তপোভূমি নর্মদা

সপ্তম খণ্ড

দক্ষিণতট

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

তপোভূমি নর্মদা

সপ্তম খণ্ড

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

প্রকাশক
শ্রী আনন্দ মোহন ঘোষাল
৪১, দানেশ শেখ লেন
হাওড়া - ৭১১ ১০৯

প্রথম প্রকাশ ঃ
দোল-পূর্ণিমা, ১৪১২

© সর্বস্বত্ব শ্রী আনন্দ মোহন ঘোষাল কর্তৃক সংরক্ষিত।
All right reserved. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without prior written permission from the publisher.

মূল্য - ২৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান ঃ
১) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮, বিধান সরণী, কলিকাতা - ৭০০ ০০৬
২) আদি নাথ ব্রাদর্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৩) দে বুক স্টোর
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৪) দেজ পাবলিসিং
১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৫) বলাকা বুক স্টল
হিন্দুস্কুল মেন গেট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩
৬) বুক ফ্রেন্ড
৮/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

মুদ্রন ঃ টাইপোগ্রাফিক আর্টস
৫৪/১বি, পটুয়াতলা লেন, কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

অভিবন্দন

(প্রণাম ও পূজা)

অগ্নিহোত্রী পিতৃদেব

ঁশশীভূষণ ঘোষাল

শ্রীচরণসরোজেষু —

এই মাটিতে পিতঃ। তোমার চরণ স্পর্শ আছে।
তাই এ মাটি, স্বর্গসম, মধুর আমার কাছে।
এই হাওয়াতে বাবা তুমি নিয়েছিলে শ্বাস
তাই এ হাওয়া স্নিগ্ধ হলো, তাই এত সুবাস।
এই আলোতে ভাগ্যবলে হেরেছিনু নয়ন মেলে
তোমায় পিতঃ! তাই এ আলো হৃদয় দীপ জ্বালে॥
সকল ধ্বনি রণরণি কানে শোনায় মধুর বাণী
হৃদয় বীণায় নিত্য তোমার অমৃত গান শুনি।
ঝরণা, নদী, বৃষ্টিধারা মন্দাকিনী সুধাভরা
তোমার স্নেহসাগর মাঝে হয় যে প্রভু হারা॥
সকল ধ্যানের সকল জ্ঞানের শেষ যে তোমার কাছে।
পুত্র তোমায় নিত্য যে তাই অভয় চরণ যাচে॥

তোমার স্নেহের

শৈলেন

চিরন্তন

১। দৃতে দৃংহ মাং মিত্রস্য চক্ষুষা সর্বানি ভূতানি সমীক্ষতাম্।
মিত্রস্যাহহং চক্ষুষা সর্বানি ভূতানি সমীক্ষে ॥
হে ভগবন্ ! আমাকে এমনভাবে দৃঢ় কর, যাতে সকল প্রণী আমাকে মিত্রভাবে দেখে, আমিও যেন সকল প্রাণীকে মিত্রভাবে দেখি ॥

২। সত্য — প্রথমেই প্রশ্নবানে আহত, গতি হয় বাধাপ্রাপ্ত, প্রসিদ্ধিতে ভর্ৎসিত, সর্বশেষে তার বিজয় প্রতিষ্ঠার জন্য স্বীকৃত।

৩। সন্ধ্যাভ্রবিভ্রমনিভা, বিভবা ভবেহস্মিন্। প্রাণাস্তৃণাগ্রলগ্নঃ বিন্দুলোলা চলস্বভাবাঃ।
পুণ্যং নৃণামিহপরত্র চ বন্ধুবেকো নোচ্চৈ স্বদেশ হিতসাধনতোহস্তি পুণ্যম্ ॥

বিভব মিথ্যা, তা সন্ধ্যাকাশের মেখমালার মত বিভ্রম উৎপাদিত করে। প্রাণ তাহাও চঞ্চল, তৃণাগ্রলগ্ন জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী, তবে কি কোন বন্ধু নাই ? পুণ্যই পরকালের একমাত্র বন্ধু। পুণ্য নানা প্রকার। তারমধ্যে স্বদেশের হিতসাধন অপেক্ষা উচ্চতর আর কোন পুণ্য নাই।

৪। Love is too slow for those who wait, too swift for those who fear, too long for those who grieve, too short for those who rejoice but for those who love life is eternity.

৫। দঁরি দরিয়া মন্ হস্তম্, ন মন্ হস্তম্ ন দরিয়া হম্
ন দানদ হেচ্ কস্ ইঁ, সর মোগো, আকস্ চুনি বাসন্।
যে চৈতন্য সমুদ্রে আমি আছি, সেখানে আমিও নাই, সমুদ্রও নাই, যার এ অবস্থা হয় নি, সে এই রহস্য জানে না।

৬। ঈশ্বরের যে কী গভীর প্রেম, তা তুমি জান না। সর্বক্ষণ তিনি প্রেমিকের মত তোমার দিকে তাকিয়ে আছেন। যদি প্রিয়তমের ঘর সমুদ্রের মধ্যে হয়, সাপেরা যদি বেড়ার মত ঘিরে থাকে, পথে যদি সিংহ গর্জন করে, স্বয়ং যম যদি দ্বারে পাহারায় থাকে, তবুও প্রিয়তমের কাছে যাওয়ার বাধা প্রেমিকের হয় না।

গ্রন্থসূচী

১ – ২৫৪

ঋষভদেবের তপস্যা ক্ষেত্র বাবলাগজায় অবস্থান — মহাত্মা ভোলানন্দ তীর্থের কথা — জৈন তীর্থ দর্শন ও জৈন শাস্ত্রালাপ — সহস্রযজ্ঞ তীর্থ — পিপলোদ ঘাটে স্থিতি — ছোট বরদা (অগ্নিতীর্থ) — কপালমোচন তীর্থ — অগ্নিহোত্রী পিতৃদেবের নবপঞ্চদশীর বর্ণনা — বেদজ্ঞানের আবশ্যকতা — পারসিক ধর্মগ্রন্থ জেন্দ্ অভেস্থা অথর্ববেদেরই যে অংশ সেই বিষয়ে আলোচনা — বেদ যেমন ঈশ্বরের নিঃশ্বাস তেমনি সংস্কৃত ভাষাই হল জীবন — ভাষার জননী সংস্কৃত হতেই রুশ ভাষা সৃষ্ট — মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের জীবনী অনুধ্যান — প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান সাধনা — শোক-দুঃখ হল জীবন-মুক্তির যৌতুক — পঞ্চ পাণ্ডব প্রতিষ্ঠিত পর্বতেশ্বর, নর্মদেশ্বর, বরুণেশ্বর, শিবযোগেশ্বর মন্দিরে অবস্থান — পিতৃস্তুতি — রঞ্জনের গুরুস্তোত্র পাঠ — পিতৃতীর্থ ব্রহ্মাবর্ত তীর্থ — পূজার তাৎপর্য্য — নির্গুণমানসপূজা — মাণ্ডব দুর্গ — বিল্বাম্রক তীর্থ — খলঘাটের কপিলা তীর্থ — সহস্রধারায় মৌনী সাধু মঙ্গলনাথজীর আশ্রয়ে অবস্থান — সাধুর প্রকৃত স্বরূপ জানা কঠিন — সদ্গুরু চিনবার বাহ্য লক্ষণ — ঝুটা গুরু ত্যাগ দোষাবহ নয় — স্বর্ণদ্বীপ তীর্থ — বৈদিক দৃষ্টিতে জন্মান্তরবাদ — মাণ্ডবাশ্রমের বিশোকেশ্বর মহাদেব — ঋষি মন্দপালের কাহিনী — অগ্নিস্তব — অর্ধনারীশ্বর স্তোত্র — বেদেশ্বর মন্দির — বেদচর্চাশ্রম — বেদের ছত্রে ছত্রে দেশমাতৃকার বর্ণনা — সত্যের স্বরূপ বিচার — পল্লীকবির স্মৃতি রোমন্থন — ভারতের বিচিত্রতম সাধন গুহা — হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি রহস্য ও হিন্দু ধর্মের সারমর্ম — কামনা-বাসনা পূর্ণ পূজার ভেট শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের সমতূল্য — নৃত্যকলা ঈশ্বর প্রাপ্তির সাধনা — আর্যদের আদি বাসস্থান নির্ণয় — মর্কটি সঙ্গম — কমলভারতীজীর সমাধি দর্শন — শংকর ভারতীজীর উপদেশ দান — অর্বাচীন ভাগবতের রচয়িতা বেদব্যাস নন — অসুররা প্রাচীন ভারতের এক সুসভ্য জাতি — মাতৃ-চিন্তা — অর্ধনারীশ্বরের পীঠ সোমতীর্থে অবস্থান — মহাযোগী পাগল হরনাথ — সাতপিপলী ঘাঠ — ময়ূরধ্বজের তপস্যাক্ষেত্র — গালবের তপস্যাক্ষেত্র খড়ক সংগম — রাবেরখেড়ী ঘাট — বৈদিক পরিমাপক সংখ্যার বর্ণনা — নর্মদাবক্ষের গঙ্গেশ্বর শিবের মন্দিরে স্থিতি — রঞ্জনের সমাধি — কৈলাস-মানসসরোবরের বর্ণনা — সোমানন্দজীর আবির্ভাব — রঞ্জনের সমাধি ভঙ্গ — রঞ্জনের তর্পন ক্রিয়া — শঙ্করাচার্য নামাঙ্কিত সমস্ত শ্লোক শঙ্করাচার্য দ্বারা রচিত নয়; এ বিষয়ে আলোচনা — আটদিন ধরে Ventroloquism পদ্ধিতিতে মহাত্মা সোমানন্দজীর অন্তরিন্দ্রিয়-লাভ, বাসনা-বিচার, আহার-বিচার, মন জয়ের গুহ্য কৌশল, মনের পরিবীক্ষণ ও পরিবিষ্টি, আসন বিচার, প্রাণায়মের প্রহেলিকাভেদ, ষটচক্ররহস্য ও কুলকুণ্ডলিনী, সমাধি বিষয়ে আলোচনা — প্রত্যজ্ঞানন্দ স্বামীজী ও অবতারাবাদ — খেড়ীঘাটে স্থিতি ও স্ত্রী-ধর্ম প্রসঙ্গ — ওঁকারেশ্বরের অদূরে মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে অবস্থান — পুনরায় সোমানন্দজীর আবির্ভাব — পিতা = শিব ব্যাখ্যা — মহাত্মার উপস্থিতিতে রঞ্জনের কব্য আহুতি — সৎগুরু তত্ত্ব ও দীক্ষার তাৎপর্য্য বর্ণনা — রঞ্জনকে দীক্ষাদান প্রক্রিয়া শুরু ও দীক্ষাদান — ওঁকারেশ্বরের বিষ্ণুপুরী দর্শন — বিষ্ণুপুরীতে সাধুসম্মেলনে ভক্তি ও জ্ঞান, অদ্বৈতবাদের মূল উৎস, বৈরাগ্য মহিমা প্রসঙ্গে ভর্তৃহরি ও স্ফোটবাদ আলোচনা — রামদাসজীর সঙ্গে ওঁকার তীর্থে পদার্পন — সবার অলক্ষ্যে প্রলয়দাসজীর সঙ্গলাভ — ওঁকারতত্ত্বের মর্মানুসারিণী ব্যাখ্যা — শম্ভুনাথের পরিবারের সঙ্গে সাক্ষাৎ — কিষণের দীক্ষা ভিক্ষা — ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা ব্যাখ্যা — যোগ হল পরিপূর্ণ বিজ্ঞান — বাল্মীকি রামায়ণ Vs কৃত্তিবাসী রামায়ণ — রামদাসজীর কাছে ভুশুণ্ডি কাকের মুখে গরুড়ের রাম-কথন শ্রবণ — রামদাসজীর কাছে ওঁকারেশ্বর ত্যাগের জন্য বিদায় প্রার্থনা — ওঁকারেশ্বর ত্যাগ — পুনরায় পরিক্রমার পথে মুণ্ডমহারণ্যে।

লেখক পরিচিতি

লেখক ঃ শ্রী শৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী।

জন্ম ঃ ১৯২৮ সালের ৫ই মার্চ দোল-পূর্ণিমার দিন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াড়া নামক গ্রাম।

পিতা ঃ অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ স্বর্গীয় শশিভূষণ ঘোষাল।

মাতা ঃ স্বর্গীয়া প্রভাবতী দেবী।

শিক্ষা ঃ মাধপুর স্কুল হতে প্রাথমিক শিক্ষালাভ; পরে মেদিনীপুর বি.এইচ ইনস্টিটিউট হতে ম্যাট্রিকে জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ধীরে ধীরে লেখকের মধ্যে ঐশ্বরিক প্রতিভার স্ফূরণ ঘটে। মেদিনীপুর কলেজ হতে প্রথম বিভাগে আই.এস.সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে কোলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ হতে প্রথম শ্রেণীতে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পিতৃ আদেশে বেদাধ্যয়ন ও 'ভারতকে জান' এই আদেশ শিরোধার্য করে কৈলাস, মানস-সরোবর, শতপন্থ, কেদারবদ্রীসহ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ পদব্রজে চারবার পরিভ্রমণ করেন। ভারতবর্ষ পরিভ্রমণের ফাঁকে ফাঁকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংস্কৃত ও দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পিতৃবিয়োগ। সংসার ত্যাগ। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নর্মদা পরিক্রমা শুরু।

গ্রন্থ ঃ দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে নর্মদা পরিক্রমান্তে ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় প্রথম গ্রন্থ আলোক-তীর্থ। ধর্মজীবনের সমস্ত কুসংস্কার, গোঁড়ামি, পাপ এবং অবতারবেশী পরভোজী 'ঠাকুরে'রা আজ সারা দেশের বিভিন্ন অংশে ধর্মের নামে আসর জাঁকিয়ে লুণ্ঠন ও শোষণের যে নিরঙ্কুশ বাণিজ্য চালাচ্ছেন তার বিরুদ্ধে এক বিস্ময়কর বিদ্রোহ। ১৯৫৯ সালে দ্বিতীয় গ্রন্থ আলোক-বন্দনা। আলোক-তীর্থের বিরুদ্ধে প্রকাশিত বিভিন্ন সমালোচনা গ্রন্থের প্রত্যুত্তর, বেদের বিভিন্ন ভাষ্য সম্বন্ধে তুলনামূলক গবেষণা, মহাভারত, রামায়ণ, পুরাণ শাস্ত্রের প্রকৃত পরিচয় নির্ণয় এই গ্রন্থের প্রধান সম্পদ। ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বৈদিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, যেখানে প্রতি মঙ্গলবার বৈদিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন জিজ্ঞাসুর নানা প্রশ্নের উত্তর দিতেন। বর্ত্তমানে তা অবলুপ্ত। ১৯৮০ সালে তৃতীয় গ্রন্থ 'পিতরৌ', একাধারে মাতৃগীতা ও পিতৃগীতা, যার মন্ত্রবাণী —

স্রষ্টা আছেন শুনি
তাঁরে চোখে দেখিনি
মাতাপিতা নিত্য প্রকট
তাঁদেরই নমি।

১৯৮৬ সালে চতুর্থ গ্রন্থ সিরিজ 'তপোভূমি নর্মদা' (১-৮ম)। ঋষি পিতার শেষ আদেশানুসারে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নর্মদার উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে গুজরাটের ভৃগুকচ্ছ (নর্মদার সঙ্গে সমুদ্রের সঙ্গমস্থল) পর্যন্ত উভয়তট নগ্নপদে পরিক্রমাকালে যেখানে যা দেখেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা। এই গ্রন্থে রয়েছে উচ্চকোটির সাধু মহাত্মাদের সাধনপথ, শ্বাপদ-সঙ্কুল গভীর অরণ্যের পথঘাট ও আরও সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

মৃত্যু ঃ ১৯৮৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর রাত্রি ১২টায় পিতৃপক্ষের মহামহাক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে লেখক শিবতনু প্রাপ্ত হন।

শ্রী শৈলেন্দ্র নারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী
(১৯২৮ - ১৯৮৭)

তপোভূমি নর্মদা

ওঁ

॥ হর নর্মদে হর॥

দক্ষিণতটের বড়বানী রাজ্যের অন্তর্গত রাজঘাটে এসে শূলপাণির ঝাড়ি শেষ হল। শূলপাণির ঝাড়ি অতিক্রম করে আমরা যেন নবজন্ম লাভ করেছি। সবসময়ে যেন মৃত্যুকে শিয়রে রেখে হেঁটেছি। আমৃত্যু মনে থাকবে এই ভয়ঙ্কর ঝাড়ির কথা। সবারই শরীর ক্লান্ত, অবসন্ন। হরানন্দজীর ইঙ্গিতে উপর দিকে তাকিয়ে দেখি — সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষদেশ রোদে ঝলমল করছে। উভয় পর্বতের শীর্ষদেশের নীলাভ ঘন বনের শোভা চোখে যেন এক অপরূপ মায়ার কাজল পরিয়ে দিয়েছে। কতক্ষণ যে এইভাবে কেটে গেছে জানি না? হঠাৎ পিছনদিকে কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠলাম।

— আপলোগ্ নর্মদা মাইয়াকো পরকরমা কর্ রহে হো? ঠারেঙ্গে কাঁহা?

আমি বললাম — ইধারই ঠারনেকা বিচার হৈ। নর্মদা মায়ীকী যো মৌজ হোগা ওহি করনে পড়েগা।

— ইধর ঠারনাই আচ্ছা হৈ। আপ হামারা সাথমে আইয়ে। সব ইন্তেজাম হো যাবেগা।

তখন রঞ্জনের ঘড়িতে ৩টা বেজেছে। সূর্য তখন পাটে, অস্তাচলগামী সূর্যের রক্তিমাভাতে যেন বেদনা ফুটে উঠেছে। বনের মধ্যে নর্মদার ধারে ঐ আগন্তুকটি একটি পাথরের ব্যারাকবাড়ীর সামনে আমাদেরকে নিয়ে এসে হাজির করল। গুণে দেখলাম বারখানা ঘর। প্রত্যেকটি মনে হয় ১২ ফুট × ১০ ফুট করে। ব্যারাকবাড়ী সংলগ্ন বিরাট একটি বারান্দা, বাড়ীর পিছনে পরচালা নামিয়ে আর একটি ঘর, সেইটি ভাঁড়ার ঘর। প্রধান দরজা মজবুত, মোটা শাল কাঠের, প্রত্যেক ঘরের উপরদিকে একটা করে ছোট ছোট ফোকর। সেই ফোকর দিয়েই আলো বাতাস ঢোকে। প্রত্যেকটি ঘরের মধ্য দিয়েই অন্যান্য ঘরে যাতায়াত চলে।

প্রেমানন্দ বলল — জায়গাটি বেশ ভালো ও সুরক্ষিত। আজ এখানেই রাত্রিবাস করা যাক।

— মেরা নাম হ্যায় সরযু। ম্যায় ইস্ সদাবর্তকা কোঠারী হু। এ দাস আপকা সেবামেঁ সদাই প্রস্তুত। উত্তরতটমেঁ ভী এয়স্যাই বড়বানী রাজাকা পথলকা ব্যারাকবাড়ী হ্যায় পরিক্রমাবাসীয়োঁকে লিয়ে। দোনো তটই বড়বানীকা অন্তর্গত হ্যায়। সে আরও জানাল — বড়বানী রাজ্যের রাজা বাস করেন এই নর্মদাতট হতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে। এখানকার রাজা ভীলালা। আমাদের এখানে পরিক্রমাবাসী সাধুদের ভোজনের ব্যবস্থা আছে। এতদ্‌ঞ্চলের কৃষিজীবী গোঁড় এবং ভীলদের কাছ হতে গম, যব, বাজরা ভেট স্বরূপ আসে, পরিক্রমাবাসীদের ভাণ্ডারার জন্য। আগে রাজাই সব খরচ বহন করতেন। কিন্তু এখন রাজার অবস্থা সেরকম নাই। আপনারা বিশ্রাম করুন। কিছুক্ষণের মধ্যে ভোজন প্রস্তুত হয়ে যাবে।

সরযু ঘরগুলি ভাল করে পরিষ্কার করে তামার কলসে নর্মদার জল এনে ভরে দিল। কলসির গলা অবধি পাথরে পোঁতা। নর্মদার শোভা দেখতে দেখতে নর্মদা থেকে কিছুদূরে পাহাড়ের উপর ঘন বনের মধ্যে একটি রঙচঙে বিশাল মন্দিরের দিকে জ্যোতির্ময়ানন্দের চোখ পড়ল। মন্দিরের চূড়ায় হরিদ্রাবর্ণের একটা পতাকা উড়ছে বলে মনে হল। আমি বললাম — ঐটা বাবলাগজার পাহাড়। মন্দিরটি জৈনদের। জৈনরা বিশ্বাস করেন, এইখানে নর্মদার দক্ষিণতটে ঋষভদেব তপস্যা করেছিলেন। ঋষভদেব তাঁদের মতে স্বয়ং শিব। অন্যান্য হিন্দু মহাত্মাদের মতে, রাজা 'অগ্নিধ্রের পুত্র নাভির ঔরষে মেরুদেবীর গর্ভে মহাত্মা ঋষভের জন্ম হয়। তিনিই পরমহংস ব্রতের পথপ্রদর্শক। তাঁর একশত পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে একানব্বুইজন কঠোর বৈরাগ্যের পথ অবলম্বন করেন এবং অবশিষ্ট ভরত প্রভৃতি ন'জন পুত্র ভারতবর্ষের নয়টি দ্বীপের অধীশ্বর হন। এই মহারাজ ভরতের নামানুসারেই আমাদের দেশের নাম ভারতবর্ষ। সেই ভরতের পিতৃদেব পরমযোগী এবং পরম বৈরাগী

ঋষভদেবের তপস্যাস্থল এই বাবলাগজা। দক্ষিণতট দিয়ে যাঁরা পরিক্রমা করেন তাঁরা বাবলাগজা থেকেই শূলপাণির ঝাড়িতে প্রবেশ করেন, কারণ ঐ তটে চিখলদা থেকে প্রকৃত শূলপাণির ঝাড়ি আরম্ভ হলেও এই তটে বাবলাগজা থেকেই শূলপাণির ঝাড়ি শুরু। শূলপাণির ঝাড়ির গভীর অরণ্য উভয় তটেই বিস্তৃত।

মহানন্দস্বামী বললেন — হিমালয়ের উত্তরে কৈলাসের নিকট ঋষভ নামে একটি পর্বত আছে। ঐ পর্বতে বিশল্যকরণী, মৃতসঞ্জীবনী, সন্ধিনী, সুবর্ণকরণী প্রভৃতি ওষধি পাওয়া যায়; যা ছিল শিবের বিচরণ ক্ষেত্র, তপস্যার ক্ষেত্র। সেই থেকে শিবের অপর নাম ঋষভ। তাই বলে বাবলাগজার ঋষভদেব স্বয়ং শিব ছিলেন না। তবে একথা সর্বথা মান্য যে, তপোবলে মহারাজ নাভির পুত্র পরমহংস শিরোমণি ঋষভদেব শিবত্ব অর্জন করেছিলেন। শ্রেষ্ঠ যোগীন্দ্র মাত্রই তপস্যার প্রভাবে শিবত্ব অর্জন করতে পারেন। তাই বলে তাঁরা কেউ স্বয়ং শঙ্কর নন।

এইভাবে ঘরের মধ্যে বসে আলোচনা করছি, এমন সময় কোঠারী এসে জানাল — ভোজন প্রস্তুত। এখন ৪টা বেজে গেছে। ঘরের মধ্যে সকলে একসঙ্গে বসে লিট্টি ও গুড় পরমানন্দে খাওয়া হল। খাওয়ার পর আমরা সকলেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে নর্মদাতে মুখ হাত ধুয়ে এলাম।

ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অস্তগামী সূর্যের রঙিন রশ্মির বর্ণালী ছড়া এসে পড়েছে নর্মদার জলে ও পাহাড়ের গায়ে। এই গম্ভীর মহারণ্যে গাছপালার মধ্যে শুধু জীবন্ত মৃত্যুই ওৎ পেতে নেই, এই শান্তশ্রীমণ্ডিত শ্যামশোভার মধ্যে সঙ্গীতও আছে। কিন্তু তা শোনার জন্য নীরবে কান পেতে থাকতে হয়।

প্রধান দরজা সশব্দে বন্ধ করে দেওয়া হল। পরপর দুটি ঘরে আমরা চারজন করে আসন পেতেছি। ব্যারাকবাড়ীর ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাসও আসছে তবুও খুব গরম লাগছে। প্রত্যেক ঘরেই একটি করে প্রদীপও জ্বালা হয়েছে। সবাই সান্ধ্যক্রিয়াতে বসেছেন, আমিও কমণ্ডলুর জলে আচমন করে স্মরণ মননে রত হলাম। আজও শীতের দাপট প্রচণ্ড, অন্ততঃ এই ঘরটার মধ্যে খুব কমই মনে হচ্ছে।

সবাই চুপচাপ কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকতে থাকতে প্রেমানন্দ বললেন — সকলে মিলে কিছুক্ষণ সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করা যাক ঘুম না আসা পর্যন্ত্য। আজকে আমাদের কামরূপ মঠ ও আমার গুরুদেব নৈষ্ঠিক সন্ন্যাসী ভোলানন্দ তীর্থজীর কথা খুব বেশী করে মনে পড়ছে। তাঁর সম্বন্ধে কিছু আপনাদের বলতে খুব ইচ্ছে করছে। শৈলেন্দ্রজী তাহলে বুঝতে পারবেন কি গুণে তিনি এতগুলি লোকের চিত্ত হরণ করলেন!

যদিও আমার পক্ষে গুরুদেবের অনন্ত মহিমা বর্ণনা করা বাচালতা মাত্র। তবে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁর নিত্য সান্নিধ্যে আমাকে থাকতে হয় বলে তাঁর লৌকিক ব্যবহার এবং কথোপকথনের ধারা সম্বন্ধে কিছু বলতে পারি। আমি বলছি শুনুন।

কামরূপ মঠ হল কাশীর প্রাচীনতম মঠগুলির অন্যতম। অতি প্রাচীনকালে বর্ত্তমানে যেখানে বারাণসী শহর, তার উপর দিয়ে গোদাবরী নদী বয়ে যেত। বলা বাহুল্য, এই নদী দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত গোদাবরী নয়। কাশীস্থ এই গোদাবরী নদীর উভয়দিকে বিস্তীর্ণ গোচারণ ভূমি ছিল, গোক্ষুরোত্থিত ধূলিতে গোদাবরীর উভয় তীর সমাচ্ছন্ন থাকতো বলে পরবর্তী কালে কাশীর বিখ্যাত কেন্দ্রস্থলটির নাম হয়েছে গোধূলিয়া। যাই হোক, এই গোদাবরী বরুণা এবং অসি নদীর সঙ্গমস্থলেই ছিল ব্রহ্মা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের কেন্দ্রস্থল। কালক্রমে নদীগুলি একটু একটু করে স্থান পরিবর্তন করে গঙ্গার সঙ্গে মিশে গেছে। ব্রহ্মার প্রধান যজ্ঞকুণ্ডের উপরেই এই কামরূপ মঠ গড়ে ওঠে। মঠের তাম্রশাসনে দেখা যায়, কামরূপের রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহ মবল ১২৩০ শকাব্দে তাঁর গুরু মহাযোগী মহাদেবানন্দ তীর্থের তপস্যা-ক্ষেত্র হিসাবে এই মঠ স্থাপন করেন। এই মঠের আচার্যগণের ত্যাগ ও তপস্যার নানা কাহিনী প্রবাদ বাক্যের মত প্রচলিত। ফলে স্মরণাতীত কাল হতে ভারতের সাধু সমাজে এই মঠ এক অসাধারণ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। অদ্বৈতবেদান্ত রাজ্যের যিনি দ্বিতীয় শঙ্করাচার্য, অমূল্য মহাগ্রন্থ অদ্বৈতসিদ্ধিঃ প্রণেতা আচার্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীও এই মঠের তলদেশস্থ ধ্যান গুহায় কিছুদিন বাস করেছিলেন। পুরীর গোবর্ধন মঠের শঙ্করাচার্য, বিশ্ববিশ্রুত অঙ্কবিদ্ এবং বৈদান্তিক শ্রীমৎ স্বামী ভারতী কৃষ্ণতীর্থ মহারাজের গুরুদেব শ্রীমৎ স্বামী মধুসূদন তীর্থজীও ছিলেন এই মঠেরই অনুগত সন্ন্যাসী। তিনি প্রায়ই বলতেন — 'সন্ন্যাসীর পক্ষে অহমিকা থাকা অপরাধ। কিন্তু যখনই মনে করি যে আমি কামরূপ মঠের সন্ন্যাসী, তখন আমর মনে অহঙ্কার জাগে।'

এই মহৎ উত্তরাধিকারের যোগ্যতম উত্তর সাধক হলেন আমাদের গুরুদেব — স্বামী ভোলানন্দ তীর্থ। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। জন্মস্থান - বর্ধমান। সংসারে তাঁর একমাত্র বন্ধন ছিলেন মা। মায়ের দেহান্তের সঙ্গে সঙ্গে ইনি বর্ধমান, পুরী, ভুবনেশ্বর, হরিদ্বার, কাশী ও প্রয়াগ প্রভৃতি স্থানের ১২ খানি অট্টালিকা এবং নগদ ৩ লক্ষ টাকা চতুষ্পাঠী স্থাপন এবং সৎকাজের জন্য দান করে দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে কামরূপ মঠের যে গুফাটিতে আশ্রয় নেন, সেখানে থেকে রাত্রি ৩টায় একমাত্র গঙ্গা স্নান ছাড়া অন্য কোন কারণেই মঠের বাইরে যেতেন না। মঠের পেছনে প্রায় দুইশত গজ দূরেই গোধূলিয়ার মোড়। কিন্তু তিনি তার সুদীর্ঘ ৬২ বৎসরের সন্ন্যাস জীবনে গোধূলিয়া দেখেন নি। পবিত্র সন্ন্যাস-ধর্ম যে কী কঠিনতম ব্রত, তা অজগর-বৃত্তিধারী এই মহাতপা যোগীর পুণ্যজীবন দেখলে তবেই মর্মে মর্মে অনুভব করা যায়।

তাঁর জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা আমি আপনাদের বলছি, তা শুনলেই তাঁর জীবন-দর্শনের আভাষ পাবেন। ভারত বিখ্যাত মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্যের পুত্র পণ্ডিত গোপাল ন্যায়াচার্য একদিন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। তিনি ছিলেন, তাঁর ভগ্নীপতি কবিরাজ নিবারণ ভট্টাচার্যের প্রতিষ্ঠিত দিল্লী আয়ুর্বেদিক ফার্মেসীর কর্মাধ্যক্ষ। দিল্লী ও উত্তর প্রদেশের নানা স্থানে তার শাখা প্রশাখা আছে। এই কবিরাজী দোকানের কাজে তাঁরা বহু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তিনি স্বামীজীকে বললেন — 'তোমার আশীর্বাদে আমরা বহু অর্থ উপার্জন করেছিলাম, অহংকারে তোমাকে মানিনি, আজ বড় দুঃসময়, গত বছর থেকে আমরা ব্যবসায়ে মার খাচ্ছি। তুমি আশীর্বাদ কর। আমাদের পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দাও।'

স্বামীজী — সে কি ভগবন্। আমি আবার তোমার ভাগ্য ফিরালুম কবে? আমি নিজে ভিখিরি, বিশ্বনাথের দুয়ারে পড়ে আছি। ভিখিরি আবার টাকার সন্ধান জানবে কি করে? তুমি তোমার কর্ম অনুযায়ী ফল পেয়েছ বা পাচ্ছ। অতবড় পণ্ডিতের ছেলে তুমি, পাছে টাকার প্রয়োজনে অন্য কোন বৃত্তি তুমি অবলম্বন করে ফেল, এজন্য বলেছিলাম সংস্কৃত জান যখন, আয়ুর্বেদের চর্চা করে বিশুদ্ধ কবিরাজী ঔষধের দোকান কর। আশা ছিল — তোমার সংসারের প্রয়োজনও মিটবে আর .... আর যে বিরাট প্রতিভা থেকে তোমার জন্ম, চাই কি হয়ত একদিন তোমার হাত দিয়ে কোন বিস্ময়কর ওষুধও বের হয়ে যেতে পারে। নতুবা আমার মত ভিখিরি, টাকার সুলুক-সালুক কি করে জানবে ধন? ছিঃ বাবা, সন্ন্যাসীর কাছে টাকা চাইতে নাই, টাকা দিতে নাই, টাকার প্রসঙ্গ তুলতে নাই।

স্বামীজীর এই কথা শুনে গোপালবাবু বড় কাতর হয়ে পড়লেন। কিছু পরে স্বামীজী উঠে পড়লেন। বললেন চল ভগবন্, উপরে লাইব্রেরী ঘরে যাই। তিনতলায় ছাদের উপর তখন মঠসংলগ্ন একটা অশ্বত্থ গাছের ছায়া পড়েছে। সূর্যাস্ত হতে তখন বেশী দেরী ছিল না। হঠাৎ স্বামীজী গোপালবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন — 'ভগবন্! এই যে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, একটু আগে এখানে রোদ ছিল, এখন ছায়া পড়েছে। এই যে ছায়া এটা কি সূর্যের জন্য, না কালের জন্য?

গোপাল — কালের জন্য। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। তাই ছায়া।

স্বামীজী — আবার রোদ আসবে?

গোপাল — হ্যাঁ, আবার রাত্রি গত হলে কাল সকালে এইখানে রোদ আসবে।

স্বামীজী — তবে দেখ, রোদের পর ছায়া, দিনের আলোর পর সন্ধ্যা — এই তো নিয়ম। কাল শুভ হয়েছিল, তোমার ঐশ্বর্য হয়েছিল, এখন সন্ধ্যা — অপেক্ষা কর, আবার ঘুরে ঘুরে সূর্যের আলো এইখানেই এস পড়বে। এই নিয়ম। এতে কারও হাত নাই। মনে কর, একটা নাচ-উলি, হাসিমুখে নাচ দেখিয়ে চলে গেল সোনারপুরার দিকে। তুমি বসে আছ জঙ্গমবাড়ীতে। এখন তুমি যদি তাকে ঐখানে আটকে রাখতে না পার অথচ তার নাচ দেখবার জন্য আবার যদি ইচ্ছা কর, তাহলে তোমাকে অপেক্ষা করতেই হবে, ঠায় ঐখানটায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে যতক্ষণ না সে নাচ-উলি আবার ঐ রাস্তা দিয়ে ফিরে আসে। আবার এটাও ভেবে দেখা দরকার, ঠিক এই পথ দিয়েই সে আসতেও পারে, নাও পারে। এলেও হাসিমুখে আবার নাচ দেখাবে কিনা তার কোন ঠিক নাই। সবই তাঁর ইচ্ছা ভগবন্।

প্রেমানন্দের গল্প শেষ হতেই রঞ্জন জানাল ঘড়িতে এগারটা বেজেছে।

দণ্ডী সন্ন্যাসীদের মধ্যে কেউ কিছু বলার আগেই হরানন্দজী বলে উঠলেন — জয়গুরু! জয়গুরু! আমরা সকলে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

এক ঘুমেই সকাল হল। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন সাতটা বেজেছে। দরজাটা ঈষৎ ঠেলে দেখলাম — নিবিড় কুয়াশায় সব ঢেকে গেছে। জানলা দিয়ে তীব্র শীতের হাওয়া বয়ে আসছে। গাছ, পাহাড়, রাস্তাঘাট দেখে মনে হল রাতে যেন বৃষ্টি হয়েছে। চারদিক ভিজা ভিজা। আসলে বৃষ্টি হয়নি, সারারাত্রি ধরে শিশির পড়ে এই অবস্থা। তবুও তা আগ্রাহ্য করে উত্তরদিকের জানলার কাছে এগিয়ে গেলাম মা নর্মদাকে দর্শন করতে। নর্মদার ধারাকে একটা রূপালী স্রোত বলে মনে হচ্ছে, কুয়াশার জন্য দৃষ্টি চলে না, কনকনে ঠাণ্ডার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেও কষ্ট হয়। কোনমতে হাতদুটো কপালে ঠেকিয়ে দৌড়ে ফিরে এলাম বিছানায়। ভাল করে কম্বলে সারা শরীরকে ঢেকে নিচ্ছি, এমন সময় দেখলাম পাশের ঘর থেকে আরও কিছু শুকনো ডাল এনে হরানন্দজী আগুনের চুল্লীর উপর চাপিয়ে দিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। আগুন জ্বলে উঠতেই তিনি আবার বিছানায় শুয়ে কম্বল মুড়ি দিলেন। পৌনে আটটা নাগাদ চারদিকে সূর্যোদয়ের আভাষ ফুটে উঠল। আমরা কমণ্ডলু ও গামছা হাতে নিয়ে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান করতে চলে গেলাম। প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদার জলে কমণ্ডলু বারবার ডুবিয়ে গায়ে মাথায় ঢেলে কোনমতে স্নান, তর্পণ সেরে নিলাম। পাহাড়ের উপর দিয়ে তখন সূর্যের আলো সমগ্র মালভূমি এবং উপত্যকা অঞ্চলকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

এরপর স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ, আমি, হরানন্দজী ও রঞ্জন চললাম বাবলাগজা পাহাড়ে জৈনদের মন্দির দর্শন করতে। অন্যরা জৈন-মন্দির দর্শনে যেতে চাইলেন না। প্রায় ১০৫ খানা সিঁড়ি অতিক্রম করে আমরা মন্দিরে পৌঁছলাম। খুবই সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশ। মন্দিরে ঋষভদের বিশাল মর্মর মূর্তি। দেওয়ালে দেওয়ালে অন্যান্য তীর্থঙ্করদের মূর্তি ও তাঁদের উপদেশ। একজন দিগম্বর সাধু সবকিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখালেন। ফেরার পথে স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ বলতে লাগলেন — জৈন ধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন, তাতে সন্দেহ নেই। যজুর্বেদে ঋষভ, অজিতনাথ এবং অরিষ্টনেমি নামে তিন জন তীর্থঙ্করের উল্লেখ আছে। ভাগবত পুরাণ মতে ঋষভদেব হতেই জৈন ধর্মের উৎপত্তি হয়। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে 'নিগন্থ' নামে এই সম্প্রদায়ের এবং তাঁর গুরু নাতপুত্ত বর্দ্ধমান মহাবীরের উল্লেখ আছে। বুদ্ধের সময়ে যে সকল রাজা ছিলেন, জৈন শাস্ত্রেও মহাবীরের সমসাময়িক বলে তাদের উল্লেখ আছে। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জৈন শাস্ত্রও প্রথমে কণ্ঠস্থ করে রাখা হত। তবে সমগ্র শাস্ত্র কণ্ঠস্থ রাখা দুরূহ। ফলে প্রাচীন শাস্ত্রের কিয়ৎ অংশ নষ্ট হয় এবং মতভেদের উৎপত্তি হয়। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পাটলিপুত্র নগরে ধর্মের প্রকৃত মতগুলি নির্দ্ধারণ করবার জন্য এক অধিবেশন হয়। এর পরে খৃষ্টীয় ৪৫৪ অব্দে বলভী নগরে আর এক সভায় ধর্মমতগুলির চূড়ান্তরূপ নির্দ্ধারিত হয়। এই সভায় ৮৪ খানা গ্রন্থ শাস্ত্র বলে গৃহীত হয়। এদের মধ্যে ৪১ খানা সূত্রগ্রন্থ, ১২ খানা নির্যুক্তি (ভাষ্য), একখানা মহাভাষ্য এবং কতকগুলি প্রকীর্ণক (বিচ্ছিন্ন - অশ্রেণী বদ্ধ) গ্রন্থ ছিল। সূত্রগ্রন্থদিগের মধ্যে ছিল ২১ অঙ্গ, ১২ উপাঙ্গ, পাঁচ ছেদ, পাঁচ মূল এবং আট বিবিধ গ্রহ। ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই সকল গ্রন্থ অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লিখিত ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হতে সংস্কৃত ভাষাতেও জৈন গ্রন্থ লেখা হতে থাকে। দিগম্বর জৈনদিগের মতে খৃষ্টীয় ৫৭ অব্দে জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হয়। এই সময়ে শাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকের অভাব হয়েছিল, এবং মহাবীরের ও কেবলী সন্তদিগের উপদেশ সকলের মধ্যে যা যা কারও কারও স্মৃতিতে রক্ষিত ছিল, তাই মাত্র শাস্ত্রের অবশিষ্ট ছিল। এর উপরই সপ্ততত্ত্ব, নবপদার্থ, ষট্‌দ্রব্য এবং পঞ্চ অস্তিকা সম্বন্ধীয় শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সমস্ত শাস্ত্রের বহু ভাষ্য ও টীকা পরে রচিত হয়েছিল।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পদ্য ও গদ্যে জৈনদিগের অনেক গ্রন্থ আছে। কাব্য, নাটক, নীতি-কাব্য, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিভাগে জৈনদিগের দান — সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নগণ্য নয়। হিন্দুরা যেমন বেদ বেদান্তকে মান্য ও শ্রদ্ধা করে তেমনি জৈনরা অঙ্গকে সর্বপ্রধান গ্রন্থ বলে মানে। জৈনরা প্রধানতঃ দুটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত — (১) দিগম্বর, এরা সব থেকে প্রাচীন ও বহু বিস্তৃত। (২) শ্বেতাম্বর। দিগম্বর সম্প্রদায়ের উদাসীনরা সবসময়ে দিগম্বর (বিবস্ত্র) অবস্থায় থাকেন কিন্তু শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উদাসীনরা সবসময়ে শ্বেতাম্বর বস্ত্র পরিধান করেন। দিগম্বর তীর্থঙ্করদের প্রতিমূর্তি হার, কুণ্ডল, মুকুট প্রভৃতি স্বর্ণময় ও রত্নময় ভূষণে অলঙ্কৃত থাকে। দিগম্বররা ষোড়শ স্বর্গ এবং একশত স্বর্গাধিপতির অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কিন্তু

শ্বেতাম্বরদের মতে স্বর্গ দ্বাদশ এবং ইন্দ্র চতুঃষষ্ঠি। দিগম্বর গুরুরা পাত্রে ভোজন করেন না। শিষ্য প্রদত্ত খাদ্য হাতে নিয়ে ভোজন করেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর গুরুরা পাত্রে ভোজন করেন। দিগম্বর সাধুরা জলপাত্র, চৌরি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহৃত জিনিষ সঙ্গে রাখেন। দিগম্বর জৈনদের সমস্ত শাস্ত্র উত্তরকালবর্তী আচার্য দ্বারা লিখিত বলে স্বীকার করেন। কিন্তু শ্বেতাম্বররা বলেন অঙ্গ নামক ধর্মশাস্ত্র তীর্থঙ্করদের শিষ্যদের দ্বারা প্রণীত। দিগম্বররা স্ত্রীগণকে নির্বাণমুক্তি লাভের অধিকারী বলে স্বীকার করেন না কিন্তু শ্বেতাম্বররা তা স্বীকার করেন। জৈন সন্ন্যাসীগণ ভিক্ষোপজীবী, কৌপীনধারী ও ক্ষৌরিত মস্তক। সম্বল ভিক্ষাপাত্র ও যষ্ঠী। প্রত্যহ তিন ঘন্টার অধিককাল নিদ্রা যাওয়া নিষেধ। দিনের অবশিষ্ট সময় সন্ন্যাসীরা পাপের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, ধ্যান, অধ্যয়ন এবং ভিক্ষায় ব্যায়িত হয়।

জৈনরা প্রত্যেক মানুষের জীবনকে নয়টি তত্ত্ব দ্বারা ভাগ করে থাকেন — জীব, অজীব, পুণ্য, পাপ, আস্রাব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ, মোক্ষ।

১) জীব ঃ জীব দু'প্রকার—সচল ও অচল। দেব, দৈত্য, মনুষ্য ও অন্যান্য জন্তু প্রথম শ্রেণীভুক্ত। ক্ষিতি, অপ, তেজ, বায়ু, এই চারি ভূতের সংযোগ ও বিয়োগে যত বস্তু উৎপন্ন হয় তা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। জৈনদের মতে এ সকল সজীব পদার্থ।

২) অজীব ঃ যাবতীয় বোধ বর্জিত নির্জীব পদার্থের নাম অজীব। এরও নানা প্রকারভেদ আছে। যে পদার্থ দ্বারা সজীব ও নির্জীব বস্তুর গতিবিধির সুবিধা হয়ে থাকে তাকে ধর্মাস্তিকায় বলে। যার দ্বারা গতিবিধির ব্যাখ্যাও জন্মে, তাকে অধর্মাস্তিকায় বলে। যে গুণ থাকতে, বস্তু সকল একবারে পরস্পর সংযুক্ত না হয়ে, স্বতন্ত্র থাকে। তাকে আকাশাস্তিকায় বলে। সমস্ত জড় বস্তুর মূলীভূত অণু সমুদায়কে পদ্‌গল বলে। অজীবের আর এক প্রকার ভেদের নাম কাল।

৩) পুণ্য ঃ জীবগণের সুখদায়ক বিষয়কে পুণ্য বলে। এই পুণ্য ৪২ প্রকারের। যেমন দেবত্ব প্রাপ্তিকে সুরগতি, মানব জন্মগ্রহণকে মনুষ্যগতি, কুল মর্যাদাকে উচ্চগোত্র বলে। নিজ নিজ কর্মানুসারে মানুষ যেরূপ ধারণ করে তাকে কার্ম্মণ বলে। বর্ণ, সৌরভ, সুস্বাদ, শৈত্য, উষ্ণতা পুণ্যের অন্তর্গত।

৪) পাপ ঃ মানুষের অ-সুখজনক ব্যাপারকে পাপ বলে। পাপ ৮২ প্রকার। যেমন — নিদ্রা, নীচ কুলে উৎপত্তি, জ্ঞানলাভের ব্যাঘাত, মনঃকল্পিত দেবদেবীতে বিশ্বাস, শরীরের অঙ্গ বৈলক্ষণ, কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপু। হাস্য ও প্রেম হল পাপ।

৫) আস্রাব ঃ যে যে কারণে জীবের দুষ্প্রবৃত্তি উপস্থিত হয় তাকে আস্রাব বলে। চক্ষু, শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, ক্রোধ, অহঙ্কার, প্রবঞ্চনা এই রিপু চতুষ্টয়। কোন বিষয়ে অনন্যভাবে মন, বাক্য, শরীর, সমর্পণকে আস্রাব বলে। জৈন ধর্মে অশ্রদ্ধাও এক প্রকার আস্রাব।

৬) সম্বর ঃ সমিতি, পরিষহা যতিধর্ম প্রভৃতি নানা প্রকার সম্বর আছে। পদাঘাতে কীট-পতঙ্গের যেন মৃত্যু না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। অকথ্য শব্দ উচ্চারণ না করা, অগ্রাহ্য সামগ্রী গ্রহণ না করা ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ে সাবধান থাকাকে সমিতি বলে। ক্ষুদ্রা, তৃষ্ণা সম্বরণ, শীত উষ্ণাদি, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বিষয়ে সহিষ্ণুতা প্রকাশকে পরিষহা বলে। সত্য, শুদ্ধি, সারল্য, শিষ্টাচার, নিঃস্বার্থতা, ধ্যান, ধৈর্য্য, তপঃকাষ্ঠা, দারিদ্র্য, স্ত্রী সহযোগ পরিত্যাগ প্রভৃতি দশটিকে যতিধর্ম বলে।

৭) নির্জ্জর ঃ রিপু দমনার্থ কষ্টকর অনুষ্ঠানকে নির্জ্জর বলে। এটি দু প্রকার — বাহ্য ও আন্তরিক। অনশন, মৌন, স্ত্রী সহযোগ পরিত্যাগ ও কায়ক্লেশকে বাহ্য নির্জ্জর বলে। আর ধ্যান, অনুশোচনা, শাস্ত্রানুশীলন, উপাস্য বস্তুতে নিষ্ঠা ও ভক্তি, পুণ্যবানকে আশ্রয় দান, পাপ-পুণ্য পরিত্যাগকে আন্তরিক নির্জ্জর বলে।

৮) বন্ধ ঃ দুধের সঙ্গে জলের ও উষ্ণ লোহার সঙ্গে অগ্নির যেমন সংযোগ থাকে তেমনি জীবের সাথে কর্মের যে সংযোগ থাকে তাকে বন্ধ বলে।

৯) মোক্ষ ঃ কর্ম বন্ধন হতে মুক্ত হওয়াকে মোক্ষ বলে। পুনর্জন্ম নিবৃত্ত মোক্ষের প্রধান লক্ষণ।

জৈন সহিত্যে প্রাধানতঃ পালি ভাষায় লিখিত। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের আক্রমণ হতে আত্মরক্ষার জন্য জৈন দার্শনিকগণ সংস্কৃত ভাষাতেও গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

জৈন দর্শন বহুত্ববাদী ও বস্তুবাদী। দাহ্য জগৎ, যা আমরা ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তা সত্য। জগতে

দ্বিবিধ বস্তুর অস্তিত্ব আছে — প্রাণবান্ ও প্রাণহীন। প্রত্যেক প্রাণবান বস্তুর আত্মা (জীব) আছে। সুতরাং অহিংসা — জীবহিংসা বর্জন — জৈন মতে পরম ধর্ম। জৈন ধর্মের আর একটি প্রধান কথা — পরের মতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। জৈন অনেকান্তবাদের উপর এই পরমতসহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত।

গল্প করতে করতে আমরা আমাদের আশ্রয়স্থলে এসে জামাকাপড় চড়িয়ে ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে ফেললাম। এমন সময় কোঠারী এক মাঝবয়সী লোককে এনে হাজির করল। জানাল — লোকটি তার আত্মীয় কসরোদ গ্রামে থাকে। বড়বানীতে শ্রীগণপতিজী শ্রীবানী বিনায়ক মন্দিরে পূজা দিতে এসেছিল। এর সঙ্গে গেলে কসরোদ পর্যন্ত আমাদের কোন অসুবিধা হবে না।

বেলা দশটা বেজেছে, মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হল। লোকটি আমাদের আগে আগে চলল। হরানন্দজী জ্যোতির্ময়ানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন — জৈন ধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের কোন সাদৃশ্য কী লক্ষ্য করা যায়।

জ্যোতির্ময়ানন্দ — নিশ্চয়ই। বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্মের মধ্যে কয়েক বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উভয় ধর্মের অহিংসাই পরম ধর্ম। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়ের বহু সন্ন্যাসী আছে। উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। উভয় ধর্মেই বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত। বুদ্ধ ও মহাবীরের উপদেশের মধ্যেও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ফলে কেউ কেউ অনুমান করেন — বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম মূলতঃ এক এবং জৈনধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের এক শাখা। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের জীবনের ঘটনার মধ্যেও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। উভয়েই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। উভয়েই বিবাহ করেছিলেন। উভয়ের আত্মীয় ও শিষ্যদিগের নামের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে। একই শতাব্দীতে প্রায় এক সময়েই উভয়ের আবির্ভাব হয়েছিল। বুদ্ধ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে, মহাবীর ৫২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে। উভয় সম্প্রদায়ের মত মৌর্য্যবংশীয় রাজগণ তাদের সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। উভয় ধর্মের তীর্থস্থানগুলি পরস্পরের নিকটবর্তী। এই সকল বিষয় বিবেচনা করলে মনে হয় এই দুই সম্প্রদায়ের একটি অন্যটির শাখা। এই সমস্ত সাদৃশ্যের উল্লেখ করে বার্থ তাঁর গ্রন্থে বৌদ্ধধর্ম হতে জৈন ধর্মের উদ্ভব হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কোলব্রুকের মতে জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্ম হতে প্রাচীন। প্রায় প্রত্যেক বস্তুরই আত্মা আছে, এই জীববাদ (Religions of India) জৈনধর্মের বিশেষত্ব। বৌদ্ধধর্মে এই বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাস কোলব্রুকের মতে ধর্মের অভিব্যক্তির ইতিহাসে প্রথমেই উদ্ভূত হয়। জেকোবি, বুলহার এবং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বার্থের মত গ্রহণ করেন নি। গৌতম বুদ্ধ ও বর্দ্ধমান মহাবীরের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি প্রভেদও আছে, এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম যে বিভিন্ন উৎস হতে উদ্ভূত তাতে বর্ত্তমানে কেহ সন্দেহ করেন না। জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ববর্ত্তী।

কথা বলতে বলতে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছি। উত্তরতটের দিকে দৃষ্টি পড়তেই দেখলাম এই দক্ষিণতটের চেয়ে উত্তরতটের পাহাড় ও জঙ্গলের আধিক্য বেশী। নর্মদা গর্ভ হতে পাহাড়ের উপত্যকায় উঠে এসে হাঁটতে লাগলাম সোজা পূর্বদিকে। রাস্তা কঙ্করময় তবে চলার পথ আছে। ডানদিকে পাহাড় উঠে গেছে, উপর দিক ঘন জঙ্গলে ভরা। আমরা বাঁ দিকে নর্মদার ধারার দিকে লক্ষ্য রেখে দ্রুত হেঁটে চলেছি। পথ পার্বত্যময় হলেও, মাঝে মাঝে ছোট ছোট রমনীয় অরণ্য এবং নর্মদার উভয়তটে ঘনবসতি চোখে পড়ছে। অজস্র কুটীর, গরু, ভেড়া, ছাগল অজস্র চড়ে বেড়াচ্ছে। রাস্তার উপর অজস্র মেহরীন্ গাছ। মেহরীন্ গাছের তলায় তলায় ফাঁকে ফাঁকে বাঞ্জারা ও ভীলদের বাস।

হরানন্দজীর প্রশ্নের উত্তরে লোকটি জানাল — হমলোগ্ ইহাঁ মিলজুলকে বাস করতা হুঁ।

আমি আবার প্রশ্ন করলাম — পাহাড় ঔর জঙ্গল ত বহোৎ নজদিগ্ হ্যায়। আপলোগোঁকা উপর শের ভাল্লুক কা হামলা হোতা হ্যায় কি নেহি?

— হ্যায় তো জরুর। লেকিন রেবা মায়ীকা ভরোসা মেঁ হম্ বাস করতা হুঁ।

হরানন্দজী আমাদের বললেন — এই সাধারণ পাহাড়ী লোকেদের মা নর্মদার উপর কতখানি শরণাগতি দেখুন। এই শরণাগতি আমাদের থাকলে আমরা তরে যেতাম।

প্রায় আড়াই ঘন্টা হেঁটে আমরা পৌঁছে গেলাম কসরোদ গ্রামে। লোকটি জানাল — এর অপর নাম সহস্রযজ্ঞ তীর্থ। এখানে কোন শিবমন্দির নেই। কথিত আছে — দক্ষ প্রজাপতির পুত্র এই তীর্থে এসে এক

হাজার দিব্যবর্ষ ধরে তপস্যা এবং যজ্ঞ করেছিলেন। প্রাচীনকালে বেদপাঠের উদাত্ত ধ্বনি এবং যজ্ঞধূমে পূর্ণ থাকত এখানকার আকাশ বাতাস। তাই এখানে স্নান, দান, তর্পণ ও ব্রাহ্মণ ভোজনের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। জৈষ্ঠমাসে বিশেষতঃ শুক্লা তৃতীয়ায় যে পঞ্চাগ্নি সাধন করে, সে অশেষ পাপ হতে মুক্ত হয়।

আমাদের নমস্কার জানিয়ে চার মাইল দূরের পিপলোদ ঘাটের পথ নির্দেশ দিয়ে সে তার গ্রামে ফিরে যেতে চাইল। তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় দিলাম। সামনে আমাদের অন্তঃহীন পথ।

আমরা হাঁটতে শুরু করলাম নর্মদার উপলঝঙ্কৃত গতিপথ অনুসরণ করে। এখানেই নর্মদার সঙ্গে সুসার নদীর সঙ্গম হয়েছে। সুসার নদী খাড়া হয়ে জলপ্রপাতের আকারে পড়ছে না, তির্ তির্ করে বয়ে চলেছে গাছপালা প্রান্তর ডুবিয়ে। আমরা লাঠি ঠুকে ঠুকে জলের নীচে ছোট ছোট পাথরে ঠোক্কর খেতে খেতে সুসার সঙ্গম পেরিয়ে গেলাম। এখানে ধর্মশালা ও শেঠদেরও ছত্র আছে। মনোরম পরিবেশ। এখানে ইতঃস্ততঃ কিছু বনস্পতি থাকলেও ঝোপঝাড় জঙ্গল আদি নাই বললেও চলে। সব মিলিয়ে এখানে বোধহয় শতাধিক লোক বাস করেন। এইজন্য পরিক্রমাবাসীদের পক্ষে এ স্থান বড় প্রিয়। দুর্ভেদ্য জঙ্গলখণ্ড অতিক্রম করে এসে এখানে তাঁরা বিশ্রাম করতে পান। আহার্য বস্তুও তুলনামূলক ভাবে সুলভ। সবচেয়ে স্বস্তির কথা সাতপুরার কোলে এই স্থানে দূরে দূরে জঙ্গল থাকলেও এখানে বাঘ, ভালুক, চিতার উপদ্রব তত নেই। সূর্যের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বেলা বোধহয় তিনটে বাজতে যায়। হঠাৎ দেখলাম ত্রিদিবানন্দের মনে ভাবোচ্ছ্বাস দেখা দিল। তিনি সহসা গলা ছেড়ে নর্মদা মাতার ভজন শুরু করে দিলেন।

শংকর তুমহেঁ মহাবর দীন্হে, তুম্ কঙ্করকো শংকর সম্য কীন্হে।
ভক্তন্ কো নিজ সেবক চীন্হে, কিয়া জগৎ উদ্ধার॥
মাতু নর্মদে তুম্হে মনাউঁ, তুমহারী কিরূপা বিমলমতি পাউঁ।
শিব সরিতে তেরে গুণ গাউঁ, করদে বেড়া পার॥

সকাল থেকেই সকলে অভুক্ত। পার্বত্য পথে হাঁটতে হাঁটতে সকলে ক্লান্ত, এর মধ্যেই তাঁর কিভাবে যে ভাব জন্মালো তা মা নর্মদাই জানেন। ভজন করতে করতে সকলের মধ্যে যেন জোস্ অর্থাৎ নূতন শক্তি বা উদ্দীপনা জেগে উঠেছে। চলার গতিও যেন সকলের বেড়ে গেছে। চলতে চলতে তাঁরা পায়ে এবড়ো খেবড়ো পাথরের উপরেই তাল ঠুকতে ঠুকতে ভজন গাইছেন, আমার এই ভজন মুখস্তও নাই, রৌদ্রের তাপে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলে কোনও রসও পাচ্ছি না, কিন্তু রঞ্জনকে দেখছি সেও সাধুদের সঙ্গে সমান তালে মেতে উঠেছেন।

প্রায় আধঘন্টা পর ভজন শেষ হল। ভজন শেষ হতেই আমরা ধর্মশালায় এসে উপস্থিত হলাম। পাথরের দেওয়াল। ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক আমাদের অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে দোতলায় নিয়ে গিয়ে বড় ঘরটি খুলে দিলেন। ধর্মশালা খালি। আমরা ঘরটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে নিজেদের আসন পাতলাম। ঘরে কম্বল বিছিয়ে বসতে না বসতেই ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক নিজ হাতে একখানা রেকাবীতে পুরী লাড্ডু নিয়ে এসে হাতজোড় করে বললেন — কৃপা করকে পা লিজিয়ে। আভি সূর্যাস্ত নাহি হুয়া, দের হ্যায়। হাম্ পরিক্রমাকে নিয়ম জানতে হ্যায়।

আমরা ধর্মশালার বারান্দায় পুরী, লাড্ডু নিয়ে ভোজনে বসে গেলাম। ভোজন শেষ করে নর্মদায় গেলাম হাত মুখ ধুতে। সকলে ধর্মশালায় ফিরে গেলেও আমি পিপলোদ ঘাটে বেড়াতে লাগলাম। নর্মদার কাকচক্ষু নির্মল জলে অত্যধিক বাতাসের ফলে ঢেউ উঠেছে। প্রচণ্ড শীতও পড়েছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে কাঁপছি। কিন্তু নর্মদার শোভা ও অস্তাচলগামী সূর্যের শেষরশ্মি নর্মদাতে পড়ে যে অপরূপ শোভা সৃষ্টি করেছে সেই দৃশ্য ছেড়ে ধর্মশালায় আসতে মন চাইছিল না। এদিকে শীতকালের বেলা ছোট বলে তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে গেল। আবার হরানন্দজীও ধর্মশালার বারান্দা থেকে ফিরে আসার জন্য ডাকাডাকি শুরু করলেন।

ফিরে এলাম ধর্মশালার ঘরে। কম্বল পেতে জপে বসলাম। শুয়ে শুয়ে ব্রহ্মর্ষি তণ্ডিকৃত সেই বিরাট শিবস্তব আবৃত্তি করতে লাগলাম। কখন যে শিবনাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। বহুক্ষণ পর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। শুয়ে শুয়ে আকাশের দিকে তাকাতেই দৃষ্টি যেন ঝলসে গেল তৎক্ষণাৎ। চন্দ্রোদ্ভাসিত সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতির উপর যেন রূপালী ধারা ঝরে পড়ছে, আমি উঠে পড়লাম। বিছানা থেকে কাছেই বারান্দা থেকে

উঠোনে নামবার সিঁড়ির ধাপ। আমি ধাপের উপর বসে চাঁদের দিকে তাকালাম। বাবার কথা মনে পড়ল। তিনি বলতেন — চঞ্চল মনকে বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করার অন্যতম উপায় হল আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে চাঁদের উপর দৃষ্টি স্থির করলাম। ধীরে ধীরে সমগ্র আকাশ জুড়ে এমন এক বিহ্বল করা বিস্ময়ভরা রূপ ফুটে উঠল, মনে হল যেন সমগ্র বিরাট মূর্তিটি জ্যোতির্লিঙ্গের মত দীপ্যমান। আকাশের চাঁদ যেন তাঁরই আয়ত ললাটে শোভা পাচ্ছে।

আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম, আমার যখন চেতনা এল, তখন দেখি আমি বারান্দার নিচে পড়ে আছি। ধড়মড়িয়ে উঠবার চেষ্টা করতেই দেখি মাথার পেছনটা এমন ব্যথা যে ঘাড় তুলতে পারলাম না। আবার জ্ঞান হারালাম। কতক্ষণ যে এইভাবে পড়েছিলাম জানি না। মহানন্দস্বামীর কণ্ঠস্বর কানে এল। তিনি বলতে লাগলেন — 'হায়, হায় এরকম অবস্থা আপনার কিরকম করে হল'? আমি সংক্ষেপে বললাম — আমি প্রস্রাব করতে যাব বলে উঠোনে নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ে গেছি।

মহানন্দস্বামীর চিৎকার চেঁচামেচির মধ্যে ধর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক গ্রামের এক বৈদ্যজীকে ডেকে এনেছেন। এঁর নাম হরিকিষণজী। সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক আমার নাড়ী দেখে জানালেন — ভয়ের কিছু নেই। এক্ষুনি আমি ঔষধ দিয়ে দিচ্ছি বলে এক টুকরো গাছের শিকড় এনে আমাকে চিবিয়ে খেয়ে নিতে বললেন।

হরানন্দজী জিজ্ঞাসা করলেন — আমরা কি আজ যাত্রা করতে পারব।

হরিকিষণজী — বেশখ, আপলোগ যা সকতে হো। থোড়ী দেরমে উনকা আরাম হো জাবেগা।

হরানন্দজী — চুপ করে ঘুমাবার চেষ্টা করুন ভাই। সকাল হতে, সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরী।

বেলা বোধহয় সাতটা বা সাড়ে সাতটার সময় আমার ঘুম ভাঙল। উঠে দেখি সকলেই যাত্রার জন্য তৈরী। মাথার পিছনে যেখানে চোট লেগে ফুলে উঠেছিল, তা মিলিয়ে গেছে। কোথাও কোন ব্যথা অনুভব হল না। আমি আমার বিছানা গুটিয়ে ফেললাম। 'হর নর্মদে' ধ্বনি তুলে আমাদের যাত্রা শুরু হল।

নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হেঁটে চললাম দক্ষিণতট ধরে। বিন্ধ্যপর্বতের ঢাল নেমে এসেছে নর্মদার তীর পর্যন্ত। তার ফলে কোথাও কোথাও রাস্তা সংকীর্ণ এবং খারাপ হলেও মোটামুটি উপত্যকা অঞ্চলের রাস্তা ভাল। মনোরম পার্বত্যপথ। শূলপাণির সেই দুর্গম অরণ্যের বিভীষিকা আর কোথাও নাই, আমাদের বাংলাদেশের গ্রামের শোভার মত নর্মদার এই উপত্যকা অঞ্চলও নানা ফল ফুল ছোট-বড় নানারকমের গাছ ও শস্যক্ষেতের শোভায় অপরূপা। বাংলাদেশে জল কাদা নালা ও পুষ্করিণী আছে, মাটি কাদার পথ, কিন্তু এখানে পরিষ্কার পার্বত্যপথ।

নর্মদার দুই পাড়েই কত যে মন্দির। বেলা বারোটা নাগাদ আমরা পৌঁছে গেলাম অগ্নিতীর্থে। গ্রামের নাম ছোটা বরদা। নর্মদা এখানে বেশ চওড়া। ঘাটের উপরেই একটি পাথরের শিবমন্দির। আমরা স্নান করে সকলেই মন্দিরে ঢুকলাম শিবপূজা করতে। একটি কালো রঙের শিবলিঙ্গ।

শিবলিঙ্গের মাথায় প্রচুর ফুল এবং বেলপাতা। তার মানে কেউ এসে পূজা করে গেছেন। জ্যোতির্ময়ানন্দ বললেন — এতদঞ্চলে বহু লোকের বসতি। ঐ দেখুন, দূরে দূরে পল্লী দেখা যাচ্ছে। গৃহীরা অনেকেই এই মন্দিরে এসে শিবপূজা করে যান।

পুরোহিতজী সরে এসে আমাদের পূজার সুযোগ করে দিলেন। তাম্রপাত্রে প্রচুর ফুল, বেলপাতা ও চন্দন রাখা আছে। আমরা তা দিয়ে পূজা করলাম। কমণ্ডলুর জল ঢেলে হাত দিয়ে ঘসে লিঙ্গটিকে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম।

পূজা সেরে উঠে আমি পুরোহিতজীকে জিজ্ঞাসা করলাম — এহি মহাদেবকা ক্যা নাম হ্যায়?

— নর্মদেশ্বর হ্যায়। ঔর ক্যা। শিউজীকা নাম শিউজী হ্যায়। অগ্নিদেবনে ইধার তপ করকে সিদ্ধি প্রাপ্ত হুয়ে থে।

আমি আমার নিত্যসঙ্গী 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' নামক বইটি ঝোলা থেকে বের করে এই শিবলিঙ্গের লক্ষণ মিলিয়ে স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলাম। লিঙ্গের মধ্যে কালো কালো কুণ্ডলী পাকানো রেখা চোখে পড়ল। অবশেষে পাতার পর পাতা উলটিয়ে চোখে পড়ল শিবলিঙ্গ বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ 'হেমাদ্রিধৃত-লক্ষণকাণ্ডে' এ বিষয়ে স্পষ্ট বলা হয়েছে—

জলৎপিঙ্গং জটাজূটং কৃষ্ণাভং স্থূলবিগ্রহম্।
কালাগ্নিরুদ্রমাখ্যাতং সর্বসত্ত্বৈনিষেধিতম্॥

এই বাণলিঙ্গের নাম কালাগ্নিরুদ্র। আমি বললাম — আপনারা দেখুন এই শিবলিঙ্গের দিকে তাকালে মনে হয় লিঙ্গের মধ্যে আগুন জ্বলছে। স্পষ্টতই অগ্নিশিখা দেখা যায়। এই শিবলিঙ্গ ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণের হয় এবং কিঞ্চিৎ স্থূলও হয়। সকল জীবই এই শিবলিঙ্গ পূজা করতে পারেন।

উঠে দাঁড়াতেই হঠাৎ দৃষ্টি যেতেই দেখলাম মন্দিরের ছাদ নেই। কোনকালে হয়ত ছিল, এখন নেই। পুরোহিতজী জানাল — এই মন্দিরের গঠনশৈলীই এরকম। কোনকালেই এই মন্দিরের শিবজীর উপর কোন আচ্ছাদন নেই। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সর্ব অবস্থায় মহাদেব এই মুক্ত অকাশতলে বিরাজমান। সত্যিই এই উন্মুক্ত অকাশতলে সূর্যের খরতাপে পাথরের লিঙ্গ গরম হয়ে উঠার কথা। কিন্তু লিঙ্গটি বড়ই স্নিগ্ধ এবং এর স্নিগ্ধতা এত বেশী যে আমার মনে হল ভক্তিহীন পাষাণ প্রাণে শিবজী যেন চন্দনের প্রলেপ লাগিয়ে দিলেন।

পুরোহিতজী আমাদের ভোজনের জন্য চাপাটি, ডাল, ফল ও দুধ নিয়ে এলেন। ভোজনরত অবস্থায় পুরোহিতজী এই তীর্থ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বললেন — এই মহাদেব সত্যযুগে রাজা দুর্যোধনের যজ্ঞবেদীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর আবির্ভাব প্রসঙ্গ আপনারা খেতে খেতে শুনুন। সত্যযুগে এই স্থানে দুর্যোধন নামে এক পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর রূপযৌবনে মুগ্ধ হয়ে নর্মদা তাঁর পাণিপ্রার্থী হলে দুর্যোধন নর্মদাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। কালক্রমে তাঁদের এক সর্বসুলক্ষণা কন্যা জন্মালে তাঁরা তার নাম রাখেন সুদর্শনা। ধীরে ধীরে সুদর্শনা বড় হলে তাঁর সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের খ্যাতি অন্যান্য রাজ্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

একদিন মহাতপা হুতাশন (অগ্নি) দরিদ্র, সঙ্গতিহীন দ্বিজের রূপ ধারণ করে দুর্যোধনের কাছে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করতে চান। কিন্তু দুর্যোধন দরিদ্র ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে না চাইলে হুতাশন অত্যন্ত পীড়িত হয়ে সেই স্থান ত্যাগ করেন। এরপর দুর্যোধন এক বিরাট যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেন। কিন্তু যথাকালে যজ্ঞ আরম্ভ হলে, উপস্থিত রাজা, মন্ত্রী ও পুরোহিতদের অবাক করে অগ্নি যজ্ঞবেদী হতে অদৃশ্য হন। পুরোহিতদের বারবার চেষ্টাতেও যজ্ঞীয় বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হল না।

এই দৃশ্য দর্শন করে রাজা ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতিত হন এবং পণ্ডিতদের এর কারণ নিরূপণের নির্দেশ দেন। তিনি এই বলে বিলাপ করতে লাগলেন — হয় আমার বা আপনাদের কোন দোষে অগ্নিদেব অন্তর্হিত হয়েছেন, কেননা যজ্ঞক্রিয়া বড়ই বিঘ্ন সঙ্কুল। যজ্ঞক্রিয়া অগ্নিহীন হলে রাষ্ট্র, মন্ত্রহীন হলে ঋত্বিকগণ এবং দক্ষিণাহীন হলে দাতাকে দগ্ধ করে।

অনন্তর রাজার বাক্যে বিপ্রগণ স্থিরসঙ্কল্প হয়ে যে স্থানে হুতাশন অদর্শন হয়েছিলেন, সেই যজ্ঞশালায় অনশনে উপবেশন করলে মহাতেজা জাতবেদা স্বপ্নযোগে বিপ্রগণকে জানালেন — আমি পৃথিবীপতি দুর্যোধনের নিকট তাঁর দুহিতাকে প্রার্থনা করেছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে কন্যাদান করেন নি। রাজা যদি আমাকে তদীয় কন্যা প্রদান করেন তবে আমি জাজ্বল্যমান হয়ে তাঁর গৃহে বসবাস করব অন্যথায় তাঁর গৃহে গমন করব না। রাজা সব শুনে অগ্নিকে কন্যাদানে সম্মত হন। হুতাশন সুদর্শনাকে প্রাপ্ত হয়ে এখানে এই যজ্ঞবেদীতে লিঙ্গরূপে আবির্ভূত হন। সেই থেকে এই তীর্থ অগ্নিতীর্থ নামে খ্যাত। এই অগ্নিতীর্থ সর্বপাপহর। এখানে অমাবস্যা বা পূর্ণিমায় যারা স্নান, দান, পিতৃগণের তর্পণ করে তাদের অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়। ভোজনপর্ব সমাধা করে পুরোহিতজীকে 'নম নারায়ণায়' বলে আমাদের যাত্রা শুরু হল। লক্ষ্য — কপালমোচন তীর্থ।

আমাদের ত আর থমকে দাঁড়ালে চলবে না। আমরা সাবধানে পা ফেলে ইষ্ট স্মরণ করতে করতে এগিয়ে চললাম। দুদিকে পাথর আর কাঁকর, পথের উপরেও ছোট বড় পাথর, তাও আবার লতা-গুল্মে ঢাকা। খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবু উপায় নেই। এইভাবে প্রায় আধ মাইল হাঁটার পর এমন একটা স্থানে এলাম যেখানে প্রায় দেড়ফুট চওড়া পরিষ্কার পথের দাগ। সেগুন ত আছেই, তার সঙ্গে শিমূল, বেল, জামীর, কাঁঠাল, চম্পক এবং অগস্তি গাছও দেখা যাচ্ছে। পথ মোটামুটি অনুকূল হওয়ায় চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। নর্মদা তাঁর আপন বেগে বয়ে চলেছেন। নর্মদা এতদূর যেভাবে এঁকে বেঁকে আসছিলেন; এখানে দেখছি তাঁর জলরাশি যেন ক্রমেই উঁচু হতে নিচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে।

বেলা ৪টা বাজতে যায়। ঘন ছায়া পড়ে আসছে বনে বনে। চারধারে পাহাড়ের ছায়া নেমে এসেছে —

কোন অজানা বনপুষ্পের সুবাসে ভাসছে অপরাহ্নের শীতল বাতাস। নর্মদা স্পর্শ করে উঠে দেখি শিখা উপবীতধারী সদ্যস্নাত এক ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম — কপালেশ্বর শিবজীকা মন্দির ক্যাতনা দূর বা?

— নজদিগ, নজদিগ, আপলোগ আ গয়া। নর্মদা মাইয়াকো পরকরমা কর রহে হো?

প্রেমানন্দ অন্যমনস্ক ভাবেই উত্তর দিলেন — জী হাঁ।

তিনি নর্মদার ঘাট থেকে উঠে এসে সামনে দাঁড়িয়ে বললেন — হামারা গাঁও কা নাম হ্যায় মোহিপুর। হামারা মহল্লা ছোটা হ্যায়। ব্রাহ্মণ, গোঁড় ঔর খাটোলা মিলজুল কর রহতা হ্যায়। ইহাঁসে তিন মিনিট কা দূরীমেঁ কপালমোচন তীর্থ দত্তবারা ঘাটমেঁ। উধার পরিক্রমাবাসীয়োঁকে লিয়ে আচ্ছা ইন্তেজাম ভী হ্যায়। মিনিট তিনেক হেঁটেই আমরা কপালমোচন তীর্থে পৌঁছে গেলাম। প্রশস্ত ঘাটের উপর শিব মন্দির। প্রায় সকাল থেকেই হাঁটছি আমরা। হাত পা ব্যথায় যেন ভেঙে পড়ছে। নর্মদায় নামলাম হাতমুখ ধোয়ার জন্য। শ্রান্তিহরা ক্লান্তিহরা নর্মদার স্নিগ্ধ জলধারায় সব ক্লান্তি জুড়িয়ে গেল।

তখন সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। মন্দিরে পুরোহিতজী আরতির আয়োজন করছেন। শিবমন্দিরে তখন লোক সমাগম শুরু হয়েছে। আমরা গাঁঠরী ফেলে রেখে, মন্দিরস্থ দেবতার উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরতি দেখতে লাগলাম।

পুরোহিতজী অত্যন্ত প্রাণ ঢেলে মহাদেবের পূজা শেষ করলেন। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে পুরোহিতজী আমাদের সামনে হাতজোড় করে বললেন — ম্যাঁয় নাটমন্দিরকা দরজা খুল দেতে হেঁ। আপলোগ ইহাঁ কপালমোচন শিবজীকে পাশ রহকর আনন্দ লেতে রহে।

ঘরটি ইষ্টকনির্মিত হলেও টিনের ছাউনী। পুরোহিতজী নিজেই আমাদেরকে হ্যারিকেনের আলো দেখালেন। আমরা সেই ঘরে ঝোলা, গাঁঠরী রেখে যে যার আসন বিছিয়ে বসতেই পুরোহিতজী আমাদের বলতে লাগলেন — আপনারা কপালমোচন তীর্থে এসে পৌঁছেছেন।

দৈত্যগুরু মহাত্মা শুক্রাচার্য্য এই তীর্থে সমগ্র নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করেছিলেন বলে এই তীর্থের প্রাচীন নাম ছিল 'ঔশনস তীর্থ'। পরবর্তীকালে দশরথনন্দন রামচন্দ্র এক রাক্ষসের মস্তক ছেদন করলে মস্তকটি দণ্ডকারণ্য বনে পতিত হয়। তৎকালে মহোদর মুনি ঐ বনে তপস্যারত ছিলেন। মস্তকটি মুনির জঙ্ঘাদেশে গিয়ে আটকে যায় এবং মুনির জঙ্ঘার অস্থি ভেদ করে কাঁপতে থাকে। মহোদর মুনির তীর্থ পরিক্রমার ক্ষমতা নষ্ট হয়। পরে অনবরত পুঁজ বের হতে থাকায় মুনি ঐ কপালমোচনের উদ্দেশ্যে তীর্থ ভ্রমণ করতে শুরু করেন এবং এই ঔশনস তীর্থে এসে উপস্থিত হন। এই নর্মদাতটে সেই স্খলিত কপালের মধ্য হতে আর্বিভূত হয় এক শিবলিঙ্গ। তিনি এইস্থানে নর্মদার জলে স্নান করে উঠতেই দেখেন যে রাক্ষসের মস্তক তাঁর জঙ্ঘাদেশ হতে মুক্ত হয়ে জল মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছে। মুনি এর পূজা শুরু করেন। মহোদর মুনি তখন ঔশনস তীর্থের নামকরণ করলেন — 'কপালমোচন'। কাল সকালে যখন শিবের মঙ্গল আরতি করব তখন আপনারা অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন। এইরকম কপাল আকৃতির শিবলিঙ্গ সারা ভারতবর্ষ তো বটেই এমনকী নর্মদাতটেও কোথাও দেখতে পাবেন না। হর নর্মদে, হর নর্মদে।

পুরোহিতজী চলে গেলে আমরা ইষ্টগোষ্ঠীতে মত্ত হলাম। কিন্তু হাত পা কোমরের অসম্ভব যন্ত্রণায় ইষ্ট জপে মন বসল না।

এই সময় হরানন্দজী আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — এতদিন আমরা একসঙ্গে কাটালাম। আপনার মুখ থেকে আপনার পিতাঠাকুরের যেসব কথা শুনেছি তাতে আমার মনে হয় আপনার পিতাজী একজন তপোনিষ্ঠ সমাধিনিষ্ঠ মহাযোগী ছিলেন সন্দেহ নাই, তবে ভাই তাঁর কোন্ উপদেশবাণী আপনার জীবনকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছে, দয়া করে শোনাবেন কী?

আমি বললাম — আমার পরমপূজনীয় ঋষিকল্প পিতাঠাকুর তাঁর জীবনচর্চায় যা প্রত্যক্ষ করেছেন, নিজে শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও গার্হস্থ্য জীবনে যা সাধ্যমত অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছেন তা আমাকেও অনুসরণ করবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। বেদ-বেদান্ত অধ্যয়নকালে তিনি প্রায়ই বলতেন অদ্বৈতবেদান্তের নিগূঢ় রহস্য বুঝতে হলে বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর প্রণীত পঞ্চদশী অপরিহার্য। এই বই-এর প্রারম্ভেই বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর সনাতন

ব্রহ্ম সংবিদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন — ঐ সংবিদের উদয় নাই, অস্তও নাই, এটি স্বপ্রকাশ এবং স্বতঃপ্রমাণ — নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সংবিদেযা স্বয়ংপ্রভা (পঞ্চদশী ১।৭)।

পঞ্চদশী ধৃত ঐ সংবিদ যেমন নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে নিত্য এবং শাশ্বত, তেমনি মদীয় পিতৃদেব প্রদত্ত পঞ্চদশ উপদেশও শুধু আমার জীবনে কেন, যে কোন মানুষের জীবনে শাশ্বত আলোকবর্তিকার মত; জীবনে যত পরিবর্তনই আসুক, তাঁর উপদেশের অন্তর্নিহিত সংবিদই যে কোন মানুষের জীবনের ধ্রুব পথটিকে উদ্ভাসিত করে তুলবে বলে আশা করি। আমি তাঁর উপদেশগুলি এক এক করে বলছি শুনুন —

১। সব সময় লেখাপড়া করবে। বই এর পর বই, লাইব্রেরীর পর লাইব্রেরী উজাড় করে পড়বে। হাতের কাছে পঞ্জিকা জুটলে তাই পড়বে। তাতেও অনেক শিক্ষণীয় বিষয় থাকে। প্রত্যেকের কিছু না কিছু নেশা থাকে। বইপড়া-ই তোমার নেশা হউক।

২। যা কিছু পড়বে, শুনবে এবং দেখবে তা বিচার পূর্বক গ্রহণ করো।

৩। প্রীতির ঘাটে অপরাধ করো না। যে তোমাকে ভালবাসে, তার ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষা করতে শিক্ষা কর।

৪। যে তোমাকে দেয় জল প্রতিদানে অন্ন দিও তারে,
মিষ্ট কথা বলে যদি কেহ, নমস্কার করো বারে বারে।
কড়ি যদি পাও কভু মোহরেতে দিও প্রতিদান,
প্রাণ যে বাঁচাল তব তার তরে দিও তব প্রাণ।
একগুণ পাও যদি তুমি দশগুণ দিও তারে ফিরে,
অপকার পাও যদি কভু, উপকারে রেখো তারে ঘিরে॥

৫। সংস্কৃত শাস্ত্রের সেবায় জীবনপাত করবে। সংস্কৃত একাধারে জ্ঞান এবং আনন্দের খনি। ধন্যা সংস্কৃতবাক্ সুধাপরতরা গীর্ব্বাণসংসেবিতা।

'ধন্য সংস্কৃতভাযা! কি রস তোমার,
সুধাও তাহার কাছে অতি তুচ্ছ ছার।'

৬। বৈদিক ঋষিদের কেহ অমর্যাদা করলে তা পিতৃ-অপমানের সমতুল্য মনে করবে এবং তার প্রতিবিধানে তৎক্ষণাৎ তৎপর হবে। স্বদেশী বিদেশী যিনি যত বড় পণ্ডিতই হউক না কেন, তাঁরা কেহ যদি ঋষি বাক্যের বিকৃত অর্থ করেন, তা হলে নির্ভয়ে তা খণ্ডন করা কর্তব্য। তোপের মুখে উড়িয়ে দিলেও সত্য প্রকাশে কখনও কুণ্ঠিত হবে না।

৭। আগতে স্বাগতং কুর্যাৎ গচ্ছন্তং ন নিবারয়েৎ।
যথাপ্রাপ্তং সহেৎ সর্বং স তপস্যোত্তমত্তমা॥

প্রিয় বা অপ্রিয় কিছু উপস্থিত হলে তাকে আদরে গ্রহণ করতে হয়। তা চলে যাবার উপক্রম করলে নিবারণ করতে নাই।

সুখ দুঃখ অভাব অনটনকে শান্ত চিত্তে গ্রহণ করতে অভ্যাস কর। দারিদ্র্যের কষাঘাতে জীবনের ভিত্ পাকাপোক্ত হয়। মহাত্মা যীশুখ্রীষ্টের জন্ম আস্তাবলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কংসের বন্দীশালায়। মা জানকী, কুন্তী দেবী এবং পঞ্চ পাণ্ডবকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ এবং অনেক কান্না কাঁদতে হয়েছে। এই সবের তাৎপর্য কখনও ভেবে দেখেছ কি? কেবল তোতা পাখীর মত শাস্ত্র মুখস্থ করলেই চলবে না। প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্র অঙ্কনের মূলে ঋষিদের উদ্দেশ্য কি, তা হৃদয়ঙ্গম করতে চেষ্টা কর। এটাই সর্বোত্তম তপস্যা কেননা জীবন্মুক্তি লক্ষণ-স্থিতি রূপী তপস্যা।

৮। ঈশ্বর আছেন — এটাই ধ্রুব সত্য।

৯। ভয়, ভাবনা, ভূত, ভোগ ও ভগ — এই পাঁচটি 'ভ'-কারান্ত শব্দের উপদ্রব থাকলে ভগবানকে লাভ করা যায় না। যেমন, অন্ধকার থাকলে আলোর অভাব এবং আলো থাকলে অন্ধকারের অভাব সূচিত করে, তেমনি উক্ত পাঁচটি 'ভ'-কারান্ত শব্দের সঙ্গে ষষ্ঠ 'ভ'-কারান্ত শব্দ ভগবৎ-তত্ত্বের নিত্য বিরোধ বর্তমান।

১০। মন চঞ্চল কারণ সে অখণ্ড আনন্দের প্রত্যাশী। সে অখণ্ড আনন্দের স্বাদ জানে, অথচ পাচ্ছে না। ফলে, বিষয় হতে বিষয়ান্তরে ছোটাছুটি করে। চঞ্চলতা মনের স্বভাব নয়, স্থৈর্যই তার স্বভাব। চাঞ্চল্যটা তার

সাময়িক ব্যারাম মাত্র।

১১। একটা দিয়াশলাই কাঠি যদি সারা বৎসর ধরে অহরহ উল্টো দিকে ঘর্ষণ করা হয়, তাতে যেমন আলো জ্বলে না, তেমনি ঠিক ঠিক ভাবে প্রক্রিয়ামত ধ্যান না করলে কিছুতেই ফল পাবে না। প্রক্রিয়ামত এবং অনুরাগ সহকারে ধ্যান করে যাও, আনন্দের সন্ধান অবশ্যই মিলবে।

১২। ভগবানের নিকট কখনও কোন মানৎ — মানসিক করবে না। আমরা ব্রাহ্মণ — বেনিয়া নই। এবং ভগবানও কারো বাজার-সরকার নন যে, প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগের পর হতে রাত্রিতে পুনরায় শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত কেবলই 'এটা দাও ওটা আন' বলে ফর্দের পর ফর্দ পেশ করব আর তিনি তটস্থ হয়ে তদ্দণ্ডে তা করে দেবেন।

১৩। অসন্তুষ্টাঃ দ্বিজাঃ নষ্টাঃ। অতএব সর্বাবস্থায় চিত্তের সন্তোষ বজায় রেখে চলবে — সন্তোষং পরমং ধনম্।

১৪। জীবনের আদর্শ কি তা জানতে হলে নিজের গোত্রকে ভাল করে জানতে হবে। প্রত্যেকের গোত্রের মধ্যেই তার নির্দেশ আছে। আমাদের বাৎস্য গোত্র। বাৎস্য গোত্রের প্রবর অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে বরণীয় ঋষি যথাক্রমে ঔর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য এবং আপ্লুবান্। ঋষি ঔর্ব্ব ছিলেন সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, সগরের গুরু। তিনিই পৃথিবীতে অগ্নিতত্ত্বের প্রথম উদ্ভাবক; তিনিই বলেছিলেন, 'জীবন তো কেবল জৈব কর্ম নহে — ইহা বিশ্বদেবের পূজা। সমগ্র মানব জীবনকে বৈশ্বানরের অগ্নিচয়ন-যজ্ঞ বলে মনে করবে।' তাঁর জীবন এই শিক্ষা দিতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞান চেতনাও প্রয়োজন। চ্যবন মুনি অতিরিক্ত ভোগের ফলে অকালে জরাগ্রস্ত হন, পরে সংযম ও সাধনা দ্বারা জরা ব্যাধি জয় করেন। মাত্রাতিরিক্ত ভোগের কুফল এবং তা জয়ের কৌশল ঐ মুনির জীবন হতে শিক্ষনীয়। ভার্গব অর্থাৎ শুক্রাচার্য ছিলেন মৃত-সঞ্জবনী বিদ্যার কুশলী আচার্য— মৃত্যুর উপর জীবনের জয়গানের উদ্গাতা। জামদগ্ন্য (পরশুরাম) ছিলেন তেজ, বীর্য, তপস্যার জ্বলন্ত বিগ্রহ আর আপ্লুবান্ ছিলেন দেশপ্রেমিক ঋষি, তিনি মাতৃভূমিকে জড় মাটি, কাঠ পাথরের ভূখণ্ড বলে ভাবতেন না — তাঁহার ভাবদৃষ্টিতে মাতৃভূমি ছিল মৃন্ময়ী মা।

আমাদের গোত্র-পুরুষ ঐ সমস্ত ঋষির জীবনাদর্শ মনন করলেই পথের সন্ধান পাবে।

১৫। যাহা কিছু দুর্গম, দুস্তর, দুর্লভ এবং দুঃসাধ্য — তৎ সর্বং তপসা সাধ্যং তপো হি দুরতিক্রমম্। তপস্যা দ্বারাই সব কিছু লাভ করা যায়। পরশুরাম রামচন্দ্রকে বলেছিলেন, তুমি শরনিক্ষেপ করে আমার স্বর্গপথ রুদ্ধ করতে পার, তুমি কেবল আমার তপস্যার পথ নষ্ট কোর না। কারণ, তপস্যার পথ খোলা থাকলে আমি তপস্যা দ্বারা সব কিছুই পুনরায় জয় করে নেব। সারকথা — তপস্যা। তপস্যাই ব্রাহ্মণের একমাত্র ধন। মনে রাখবে — ব্রহ্মবিদ্যা অনায়াস লভ্য নহে, তার জন্য চাই অবিশ্রান্ত যত্ন, চাই অবিরাম তপস্যা॥

আমি নীরব হতেই যতীশ্বরানন্দ বললেন — তোমার বাবার মত মহাপুরুষের সঙ্গে আমার যৌবনকালে দেখা হলে কত ভালই না হত। মা নর্মদা সেই বিদেহী আত্মার আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান করুন। লেকিন রাত অনেক হয়ে গেছে। প্রায় বারটা বাজতে যায়, আভি লেট যাইয়ে। জয় মা রেবা! হর নর্মদে!

কিছুক্ষণ পরে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি সকাল হয়ে গেছে, কাক কোকিলের প্রভাতী ডাক শুনতে পাচ্ছি। মন্দিরের দরজা খুলে প্রভাত-সূর্যের উদয়রশ্মিকে প্রাণভরে প্রণাম ও অভ্যর্থনা জানালাম। পুরোহিতজী এলেন পূজা করতে। এসেই বললেন আজ আপনাদের আমার কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া এতটা পথ অতিক্রম করে এসে আপনারা ক্লান্ত। এখানে একদিন বিশ্রাম করুন। হুড়োহুড়ি করে পরিক্রমা করলে পরিক্রমার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। এইজন্য মার্কণ্ডেয় মুনির স্পষ্ট নির্দেশ — এক এক যোজন গিয়ে কয়েকদিনের জন্য বিশ্রাম করতে হবে। সম্ভব হলে নর্মদার প্রতি ঘাটে প্রতি তীর্থে একরাত্রি করে বাস করা উচিত। তাহলে তৎ তৎ তীর্থের শুদ্ধ বাতাবরণ সাধককে সাধনপথে সাহায্য করে। পূর্বে পূর্বে যে সব দেবতা বা ঋষি সেই সেই ঘাটে তপস্যা করে গেছেন তাঁদের চিৎশক্তির কম্পন এবং পবিত্র ভাব-ভঙ্গী পরিক্রমাবাসীকে ধ্যানের পথে টেনে নিয়ে যাবার সুযোগ পায়। কম্পন হতেই এই জগতের সৃষ্টি, কম্পনের স্পন্দন-পথেই সাধকের জীবদেহ নেমে এসেছে এই মর্ত্যভূমিতে, সেই স্পন্দনের ধারা ধরেই তাকে উঠে যেতে হবে সেই দিব্যভূমিতে।

আরও একটা কথা মনে রাখবেন, এই ঠাকুরের বহু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। পরিক্রমাবাসীদের সেবার

জন্যও আমরা জমির উপসত্ত্ব ভোগ করি। ভাববেন না যে আপনারা কোন গৃহীর সেবা গ্রহণ করছেন। এই ভোগ কপালেশ্বরজীর সম্পত্তি থেকেই আসবে জানবেন।

আমাদের আপত্তি তাঁর আন্তরিকতার তাপে ভেসে গেল। আমরা সবাই প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদায় স্নান করে কপালেশ্বরজীর অর্চনা করলাম। বহু প্রাচীন পাথরের মন্দির। মন্দিরের গায়েই পরপর তিনটি বিল্ববৃক্ষ। প্রণাম করে বিরাট কপাল আকৃতির শিবলিঙ্গের দিকে তাকাতেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এইরকম বিচিত্র শিবলিঙ্গ নর্মদাতটে কোথাও দেখিনি। প্রায় তিনফুট উঁচু শিবলিঙ্গ। পূজা করে তিনি সাথীদেরকে নিয়ে চলে গেলেন।

বেলা বোধহয় একটা নাগাদ পুরোহিত মশাই একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের জন্য চাপাটি, ডাল, ফল, দুধ নিয়ে এলেন। খুবই যত্নের সঙ্গে পুরোহিতজী আমাদের ভিক্ষা দান করলেন। ভিক্ষা গ্রহণের পর আমরা নাটমন্দিরের বিশাল মণ্ডপে বিশ্রাম করতে লাগলাম। রঞ্জনের ঘড়িতে তখন বেলা দু'টা বেজেছে।

ঘন্টাখানেক পরেই দেখলাম পুরোহিতজী মন্দিরের দিকে যাচ্ছেন। তাই দেখে আমাদেরও আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগল না। আমরা সবাই উঠে মন্দিরে গিয়ে বসলাম। আমাদেরকে দেখে তিনি বলতে লাগলেন — রেবাতটে সকল বৈদিক ঋষি এবং দেবতাদেরকেও তপস্যা করতে হয়েছে। এই ঘোর কলিকালে মা নর্মদার কৃপা কটাক্ষ ছাড়া অলৌকিক সিদ্ধি বা ব্রহ্মজ্ঞান সুদূরপরাহত। একথা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। শুধু সিদ্ধিলাভ নয়, পরমবস্তু প্রাপ্তির পরেও সাধনার সমগ্র রসস্ফূর্তির জন্য নর্মদাতটে আসতেই হয়। আরও জানবেন — এই পরমবস্তু প্রাপ্তি ও সাধনার রসস্ফূর্তির জন্য বেদ-জ্ঞান আবশ্যক। কারণ বেদই সকল ধর্মের মূল — সমূহ জ্ঞানের উৎস। সেইজন্য বিভিন্ন মার্গের লোকেরা নিজ নিজ জ্ঞানদৃষ্টি অনুসারে বেদের মধ্যে বিভিন্ন তত্ত্বের সন্ধান পান। দৃষ্টিভঙ্গীর তারতম্যানুসারেই বেদমন্ত্রের মধ্যে বৈচিত্র্য এবং ভাবের তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ঐ একই কারণে বিভিন্ন ভাষ্যকারের ব্যাখ্যায় ভাব-বৈষম্য এবং অর্থ-বৈষম্য সচরাচর দৃষ্ট হয়।

প্রকৃত কথা এই যে, বেদে এক এবং অখণ্ড জ্ঞানই নিহিত আছে। সত্য যেমন কদাপি মিথ্যা হয় না, বেদমন্ত্রও তেমনি কখনও ভিন্ন ভিন্ন বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে না। আধার ভেদে সূর্যরশ্মিতে যেমন বৈচিত্র্য দেখা যায়, বেদার্থও তেমনি ক্ষেত্রভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকট হয়। মানুষের জীবনে চরম লক্ষ্য নিঃশ্রেয়স লাভ — বেদই তার একমাত্র সহায়। বেদের শিক্ষাই হল অখণ্ড আনন্দে নিত্যস্থিতি।

নদী যেমন বিভিন্ন মার্গ অতিক্রম করে অবশেষে সমুদ্রে গিয়েই মিলিত হয়, জীবও তেমনি আপন আপন কর্মানুসারে, বিভিন্ন গতি প্রাপ্ত হলেও সকলেই সেই একই পূর্ণের দিকেই এগিয়ে চলেছে। বেদ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মত পোষণকারীদেরও এই জন্মে বা জন্মান্তরে সদ্‌বুদ্ধির উদয় হবে, তাঁরাও পূর্ণত্ব লাভ করবেন। এইখানেই বেদচর্চার মহত্ব ও উপাদেয়তা। বেদপাঠীদের স্মরণে রাখা কর্তব্য যে, বেদ হল সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাণী।

শ্রমেণ তপসা সৃষ্টা ব্রহ্মণা বিত্তর্তে শ্রিতা॥ ১
সত্যেনাবৃতা শ্রিয়া প্রাবৃতা যশসা পরিবৃতা॥ ২
স্বধয়া পরিহিতা শ্রদ্ধয়া পর্য্যূঢ়া দীক্ষয়া গুপ্তা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতা লোকো নিধনম্॥ ৩

(অর্থব, দ্বাদশকাণ্ড, ৫ম অনুবাক)

— শ্রম ও তপস্যায় এই ব্রহ্মবাণী সৃষ্ট হয়। ভক্তি ও জ্ঞানে তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সুগভীর সত্য ঋতে আশ্রিত। সত্যই তার আবরণ, সত্য তার বিজয়শ্রী, কল্যাণে তা পরাবৃত এবং যশে তা পরিবৃত।

বেদই মানুষকে শুনিয়েছেন যে, সে ক্ষুদ্র নয়। তার মধ্যেই রয়েছে পরিপূর্ণতার স্বধা। শ্রদ্ধা, শুচিতা, তপস্যা এ ব্রত পালনের দ্বারাই তা বিকাশ প্রাপ্ত হয়। বেদের দীক্ষা-বীর্যই জীবকে অমৃত তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত করে, অন্তরস্থ যজ্ঞশিখা দ্বারা তার এই অমৃত সত্তার বোধন ঘটে। সে তখন বুঝতে পারে যে, সে সীমার মধ্যে আবদ্ধ নয়, সমগ্র ত্রিলোকই তাহার নিবাসস্থল — সে মহতো মহীয়ান সর্বব্যাপ্ত সত্তা।

বেদব্যাখ্যাকারীদের এই তত্ত্বটি বিশেষভাবে অনুধাবন করা আবশ্যক। তাঁদের মনে রাখা উচিত যে অমৃতবিদ্যা এইভাবে মানুষের জীবনকে প্রদীপ্ত করে, পরিতৃপ্ত করে, প্রসন্ন করে। সেই বিদ্যার রহস্য অবগত হতে হলে চাই অবিচল শ্রদ্ধা, শুদ্ধা, বোধি, অবিশ্রান্ত যত্ন ও অবিরাম তপস্যা।

এই বলে পুরোহিতজী নীরব হলেন। কিছুক্ষণ পরে পুরেহিতজী বললেন — আপনারা জপে বসুন। আমি কপালেশ্বরের আরতি করতে চললাম। কাল আমি বেদ ব্যাখ্যা করে দেখাব যে পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ

অভেস্থা আমাদের অথর্ববেদেরই অংশ। নর্মদার জলে হাত মুখ ধুয়ে আমরা নর্মদার ঘাটে সন্ধ্যা সেরে নিলাম। সন্ধ্যারতি করার জন্য পুরোহিতজী মন্দিরে চলে গেলেন। নর্মদার ঘাটে বসেই আমরা আরতির ঘন্টাধ্বনি শুনতে পেলাম। আমরা সকলে সান্ধ্যক্রিয়া সেরে মন্দিরে গিয়ে পৌঁছালাম, তখন আরতি শেষ হয়ে গেছে। পুরোহিতজী সমাগত ভক্তদেরকে কুশীতে করে স্নান জল দিচ্ছেন। আমরাও তাঁর হাত হতে স্নান জল নিলাম।

পুরোহিতজী হ্যারিকেনের আলো দেখিয়ে আমাদেরকে নাটমন্দিরে পৌঁছিয়ে দিলেন। একটি ছোট মোমবাতি জ্বেলে দিয়ে তিনি তাঁর বাড়ীতে চলে গেলেন সন্ন্যাসীদেরকে নম নারায়ণায় জানিয়ে। আমরা নিজের নিজের আত্মকর্মে মন দিলাম।

রাত্রি ৯টা বা ১০ টা হবে। আকাশে চতুর্দশীর চাঁদ। চাঁদের হাসির যেন বাণ ডেকেছে আকাশে। সাতপুরার কোলে এই মনোরম নির্জন পরিবেশে, জ্যোৎস্না-প্লাবিত বাতাবরণে সুরলোকের মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। রাত্রি অনেক হয়ে গেছল। তাই আর বৃথা কালক্ষেপ না করে শুয়ে পড়লাম। খুব ভোরেই ঘুম ভেঙেছে। শৌচাদি সেরে নর্মদাতে নামলাম স্নান করতে। স্নান তর্পণাদি সেরে শ্রীশ্রীকপালেশ্বরজীকে দর্শন করতে চললাম। পথেই দেখা হল পুরোহিতজীর সঙ্গে। তিনি পূজা করে ফিরছেন। উভয়ই উভয়কে নম নারায়ণায় জানালাম।

বেলা বোধহয় একটা নাগাদ পুরোহিত মশাই তাঁর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে আমাদের জন্য নিয়ে এলেন পতর্-পতর্ রুটি, শঁশার তড়কা, ফল, দুধ। পুরোহিত মশাই-এর বৃদ্ধ মাতাজীও এসেছেন। আমরা তাঁদের অতিথিপরায়ণতা ও ধর্মপ্রাণতার জন্য ধন্যবাদ দিলাম।

পুরোহিতমশাই খুবই সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন — এ ফকিরের আয়োজন অল্পই, মহাদেব যা জুটিয়ে দেন।
— আমরাও ত ফকির। মা নর্মদা যে এই জুটিয়ে দিলেন এই যথেষ্ট। পরিক্রমায় বেরিয়ে আমরা কি রাজভোগের কল্পনা এঁকে রেখেছি নাকি? আপনি বিশ্বাস করুন আমাদের কাছে এটি রাজভোগেরও বাড়া।

আমি বললাম — বাবা বলতেন — ভোজনং গতজীর্ণানি সাদরং অজরামরঃ। রাজভোগ বা শুকনো রুটি সবই ত জীর্ণ হয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু আন্তরিক আদর ও আপ্যায়নের বিনাশ নেই।

আমাদের আহার সমাপ্ত হল। খুব তৃপ্তি সহকারেই খেলাম। পুরোহিতজী ফিরে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন — আপনারা বিশ্রাম করুন। কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আপনাদের আমি বেদ ব্যাখ্যা করে দেখাব যে পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ জেন্দ অভেস্থা আমাদের অথর্ববেদেরই অংশ।

খাবার পর নাটমন্দিরের বারান্দায় অর্ধশায়িত হয়ে বিশ্রাম করতে লাগলাম। আর নর্মদা যে তপস্যাভূমি সে সম্বন্ধে আমরা আমাদের নিজেদের মধ্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা কিছুটা বললাম।

ঘন্টা দুই পরে পুরোহিতজী আমাদের মধ্যে নাটমন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা সকলে তাঁর কাছে বেদ ব্যাখ্যা শুনবার জন্য তৈরী হয়ে বসেছিলাম। তিনি বলতে লাগলেন — বেদ ও বৈদিক জ্ঞানের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। কালক্রমে নানা বিপর্যয় এবং রাজনৈতিক উত্থান পতনের ফলে এই বিরাট ভূভাগ নানাভাবে ভেঙেছে এবং গড়েছে। এইভাবে বহিঃপ্রকৃতির রূপান্তর হলেও অন্তরঙ্গ স্তরে আজও একটা মিলনের ফল্গুধারা রয়ে গেছে। তাই প্রথমেই জেনে আশ্বস্ত হন জেন্দ অভেস্থা এই আমাদের অথর্ববেদেরই একটা অংশ, লুপ্ত ভৃগু বিদ্যারই demonstration মাত্র। জরাথুস্ত্র প্রবর্তিত ধর্মমত ছিল বৈদিক ধর্মেরই একটা শাখা। কেবলমাত্র ভাষার ভেদ — ভাষান্তরে বেদেরই একটি শাখা হল জেন্দ্ অভেস্থা — সংস্কৃতের পরিবর্তে ইরাণী ভাষায় লিখিত। প্রাচীন পারসীদের ধর্মমতের মূল তথ্য অনুসন্ধান করতে গেলে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে পারসীদের আদি পুরুষ — আমাদেরই পূর্বপুরুষ বৈদিক ঋষিরা। এককথায় তাঁরাও ভারতের অধিবাসী ছিলেন — ক্রিয়াহীনহেতু ভারত হতে বিতাড়িত হয়ে তাঁরা পারস্যে বসবাস করেছিলেন এবং আর্যরাই যে ইরাণীদের বা অপভ্রংশে Aryan — এই কথাই আমি বলতে চাই। প্রমাণ স্বরূপ আমি মনুসংহিতার নিম্নলিখিত শ্লোকটিই উপস্থিত করতে চাই —

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়োঃ। বৃষলত্বং গতালোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চোড্রদ্রাবিড়াঃ কম্বোজাঃ যবণাশোকাঃ। পারদা পহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতাঃ দরদাখশাঃ॥

অর্থাৎ পারস্যের প্রাচীন নাম পারদ। সংসারাদি ক্রিয়ালোপহেতু কতকগুলি ক্ষত্রিয় শূদ্রত্ব লাভ করে এবং কালে যবনাদি নামে অভিহিত হয়। পারসীরা তাদেরই একটা দল। Max Multer তাঁর Lectures on the

Snaskrit Language গ্রন্থে কোন সঠিক যুক্তি উপস্থাপন না করলেও অনুমান করেছেন 'The Zoraastrians were a colony from Northern India.'

পর পর কয়েকটি অকাট্য প্রমাণ দিলে আপনারা নিজেই বুঝতে পারবেন জেন্দ ভাষা সংস্কৃত হতে উদ্ভূত।

পারস্যের আর একটি প্রাচীন নাম — ইরাণ। ইরাণদেশের অধিবাসীরা 'ঐরাণ' নামেও পরিচিত। ইরাণ ও ঐরাণ — এই দুটি শব্দের মূল অনুসন্ধান করলে আমরা পাই যে চন্দ্রবংশে ইড়ার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয়। তাঁর বংশধরগণ অর্থাৎ ইড়ার পুত্র — এই অর্থে 'ঐড়' নামে অভিহিত। এই ঐড়গণের বাসস্থান বলে ঐড়াণ বা ঐরাণ নামের উৎপত্তি। সূর্যবংশীয়দের সঙ্গে চন্দ্রবংশীয়দের বিবাদের ফলেই যে তাদেরকে এদেশ ত্যাগ করতে হয় — একথাও আমাদের ধর্মশাস্ত্রে বারবার উল্লেখ আছে। তুরাণ ও ইরাণদের যুদ্ধ আসলে চন্দ্রবংশীয় ও সূর্যবংশীয়দেরই যুদ্ধ। সুর ও সুরাণ শব্দের অপভ্রংশে যে তুর ও তুরাণ শব্দের উৎপত্তি — একথা ভাষাতত্ত্ববিদ্‌মাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য। বেদ ও জেন্দ্ অভেস্তায় বর্ণিত দেবদেবীদের নাম, বীরগণের নাম ও উপাখ্যান, যজ্ঞবিধি ধর্ম কর্ম আচার ব্যবহার — সবকিছু আলোচনা করলে সব বিষয়ে সাদৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। অনেক ঘটনার এমন হুবহু মিল দেখা যায় যে সবিস্ময়ে ভাবতে হয় — একটি অপরটির ভাষান্তরে অনুবাদ মাত্র কিনা। কর্ণেল টডের মত ভারতবিদ্বেষী লোকও প্রাচীন মিডিয়া রাজ্যের অভ্যুদয় বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একস্থানে লিখেছেন — প্রাচীন ব্রহ্মাবর্তবর্ষের রাজা অজমেধের পাঁচটি পুত্র ছিল। তাঁদের মধ্যে দুজন ভারতবর্ষ ত্যাগ করে উত্তর পশ্চিমে চলে যান। তাঁরা সেখানে নূতন রাজ্য স্থাপন করেন এবং পিতৃস্মৃতি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য তাঁদের পদবী মেধ এবং তাঁদের বাসস্থানের নাম রাখেন মেধদেশ — এই মেধদেশই চলতি ভাষায় মেধিয়া হতে ক্রমে Media নামের উৎপত্তি। এইভাবে তিনি পারসীদের সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন — The country from which Persians are said to have come, can no other be than the North-West Part of Ancient India.'

প্রাচীন ভারতীয়দের একটি দল যে আফগানিস্থান বেলুচিস্থানের পথে হিমালয় অতিক্রম করে পারস্যে উপনীত হয়েছিলেন — একথা সবিস্তারে জেন্দ্ অভেস্থাতেই লেখা আছে। জেন্দ্ অভেস্থার অন্তর্গত 'ভেন্দিদাদ' নামক অংশে জরাথুস্ট্রকে সম্বোধন করে আহুর মাজদা বলছেন — 'আমি মনুষ্যদিগের জন্য অত্যুৎকৃষ্ট উর্বর ভূখণ্ড প্রদান করিয়াছি। কেহই সেরূপ ভূখণ্ড প্রদানে সমর্থ নহেন। সেই ভূখণ্ড পূর্বভাগে অবস্থিত। সেখানে প্রতি সন্ধ্যায় তারাদল সমুদিত হন'। জেন্দ্ অভেস্থায় আরও লেখা আছে — জামসেড নামক নেতার কর্তৃত্বাধীনে ঐ জাতি সেই পূর্ব স্থিত উচ্চ ভূখণ্ড হতে জীবজন্তু মনুষ্যহীন সমতলে উপনীত হন। ভূগোল সম্বন্ধে যাঁর কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান আছে — তিনি নিশ্চয়ই ঐ বর্ণনা হতে বুঝতে পারছেন যে পারস্যের পূর্বভাগে ভারতবর্ষ অবস্থিত। মূলকথা যে জরাথুস্ট্রকে পাশ্চাত্য ও প্রতীচ্যের গবেষকগণ ও পণ্ডিতগণ পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন একেশ্বরবাদের উদ্‌গাতা বলে বর্ণনা করেন — তাঁর সেই প্রাচীনতম ধর্মমতের মূল উৎস ভারতীয় বৈদিক ধর্মের মধ্যেই নিহিত।

ভারতের আর্য হিন্দুগণ ও পারস্যের প্রাচীন অধিবাসীদের ভাব ভাষা আচার ব্যবহার এবং ধর্মগ্রন্থের বাণীবচনের সাদৃশ্য আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে ভারতীয় ধর্ম হতেই ইরাণীয় ধর্মের উৎপত্তি। প্রথমতঃ ধরুন — ধর্মগ্রন্থের নামে বিভাগ ও ভাষার সাদৃশ্য। হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থের নাম - বেদ। বেদ শব্দের মূল বিদ্ ধাতু। বিদ্ ধাতুর অর্থ জানা। জেন্দ্ অভেস্থা নামের মূল - জেন্দ্ + অবেস্তা, ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় এই নাম — নানারূপে এবং বিভিন্ন শব্দ সংযোগে উচ্চারিত হয়। বাংলা ভাষায় বলা হয় জেন্দ্ অভেস্তা, কেউ বলেন জেন্দাভেস্তা আবার কেউ বলেন জেন্দ্ অভস্থা। ইংরাজীতে বলা হয় Zend Avesta , ইরাণী ভাষায় জেন্দ্ শব্দ ইরাণী ধাতু Zan বা জান্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন। এই জান্ ধাতু মানেও জানা অর্থাৎ সংস্কৃতে 'জ্ঞা' ধাতুর সমার্থক অবস্তা শব্দটি বিদ্ ধাতুরই রূপান্তর। নিরুক্ততে বিদ্ ধাতুর যতরকম রূপান্তর এবং প্রয়োগ হতে পারে তা বলতে গিয়ে অবস্তা শব্দটিরও উল্লেখ আছে।

আমার মতে — জেন্দ্ শব্দটিকে সংস্কৃত 'ছন্দঃ' শব্দেরও রূপান্তর বলা যেতে পারে। অভিজ্ঞান শকুন্তলমে দেখি সংস্কৃত 'ঐয়ি শকুন্তলে' কে সখীরা 'হলে শউন্দলে' বলে সম্বোধন করেছেন। সংস্কৃতে ঐয়ি শকুন্তলে যদি প্রাকৃত ভাষায় হলে শউন্দলে হয় — তাহলে লৌকিক কথ্য ভাষার মহিমায় ছন্দ শব্দটিও জেন্দ বা জেন্দ এ

রূপান্তরিত হওয়া এমন কিছু আশ্চর্য নয়। বেদের ভাষাকে পাণিনি বলেছেন — ছন্দঃ। তদনুযায়ী যে অভেস্তার ভাষাকে ইরাণীরা জেন্দ্ বলেছেন — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ছন্দঃ এবং জেন্দ্ একই ভাবাত্মক। এইভাবে আভেস্তা শব্দটি — সংস্কৃত অবস্থা শব্দেরও রূপান্তর হতে পারে। অবস্থা শব্দের অর্থ স্থিতি। জেন্দ ভাষায় জেন্দ্ অভেস্থাতে যে জ্ঞানের কথা আছে — যে নিত্যস্থিতির কথা আছে — ছন্দঃ অর্থাৎ বেদেও সেই পরিপূর্ণ স্থিতির কথা আছে।

আর একটি বিষয়ে লক্ষ্য করলে দেখা যায় জেন্দ্ অভেস্তা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত (১) যশ্ন (২) ভেন্দিদাদ (৩) যস্থ বা যশৎ। 'যশ্ন' শব্দটি সংস্কৃত যজন্ বা যজ্ঞ শব্দের রূপান্তর। বৈদিক সূত্রে যেমন ঈশ্বরের স্তব বা যজ্ঞাহুতির পরিচয় পাই, জেন্দ্ অভেস্তায় যশ্ন অংশেও সেইরকম আহরমণ্ অর্থাৎ ঈশ্বরের স্তব স্তুতি বা হবনাদি ক্রিয়ার বর্ণনা আছে। এই যশ্নের অপর নাম গাথা। বেদের ঋক্ মন্ত্রগুলিতে যেখানে স্তব আছে সেগুলিকে গাথা বলে।

ভেন্দিদাদ কথাটি সংস্কৃতে বন্দিতাতঃ কথার অপভ্রংশ। বন্দিতাতঃ মানে হে তাতঃ, হে পরমপিতঃ। তোমাকে বন্দি অর্থাৎ বন্দনা করি। আশ্চর্যভাবে জেন্দ্ অভেস্তার ভেন্দিদাদ অংশটি পুরোপুরি আহুর মাজদার উপাসনা পদ্ধতিতে পরিপূর্ণ। জেন্দ্ অভেস্তার তৃতীয় অংশ যস্থ বা যষতে আমাদের অথর্ববেদের মত লৌকিক ব্যবহার বিষয়ে বহু উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে। জেন্দ্ অভেস্তার এই যে তিনটি ভাগ — এও বেদের প্রতিচ্ছায়া। কারণ বেদব্যাস কর্তৃক বেদের বিভাগ হওয়ার পূর্বে আদিতে বেদেরও তিনটি ভাগ ছিল। এজন্যই বেদের অপর নাম 'ত্রয়ী'।

শুধু তাই নয় — আমাদের দেশে সকলের সংস্কার আছে যে সকল রকম ধর্ম কর্ম আধ্যাত্মিক বিষয় সংস্কৃতে হওয়া চাই। কারণ সংস্কৃত বাক্যগুলি ঋষিবাক্য। হিন্দু মাত্রই বিশ্বাস করেন — ঋষিগণ যে ভাষায় মন্ত্রগুলি আদিতে রচনা করেছেন — সেই সংস্কৃত ভাষাতেই সেগুলি যথাযথ উচ্চারিত হলে তবেই কার্য সিদ্ধ হয়। কারণ ঐ ভাষা ও শব্দের মধ্যে তাঁদের বাক্ চৈতন্য ছড়িয়ে আছে। আজ পর্যন্ত কোন হিন্দুকেই কখনও তাঁর মাতৃভাষায় পূজা-পদ্ধতি শ্রাদ্ধাদি দশকর্ম করতে দেখা যায় না। বেদমন্ত্রগুলি যথাযথভাবে উদাত্তপ্লুত অনুদাত্ত স্বর যোগে যথাবিহিত ছন্দে উচ্চারিত হলে যে কোন আধ্যাত্মিক কার্যে তবেই সিদ্ধিলাভ সম্ভব — এ বিশ্বাস প্রত্যেক হিন্দুর মজ্জাগত। ঠিক তেমনি ইরাণীগণও জেন্দ্ অভেস্তার ভাষাতেই তাঁদের ঈশ্বর আহুর মাজদার উপাসনা করে থাকেন। কোন ইরাণীকেই আপনি জেন্দ্ অভেস্তার ভাষা ছাড়া তাদের কথ্য ভাষায় আহুর মাজদার উপাসনা করতে দেখবেন না। কারণ তাঁরাও আমাদের মত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন জেন্দ্ ভাষায় লিখিত স্তোত্রাদি মোহিনী শক্তি সম্পন্ন। সাধারণ ভাষায় সে স্তোত্র অনুবাদ করে উচ্চারণ করলে তাতে কোন ফললাভ হবে না।

এই সহজ সংস্কার, এই চেতনা এই সাদৃশ্য দেখে কি ইরাণীদের মধ্যে বৈদিক ঋষিদের Heredity complex এর প্রতিচ্ছবি দেখা যায় না? এই কৃষ্টিগত বোধের সমতা ও সাদৃশ্য দেখে কি ইরাণীদেরকে সেই প্রাচীন ভারতীয়দের সেই বৈদিক অব্যাহত ধারার একটি নিরবচ্ছিন্ন সংস্কৃতির স্রোত বললে কি ভুল হবে?

এইবার কিছু ব্যাকরণগত সাদৃশ্য আলোচনা করা যাক। সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদে যাহা অস্মৈ, কস্মৈ, যস্যাম জেন্দ্ ভাষায় লিখিত অবেস্তাতে তা হয়েছে অহ্মৈ কহ্মৈ এং যেস্যাম্। সংস্কৃতে অস্মৈ মানে ইঁহাদেরকে জেন্দের অহ্মৈ মানেও ইঁহাদেরকে। বেদে আছে কস্মৈ দেবায় বিধেম — কোন দেবতাকে উৎসর্গ করবো! অবেস্তাতেও ঠিক ঐ কথাই আছে কহ্মৈ দেবায় বিধেন। এইভাবে যস্যাম এবং যেস্যাম একই অর্থ বহন করে। সংস্কৃতে কুকুরকে বলা হয় শ্বন্, অবেস্তাতেও কুকুরকে বলা হয়েছে স্পন্। শব্দ রূপের বিচারে এই দুই মহাগ্রন্থের কি অপূর্ব মিল! সংস্কৃতে শ্বন্ শব্দের প্রথমার একবচনে 'শ্বা', জেন্দ্ ভাষায়ও 'স্পন্' শব্দের প্রথমার একবচনে 'স্পা'। শ্বন্ শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে সংস্কৃতে 'শ্বানম্', জেন্দ্ ভাষাতেও 'স্পন্' শব্দের দ্বিতীয়ার একবচনে 'স্পানম্' অর্থাৎ কুকুরকে। চতুর্থীর একবচনে উভয় শব্দ একবারে মিলে গেছে — যথা শুনে এবং সুনে। কেবলমাত্র তফাৎ বানানে। সংস্কৃতে তালব্যশতে উকার, জেন্দে দন্ত্যসতে উকার। জেন্দ্ অবেস্তার 'পথন' শব্দটিরও ব্যুৎপত্তি আলোচনা করলে আরও স্পষ্ট হবে যে বেদেরই কোন অংশ ভাষান্তরে জেন্দ্ অবেস্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। জেন্দের এই পথন্ শব্দটি সংস্কৃতে 'পথিন' শব্দের অনুরূপ। সংস্কৃতে 'পথন' শব্দের

প্রথমার একবচনে 'পন্থা', জেন্দ ভাষায় 'পথন' শব্দেরও প্রথমার একবচনে পন্তা। প্রথমার বহুবচনে 'পন্থানঃ' জেন্দ ভাষায় 'পন্তানো'। শব্দরূপ ও বিভক্তির ধারায় কোন প্রভেদ নেই, প্রভেদ শুধু 'থ' এর জায়গায় 'ত'।

পারসীদের পরম পূজনীয় গ্রন্থ জেন্দ্ অভেস্তা এবং হিন্দুদের পরম পূজনীয় গ্রন্থ বেদ — এই দুই এর তত্ত্বগত, গুণগত এবং সাধনতত্ত্ব আলোচনা করে আমি বলতে চাইছি যে — জেন্দ্ অভেস্তা অথর্ববেদেরই লুপ্ত অংশ মাত্র। এ আমার হিন্দু সংস্কার বা বেদ প্রীতিমাত্র নয়; প্রাচ্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ যে তড়িৎ সিদ্ধান্তে এসেছেন — অথর্ববেদের অংশ বিশেষ নানা রাষ্ট্র বিপর্যয় এবং অন্য কোন কারণে নষ্ট হয়ে গেছে — সে বিষয়েই আমি প্রতিবাদ করছি এবং বলতে পারেন — আমার দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানের ফল প্রকাশ করে এই আবেদন জানাতে চাইছি — পণ্ডিতমহাশয়গণ। কৃপা করে অন্য কোন বই এর অংশকে অথর্ববেদের অংশ বলে চালাতে চাইবেন না। বেদের সেই লুপ্ত ভৃগু বিদ্যা, অথর্বন ঋষি বা ভৃগু ঋষির সেই আলোকজ্জ্বল উপলব্ধির সারসত্য আমাদেরই পূর্বপুরুষদের একটি শাখা ইরাণীদের মহাগ্রন্থ জেন্দ্ অবেস্তা রূপে বিরাজমান। তত্ত্বগত মিল ছাড়াও সামান্য মাত্র একটি আধটি বর্ণের পরিবর্তন করে দেখলে উভয় ভাষায় উভয় গ্রন্থের ভাষা ও শব্দের অভিন্নত্ব সহজেই উপলব্ধি করতে পারবেন। আর যেহেতু শ্রেষ্ঠ গবেষক পণ্ডিতগণ বেদকে খৃঃ পূঃ অন্ততঃ ৬ হাজার বৎসর এবং জেন্দ্ অভেস্তা খৃঃ পূঃ ২৫০০ হতে ৩০০০ হাজার পূর্বে লিখিত বলে প্রামাণিক সিদ্ধান্তে পৌঁচেছেন — এজন্য বেদেরই কোন অংশ জেন্দ্ অবেস্তা রূপে বিরাজিত একথা বলাই সমীচীন। যদি কেউ তর্ক তোলেন — Great men think alike, Great Rishis realise alike — এই সত্যানুসারে ঋষি জরাথুষ্ট্র এবং বৈদিক ঋষি সমাধির উত্তুঙ্গ অবস্থায় উঠে একই পরমসত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তার জবাব হিসাবে নিম্নলিখিত শব্দগুলি অনুধাবন করতে বলছি, একটু খুঁটিয়ে বিচতার করলেই বুঝতে পারবেন — সে অবস্থায় শুধু তত্ত্বের মিল শুধু একই সত্যোপলব্ধির মিল থাকতে পারতো। কিন্তু এমনভাবে বেদের পূর্ব পূর্ব অংশের জের পূরণ করার মত বর্ণগত ধাতুগত বিভক্তিগত শব্দগত মিল হতে পারে না। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি —

ক) যে সব সংস্কৃত শব্দের 'স' জেন্দ্ ভাষায় 'হ্' রূপে পরিবর্তিত কিন্তু অর্থ একই।

সংস্কৃত ঃ—	অসুর	সোম	সপ্ত	মাস	সেনা	অস্মি	সত্তি	অসু	বিবস্বত
জেন্দ্ ঃ—	অহুর	হোম	হপ্ত	মাহ	হেনা	অহ্মি	হত্তি	অহু	বিবহৃত

খ) যে সব সংস্কৃত শব্দের 'হ', জেন্দ্ ভাষায় 'জ' রূপে পরিবর্তিত কিন্তু অর্থ একই।

সংস্কৃত ঃ—	হৃদয়	হস্ত	বরাহ	হোতা	আহুতি	হিম	হ্বে	বাহু	অহি
জেন্দ্ ঃ—	জরদয়	জস্ত	বরাজ	জোতা	আজুতি	জিম্	জ্বে	বাজু	অজি

গ) যে সব সংস্কৃত শব্দের 'শ্ব', জেন্দ্ ভাষায় 'স্প' রূপে পরিবর্তিত কিন্তু অর্থ একই।

সংস্কৃত ঃ—	বিশ্ব	অশ্ব	শ্বন্	কৃশাশ্ব
জেন্দ্ ঃ—	বিস্প	অস্প	স্পন্	কৃশাস্প

ঘ) যেখানে সংস্কৃত শব্দের 'ত', জেন্দ্ ভাষায় 'থ' রূপে দেখা যায়; অর্থও এক।

সংস্কৃত ঃ—	মিত্র	ত্রিত	ত্রৈতাল	মন্ত্র
জেন্দ্ ঃ—	মিথ্র	ত্রিথ	থ্রৈতান্	মন্থ্র

প্রত্যেকটি শব্দ এক আধটি বর্ণের উচ্চারণগত কিঞ্চিৎ ভেদ থাকলেও সবগুলি একই অর্থ বহন করছে। এতখানি মিলকে কেবলমাত্র Coincidence বললে ভুল হবে। এতখানি Coincidence একমাত্র সম্ভব যদি একই ভাষাভাষী লোক, একই দেশের লোক — একই বংশোদ্ভব লোক — একই ভাবধারা ও সংস্কৃতির লোক — অবস্থাক্রমে ভিন্ন দেশে গিয়ে বাস করে তবেই কালক্রমে সেই নূতন দেশের দেশজ ও তদ্ভব শব্দের মিশ্রণে কিছুটা উচ্চারণ বিকৃতি ঘটতে পারে। কিন্তু একই ভাবধারার একই কৃষ্টির লোক হলে মূল ভাবটি একই থেকে যাবে। আবার সবসময় যে সব শব্দের ভেদে দেশ ভেদে শুধু তৎ তৎ দেশে বাস করার ফলেই উচ্চারণ বিকৃতি ঘটবে তা নয়। অধিকাংশ শব্দ বংশানুক্রমিক পরিবর্তনের ফলেও অবিকৃত অবস্থা মূলাকারে থেকে যাবে। জেন্দ্ অভেস্তা যে বৈদিক ঋষিদের উপলব্ধ সত্যের একটা ধারা বা ঐ মহাগ্রন্থ যে বেদেরই একটি লুপ্ত অংশ তার প্রমাণস্বরূপ আমি জেন্দ্ অভেস্তা থেকে নিম্নলিখিত শব্দগুলি পেশ করছি — যেগুলি বিচার করলে বুঝতে

পারবেন শব্দগুলি একই আকারে একই অর্থে রয়ে গেছে। এই শব্দগুলি ব্যাকরণে এবং বৈদিক শব্দে যে অর্থ, যে ভাব বহন করে, জেন্দ্ অবেস্তাতেও সেই একইভাব, একই অর্থ, একই রূপ বহন করছে—

যেমন - পিতর, মাতর, ভ্রাতর, দুহিতব, পশু, গো, মক্ষী, শরদ, বাত, অভ্র, যব বৈদ্য, ঋত্বিজ, নমস্তে, মনস্, যম, বরুণ, বায়ু, অর্যমন্, অর্মতি, রথ, রথস্থ, গন্ধর্ব, প্রশ্ন, অথর্বণ, গাথা, ইন্দ্র, দেব, জন, বজ্র অজ এবং জানু।

এইভাবে বৈদিক ভাষায় এবং জেন্দ্ অভেস্তার গাথা মধ্যে অজস্র সাদৃশ্য দেখা যায়। শুধু তাই নয়, এদেশ হতে চলে যাওয়ার পর প্রাচীন পারসিকরা অনেকদিন পর্যন্ত বৈদিক ধর্ম, কর্ম, আচার অনুষ্ঠানও বিস্মৃত হন নি। জলবায়ু ভেদে উচ্চারণের তারতম্যে শব্দের কিছু বিকৃতি ঘটেছিল বটে তাও নাম মাত্র। বাক্যগত সাদৃশ্য দেখালে আরও আপনারা বুঝতে পারবেন জেন্দ্ অভেস্থা যে মূলতঃ বেদ — আমার এ সিদ্ধান্ত কোন টেনে বুনে অর্থ করা নয়। যেমন ঃ-

	সংস্কৃত	জেন্দ্
১।	বিশ্ব দুরক্ষো জিনবতি।	বিস্প দ্রুক্ষ জনৈতি।
২।	বিশ্ব দুরক্ষো নশ্যতি।	বিস্প দ্রুক্ষ নাশৈতি।
৩।	যদা শৃণোতি এতাং বাচাং।	যথা হানোতি ঐযম্ বাচন্।

অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। এবার পারসিকগণের আচার ব্যবহার এবং সমাজ বন্ধনের কিছু উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে তাঁদের (ইরাণীদের) সবকিছুতেই আর্যদের আচরিত ধর্মে, কর্মে, ব্যবহারে কত মিল ছিল। তাঁরা সেই চির পুরাতন বেদাচরিত ধর্মেরই অনুসরণকারী ছিলেন। সবাই জানেন, পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শুদ্র — এই চারি বর্ণের বিভাগ ভারতবর্ষের নিজস্ব ধারা। ভারত ছাড়া এই বিভাগ পৃথিবীর আর কোন দেশে, কোথাও দেখা যাবে না। বেদের এই বর্ণ বিভাগের কথা কিন্তু আমরা জেন্দ্ অভেস্তাতে পাই। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে আছে—

ব্রাহ্মণোস্য মুখমাসীদ্ বাহু রাজন্য কৃতঃ।
উরুতদস্যয়দ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোহজায়তঃ॥

অর্থাৎ সেই পরমপুরুষের মুখ হতে ব্রাহ্মণ, বাহু যুগল হতে ক্ষত্রিয়, উরু হতে বৈশ্য এবং পা হতে শূদ্র জাতির সৃষ্টি হয়েছিল। বেদের এই কথা থেকেই পরে ভণ্ড সাধু, পুরোহিত এবং মূর্খ ব্রাহ্মণের দল জাতি বিভাগ সৃষ্টি করেছে — পুরাণে, সংহিতায়, নানাবিধ শাস্ত্রে তারই গোঁড়ামির বিকৃত রূপায়ণ দেখি। বেদে অবশ্য ঐ কথার গভীর অর্থ আছে। আমি শুধু জাতিবিভাগ তথা বর্ণবিভাগের যে similarity অভেস্তাতে দেখা যায় তার কথাই বলবো। বেদে ঐ যে বর্ণ বিভাগ পরবর্তীকালে তার যত কদর্থ আমাদের পুরাণ পুঁথিতে হোক না কেন, বেদানুসারে অবশ্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র নয়। এই চারটি বর্ণের নাম ছিল কর্মানুসারে। জেন্দ্ অভেস্তাতেও ঐ চারটি বর্ণের নাম হল — ১) অথর্ব অর্থাৎ পুরোহিত ২) রথেষ্টন্ অর্থাৎ যোদ্ধা ৩) ভস্ত্রীয়োস্ত্রীয় অর্থাৎ কৃষিজীবী ৪) হুইটস্ অর্থাৎ শ্রমজীবী। জেন্দ্ অভেস্তার প্রসিদ্ধ অনুবাদক Prof. Darmestater তাঁর Translation of Zend Avesta তে বিষয়টি লক্ষ্য করে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে লিখেছেন — "We find in it a description of the four classes which strikingly remind one of the Brahminical account of the origin of casts and which are certainly borrowed from India."

প্রাচীন পারসীদের আর একটি শাখা পহ্লবীদের মধ্যে ঐ বর্ণ বিভাগের নাম ১) রথোরণান ২) রাথেস্তারাণ ৩) বস্তারোসান এবং ৪) হোৎমান। এই বর্ণ বিভাগ বেদ থেকে পারসীদের মধ্যে এবং পারসীদের কাছ থেকে পহ্লবীদের জীবনধারায় সঞ্চারিত হয়েছিল।

বেদে যেমন দেখি চারি বর্ণের মধ্যে শূদ্র ছাড়া আর তিন বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য উপবীত ধারণের অধিকারী তেমনি জেন্দ অভেস্তাতেও অর্থব, রথেষ্টন এবং ভস্ত্রীয়োস্ত্রীদের মধ্যে উপবীত ধারণের অভিনব অনুকরণ দেখতে পাই। পারসীদের মধ্যে ঐ তিন সম্প্রদায় উপবীত ধারণ করেন। অবশ্য এঁকে তাঁরা জেন্দ ভাষায় বলেন - কুস্তি'।

ভেন্দিদাদে ঋষি জরাথুস্ত্রের সঙ্গে আহুর মাজদা অর্থাৎ ভগবানের যে কথোপকথনের বর্ণনা আছে তা দেখা যায় —'যারা নির্দিষ্ট সময়ে কুস্তি ধারণা না করে, গাথা উচ্চারণে বিরত থাকে এবং তর্পণের সলিলের প্রতি

সম্মান প্রদর্শন না করে, তারা দণ্ডদানের যোগ্য'। তেমনি ব্রাহ্মণাদি বর্ণ যদি উপবীত ধারণ না করেন, বেদ পাঠে বিরত থাকেন, সন্ধ্যাহ্নিকে উদাসীন হন, তাহলে তাঁদের অপরাধের এবং প্রায়শ্চিত্তের বিষয়ে আমাদের শাস্ত্রে যা লেখা আছে — ভেন্দিদাদের উক্ত অংশ তারই অনুকরণ এবং অনুসরণ বলে মনে হয় না কি? শুধু কি তাই? ব্রাহ্মণের সারসর্বস্ব যে বেদমাতা গায়ত্রী, সেই একই ভাবে পবিত্র অন্তঃকরণে এবং একই আকুতিতে — ইরাণের যাঁর অথর্বা তাঁরাও গায়ত্রী পাঠ করেন, জপ করেন, গোপনতম সম্পদরূপে তাঁরা এই গায়ত্রীকে রক্ষা করেন। বেদের গায়ত্রীটি হল —

ওঁ তৎ সবিতুর বরেণ্যম্ ভর্গো দেবস্য ধীমহী ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

এর অর্থ হল — সবিতার অর্থাৎ জগৎ স্রষ্টার ভর্গই আমাদের অন্তরে প্রজ্ঞারূপে অবস্থিত, উহার অনুবর্তনই জীবনের সাধনা। আমরা যেন নিরন্তর সেই ভর্গের ধ্যান করি। একই উদাত্ত স্বরে জেন্দ্ অভেস্তার গায়ত্রী পাঠ শুনুন —

ওঁ যথা অহু বর্য্যো অথা রতুস, অযাৎ চিৎ হচা
বংহেউস্ ক্ষত্রং চ অহুরাই আ
যিম্ দ্রিগুব্যো দদাৎ বাস্তারেম্ ওঁ।

এর অর্থ হল — ধর্ম সাধনার জন্য সেই অহু অর্থাৎ প্রভু, তাঁর রতু অর্থাৎ ভর্গ আমাদের নমস্য। আহুর মাজদার অভিপ্রেত দিব্য জীবনলাভের জন্য বংহেউস অর্থাৎ বহুমনস প্রজ্ঞার অনুবর্তনই আমাদের জীবনের সাধনা। উহাই দুর্বলের বল। আমরা যেন নিরন্তর ঐ রতুর ধ্যান করি।

বেদে ঋষি উদাত্ত কণ্ঠে প্রার্থনা করেছিলেন —

মহান্তা মিত্রা বরুণা, সম্রাজা দেবাব্ অসুরাঃ
সখে সখায়াম্ অজরো জরিম্নে অগ্নে মর্ত্তান্ অমর্ত্ত্যস্ ত্বং নঃ॥ (ঋ।১০/৮৭/২১)

অর্থাৎ হে মহান পুরুষ, তুমিই অগ্নি, তুমিই সূর্য, তুমিই বরুণ, তুমিই আমাদের কাছে পিতারূপে পতিরূপে সখারূপে সাধুরূপে প্রকাশিত। হে পরমপিতঃ, তুমি অজর আমরা জরাগ্রস্থ। তুমি অমর আমরা মরণশীল। তথাপি তোমাকে সখা বলে ডাকবার সৌভাগ্য তুমি আমাদেরকে দিয়েছ।

জেন্দ্ অভেস্তাতে বৈদিক ঋষির ঐ একই উদাত্ত কণ্ঠস্বরের স্তুতিবাক্য শুনুন —

মহান্তা মিত্রাবরুণা দেবাব্ অহুরাঃ সখে যা ফেধ্রোই বীদাৎ,
পত্যয়ে চা, বাস্ত্রেব্যো, অৎ চা খত্রতবে অযাউনো অযবব্যো। (গাথা ১৭।৪/যশ্ন ৫৩।৪)

অর্থাৎ হে আহুর মাজদা, হে প্রভু তুমি ধার্মিকের নিকট পিতারূপে, পতিরূপে, সখারূপে কর্মী রূপে রতু অর্থাৎ প্রজ্ঞারূপে প্রতিভাত হয়ে থাক। আমাদের মত মরণশীল অযোগ্যকে যে শ্রীচরণে ঠাঁই দিয়েছ এ তোমার কেবল দয়া।

জেন্দ অভেস্তার ৪৬ যশ্নতে জরাথুষ্ট্র প্রার্থনা করছেন —

রফেধ্রম্ চগ্মান্ত যত প্রিয়োপ্রিয়ায় দহ্নীৎ। (গাথা ১০/২ / যশ্ন ৪৬/২)

অর্থাৎ হে আহুর মাজদা! প্রিয়জন প্রিয়জনকে যে আনন্দ দেয়। তুমি সেই আনন্দ আমাতে উদ্দীপিত কর।

বেদে আছে এক পরমপুরুষের আরাধনা। একং সদ্ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি॥

এই একেশ্বরবাদ জেন্দ্ অভেস্তার ছত্রে ছত্রে। কারণ জেন্দ্ অভেস্তা বেদেরই একটি অংশ বলেই তা সম্ভব হয়েছে। সম্ভব কেন — এটাই ধ্রুব সত্য। ধ্রুব সত্য বলেই বেদের একই ভাষা জেন্দ্ অভেস্তাতে প্রবেশ করেছে। বেদে আছে —

মজদাঃ সকৃত্ব স্মরিষ্ঠঃ।

মজদা অর্থাৎ সেই পরমমেধসই একমাত্র আরাধ্য।

অভেস্তার ২৯ যগ্নে ১৭/৪ গাথাতে আছে ঐ একই ভাষায় একই কথার প্রতিধ্বনি —

মজদাস্ত সখারে মহরিস্তো।

আহুর মাজদাই একমাত্র আরাধ্য।

বেদে যেমন সন্ন্যাস ধর্মের নিষেধ আছে, অভেস্তাতেও সেইরকম গৃহত্যাগের নিষেধ আছে। বৈদিক

ঋষিদের যেমন জীবেম শরদঃ শতম — গার্হস্থ্য জীবনযাপন, একশ শরৎ অর্থাৎ সুখী এবং আনন্দময় জীবনের প্রার্থনা আছে, অভেস্তাতেও সেই একই কথার প্রতিধ্বনি পাই। বৈদিক ঋষির প্রার্থনা —

এতাবতীং বসুমনসাং দেহি যা সুক্ষিতিম্ রামাং চ দধাতি।

বহু ধন দাও, সকলে গৃহে যেন সুখ ও আনন্দে থাকে। গৃহে বাস করার সুমতি দাও। অভেস্তাতেও সেই একই প্রার্থনা —

অবৎ বহু মনংহ্য, যা হুসৈইতিস্ রামাং চ দাৎ। (গাথা ১৭/যশ্ন ২৯)

হে আহুর মাজদা, আমাদেরকে সেই সুবুদ্ধি দাও — যা গৃহে বাস ও তুষ্টি পছন্দ করে। বেদবাণীর মধ্যে যে তেজ যে যুযুৎসা বা বিজিগীষার পরিচয় পাই, অভেস্তাতেও সেই তেজোময় বিজিগীষার বাণী প্রায় একইভাবে দেখতে পাই।

বেদে পাই —

যঃ মহ্যম জোশং দদাতি, অস্মৈ অতশ্চিৎ বহিষ্টম্
অপি চ অস্মান অন্তম্ দদাতি, অস্মৈ আন্তম্ দদানি।

অভেস্তাতেও ঐ মন্ত্রের প্রতিধ্বনিটি দেখুন —

যঃ মর্হব্যো যস্তস্ অস্মাহি অস্ চিৎ বহিস্তো
আস্তেং অন্মাই যে নাও আস্তেং দহ্দীতা।

উভয় গ্রন্থের উভয় শ্লোকের অর্থ হল — যে আমার হিত করে, তার চেয়েও বেশী হিত, আর যে আমার অনিষ্ট করে, তার — তার চেয়েও যেন বেশী অনিষ্ট না করি। একই বিশ্বমৈত্রী ও সাম্যের বাণী —

বেদে — যস্মৈ কস্মৈ চিদ্ যদ্ ইষ্টম্, তদ্-এব অস্মৈ ইষ্টম।

অভেস্তা — উস্তা অহ্মাই যহ্মাই যৎ উস্তা কহ্মাই চিৎ। (গাথা ৭/১/যশ্ন ৪৩)

উভয় শ্লোকের অর্থ হল কেবল তাহাতে কাহারও অধিকার — যাহাতে সকলের সমান অধিকার আছে।

ঈশ্বরের নিকট পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণই হল বৈদিক সাধনার মূল কথা। তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ আমার জীবন মাঝে - এই কান্না দিয়ে এই আত্ম নিবেদন দিয়েই ভক্ত ভগবানের জন্য নৈবেদ্য সাজায়! সেই কথাই বৈদিক ঋষিরা উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের কথা —

অথ নঃ অসতু, যথা স্বঃ বশতি।

তিনি যেমন ইচ্ছা করেন, আমাদের তাই হোক।

আহুর মাজদার চরণে ভক্তেরও সেই একই আত্মসমর্পনের কথা পাই। ঋষি জরাথুস্ত্র সেই পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের মন্ত্রই শিখিয়েছেন —

অথা নে অংহৎ যথা হ্বো বশৎ। (গাথা ২।৪)

হে আহুর মাজদা, হে প্রিয়, তোমার যেমন ইচ্ছা তাই জীবনে ঘটুক।

এইসব অজস্র উদাহরণ দেখে আশাকরি বুঝতে পারছেন — আমি যে জেন্দ্ অভেস্তাকে বেদের একটি লুপ্ত অধ্যায়ের গৌরবময় প্রকাশ বলছি, এ আমার কোন মনঃকল্পিত জল্পনা বা বিদ্যাবুদ্ধির কোন বিজৃম্ভন নয়। আমার এই সিদ্ধান্ত সকলের জল্পনা কল্পনা বা নাসিকা কুঞ্চনকে স্তব্ধ করে দেবে যদি নিচের মন্ত্রটি দেখেন। এই মন্ত্রটি যেমন অথর্ববেদের ৭ মণ্ডলের ৬৬ অধ্যায় আছে তেমনি অবিকৃত অবস্থায় একই ভাষায় অভেস্তার পৃশ্নি খণ্ডে ৮ম অধ্যায়ের দ্বাদশ গাথাতে আছে। ভাব ভাষা তো দূরের কথা কোন অনুস্বার বিসর্গেরও তফাৎ নেই। মন্ত্রটি হল —

যদি অন্তরীক্ষে যদি বাতে আস যদি বৃক্ষেষু যদি বোলপেযু।
যদ্ অশ্রবণ্ পশব উদ্-যমানম্ তদ্ ব্রাহ্মণম্ পুনর্ অস্মান উপৈতু॥

হে প্রভু, তুমি আকাশেই থাক, আর বাতাসেই থাক, বনেই থাক আর তরঙ্গেই থাক, যেখানেই তুমি থাক না কেন তথা হতে একবার তুমি আমাদের কাছে এস। তোমার পদধ্বনি শুনবার জন্য জীবগণ উৎকর্ণ হয়ে আছে। অলমিতি।

এই পর্যন্ত বলেই পুরোহিতজী চোখ বন্ধ করে বসে রইলেন। তিনি ধ্যান নিমীলিত লোচনে বসে আছেন।

আর আমরা তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে আছি। নর্মদাতটের মুক্ত আকাশতলে পুরোহিতজী ও আমাদের এইরকম ধ্যাননিবিষ্ট দৃশ্য দেখে প্রাচীন বৈদিক ভারতবর্ষে ঋষিদের তপোবন-দৃশ্য যেন আমার চোখে ভেসে উঠল। সবুজ গাছপালা ও পর্বতের অপরূপ শোভা এই পরিবেশকে আরও মহিমামণ্ডিত করে তুলেছে।

হঠাৎ 'হর নর্মদে' ধ্বনিতে আমি চমকে উঠে তাকিয়ে দেখি, পুরোহিতজী চোখ খুলে আমার উপরই দৃষ্টি স্থাপন করেছেন, যেন তিনি আমার ভিতরটা পরখ করছেন!

— শৈলেন্দ্রনায়ারণজী। হমারা প্রবচন সে আপকা মনমেঁ কোঈ জিজ্ঞাসাকী উদয় হুয়া ত মুঝে বাতাইয়ে।

আমি যুক্তকরে তাঁকে নিবেদন করলাম — আপনার কথা শুনে আমার বুক আনন্দে ও গর্বে ভরে উঠেছে। বিশ্বের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বেদ। বেদের ভাষা সংস্কৃত। শ্রুতিরূপে বেদ বংশপরম্পরায় প্রচলিত। বেদের সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মনীষীরা যাই বলুন না কেন, আমাদের বিশ্বাস, পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার আগে থেকেই বেদ প্রচলিত রয়েছে। পৃথিবী কার ভিতর হতে উদ্ভূত হয়েছে? এ সম্বন্ধে প্রচলিত মত হল —

যস্য নিঃশ্বসিতং বেদঃ যো বেদেভ্যোঽখিলম জগৎ।
নির্মমে তমহম বন্দে বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বরং॥

বেদকে বলা হয় ঈশ্বরের নিঃশ্বাস। আর এই নিঃশ্বাস হতেই বিশ্বের উৎপত্তি। বেদ ঈশ্বরের নিঃশ্বাস — এই কথার তাৎপর্য এই যে নিঃশ্বাসের দ্বারা কোন জীব জীবিত কিনা যেমন বুঝতে পারা যায় তেমনি এই বিশ্বে ঈশ্বর যে জীবন্ত-শক্তি একমাত্র বেদ বুঝলেই তা জানা যায়। এই বেদকে জানতে হলে, বুঝতে হলে সর্বাগ্রে সংস্কৃত জানা আবশ্যক। সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার। কিন্তু আজকাল সর্বত্রই সংস্কৃতের অনাদর। প্রত্যেকেই চাকুরী লাভের দৃষ্টিকোণ হতেই বিদ্যার মূল্য যাচাই করে। অর্থকরী বিদ্যারই কদর সর্বত্র। বর্ত্তমানে প্রত্যেকের মনোভাব এই যে স্কুল কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়বার সুযোগ না পেলে তাঁদের সন্তানদের জীবন বুঝি ব্যর্থ হয়ে যাবে।

স্কুলের গণ্ডী অতিক্রম করে যখন আমি কলেজে সংস্কৃতে অনার্স পড়ার জন্য ভর্তি হই, তখন আমার সহপাঠীরা সবাই সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হয়। তাদের লক্ষ্য কেউ ডাক্তারী পড়বে, কেউ ইঞ্জিনীয়ারিং, কেউ বা Atomic Physics নিয়ে রিসার্চ করবে। এক কথায় তাদের সকলের ভাগ্যের চাকাটা স্বর্ণোজ্জ্বল রাজপথ দিয়ে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাবে। আর আমার প্রতি তাদের এবং আমার মাষ্টারমশাইয়ের মনোভাব ছিল — 'এটা সায়েন্সের যুগ, সংস্কৃতে কোন prospect নেই, যুগধর্মকে এড়িয়ে কেবল পাগল ছাড়া এযুগে কেউ সংস্কৃত পড়ার কথা ভাবতে পারে না। কিন্তু আমার সেই মাষ্টারমশাই-এর জীবনটা বিচার করলেই পাই তাঁর ভাগ্যের চাকাটা নিজের রঙিন সাধ ও স্বপ্ন অনুযায়ী সোজা সড়ক ধরে চলে নি। তিনি নিজে সায়েন্সের কৃতী ছাত্র। হয়ত যখন সায়েন্স পড়তে ঢুকেছিলেন তখন হয়ত তিনি কত রঙিন ভবিষ্যতের কল্পনায় বিভোর হয়ে থাকতেন। তাঁর বাবা মাও তাঁদের সন্তান সম্বন্ধে কত না উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ এঁকে রেখেছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কি তা হয়েছে? অঙ্ক নিয়ে এম.এস.সি. পাশ করে তাঁকে আজ পাড়াগাঁয়ে একটা অখ্যাত স্কুলে শিক্ষকতা করেই জীবন কাটাতে হচ্ছে। উদয়াস্ত টিউশন করে অকালেই তিনি বুড়িয়ে গেছেন। সপ্তম হতে দশম শ্রেণীর ছাত্রদেরকে পড়িয়ে Higher Mathematics এর principle তাঁর কতটুকুই বা মনে আছে? স্কুলে তা চর্চা করার সুযোগই বা তাঁর কোথায়? এর মূলে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অন্য যেসব জটিল কার্য-কারণ সূত্রই থাক না কেন, সায়েন্স পড়েও যে তার মত কৃতী ছাত্র, ব্যর্থ হয়েছে, এটাই রূঢ় বাস্তব।

হরানন্দজী — জানেন, আমি পূর্বাশ্রমে একটি চতুষ্পাঠী স্থাপনের চেষ্টা করেছিলাম। পণ্ডিত পাওয়াই দুষ্কর। যদিও পণ্ডিত পাওয়া যায়, অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের বিনিময়ে সংস্কৃত পড়তে চায় এরূপ ছাত্র পাওয়া দুর্ঘট। প্রত্যেক মেধাবী ছাত্র এবং তাদের মাতা-পিতা বিজ্ঞান-শিক্ষার নামে লোভনীয় চাকরীর আলেয়ার পিছু করতে করতেই গলদঘর্ম হচ্ছে। প্রত্যেকের মনোভাব এই যে স্কুল কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে পড়বার সুযোগ না পেলে তাঁদের সন্তানদের জীবন বুঝি-বা ব্যর্থ হয়ে গেল।

আমি যখন কলেজে পড়ি, তখন আমাদের ক্লাসে প্রায় একশত ছাত্র ছিল। তার মধ্যে ৮০ জনই দ্বিতীয় ভাষা রূপে সংস্কৃত নিয়েছিল। একটি মুসলমান ছাত্র আমাদের চেয়ে সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠ ছিল। তাকে আমরা শাস্ত্রী বলে ডাকতাম। পরে সে সংস্কৃত অনুবাদকের কাজ নিয়েছিল। প্রতিটি বক্তৃতা সভায় সে সংস্কৃতে বক্তৃতা দিত

এবং প্রথম পুরস্কার পেত। ব্রাহ্মণ ছাত্ররা বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে তাকিয়ে থাকত। সুতরাং সংস্কৃতে কেবল ব্রাহ্মণদেরই অধিকার, আর কেউ সংস্কৃত শিখতে পারে না, এ কথা বলা ভুল।

আমি তখন বললাম — কয়েক বৎসর পূর্বে পিতাঠাকুরের সঙ্গে জ্যোতির্মঠের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য পরমপূজ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দ জীউর পাদ-পদ্ম দর্শনের জন্য কানপুরে গিয়েছিলাম। সেখানে সনাতন ধর্ম কলেজের মাঠে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল সহ মন্ত্রীবর্গ এবং হাজার হাজার সাধু-সন্যাসী পণ্ডিতবর্গের উপস্থিতিতে তিনি যে ভাষণ দিয়েছিলেন, এখন আমার তা মনে পড়ছে।

এক মৈথিলী সাধু এক বৈষ্ণব-মঠে ভিক্ষা পাবার আশায় গিয়েছিলেন। তাঁর কপালে স্বসম্প্রদায়ের ত্রিপুণ্ড্র ছিল। ভোজন তো দূরের কথা, তাঁর সঙ্গে কেউ বাক্যালাপও করেন নি। সাধুটি বড় রহস্য প্রিয় এবং রসিক ছিলেন। তিনি কিছুদিন পরে কপালে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের তিলক লাগিয়ে ঐ মঠে পুনরায় উপস্থিত হলেন। মঠস্থ বাবাজীগণ এইবার তাঁকে যথেষ্ট সমাদর পূর্বক প্রসাদ দিলেন, ধর্মবিষয়ক আলাপ আলোচনা করলেন। শুধু তাই নয়, নবাগত সাধুর বৈষ্ণবীয় তিলক-ধারণের ঘটা দেখে মঠস্থ বাবাজীগণ এতই মুগ্ধ হলেন যে, তাঁহারা অগ্রিম-আশ্বাস দিলেন, অতঃপর মঠে আসলেই প্রসাদ পেতে সাধুর আর কোন অসুবিধা হবে না।

পূর্বেই বলেছি সাধুটি রহস্য প্রিয়। তিনি পরদিন হতেই পেটের উপর বড় বড় বৈষ্ণবীয় তিলক লাগিয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন। লোকে তাঁর ঐরূপ বিচিত্র তিলক-সেবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সাধু বলতেন — 'হম তো বাস্তব মেঁ মৈথিলী হৈ, মস্তিষ্ককে চিহ্ন সূচিত হি করতে হৈ। পরন্তু ইন বৈষ্ণবী চিহ্নোঁসে উদর পূর্তি হুই থী, সো ইনকো পেটপর লগায়ে হৈ।'

পরমারাধ্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী ঐ গল্পটি বলে উপসংহারে বললেন, 'পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা তো উদর কী বস্তু হৈ, মস্তিষ্ককো নহীঁ। অংগ্রেজী (ইংরেজী) পেট মে রাখো, মস্তক মেঁ সংস্কৃত রাখো। পেটকো লিয়ে অংগ্রেজী, পরন্তু জ্ঞানকো লিয়ে সংস্কৃত পড়না চাহিয়ে। সংস্কৃত হী ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষকা বীজক হৈ। বীজক কী রক্ষা আবশ্যক হৈ, আপনে ঘর কী নিধিসে লাভ উঠাও।'

দুর্ভাগ্যের বিষয় ধর্ম-সম্রাট জগদ্‌গুরুর এই মহাবাক্যে কেহ কর্ণপাত করছে না। পোড়া পেটের চিন্তায় সবাই কাতর।

আজকাল আমাদের চারদিকে ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং, এবং সায়েন্সের উচ্চতম ডিগ্রীধারী যেসব মানুষগুলি দেখি, তাঁদের জীবন ও জীবিকা বিচার করলেই বোঝা যাবে — হায় রে বিজ্ঞানের দীপশিখা কিভাবে সেখানে আলো দিচ্ছে! আমার জানা দু'জন ইঞ্জিনীয়ারিং ছাত্রের কথা শুনুন। দুজনেই ইঞ্জিনীয়ারিং এর প্রথম শ্রেণীর ডিগ্রীধারী, একজনকে নানারকম সরকারী ফাইলের স্তূপে ডুবে থাকতে হয়। আর অন্য জন? কোথাও তিনি যোগ্যতার অনুরূপ সমাদর না পেয়ে একের পর এক চাকরী ধরলেন, ছাড়লেন এবং পরে বেকারীর জ্বালা সহ্য করতে না পেরে হোমিওপ্যাথি পড়ে দিনভোর নক্স-ভমিকা আর পালসেটিলার পুরিয়া মুড়ছেন।

অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও আছে। সায়েন্স পড়ে অনেকে কৃতী হয়েছেন, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, কেউ কেউ চিকিৎসাবিদ্যা, কারিগরীবিদ্যা এবং বিজ্ঞানের নানা শাখায় উল্লেখযোগ্য অবদানও রাখছেন সেকথা আমি জানি এবং মানি। বিজ্ঞান বা কারিগরী বিদ্যাকে আমি মোটেই ছোট করে দেখছি না। আমার বলার উদ্দেশ্য হল, সায়েন্স পড়লেই জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির স্বর্ণদ্যুতি ঠিকরে পড়বে আর সংস্কৃত পড়লেই জীবনে অন্ধকার নেমে আসবে এটা একেবারেই অসার কথা, বোকাদের কথা। তুলনামূলক বিচারে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের মধ্যেই বেকারীর সংখ্যা অনেক কম , তাঁরা আলিবাবার মত হঠাৎ স্তূপীকৃত মোহরের সন্ধান হয়তো খুঁজে পান না, কিন্তু যে কোনভাবে হোক, তাঁরা শ্রদ্ধা ও সম্মানের সঙ্গে মোটা ভাত-কাপড়ের ব্যবস্থা করে নিয়েছেন। একজন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতকেও আজ পর্যন্ত দেশ ছেড়ে বিদেশে স্বর্ণ-মৃগের পিছনে ছুটতে হয়নি। কিংবা কৃতী বৈজ্ঞানিক ডঃ জোসেফের মত অভাব এবং ব্যর্থতার জ্বালায় আত্মহত্যাও করতে হয় নি।

এহ বাহ্য। মোটা বেতনের মনসবদারী সংগ্রহ করাই কি লেখাপড়ার উদ্দেশ্য? অন্ততঃ ভারতের আদর্শ তা নয়। জ্ঞানের তপস্যা, অমৃতের তপস্যা, সরল এবং অনাড়ম্বর জীবনচর্চা — এটাই হল আমাদের আদর্শ, আমাদের উত্তরাধিকার। ঋষিদের কথায় শুচিতায় শুভ্র, জ্ঞানে দীপ্ত, সুখে তৃপ্ত, সুস্থ এবং স্বচ্ছ জীবনই শান্তিলাভের সিদ্ধ বীজ।

আমার এই সাধারণ ক্ষুদ্র জীবনে অত বড় আদর্শবাদের কথা মানায় না। অপরকে না মানাক, কিন্তু যে বংশে আমার জন্ম সেই বংশের ধারা বা ঘরানার কথাটা আমাদের ভাবতে হবে এবং ভাবা উচিত বলে আমি মনে করি। আমার পিতামহ ছিলেন সংস্কৃত ভাষার মুগ্ধ পূজারী। সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগ আমার অগ্নিহোত্রী পিতার রক্ত কণিকায় মিশে ছিল, তিনি প্রায়ই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করতেন,

যুস্মাকং কুলপূর্বজাঃ স্থিরধিয়ো মৎ সেবয়া দুর্লভম্
আবিষ্কৃত্য নবং নবং বহুবিধং তত্ত্বং বিচিত্রং পুরা।
নিঃস্বার্থ নিয়তং প্রচার্য জগতাং শিক্ষাগুরুত্বং গতা
বৎসাঃ! পূর্বপথানুগা ভজত রে! মাং কামধেনুপমাম্।
পাশচাত্ত্যো বহুশিক্ষিতা অনুদিনং মৎ সেবয়া তীব্রয়া
বিজ্ঞানে গণিতে রসায়নবিধৌ শিল্পে চ বাস্তুক্রমে।
দুর্বারাস্ত্র বিনির্মিতৌ স্থলজল — ব্যোমাদিযানোন্নতৌ
প্রাপ্তা শ্রেষ্ঠপদং সমীক্ষ্যতনয়া! গৃহীত সেবাব্রতং॥

অর্থাৎ সংস্কৃতের প্রতি আমাদের বিরাগ দেখে সংস্কৃত-জননী যেন আক্ষেপ করে বলছেন, পুত্রগণ! তোমাদের ধীমান পূর্বপুরুষেরা আমার সেবা করেই প্রাচীনকালে নানাবিধ নূতন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন এবং সেই তত্ত্ব প্রচার করে জগতে শিক্ষাগুরুর পদে সমাসীন হয়েছিলেন। আমাকে তোমরা কামধেনু বলে জেনো। তোমাদের পূর্বপুরুষদের মত নিঃস্বার্থ ভাবে আমার সেবা করলে তোমাদের সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হবে। চেয়ে দেখ, পাশচাত্ত্য দেশের বহু শিক্ষিত ব্যক্তি তীব্র অনুরাগ ও নিষ্ঠার সঙ্গে আমার চর্চা করে বিজ্ঞান, গণিত, রসায়ন, শিল্প এবং বাস্তু বিদ্যায় (Engineering) পারদর্শিতা লাভ করেছেন। এমন কি, নানাবিধ দুর্বার অস্ত্র থেকে আরম্ভ করে স্থল-জল-গগন-বিহারী ব্যোমাদিযান আবিষ্কারের কৌশলও আয়ত্ত করে জগতে শ্রেষ্ঠ পদ অর্জন করেছেন।' ভাবার্থ হল, সংস্কৃত ভাষার চর্চা করলে বৈজ্ঞানিক কলা-কৌশল আয়ত্ত করাও সম্ভব হয়, সংস্কৃতকে অবজ্ঞা করা উচিত নয়।

আর অর্থ? সে সম্বন্ধে জ্যোতির্মঠাধীশ ধর্ম-সম্রাট ব্রহ্মানন্দজীর একটি উপদেশ মনে পড়ছে। তিনি বলতেন, 'ধন সংগ্রহ কী চিন্তা করনা ব্যর্থ হৈ। যদি সন্তান যোগ্য হৈ উহ্ স্বয়ং প্রারব্ধবান হোগী। উস্‌কে লিয়ে পূর্ব-সঞ্চিত ধন ন রহে ঔর উস্‌কা আপনা কামাই ন ভি হো তো উহ্ দুঃখী নহী রহেগী। ঔর যদি সন্তান অযোগ্য হৈ তো সঞ্চিত কা তথা আপনা কামাইকা দুরুপযোগ করকে পাপকা সংগ্রহ করেগী, উসকা পরিণাম মেঁ ঔর কষ্ট ভোগেগী। বিদ্বান্ হোনে সে ভি প্রারব্ধ কা বারেমে অর্থাগম নহী হো সকতী। সদৈব ইয়াদ রাখনা যৎ ভোগ্যম্ তৎ অবশ্য প্রাপ্তব্যম্।'

এই প্রসঙ্গে বাবার জীবনের একটি ঘটনা বলছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে যখন সর্বত্র ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠেই বহু ব্যাঙ্ক লালবাতি জ্বাললো, তখন বাবার ভয়ানক আর্থিক বিপর্যয় ঘটে। সেই সময়েই কংসাবতীর প্রলয়ঙ্করী বন্যায় আমাদের বাড়ী ঘরও ধুলিসাৎ হয়ে যায়। সেই দুঃসময়ে ভূতগেড়িয়া গ্রামের অপুত্রক রাখালবাবু বাবাকে ২০০ বিঘা ধান জমি এবং নগদ বহু টাকা দান করতে চেয়েছিলেন। আমার মাতামহ সেই দান গ্রহণ করার জন্য বাবাকে খুব পীড়াপীড়ি করেছিলেন। বাবা তখন উত্তর দেন, 'মনে রাখবেন আমি লোভী বামুনের ছেলে নই। আমি ত্যাগীর সন্তান। জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি। আমি তাঁকেই ডাকবো যাঁর দয়ায় সব অভাব দূর হয়। আমার গুরুর মহাবাক্য — যৎ ভোগ্যম্ তৎ অবশ্য প্রাপ্তব্যম্।' সংসার যে আমাদের গুরু এবং পরম শিক্ষার স্থল তা প্রতিমুহূর্তে অনুভব করছি। গুরুদেব বলেছেন, সংসারের তাপ সহ্য করাই আসল তপস্যা, কাজেই সেই তাপ সহ্য করেছি, কখন কখনও এই তাপকে পঞ্চতপা কালে প্রজ্বলিত অগ্নির মধ্যস্থলে বসলে শরীরে যে দাহ লাগে, সেই দাহের মতই দুঃসহ বলে মনে হচ্ছে। গিরি গুহা বা জঙ্গলে থেকে তপস্যা করার চেয়ে শম দমাদি বৃত্তি স্থির ও শান্ত রেখে সংসারের মধ্যে তপস্যা করা নিশ্চিতরূপেই কঠিনতর। শ্রীগুরুর জয় হউক।

এইরকমই ছিলেন আমার বাবা, যিনি শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও নিজের দৈনন্দিন শাস্ত্রচর্চা এবং ধর্মনিষ্ঠা বজায় রেখেছিলেন। একেই আমি 'ঘরানা' বলছি। বাবার আদর্শকে বুকে ধরেই শাস্ত্র অধ্যয় এবং সরল

অনাড়ম্বর জীবন ধারাটি আমাদের বজায় রাখতেই হবে। আমি বিশ্বাস করি সংস্কৃত-চর্চার মধ্যেই আমাদের সমূহ ইষ্ট। সংস্কৃত অধ্যয়ন প্রত্যেক মানুষের জীবনে একটা মূল্যবান সঞ্চয়।

বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত আপিস-আদালতের ঘানিতে কলম পিষতে পিষতে যখন প্রাণ-রস নিঃশেষ হয়ে যায়, তখনই সেই ক্ষয়রোগের একমাত্র প্রতিষেধক হল সংস্কৃতের অক্ষয় ভাবসম্পদ। বস্তুতঃ ভারতবর্ষের শিক্ষা সংস্কৃতির মণি-মঞ্জুষাই হল সংস্কৃত শাস্ত্র। ভারতের প্রাণ-স্রোতটিকে যদি একটা নদীর সঙ্গে তুলনা করা হয়, সেই নদীর বেগ এবং গতিধারাকে নিত্য বহমান রেখেছে এই ভাষা। সংস্কৃতের সঞ্জীবনী সুধারসই হল ভারতের জীয়ন-কাঠি। সংস্কৃত চর্চাকে যেদিন থেকে দেশের মানুষ অবহেলা করেছে, 'মৃত ভাষা' বলে নাসিকা কুঞ্চন করতে শিখেছে, সেইদিন থেকেই এদেশের দুর্ভাগ্যের বোঝা শুরু। সাধারণ লোকে সংস্কৃতকে কতকগুলি পূজার্চনা এবং নিছক ধর্মচর্চার প্রাণহীন মন্ত্র বলে ধরে নিয়েছে। কিন্তু ইতিহাস পড়লে দেখা যায়, সেই সুদূর অতীত ৮১০ খৃষ্টাব্দে আরবের জ্ঞানীরা সংস্কৃত ভাষার কদর বুঝতে পেরেছিলেন। 'বায়ত্-অল-হিক্‌মা' বা জ্ঞানের আগার নাম দিয়ে তাঁরা শত শত সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করে তার চর্চা এবং গবেষণা শুরু করে দিয়েছিলেন। আরব-সংস্কৃতি থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতা পুষ্ট হয়েছে আর আরব সভ্যতা বিকাশ লাভ করেছে এই সংস্কৃত তথা ভারতীয় সংস্কৃতির দৌলতে। ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানী চরক ও সুশ্রুতের লেখা চিকিৎসা-শাস্ত্র, আর্যভট্টের জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত, ব্রহ্মসিদ্ধান্ত, শ্রীধর ও ভাস্করাচার্যের অঙ্কশাস্ত্র প্রভৃতি অনুবাদ করে আরবরাই ঐ সমস্ত বিজ্ঞানের তত্ত্ব আয়ত্ত করেন। আমাদের 'কথাসরিৎসাগর' নামক গ্রন্থটিকে আরবী ভাষায় অনুবাদ করে তাঁরা এর নাম দিয়েছিলেন 'আলিফ-লায়লা-ও-লায়লা'। পারসী ভাষায় এই গ্রন্থের নাম হয়, 'হাজারদস্তান' বা সহস্র কাহিনী। শুধু কি আরব? চীন, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি এবং ইউরোপের অন্যান্য সব দেশেরই কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, জ্যামিতি শাস্ত্র, রসায়ন ও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখা, স্থাপত্য, ভাস্কর্য — এক কথায় যে সব শাস্ত্রের অবদানে বর্তমান সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তার মূল উৎস হল এই সংস্কৃত।

কোন্ দেশে বা কোন্ ভাষায় আজ পর্যন্ত ব্যাস বাল্মীকির মত মহাকবি, কালিদাস ভবভূতির মত কবি, শূদ্রকের মত নাট্যকার, বিষ্ণুশর্মার মত গল্পলেখক, যাজ্ঞবল্ক্য, গৌতম, শঙ্কর প্রভৃতির মত দার্শনিক, পাণিনি কাত্যায়নের মত বৈয়াকরণ, পিঙ্গলের মত ছন্দ-শাস্ত্রজ্ঞ, আর্যভট্ট, বরাহমিহির, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মত গণিতজ্ঞ, চরক সুশ্রুতের মত চিকিৎসা-বিজ্ঞানী, কৌটিল্যের মত অর্থশাস্ত্রকার এবং নাগার্জুনের মত রসায়নবিদ জন্মগ্রহণ করেছেন? পঞ্চম শতাব্দীতে আর্যভট্ট সংস্কৃত পড়েই সর্বপ্রথম পৃথিবীর আবর্তন জনিত দিবা-রাত্রির ভেদ আবিষ্কার করেছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভাস্করাচার্য সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানী নিউটনের বহুপূর্বেই, পৃথিবীর উপর থেকে সকল বস্তু পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যই মাটিতে পড়ে থাকে, একথা বলেছিলেন। এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা এবং শূন্যের (০) সাহায্যে অঙ্ক লেখার প্রণালী, পাটীগণিতের যোগ বিয়োগ গুণ ও ভাগের পদ্ধতি সংস্কৃতসেবী হিন্দুরাই জগৎকে শিক্ষা দিয়েছেন। ব্রহ্মগুপ্ত এবং পদ্মনাভ প্রণীত 'ব্যক্ত গণিত' থেকেই আধুনিক পাটীগণিতের সৃষ্টি। বীজগণিতও সংস্কৃত শাস্ত্রের দান। শ্রীধর ও ভাস্করই সর্বপ্রথম অজ্ঞাত রাশির সাহায্যে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এজন্য তাঁরা বীজগণিতের নাম দেন 'অব্যক্ত গণিত'। মহম্মদ-বেন-মুসা আমাদের কাছ থেকে বীজগণিত শিক্ষা করেন এবং আরবদের কাছ থেকেই ইউরোপ বীজগণিতের প্রথম পাঠ লাভ করে। আরবী 'এলজিব্‌র' থেকেই ইংরেজী Algebra শব্দের উৎপত্তি। আরব-মনীষী এই ঋণের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদের অঙ্কশাস্ত্রের নাম দিয়েছিলেন হিসাব-উল্-হিন্দ অর্থাৎ হিন্দুস্থানের গণনা পদ্ধতি।

বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখাতেও সংস্কৃত জানা পণ্ডিতরা যে বিস্ময়কর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্র আলোচনা করতে গিয়ে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতরাই বিষুবরেখা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য এবং চন্দ্র-সূর্য গ্রহণের কার্যকারণ তত্ত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। 'চলা পৃথ্বী স্থিরা ভাতি ব্যোম্নি সচলো তিষ্ঠতি' — পৃথিবী নিজের কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, পৃথিবীর আবর্তনের জন্যই দিবারাত্রির ভেদ হয়, এই যুগান্তকারী তত্ত্ব কপারনিকাসের জন্মের বহু পূর্বেই সংস্কৃত পড়ুয়া আর্যভট্ট আবিষ্কার করেন। শুধু কি তাই? সোনা ও লোহার যৌগিক পদার্থ প্রস্তুত প্রণালী, পারদ ও গালার নানারকম রাসায়নিক ক্রিয়াকৌশল, জাহাজ ও নৌকা তৈরীর নানারকম কারিগরী বিদ্যা অতীতকালে সংস্কৃতের পণ্ডিতরাই আবিষ্কার করেছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের History of Hindu Chemistry এবং মনীষী রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের

History of Indian Shipping বই পড়লে বিজ্ঞান সাধনায় সংস্কৃতের দান যে কি অপরিমেয় তার বিশদ পরিচয় পাওয়া যাবে। কাজেই যাঁরা বলেন, 'সংস্কৃত মৃত ভাষা এবং সংস্কৃত জানলে সায়েন্স জানা যায় না', তাঁরা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত এবং একদেশদর্শী।

আজ ঔসনশ-তীর্থে তৃতীয় দিন। বেশ আনন্দেই কাটছে। গা-হাতের ব্যথা প্রায় নেই বললেই চলে। ভোরে উঠেই নর্মদাতে স্নান করে এলাম। যথারীতি খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রামের পর পুরোহিতজী এলেন আমাদের সঙ্গে গল্প করতে। কথায় কথায় জানালেন — হম্ কাশীজীমেঁ মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজজীকে ছাত্র থা। কাশীমেঁ বহুৎ বাঙালী সজ্জন হমারে দোস্ত থা। বাংলা থোড়া বহুৎ হম্ সমজ্তে হেঁ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথজীকো দো চারঠো কেতাব ভি হম্ পড়া।

পণ্ডিতজী আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — একবার কলকাতায় ক্রুশ্চেভ এবং বুলগানিনের সভা হয়েছিল। আমি সেই সভায় যোগ দিয়েছিলাম। লক্ষ লক্ষ জনতার এরকম সমাবেশ আমি জীবনে কোনদিন দেখিনি। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মত লক্ষ লক্ষ জনতার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল ব্রিগেড-প্যারেড-গ্রাউণ্ডের চারপাশে। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ব্যক্তিত্বকে আমাদের স্বীকার করতেই হবে। তাঁর অনুরোধে এতবড় বিরাট বিশাল জনতা শান্তভাবে ধারণ করে। রুশ নেতাদের বক্তৃতা শুরু হয়।

আমার মনে যেটি বিস্ময় সৃষ্টি করেছে, সেটি হল এই — রাশিয়ার নেতৃদ্বয় রুশভাষায় যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল যেন কোন সংস্কৃতে ভাষণ শুনছি। অর্থ দুর্বোধ্য কিন্তু তার ধ্বনি ও rythm আমার কানে সংস্কৃত মন্ত্রের মত শোনাচ্ছিল। তাঁদের বক্তৃতা দোভাষীর অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন কিন্তু তার বিন্দুবিসর্গও আমার কানে ঢোকেনি। আমার কানে তাঁদের মূল ভাষার উচ্চারণ ভঙ্গীটিকে কেবলই সংস্কৃতের অনুরূপ বলে মনে হচ্ছিল। এটি কি করে সম্ভব? রুশ ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের মিল কিভাবে থাকতে পারে? সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি আমাদের ভারতবর্ষে। রাশিয়া এখান থেকে বহু দূর। উভয় দেশের মধ্যে ভাষাগত সংস্কৃতিগত দুস্তর ব্যবধানও বর্তমান। তবে এ কি আমার শোনার ভুল? নয় যে, আমি সংস্কৃত ভাষা জানি, ফলে আমার অবচেতন মন রুশভাষার মধ্যে সংস্কৃতের ধ্বনিগত সাদৃশ্য আরোপ করে বসেছি। আমি স্পষ্ট শুনেছি, একজন সংস্কৃত পড়লে যেমন শোনায়, তেমনি সেদিন রুশ-নায়কদের ভাষণও আমার কানে সেইরকমভাবেই প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল।

তুমি তোমার পণ্ডিত পিতার কাছে সংস্কৃতের পাঠ নিয়েছ! সত্যিই কি রাশিয়ান ভাষার সঙ্গে সংস্কৃতের কোন মিল আছে?

আমি — হ্যাঁ অবশ্যই মিল আছে। কারণ সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর সকল ভাষারই আদি জননী এবং রুশভাষা সংস্কৃত হতে জাত। সেই স্মরণাতীত কাল হতে আমাদের সংস্কৃত ও সংস্কৃতি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত আলোক ও অমৃতের বার্তা বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। তাইচুং সম্রাটদের মহাচীন, আরব খলিফাদের যাদুপুরী বাগদাদ, রোমান সম্রাট অগাষ্টাইনের ঐশ্বর্যময়ী রোম ও আলেকজান্দ্রিয়া, আসিরীয় সাম্রাজ্য, শ্যাম, কম্বোজ, চম্পা, ইন্দোচীন, শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যভুক্ত সুবর্ণদ্বীপ-এমন কোন দেশ, দেশ-ই বা ছিল যেখানে আমাদের মহান পূর্বপুরুষদের পদধূলি পড়েনি? আমাদের পূর্বপুরুষরা এসব দেশে শুধু উপনিবেশ গড়েননি, সেই সব দেশের শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য, ভাস্কর্য, ভাষালিপি সব কিছুর উপরই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। শুধু প্রভাবই বা বলি কেন, আমাদের ভাব, ভাষা, লিপিই অনেক দেশেই সাজসজ্জা বদলিয়ে আজও সগৌরবে বিরাজমান আছে। বর্তমান ঐতিহাসিকরা হেরোডেটাস এবং প্লিনিও এই কথা স্বীকার করে গেছেন।

কাজেই বর্তমান ভারতবর্ষ থেকে বর্তমান রুশদেশের মধ্যে দূরত্ব আছে বলে ব্যবধান নিয়ে আপনার কোন দুশ্চিন্তার কারণ নাই। ব্যবধান থাকলেও একদেশের ভাষা অন্য দেশের ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে। তাছাড়া বর্তমান যে ভৌগোলিক বাধা বা ব্যবধান দেখছেন, এইরকম অবস্থা চিরকাল ছিল না। বর্তমান পৃথিবীর যে রূপটি আমাদের চোখে পড়ে সুদুর অতীতে তা অন্যরকম ছিল। বর্তমান ভারতবর্ষের যে মানচিত্র আমরা চোখে দেখি, সেযুগে তা ছিল ব্রহ্মাবর্তবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, কিম্পুরুষবর্ষ (তিব্বত), হিমবর্ষ (হিমালয় সহ হিমবন্ত প্রদেশ) এবং নিষধবর্ষের যুগ্মরূপ; চীনের নাম ছিল ইলাবৃতবর্ষ, কোরিয়ার নাম কুরুবর্ষ এবং বর্তমান রাশিয়ার ভৌগোলিক রূপটি ছিল কেতুমালবর্ষের কিয়দংশ সহ হিরন্ময়বর্ষ এবং রম্যকবর্ষের সমষ্টি। আবার বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত

উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন তাঁর 'মানবের আদি জন্মভূমি' নামক পুস্তকে দেখিয়েছেন যে, উত্তরকুরু ছিল ব্রহ্মার তপস্যাক্ষেত্র এবং যথাক্রমে হিরন্ময়বর্ষকে তপোলক, রম্যকবর্ষকে মহর্লোক, ইলাবৃতবর্ষ, নিষধবর্ষ ও কিম্পুরুষবর্ষকে স্বর্লোক, বর্তমান ভারতের রূপরেখাকে ভূর্লোক এবং কেতুমালবর্ষকে ভুবর্লোক প্রভৃতির ভৌমরূপ বলে ধরা হত। বলা বাহুল্য, এই বিরাট ভূভাগ জুড়ে একই বৈদিক সংস্কৃতির ধারা অব্যাহত ছিল।

এ কথা সবাই জানেন যে, বেদ ও বৈদিক জ্ঞানের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। কাজেই একটি অখণ্ড সংস্কৃতির ধাত্রীরূপে ভারতের ভাষাগত ভাবগত লিপিগত মিল স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠতে কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ সংস্কৃত ভাষা পৃথিবীর সকল ভাষারই আদি জননী এবং রুশভাষা সংস্কৃত হতেই জাত। কালক্রমে অবশ্য নানা সাংস্কৃতিক বিপর্যয় এবং রাজনৈতিক উত্থান পতনের ফলে ঐ বিরাট ভূভাগ নানাভাবে ভেঙেছে এবং গড়েছে। বর্তমান বহিরঙ্গ রূপের নানা transformation এবং transfiguration হল তারই অনিবার্য পরিণতি। এইভাবে বহিঃপ্রকৃতির রূপান্তর হলেও অন্তরঙ্গস্তরে আজও যে একটা মিলনের ফল্গুধারা এবং সাদৃশ্যের গুহায়িত স্বর্ণরশ্মি রয়ে গেছে, একটু অনুসন্ধান করলেই যে সেই যোগসূত্রটি পাওয়া যাবে, একথা আমি বরাবরই বিশ্বাস করতাম। কোন যুক্তি দিয়ে বুঝাতে না পারলেও এই ধারা এক সময় আমাকে অন্ধভাবে পেয়ে বসেছিল। কিন্তু ধারণা বা অনুমান তো প্রমাণ নয়।

কিন্তু একদিন দৈবক্রমে আমার জীবনে এমন একটা রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ঘটে গেল যার ফলে আমার ঐ ধারণা দৃঢ় প্রত্যয়ের রূপ নিয়েছে। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের পাঠচক্রে বসে আছি। কলিকাতা হতে এসেছেন ইণ্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল ক্লাবের সেক্রেটারী পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ শাস্ত্রী। আলেক্সাই ডিমিট্রেভ নামে একজন গবেষক রাশিয়ান ছাত্রও তাঁর এক বন্ধু সহ এসেছেন মহামনীষী গোপীনাথের কাছে এবং ডিমিট্রভের জিজ্ঞাসিত প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই তিনি প্রবচন করছিলেন। আমরা সবাই গোপীনাথের অনবদ্য আলোচনা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। হঠাৎ নীচে রাস্তার ধারে একটা গোলযোগ শোনা গেল। ডিমিট্রভের বন্ধু বারান্দা দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে গেলেন গোলমালের হেতুটা কি। ফিরে এসে তিনি ডিমিট্রভকে রুশ ভাষায় কিছু বললেন। ডিমিট্রভ আমাদেরকে তর্জমা করে জানালেন যে পাশের বাড়ীর একজন বৃদ্ধা মহিলা একজন বিধবা ভিখারিণী আর তার দুটো ছেলেকে কিছু মাংস ও মধু দিচ্ছেন। তারা আরও বেশী চায়, তাই গোলমাল হচ্ছে। (তালের বড়া ও গুড়কে ঐ রাশিয়ান ভদ্রলোক মাংস ও মধু বলে ভুল বুঝেছিলেন) যাইহোক গোলমালের কারণটা ত জানলাম কিন্তু ডিমিট্রভের বন্ধু যে মিষ্ট ভাষায় বন্ধুকে কথাগুলি বললেন ওটা আমাদের কানে সংস্কৃতের মতই শোনাল। আমরা আর একবার ঐ কথাগুলি তাঁর মাতৃভাষায় উচ্চারণ করতে অনুরোধ করলাম। তিনি কেটে উচ্চারণ করলেন —'স্তেবেয়া মাতি দোয়েত সয়োদ সমাংসম্ এতয়ে বিধয়ে উবাব্যাম্ সিগেভ্যাম্'। বিশুদ্ধ রুশ ভাষায় এর অর্থ হল, একজন বুড়ী মা একটি বিধবা ও তার দুটি ছেলেকে কিছু মাংস সহ মধু দিচ্ছেন।

কথাগুলি শোনামাত্রই মূল ভাব ও অর্থ বজায় রেখে গোপীনাথ সংস্কৃতে উচ্চারণ করতে লাগলেন, 'স্থবিরা মাতা দদাতি মধু সমাংসম্ এতস্যৈ বিধবায়ৈ উভাভ্যাম্ চা সুনুভ্যাম্।

উভয় ভাষার অর্থগত ধ্বনিগত এবং ভাবাগত এই মিল দেখে আমরা আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার পক্ষে এটা যেন একটা startling revelation. সঙ্গে সঙ্গে আলোচনার মোড় ঘুরে গেল। সংস্কৃতের সঙ্গে রুশ ভাষার কোথায় কোথায় সাদৃশ্য আছে কয়েকদিন ধরে তারই আলোচনা চলতে লাগল। ডিমিট্রভের যে কোন একটি শব্দ উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অনুরূপ সংস্কৃত শব্দটি একবার গোপীনাথ বলেন তো আরেকবার জবাব দেন পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ। আচার্য গোপীনাথ এবং দুর্গাপ্রসাদ দুজনেই রুশ ভাষায় অভিজ্ঞ, দুজনেই সংস্কৃতের দিক্‌পাল পণ্ডিত। ডিমিট্রভ এমন একটি শব্দও বলতে পারেন নি যেটি সংস্কৃত হতে জাত নয় বা সংস্কৃতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য নাই।

ডিমিট্রভের কাছে শুনেছিলাম, ক থেকে ম পর্যন্ত এই ২৫টি সংস্কৃত বর্ণের মধ্যে রুশ ভাষার ৯টি alphabet নাই।

'হ' বর্ণটি আদৌ নাই। তার ফলে রাশিয়ানরা হলাণ্ডকে বলে গোল্যাণ্ড (Golland), হিন্দীকে জিন্দী (Xindi) এবং হিমালয়কে বলে জিমালয় (Zimalaya)।

আমাদের আচার্য পাণিনি কিম্, তৎ, অন্য, সর্ব প্রভৃতি সর্বনাম পদে 'দা' যোগ করে সেগুলিকে ক্রিয়ার

বিশেষণরূপে ব্যবহার করেছেন। রুশ ভাষাতেও 'দা' যোগ করে ঐভাবে কতকগুলি শব্দ গঠন করা হয়েছে। আমি ঐ শব্দগুলির সঙ্গে ডিমিট্রিভের কাছ হতে আহৃত আরও কতকগুলি শব্দ পর পর সাজিয়ে দিচ্ছি। বিচার করে দেখুন, সেই প্রাচীন যুগে ব্রহ্মাবর্তের ভাষা কেতুমালবর্ষ হতে হিরন্ময়বর্ষ পর্যন্ত (রাশিয়াতে) প্রচলিত ছিল কি না ঃ

		সংস্কৃত	রুশ	অর্থ
সর্বনাম কিম (দা যোগ করে)		কদা	কগ্দা	কখন
তৎ	ঐ	তদা	তগ্দা	তখন
অন্য	ঐ	অন্যদা	এনগ্দা	অন্য কোন সময়
সর্ব	ঐ	সর্বদা	বেসগ্দা	সবসময়
		বিনা	বিনে	ছাড়া/ব্যতীত
		স্বসৃ	স্বেস্	বোন
		দ্বার	দ্বের	দরজা
		অভ্রক	অবলক	মেঘ
		দরি	ডালিনা	গুহা
		শ্রুয়	শ্লুয়	শ্রবণ করা

উপরের স্বসৃ শব্দটির প্রয়োগ দেখলে কোনই সন্দেহ থাকবে না যে, মূল সংস্কৃত ভাষাই কালক্রমে পরিবর্তিত আকারে রুশ ভাষার রূপ নিয়েছে।

একটা উদাহরণ দিই। 'এই দুজন আমার বোন আর ঐ দুজন তোমার বোন' — এই বাংলা বাক্যটিকে সংস্কৃতে প্রকাশ করতে গেলে বলব — 'এতে দ্বে মে স্বসারৌ তু উভে চ তে স্বসারৌ।' রাশিয়ানরা তাদের মাতৃভাষায় ঐ একই কথা বলতে গেলে বলবেন — 'এতে দ্বে ময়ে স্বেষ্ট্রি তু ওবে ত্বয়ে স্বেষ্ট্রি'। এখানে দেখুন 'এতে' 'দ্বে' 'তু' — এই তিনটি শব্দ উভয় ভাষার একই বচনে একই বিভক্তিতে একই রূপে প্রকাশ রয়েছে। কেবলমাত্র 'উভে' শব্দটি হয়েছে 'ওবে' আর 'স্বসারৌ' শব্দটি হয়েছে 'স্বেষ্ট্রি'। অর্থ কিন্তু একই রয়েছে। এমনকি বচনে ও বিভক্তির মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। সংস্কৃতে 'স্বসৃ' শব্দের প্রথমার দ্বিবচনে স্বসারৌ আর রুশভাষার মূল স্বেস্ শব্দেরও প্রথমার দ্বিবচনে হল স্বেষ্ট্রি। স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে — সামান্য রূপান্তর হলেও ব্যাকরণগত নিয়মের কোন বড় রকম তারতম্য নাই। এছাড়া এমন আরও অনেক শব্দ আছে যেগুলির বিন্দুমাত্র অদল বদল ঘটেনি। যেমন 'বাহিনী'। 'বাহিনী' অর্থে সৈন্যদল বুঝি, রাশিয়ানরাও Army অর্থে সৈন্যদলকে বাহিনী বলে।

এগুলেও বিপদ পিছুলেও বিপদ, সামনেও শত্রু পিছনেও শত্রু — এইরকম কোন প্রাণান্তকর অবস্থা বুঝবার জন্য সংস্কৃতে একটি প্রসিদ্ধ বচন আছে — পূর্বে অগ্নিঃ পশ্চাৎ ধূমঃ। রুশ ভাষাতেও ঐরকম উভয়সঙ্কট বুঝাবার জন্য বহু প্রচলিত বাগ্‌বিধিটি শুনুন। তাঁরা বলেন 'পূর্বে অগন্ পাতম্ দিয়াম্। অগন্ হল Fire আর দিয়াম হল smoke।

এইভাবে যখন রুশ এবং সংস্কৃত ভাষার তুলনামূলক বিচার করে আচার্য গোপীনাথ উভয় ভাষার সাদৃশ্য দেখাচ্ছিলেন, তখন একজন ভদ্রলোক আপত্তি করে বললেন, 'শব্দগত অর্থগত মিল থাকলেই এদেশের ভাষাকে প্রভাবান্বিত করেছে একথা বলা যায় না। দুশ পাঁচশ এমনকি হাজারটি সংস্কৃত শব্দের অনুরূপ শব্দও যদি রুশ ভাষার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় তবে তাকে প্রক্ষিপ্ত বলে ধরা উচিত।' সেই কুতার্কিকের শঙ্কা ও সংশয় নিরসনের জন্য গোপীনাথ দীপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন 'বটে! আপনার অবগতির জন্য তাহলে একটি গীতা মন্ত্র (১/অ/২১ শ্লোক) উদ্ধার করা যাক,

অর্জুন উবাচ, 'সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত'।

এই প্রসিদ্ধ গীতা বাক্যের অর্থ বোধহয় সবাই জানেন। অর্জুন বলছেন, 'হে অচ্যুত, উভয় বাহিনীর মধ্যে আমার রথটিকে স্থাপন কর।' একটি বিখ্যাত রাশিয়ান গ্রন্থে ঐ কথাটি কিভাবে আছে দেখুন, 'অর্জুন গবারিৎ — মেজদে বাহিন্যোয়ো ওবে করেতু স্তাভেমে, ওচ্যুত!' অর্থ একই। কিন্তু সেটাই বড় কথা নয়। লক্ষ্য করার বিষয় হল, যদি একই ভাষাভাষী লোক উভয় দেশে না থাকত তাহলে আমাদের ধর্মশাস্ত্রের কথা কি ঐভাবে

রুশ সাহিত্যে স্থান লাভ করতে পারে?

আরও এমন সব অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে যা মিলিয়ে দেখলে চার হাজার বছরের পুরাণো রুশ ভাষা এবং দশ হাজার বছরের সংস্কৃত ভাষার নৈকট্য সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে না।

বৈসাদৃশ্যও যে কিছু নাই তা নয়। প্রত্যেক দেশের আচার বিচার প্রথা সংস্কার জীবন-দর্শনের প্রতিফলন যে কোন প্রাণধর্মী ভাষার উপর পড়ে থাকে। ফলে সংযোজন, বিয়োজন, অর্থান্তর, রূপান্তর, পরিবর্ত্তন পরিবর্ধনাদি অনিবার্যভাবেই ঘটে যায়।

তা ঘটুক, সেটা হল ভাষার গতিময়তার লক্ষণ। কিন্তু এতৎ সত্ত্বেও মূল কাঠামোটা যে অপরিবর্তিত থেকে যায়, তারও কিছু উদাহরণ দিচ্ছি।

ডিমিট্রিভ বলেছিলেন — রুশীয় ভাষায় 'হ' বর্ণটি নাই। পণ্ডিত দুর্গাপ্রসাদ অনুষ্কান ও আলোচনা করে তাঁকে দেখিয়ে দিলেন যে রুশ ভাষায় সস্কৃতের 'জ' 'ভ' 'ধ' প্রভৃতি আরও কয়েকটি বর্ণ নাই। তাই রাশিয়ানরা জাপানকে বলে ইউপোনিয়া, জার্মানকে গোরমান্না, জয়পুরকে দিয়পুর বলে থাকে। সংস্কৃতে 'অজ' মানে ভেড়া বা ছাগল। রুশ ভাষাতেও অজ মানে ভেড়া। তবে এটিকে তাঁর উচ্চারণ করেন 'অফত্সা'। উচ্চারণে বৈষম্য থাকলেও সংস্কৃত শব্দটির সঙ্গে কোন অর্থ বৈষম্য নাই।

যেমন ধরুন, গ্রামের কোন চাষী মায়ের কাছে এসে কোন প্রতিবেশিনী তাঁর মেয়ের খোঁজ করলেন। চাষী মা হয়তো বললেন — আমার মেয়ে ছাগল দুটোকে দুইছে। যদি ঐ চাষী মার মাতৃভাষা সংস্কৃত হয়, তাহলে তিনি বলবেন — মদীয়া দুহিতা দোগ্ধি উভে অজে। চলে যান রাশিয়ার গ্রামে। সেখানের চাষী মাও ঐ একই জবাব দেবেন। তাঁদের ভাষায় — 'ময়া দোচি দোইত ওবে অফট্সে।'

সংস্কৃতের দুহিতা রুশ দেশীয় মায়ের কণ্ঠে হল দোইত। দোহন অর্থে সংস্কৃতে প্রথম পুরুষে এক বচনে দোগ্ধি হয়। প্রাক্ আর্যযুগে ব্যাকরণে 'দোগ্ধি'। শব্দটিকে বলা হত দুহতি।

মজা দেখুন, রুশীয় ভাষায় 'ধ' শব্দটি না থাকায় ওটি হল দোইত। দুহিতা দুহতি আর দোইত, এর মধ্যে তফাৎ কতটুকু? শব্দগুলির মধ্যে ধ্বনিসৌকর্যটি কি অবিকল থেকে যায় নি? কিংবা উভে যদি ওবে হয়, তাহলে প্রভেদটা কি খুব বেশী গুরুতর? রুশ ভাষায় 'ভ' না থাকার ফলে স্ত্রী লিঙ্গের দ্বিবচনে উভে কেমন স্বচ্ছন্দে 'ওবে'তে পরিণত হয়ে গেল। রাশিয়ানরা মাকে বলে মাতি, উচ্চারণ করে মাচী। পাঁচকে বলে পয়াত, উচ্চারণ করে প্যাচ! মাতৃ শব্দের মাতি এবং পঞ্চ শব্দের প্যাচ রূপান্তর কি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে না — উভয় ভাষার সংযোগ কত স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ?

নিম্নলিখিত শব্দগুলির উচ্চারণ ও অর্থ লক্ষ্য করুন ঃ—

বাংলো	সংস্কৃত	রুশ
এক	একম্	আদিন্
আদি	আদি	আদিন্
দুই	দ্বি	দ্বি
তিন	ত্রি	তি
চার	চত্বার	চত্যেরি
পাঁচ	পঞ্চ	প্যাত বা প্যাচ
বার	দ্বাদশ	দ্বাদশস্তেতি
তের	ত্রয়োদশ	তিরদস্ততি
একশ	শত	স্তো

উপরে শব্দগুলি এত common যে সংস্কৃতে বললে তা রুশ ভাষী বুঝবে, আবার রুশভাষী যদি বলেন, কোন ভারতীয়রই তা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হবে না।

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী অব্যয় পদগুলো সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় বিশেষ্যের পরে। কিন্তু রুশীয় ব্যাকরণে অব্যয় পদগুলো পূর্বে ব্যবহৃত হয়। যেমন —

তোমার ভাই বাড়ীটি ও গাছটির মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে অছে। সংস্কৃতে এর অনুবাদ দাঁড়াবে — ধাম্নঃ তরোশ্চ

মধ্যে তিষ্ঠতি তব ভ্রাত। কিন্তু রুশ ভাষায় হবে — মেজদু দোমম্ ই দেরেভস্ স্তোইত তব ব্রাত।

এই বাক্যে লক্ষ্য করুন, 'মেজদু' অব্যয়টি বিশেষ্য দোমম্। (যার অর্থ বাড়ী) এর পূর্বে বসেছে। ঐ কথাটির সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'মধ্যে' বসেছে বিশেষ্য তরোশ্চ শব্দটির পরে।

এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল উপরের বাক্যে 'তিষ্ঠতি' ক্রিয়াটি রুশ ভাষায় হয়েছে 'স্তোইত'। 'স্তোইত'কে তিষ্ঠতির' বিকৃতি বলা চলে না। কারণ মহর্ষি পাণিনির পূর্বে রচিত প্রাচীন ব্যাকরণে ঐ তিষ্ঠতি ধাতু একই অর্থে প্রয়োগ ছিল স্থতি। 'স্থতি' মানে থাকা। কে বলতে পারে, যে যুগে তিষ্ঠটির রূপ ছিল স্থতি। সেই প্রাচীনতম যুগে এখানকার ভাষাই কেতুমালবর্ষ হতে হিরন্ময়বর্ষ পর্যন্ত ভূখণ্ডে অর্থাৎ বর্তমান রাশিয়ায় প্রচলিত ছিল না?

আর দু-একটা উদাহরণ দিলে এই সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য আরও স্পষ্ট হবে আশা করি ঃ

(১) জলপ্রপাত থেকে দিনরাত জল পড়ছে। এই বাংলা কথাটির সংস্কৃতে অনুবাদ হবে — নক্তং দিনং উদপাতাৎ পততি উদ। রুশ ভাষায় ঐ একই কথা প্রকাশ করতে গেলে বলতে হবে — ন চ ই দিয়োম ওতোভোদাপাদা পদাইত ভোদা।

জলপ্রপাতের সংস্কৃত হল — উদ্‌পাত, পঞ্চমী বিভক্তিতে উদপাতাৎ অর্থাৎ জলপ্রপাত থেকে বা হতে। রাশিয়ানরা উদপাতাৎকে বলে ওতভোদাপাদা। উচ্চারণের সামান্য বিকৃতি দেখা গেলেও ব্যাকরণের নিয়মে কিন্তু কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। সংস্কৃতের মত এখানেও পঞ্চমী বিভক্তি হয়েছে। সংস্কৃতে 'পততি' মানে পতিত হয়। রুশ ভাষায় পদাইত মানেও প্রায় একই। পদাইত মানে হল নিম্নমুখে গমন করা। পততি ও পদাইত এর মধ্যে কেমন সুন্দর সুন্দর সাদৃশ্য দেখুন।

এইভাবে রুশভাষা ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে মিল থাকার ফলে যদি একজন রাশিয়ান ভারতের সংস্কৃত ভাষী কোন লোককে কিছু বলে, তবে তার ভাষা বুঝতে ভারতীয় ভদ্রলোকের কোন কষ্ট হবে না। একটা উদাহরণ দিই। একজন সংস্কৃত ভাষী খরিদ্দার মাংস দোকানে গিয়ে বলল — ভ্রাতঃ! দেহি মাং ত্রি-চতুর্থং মাংসম্। মাংস দোকানীটির যদি সংস্কৃত জানা থাকে তাহলে সে স্বচ্ছন্দেই বুঝতে পারবে, তার খরিদ্দার তাকে বলছে — ভাই আমাকে পৌনে এক কিলো মাংস দাও।

এখন যদি কোন রাশিয়ানের অনুরূপ মাংসের দরকার থাকে তাহলে সে তার মাতৃভাষাতেও দোকানদারকে বলুক না কেন — বাত! দাইন্নি তি — চত্বোতি ম্যাস্যা। বলুন, সংস্কৃতজ্ঞ দোকানদারের ঐ রুশভাষার অর্থ বুঝতে কি কোন কষ্ট হবে?

এখানে সংস্কৃত ভাষার ভ্রাতঃ রুশ ভাষায় হয়েছে বাত।
এখানে সংস্কৃত ভাষার দেহি রুশ ভাষায় হয়েছে দাইন্নি
এখানে সংস্কৃত ভাষার মাংস রুশ ভাষায় হয়েচে ম্যাস্যা।

শব্দগুলির মধ্যে সামান্য যেটুকু বিকৃতি দেখা যাচ্ছে তা দেখে আঁতকে উঠার কারণ নাই। এটা কোন মারাত্মক প্রভেদ নয়। কারণ, এদেশে গ্রামের লোক মাংসকে বলে মাস, রাজস্থানীরা তাদের কথ্য ভাষায় দেহি অর্থাৎ 'দাও'কে বলে দেম্নে। তাছাড়া 'ঐয়ি শকুন্তলে' যদি প্রাকৃত কথ্য ভাষায় 'হলো শউন্দলে' হয়, তাহলে ভিন্‌দেশে গিয়ে সংস্কৃত শব্দ যদি কিছুটা অপভ্রংশ রূপ ধারণ করে এবং সামান্য সাজসজ্জা বদলিয়েও একই ভাব একই অর্থ প্রকাশ করে তাহলে তাকে কি জাত্যন্তর দোষে দুষ্ট বলা যাবে?

রুশ ভাষার উপর সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রভাব দেখাতে গিয়ে আমি পূর্বেই একটি গীতাবাক্য উদ্ধার করেছি। এখানে একটি বেদমন্ত্র আলোচনা করে এবার এই প্রশ্নের উপসংহার টানবো।

আমাদের বৈদিক ঋষিদের নিত্যকালের প্রার্থনা —

'জীবেম শরদঃ শতম্ ব্রুবাম্ শরদঃ শতম্।'

আমরা যেন একশ শরৎ ভোগ করে জীবনের জয়গান গাইতে পারি। যেখানে 0° এর নীচে temperature প্রাকৃতিক কারণে যেখানে হাড় কাঁপানো শীত ছাড়া শরৎ হেমন্ত প্রভৃতি অন্য কোন ঋতুকে অনুভব করা যায় না, সেই প্রচণ্ড শীতের দেশের লোকেরা এক ভাষাভাষী হলেও শরৎ ঋতুর বন্দনা গান গাইবেন এটা নিশ্চয়ই

আশা করতে পারি না। তাঁদের কাছে গ্রীষ্ম ঋতুই বাঞ্ছিত ঋতু। কাজেই জীবনের জয়গান গাইতে গিয়ে যদি তাঁদের কোন ঋতুকে প্রশস্তি জানাতে হয়, তাহলে তাঁরা গ্রীষ্মের জয়গানই গাইবেন, এটাই স্বাভাবিক।

শুনুন রুশভাষার উদাত্ত আহ্বান —

'জীবেম শরদঃ শতম্ ব্রুবাম্ শরদঃ শতম্' বৈদিক ঋষিদের এই প্রার্থনার সমতালে রাশিয়ানরাও আকুতি জানিয়ে থাকেন — জিভেম স্তো গোদা, স্তো গোদা — শতায়ু হয়ে শতবর্ষ ধরে আমাদের জীবনের জয়গান চলুক। জিভেম্ স্তো লিয়েত, গোবারিম্ স্তো লিয়েত। — আমরা যেন একশ গ্রীষ্ম ভোগ করে একশ গ্রীষ্মের জয়গান গাইতে পারি।

কিংবা গুরুগম্ভীর শব্দ চয়নে, ভাবের বিস্তারে কিংবা অপূর্ব ধ্বনিব্যঞ্জনায় এই যে উভয় ভাষায় সাদৃশ্য— এটা কোন mere coincidence নয়। যদি কখনও গোপীনাথজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে কাশীতে যান তবে আপনি এই বইগুলি পড়লে জানতে পারবেন — ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের* Indo-Aryan Philisophy এবং ডঃ রমেশ মজুমদারের লেখা Ancient Indian Colonies in the Far East (3 Vols), Greater India, Ancient India, Incriptions Kambuja, ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের লেখা Indian Travels Theveuat and Carry এবং ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিক সংবাদ। ডঃ সেনের শেষোক্ত বইটি বিদেশী ভাষা ও সাহিত্যের উপর সংস্কৃত সাহিত্যের অপ্রতিরোধ্য প্রভাবের অকাট্য প্রমাণ। ডঃ সেন পর্তুগাল থেকে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি এনে এই বইটি সম্পাদনা করেছিলেন। ঐ সঙ্গে সুনীতিকুমারের 'দ্বীপময় ভারত' বইটিও পড়ে নেবেন। অলমিতি।

কিছুক্ষণ পরেই পুরোহিতজী চলে গেলেন কপালেশ্বরজীর আরতি করতে। আমরা নাটমন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেখলাম, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। হরনন্দজী বললেন — আপনার বেদ-ব্যাখ্যা আমাদেরকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছে। চলুন, নর্মদার জলে মুখ হাত ধুয়ে নর্মদার ঘাটে সন্ধ্যা-আহ্নিক সেরে আসি। নর্মদা-বন্দনা ও সান্ধ্যক্রিয়া সেরে যখন মন্দিরে ফিরে এলাম তখন পুরোহিতজী আরতি আরম্ভ করেছেন। গালবাদ্য করে ববম্-ববম্ ধ্বনি দিতে দিতে দেখলাম তিনি পায়েও তাল ঠুকছেন। ঘণ্টা শিঙা ডম্বরুর নাদের সঙ্গে তাথৈ-তাথৈ, তা-তা-থৈ, তা-তা-থৈ ছন্দ যেন অল্প সময়ের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠল। নর্মদাতটে সান্ধ্য পরিবেশ বড়ই গম্ভীর এবং আধ্যাত্মিক হয়ে উঠল। ভক্তরা চলে যাবার পর তিনি নর্মদার জলে কপালেশ্বরজীকে ভাল করে স্নান করিয়ে এক বাটি চন্দন সযত্নে ঢেলে দিলেন শিবলিঙ্গের উপর। যার পারিভাষিক নাম 'হিমচন্দন'।

মন্দিরের দরজা বন্ধ করে আমারা ফিরে এলাম নাটমন্দিরে। পুরোহিতজী উদাত্ত কণ্ঠে সামগান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরে গেলেন। আমরা যে যার শয্যা বিছিয়ে বসলাম। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে যতীশ্বরানন্দ বললেন — বেঁটে খাটো চেহারার মানুষটিকে দেখে কে বলবে যে পুরোহিজী এতবড় বেদজ্ঞ পণ্ডিত। সমগ্র বেদ ও সংস্কৃত সাহিত্য এঁর কণ্ঠস্থ।

আমি বললাম — পুরোহিতজী যে কত বড় মহাচার্যের শিষ্য তা এখানে সকলে সম্যকভাবে জানেন কিনা জানি না, তবে বাবার মুখে প্রথম তাঁর পাণ্ডিত্যের মহিমা শুনি। বাবা আমাকে গল্প করেছিলেন, 'প্রাচীন গুরুকুল পদ্ধতিতে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীগুলিতে সংস্কৃতের যে পঠন পাঠন হয় তাতেই প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের যে শিক্ষা, তা অসম্পূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের উপাধিধারী পণ্ডিতদের রামচন্দ্রের বানর সৈন্যদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তারা সমুদ্র অতিক্রম করেছে কিন্তু সমুদ্রের গভীরতা জানে মন্দার বা মৈনাক পর্বত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোন উপাধিধারী পণ্ডিতকে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ বা পণ্ডিতরাজ রাজ্যেশ্বর শাস্ত্রীর কাছে নিয়ে গেলে তাঁদের চাপল্য মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে যাবে।'

১৯২৩ সালে দ্বারভাঙ্গার মহারাজ রামেশ্বর সিং, রাজা মতিচাঁদ, ভারতবর্ষ মহামণ্ডলের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী

* বর্তমান ভারতবর্ষে ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাষাতত্ত্ববিদ্ আর একজনও নাই। সংস্কৃত এবং রাশিয়ান এ দুটি ভাষারই তিনি কুশলী আচার্য। নানা দেশের প্রায় ৫০টি ভাষার লিপিও তাঁর আয়ত্তে। শুধু তাই নয়, Indo-Aryan Philology নামে থিসিসটি লিখে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ডি. লিট্ উপাধি পেয়েছেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লাভ ও ইউরোপীয়ান ভাষাতত্ত্ব, অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষাতত্ত্ব এমন কি প্রাচীন সগোডিয়ান এবং প্রাচীন ঘোটানী ভাষার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার দৌলতে তিনি ভারতকে দিয়েছেন বিশ্ব-শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা।

জ্ঞানানন্দ প্রভৃতির উদ্যোগে যে অখিল ভারতীয় ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলন হয়, সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য, মহামহোপাধ্যায় অন্নদাচরণ তর্কচূড়ামণি, মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ, মহামহোপাধ্যায় যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় সীতানাথ তর্কভূষণ, মহামহোপাধ্যায় ফণীভূষণ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় কামাখ্যা নাথ তর্কবাগীশ, মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন, মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী দ্রাবিড় প্রভৃতি ভারতের বৃহস্পতিতুল্য পণ্ডিতবর্গ। যদিও সারদা আইন শুদ্ধি এবং অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি শাস্ত্রসম্মত কিনা — এই ছিল ঐ মহাসম্মেলনের বিচার্য বস্তু, তবুও সে যুগের ধারণানুযায়ী নানা দুরূহ দার্শনিক সিদ্ধান্ত নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে বিচার বিতর্ক শুরু হয়ে গেল। ব্যাকরণ শাস্ত্রের দর্শনগ্রন্থ বাক্যপদীয়-এর একটি সূত্র নিয়ে বিচার চলেছে দুই তরুণ বিদ্যার্থী রাজেশ্বর শাস্ত্রী এবং কুপ্পস্বামীর মধ্যে। কুপ্পস্বামী ছিলেন মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রীর ছাত্র, আর রাজেশ্বর তাঁর আত্মজ সন্তান। রাজেশ্বরের আচার্য ছিলেন মহামহোপাধ্যায় বামাচরণ ন্যায়াচার্য। পরপর তিনদিনের বিচারেও মীমাংসা আর হয় না। রাজেশ্বরের বাগ্মীতা এবং অকাট্য যুক্তিজালে কুপ্পস্বামী নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। পুত্রের হাতে তাঁর প্রাণপ্রিয় ছাত্রের পরাজয়ের সম্ভবনা দেখে লক্ষ্মণ শাস্ত্রীজি শিখা উন্মোচন করে পুত্রকেই অভিসম্পাত দিতে শুরু করলেন। সমবেত দিক্‌পাল পণ্ডিতেরা দিশেহারা। এমন সময় দেখা গেল ৩৮ বৎসর বয়স্ক এক ধ্যানগম্ভীর প্রশান্তমূর্তি ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন সভাস্থলে। তিনি রাজেশ্বরের বক্তব্যের সূত্র ধরে দীর্ঘকাল প্রবচন করলেন। আর সে কী বাক্‌বৈদগ্ধ! একটি বিচারের সূত্র প্রসঙ্গে তিনি সমগ্র যোগদর্শন বিশেষতঃ বাক্যপদীয়ের মূলীভূত ব্যাকরণ রহস্যকে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করলেন। পণ্ডিতেরা বুঝলেন যে ভারতবর্ষের দর্শন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন সূর্যের উদয় হয়েছে।

এই নবোদিত সূর্যই হলেন মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ। রাজেশ্বরের পণ্ডিতরাজ উপাধি ওনারই প্রদত্ত। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে প্রকাশ্য সভায় গোপীনাথের ঐ প্রথম ও শেষ ভাষণ। অতঃপর জীবনে তিনি কোন সভায় যোগ দেন নি।

সত্যিকথা বলতে কি, অতলান্তিক সমুদ্রের জলের যেমন পরিমাপ করা যায় না, গোপীনাথের প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্যেরও কোন পরিমাপ করা দুঃসাধ্য। গত চল্লিশ বৎসর যাবৎ ভারতবর্ষের যেখানে যত ধর্মগুরু হয়েছেন গোপীনাথই তাঁদের উপদেষ্টা। সংস্কৃত সাহিত্য এবং দর্শনেও যেখানে যত গবেষক পণ্ডিত ডক্টরেট পেয়েছেন — তাঁরও প্রধান পরীক্ষক তিনি। ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শন ও সাহিত্যে' এবং সুধীর নন্দীর লেখা 'রবীন্দ্র সাহিত্যে নন্দন তত্ত্ব' প্রভৃতি হতে আরম্ভ করে ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রীর ভর্তৃহরির স্ফোটবাদ এর মত দুরূহ দার্শনিক তত্ত্বের থিসিসও গোপীনাথের নির্দেশ এবং সঙ্কেতসূত্র ছাড়া রচিত হয় নি।

তিনি জীবনে ১৭৮টি গ্রন্থের ভূমিকা ও সমালোচনা লিখেছিলেন। তার মধ্যে মহামহোপাধ্যায় গঙ্গানাথ ঝাঁ কৃত বাৎস্যায়ণ ভাষ্য ও তন্ত্রবার্ত্তিকের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকা, বলদেব উপাধ্যায় কৃত বৌদ্ধ দর্শন নামক গ্রন্থের ভূনিকা, ভাস্করানন্দজীর গুরুদেব রচিত উপেন্দ্র বিজ্ঞানসূত্রের ভূমিকা, মহামহোপাধ্যায় উমেশ মিশ্র রচিত Conception fo Matter নামক গ্রন্থের ভূমিকা, নাথমল টাঁটিয়া রচিত Studies in Jain Philosophy গ্রন্থের ভূমিকা, মেহেরপীঠের সর্ববিদ্যাচার্য মহাসাধক সর্বানন্দকৃত সর্বোল্লাস-তন্ত্রের প্রাক কথন এবং ১৯২৩ সালে হিন্দুস্থান রিভিউতে প্রকাশিত ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস' (১ম) — এর সমালোচনা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন অর্বাচীন কোন লেখককেই যেমন এই আশুতোষ আত্মভোলা পণ্ডিত বিমুখ করেন নি, তেমনি বর্ষীয়ান জ্ঞান-ভূমিষ্ঠ পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্নের রচিত ব্রহ্মসূত্রের 'শক্তিভাষ্য' এবং মহামহোপাধ্যায় হারাণ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'কালসিদ্ধান্তদর্শিনী' নামক পুস্তকেরও তিনি ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। সে যুগের সর্বজনপুজ্য এ দুজন বর্ষীয়ান্ পণ্ডিত, তাঁদের চেয়ে বয়সে নবীন হলেও গোপীনাথের উপরেই এই দায়িত্ব দেন। কারণ, তারা বুঝেছিলেন গোপীনাথ ছাড়া তাঁদের ভূমিকা লেখার মত তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত সে যুগে আর কেউ ছিলেন না। আমার বাবা ছিলেন তাঁর স্নেহধন্য। মহামনীষী গোপীনাথ সম্বন্ধে বাবার প্রশস্তি আমার মনে তাঁকে দেখার আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। ছাত্রজীবনে পূজার ছুটি বা গ্রীষ্মের ছুটিতে বাবা প্রায়ই আমাকে বিভিন্ন তীর্থ ভ্রমণে পাঠাতেন। একবার একটি চিঠি আমার হাতে দিয়ে বাবা বললেন, 'কাশীতে গিয়ে বিশ্বনাথ দর্শন করে এস। তাঁর সঙ্গে অবশ্যই দর্শন করবে বিশ্বনাথের জ্ঞানময় বিভূতি গোপীনাথ কবিরাজকে'।

কাশীতে পৌঁছে বিশ্বনাথ-অন্নপূর্ণা দর্শন করে যখন তাঁর বাড়ীতে পৌঁছলাম দেখি ঘরভর্তি দেশী-বিদেশী ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে শাস্ত্র আলোচনা করছেন। সকলে চলে যেতে সৌম্যকান্তি আত্মভোলা ষাটোর্দ্ধ এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে বাবার চিঠি দিয়ে প্রণাম করতেই আমাকে দেখে বললেন, 'তোমাকে ত বাঙালী বলে মনে হচ্ছে। বাড়ী কোথায়? নামধাম ও পিতৃপরিচয় পাবার পর তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে দুগালে চুমু খেতে লাগলেন। বললেন, তুমি আমার শশীর ছেলে। শশী আমার আত্মার আত্মীয়। আদর যত্নের ঘটা দেখে কে? এরপর বহুবার কাশী গেছি শুধু তাঁর সঙ্গ করার জন্য। কোন কোনবার কাশী বিশ্বেশ্বর ও মা অন্নপূর্ণার দর্শন করিনি। তাঁর কাছ থেকে আমি পেয়েছি অনেক।

গোপীনাথের পাণ্ডিত্য যে কি বিপুল এবং বিরাট তার প্রমাণ স্বরূপ আমার নিজের দেখা একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি। ১৯৪৭ সালে আগষ্ট মাসে একদিন মধ্যাহ্নে গোপীনাথ তাঁর অভ্যাসমত লাইব্রেরীতে বসে দেশী বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা জিজ্ঞাসুদের কাছে নানা তত্ত্বের ব্যাখ্যা করছেন, এমন সময় সেখানে প্রবেশ করলেন কাশী, এলাহাবাদ এবং দ্বারভাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন পণ্ডিত। তাঁরা গোপীনাথের কাছে সবিনয়ে নিবেদন করলেন যে এন্‌সাইক্লোপিডিয়া অব্ ব্রিটানিকার অনুকরণে হিন্দী ভাষায় এক বিরাট শব্দকোষ রচনার ভার দিয়েছেন ভারত সরকার। ভারত সরকারের অর্থ সাহায্যে কাশী নাগরী প্রচারিণী সভা হতে এ বই বার খণ্ডে প্রকাশিত হবে এবং তা সমাপ্তপ্রায়। তাঁরা তাঁদের সেই অমূল্য রচনা গোপীনাথকে একবার শোনাতে চাইলেন। 'উ' বর্ণটির বর্ণনা তাঁরা যখন শোনাচ্ছিলেন, সহসা গোপীনাথ বলে উঠলেন, 'উৎক্রমণ শব্দকা উল্লেখ আপ্‌নে নেহি কিয়া? ঐ সব গবেষক পণ্ডিতরা জবাব দিলেন, 'উৎক্রমণ শব্দ ক্যা এ্যায়সা জরুরী হ্যায়'? ঝলসে উঠলেন গোপীনাথ। তিনি বললেন, উৎক্রমণ শব্দ বাদ দিলে হিন্দুদর্শন ও যোগশাস্ত্রের সবচেয়ে মহত্তম দিকটি বাদ দেওয়া হবে। কারণ, পৃথিবীর তাবৎ শাস্ত্রের মধ্যে হিন্দু ঋষিদের শ্রেষ্ঠ মৌলিক অবদানই হলো — আত্মার উৎক্রমণ তত্ত্ব। এইবার এই উৎক্রমণ শব্দটি বেদ-বেদান্ত, ষড়দর্শন, ব্রাহ্মণগ্রন্থ, শৈবাগম, পাতঞ্জল প্রভৃতি যোগের বই হতে আরম্ভ করে প্রাচীন কাব্য সাহিত্য এবং রসশাস্ত্রের কোথায় কোথায় উল্লেখ আছে, শুধু সেই কথাই গোপীনাথ তাদেরকে শুনিয়েছিলেন অনর্গলভাবে, দীর্ঘ এক মাস ধরে।

ম্যাক্সমুলারের কথিত 'চলন্ত বিশ্ববিদ্যালয়' ভারতরত্ন ভগবান দাস এবং পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন কথিত 'অমানবমানব', জ্যোতির্মঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য এবং মহামণ্ডলেশ্বের স্বামী মহাদেবানন্দ বর্ণিত 'তত্ত্বদ্রষ্টা' গোপীনাথের লিখিত পুস্তকের সংখ্যাও শতাধিক। তার মধ্যে ভারতীয় সাধনার ধারা, তন্ত্রের স্বরূপ ও শক্তি সাধনা, তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত, শঙ্করবেদান্ত ও অদ্বৈতপ্রস্থান, Bibliography of Nyaya Vaisesika Literature, সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, আবির্ভাব ও ভেদ, তন্ত্র ও আগমশাস্ত্রের দিগ্‌দর্শন, সূর্যবিজ্ঞান, কিরণাবলীভাস্কর (বৈশেষিক), বীর শৈব সম্প্রদায়ের কারণতত্ত্ব, তান্ত্রিক বৌদ্ধ সাধনা, রস ও সৌন্দর্য, ন্যায় বৈশেষিক সাহিত্যের ঐতিহাসিক মূল্যায়ন, ত্রিপুরারহস্য (শাক্ত-আগম-দর্শন), কুসুমাঞ্জলী-বোধিনী (ন্যায়), যোগিনী-হৃদয়-দীপিকা (শাক্ত আগম), পত্রাবলী, সাহিত্য চিন্তা, স্বসংবেদন অখণ্ড মহাযোগের পথে প্রভৃতি বই উল্লেখযোগ্য। সরস্বতী-ভবনের অধ্যক্ষ হিসাবে দুষ্প্রাপ্য হস্তলিখিত পঞ্চাশ হাজার পুঁথির ক্যাটালগ তৈরী করে প্রায় বাহাত্তর খানা পুঁথির সম্পাদনাও তাঁরই কীর্তি। এ ছাড়াও তিনি বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্স অব্ ওয়েলস্ সংস্কৃত সিরিজের ৭২ খানি বই এরও সম্পাদনা করে গেছেন। সারনাথে খননকার্যের ফলে ব্রাহ্মী এবং পালি ভাষায় কুষাণ অশোক ও গুপ্তযুগের যে সব লিপি অবিষ্কৃত হয়েছে তারও পাঠ উদ্ধার করেছিলেন গোপীনাথ।

আগামী সহস্র বৎসরের মধ্যেও এইরকম শাস্ত্রে অকুণ্ঠিত বুদ্ধি, প্রজ্ঞাচক্ষুঃ, সর্ববিদ্যায় পারঙ্গম পণ্ডিতের আবির্ভাব ভারতবর্ষে আর ঘটবে কিনা জানি না। কিন্তু তাঁর এই পাণ্ডিত্যকেও অতিক্রম করেছিল তাঁর যোগজ প্রাতিভ* জ্ঞান। নির্ধারিত কাল সমাপ্ত হওয়ার আট বৎসর পূর্বেই ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে তিনি কাশী সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে যোগসাধনায় নিমগ্ন হয়েছিলেন।

---

* পাতঞ্জল দর্শন এবং ব্যাসভাষ্যে প্রাতিভ জ্ঞানের উল্লেখ আছে। এই জ্ঞান অনুত্তর মহাজ্ঞানস্বরূপ, স্বয়ম্ভুত বলে সাংসিদ্ধিক। এই জ্ঞানের উদয় হলে সেই সৌভাগ্যবান সাধকের সিদ্ধি বা ঐশ্বর্য ভাল লাগে না। তখন শিবময় পরম সত্যে তাঁর বিশ্রান্তি ঘটে এবং সমস্ত ভাব হতেই বিবেক উৎপন্ন হয় বলে সমস্ত বিষয়েই বৈরাগ্য জন্মে। দর্পণে যেমন নিজেকে প্রতিবিম্বরূপে দেখা যায়, তেমনি সর্বত্র ভিতরে ও বাহিরে শিবকে দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ শিবৈকঘন রূপে বিশ্বের তথা তত্ত্বের সাক্ষাৎকার ঘটে।

এখানে একটি কথা প্রকাশ না করে পারছি না যে, আজকাল অনেক অভিসন্ধিপরায়ণ ব্যক্তি এই সদাশিবতুল্য মহাপুরুষকে তাঁদের স্ব স্ব গুরুদেব বা গুরুমার ভক্ত বলে প্রচার করতে ব্যস্ত। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, তাঁর সাধন-জীবনে দীক্ষাগুরু স্বামী বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস (গন্ধীবাবা) ছাড়া আর একজন মাত্র মহাপুরুষের প্রভাব পড়েছিল, তিনি হলেন আর্যশাস্ত্র-প্রদীপ প্রণেতা শিবরামকিঙ্কর ভার্গব যোগত্রয়ানন্দ স্বামী। স্বয়ং পতঞ্জলির কৃপাধন্য এই মহাপুরুষের কাছে পাণিনির অন্তর্গত 'স্থানে অন্তরম্' ও ত্রিয়াম্ প্রভৃতি সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রবণ করেই তাঁর মধ্যে জ্ঞান-গঙ্গার বোধন ঘটেছিল, দিব্যশক্তি সম্পাতে যেন উন্মোচিত হয়েছিল সুপ্ত জ্ঞান প্রবাহের উৎসমুখ। তাঁর সম্বন্ধে গোপীনাথের নিজস্ব উক্তি — 'বুদ্ধির অতীত অধ্যাত্ম ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান আমি নতশিরে স্বীকার করিতে বাধ্য' (সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ ২য় খণ্ড)। বলা বাহুল্য, এই দুই মহাপুরুষের কৃপাতেই আধ্যাত্ম-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন গোপীনাথ।

তিনি প্রতিষ্ঠাকে শূকরীবিষ্ঠা এবং গৌরবকে রৌরব নরকের তুল্য মনে করতেন। এটি যে আক্ষরিক অর্থে সত্য তার প্রমাণ হিসাবে দেখি — ১৯৩৪ সালে ভারত গভর্ণমেন্ট প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায়, পদ্মবিভূষণ উপাধি, কাশী এলাহাবাদ কলিকাতা দিল্লী ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত ডি.লিট. কিংবা বিশ্বভারতী প্রদত্ত দেশিকোত্তম উপাধি তিনি স্বয়ং উপস্থিত হয়ে গ্রহণ করতে যান নি। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতার পর ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কাশীতে পাঁচটি রূপার চৌকীর উপর বসিয়ে পাঁচজন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের পাদধৌত করার আয়োজন করেছিলেন। অন্যান্য পণ্ডিতেরা সেখানে উপস্থিত হলেও গোপীনাথ ছিলেন অনুপস্থিত। কাশীতে সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর উত্তরপ্রদেশের তদানীন্তন রাজ্যপাল ডঃ সম্পূর্ণানন্দসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি করজোড়ে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, অন্ততঃ একদিনের জন্য হলেও ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার জন্য। গোপীনাথ সবিনয়ে তাও প্রত্যাখ্যান করেন।

এই আত্মমগ্ন মহাসাধক সংসারে থেকেও সংসারের বহু উর্দ্ধে নিত্যযুক্ত এবং সমাসীন থাকেন ভালবাসতেন। গীতায় 'স্থিতপ্রজ্ঞ' শব্দটির ব্যাখ্যা আছে। আমরা ভাবের আতিশয্যে যত্র তত্র এই শব্দটির অপপ্রয়োগ করে থাকি। কিন্তু গোপীনাথ ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞতার জ্বলন্ত এবং জীবন্ত দৃষ্টান্ত। ১৯৪৯ সালের ২১শে ডিসেম্বর 'Spiritualite Hindu' গ্রন্থের লেখক জে. এন. হার্বার্ট, সংস্কৃতজ্ঞ জার্মান পণ্ডিত অধ্যাপক উইণ্ডিস, বিখ্যাত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক ঈগল, Antiquities of India গ্রন্থের লেখক এল. ডি. বার্ণেট, ডি. লিট প্রভৃতি কয়েকজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত তাঁর কাছে এসে কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করেছিলেন। সেদিন সেখানে তাঁর সহপাঠী এবং কাশী বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন উপকূলপতি বিখ্যাত সমাজবাদী নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেব বিদ্যাভূষণ, মহামহোপাধ্যায় পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ এবং নিকটতম প্রতিবেশী ভারতরত্ন ডঃ ভগবান দাসের মত মনীষীরাও উপস্থিত ছিলেন। সহসা বাড়ীর মধ্যে ক্রন্দন রোল উঠলো, আলুথালু বেশে হাহাকার করতে করতে তাঁর সহধর্মিনী এসে পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। একমাত্র পুত্র জিতেন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন রোগভোগের পর এইমাত্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। গোপীনাথের সেবক সীতারাম উপস্থিত পণ্ডিতবর্গকে এই মর্মন্তুদ সংবাদ দিবামাত্র সকলেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। কিন্তু গোপীনাথের কোন চাঞ্চল্য নেই, কোন বিকার নেই। তিনি সহাস্যে স্ত্রীকে বললেন, 'পরমপিতার হাতের রসগোল্লাই শুধু মিষ্টি তাঁর দেওয়া আঘাতটা সইবে না কেন? দীর্ঘায়ু হওয়ার সাধ করব অথচ কোন শোক তাপ পাবো না এ কেমন করে হয়?' এই বলে তিনি স্ত্রীকে হাতে ধরে বাড়ীর ভিতর রেখে এসে পুনরায় যথারীতি প্রবচন করতে উদ্যোগী হলেন। সকল পণ্ডিতের চোখেই তখন জল। অধ্যাপক উইণ্ডিস্ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, আপনি কি পাথর? আপনি স্থিতপ্রজ্ঞ হতে পারেন, আমাদের পক্ষে এই পরিস্থিতিতে আজ কিছু শোনা সম্ভব নয়। প্রসন্ন কণ্ঠে গোপীনাথ জবাব দিলেন —

'অযাচিতো ময়লাব্ধস্তং প্রেষিতঃ পুনর্গতঃ।
যত্রাগতস্তত্রাগতস্তত্র কা পরিবেদনা॥

আমি ত পুত্র চাই নি। তিনি দিয়েছিলেন। এই অযাচিত দ্রব্য আমার কাছে প্রেরিত হয়েছিল। পুনরায় তা চলে গেছে। যেখান থেকে এসেছিল সেখানে গেছে, তাতে পরিতাপের কি আছে?

ডঃ ভগবান দাসকে বিলাপ করতে দেখে তিনি তাঁকে সান্ত্বনা দিতে দিতে বললেন, 'আপনার মত জ্ঞান-বৃদ্ধের এই শোক অনুচিত। ঐ পথে একদিন সবাইকে যেতে হবে।

যদ্যেকস্তরিতো যাতি তত্র কা পরিদেবনা।

একজন যদি আগেভাগে চলে যায়, তাতে দুঃখের কি আছে'?

আচার্য নরেন্দ্র দেব বলেছিলেন, - 'মৃত্যু মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম সন্দেহ নাই, তবু এই অকালমৃত্যু শোকাবহ।' গোপীনাথ তাঁর দিকে ঘুরে জবাব দিলেন,

নাকালে ম্রিয়তে জন্তুর্বিদ্ধ শরশতৈরপি
কুশাগ্রেণ তু সংস্পৃষ্টং প্রাপ্তোকালো ন জীবতি।

অকালমৃত্যু কাকে বলছেন? অকালবিয়োগ একটা কথার কথা। কোন জীব বা জন্তু শতশরবিদ্ধ হলেও অকালে প্রাণত্যাগ করে না। কিন্তু কালপ্রাপ্ত হলে কেউ জীবিতও থাকে না। জিতেন্দ্রের কাল উপস্থিত হয়েছে, সে আনন্দধামে চলে গেল।

বিখ্যাত মহাত্মা হরিহর বাবার গুরু বীতরাগ বাবা, পরমহংস প্রেমানন্দতীর্থ স্বামী এবং সরযু-তটবাসী মহাত্মা অহোবল প্রপন্নাচার্য ('দৌরাহা বাবা') এই ঘটনা স্মরণ করে মন্তব্য করতেন —

'গোপীনাথ কেবল স্থিপ্রজ্ঞ নেহি, উনোনে বিশ্বনাথকা জ্ঞানময় বিভূতি হ্যায়।'

বিশ্বনাথের এই জ্ঞানময় বিভূতিকে নমস্কার।

মোমবাতি নিভে গেছে। কথায় কথায় রাত্রি বেশী হয়ে গেছে। তাই আমরাও 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' বলতে বলতে শুয়ে পড়লাম। ভোর ৬টায় আমরা জেগে উঠলাম। পাখীর কলকাকলিতে ভরে গেছে চারদিক। প্রাতঃকৃত্য সেরে স্নান করে ভিজা গায়ে নর্মদার জল নিয়ে আমরা মন্দিরে গেলাম কপালেশ্বরজীর পূজা করতে।

আজ চতুর্থ দিন। মন্দিরের মধ্যে সারাদিন জপ ও পুরশ্চরণ করেই কাটালাম। কারণ নর্মদাতীর তপস্যাভূমি, এখানে জপ ও পুরশ্চরণাদির ফল সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। আহার-বিশ্রামের পর পুরোহিতজী এসে উপস্থিত হলেন। বললেন — এখানকার জলবায়ু সব ঋতুতেই মনোরম। বর্ষাকালে দুর্গমতা ও মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার ছাড়া শরীর স্বাস্থ্যের কোন অসুবিধা ঘটে না।

— আচ্ছা, দেশ-বিদেশের সাধারণ লোকের ধারণা, যত কিছু বিজ্ঞানের বিস্ময়কর গবেষণা ও অবিষ্কার হয়েছে সবই হয়েছে পাশ্চাত্যদেশে। ভারতীয় পণ্ডিতরা কেবল ন্যায়ের কচকচি, বেদান্তের গুরুগম্ভীর আলোচনা। কাব্যের রস আলোচনা করেই কাল কাটিয়েছেন। আর সাধু সন্ন্যাসীরা কেবল পরলোকের কথা চিন্তা করেন এবং নিজের আত্মার উন্নতি কিভাবে হয় সেই সাধনায় মত্ত থাকেন। তাঁরা ইহলোকের কোন বিষয়ে চিন্তাই করেন না, বিজ্ঞানশাস্ত্র অনুশীলন ত নয়ই। শৈলেন্দ্রনারায়ণজী এই বিষয়ে তোমার মত কি?

আমার জ্ঞান অতি অল্প, সাধন ভজন করি না। আমার যা কিছু বিদ্যা বাবার কাছে শুনে শুনে। বাবার কছে শুনেছি আমাদের এই ধারণা সর্ব্বৈব ভুল। আপনার মত পণ্ডিত ব্যক্তির কাছে এ সম্বন্ধে কিছু বলা মানেই আমার ধৃষ্টতা প্রকাশ করা। যাইহোক আপনি জানতে চেয়েছেন, আমি বলব।

মা নর্মদাকে স্মরণ করে আমি বলতে শুরু করলাম — যাঁরা বলেন, প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান চর্চা হত না, তাঁরা ভ্রান্ত। প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে আর্য ঋষিগণের স্বাধীন ও সবল চিন্তাধারার প্রথম বিকাশ আমরা লক্ষ্য করি বেদ, বেদাঙ্গ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যাদির মধ্যে। প্রাচীনতম বেদ ঋক্-সংহিতার বহু স্তোত্রে প্রতিফলিত হয়েছে প্রকৃতি ও বস্তুজগতের রহস্য সম্বন্ধে এক সজাগ কৌতুহল এবং এই রহস্য ভেদ করবার এক তীব্র আকাঙ্খা। সৃষ্টিকর্তার মহিমা কীর্তন, মানুষের গভীর ধর্মানুভূতি বৈদিক স্তোত্রের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এর ফাঁকে ফাঁকে প্রকৃতি ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে বৈদিক ঋষিগণের যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাওয়া যায় তাহার মূল্য কম নহে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই ভারতীয় বিজ্ঞানের প্রথম অঙ্কুরোদগম্ হয়েছিল, আত্মপ্রকাশ করেছিল গণিত, জ্যামিতি, জ্যোতিষ, চিকিৎসা ও ভেষজবিদ্যা। বেদ, বেদাঙ্গ ও ব্রাহ্মণ সাহিত্যাদির মধ্যে ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শনের ক্ষেত্রে সমসময়ে অন্যান্য সভ্য জাতির তৎপরতা অপেক্ষা ভারতীয়দের এই তৎপরতা কোনও অংশে ন্যূন বোধ হয় না; বরং কোন কোন বিষয়ে তাদের জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপন্ন হয়েছে।

বৈদিক হিন্দুদের এই জ্ঞান চর্চার কাল প্রায় দেড় হতে দুই হাজার বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালের প্রথম পর্বে রচিত হয়েছিল ঋক্, সাম্, যজু, অথর্ব প্রভৃতি বিভিন্ন সংহিতা, তারপর ঐতরেয়, কৌশিকী, পঞ্চবিংশ,

তৈত্তিরীয়, শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ সাহিত্য, তারপর উপনিষদ্ ও সূত্র সাহিত্য। ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্য প্রধানতঃ মূল চারি সংহিতার ব্যাখ্যা, টীকা বা সম্প্রসারণ মাত্র। বেদের দর্শনভাগ সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন করে উপনিষদের সৃষ্টি। দুঃখের বিষয় বৈদিক সাহিত্যের এই পরবর্তী পরিণতি বিজ্ঞান চর্চার বিশেষ সহায়ক হয় নি। ব্রাহ্মণ ও সূত্র সাহিত্যে প্রথম যুগের ঋষিগণের সেই স্বাধীন নির্ভীক ও সমালোচকমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আর দৃষ্ট হয় না। ধর্মানুষ্ঠান যাগ-যজ্ঞ, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি বিষয়ের নিষ্ফল খুঁটিনাটিতেই এই সব অলোচনা নিবদ্ধ। বেদী নির্মাণে গণিতের ও কাল নির্ণয়ে জ্যোতিষের প্রয়োজন থাকায় এই দুই বিদ্যার উন্নতি বিশেষ ব্যাহত হয় নি, কিন্তু অন্যান্য বিদ্যার সেরূপ কোন উন্নতি দেখা যায় না। চিকিৎসাবিদ্যার অবনতি সুস্পষ্ট। সূত্রযুগে চিকিৎসাবৃত্তি নীচবৃত্তি বলে পরিগণিত; সূত্রধর, কর্মকার ও অন্যান্য কারিগর সম্প্রদায় পূর্ব মর্যাদা হতে ভ্রষ্ট। সমাজে এইরূপ উচ্চ-নীচ ভেদের প্রাবল্য, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান, নিষ্প্রাণ অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞাদি ও পশুবলির আধিক্য, বেদের অভ্রান্ততায় অন্ধবিশ্বাস ও তার বিরুদ্ধ সমালোচনায় অসহিষ্ণুতা নানাভাবে স্বাধীন চিন্তার পথ রুদ্ধ করেছিল। এ যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার অনুকূল ছিল না। সমগ্র আর্যাবর্ত পরস্পর বিবদমান অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। একতাবদ্ধ হয়ে বিরাট রাজশক্তি স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় নি। সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণত্বের কাছে ক্ষাত্র-ধর্মের নতি-স্বীকার এর জন্য আংশিকভাবে দায়ী। পরিতাপের বিষয় যে, পাশ্চাত্য বিদ্যায় কৃতবিদ্য অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি যথোচিত অনুসন্ধান না করেই ঐ রকম প্রগলভ উক্তি করেছেন।

ভারতবাসী স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ, বস্তুতন্ত্রহীন ভাবাতিশয্য তাঁদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ — একথা কোনো কোনো ইংরেজ ঐতিহাসিকের কৃপায় বিরাম বিহীনভাবে আমাদের কর্ণকুহরে ধ্বনিত হয়েছে। সেই কুশিক্ষার ফলে অনেক ভারতীয় পণ্ডিতও বলতে আরম্ভ করেছেন, ভারতবর্ষ চায় সৌন্দর্য, সুষমা, আলো, মলয় বাতাস, বকুল যুঁই-এর প্রাণমাতানো গন্ধ, বাস্তবের সঙ্গে তার কোনও যোগাযোগ নেই। ভারতবর্ষের বহিঃপ্রকৃতিই নাকি এর জন্য দায়ী। প্রাচীন ভারতে অল্প আয়াসেই খাওয়া দাওয়া জুটতো বলে জীবন সংগ্রামের কঠোরতা মোটেই ছিল না, সুতরাং জগৎ মায়া, সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি, আগে ধূম পরে আগুন — না — আগে আগে আগুন পরে ধূম এই সব চুলচেরা বিশ্লেষণ বিচার বা তর্কের যথেষ্ট সুযোগ মিলেছিল, তাই ভারতবর্ষে কাব্য ও দর্শনের ছড়াছড়ি, কিন্তু বিজ্ঞানের কোনও চর্চা হয়নি — এরূপ মতলবি প্রচারও খুবই সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে হয়েছে এবং এখনও হয়ে আসছে।

ভারতবাসী বাস্তব ব্যাপারে অপটু একথা বলার মধ্যে একদল লোকের স্বার্থ আছে কিন্তু স্বার্থ প্রণোদিত হয়ে এরকম প্রচার করেছে আমি একথা বলছি না। বিজয়ী জাতির স্বাভাবিক ঔদ্ধত্য ও পরাজিতের প্রতি তাচ্ছিল্যবশতঃ তার অতীত কীর্ত্তি সম্বন্ধে জানবার অনিচ্ছা হেতু অবশ্য এর জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। 'আমরা কি ইউরোপীয় সুযুক্তিপূর্ণ দর্শনশাস্ত্র, সত্যিকারের ইতিহাস, উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধীয় মতবাদ থাকতে তার স্থানে এমন একটা জিনিষ শিক্ষা দেব যা শিক্ষা করা কোনও ইংরাজ চাকরাণীও গৌরবের মনে করবে না! আমরা কি এমন জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দেব যা শুনলে ইংলণ্ডের যে কোন স্কুল বোর্ডিং-এর মেয়ে হাসি রাখতে পারবে না? আমরা কি এমন ইতিহাস পড়াব যাতে বহু ত্রিশ ফুট লম্বা রাজার কথা আছে এবং যাদের রাজত্ব ত্রিশহাজার বছর ছিল, অথবা চিনি ও মাখন সমুদ্রের বর্ণনাযুক্ত ভূগোল পড়াব'!! — ১৮৩৫ সালে তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষার পরিবর্ত্তে, ভারতবর্ষের ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তনের পক্ষে লর্ড মেকলের উপরোক্ত যুক্তি ঔদ্ধত্যের নগ্নমূর্ত্তি। আমাদের শিক্ষা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি ইংরেজদের উন্নাসিক মনোবৃত্তির উলঙ্গ প্রকাশ।

আসল কথা এই যে কাব্য ও দর্শনের মত প্রাচীন ভারতবর্ষ বিজ্ঞানেও উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করেছিল। সে যুগে বিজ্ঞানেও যে তার সমকক্ষ কোনও দেশ ছিল না। বৈদিক ঋষিরা শুধু ব্রহ্মতত্ত্ব ও নির্বাণসুখ নিয়েই মগ্ন থাকতেন না, তাঁদের শুদ্ধ বোধি দ্বারা বর্ত্তমান যুগের আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের জ্ঞানলাভ করেছিলেন। ব্যবহারিক জীবনেও তার প্রয়োগ করেছিলেন।

গণিত অর্থ গণনবিদ্যা, বৈদিক ঋষিগণ গণিত বলতে সাধারণতঃ পাটীগণিত ও জ্যোতিষকে বুঝতেন; জ্যামিতি বা রেখাগণিত (ক্ষেত্র গণিত) ছিল কল্পসূত্রের অন্তর্ভুক্ত। সকল প্রকার বিদ্যার মধ্যে গণিত যে শ্রেষ্ঠ

বিদ্যা বৈদিক সাহিত্যে এইরূপ উল্লেখ আমরা একাধিক স্থানে দেখতে পাই। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের মতে গণিতের স্থান সর্বোচ্চ। বেদোক্ত সকল বিদ্যার মধ্যে ইহা শীর্ষস্থানীয়। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের এক জায়গায় আছে;

'যথা শিখা ময়ূয়ারানাং নাগানাং মণয়ো যথা।
তদ্বদ্বেদাঙ্গ শাস্ত্রাণাং গণিতং মূৰ্দ্ধনি স্থিতম্।'

অর্থাৎ ময়ূরের মাথার শিখার মত, সাপের মাথার মণির মত, বেদাঙ্গ নামে অভিহিত সকল বিজ্ঞানের শীর্ষস্থানে গণিতের অবস্থিতি।

ভারতবর্ষ উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনায় যথেষ্ট প্রতিভা ও উৎসাহের পরিচয় দিয়েছে কিন্তু তাই বলে বাস্তবকে ভোলে নি। যে আরুণি শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন, 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' — তিনিই তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন — অন্ন-ব্রহ্মঃ। পাটীগণিত, বীজগণিত (ব্যক্ত ও অব্যক্ত গণিত) জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, জ্যোতিষ, রসায়ণ, ফলিত রসায়ণ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের সব বিভাগেই ভারতীয়রা আশ্চর্যজনক উন্নতি লাভ করেছিলেন।

পাটীগণিত সম্পূর্ণরূপে হিন্দুদের বিজ্ঞান। অন্য কোনও জাতির দ্বারা কোনও রকমে প্রভাবান্বিত না হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে হিন্দুরা অন্য সব জাতির চেয়ে পাটীগণিতে সমধিক ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। পাটীগণিতে হিন্দুদের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব ১ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা ও '০'এর আবিষ্কার। মানুষের আবিষ্কারের মধ্যে অক্ষর আবিষ্কারের পরেই এই আবিষ্কারের স্থান। আমেরিকার অধ্যাপক হ্যালস্টেড হিন্দুদের '০' অবিষ্কারের সম্বন্ধে লিখেছেন —'অংক শাস্ত্রের অন্য কোনও আবিষ্কার মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও ক্ষমতা বিকাশের পথে এতটা প্রভাব বিস্তার করেনি। ১ থেকে ৯ এবং '০' ধরে অর্থাৎ দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের ফলেই হিন্দুরা গণিতে গ্রীকদের চেয়ে বেশী উন্নতি লাভ করেছিলেন।' ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন তাঁর ভারত-ইতিহাসে লিখেছেন —'হিন্দুরা পাটীগণিতে সর্ববাদী সম্মত দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত এবং মনে হয় এটাই, গ্রীকদের তুলনায় পাটীগণিতে তাঁদের এত বেশী উন্নতির কারণ।' যজুর্বেদ সংহিতায় আমরা বিভিন্ন বিরাট সংখ্যার নামকরণ পাই ঃ এক (১), দশ (১০), শত (১০০), সহস্র (১০০০), অযুত (১০,০০০), নিযুত (১,০০,০০০), প্রযুত (১,০০০,০০০), অর্বুদ (১০,০০০,০০০), ন্যর্বুদ (১০০,০০০,০০০), সমুদ্র (১,০০০,০০০,০০০), মধ্য (১০,০০০,০০০,০০০), অন্ত (১০০,০০০,০০০,০০০) ও পরার্ধ (১,০০০,০০০,০০০,০০০)। গ্রীকদের গণিতে মিরিয়াড (১০,০০০) এর উর্দ্ধে কোন সংখ্যার নাম পাওয়া যায় না। অক্ষরের সাহায্য সংখ্যা প্রকাশ করবার দুর্বলতার জন্যই বৃহৎ সংখ্যা চিরদিনই গ্রীকদের কল্পনাতীত থেকে গেছে।

এই সংখ্যা গণনা পদ্ধতি ইউরোপ আরবদের কাছ থেকে শিক্ষা করে; তাই ইউরোপীয়রা একে আরবীয় সংখ্যা বলে ধরে। কিন্তু আরবীয়রা নিজেরাই একে হিন্দুসংখ্যা বলে স্বীকার করে। কোলব্রুক বলেছেন — 'আরবরা স্পষ্টতই বিজ্ঞানে অধমর্ণ এবং তাদের নিজেদের স্বীকৃতি অনুসারেই এটা নিশ্চিত যে তাঁরা এই সংখ্যা গণনাপদ্ধতি হিন্দুদের কাছ থেকে শিক্ষা করেছিল।' Macdonell তাঁর History of Sanskrit Literature এ লিখেছেন —"বিজ্ঞানেও ভারতবর্ষের কাছে ইউরোপের ঋণ যথেষ্ট, প্রথমতঃ জগতে প্রচলিত সংখ্যা হিন্দুদের আবিষ্কার। শুধু অঙ্ক শাস্ত্রে নয়, সমস্ত সভ্যতার ক্রমবিকাশের উপর এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রভাব অপরিসীম। ৮ম ও ৯ম শতাব্দীতে ভারতীয়রা পাটীগণিত ও বীজগণিতে আরবদের শিক্ষাদাতা হয়েছিলেন এবং তাঁদের মারফতে পাশ্চাত্য জাতি সমূহের শিক্ষাদাতা।

এই দশ ধরে গণনা পদ্ধতিকে ইংরেজীতে Decimal Notation বলে। হিন্দুরা Decimal Notation আবিষ্কার করেছিলেন — বিশ্ববিখ্যাত পণ্ডিত ডঃ ব্রজেন শীল পতঞ্জলির ব্যাসভাস্য থেকে সূত্র উদ্ধৃত করে এই ধারণাকে সমর্থন করেছেন।

হিন্দুরা পূর্ণসংখ্যার যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, বর্গ, ঘন, ঘনমূল — এই ৮ রকমের প্রণালী জানতেন। মধ্যযুগে ইউরোপ ভাগকে একটা শক্ত জিনিষ বলে মনে করত। কিন্তু হিন্দুদের কাছে তা বেশ সহজ ছিল। বর্তমান ভাগের প্রণালী হিন্দুদের আবিষ্কার। বর্গমূল ও ঘনমূল বের করার বর্তমান নিয়মও হিন্দুদের দান। হিন্দুরা গ্রীকদের অনেক আগে, যে সমস্ত সংখ্যার বর্গমূল পূর্ণসংখ্যা হয় না, তাদের নিকটতম বর্গমূল বের

করার প্রণালী জানতেন। কোনও দু বা ততোধিক সংখ্যার পূরণফল ঠিক হয়েছে কিনা স্থির করার জন্য '৯' বাদ দিয়ে যে নিয়ম রয়েছে তাও হিন্দুদের।

ত্রৈরাশিকও প্রথম হিন্দুদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। ঠিক কোন সময় এই আবিষ্কার হয়েছে, তা নির্ণীত হয় নি। কিন্তু আর্যভট্ট প্রণীত গ্রন্থে ত্রৈরাশিকের নিয়ম পাওয়া যায়। আরবরা ত্রৈরাশিকের নিয়মও হিন্দুদের কাছ থেকে শিক্ষা করে। ভগ্নাংশ সম্বন্ধেও হিন্দুদের যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। দুই বা ততোধিক ভগ্নাংশের যোগ বিয়োগ করতে হলে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বের করতে হয়। ৯ম শতাব্দীর হিন্দু গণিতজ্ঞ মহাবীর* তাঁর গণিত সার-সংগ্রহে এই নিয়মের ব্যবহার করেছেন। তিনি লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক (ল,সা.গু) কে 'নিরুদ্ধ' নাম দিয়েছিলেন।

হিন্দুরা অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছন্দগণিত Permutation and Combination জানতেন। বিভিন্ন রকমের বৈদিক ছন্দ ঠিক করার জন্যই প্রথম এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে আচার্য পিঙ্গলের ছন্দশাস্ত্রে এ সম্বন্ধে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। Arithmetical and Geometrical progression কে ঋষিরা বলতেন 'শ্রেঢী'। আর্যভট্টের গ্রন্থে এ সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মও কষে দেখানো হয়েছে। কোনও সংখ্যাকে শূণ্য দিয়ে ভাগ করলে যে অনন্ত রাশি হয়, ভাস্করাচার্যের লীলাবতীতে তা পাওয়া যায়। সমান্তর বা গুণোত্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধতি বৈদিক হিন্দুরা জানতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে সমান্তর প্রগতির যোগফল নির্ণয়ের পদ্ধতি আছে। বৌধায়ন একটি বর্গ সংখ্যাকে কিরূপে একটি সমান্তর প্রগতিতে রূপান্তরিত করা যায় তা দেখিয়েছেন।

মোট কথা, হিন্দুরা পাটীগণিতে প্রাচীনকাল হতে অবিসম্বাদিত রূপে সমস্ত জাতির চেয়ে উন্নত ছিল। হিন্দুরা মূলতঃ ধর্মপ্রাণ জাতি। এই ধর্মই হিন্দুদের সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভের গবেষণা ও চর্চার প্রেরণা জুগিয়েছে। ঠিক সময়ে ধর্মকার্য করার জন্য হিন্দুরা জ্যোতিষশাস্ত্রের ভাল রকম চর্চা আরম্ভ করে। গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ না করলে জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত হওয়া যায় না। তাই তারা গণিতের চর্চা আরম্ভ করে। ভাস্করাচার্য তাঁর সিদ্ধান্ত শিরোমণি নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে একথা জোর করেই বলেছেন যে দুই প্রকারের গণিতশাস্ত্রে (ব্যক্ত ও অব্যক্ত) অভিজ্ঞ হলে তবে জ্যোতিষশাস্ত্র পাঠ করবার অধিকারী হয়, 'সোহন্যথা নামধারী' নইলে জ্যোতিষী নামধারীই হয়, সত্যিকারের জ্যোতিষী হয় না। একথা বোঝাবার জন্য অতি সুন্দর উপমা দিয়েছেন।

'ভোজ্যং যথা সর্বরসং বিনাজ্যং, রাজ্যং যথা রাজবিবর্জিতং চ।
সভা ন ভাতীব সুবক্তহীনা গোলানভিজ্ঞো গণকস্তথাত্র।''

ঘৃত ভিন্ন খাদ্য যেমন অখাদ্য, রাজা শূণ্য রাজ্য যেমন, ভালো বক্তাহীন সভা যেমন শোভা পায় না। গণিতশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ গণকও তেমনি। তাই আর্যভট্ট*, ব্রহ্মগুপ্ত* ও ভাস্করাচার্যের জ্যোতিষশাস্ত্রের পুস্তকে

---

* মহাবীর - দক্ষিণ ভারতের মহীশূর রাজ্যের অধিবাসী। গুনোত্তর প্রগতি, দ্বিঘাত সমীকরণের তিন প্রকার সমাধান, উপবৃত্ত, ভগ্নাংশ প্রভৃতির আলোচনার জন্য ভারতীয় গণিতের ইতিহাসে তাঁর আসন চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকলেও দ্বিঘাত সমীকরণের ক্ষেত্রে কাল্পনিক মূল অবশ্য তিনি বাদ দিয়ে গেছেন। তাঁর গণিত আলোচনা ব্রহ্মগুপ্ত অপেক্ষা বিশদ ও ব্যাপক হলেও মৌলিকতার দিক হতে তিনি ব্রহ্মগুপ্তের থেকে নিকৃষ্ট ছিলেন।

* আর্যভট্ট - আর্যভট্ট প্রণীত মহাসিদ্ধান্তেরই অপর নাম আর্যসিদ্ধান্ত। ইনি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। বৃদ্ধ আর্যভট্ট এবং আর্যভট্টীয় প্রণেতা আর্যভট্ট হতে ইনি পৃথক ব্যক্তি। কোন কোন বিষয়ে ভাস্করাচার্য আর্যসিদ্ধান্তকার আর্যভট্টের কাছে ঋণী ছিলেন। আর্যভট্ট বলেছেন 'ভপঞ্জরঃ স্থিরো ভূরেব বৃত্যাবৃত্য' ইত্যাদি। অর্থাৎ নক্ষত্রখচিত নভোমণ্ডল স্থির হলেও স্বীয় মেরুদণ্ড অবলম্বন পূর্বক ভ্রমণ করে। সেই জন্যেই গ্রহনক্ষত্রগণের উদয়াস্ত প্রতীয়মান হয়। তাঁর অপর সিদ্ধান্ত 'বৃত্তভপঞ্জরমধ্যে কক্ষয়া পরিবেষ্টিতঃ' ইত্যাদি। এইরূপ চিন্তাধারা থেকেই ভাস্করাচার্য বলেছেন - 'নান্যাধার স্বশক্তৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে' ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবীর কোন আধার নাই নিয়ত অন্তরীক্ষে অবস্থান করে এবং আমরা তার পৃষ্ঠদেশে বাস করছি। তাঁদের এসব গবেষণাই প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞানচর্চার প্রমাণ।

* ব্রহ্মগুপ্ত - ব্রহ্মগুপ্ত আর্যভট্টের পর গণিত ও জ্যোতিষে বিশেষ স্বকীয়তার পরিচয় দেন। অধ্যাপক সার্টন লিখেছেন, 'One of the greatest scientists of his race and the greatest of his time'. হিন্দু ভারতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের তীর্থক্ষেত্র উজ্জয়িনী ছিল তাঁর বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্র। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি 'ব্রহ্ম-স্ফুট সিদ্ধান্ত' রচনা করেন। বৃদ্ধ বয়সে খণ্ড-খাদ্যক (যার আরবী অনূদিত নাম অর্কন্দ) ও উত্তর খণ্ড খাদ্যক নামে আরও দুখানি জ্যোতিষীয় গ্রন্থ রচনা করেন। যার খ্যাতি দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। আরবী ভাষায় অনূদিত হয়ে এর নাম হয় 'সিন্দহিন্দ'। দিনের যে কোন সময়ে গ্রহদের সঠিক গতি ও অবস্থান কিভাবে নির্ণয় করা ছাড়াও লম্বন, সূর্যের ক্রান্তি, বলন ইত্যাদি জ্যোতিষীয় বিষয়ের নির্ভুল গণনা-পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রার নির্ণেয় ও অনির্ণেয় সমীকরণ ও বৃত্তস্থ চতুর্ভূজের নানা ধর্ম আবিষ্কার করে তিনি গণিতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

গণিতের বিশদ আলোচনা পাই। আর্যভট্ট তন্ত্রই এ বিষয়ে প্রাপ্ত পুস্তকের মধ্যে প্রাচীনতম। মাত্র ২৩ বৎসর বয়সে আর্যভট্ট এই গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ থেকে বুঝতে পারা যায় যায় যে তিনি এ বিষয়ে প্রথম লেখক নন; কিন্তু পূর্ববর্তী কোনো লেখকের বই এখনও পাওয়া যায় নি।

আর্যভট্ট কুসুমপুর বা বর্তমান পাটনায় এই গ্রন্থ রচনা করেন। আর্যভট্টের সময় সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে পাটনা অঞ্চলের মাতৃভাষা বা প্রাকৃতের তফাৎ বড় একটা ছিল না। আমাদের মাতৃভাষার সঙ্গে ইংরেজী যতটা তফাৎ উত্তর ভারতের কোন এক ভাষার সঙ্গে অন্য কোন ভাষার তার অর্ধেকটা তফাৎও নেই। আর সে সময়ে বলতে না পারলেও প্রায় সকলেই সংস্কৃত বুঝত। এরই কাছাকাছি সময়ে কালিদাসের শকুন্তলা ও শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটক লিখিত। ঐসব নাটকে সাধারণতঃ সভ্য ও শিক্ষিত সমাজের পুরুষরা সংস্কৃত ভাষায় কথা বলেছেন, মেয়েরা ও সাধারণ লোকেরা সংস্কৃত বুঝে প্রাকৃত ভাষায় উত্তর দিয়েছেন। কাজেই সংস্কৃত সে সময় সমাজের উচ্চ বা শিক্ষিত স্তরে এক রকম চলতি ভাষাই ছিল এবং প্রায় সকলেই সংস্কৃত বুঝত।

হিন্দু গণিতজ্ঞদের মধ্যে *ভাস্করাচার্যকেই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া যেতে পারে। তিনি ৩৬ বৎসর বয়সে ১১৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সিদ্ধান্ত শিরোমণি' রচনা করেন। তিনি সহ্য পর্বতের সমীপে বিজুবিড় বা বিজাপুর নামক স্থানের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ কৃতী দৈবজ্ঞ চূড়ামণি মহেশ্বর উপাধ্যায়ের পুত্র ও ছাত্র ছিলেন। লীলাবতী নামক পাটীগণিত ও বীজগণিত সিদ্ধান্ত শিরোমণির দুইটি অংশ।

এরূপ প্রবাদ আছে যে ভাস্করাচার্য তাঁর বিধবা কন্যা লীলাবতীকে পাটীগণিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত শিরোমণির পাটীগণিত অংশ লিখেছিলেন বলে তার নাম লীলাবতী। এ প্রবাদ সত্য নয়। লীলাবতীতে যেমন 'অয়ি বালে লীলাবতী'— হে বালিকে লীলাবতী — বলে সম্বোদন রয়েছে তেমন 'ব্রুহি সখে' ও ব্রুহি কান্তে' — সখা ও কান্তা বলেও সম্বোধন রয়েছে। নিজের মেয়েকে কেউ সখা ও কান্তা বলে সম্বোধন করতে পারে না। আমার মনে হয় লীলাবতী বলতে এখানে কোন মহিলাকেই বোঝায় না, লীলাবতী শব্দের অর্থ গুণসম্পন্না। এই অর্থে সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোড়ায় লীলাবতী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে; 'লালিত্য লীলাবতী' — মাধুর্য গুণসম্পন্না। নিজের পুস্তককে নিজেই গুণসম্পন্ন বলা যুক্তিবিরুদ্ধ — এই আপত্তি টিকতে পারে না, কারণ ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্ত শিরোমণির গোলাধ্যায়ের শেষেও লিখেছেন 'কবি ভাস্কর পণ্ডিতগণের সন্তোষপ্রদ, সুব্যক্ত, সুযৌক্তিক বাক্যবহুল, সহজবোধ্য, কুবুদ্ধি বিনাশক এই সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।'

বীজগণিতেও হিন্দুদের কৃতিত্ব যথেষ্ট। 'যদিও শেষোক্ত বিজ্ঞান (বীজগণিত) একটি আরবী নামে অভিহিত তথাপি এ দান আমরা হিন্দুদের কাছ থেকেই পেয়েছি' (Macdonel) 'যে সময় আরবরা বীজগণিতের কিছুই জানত না সেই সময়ে (অর্থাৎ আরবদের বহুপূর্বে) হিন্দুরা বীজগণিত আবিষ্কার করে' (কোলব্রুক)। বীজগণিতের ইংরেজী নাম অ্যালজেবরা (Algebra)। আরবদের মধ্যে বীজগণিতের প্রথম লেখক মহম্মদ মুশাআল্ খোয়ারেজমী (৮২৫ খৃঃ) কৃত 'আলজেব-ওয়াল-মোকাবেল' নামক বীজগণিতের গ্রন্থের নাম থেকে ঐ শব্দ নেওয়া হয়েছে। ইউরোপ আরবদের কাছ থেকে বীজগণিত শিক্ষা করে, কিন্তু আলখোয়ারেজমী তাঁর বীজগণিতের জ্ঞান হিন্দুদের কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন। আরবরা হিন্দুদের কাছ থেকে কেবল যে বীজগণিতের মূল পেয়েছিল তা নয় তারা গণনাপুস্তক ও দশ ধরে গণনা পদ্ধতিও হিন্দুদের কাছ থেকেই পায়' (মনিয়ার উইলিয়ামস্)। যদিও গ্রীক ও চীনারাও প্রাচীনকালে বীজগণিতের চর্চা করেছিল, তথাপি এই বিজ্ঞানে হিন্দুরাই অধিকতর ব্যুৎপত্তি লাভ করে।

ডাঃ বিভূতিভূষণ দত্তের মতে আধুনিক বীজগণিতের আকার ও ভাব মূলতঃ হিন্দুদের। হিন্দুরা বীজগণিত ও অব্যক্তগণিত এই দুই নামেই এই শাস্ত্রকে অভিহিত করত। অব্যক্ত গণিত অর্থ অজ্ঞাত রাশির গণনা বিজ্ঞান, আর বীজ শব্দের অর্থ মূল বা কারণ। ঋণাত্মক সংখ্যা (negative number) প্রয়োগের জন্য জগৎ হিন্দুদের কাছে ঋণী। প্রথম ধন (Positive) ও খনন সংখ্যাকে যথাক্রমে ঋক্ ও অনৃক বলা হত; পরবর্তীযুগে ব্রহ্মগুপ্ত প্রভৃতি গণিত পণ্ডিতরা এদের ধন ও ঋণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। বীজগণিতে সমীকরণ (equation) শব্দও

---

* ভাস্করাচার্য - প্রাচীন ভারতে আর আর একজন ভাস্করাচার্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন বেদান্ত ভাষ্যকার - সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রণেতা ভাস্করাচার্যের ঊর্ধ্বতন ষষ্ঠপুরুষ। তিনি ৯ম খ্রীষ্টাব্দের লোক। রাজা মিহিরভোজ তাঁকে 'কবি চক্রবর্ত্তী' উপাধি প্রদান করেন। তাঁর বেদান্ত-ভাষ্য বিশিষ্টাদ্বৈতাবাদের অন্তর্ভূক্ত। ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র কর্তৃক তাঁর মতবাদ খণ্ডিত হয়।

প্রথম। হিন্দু গণিতজ্ঞ ব্রহ্মগুপ্ত (৬২৮ খৃঃ) তা আবিষ্কার করেন। হিন্দু গণিতে চার রকমের সমীকরণের উল্লেখ পাওয়া যায় ঃ ১) একবর্গ সমীকরণ ২) অনেকবর্গ সমীকরণ ৩) মধ্যমাহরণ ও ৪) ভাবিত (Simple, Simultaneous quadratic equation and equation involving products fo two unknown quantities)। বর্গসমীকরণের (Quadratic equation) নাম মধ্যমাহরণ হওয়ার কারণ মধ্যম সংখ্যা অপনয়নের দ্বারা ঐ সমীকরণের সমাধান। এই প্রণালী প্রথম শ্রীধরাচার্য অবিষ্কার করেন।

বর্গ সমীকরণে অজ্ঞাত সংখ্যার ধন ও ঋণ এই দুইটি মূল্যই বের হতে পারে তা হিন্দু গণিতজ্ঞ পদ্মনাভের আবিষ্কার। শ্রীধরাচার্য ও পদ্মনাভ কৃত গণিতের পুস্তক এখনও পাওয়া যায় নি। ভাস্করাচার্যের গ্রন্থে তাঁদের নাম ও উপরোক্ত অবিষ্কারের উল্লেখ পাওযা যায়। বর্গসমীকরণে ভাস্করাচার্যের প্রণালী শ্রীধরাচার্যের প্রণালী থেকে তফাৎ এবং তা বর্তমান প্রচলিত প্রণালীরই অনেকটা অনুরূপ। হিন্দুরা বর্গসমীকরণের পূর্বে সমাধান করতে পারত। অনিশ্চিত একবর্গ সমীকরণ (Indeterminate equation of the first degree) বা কুটকের সমাধান আর্যভট্টের গ্রন্থেই পাওয়া যায়। তারপর অন্যান্য হিন্দু বীজগণিতজ্ঞদের চেষ্টায় ইউরোপের বহুপূর্বে সাধারণ সমাধান আবিষ্কৃত হয়।

আধুনিক কালে ১৬২৪ সালে Bajel De Maziriak ঐ নিয়ম পুনরায় আবিষ্কার করেন এবং Oylar ও Lagraze তার উন্নতি সাধন করেন। উপরোক্ত ইউরোপীয় গণিতজ্ঞদের প্রণালী ও আর্যভট্ট আবিষ্কৃত নিয়ম ফলতঃ একই। ভাস্করাচার্য অনিশ্চিত বর্গ সমীকরণেরও (Indeterminate equation of the 2nd degree) সাধারণ সমাধান আবিষ্কার করেছিলেন। এ বিষয়ে অংক শাস্ত্রের ইতিহাস প্রণেতা Kazori লিখেছেন — 'অনিশ্চিত সমীকরণ বিদ্যায় হিন্দুরা বেশ একটা সহজ নিজস্ব ভাব দেখিয়েছেন। আমরা আগেই বলেছি যে এ বিষয়টি গ্রীক বীজগণিতজ্ঞ Diophantus এর প্রিয় ছিল এবং তিনি কয়েকটি নির্দিষ্ট উদাহরণের সমাধান করতে অফুরন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু অংকশাস্ত্রের এই সূক্ষ্ম বিভাগে সাধারণ আবিষ্কারের গৌরব হিন্দুদেরই।'

আগেই বলেছি হিন্দুরা জ্যোতিষী গণনার সাহায্যের জন্য দুই প্রকারের অংক শাস্ত্রের চর্চা করে। তারা বীজগণিতের এই সূক্ষ্মগণনা জ্যোতিষশাস্ত্রে ও জ্যামিতিতে প্রয়োগ করেছেন। কোলব্রুক গবেষণা করে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন — 'যদি একথা স্বীকার করা যায় যে হিন্দু ও আলেকজেন্দ্রিয়ার দুইজন গণিতবিদ্ আর্যভট্ট ও ডায়োফ্যান্টাস্ প্রায় একই সময় করে, তবুও হিন্দু বীজগণিতজ্ঞদের পক্ষে একথা বলতে হবে যে তিনি এ বিজ্ঞানে অর্ধেক ব্যুৎপন্ন ছিলেন।' আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, *শ্রীধর, পদ্মনাভ ও ভাস্করাচার্য বীজগণিতে এমন সব প্রশ্নের সমাধান করেছেন যা ইউরোপে ১৭শ ও ১৮শ শতাব্দীতে পুনরায় আবিষ্কৃত হয়েছে। অংক শাস্ত্রের মধ্যেও হিন্দু গণিতবিদ্রা যে কবিপ্রতিভার নিদর্শন দেখিয়েছেন তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাস্করাচার্য থেকে একটি ছন্দগণিতের একটি বর্গ সমীকরণের উদাহরণ দিলেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে ঃ—

ছন্দগণিতের (Permutation & Combination) উদাহরণ ঃ—

পাশাঙ্কুশাহি ডমরুক কপাল শূলৈঃ খট্টাঙ্গ শক্তি শরচাপযুতৈ ভর্বন্তি।
অন্যোন্যহস্ত কলিতৈকতিমূর্ত্তি ভেদাঃ শম্ভোর্হরেরিব গদারি সরোজ শঙ্খৈঃ॥

অর্থাৎ মহাদেবের দশহাতে যথাক্রমে রজ্জু, অংকুশ, সাপ, ডমরুক, কপাল, ত্রিশূল,খাট তরোয়াল, তীর ও ধনুক এবং হরির চারহাতে শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্ম। মহাদেব ও হরির নিজ নিজ একহাতের জিনিষ অপর হাতে দিয়ে অদল বদল করলে কত প্রকারের মূর্ত্তি হয়?

উত্তর - মহাদেবের মূর্ত্তি - ৩৬২৮৮০০ ও হরির মূর্ত্তি - ২৪

---

* শ্রীধর - প্রাচীন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ শ্রীধর আবির্ভূত হন দশম শতাব্দীর শেষভাগে। আনুমাণিক ১০২০ খৃঃ তিনি রচনা করেন 'গণিতসার' বা 'ত্রিশতিকা'। শূণ্যের (০) তাৎপর্য বর্ণনায় শ্রীধর ত্রিশতিকার এক শ্লোকে যা লিখেছেন তার সাংকেতিক অর্থ হল $a \pm = 0$; $0 \times a = o$; $a \times 0 = 0$ অধ্যাপক সার্টনের মতে সংস্কৃত ভাষায় শূন্যের গুণ ও তাৎপর্য সম্বন্ধে এটাই সর্বাপেক্ষা পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল আলোচনা। দ্বিঘাত সমীকরনের সমাধানের সূত্র $x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$, তাঁরই প্রথম আবিষ্কার।

বর্গ সমীকরণের উদাহরণ — মেঘ দেখা দিলে একদল হাঁসের মধ্যে সমস্ত সংখ্যার বর্গমূলের দশগুণ মানস সরোবরে চলে যায়। ৮ ভাগের একভাগ স্থলপদ্মের বনে যায় এবং তিনজোড়া পদ্মের মৃণাল সুশোভিত জলে খেলা করতে থাকে। প্রিয় বালিকে বল দেখি, এই দলের মোট সংখ্যা কত? উত্তর - ১৪৪।

খুব প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে জ্যামিতির চর্চা আরম্ভ হয়। বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের বেদীর গড়নপ্রণালী স্থির করা থেকে জ্যামিতির উৎপত্তি। সমসাময়িক মিশর ও চীনদেশের চেয়ে ভারতবর্ষে জ্যামিতির উন্নতি অনেক বেশী হয়েছিল। অবশ্য পরবর্তী যুগে গ্রীকরা হিন্দুদের চেয়ে এ বিষয়ে উন্নতি করেছিল। কিন্তু এটা ভুলতে পারা যায় না যে জগৎ জ্যামিতির প্রথম শিক্ষার জন্য ভারতের কাছেই ঋণী, গ্রীসের কাছে নয়। (রমেশ দত্ত)

হিন্দু জ্যামিতির পুস্তক হিসেবে বৌধায়ণ ও আপস্তম্ভের 'শূল্বসূত্রের' নাম করা যেতে পারে। শূল্বসূত্র খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে লিখিত।

সমকোণী ত্রিভূজের একটি বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র অপর দুই বাহুর উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান। এই উপপাদ্য গ্রীকদেশীয় জ্যামিতিবিদ্ Pythagorus এর নামের সঙ্গে যুক্ত এবং একে সাধারণতঃ Pythagorus এর Theorem বলা হয়। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। বৌধায়ণে অছে —

১) সমচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুর্দ্বিস্তাবতীং ভূমিং করোতি। — সম চতুষ্কোণের কর্ণের উপরে অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের আয়তন ঐ চতুষ্কোণের দ্বিগুণ।

২) দীর্ঘচতুরস্রস্যাক্ষয়ারজ্জুপার্শ্বমানো তির্যঙমানোচ যৎ পৃথগ্‌ভূতে কুরুতস্তদুভয়ং করোতি। — দীর্ঘ চতুষ্কোণের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র চতুষ্কোণের পাশের ও নিচের দুই বাহুর অঙ্কিত দুইটি বর্গক্ষেত্রের সমষ্টির সমান। বৌধায়ণ পিথাগোরাসের বহু পূর্বে জন্মেছিলেন। অতএব এই উপপাদ্য প্রথম আবিষ্কারের সম্মান বৌধায়ণেরই প্রাপ্য।

শ্রয়ডার বিউরক প্রভৃতি পণ্ডিতেরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন যে পিথাগোরাস এই উপপাদ্য হিন্দুদের কাছ থেকেই সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু এমন অনেক পণ্ডিত আছেন যাঁরা হিন্দু জ্যানিতি গ্রীকদের কাছ থেকে ধার করা বলে আমাদেরকে হেয় করতে চান। বৌধায়ণ ও আপস্তম্ভের শূল্বসূত্র হিন্দুদের ধর্মকার্যে প্রামান্য ধর্মগ্রন্থ হিসাবে মান্য। যাঁরা হিন্দু প্রকৃতি জানেন তাঁরা একথা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেন না যে হিন্দুরা তাঁদের ধর্মপুস্তকে ধর্মকার্য বিষয়ক ব্যাপারে অত প্রাচীনকালে অন্যদেশের পণ্ডিতের মত এনে বেমালুম চালিয়ে দিয়েছে। বিশেষ অকাট্য প্রমাণ না পেলে যাতে হিন্দুদের ধর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এখন সব জিনিষ তারা নিজেরাই আবিষ্কার করেছে একথা নিঃসংকোচে ধরে নেওয়া যায়। অপরদিকে Pythagorus এর পুনর্জন্মবাদ বিশ্বাস ও হিন্দুদর্শনের অন্যান্য তত্ত্বের জ্ঞান ভারতীয় ঋষি প্রণীত পুস্তক ও চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় ছিল, তিনি যে এসব সযত্নে শিখেছিলেন — তা সুস্পষ্ট করে দেয়।

পৃথিবীর আবর্তনের জন্য দিবারাত্রি ভেদ হয়, এই তত্ত্ব আর্যভট্ট প্রথম আবিষ্কার করেন। তাঁর মত খণ্ডনের জন্য লল্ল, *বরাহমিহির ও ব্রহ্মগুপ্ত যে সমস্ত যুক্তি দিয়েছিলেন, ইউরোপে কোপার্নিকাস কর্তৃক ভূভ্রমণবাদ আবিষ্কারের পর সেই মত খণ্ডনের জন্য তায়কোব্রাহি নামক জ্যোতির্বিদ হিন্দু জ্যোতিষীদের প্রায় একহাজার বৎসর পরে ঠিক ঠিক তাঁদের যুক্তিগুলিও প্রয়োগ করেছিলেন।

— ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সমান বর্গক্ষেত্র, একটি বর্গক্ষেত্রের দ্বিগুণ, তিনগুণ বা অর্ধেক ও এক তৃতীয়াংশের সমান বর্গক্ষেত্র অঙ্কণ, বর্গের ক্ষেত্রফলের সমান ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট বৃত্ত অঙ্কণ প্রভৃতি বিবর "শূল্বসূত্রে" আছে।

---

* বরাহমিহির - বরাহমিহির ছিলেন ভারতবর্ষের প্লিনি। তাঁর জ্ঞান ছিল বিশ্বকোষের মত ব্যাপক। গণিত, জ্যোতিষ, ফলিত জ্যোতিষ, ভূগোল, মণিকবিদ্যা, প্রাণীবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিদ্যায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং গ্রন্থ-রচনা করেন। কিন্তু তাঁর বিদ্যার ভার যত ছিল ধার তত ছিল না। প্রাচীন হিন্দু বিজ্ঞান, বিশেষতঃ জ্যোতির্বিদ্যার ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বরাহের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষীয় গ্রন্থ 'পঞ্চসিদ্ধান্তিকা', এতে তিনি তিনি পৌলিশ, রোমক, বাশিষ্ঠ, সূর্য ও পৈতামহ সিদ্ধান্তের আলোচনা করেছেন। বরাহের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'বৃহৎ-সংহিতা'। এ গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ফলিত জ্যোতিষ। মানুষের উপর গ্রহাদির প্রভাব কাটাবার জন্য তিনি দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান নানাবিধ প্রস্তর, মণি, মুক্তা, প্রবাল এর বাহ্যিক গুণাগুণ সম্বন্ধে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনিই প্রথম নানারূপ রঞ্জক দ্রব্য বকুল, উৎপল, চম্পকের গন্ধ অনুকরণ করে কৃত্রিম উপায়ে সুগন্ধি দ্রব্য, ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যা, বজ্রলেপ নামক সিমেন্ট জাতীয় পদার্থের কথা ভারতবাসীকে জানিয়ে গেছেন। বরাহমিহির ক্ষুদ্র-বৃহৎ কয়েকটি জাতক রচনা করেছিলেন, যা আলবিরুনী আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।

বৌধায়ণ ও আপস্তম্ভের মতে —সমচতুর্ভুজের বাহুর পরিমাণ ১ হলে কর্ণের পরিমাণ $১+\frac{১}{৩}+\frac{১}{৩\times৪}+\frac{১}{৩\times৪\times৩৪}$; দশমিকে ব্যক্ত করলে ১.৪১৪২১৫৬ হয়। আধুনিক মতে $\sqrt{২}$ অথবা ১.৪১৪২১৩...। পঞ্চম দশমিক পর্যন্ত মিল রয়েছে।

— আর্যভট্ট পরিধি ও ব্যাসের অনুপাত দিয়েছেন ২২/৭। ভাস্করাচার্যের মতে ২২/৭ দিয়ে ব্যাসকে গুণ করলে স্থূল এবং ৩৯২৭/১২৫০ দিয়ে গুণ করলে নিকট পরিধি পাওয়া যায়। ৩৯২৭/১২৫০ প্রায় আধুনিক গণনাসম্মত, দশমিকে ব্যক্ত করলে ৩.১৪১৬...হয় আর আধুনিক গণনানুযায়ী ৩.১৪১৫৯।

এই রকম আরও অজস্র উদাহরণ দিয়ে দেখানো যাবে প্রাচীন ভারতে ঋষিরা পাত্রাধার তৈল কিংবা তৈলাধার পাত্রের শুষ্ক তর্ক বিচার কিংবা অতীন্দ্রিয় জগতের তূরীয় চিন্তাতেই বিভোর থাকতেন না, তাঁদের প্রজ্ঞা জ্ঞান বিজ্ঞানের বহু জটিলতম রহস্য ভেদ করেছিল।

— ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তিন বাহুর দ্বারা বের করার প্রণালী ইউরোপে ১৬শ শতাব্দীতে clouvius আবিষ্কার করেন। কিন্তু এই প্রণালী আনুমানিক ৩০০ খৃষ্টাব্দে লিখিত সূর্যসিদ্ধান্তে রয়েছে।

যথা — ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যে চারবাহু থেকে চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল বের করার প্রণালী আছে।

Trigonometry তেও হিন্দু ঋষিদের দান যথেষ্ট। Elphinstone তাঁর ভারত ইতিহাসে লিখেছেন — 'সূর্যসিদ্ধান্তে ত্রিকোণমিতির এমন পদ্ধতি রয়েছে যা গ্রীকরা জানতো না। শুধু তাই নয় এমন অনেক সমস্যার সমাধান রয়েছে যা ইউরোপে ১৬শ শতাব্দীর আগে আবিষ্কৃত হয়নি।'

হিন্দু ত্রিকোণমিতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে অধ্যাপক ওয়ালেশ এই মন্তব্য করেছেন —'একটি পুস্তক যতই প্রাচীন হোক তাতে যদি ত্রিকোণমিতি পাওয়া যায় তবে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে ঐ পুস্তক বিজ্ঞানের শৈশবে লিখিত হয় নি। কাজেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, সূর্যসিদ্ধান্তের বহু পূর্বে ভারতবর্ষে জ্যামিতির চর্চা হয়েছিল।' সত্যি কথা বলতে কি ত্রিকোণমিতিতে ঋষিদের অবদান এতই মৌলিক ও অপরিমেয় যে তা আধুনিকতম ত্রিকোণনিতির বিজ্ঞানের চেয়ে কোনও অংশেই কম নয়।

বর্ত্তমান ত্রিকোণমিতির $\sin\theta$ Co-$\sin\theta$ ও vised Sin বা $\sin^{-1}\theta$ হিন্দুরা প্রথম আবিষ্কার করেন। এদেরকে তাঁরা বলতেন যথাক্রমে জ্যা, কোটি-জ্যা এবং উৎক্রম জ্যা। এছাড়াও আরও অনেক আধুনিক ফর্মুলা তাঁর জানতেন। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রের প্রত্যেক পুস্তকে জ্যা, কোটি-জ্যা ও উৎক্রম-জ্যা'র সারণী রয়েছে। সূর্যসিদ্ধান্তের সারণীতে ত্রিকোণমিতির এমন পদ্ধতি রয়েছে যা ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রিগস্ পুনরায় আবিষ্কার করেছেন। প্রাচীন জ্যোতিষশাস্ত্রের ইতিহাস লেখক Dilamercy সূর্যসিদ্ধান্তের একটি গণনা- প্রণালীর উল্লেখ করে বলেছেন —'এখানে একটি প্রণালী রয়েছে যা হিন্দুরাই জানতেন, গ্রীকরা বা আরবরা জানতেন না।' ভাস্করাচার্যের লীলাবতীতে একটি বৃত্তের মধ্যে অঙ্কিত সমকোণী, সমবাহু ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, ষড়ভুজ, সপ্তভুজ, অষ্টভুজ ও নবভুজের বাহুর পরিমাণ বৃত্তের ব্যাসের হিসাব বের করার প্রণালী রয়েছে।

এই প্রণালী অনুযায়ী যে ফল পাওয়া যায় তা আধুনিক ত্রিকোণমিতি অনুযায়ী ফলের সঙ্গে তুলনা করলে অবাক হয়ে যেতে হয়। তুলনার জন্য ফল দশমিকে প্রকাশ করছি, অবশ্য ভাস্করাচার্য মূল পুস্তকে তা ভগ্নাংশে ব্যক্ত করেছেন—

আধুনিক ত্রিকোণমিতি অনুসারে		ভাস্করাচার্যের প্রণালী অনুসারে
ত্রিভুজের বাহু —	ব্যাস × .৮৬৬০২৫৪	ব্যাস × .৮৮৬৬০২৫
চতুর্ভুজের বাহু —	ব্যাস × .৭০৭১০৬৭	ব্যাস × .৭০৭১০৮৩
পঞ্চভুজের বাহু —	ব্যাস × .৫৮৭৭৮৫৩	ব্যাস × .৫৮৭৭৮৩
ষড়ভুজের বাহু —	ব্যাস × .৫	ব্যাস × .৫
সপ্তভুজের বাহু —	ব্যাস × .৪৩৩৮৮১৯	ব্যাস × .৪৩৩৭৯১৬
অষ্টভুজের বাহু —	ব্যাস × .৩৮২৬৮৩৫	ব্যাস × .৩৮২৬৮৩
নবভুজের বাহু —	ব্যাস × .৩৪২০২০১	ব্যাস × .৩৪১৯২৫

ঐসব সূত্র কি প্রমাণ করে না যে হিন্দু ঋষিগণ প্রাচীনতম কালেও ত্রিকোণমিতির মত কঠিন বিজ্ঞানে অতি উচ্চস্থান অধিকার করেছিলেন।

নিউটন, লাইবনিটসের ৫০০ বৎসরেরও অধিক পূর্বে ভাস্করাচার্য ব্যাসকলন বা Differential Calculus এর সূত্র আবিষ্কার করেন। হিন্দু জ্যোতির্বিদরা সাধারণত পরপর দুইদিন ঠিক একই সময়ে কোনও গ্রহের দেশান্তর ও Longitude বের করে দৈনিক গতি নির্ধারণ করতেন। ভাস্করাচার্য এই প্রণালীকে বললেন — 'স্থূল'—'ইয়ং কিল স্থূলাগতিঃ।' তিনি সূক্ষ্মগতি বের করার জন্য এক নতুন প্রণালী উদ্ভাবন করলেন যার নাম দিলেন —'তাৎকালিক প্রণালী'। এই তাৎকালিক প্রণালী যেভাবে ভাস্করাচার্য গ্রহের গতি নির্ধারণ করতে প্রয়োগ করেছেন তা Differential Calculus এর প্রণালী ভিন্ন অন্য কিছু নয়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ Spotish Wood ভাস্করাচার্যের ব্যাসকলন আবিষ্কার স্বীকার করে নিয়েও দুটি আপত্তি উত্থাপন করেন — ১) এই প্রণালীতে যে ফল বের হয় তা নিকটমাত্র একথা ভাস্করাচার্য বলেন নি। আর ২) অতি ক্ষুদ্র সময় ও স্থানের (Infinitisual time & space) উল্লেখ করেন নি। ডঃ ব্রজেন শীল এ দুটি আপত্তিকেই খণ্ডন করে দেখিয়েছেন যে ব্যাসকলন বা Differential Calculus এর আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় গণিতবিদ্‌রাও আবিষ্কার করেন নি যে এরকম গণনাফল নিকটমাত্র, তা পরে আবিষ্কৃত হয়েছে। কাজেই প্রথম আপত্তি টিকতে পারে না। দ্বিতীয় আপত্তি Spotish Wood-এর নিতান্ত অজ্ঞতাবশতঃ করেছেন। ভাস্করাচার্য একথা স্পষ্টই বলেছেন যে তাৎকালিক গতি খুব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের (প্রতিক্ষণ) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ভাস্কর তাঁর জ্যোতিষশাস্ত্রে এক সেকেণ্ডের প্রায় ৩৪০০০ ভাগের ১ ভাগকে কালপরিমাণ স্বরূপ ব্যবহার করেছেন এবং তার নাম দিয়েছেন 'ত্রুটি', 'প্রতিক্ষণের' চেয়ে ক্ষুদ্রতর সময়। কাজেই এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যে তিনি তাঁর তাৎকালিক প্রণালীতে খুব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সময়ের ব্যবহার করেছেন। স্থানের পরিমাণ হিসেবেও খুব ক্ষুদ্র সংখ্যাই ব্যবহার করেছেন। এইভাবে সব দিককার যুক্তি বিবেচনা করে ডঃ শীল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন —'ব্যাসকলনের আবিষ্কারক হিসাবে নিউটনের পূর্ববর্ত্তী বলে ভাস্করের দাবী সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত।'

ভাস্করাচার্যের বই থেকে আরও অনেক অঙ্কের উদ্ধৃতি দিয়ে এ বিষয় প্রমাণ করা যায়। শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় আর্যভট্ট (৯৫০ খৃঃ) এবং *মুঞ্জাল (৯৩২ খৃঃ) প্রভৃতি আরও হিন্দু গণিতজ্ঞের লেখায় ব্যাসকলনের সূত্রপাত দেখা যায়। Dilambrey সূর্যসিদ্ধান্তের একটি জ্যোতিষ সারণীর গণনা পদ্ধতি বিচার করে ঐ পুস্তকের গ্রন্থকার যে ব্যাসকলনের সূত্র জানতেন তা স্বীকার করেছেন।

জ্যোতিষশাস্ত্রেও হিন্দুরা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বৈদিক যুগ থেকেই জ্যোতিষের চর্চা করতেন। আজ চন্দ্র আকাশে যে জায়গায় আছে ২৭/২৮ দিন পরে আবার সে জায়গায় ফিরে আসবে এবং চন্দ্র যে সূর্যের আলোতেই তেজোময় — একথা বৈদিক ঋষিরা জানতেন। এক পূর্ণিমা বা অমাবস্যা থেকে অপর পূর্ণিমা ও অমাবস্যা পর্যন্ত ত্রিশবার সূর্যোদয় হয় লক্ষ্য করে তাঁরা ত্রিশ দিনে মাস স্থির করেন। পরে অবশ্য বিশেষভাবে লক্ষ্য করে বুঝতে পেরেছিলেন যে চান্দ্রমাস ঠিক ত্রিশ দিনে নয়, কিছু কম। আর একথা তাঁরা লক্ষ্য করেছিলেন যে বৎসরের আরম্ভে কোনও নক্ষত্র থেকে সূর্য গমন করলে ৩৬৫ দিনে আবার একত্র হয় অর্থাৎ ৩৬৫ দিনে এক বৎসর। কিন্তু ১২ চান্দ্রমাসে ৩৬৫ দিন হয় না; প্রতি তিন বৎসরে প্রায় ১মাস কম পড়ে। অতএব চান্দ্র ও সৌর বৎসরের সামঞ্জস্য করার জন্য তাঁরা প্রতি ৩ বৎসরে একটি 'মল' মাস কল্পনা করেন।

বর্তমানে ভারতবর্ষের অনেক জায়গায় সৌরমাস প্রচলিত, কিন্তু হিন্দুদের ধর্মকার্য প্রায় সবই তিথি ধরে। অতএব ঠিক ঠিক সময়ে ধর্মকার্য করার জন্য চন্দ্রের গতি বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার, তাই তাদের এ বিষয়ে জ্ঞান খুবই হয়েছিল — গ্রীকদের ততটা হয়নি। চন্দ্রের ভগন-ভোগকাল দশমিকে ব্যক্ত করলে সূর্যসিদ্ধান্ত মতে ২৭.৩১২৬৭ দিন এবং আধুনিক মতে ২৭.৩১২৬৬ দিন। সূক্ষ্মগণনার পরিচয় এর চেয়ে আর বেশী কি হতে পারে? এইভাবে আকাশ পরীক্ষার ফলে তাঁরা গ্রহদের সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ করেন।

বৈদিক ঋষিরা শুক্র ও বৃহস্পতি গ্রহের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন; তিলকের মতে তাঁরা মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি,

---

* মুঞ্জাল - মুঞ্জাল ছিলেন নবম শতাব্দীর একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ। তাঁর সঠিক জন্মস্থান জানা না গেলেও তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল উজ্জয়িনী। মুঞ্জালই ভারতীয় জ্যোতিষে সর্বপ্রথম অয়ন-চলন, অয়ন-চলনের বেগ ও তার তাৎপর্য্য আলোচনা করেন। তাঁর পূর্বে কোন ভারতীয় জ্যোতির্বিদের রচনায় এই গুরুত্বপূর্ণ জ্যোতিষীয় তথ্যের আলোচনা দেখা যায় না। ভাস্করাচার্যও অয়ন গতি বর্ণনা করবার কালে মুঞ্জালকেই প্রকৃত গ্রহণ করেছেন।

শুক্র ও শনি এই ৫টি গ্রহের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন।

হিন্দু জ্যোতিষীদের মধ্যে আর্যভট্টের নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য। পৃথিবীর আবর্ত্তনের জন্য যে দিবারাত্রি ভেদ হয় আর্যভট্টই প্রথম সে তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

'অনুলোমগতির্নৌস্থ পশ্যত্যচলং বিলোমসং যদ্বৎ।
অচলানি তানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্।'

অর্থাৎ পূবে চলতি নৌকায় উপবিষ্ট লোক যেমন নদীর দুই পারের অচল গাছ পাহাড় পশ্চিম দিকে চলছে এরূপ দেখেন তেমনি লঙ্কায় অর্থাৎ নিরক্ষদেশে (0° altitude) অচল নক্ষত্র সকলকে পশ্চিম দিকে যেতে দেখায়।

আর্যভট্টের প্রায় ১০০০ বছর পরে কোপার্নিকাস নামক জ্যোতির্বিদ ইউরোপে এই তত্ত্ব যথাবিধি প্রকাশ করেন।

আর্যভট্ট সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের কারণ ঠিক ঠিক জানতেন। চন্দ্র ও গ্রহ সকলের নিজের আলো নেই — সূর্যের আলোকে আলোকিত — তিনিই প্রথম এই মত ব্যক্ত করেন। গ্রহ সকল পৃথিবীর মত সূর্যের চারিদিকে ঘোরে এবং তাদের ভ্রমণ পথ, বা গ্রহকক্ষ যে ঠিক ঠিক বৃত্ত নয়, নীচোচ্চ বৃত্ত (epicycle) অর্থাৎ অনেকটা দীর্ঘবৃত্তের (ellipse) মতো তিনি একথাও বলেছিলেন।

'পৃথিবী যে গোলাকার'- বৈদিক ঋষিরাই একথা প্রমাণ করেছিলেন — 'কপিত্থ ফল বৎ বিশ্বম্'। (গোলাধ্যায়) ঋষিগণ পৃথিবী গোলাকার বলে স্বীকার করতেন। তার প্রমাণ পৃথিবীর গোলত্ব স্বীকার না করলে সূর্যের অগ্রে উষার উদয় বলার তাৎপর্য থাকে না। ভাস্করাচার্য সিদ্ধান্ত শিরোমণিতে একথা স্পষ্ট করেই বলেছেন

'যদি সমা মুকুরোদর সন্নিভা ভগবতী ধরণীতরণিঃ ক্ষিতেঃ
উপরি দূরগতোহ্পি পরিভ্রমণ্ কিমু নরৈ রমরৈরিব নেক্ষ্যতে।'

অর্থাৎ পৃথিবী যদি আয়নার মত সমতল হত, যে সূর্য বহু উপরে ও দূরে থেকে ভ্রমণ করছে তাকে দেবতারা যেমন সব সময় দেখতে পায় মানুষেরা তেমন পায় না কেন? যদি গোলাকারই হয় পৃথিবীর পৃষ্ঠ সমতল দেখা যায় কেন তা বুঝবার জন্য ভাস্করাচার্য অতি সুন্দর একটি উপমা দিয়েছেন —

সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশং পৃথ্বীচ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎ পৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা॥

অর্থাৎ একটি বৃত্তের পরিধির শতভাগের এক ভাগকে (অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে) যেমন সমান বোধ হয়, তেমনি মানুষ পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে পৃথিবীর খুব সামান্য অংশকে দেখতে পায় বলে তাকে সমতল দেখায়।

পৃথিবীর ব্যাস ও পরিধি কত তা অতি প্রাচীন কালেই হিন্দুরা স্থির করতে চেষ্টা করছেন। গোলাধ্যায়ের (৩/৫২) শ্লোকে বলা হয়েছে —

প্রোক্তো যোজনসংখ্যয়া কুপরিধিঃ সপ্তাঙ্গনন্দাব্ধয়
স্তদ্ ব্যাসঃ কুভুজঙ্গ-সায়কভুব সিদ্ধাংশকেনাধিকাঃ॥ *

ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করাচার্যের মতে পৃথিবীর ব্যাস যথাক্রমে ১৫৮১ ও ১৫৮১ $\frac{১}{২৪}$ যোজন; সূর্যসিদ্ধান্তের মতে ১৬০০ যোজন। এটা অধুনিক গণনাসম্মত কিনা স্থির করতে হলে যোজনের পরিমাণ জানা দরকার। 'লীলাবতীতে' আছে ৮ যবে ১ আঙ্গুল, ২৪ আঙ্গুলে ১ হস্ত, ৪ হস্তে ১ দণ্ড, ২০০০ দণ্ডে ১ ক্রোশ, ৪ ক্রোশে ১ যোজন। অর্থাৎ ৩২০০০ হাত বা ৯ $\frac{১}{১১}$ মাইল ১ যোজন। জ্যার অর্ধ ($\frac{১}{২}$) বোঝাতে যেমন ভাস্করাচার্য 'জ্যা' শব্দ ব্যবহার

---

* এই শ্লোকের পদগুলির অর্থ একটু জটিল। তাই ভেঙে দেখানো হচ্ছে। গোলাধ্যায়ের উপর স্বরচিত বাসনাভাষ্যে ভাস্করাচার্য 'সিদ্ধাংশ' পদে ১/২৪ ভগ্নাংশকে বুঝিয়েছেন। বোধ হয়, সাংখ্যের ২৪টি তত্ত্বের একাংশ বলাই আচার্যের অভিপ্রায়। সপ্ত = ৭, অঙ্গ অর্থাৎ ষড়ঙ্গাদি = ৬, নন্দ অর্থাৎ নবনন্দ = ৯, অব্ধি বা সমুদ্র = ৪, অতএব সপ্তাঙ্গনন্দাব্ধয় = ৭৬৯৪। এইভাবে কু অর্থাৎ পৃথিবী = ১, ভূজঙ্গ বা অষ্টনাগ = ৮, সায়ক অর্থাৎ পঞ্চবাণ = ৫, ভূ অর্থাৎ পৃথিবী = ১, অত্রএব কূভূজঙ্গ-সায়কভুবঃ = ১৮৫১। 'অঙ্কস্য বামাগতি' এই ন্যায়ানুসারে দুটি সংখ্যা পাওয়া গেল ৪৯৬৭ এবং ১৫৮১। ১৫৮১ এর সঙ্গে সিদ্ধাংশ যুক্ত হয়ে ১৫৮১ সংখ্যাটি পাওয়া গেল।

করেছেন, ব্রহ্মগুপ্ত ভাস্করাচার্য প্রভৃতি তেমনি যোজনার্ধ বোঝাতে যোজন শব্দ ব্যবহার করেছেন। এভাবে গণনা করলে পৃথিবীর ব্যাস ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের মতে ৭১৮২ মাইল হয়। কেউ কেউ ৫ মাইল যোজন ধরে ব্যাসের পরিমাণ ৭৯০৫ মাইল করেছেন। আধুনিক মতে ৭৯১৮ মাইল।

আগেই বলেছি পৃথিবী গোলাকার একথা বৈদিক ঋষিরা জানতেন। পরবর্ত্তী যুগে হিন্দুরা ভূগোলক কল্পনা করেছেন। ব্রহ্মগুপ্তের সময় এমনকি তার আগেও লঙ্কাকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ধরে তাঁরা কল্পনা করতেন। বেদে (ভাস্কর) আছে —'লঙ্কা কুমধ্যে যমকোটিরস্যাঃ প্রাক্ পশ্চিমে রোমক পত্তনং চ'। আজকাল আমরা যে ভূগোল পড়ি, তাতে গ্রীনিচ্‌কে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থল ধরে ভূগোলক কল্পনা করা হয়। কিন্তু লঙ্কাকে কেন্দ্র করে ভূগোল লিখলেও ভূগোলের কোনও ত্রুটি হয় না। জ্যোতিষ বিষয়ক পরীক্ষার জন্য হিন্দুরা 'শঙ্কু, ঘটি, প্রভৃতি কিছু কিছু যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। ঐ সব সাধারণ যন্ত্রের সাহায্যে তাঁরা খুব সূক্ষ্ম গণনা করতেন। একটি গ্রহ যতদিনে একবার সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসে ততদিনকে তাঁরা ভগন-ভোগকাল বলতেন। আধুনিক ও সূর্যসিদ্ধান্ত মতে কয়েকটি গ্রহের ভগন-ভোগকাল তুলনার জন্য দিচ্ছি ঃ —

গ্রহের নাম	সূর্যসিদ্ধান্ত মতে	আধুনিক মতে
বুধ	৮৭.৯৫৮৫	৮৭.৯৬১৩
শুক্র	২২৪.৬৯৮৫	২২৪.৭০০৮
মঙ্গল	৬৮৬.৯৯৭৫	৬৮৬.৯৫০৫
বৃহস্পতি	৪৩৩২.৩২০৬	৪৩৩২.৫৮৪৮
শনি	১০৭৬৫.৭৭৩০	১০৭৫৯.২১৯৭

পৃথিবীর উপরিভাগে বায়ুমণ্ডল কতদূর ব্যাপী এ বিষয়েও ঋষিরা গবেষণা করেছেন। ভাস্করাচার্যের মতে 'ভূমের্বহির্দ্বাদশ যোজনানি।' অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল দ্বাদশ যোজন পর্যন্ত। পূর্বে ৫০/১১ মাইলে ভাস্করাচার্যের যোজন ধরা হয়েছে, তাহলে প্রায় ৫৫ মাইল হয়, আধুনিক মতে সাধারণভাবে ৫০ মাইল।

১৬১০ খৃঃ-এ নক্ষত্রাদি পরীক্ষার জন্য দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় এবং তার পর থেকেই জ্যোতির্বিদ্যার দ্রুত উন্নতি হয়েছে। এর আগে জ্যোতির্বিদ্যায় হিন্দুরা কোনো জাতির চেয়ে কম উন্নত ছিল না। বরং হিন্দু ঋষিরাই ছিলেন এ বিষয়ে পথিকৃৎ।

গণিতশাস্ত্রের মতো জ্যোতির্বিজ্ঞানেও হিন্দুরা আরবদের তথা সমগ্র জগতের শিক্ষাদাতা। অধ্যাপক জ্যাচাউ তাঁর আলবেরুনী কৃত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ইংরেজী অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন — আব্বাস বংশীয় খলিফাদের রাজত্বকালে দুই সময়ে আরবরা হিন্দুদের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করে ঃ—

১) মনসুরের রাজত্বকালে (খৃঃ ৭৫৩-৭৭৪) প্রধানতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ২) হারুণের রাজত্বকালে বারমাক নামক মন্ত্রী পরিবারের প্রভাবে (যাঁরা ৮০৩ খৃঃ পর্যন্ত মুসলমানদের উপর প্রভূত্ব করেছিলেন) বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞান ও গ্রহফল গণনাবিদ্যা।

তিনি আরও লিখেছেন — 'তারা টলেমির আগে ব্রহ্মগুপ্তের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছিল'। Colbrook এর মতেও 'গ্রীক্ দেশীয় কোনও জ্যোতির্বিদ বা গণিতজ্ঞের লেখার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার আগে আরবরা হিন্দু জ্যোতিষ ও সংখ্যা-গণনা পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।'

বিজ্ঞানে ঋষিদের আর একটি অত্যাশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছি। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আবিষ্কারক বলে নিউটন জগৎ বিখ্যাত। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অংকশাস্ত্রের ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন কিন্তু পৃথিবীর আকর্ষণে যে ভারী বস্তু সকল উপর থেকে পৃথিবীতে পড়ে তা বেদের গোলাধ্যায়ে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে —

আকৃষ্টি শক্তিশ্চ মহীর্তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎ পততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে।

অর্থাৎ আকর্ষণ শক্তির দ্বারা পৃথিবী যখন আকাশস্থ (উপরিস্থিত) গুরুবস্তু নিজ শক্তিদ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ করে তখন মনে হয় যেন ঐ সকল বস্তু পড়ছে অর্থাৎ বাস্তবিক পক্ষে তারা পড়ছে না, পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তির জোরেই পৃথিবীতে আসছে।

এই শ্লোকে চতুর্থ লাইনে আছে — 'সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং মে' — সকল দিকে সমান আকর্ষণে আবদ্ধ অর্থাৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এমন অবস্থায় পৃথিবী আকাশে কোথায় গিয়ে পড়বে। এর অর্থ এই যে পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য প্রভৃতি পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এবং সেই আকর্ষণ শক্তির বলেই কেউ নিজ কক্ষ চ্যুত হয় না।

সিদ্ধান্ত-শিরোমণি অধ্যয়ন করলেও বুঝতে পারা যায় যে নিউটনের জন্মের বহু পূর্বেই ভাস্কারাচার্য ধনুনিঃসৃত বান উর্ধমুখে নিক্ষিপ্ত হয়েও পুনরায় অধোমুখে পতিত হয় কেন তার বিচারে প্রবৃত্ত হয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব ও সমগ্র জড় পদার্থের আপীড়ন* তত্ত্ব আবিষ্কার করে ফেলেন।

ঋষিদের ঐ আবিষ্কৃত তত্ত্বের বহু পরে বিজ্ঞানীরা জেনেছেন যে The earth, the stars, the planets are rotating in the Celestial meridian round their own respective axis & orbits making different angles but ties with each other with their respective centripetal and centrifugal force.

সভা যখন শেষ হল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। পুরোহিতজী সন্ধ্যা আরতির জন্য মন্দিরে গেলেন। আরতির শেষে যখন পুরোহিতজী সহ সকলে ফিরে এলাম তখন মহানন্দস্বামী পুরোহিতজীর হাত দুটি জড়িয়ে ধরে বললেন — অনেকদিন হয়ে গেল। এবার প্রসন্ন মনে আমাদের এবার দক্ষিণতট ধরে এগিয়ে যাবার অনুমতি দিন। এখনও প্রায় ঝাড়ি ও উপত্যাকা পথ ধরে প্রায় তিনশ মাইল আমাদের অতিক্রম করতে হবে। আমরা কালই যাত্রা করতে চাই। পুরোহিতজী বললেন — তথাস্তু। মা নর্মদা আপনাদের মঙ্গল করুন। কপালেশ্বরজীকে স্মরণ করে এগিয়ে যান। মনে রাখবেন উপনিষদের ঋষিদের সত্য ঘোষণা — চরণ বৈ মধু বিন্দতি, চরণ স্বাদুমুদম্বরম্। পশ্য সূর্যস্য শ্রেমানং যোন তন্দ্রয়তে চরণ্। চরৈবেতি, চরৈবেতি।

পথিক তুমি এগিয়ে চল। যে চলে সেই মধু পায়, তার গতি কোনদিন স্তব্ধ হয় না। চললেই সত্যের সন্ধান পায়, জ্যোতির স্পর্শ পায়। সূর্য নিরন্তর চলছেন বলেই এত জ্যোতির্ময়। তীর্থে বেরিয়ে পড়লে তীর্থ দেবতাই রক্ষা করেন। শিব সহস্রনাম পাঠ করে শুয়ে পড়লাম। রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, নর্মদাতটের এই মহাতীর্থে এসে আমি যে মহার্ঘ বস্তু লাভ করেছি — সেই মহার্ঘ বস্তু অবশ্যই বাবার পুণ্য স্পর্শ।

বাবার কথা মনে পড়ল। আমি মাথা নত করে ভক্তিভরে প্রণাম জানালাম ঋষি পিতাকে। এ সংসারে কয় জনের পিতাই বা নিজের প্রাণপ্রিয় বাছনিকে তরুণ বয়সেই পাঠিয়ে দেন একা একা এই হিংস্র শ্বাপদ অধ্যুষিত এই ঘনঘোর ভয়ংকর ঝাড়ি পথে যেখানে প্রতি পদে মৃত্যু ওৎ পেতে থাকে। তিনি পাঠিয়েছিলেন, নর্মদা পরিক্রমার অজুহাতে ভগবানের এই বিচিত্র সৃষ্টির বৈচিত্র্য দু-চোখ ভরে দেখতে, তার থেকে শিক্ষা নিতে, রস গ্রহণ করতে। আমি পরমানন্দে ভগবানের সৃষ্টি দেখে বেড়াব, ঋষিকুল সেবিত 'ভারতাজির' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গন বলে চিরবন্দিতা ভারতের পর্বত ও অরণ্য পথে ঘুরে ঘুরে তাঁর মহিমা উপলব্ধি করব। তারপর আমার মুক্তি হোক বা না হোক, দিব্যানুভূতির স্পর্শ আমার কপালে জুটুক না জুটুক, সে সব তত্ত্বভাবনা করার কথা আমার নয়। আমি না থাকলেই বা কি? সেই অপূর্ব শিল্পী যিনি এই অপরূপ দৃশ্য সৃষ্টি করেছেন — যুগে যুগে শুধু তিনিই থাকুন, তাঁর সৃষ্টি চলুক এমনই সুন্দরভাবে কল্প হতে কল্পান্তরে, কত শত বিশ্বে, কত সহস্র ব্রহ্মাণ্ডে রূপে রূপে তিনি লোক লোকান্তরে পূর্ণ করে মহাকালের পথহীন পথে অনন্তকাল একা চলুন, চঞ্চল বালকের মত সরল চপল, আনন্দোজ্জ্বল নৃত্যছন্দে হেসে গেয়ে, জগতের সকল বস্তুর মধ্যে তাঁরই আনন্দরূপ লীলায়িত হয়ে উঠুক, আমরা তা উপলব্ধি করে যেন বলতে পারি — ওহো! আনন্দম্! আনন্দরূপম্ অমৃতং যদ্ বিভাতি।

শোবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যতীশ্বরানন্দজীর সাড়া পেয়ে জেগে উঠলাম। তিনি তাড়া দিচ্ছেন — 'উত্তিষ্ঠিত! জাগ্রত! ভেইয়া জাগো!' সবাই জেগে গেছেন। ঘড়িতে সাড়ে ছটা বেজেছে। ফাঁকা হয়েছে বটে তবে সূর্যোদয় হয় নি।

আমাদের দলের অধিকাংশ প্রাতঃকৃত্য সারতে গেছেন। আমি ও রঞ্জন দাঁড়িয়ে আছি। এবার আমরাও যাব বলে উদ্যোগ করছি। আমি রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে ঘাটে গেলাম স্নান করতে। স্নান তর্পণাদি সেরে আসতে আসতে সূর্যোদয় হয়ে গেছে। এমন সময় বেদধ্বনি উঠল —

* বিশ্বগোলকের জড় পদার্থ সমূহ যে পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করছে তারই নাম আপীড়ন।

স্নানুরয়ং ভারহরেঃ কিলাভূদধীত্য বেদংন ন বিজানাতি যোহর্থম।
যোহর্থজ্ঞ ইৎসকলং ভদ্রমশ্নুতে নাকমেতি জ্ঞান বিধূত পাপ্ম॥

— যিনি বেদের স্বর ও পাঠ মাত্র সমাপ্ত করেছেন অথচ অর্থ জানেন না। তিনি শাখা পত্র এবং ফল পুষ্পের ভারবহনকারী এবং ধান্যাদির ভারবহনকারী পশুর ন্যায় ভারবাহ অর্থাৎ ভারবহনকারী মাত্র। আর যিনি যথাবিহিত স্বর জেনে বেদপাঠ করেন এবং বেদার্থ সম্যকরূপে জানেন। তিনিই পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হয়ে জ্ঞান বলে পাপ সমূহ বর্জন করে পবিত্র ধর্মাচরণ প্রভাবে দেহান্তের পর সর্বানন্দ লাভ করে যাচ্ছে।

পুরোহিতজীর মন্ত্র ব্যাখ্যা শেষ হলে আমরা তাঁকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় প্রার্থনা করলাম। পুরোহিতজী প্রত্যেককে 'নম নারায়ণায়, হর নর্মদে' বলে আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন —

তোমার পিতা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়েছেন। কষ্ট হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার মনে রাখা উচিত — শোক এবং দুঃখ হচ্ছে মানবজীবনের মহৎ অধিকার। এই অধিকার হতে দেবতারা বঞ্চিত। দুঃখ হচ্ছে মানুষের জীবনে মুক্তির যৌতুক। এই যৌতুক মানুষকে অপরাজিত মনুষ্যত্ব দান করে। রামচন্দ্র দুঃখ পেয়েছিলেন, দুঃখ পেয়েছিল বুদ্ধদেব। শোক দুঃখের পতাকা তিনি যাকে তাকে দেন না, যাকে দেন বইবার ক্ষমতাও দেন। মাটির তালটাকে কুমোর গড়ে পিটে আঘাত দেয়, কিন্তু তার হাতটি থাকে পেছনে। ঘট প্রস্তুত করার জন্য এই আঘাত প্রয়োজন। আঘাতে চঞ্চল হয়ো না, আড়ালে যে মঙ্গল হস্ত এবং মঙ্গল উদ্দেশ্যটি আছে, তার অনুসন্ধান কর। মনে রেখ, দুঃখের হুল না ফুটলে মানুষের জীবন কখনও ফুল হয়ে ফুটে ওঠে না।

নর্মদার বুক উঁচু হয়ে উঠেছে। এপার ওপার দুই তট যেন এক হয়ে গেছে। এপারের দক্ষিণতট এবং ওপারের উত্তরতট, দুই-এর মধ্যস্থলে জল ছাড়া আর কিছু নাই। আমরা খুব সন্তর্পণে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে এগোতে লাগলাম।

সকাল ৮টা নাগাদ আমরা কপালমোচন তীর্থ হতে যাত্রা করেছিলাম। আমাদের বাম পাশে তটের নিচেই অজস্র গাছপালার ভীড়, বড় বড় অশ্বত্থ, বট, অর্জুন, শিমুল, পাকুড় ছাড়াও বহেড়া ও আমলকী যেন নর্মদার ঐ উচ্ছল ও উদ্দাম বেগ দেখে সমানে মাথা উঁচু করে সারিবদ্ধ হয়ে এগিয়ে চলেছে। গাছপালার সারির ওধারে কিছুটা দূরে দূরে অনেক বসতিও দেখা যাচ্ছে। প্রায় দুই মাইল হাঁটার পর সকাল সাড়ে ৯টার সময় আমরা মোহিপুরা গ্রামে এসে পৌঁছলাম। এখানে একটি বিরাট শিবমন্দির। প্রেমানন্দ বললেন — এটি ভার্গব ঋষি প্রতিষ্ঠিত মন্দির। এখানে ঋষি এক হাজার যজ্ঞ করেছিলেন। সহস্রযজ্ঞরূপ তীর্থে প্রণাম করে আবার আমরা হাঁটতে লাগলাম হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে, এবারে রাস্তা একটু বদলাল। এতদূর পর্যন্ত নর্মদার গতিপথ একভাবেই ছিল, এখন দেখছি নর্মদা হঠাৎ আধ মাইল সরে গিয়ে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করেছেন। প্রায় আধ মাইলটাক এইভাবে যাবার পর নর্মদার কিনারে পৌঁছলাম। সেই কিনারা ধরেই সোজা পূর্বমুখে হাঁটতে লাগলাম। নর্মদা প্রশস্তরা হয়ে, বুক উঁচু করে প্রবাহিত হওয়ার পর, এখানে দেখছি হঠাৎ তট থেকে সরে গিয়ে একটি সরলরেখার মত বয়ে চলেছেন। কিন্তু গতিবেগ একই রয়েছে। পাহাড়ী পথ, বন জঙ্গলে ঢাকা। আরও তিন মাইল হেঁটে গেলে আমরা দেব নদীর সঙ্গমস্থল লোহারেয়াতে পৌঁছাতে পারব। বেলা দেড়টা বাজতে যায়। সেখানেই আজ রাতে কাটাবো।

অবশেষে আমরা মনোরম এক পল্লীতে এসে পৌঁছে গেলাম। কাছাকাছি কোন পাহাড় নেই, চারিদিকে অনেক ঘরবাড়ী, চার জন রাখাল বালক এক পাল গরু মহিষ মাঠে চরিয়ে নিয়ে তাদের পাহাড়ী ভাষায় গান গাইতে গাইতে বাড়ী ফিরছে। আমরা জঙ্গল ও হিংস্র জন্তুর পরিবর্তে সমতলভূমির মত শান্ত, নিরুপদ্রব স্থানে এসে পৌঁছলাম।

আমি এবং হরানন্দজী একজন রাখাল বালককে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করতেই সামনে নর্মদাতটের উপর পাঁচটি মন্দির দেখিয়ে বললেন — ইহ পর্বতেশ্বর, নর্মদেশ্বর, বরুণেশ্বর, মারুতেশ্বর, শিবযোগেশ্বরজীকা মন্দর। মন্দিরগুলি একই চত্বরে পাশাপাশি অবস্থিত। মন্দিরগুলির প্রধান দরজার পাশেই বসেছিলেন এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসী। মন্দিরগুলির ভিতর প্রদীপ জ্বলছে। প্রদীপের শিখা কৃষ্ণবর্ণের লিঙ্গগাত্রে পড়ায় তা চিক্‌চিক্‌ করছে। মনে হল যেন জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। আমরা মন্দিরস্থ মহাদেবের অপরূপ সুন্দর লিঙ্গমূর্ত্তিগুলি দর্শন করে প্রণাম করলাম। মন্দিরের পুজারী নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন — ইয়ে শরীর কা নাম শুদ্ধানন্দ। পাণ্ডবোঁনে বনবাসকে সময় ইধর যজ্ঞ কিয়া থা। উসী যজ্ঞকী ভস্মসে এ লিঙ্গকী উৎপত্তি হুয়া হ্যায়। তপোভূমি হ্যায়।

ইন স্থানোমেঁ তপ করনেবালা মুক্ত হো যাতা হ্যায়। আভি বেলা চার বাজ গিয়া হোঙ্গে। ম্যাঁয় নাটমন্দিরকা দরজা খুল দেঁতে হেঁ। আজ রাতমেঁ ইধারই ঠারিয়ে কাল সুবে মহাদেবজীকা আশীর্বাদ লেকর যাত্রা করেঙ্গে। আপলোগোঁকো ব্রহ্মাণতীর্থ কা পথ জরুর বাতা দেঙ্গে। পরিক্রমা ক্ষুদ শ্রেষ্ঠ তপস্যা হৈ। পরিক্রমা সফল হোনে সে তপস্যা মেঁ সিদ্ধি মিলতি হৈ।

কথা বলতে বলতে তিনি নাটমন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। বিশাল নাটমন্দির। যে যার আসনে শয্যা বিছিয়ে আমরা হরানন্দজীর সঙ্গে নর্মদা স্পর্শ করতে ঘাটে চললাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ঘাটে পৌঁছে আমি হরানন্দজীকে বললাম — সকালে যাত্রা করার পূর্বে পুরোহিতজী বললেন — দুঃখ হচ্ছে মানুষের জীবনে মুক্তির যৌতুক। দুঃখের হুল না ফুটলে মানুষের জীবন কখনও ফুল হয়ে ফুটে ওঠে না। তেমনি বাবার মৃত্যু-রূপ দুঃখের হুল আমার জীবনে ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে। আমি অন্য গুরু জানি না, অন্য ঈশ্বর জানিনা। হঠাৎ তাঁকে হারিয়ে জীবনের আলো-আনন্দ সব যেন চিরতরে শেষ হয়ে গেল। চোখে অন্ধকার। তাঁর প্রেমসুন্দর, ক্ষমাসুন্দর স্থূল বিগ্রহটি চোখের সামনে নেই। 'বাবা' বলে ডেকে প্রাণে যে তৃপ্তি পেতাম, সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে যিনি আমার পরম আশ্রয়, তিনি চলে গেলেন। এখন আমি একান্ত অসহায় এবং অনাথ — এটাই মর্মে মর্মে অনুভব করছি।

কবি বলেছেন মৃত্যু নাকি 'শ্যাম-সমান'। বাবাও মৃত্যুকে বলেছেন 'জীবনের মহোৎসব', পুরোহিতজী মৃত্যুর মধ্যে 'মঙ্গলবিধান' দেখেছেন, সর্বশাস্ত্রশিরোমণি বেদও বলেছেন — 'জীবন-মৃত্যু, শোক এবং বিচ্ছেদের দ্বারাই জীবন-কাব্য করুণ-সুন্দর হয়!'

দেবস্য পথস্য কাব্যম্ মহিত্বাদ্যা মমার স হ্যঃ সমান।

(সামবেদ, ছন্দ আর্চিক, ৪/১/৪/৩)

'দেখ দেখ দেবতার কাব্য — আজ যা মৃত্যু, কাল তা জীবন হয়ে ফুটে উঠেছে। কী তার মহিমা! কী অপূর্ব সঙ্গীত জীবন-মৃত্যুর তান লয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।'

এইসব মহাবাণীকে অবিশ্বাস করছি না। তবুও এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে মৃত্যু মানুষের জীবনে একটি নিষ্ঠুর অভিশাপ — সে এমন এক ক্রুর ঘাতক, যে এক পলকেই মানুষের হৃদপিণ্ডকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়।

আমার জীবনের প্রিয়-পরম একমাত্র ঈশ্বর অপ্রকট হয়েছেন, এইটাই এখন রূঢ় সত্য।

আমার পিতা সাধারণ ছিলেন না। তিনি ছিলেন সোমযাজী সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। তাঁর মহৎ জীবন এবং অপার স্নেহের কথা যতই অনুধ্যান করছি, ততই আমার দৃঢ় প্রতীতি হচ্ছে —

পিতা হি লোকে পুরুষঃ প্রধানো হিতো মহাত্মা পরমোহনকুলঃ।
অহেতুক স্নেহরসস্য মূর্ত্তিঃ প্রজাপতির্বা স্বয়মেব মূর্ত্তঃ॥
বিভুর্মহাত্মা মহসা বিভাব্য সসর্জ পূর্বাণ পুরুষাণ্ প্রজার্থম।
ত এব পশ্চাৎ পিতরো হি লোকে মনুষ্যরূপেণ সদা চরন্তি॥
আত্মানুরূপান্ তনয়ান্ বিধায় প্রাণাত্যয়েহাপি প্রযতেত ভর্ত্তুম।
বিত্তং মহিষ্টং বিতরেচ্ছ বিদ্যাং কলুক্রমোহশৌ ননু মর্ত্তরূপঃ॥
ভিক্ষাটনং কৃচ্ছ্রগতোহাপি কুর্ব্বন্ পুষ্ণাতি পুত্রান্ করুণার্দ্রচিত্তঃ
মন্যে বিধাতা হি নরানুকম্পী চরেৎ পৃথিব্যাং ধৃতমর্ত্ত্যরূপঃ॥

সত্য কথা বলতে কি, বাবাকে হারিয়ে আমি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলাম না। এরমধ্যে একদিন সহসা মনে পড়ল যে বাবা ছিলেন বেদ-প্রাণ। বেদপাঠের মধ্যে শান্তির সন্ধান পাই কিনা, এই আশায় ঋগ্বেদটি খুলে বসতেই প্রথমেই যে পাতাটা খুলে গেল, তাতে দেখলাম ত্রিত ঋষি ভক্তি-স্নিগ্ধ ভাষায় আকুতি জানাচ্ছেন —

প্র তে যক্ষি প্র ত ইয়র্মি মন্ম ভুবো যথা বন্দ্যো নো হবেষু।
ধন্বন্নিব প্রপা অসি ত্বমগ্ন ইয়ক্ষবে পুরবে প্রত্ন রাজন॥ (ঋ১০/৪/১)

'হে পিতঃ, আমার এই কান্না তোমারই উদ্দেশ্যে। তুমি আমার ধ্যান এবং উপাসনা, আমার একমাত্র বরণীয় এবং বন্দনীয়; তুমি প্রকাশিত হও। হে অগ্নি, হে পরমাত্মন, হে আমার অন্তরের অন্তরতম দেবতা, শান্তির আশায় আমি তোমারই শরণ নিলাম।

যং ত্বা জনাসো অভি সঞ্চরন্তি গাব উষ্ণমিব ব্রজং যবিষ্ঠ
দূতো দেবনামসি মর্ত্যানামন্তর্মহাঁশ্চরসি রোচনেন॥ (ঋ১০/৪/২)

হে জ্যোতির দেবতা, গরুর পাল যেমন শীতার্ত হয়ে গোশালার আশ্রয় খোঁজে, তেমনি ব্যথাহত কাতর মানুষ শান্ত্বনার আশায় তোমার পানেই ছুটে চলেছে। মর্ত্তমানুষের তুমিই একমাত্র গোপ্তা, সহায় ও সম্বল। পাপী, তাপী, দীন, অদীন সকলেরই বন্ধু তুমি। তুমি মহৎ মহিমায় নিজেকে প্রকাশ কর। তোমাকে প্রণাম জানাই।'

বাবার কথাই সত্য হল। বাবা যে বলতেন, বেদমন্ত্র চিন্ময়, তার প্রতিটি বর্ণেই চেৎবাণীর হিল্লোল আছে, একথা মর্মে মর্মে অনুভব করলাম। অনুভব করলাম যে, বেদ শুধু জ্ঞানেরই অক্ষয় ভাণ্ডার নয়, বেদমন্ত্র শক্তিরও অমেয় উৎস।

পিতৃপুরুষেদের স্মরণ করার জন্য আমি কোন কালাকাল বিচার করতে প্রস্তুত নই। পিতৃঋণ হতে মুক্ত হব, এ প্রত্যাশাও আমি করি না। আমৃত্যু পিতৃঋণ আমি সানন্দে বহন করতে চাই। এই বলে আমি ঘাটে নামলাম। নর্মদায় জল বেশ ঠাণ্ডা। আমি তর্পণ করতে আরম্ভ করলাম। তর্পণের কোন সামগ্রীর আমার কাছে নাই। বাবাকে স্মরণ করে সাশ্রুনেত্রে জানালাম — নরাধম পুত্রের হাতে পবিত্রতম নর্মদা বারি গ্রহণ করে তৃপ্ত হও হে দয়াল। বাবাকে স্মরণ করে বন্দনা করলাম —

যুগ যুগান্ত আসে আর যায় বহি শুধু একই ভাষা
আনেনা শ্রবণে তব মধুবাণী আঁখিতে আলোর আশা।
আকাশে বাতাসে আলোকে আঁধারে তোমারই পরশ খুঁজি
স্খলিত পাতার মৃদু মর্মরে মনে হয় আস বুঝি।
নির্জন রাতে একাকী যে জাগি কত না প্রহর গণি,
কতবার হায় চমকিয়া উঠি —শুনি যেন পদধ্বনি।
এস এস পিতঃ! নয়নের আগে আঁধারের আলো লাগে
তব পথ চাহি অধম পুত্র আজও যে সে একা জাগে।

তর্পণ যখন শেষ হল, তখন রঞ্জন জানাল পৌনে ছটা বেজেছে।

এক কমণ্ডলু জল নিয়ে মন্দিরে ঢুকে মহাদেবের মাথায় ঢেলে নাটমন্দিরে নিজের আসনে এসে বসলাম। সকলেই খুব ক্লান্ত। ত্রিদিবানন্দ জপে বসেছিলেন — জপের মালা রেখে দিয়ে শুয়ে পড়লেন। পরিহাস করে বললেন — কয়েকদিন আরামে থাকার পরে আজ এতটা হেঁটেছি যে — এখন ভগবান তো দূরে কথা গুরুর নাম, এমন কি বাবার নামও ভুলে গেছি। তখন একমাত্র রঞ্জনকেই দেখলাম, কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে গুণ্ গুণ করছে, তার একতারাটি নিয়ে। হরানন্দজী তার দিকে তাকিয়ে বললেন — ছোকরার যে রস উথলে উঠেছে। 'ছোকরা' বললুম বলে কিছু মনে করো না ভাই, আমার আবার বদরোগ আছে, জ্বর, সর্দি, মাথাধরা, গায়ে হাতে কোন ব্যথা হলে, যে কোন দৈহিক কষ্টে আমি অদৃশ্য সেই শত্রুকে যা ইচ্ছা তা ভাষায় চিৎকার করে গালাগালি করে থাকি। একসঙ্গে অমরকন্টক পর্যন্ত যেতে হবে, তখন আমার এই স্বভাবের দোষ বলে রাখাই ভাল। তাছাড়া এতদিনে একসঙ্গে থাকার ফলে আশা করি আমার স্বভাবটি ভালই বুঝতে পারছ।

আচ্ছা ভাই, এমন্ একটা গান শোনাতে পার, যাতে পথশ্রমের কষ্ট ভুলতে পারি?

আমি বললাম রঞ্জনভাই-এর কণ্ঠে যে যাদু আছে, তা আমি জানি। আমি এ কথাটি বলার সঙ্গে সঙ্গে একতারাটি পাশে রেখে দিয়ে রঞ্জন বেশ আবেগের সঙ্গে গলা ছেড়ে গান ধরল —

ভব ভয় ভঞ্জন পুরুষ নিরঞ্জন
রতিপতি গঞ্জনকারী,
যতি-জন-রঞ্জন মন-মদ-খণ্ডন
জয় ভব-বন্ধন-হারী॥
জয় জন-পালক সুর দলনায়ক
জয় জয় বিশ্ববিধাতা,
চিরশুভ সাধক মতি মলপাবক
জয় চিত সংশয়ত্রাতা॥
সুর নর বন্দন বিজয়-বিবর্দ্ধন
চিতমলনন্দনকারী,

রিপুচয়মন্থন জয় ভবতারণ,
স্থল-জল-ভূধর-ধারী॥
শমদমমণ্ডন অভয়-নিকেতন
জয় জয় মঙ্গলদাতা
জয় সুখ সাগর নটঘর নাগর
জয় শরণাগত পাতা
ভ্রমতমভাস্কর জয় পরেমশ্বর
সুখকর সুন্দরভাষী,
অচল সনাতন জয় ভবপাবন
জয় বিজয়ী অবিনাশী॥
ভকত বিমোহন বরতনুধারণ
উদগীথ কীর্ত্তন ভোলা
গদগদ ভাষণ চিতমনতোষণ
ঢলঢল নর্ত্তনলীলা॥
মতিগতিবর্জ্জন কলিমলমর্দন
বিষয়-বিরাগ প্রসারী,
জয়-চিত চেতক ভব জল ভেলক
জয় নর-মানস-চারী॥
জয় পুরুযোত্তম অনুপম সংযম
জয় জয় অন্তরযামী,
খরতর সাধন নর দুঃখবারণ
জয় গুরুদেবনমামি॥

রঞ্জন গানের প্রতিটি আখর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতে লাগল বেশ দরদ দিয়ে। তালে লয়ে সুরে স্বরে এমন মাধুর্য ঝরে পড়তে লাগল কণ্ঠ দিয়ে যে, সেই মধুর তানের টানেই দেখলাম, সকল সন্ন্যাসী উঠে বসেছেন। হঠাৎ মোমবাতিটা নিভে গেল। সূচীভেদ্য অন্ধকার কিন্তু রঞ্জনকে নিরস্ত করতে পারল না। সে একই রকম আবেগে দরদ দিয়ে গাইতে লাগল।

ভব ভয় ভঞ্জন পুরুষ নিরঞ্জন
রতিপতি গঞ্জনকারী,
যতি-জন-রঞ্জন মন-মদ-খণ্ডন
জয় ভব-বন্ধন-হারী॥

রঞ্জনের কণ্ঠ নীরব হতেই সন্ন্যাসীরা বলে উঠলেন — হর নর্মদে, হর নর্মদে। রঞ্জনের মিষ্টি গানের রেশ যেন কানে এখনও গুণ্ গুণ্ করছে।

ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল, একবারে ৬টায়। সন্ন্যাসীরা প্রায় সকলেই জেগে উঠেছেন। প্রত্যেকেই স্তব পাঠ করছেন, কেউ মহাদেবের, কেউ নারায়ণের, কেউ মহেশ্বরী পার্বতীর, কেউ বা নর্মদার।

আরও ঘন্টাখানেক পরে প্রাতঃকৃত্যের টানে সবাইকে উঠে পড়তে হল। মহাদেবানন্দ সকলের উদ্দেশ্যে বললেন — তাড়াতাড়ি করুন। আমরা এখুনি যাত্রা করব।

হরানন্দজী — অত তাড়া কিসের। আমরা কি অফিস করতে বেরিয়েছি। যে সময়ে না পৌঁছালে খাতায় দাগ পড়ে যাবে! পরিক্রমা করতে বেরিয়েছি, যেখানে যতক্ষণ ইচ্ছা থাকব, ঘুরব, তারপর গন্তব্যস্থানে যাব। হরানন্দজীর মুখ ঝাপটা খেয়ে মহাদেবানন্দ চুপ করে গেলেন।

একটু বেলা হতেই আমরা ঝোলা, গাঁঠরী, লাঠি, কমণ্ডলু ইত্যাদি নিয়ে মহাদেবকে প্রণাম করে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকে 'নম নারায়ণ' জানালাম। যতীশ্বরানন্দ আমাদের তরফে শুদ্ধানন্দজীকে জানালেন — আপকো শিষ্ট ঔর স্বাগত সৎকারকো লিয়ে হার্দিক ধন্যবাদ। আভি হম্‌লোগ চল পড়ে।

শুদ্ধানন্দজী বললেন — হিঁয়াসে সিধা চলা যাইয়ে। দশ মিল কা দূরীমে আপলোগেনে মিলেগে ব্রাহ্মণগাঁও বা ব্রহ্মাবর্ত তীর্থ। পাঁচ মিলকা দূরী পর মিলেগা মারুকী চিচলী গাঁও। ইসকে করীব দু'মিল আগে দেব নদীকা সঙ্গম নর্মদাজী সে হুয়া হ্যায়। বাস্তব মেঁ মার্গ অত্যন্ত হী ঘন জঙ্গলো ঔর গহন বনো মেঁ হৈ। দৃশ্য অত্যন্ত হী সুন্দর। মা নর্মদা আপলোঁগোকা ভালা করেঁ।

আমরা যাত্রা শুরু করলাম। প্রস্তরাকীর্ণ পথ। নর্মদা আমাদের বাম দিক দিয়ে বয়ে চলেছেন। সূর্যরশ্মির তেজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গা গরম হয়ে উঠেছে। ঘেমে নেয়ে উঠেছি। আমরা গায়ের পোশাক-আশাক খুলে ফেললাম। সবাই একসঙ্গে 'হর-হর বম-ববম-বম' ধ্বনি দিতে দিতে বেলা এগারটা নাগাদ চেচলী গাঁও অতিক্রম করে এগিয়ে চললাম। কোথাও কোথাও নর্মদা পাহাড়ের মধ্যে গুপ্ত হয়েছেন বলে নর্মদার কোন চিহ্নিত তটরেখা নেই, জলের ধার হতে গাছ উঠে এসেছে বলে কোন কোন অংশ শুধু জঙ্গলে ঢাকা। উত্তরতটেও আমি এরকম দৃশ্য দেখেছি।

পথে কয়েকজন দেহাতী লোকের সঙ্গে দেখা হতেই তারা ব্রহ্মাবর্ত তীর্থের পথ দেখিয়ে দিলেন। আমরা দক্ষিণ-পূর্ব কোণের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। একই পাহাড়ী রাস্তা, সামনে দু দুটো ছোট পাহাড় পড়ল। কড়া রোদ উঠেছে। অনেক ঝোপঝাড় আর পাথরের চাঙড় ডিঙ্গিয়ে শাল সেগুনের তলা দিয়ে প্রায় মাইল তিনেক হেঁটে আসার পর বেলা ৩টা নাগাদ এসে পৌঁছলাম আমাদের অভিষ্ট স্থানে। সুন্দর ঝকঝকে বাঁধানো ঘাট। সদাশিব ভাই নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি নর্মদা মাতার কৃপা লাভ করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই বিশাল ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। ঘাটে অনেক লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে। ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরেও ভক্তের ভীড়। ঘাটের পিছনেই মূল শহর। এখানে স্কুল, কলেজ, দোকান, বাজার, তিন-চারটে ধর্মশালা এবং দুটো বড় সদাবর্ত আছে। ডাক-ঘর আছে। নর্মদা এখানে বেশ চওড়া। ঘাটের উপরেই একটা পাথরের শিবমন্দির। আমরা স্নান করে সকলেই মন্দিরে ঢুকলাম শিবপূজা করতে। মন্দিরে গিয়ে দেখি পুরোহিতজী একটি প্রজ্জ্বলিত তামার যজ্ঞকুণ্ডে ব্রহ্মেশ্বর বা গুপ্তেশ্বর মহারুদ্রের উদ্দেশ্যে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন। পুরোহিতজী উৎসুক নেত্রে আমাদের দিকে বার কয়েক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — পরিক্রমাবাসী হো। আজই পধাঁরে?

জী হাঁ — সংক্ষিপ্ত জবাব দিলাম। সাধারণতঃ পুরোহিতজীরা পরিক্রমাবাসীদের পূজা করান না। তাই আমাদের আগে পূজা করার জন্য তিনি ভক্তদেরকে সরিয়ে দিলেন। শিবলিঙ্গটি চমৎকার মসৃণ। প্রায় দু'ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ। মাথায় একটি রূপার সাপ। আমরা যে যার ইষ্টমন্ত্র জপ করতে করতে ব্রহ্মেশ্বরের মাথায় জল ঢাললাম, তারপর প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। ব্রাহ্মণ পুত্র করজোড়ে আমাদের তাদের গৃহে যাবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাল।

ব্রাহ্মণের পুত্রের নাম গণপতি। তাকে প্রশ্ন করে জেনে নিলাম, তার পিতার নাম উমাপতি শাস্ত্রী। পণ্ডিত ব্যক্তি।

গণপতি আমাদেরকে তাদের বাড়ীতে এনে তুলল। একটি বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। সেই ঘরে আসন পেতে বসিয়ে ব্রাহ্মণী মা আমাদের পা ধুইয়ে দিয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে আমাদের মাথায় চার পাঁচটা করে ফুল দিলেন। ভোজ্য বস্তু সাজিয়ে দিলেন রুটি সব্জী ও ঘোল। খেয়ে উঠে দেখি গণপতি ও ব্রাহ্মণী মা আমাদের গাঁঠরী খুলে কম্বল ও চাদর বিছিয়ে দিয়েছেন।

হরানন্দজী বললেন — এ ত কেবল অতিথি সেবা নয়, এ ত অতিথিকে পূজা। অতিথি হলেন নারায়ণ। অতিথিকে নারায়ণ জ্ঞানেই সেবা পূজা করতে হয়। মহাভারতে অতিথি পরায়ণতার অনেক উপাখ্যান আছে। অতিথিকে উপেক্ষা করলে নরকগামী হতে হয়। তবে অতিথিকে শিব বা নারায়ণ জ্ঞানে অর্চনা আজকাল আর দেখা যায় না।

শাস্ত্রীজী পূজা সেরে মন্দির বন্ধ করে বাড়ী ফিরতে তাঁর সাড়া পেয়ে আমরা ঘর থেকে উঠে এসে বাইরে বসলাম। দেখলাম শাস্ত্রীজী খুবই ক্লান্ত। সারাদিন শিব পূজার ধকল গেছে। ব্রাহ্মণী মা দৌড়ে এসে পাখার বাতাস করতে লাগলেন। গণপতি তামাক সেজে গড়গড়াটা সামনে রেখে গেলেন। শাস্ত্রীজী দু'চারবার গড়গড়ায় সুখটান দিয়ে বলতে লাগলেন — পুরাকালে ব্রহ্মাজী এই তীর্থে শিব আরাধনায় রত হলে এই ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গের উৎপত্তি হয়। এর রং বেগুনি। সন্ধ্যাকালে আরতির সময় দেখবেন শিবলিঙ্গ অতি বেগুনী রূপ ধারণ করে। এখানে যে মন্ত্রে শিবের আরতি হয় সেই মন্ত্রে ভারতবর্ষের আর কোথাও শিবের পূজা হতে দেখবেন না। খুঁটিয়ে

দেখলে দেখবেন শিবলিঙ্গের গায়ে ছোট ছোট ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্র পথে তেজোময় রশ্মি নির্গত হয়। এই স্থান পিতৃ-তীর্থ হিসাবে খ্যাত। ব্রহ্মেশ্বর মহাদেব এতই জাগ্রত যে, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে দুবার স্বতঃই তাঁর রূপ ও রং একটু একটু করে বদলে যায়। এছাড়া ব্রহ্মেশ্বর লিঙ্গের আরও একটি কাহিনী প্রচলতি আছে যে — চিত্রসেন নামক এক গন্ধর্বের পুত্র পত্রেশ্বর ছিলেন অসাধারণ রূপবান এবং বীর। তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু স্বর্গে দেবগণের সভায় নৃত্যশীলা অপ্সরা মেনকাকে দেখে তিনি কামভাবে জর্জরিত হয়ে মেনকার মর্যাদা লঙ্ঘন করেন। তাতে দেবরাজ কুপিত হয়ে বলেন

সত্যশৌচরতানা ধর্মিষ্ঠানাং জিতাত্মনাম্।
লোকাহয়ং পাপিনাং নৈব ইতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ॥

যাঁরা সত্যনিষ্ঠ, শৌচপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্মাত্মা, এই স্থান তাঁদেরই জন্য। ইন্দ্রিয়পরায়ণ পাপীদের স্থান স্বর্গে নাই। তুমি মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে বার বৎসর কাল ইন্দ্রিয় সংযম করে যদি রেবাতটে শান্ত শিবের আরাধনা করতে পার, তবেই পুনরায় সদ্‌গতি প্রাপ্ত হতে পারবে।

নর্মদাতটমাশ্রিত্য দাবদশাব্দং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আরাধয় শিবং শান্তং পুনঃ প্রাপ্সসি সদ্‌গতিম্॥

পত্রেশ্বর এরপর ব্রহ্মাবর্ত তীর্থে এসে ব্রহ্মেশ্বরের আরাধনায় মগ্ন হন এবং সিদ্ধি লাভ করেন।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তাঁর সঙ্গে মন্দিরে গেলাম আরতি দেখতে। যেতে যেতে বললেন — পূজা বলতে ফুল-বেলপাতা-চন্দন-ধূপ-দীপ ও নৈবেদ্য সহযোগে কেবল একটা অনুষ্ঠান মাত্রকে বুঝায় না।

পূজা শব্দের প্রতিশব্দ উপাসনা। উপাসনার অর্থ — সমীপস্থ হওয়া (উপ মানে সমীপে)। অন্তরের মধ্যে অন্তরতমকে উপলব্ধি। যিনি অন্তরতন, তদ্‌গত চিত্তে তাঁতেই লগ্ন হওয়া কিংবা আত্মস্বরূপ মগ্ন হওয়া, লীন হওয়ার নামই পূজা।

অমরকোষে পূজাকে বলা হয়েছে — অপচিতি। যথা — পূজা নমস্যাহপচিতি সপর্যার্চাহ্ণসমা ইত্যমরঃ। অপচিতি শব্দটি 'অপ' পূর্বক 'চি' ধাতুর উত্তরে ভাববাচ্যে 'ক্তি' প্রত্যয় করে নিষ্পন্ন হয়েছে। 'চি' ধাতুর অর্থ সঞ্চয় করা, চয়ন করা এবং অপ উপসর্গের অর্থ বিপরীত অর্থাৎ যা সঞ্চয় ও চয়নের বিপরীত। অতএব অর্থ দাঁড়াল — দেহাদি সর্বপ্রপঞ্চকে অসঞ্চয় বা পরিত্যাগের নাম অপচিতি বা পূজা। পূজা শব্দের আর একটি পর্যায় অর্চনা — অর্চ + নট্ (ভাবে), স্ত্রীং আপ্। অর্চ ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া। ক্ষর ভাব, জীব ভাব ত্যাগ করে ব্রহ্মভাবে দীপ্ত হওয়া, স্বরূপে স্থিতি — এরই নাম পূজা।

আচার্য শঙ্কর কৃত 'নির্গুণমানসপূজা' বা 'পরাপূজা'তে সকল অর্থই ব্যঞ্জিত। পরাপূজার অপর নাম 'আত্মপূজা'।

শ্রুতি উপদেশ দিয়েছেন — সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। আচার্য নিজের অনুভবও এই বলে ব্যক্ত করেছেন,

ন মে বন্ধো ন মে মুক্তি ন মে শাস্ত্রং ন মে গুরুঃ।
মায়ামাত্রবিলাসো হি মায়াতীতোহমদ্বয়ঃ॥ ২০ (স্বাত্মপ্রকাশিকা)

আত্মরূপী নাহি মোর বন্ধন, মোচন,
নাহি মোর শাস্ত্র কোন, কেহ গুরু নন।
এ সবি নিশ্চয়ই মায়া-মাত্রের বিলাস,
মায়াতীত আমি শুধু অদ্বয় প্রকাশ॥

এই যদি তত্ত্ব হয়, ব্রহ্ম যদি নির্গুণ, নির্বিশেষ এবং একমেবাদ্বিতীয়ম্ হন, তাহলে তাঁর পূজা বা উপাসনার পদ্ধতি কি? সম্ভবতঃ কেউ এই প্রশ্ন করায় আচার্য সেই জিজ্ঞাসুকে হৃদয়স্পর্শী মধুর কাব্যাকারে উত্তর দিয়েছেন। সেই প্রশ্নোত্তরই 'নির্গুণমানসপূজা' নামে প্রকাশিত। প্রশ্নাংশে ৮টি শ্লোক এবং উত্তরাংশে ২৫টি শ্লোক রয়েছে। বর্তমানে বহুক্ষেত্রেই প্রশ্নাংশের ৮টি শ্লোকের সঙ্গে আরও ৬টি শ্লোক যোগ করে, তার নাম দেওয়া হয়েছে — পরাপূজা বা আত্মপূজা। আমি এখানে 'নির্গুণমানসপূজা' নামে অভিহিত ৩৩টি (৮ + ২৫) শ্লোকের মূল সংস্কৃত এবং তার পদ্যানুবাদ শুনাচ্ছি, শুনুন।

বলা বাহুল্য, এই শ্লোকাবলী শঙ্করের মনীষা ও সাধনার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। এই অমূল্য রচনায় কেবল যে বাহ্যোপচারাদির রূপকের আবরণটি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে তা নয়, জ্ঞানমার্গীদের অবলম্বনীয় শ্রবণমননাদির গূঢ় পদ্ধতিও ব্যক্ত করা হয়েছে। শঙ্করের মতে পূজা বা শ্রবণমননাদির উদ্দেশ্যই হল — সর্ববিধ কামনাবাসনা ত্যাগের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, শ্রদ্ধাভক্তির উদ্রেক, চিত্তের একাগ্রতা লাভ, অহমিকার বিসর্জন, আত্মস্বরূপের ধ্যান, পরিশেষে স্বরূপস্থিতি এবং ব্যাপ্তিচৈতন্যের অনুভূতি। এই দিব্যরস আস্বাদন করে সুখী হোন, তৃপ্ত হোন।

নির্গুণমানসপূজা

(ক)

শিষ্য উবাচ

অখণ্ডে সচ্চিদানন্দে নির্বিকল্পৈকরূপিণি। স্থিতিহদ্বিতীয়ভাবেহস্মিন্ কথং পূজা বিধীয়তে॥ ১
অখণ্ড সচ্চিদানন্দে নির্বিকল্পে একরূপে — এ অদ্বয়ভাবেতে থাকি পূজা হবে কিবা রূপে?
পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্বাধারস্য চাসনম্। স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যং চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥ ২
পূর্ণ যিনি কোথা তাঁর হবে আবাহন? সর্বাধার যিনি তাঁর কোথায় আসন?
স্বচ্ছ যিনি তাঁর পাদ্য-অর্ঘ্যে প্রয়োজন! শুদ্ধ যিনি তাঁর কোথা হয় আচমন?
নির্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ। অগোত্রস্য ত্ববর্ণস্য কুতস্তস্যোপবীতকম্॥ ৩
মলশূন্য নিরমল — তাঁর কোথা স্নান? সর্ব বিশ্ব যাঁর মাঝে তাঁর পরিধান!
গোত্রহীন আর যিনি বর্ণ বিরহিত, কোথা হতে আসিবে গো তাঁর উপবীত?
নির্লেপস্য কুতো গন্ধঃ পুষ্পং নির্বাসনস্য চ। নির্বিশেষস্য কা ভূষা কোহলঙ্কারো নিরাকৃতেঃ॥ ৪
নির্লিপ্তের কোথা হবে গন্ধানুলেপন? বাসনা-বিহীনে কিবা পুষ্পোপঢৌকন!
নির্বিশেষ যিনি, তাঁর ভূষা[১] কি প্রকার? আকৃতিহীনের কিবা হয় অলঙ্কার[১]!
নিরঞ্জনস্য কিং ধূপৈ দীপৈ র্বা সর্বসাক্ষিণঃ। নিজানন্দৈকতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং কিং ভবেদিহ॥ ৫
নিরঞ্জন যিনি তাঁর ধূপে কিবা হবে? সর্বসাক্ষী যিনি তাঁর দীপে কি করিবে?
এক নিজানন্দে তৃপ্ত যিনি অনুক্ষণ, নৈবেদ্যতে বল তাঁর কিবা প্রয়োজন?
বিশ্বানন্দয়িতাতুস্তস্য কিং তাম্বুলং প্রকল্পতে। স্বয়ংপ্রকাশচিদ্রূপো যোহসাবর্কাদিভাসকঃ॥ ৬
বিশ্বের আনন্দদাতা যিনি প্রভু, তাঁর তাম্বুল কি হতে পারে কভু উপচার?
স্বয়ং প্রকাশ যিনি পূর্ণ চিদরূপ, যিনি সেই সূর্যাদিরও আলোক-স্বরূপ।
প্রদক্ষিণমনন্তস্য প্রণামোহদ্বয়বস্তুনঃ। বেদবাচামবেদ্যস্য কিংবা স্তোত্রং বিধীয়তে॥ ৭
অনন্তের প্রদক্ষিণ কি ভাবে সম্ভবে? সর্বত্র অদ্বয় যদি কে কারে নমিবে?
বেদের বাক্যেও যাঁরে নাহি যায় জানা, তাঁর স্তোত্র কিভাবেতে হইবে রচনা?
স্বয়ং প্রকাশমান কুতঃ নীরাজনং বিভোঃ। অন্তর্বহিশ্চ পূর্ণ্যস কথমুদ্বাসনং ভবেৎ॥ ৮
স্বয়ং প্রকাশমান যিনি অনুক্ষণ, সে বিভুর আরতি[২] বা কোথা নীরাজন[২]?
অন্তরে বাহিরে যিনি পূর্ণ সর্বক্ষণ, কোথায় কিরূপে তাঁর হয় বিসর্জন?

১। ভূষা ও অলঙ্কার — এই দুটি শব্দকে সাধারণতঃ সমার্থবাচক হিসাবে গণ্য করা হলেও এখানে আচার্য কর্তৃক শব্দ দুটির পৃথক পৃথক প্রয়োগের মধ্যে কোন পুনরুক্তি দোষ ঘটে নি। কারণ শব্দ দুটির মধ্যে সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। যেখানে যে শোভাটি নাই, যখন কোন বস্তুর সাহায্যে সেই অবিদ্যমান শোভাকে সৃষ্টি করা হয়, তখন তার নাম ভূষা — যেমন, পরিপাটি পোষাক এবং প্রসাধন দ্রব্যাদি। আর যার দ্বারা বিদ্যমান স্বাভাবিক শোভাকে পর্যাপ্তরূপে (অলং = পর্যাপ্ত) বর্দ্ধিত করা যায়, তার নাম অলঙ্কার — যেমন গহনা, বিদ্যা, বাগ্‌বিভূতি, আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি।

২। নীরাজন ও আরতি — সংস্কৃত 'নীরাজনম্' শব্দটির দুই রকম ব্যুৎপত্তি অনুসারে দুই রকম অর্থ করা যায়। ১) নীরস্য (শান্ত্যদকস্য) অজনম্ (ক্ষেপঃ) অত্র ইতি — নীর + অজ + ল্যুট্। শান্তিজলের প্রক্ষেপ রূপ ব্যাপার। এটি স্থূল অর্থ। ২) নিঃ (নিঃশেষণ) রাজনম্ (দীপনম্) অত্র ইতি — নির্ + রাজনম্; রাজ + নিচ্ + ল্যুট্ = নীরাজনম্ — কোন বস্তুকে ঘষে মেজে উজ্জ্বল করা রূপ ব্যাপার। অতএব, শব্দটির সূক্ষ্ম অর্থ দাঁড়াল — চিত্তরূপ দর্পন পরিমার্জিত করে জ্যোতির্ময় দীপ্তিমান্ পরমাত্মাকে প্রকট করে তোলাই প্রকৃত নীরাজন।

আরতির অর্থ নানা ভঙ্গীতে পঞ্চপ্রদীপ ঘুরানো নয়। আরতি এসেছে সংস্কৃত 'আরত্রিক' শব্দ হতে। এর অর্থ হল — অরাত্র্যাপি নিবৃত্তম্ ইতি অরাত্রি + ঠঞ্; দীপো হি রাত্রৌ এব প্রদর্শ্যতে, ইদং তু দিনেহপি দর্শ্যতে ইতি। অর্থাৎ অহোরাত্র সর্বদা প্রীতিপূর্বক পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় রূপ পঞ্চপ্রদীপের আলোকে সর্বত্র অন্তরে বাহিরে পরমাত্মা দর্শনই প্রকৃত আরতি। শুধু পঞ্চপ্রদীপ ঘুরিয়ে বিচিত্র অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শনে কি লাভ?

(খ)

শ্রীগুরুরুবাচ

আরাধয়ামি মণিসন্নিভমাত্মলিঙ্গং মায়াপুরীহৃদয়পঙ্কজসন্নিবিষ্টম্।
শ্রদ্ধানদীবিমলচিত্তজলাভিষেকৈঃ নিত্যং সমাধিকুসুমৈরপুনর্ভবায়॥ ১
আরাধনা করি আমি মণি-সমুজ্জ্বল এ মোর আত্মারে, যাহা প্রতীক সম্বল।
মায়াপুরী-তুল্য এই হৃদয়-পদ্মেতে সন্নিবিষ্ট যিনি সদা অপূর্ব ভাবেতে,
শ্রদ্ধারূপ নদীটির পূত চিত্তজলে সম্পাদিয়া অভিষেক ভাব কুতূহলে —
সমাধি-কুসুম দিয়া নিত্য পূজি তাঁরে, যাহাতে না জন্মি পুনঃ এ ঘোর সংসারে॥
অয়মেকোহবশিষ্টোহস্মীত্যেবমাবাহয়েৎ স্থিরম্। আসনং কল্পয়েৎ পশ্চাৎ স্বপ্রতিষ্ঠাত্মচিন্তনম্॥ ২
হেথা আর কিছু নাই আমি আত্মা বিদ্যমান, স্থিরচিত্তে এ ধারণা তারে বলি আবাহন।
অতঃপর আপনার প্রতিষ্ঠা যে আত্মজ্যোতি, তারই ধ্যানে মগ্ন হও ধ্যানের আসন পাতি॥
পুণ্যপাপরজঃসঙ্গো মম নাস্তীতি বেদনম্। পাদ্যং সমর্পয়েদ্ বিদ্বান্ সর্বকল্মষনাশনম্॥ ৩
পুণ্য-পাপ রজোগুণ-আসক্তি-সম্ভূত নাহি মোর চিদাত্মার - এইটি যে জ্ঞান,
সর্বপাপ-বিনাশন, তারে পাদ্যরূপে সমর্পণ করিবেন যিনি সুবিদ্বান্॥
অনাদিকল্পসংবৃদ্ধ - মূলাজ্ঞানজলাঞ্জলিম্। বিসৃজেদাত্মলিঙ্গস্য তদেবার্ঘ্যসমর্পণম্॥ ৪
কল্প কল্প কাল ধরি হয়ে সংবর্দ্ধিত, মূল সে অজ্ঞান ভাণ্ডে রয়েছে সঞ্চিত।
সমর্পণ কর তারে আত্মার উপরি, তাহাই যে অর্ঘ্য দান জানিবে বিচারি॥
ব্রহ্মানন্দাব্ধিকল্লোলকণকোট্যংশলেশকম্। পিবন্তীন্দ্রাদয় ইতি ধ্যানমাচমনং মতম্॥ ৫
ব্রহ্মানন্দ তরঙ্গের কণামাত্র যাহা, তারো কোটিতম ভাগ যে আনন্দ, তাহা —
ইন্দ্র আদি যত দেব করিছেন পান, এই ধ্যান তারে কর আচমন জ্ঞান॥
ব্রহ্মানন্দজলেনৈব লোকাঃ সর্বে পরিপ্লুতাঃ। অচ্ছেদ্যোহয়মিতি ধ্যানমভিষেচনমাত্মনঃ॥ ৬
ব্রহ্মানন্দ রূপ এক সলিলের ধারা সর্বলোক - লোকান্তর হের পরিপ্লুত,
অচ্ছেদ্য এ পরিপ্লব, ইত্যাকার ধ্যান - তাহাই আত্মার হয় অভিষেক পূত॥
নিরাবরণচৈতন্যং প্রকাশোঽস্মীতি চিন্তনম্। আত্মলিঙ্গস্য সদ্‌বস্ত্রমিত্যেবং চিন্তয়েন্মুনিঃ॥ ৭
অনাবৃত এক মহাচৈতন্য - বিস্তার, আমারই প্রকাশ তাহা ব্যাপ্ত চারিধার —
মুনি-চিত্তে এইরূপ চিন্তার প্রকাশ, আত্মরূপ প্রতীকের হয় পূতবাস॥
ত্রিগুণাত্মাশেষলোকমালিকাসূত্রমস্ম্যহম্। ইতি নিশ্চয়মেবাত্র হ্যুপবীতং পরং মতম্॥ ৮
ত্রিগুণ-স্বভাব সর্বলোক-লোকান্তর, ক্ষুদ্র মাল্যাকারে যাহা শোভে নিরন্তর।
আমি আত্মা হই তার মূল সূত্রখানি — নিশ্চিত-এ-বোধ, তারে উপবীত[৩] মানি॥
অনেকবাসনামিশ্র - প্রপঞ্চোহয়ং ধৃতো ময়া। নান্যেনেত্যনুসন্ধানম্ আত্মনশ্চন্দনং ভবেৎ॥ ৯
বহুবিধ বাসনায় সমাকুল এই প্রপঞ্চেরে আত্মারূপে ধরে আমি রই,
আর কেহ নহে — এই তত্ত্বানুসন্ধান, আত্মার চন্দন-লেপ পুণ্য অনুষ্ঠান॥
রজঃসত্ত্বতমোবৃত্তি - ত্যাগরূপৈস্তিলাক্ষতৈঃ। আত্মলিঙ্গং যজেন্নিত্যং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে॥ ১০
তমো-রজঃ-সত্ত্বগুণ-বৃত্তি পরিহার, তাহাই যথার্থ তিলাক্ষত উপচার।
জীবন্মুক্তি মহাসিদ্ধি লাভের কারণ, আত্মাদেবে এইভাবে করিবে যাজন॥
ঈশ্বরোগুরুরাত্মেতি ভেদত্রয়বিবর্জিতৈঃ। বিল্বপত্রৈরদ্বিতীয়ৈরাত্মলিঙ্গং যজেচ্ছিবম্॥ ১১
ঈশ্বর শ্রীগুরু আত্মা, নাই ভেদে তিনে এরূপ অভেদ জ্ঞানে বিল্বপত্র জেনে —
তাই দিয়া কর পূজা প্রতীক - আত্মার মঙ্গল-স্বরূপ যিনি মঙ্গল আধার॥

৩। উপবীত — উপবীতের সাধারণ অর্থ পৈতা — যা ব্রাহ্মণরা ধারণ করেন। কিন্তু এখানে সাধারণ অর্থে নয়, একটি নিগূঢ় অর্থেই আচার্য্য শব্দটি প্রয়োগ করেছেন। উপ (সমীপে) বীয়তে স্ম, বেত্তি বা অজতি বা ইতি - উপ + বী বা অজ (গত্যর্থক) + ক্ত। বিশ্বসৃষ্টির প্রত্যেকটি অণু-পরমাণুর মধ্যেও যিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সূত্র রূপে অনুস্যূত হয়ে আছেন, তাঁর সঙ্গে চিন্ময়যোগে যুক্ত হওয়া এবং সামরস্য লাভই যথার্থ উপবীত ধারণ। উপবীত বা যজ্ঞসূত্র সেই নিত্যযোগেরই প্রতীক।

সমস্তবাসনাত্যাগং ধূপং তস্য বিচিন্তয়েৎ। জ্যোতির্ময়াত্মবিজ্ঞানং দীপং সন্দর্শয়েদ্ বুধঃ॥ ১২
সমস্ত-বাসনা-ত্যাগই ধূপদান তাঁরে, এরূপ ভাবনা কর পূজার ভিতরে।
উজ্জ্বল আত্মার জ্ঞান দীপ-রূপ হয় প্রকাশি দেখান তাহা জ্ঞানী নিঃসংশয়॥
নৈবেদ্যমাত্মলিঙ্গস্য ব্রহ্মাণ্ডাখ্যং মহোদনম্। পিবানন্দরসং স্বাদু মৃত্যুরস্যোপসেচনম্॥ ১৩
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাম-মহান্নের রূপ, প্রতীক আত্মার তাহা নৈবেদ্য[৪]-স্বরূপ।
মৃত্যুরে জানিও তাঁর ঘৃতাদি ব্যঞ্জন, (উপসেচন) সুস্বাদু আনন্দ-রস কর সদা পান॥
অজ্ঞানোচ্ছিষ্টস্যহস্তস্য ক্ষালনং জ্ঞানবারিণা। বিশুদ্ধস্যাত্মলিঙ্গস্য হস্তপ্রক্ষালনং ভবেৎ॥ ১৪
অজ্ঞানে উচ্ছিষ্ট হস্ত জ্ঞান-জলে ধৌত হলে, শুদ্ধ আত্ম-প্রতীকের তরে প্রক্ষালন বলে॥
রাগাদিগুণশূন্যস্য শিবস্য পরমাত্মনঃ। সরাগবিষয়াভ্যাসত্যাগস্তাম্বুলচর্বণম্॥ ১৫
রাগ বা বিরাগ নাই, না আছে বিকার, মঙ্গলস্বরূপ সেই পরম-আত্মার।
যখনই আসক্তিশূণ্য হয় দেহ মন, আত্মস্বরূপের তাহা তাম্বুল-চর্বণ॥
অজ্ঞানধ্বান্তবিধ্বংসপ্রচণ্ডমতিভাস্করম্। আত্মনো ব্রহ্মতাজ্ঞানং নীরাজনমিহাত্মনঃ॥ ১৬
অজ্ঞানের অন্ধকার-বিধ্বংসন-পর, প্রচণ্ড অতীব যাহা হয় দীপ্তিকর
বোধিবলে ব্রহ্ম সহ অভেদের জ্ঞান — আত্মস্বরূপের তাহা আরতি বিধান॥
বিবিধব্রহ্মসংদৃষ্টি র্মালিকাভিরলঙ্কৃতম্। পূর্ণানন্দাত্মতাদৃষ্টিং পুষ্পাঞ্জলিমনুস্মরেৎ॥ ১৭
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে সৃষ্টি যত যত, সকলই মালিকাসম ব্রহ্মে অলঙ্কৃত।
পূর্ণানন্দে একীভূতা এই আত্মদৃষ্টি তাঁহারেই গণ্য করি পুষ্পাঞ্জলি-বৃষ্টি॥
পরিভ্রমন্তি ব্রহ্মাণ্ডসহস্রাণি ময়ীশ্বরে। কূটস্থোহচলরূপোহহম্ ইতি ধ্যানং প্রদক্ষিণম্॥ ১৮
ঈশ্বরেতে একীভূত আমার মাঝারে, তথাপি ব্রহ্মাণ্ড কত হাজারে হাজারে,
তথাপি কূটস্থ[৫] আমি অচল-স্বরূপ-এই ধ্যান হেথা হয় প্রদক্ষিণ-রূপ॥
বিশ্ববন্দ্যোহহমেবাস্মি নাস্তি বন্দ্যো মদন্যতঃ। ইত্যালোচনমেবাত্র স্বাত্মলিঙ্গস্য বন্দনম্॥ ১৯
একাদ্বৈত আত্মা আমি বিশ্ববন্দ্য হই, আমি ছাড়া বন্দনীয় আর কেহ নাই।
এই লব্ধভূমিকত্ব কিংবা আলোচনা নিজ আত্মস্বরূপের তাহাই বন্দনা॥
আত্মনঃ সৎক্রিয়া প্রোক্তা কর্তব্যাভাবভাবনা। নামরূপব্যতীতাত্মচিন্তনং নামকীর্ত্তনম্॥ ২০
'কর্তব্যাকর্তব্য, ক্রিয়া - নাহিক আত্মার, এ দৃঢ় ভাবনা হয় দক্ষিণা সৎকার।
নামরূপাতীত সেই আত্মার চিন্তন, তাহাই হয় তাঁর নাম-সংকীর্তন!
শ্রবণং তস্য দেবস্য শ্রোতব্যাভাবচিন্তনম্। মননং তু আত্মলিঙ্গস্য মন্তব্যাভাবচিন্তনম্॥ ২১
শ্রবণ মনন যে বা সাধনাঙ্গ হয়, যার তরে কত বেদ-বেদান্ত স্বাধ্যায়,
মানস-পূজায় তাহা হইবে ভাবিতে — শ্রোতব্য মন্তব্য আত্মা - সবার অতীতে॥

৪। নৈবেদ্য ও উপসেচন — এ দুটি শব্দই গভীর অর্থবহ। সাধারণতঃ নৈবেদ্য বলতে দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত দুগ্ধ ঘৃত শর্করা অন্ন ও ফলমূলাদিকে বুঝায়। কিন্তু এখানে এই স্থূল অর্থ গ্রহণ করা হয় নি। পরমাত্মা স্বয়ং আনন্দস্বরূপ — এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই আনন্দ হতেই জাত হয়ে আনন্দেই স্থিতিলাভ করে, অন্তে আনন্দেই লয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই যেন সেই আনন্দস্বরূপ নিবেদিত অন্ন। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড রূপ অন্ন কার সাহায্যে সংহৃত হচ্ছে? যার সাহায্যে হচ্ছে তাঁর নাম মৃত্যু। এই জন্য কঠোপনিষদে (১/২/২৫) বলা হয়েছে — 'সমস্ত সৃষ্ট বস্তু তাঁর ওদন (অন্ন) স্বরূপ এবং মৃত্যু সেই ওদনের ঘৃতাদি উপসেক দ্রব্য — 'মৃত্যুর্যস্যোপসেচনম্'। কারণ মৃত্যুর মধ্য দিয়াই সকলে সংহৃত হচ্ছে, তাঁতেই লীন হচ্ছে এবং পরিশেষে স্বয়ং মৃত্যুও তাঁর মধ্যে লয় পাচ্ছে। এইভাবে মৃত্যুর মধ্য দিয়াই মরণধর্মী সব বস্তুই অমরত্ব লাভ করছে। এই সমস্ত ব্যাপারটাই (Process) উপসেচন ক্রিয়া।

৫। কূটস্থ — 'কূটস্থ' শব্দটির নানা অর্থ। ১) অমরকোষে আছে — 'কালব্যাপী স কূটস্থঃ' — অর্থাৎ যিনি কালকে ব্যাপ্ত করে আছেন, ত্রিকালকর্তা, ভূত-ভবদ্-ভাবীর নিয়ন্তা। ২) কূট = রাশি, সমূহ, সমষ্টি। কাজেই সমষ্টিতে যিনি স্থিত সেই ব্যাপ্তিচৈতন্যেরই অপর নাম কূটস্থ। ৩) কূট = মিথ্যা, অনিত্য, কূটবৎ তিষ্ঠতি, সুপি স্থঃ (পাণিনি ৩/২/৪) ইতি ক = কূটস্থ। এই বিশ্ব প্রপঞ্চে যা কিছু দেখি, তার কোনটিই চিরায়ত নয়, নিত্য পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সব কিছুই যেন প্রবাহরূপে চলেছে, নূতনরূপে ফুটে উঠছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এই চঞ্চলতা ও বিভঙ্গের মধ্যেও যিনি নিত্য স্থির, এই মায়াজালের অন্তরালেও যিনি নির্বিকার রূপে নিত্য বর্তমান, সেই ধ্রুব অক্ষর-ব্রহ্মই এখানে কূটস্থ শব্দের লক্ষ্য — কূটে মায়াজালে তিষ্ঠতি ইতি কূটস্থঃ।

ধ্যাতব্যাভাববিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনমাত্মনঃ। সমস্তভ্রান্তিবিক্ষেপরাহিত্যেনাত্মনিষ্ঠিতা॥ ২২
আত্মা একমাত্র ধ্যেয় — এ ভাব-ভাবন আত্মতত্ত্বে দৃঢ়স্থিতি — নিদিধ্যাসন[৬],
চিত্তের যতেক ভ্রান্তি, বিক্ষেপের জালি, অপগত হলে তারে আত্মনিষ্ঠা বলি॥
সমাধিরাত্মনো নাম নান্যচ্চিত্তস্য বিভ্রমঃ। তত্রৈব ব্রহ্মণি সদা চিত্তবিশ্রান্তিরিষ্যতে॥ ২৩
নাহি যবে অন্য হতে চিত্তের বিভ্রম, আত্মার সমাধি তাহা, এই তার ক্রম।
যেইক্ষণে ব্রহ্মে ঘটে চিত্তের বিশ্রান্তি পরম অভীষ্ট সিদ্ধি, নাম পরাশান্তি॥
এবং বেদান্তকল্পোক্তস্বাত্মলিঙ্গপ্রপূজনম। কুর্বন্নামরণং বাপি ক্ষণং বা সুসমাহিতঃ॥ ২৪
সর্বদুর্বাসনাজালং পাদপাংসুমিব ত্যজেৎ। বিধুয়াজ্ঞানদুঃখৌঘং মোক্ষানন্দং সমশ্নুতে॥ ২৫
এরূপে বেদান্ত শাস্ত্রে বর্ণিত যে আরাধন, আত্মার অর্চনা তাহা দিব্যভাবে উদ্দীপন।
সাধিতে থাকিবে তাহা মরণ পর্যন্ত, কিংবা ক্ষণকাল তাহে হলে সমাহিত,
সর্ব-দুর্বাসনা-রাজি পদধূলি সম ত্যজি ত্যজিয়া অজ্ঞান-জাত দুঃখের সমূহ —
চেতনার সমুত্থানে অন্তে ঘটে লয় কৈবল্য ইহারই নাম মহানন্দময়॥

— ইতি শ্রীমদ্‌শঙ্করভগবৎ পূজ্যপাদ-বিরচিত — নির্গুণমানসপূজা।

মন্দিরে প্রায় পনের যোলজন লোকের ভীড় রয়েছে। আমরা মন্দিরে পৌঁছবার আগেই আর একজন ব্রাহ্মণ এসে আরতির সব আয়োজন করে রেখেছেন। শাস্ত্রীজী আরতি আরম্ভ করলেন। তাঁর মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ভিতর যেন বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। লক্ষ করে দেখলাম মধ্যাহ্নের দৃষ্ট শিবলিঙ্গের বর্ণ ও রূপের সঙ্গে সন্ধ্যার আরতিকালীন শিবলিঙ্গের বর্ণ ও রূপের আকাশ-পাতাল তফাৎ। রাত্রি প্রায় আটটা বেজে গেল আরতি শেষ হতে। শাস্ত্রীজীর যে আরতির পদ্ধতি দেখলাম সত্যিই তা পরিশ্রম সাপেক্ষ। মন্দির বন্ধ করে তিনি আমাদের সঙ্গেই বাড়ী ফিরলেন। তিনি তখন রীতিমত হাঁপাচ্ছেন। তিনি আমার হাত ধরে ভিতরে প্রবেশ করলেন। একটি খাটের উপর বসতে বসতে বললেন — আমি ব্রাহ্মণ; যতক্ষণ বেঁচে আছি, ততক্ষণ এটি আমার নিত্যকর্ম। অন্য কারো হাতে নিজ ইষ্ট দেবতার ভার দিয়ে তৃপ্তি পাবো না। তিনি শুধু আমার ইষ্ট দেবতাই নন, তিনি আমার গৃহদেবতাও বটে।

তপসা মনসা বাগ্‌ভিঃ, পূজিতা বলিকর্মভিঃ।
তুষ্যন্তি শমিনাং নিত্যং দেবতাঃ কিং বিচারিতেঃ॥

শুদ্ধ দেহে, সভক্তি অন্তঃকরণে, প্রসন্নবাক্যে এবং প্রশান্ত এবং নৈবেদ্যদানে পূজা করলে দেবতারা সব সময়েই তুষ্ট হন।

গণপতি লণ্ঠন নিয়ে আমাদের শোবার ঘর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে গেল। আমরা যে যার বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সহজে ঘুম এল না। উঠে বসে আমি জপে বসলাম। তারপর কখন যে শুয়েছি এবং ঘুমিয়ে পড়েছি, আমার মন নেই। স্বপ্ন দেখছি, আমার শিয়রে কাছেই একটা তুবড়ীর আলোর মত আলো জ্বলে উঠল। আলোর ঝরণা ক্রমে উর্ধ্বগামী হচ্ছে, আলোর ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ছে আমারই মাথায়, কপালে, নাকে, মুখে, বুকে ও নাভিতে। ফোঁটাগুলো নিভছে না, আমার সারা শরীরের উপর আলোর ফুল ফুটে উঠেছে যেন। আলোর শিখা আরও উর্দ্ধগামী হচ্ছে। আকাশ ভেদ করে উঠে যাচ্ছে সেই শিখা। তুবড়ীর আলো যেন ফেটে গেল প্রচণ্ড শব্দে। লক্ষ যোজন দূরে আকাশের অনেক অনেক উপরে শোনা যাচ্ছে - ওঁ - ওঁ - ওঁ।

আমি জেগে উঠলাম। কিন্তু চোখ খুলতে পারছি না। অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকাতে পারলাম। পূব আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। এখনও চারদিক অন্ধকারে ঢেকে থাকলেও বুঝতে পারলাম ভোর হয়ে আসছে। উঠে বসলাম। পাশের দিকে তাকিয়ে দেখি আমার সঙ্গীরা গভীর ঘুমে অচৈতন্য। আমারও ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। ঘুমিয়ে পড়লাম।

৬। নিদিধ্যাসন — নি (নিরন্তরং) + ধ্যৈ + সন্ + ল্যুট্, ভাবে। এর অর্থ ধারাবাহিক চিন্তা, অবিশ্রামে ও অনন্যচিত্তে প্রগাঢ় ধ্যান। নিরন্তর বিচার। অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্য সর্বব্যাপী, প্রত্যেকের মধ্যে যে চিন্ময় সত্তা রয়েছে তা এই ব্রহ্মই — এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য যে নিরন্তর ধ্যান ও বিচার, প্রত্যয়ের সেই একতানতাকে নিদিধ্যাসন বলা হয়।

সকাল সাতটা নাগাদ আমার ঘুম ভাঙল। অন্যরা আগেই উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে এসেছেন। পুরোহিতজী এসে আমাদেরকে 'নম নারায়ণায়' জানিয়ে মন্দিরে গেলেন। আমিও তাড়াতাড়ি উঠে নিজের ঝোলা-কম্বল বেঁধে রেখে নর্মদাতে গেলাম। মনে পড়ল, আজ সোমবার। তখনও সূর্যোদয় হয়নি। নর্মদামাতাকে স্পর্শ করে প্রণাম করলাম।

প্রণাম করে উঠতেই দেখলাম শাস্ত্রীজী আমার কাছে দাঁড়িয়ে উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন —

ওঁ তরণির্বিশ্বধর্শতো জ্যোতিষ্কৃদসি সূর্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনম্ ওঁ॥ (ঋ ১।৫।১০)

— হে সূর্য! তুমি মহৎ পথে ভ্রমণ কর, তুমি সকল প্রাণীদের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতির কারণ, তুমি সমস্ত দীপ্যমান অন্তরীক্ষে প্রভা বিকাশ কর।

মন্দিরে ফিরে এসে দেখি, সবাই যাত্রার জন্য তৈরী। সকাল আটটা নাগাদ যখন সূর্যোদয় হচ্ছে, তখন আমরা 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিয়ে যাত্রা শুরু করলাম। রাস্তা বলে কিছু নেই, জঙ্গল ক্রমশঃ নর্মদার কিনারা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে।

আমরা নিবিড় বনপথে হাঁটছি। ক্রমে পাথরের আধিক্য পথের উপর এত বেশী মনে হল যে, ভাবলাম এত পাথরের চাঙড় পেরিয়ে আমরা আদৌ এগোতে পারব কিনা! যাইহোক লাঠি ঠুকে ঠুকে আমরা কতকটা এগিয়ে হাঁপিয়ে পড়লাম। পাথরের উপরেই বসে পড়লাম। চারদিকে শাল, সেগুন ও তেঁতরা গাছের জঙ্গল। একদল বুনো শুয়োর পাহাড় থেকে নেমে এসে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে আমাদের পাশ দিয়েই চলে গেল। বড় বড় পাথরের মাঝখানে কাঁটাগাছ। সাধ্যমত দ্রুত হাঁটতে চেষ্টা করছি। এবড়ো খেবড়ো পাথরের চাঙড় ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়েই আমাদেরকে হাঁটতে হচ্ছে। কারও মুখে শব্দ নেই। নীরবে সবাই রেবামন্ত্র জপ করতে করতে হাঁটতে লাগলাম। চলার পথ নানারকমের ঘন গাছপালায় ঢেকে আছে বলে কখনও ঝাপসা অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে। কখনও বা সূর্যের আলো পড়ায় যেন যেখানে গাছপালার তত ভীড় নেই সেখানে রৌদ্রালোকিত হয়ে উঠেছে। এক জায়গায় দেখলাম অজস্র হনুমান গাছের ডালে লাফাচ্ছে এবং অজস্র সুন্দর সুন্দর পাখীর কলতানে সমস্ত বনভূমি মুখর হয়ে যাচ্ছে।

ছোড়-বড় পাথরের চাঙড়গুলো নানা লতাগুল্মে ঢেকে গেছে। ভিজে ভিজে শ্যাওলা ধরা চাঙড়গুলো বড় পিছিল হয়ে গেছে। এখন গাছের পত্রান্তরাল হতেই অনুমান করতে পারছি, রোদ খুব চনমনে হয়ে উঠেছে। এই বনে কেঁদ গাছই বেশী। আবলুষ, পিপল্, সেগুন, বেল, সাজা ও সালাই গাছেরও অভাব নেই। বড় বড় গাছে বুনো মোটা মোটা লতা জড়িয়ে উঠেছে এবং তাতে অজস্র বুনোফুল ফুটে আছে। এই পথের গম্ভীর সৌন্দর্য্য বলে বোঝান যাবে না।

প্রায় আরও দু'মাইল হাঁটার পর মা নর্মদাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমরা তাঁর কিনারায় এসে গেছি। সাতপুরা পর্বতের যতটুকু চোখে পড়ছে, সবদিকেই ঘন বনে ঢাকা। তটরেখা ধরেই হাঁটছিলাম, কিন্তু বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ আমরা এমন জায়গায় এসে পৌঁছালুম যে, আর তট ধরে এগুনো অসম্ভব। তাই আবার আমাদেরকে ডানদিকে ঘন বনের মধ্যে ঢুকতে হল। বনে ঢুকে ক্রমে এমন একটা উঁচু জায়গায় উঠে এলাম যে আমরা আমাদের সামনে সাপের মত আঁকাবাঁকা সমস্ত পথটা দেখতে পাচ্ছি — কখনও শৈলগাত্র বেয়ে, কখনও সংকীর্ণ উপত্যকায় নেমে, আবার কখন দূর দিকচক্রবালে অদৃশ্য হয়ে পথটা বরাবর চলেছে আগে আগে। বামদিকে কিছুটা দূরে নর্মদাকে দেখতে পাচ্ছি। ডানদিকে প্রায় আধ মাইলটাক লম্বা বন্য বাঁশের বন, শালবন, বাঁশবনের ধার দিয়ে বয়ে চলেছে একটা ঝর্ণা কুলকুল শব্দে।

প্রতি মুহূর্তেই আশা করছি এই বুঝি কোন হিংস্র জন্তু ঘাড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা বাঁক ঘুরতেই দেখি হঠাৎ কোন শান্ত তপোবনে এসে পৌঁছেছি। ঝোপ-ঝাড় কাঁটা গুল্ম কিছুই চোখে পড়ছে না, বড় বড় গাছের তলা একেবারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন. দূরে নর্মদার ধার ঘেঁসে এক শিবমন্দির, একটু দূরে আর একটা, ওমা তারপরেও দেখছি প্রায় আধমাইল দূরে পাহাড়ের উপর আরও একটা। বিন্ধ্যপর্বতের মত সাতপুরাতেও দেখছি সবই শিবময়। কতকাল আগে কারা যে এইসব মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা কারও জানা নেই।

বড় বড় পাথর ডিঙিয়ে মন্দিরের পিছনে গিয়ে মানুষের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সামনে গিয়ে দেখি হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ ছয়জন লোক, তাদের কাঁধে বড় বড় টাঙি, বর্শা এবং লম্বা লম্বা তীর ধনুক। আবলুষ কাঠের মত

গায়ের রং। তাদের মধ্যে একজনই বোধহয় অল্প স্বল্প হিন্দী জানে। সেই জিজ্ঞাসা করল — আপলোগ পরিক্রমা কর রহা হৈ? হম্‌লোগ নিবাস করতা হু ব্রাহ্মণগাঁওমে। যায়েঙ্গে কঠোরা। উধার সাদীবাড়ী হ্যায়। কঠোরামেঁ বখেড় নদীকা সাথ নর্মদাজীকা সঙ্গম হুয়া।

হিন্দী জানা লোকটি বলল — হমলোগ ভীল হ্যায়। দক্ষিণতটে তাদের দৈত্যাকৃতি শরীর দেখে আমরা মনে মনে ভয় পেলাম। কারণ এর আগে উত্তরতটে ভীলদের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে!

যাইহোক তারাই পথ দেখিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। বেলা তখন বড়জোর তিনটা সাড়ে তিনটা হবে। কিন্তু পথ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। দূরে একটি গ্রাম দেখা গেল। ধীরে ধীরে মহল্লাটি অতিক্রম করে আমরা একটা পরিষ্কার রাস্তা পেলাম। রাস্তাটি পাথর বালি ও মাটি দিয়ে বাঁধানো। রাস্তার দুধারেই ভুট্টা ক্ষেত, কিছু দূরে দূরে বড় বড় গাছপালা দেখা যাচ্ছে। চারদিক রৌদ্র ঝলমল করছে। একটা বাঁক ঘুরেই আমরা আর একটা পার্বত্যপথ পেলাম। উঁচু পার্বত্যপথ, বন ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে বলে মনে হল। মা পাহাড় পর্বত ভেদ করে কখনও সোজা কখনও বা আঁকা বাঁকা পথে ছুটে চলেছেন। আমাদের সঙ্গী ছেলেটি বলল — উসপার দেখিয়ে। নর্মদাজীকে উত্তরতট পর নর্মদাজীসে দূর ঘনঘোর জঙ্গল দেখাই দেতা হ্যায়। উহ হ্যায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থান মাণ্ডবগড়। এর প্রাচীন নাম মাণ্ডবদুর্গ। বর্তমানে নাম মাণ্ডু। আমি আমার সঙ্গী সাধুদের ও রঞ্জনকে জানালাম — ঐ গভীর জঙ্গলে ঢাকা মাণ্ডবগড় কেল্লায় এখনও অনেক প্রাচীন মহল বর্তমান। ঐ স্থানের রেবাকুণ্ডে মা নর্মদার কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীমৎ চৈতন্যভারতীজী তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। আমি উত্তরতট পরিক্রমাকালে ঐ স্থান দর্শন করে এসেছি।

সঙ্গী লোকটি আমাকে থামিয়ে দিয়ে খোড়ীবলী হিন্দীতে যা বলল, তা হল — ৪০ মাইল পরিধি বিশিষ্ট এই কেল্লা ত কেল্লারই মত। বিশাল বিশাল নিরেট পাথরের তৈরী, মহলের পর মহল। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে হিন্দু রাজা ভূজের হাতে গোড়াপত্তন হয় এই দুর্গের। পরোমা রাজাদের রাজধানী ছিল এই মাণ্ডবগড়। রাণী ভানুমতী এই কেল্লায় রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন রাজপুত নারী। নর্মদার একনিষ্ঠ ভক্ত। কিন্তু নর্মদা ছিলেন কেল্লা থেকে বহুদূরে। তাই নিতা নর্মদা দর্শনের জন্য ১২২৭ ফুট উঁচু এক মহল তৈরী করে তার উপর থেকে নিত্য মাকে দর্শন করতেন। পরে ভানুমতীর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ঐখানে এক কুণ্ডের মধ্যে নর্মদা আবির্ভূত হয়েছিলেন। সার্থক তপস্যা রাণী ভানুমতীর। পরে রাণী ভানুমতী রাজ্যপাট ত্যাগ করে এই কুণ্ডের ধারে নর্মদা দর্শন করে সময় কাটাতেন।

পরে পরে ঘোরী ও খিলজী রাজারা এই দুর্গ দখল করেন। এই কুণ্ডের একধারে ছিল সেনানিবাস ও অস্ত্রাগার। কেউ কেউ বলেন ১২২৭ ফুট উঁচু ঐ মহল শত্রু পর্যবেক্ষণের জন্য নির্মিত হয়েছিল। পরিক্রমাবাসী সাধুদের এই রেবাকুণ্ড দর্শন ও স্পর্শন অবশ্যই কর্তব্য। এর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মনোরম। সূর্যাস্ত ও চন্দ্রোদ্ভাসিত রাত্রে এই কেল্লা এক মধুময় রূপ পরিগ্রহ করে। যেহেতু এই কেল্লার চতুর্দিক পাহাড়ে ঘেরা, বর্ষায় এই কেল্লাকে ঘিরে যখন পাহাড়ী নদীর স্রোত বয়ে যায় তখন এই কেল্লা রূপসী রূপ পরিগ্রহ করে। সেখান থেকে কিছুদূরে ঘন জঙ্গলের মধ্যে চারটি পাথরের গম্বুজ দেখিয়ে বলল — ঐটাই ছিল রাণীর প্রকৃত কেল্লা। এখন ঐ কেল্লার কাছাকাছি যাওয়ার সাধ্য কারও নেই, কারণ একে ত ঘনঘোর জঙ্গল, তার উপর বাঘ-ভাল্লুক, চিতা-নেকড়ে, শঙ্খচূড়, ময়াল ও পাইথনের আড্ডা।

যাইহোক স্থানটি মনোরম। ভয়প্রদও বটে। চারদিকে অঞ্জন, সালাই, ধাওয়া, আমলকী ও রুদ্রাক্ষের গাছ, তাদের ফাঁকে ফাঁকে ধূসর বর্ণের মেহরীন ধাওয়া ও সেমর গাছ যেন প্ল্যান করে লাগানো হয়েছে কুণ্ডকে মাঝখানে রেখে সারি সারি গোলাকৃতি করে। সব গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে বিরাট বিরাট ইমলি (তেঁতুল) গাছ। এই ইমলি দেখতে কাঁঠালের মত, ওর ভেতরের শাঁস বের করে নিয়ে সন্ন্যাসীরা জলপাত্র কমণ্ডলু প্রস্তুত করেন। এখানকার ইমলি ভারতপ্রসিদ্ধ।

এই রেবাকুণ্ড ছাড়াও মাণ্ডবগড়ে রামচন্দ্রজীর একটি প্রাচীন মন্দির আছে। রামচন্দ্রজীর মূর্তিটি ভারী সুন্দর ও জীবন্ত। এই মন্দিরের পাশেই যমরাজের সঙ্গে আলা উদাল বা আহ্বা উদ্দালের লড়াই হয়েছিল। তার চিহ্ন স্বরূপ আলার হাতের শাঁখ মন্দিরের পাশেই মাটির মধ্যে প্রোথিত আছে যা আজও দর্শনার্থীদের আকর্ষণ করে। মাণ্ডবগড়ে মোগল সম্রাট আকবর তাঁর হিন্দু স্ত্রীর জন্য ১৫৭৫ খৃঃ নীলকণ্ঠেশ্বর শিবের মন্দির স্থাপন করেন।

প্রায় দেড়ফুট দীর্ঘ। বর্ণ ঘন নীলাভ। দেখতে বড় সুন্দর। লোকটি আরও জানাল — ধারা নগরী সে মাণ্ডবগড় তক্ পক্কী সড়ক হ্যায়। ধার সে ওহ্ স্থান ২২ মীল হ্যায়। পশ্চিম রেলওয়েঁকে মহু স্টেশন সে ধার ৩৪ মীল হ্যায়। মহু স্টেশন বা ধারা নগরী সে মাণ্ডবগড়কে লিয়ে মোটর মিলতী হ্যায়।

হরানন্দজী বললেন, নর্মদাতটে প্রাচীন ভারতবর্ষের কত যে মহিমা, প্রাচীন সভ্যতার কত যে ইতিহাস ছড়িয়ে আছে তার শেষ নেই। আমরা সাধুবর্গ মহা তপস্যার অঙ্গ হিসেবে পরিক্রমা করেই ক্ষান্ত। নর্মদার কৃপায় সিদ্ধিলাভ করতে পারলে কৃতার্থ বোধ করব। আমরা সেই পার্বত্য জঙ্গলে যত দ্রুত হাঁটা যায়, প্রাণপণে সেই দ্রুততালেই হাঁটছি। সশস্ত্র সাথী আমাদের মাঝখানে রেখে হেঁটে চলেছে। মহারণ্যের কোল ঘেঁসে হাঁটতে লাগলাম। বাঁদিকে মোড় ঘুরে একটি পথের ক্ষীণরেখা দেখিয়ে বলল — পরিক্রমাকারীরা এই পথে হাঁটে, আমাদেরকে গাঁয়ে ফিরতে হবে তাই ঢালুর দিকের পথটা ধরলাম। এই পথেও পরিক্রমাকারীরা যান, কারণ তাঁরা গোঁড় আর ভীলদের বস্তিতে গিয়ে মাধুকরী সংগ্রহ করেন। অন্ধকারে বাম ডান কোনদিকের পথই দেখতে পাচ্ছি না। হিংস্র জন্তুর ভয়ে বুকের ভিতরটা গুরগুর করছে। কিন্তু এরা নির্ভয়ে এগিয়ে চলল। ভয় এদেরকে কম্পিত করে না। সামনে বাঘ পড়লেও তারা তীর বা টাঙ্গির ঘায়ে তাকে কাবু করে এগিয়ে যাবে। তাদের জীবনই এইরকম। মৃত্যুর সঙ্গে প্রতিনিয়ত পাঞ্জা কষে এইসব মহারণ্যে পর্বতচারী মানুষগুলি বেঁচে আছে। কোনমতে বেঁচে থাকা নয়, এইভাবে থেকেই তারা চাষবাস করে, ক্ষেতে কাজ করে, সংসার প্রতিপালন করে। ধর্মকর্মও করে থাকে। অনেকক্ষণ পরে মহারণ্যের ভিতর দিকে পর্বতের সানুদেশে এসে পৌঁছলাম। সূর্য পাটে বসেছেন। সামনে দূরে সমতলভূমিতে মানুষের বস্তির আভাষ। পিছন দিকে পর্বতচূড়ার দিকে তাকাতেই মুগ্ধ হয়ে গেলাম — অস্তমান সূর্যের রঙিন আলোয় দেবলোকের কনক দেউলের মত বহুদূর নীল শূণ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

লোকটি উত্তর-পশ্চিমদিকে আঙুল দেখিয়ে বলল — সামনে মেঁ যো গাঁও পড়েগা ওহি হমারা কটোরা মহল্লা। এস্ মহল্লা সে উত্তর-তটকা ধর্মপুরী দ্বীপ দেখাই দেতা হ্যায়। ইস্ দ্বীপ মেঁ কালেশ্বর ভৈরবজীকা মন্দির বহুৎ প্রসিদ্ধ হ্যায়। উহাঁ নাগেশ্বর তথা বিষ্ণু ভগবানকী পাঁচ বিশাল মূর্তিয়াঁ ভী হ্যায়। এহিপর কুব্জা কুণ্ড হ্যায়। উস্ নগর সে থোড়ী দূর খুজাগ্রামকে পাস নর্মদাজীকা সাথ কুব্জা নদী কা সংগম হ্যায়। ইসে বিল্বামৃক তীর্থ কহা যাতা হ্যায়। পুরাণ-প্রসিদ্ধ ঋষি দধীচি কা ইহ্ নিবাসস্থান থা। দ্বীপমেঁ বিল্বনৃত্যেশ্বর ভগবানকী মন্দির ভী হ্যায়। কাহিনী হ্যায় কী মালবকা সুলতান বনবাহাদুর শাহ কী স্ত্রী রূপমতী কা গুরুজী ইস তীর্থমেঁ নিবাস করতে থে। ইহাঁ এক Lamp জ্বলতা থা জিসকী রোশনী ১৮ মাইল দূরীকা মাণ্ডবগড়সে দেখাই দেতা থা, রূপমতী প্রতিদিন উসে দেখতী থী। এ সচ্ হ্যায় কি ঝুটা হ্যায় উহঁ মুঝে মালুম নেহী। উহাঁ ডাকঘর, পাঠশালা, হাসপাতাল ইত্যাদি হ্যায়। খলঘাটসে ধর্মপুরী তক পক্কী সড়ক ভী হ্যায়।

আকাশে চাঁদ উঠেছে — বড় বড় গাছের আড়ালে অন্ধকার জমাট বেঁধে থাকলেও ফিকে জ্যোৎস্নার আলো বনভূমিতে ঠিকরে পড়ায় পথ চলতে বিশেষ কোন কষ্ট হচ্ছে না। হঠাৎ বামদিকে একদল বন্য শৃগাল সমস্বরে ডেকে উঠল। ভাবলাম — সুলক্ষণ। এবারে নিশ্চয়ই পথ নিরাপদ কেননা খনার বচনানুসারে 'বামশিয়ালী' যাত্রা পথের শুভ লক্ষণ। অনুমান করলাম রাত্রি বোধহয় সাতটা সাড়ে সাতটা হবে। মনে হচ্ছে অনেক রাত হয়ে গেছে, যেন কত গভীর নিশুতি হয়ে গেছে। সহসা দেখলাম চার পাঁচটা জন্তু আমাদেরকে বড় বড় গাছের আড়ালে অনুসরণ করে আসছে। আমাদের সাথীরা হঠাৎ আমাদের পিছনে সরিয়ে দিয়ে পথের মধ্যেই টাঙি হাতে দাঁড়িয়ে পড়ল। চারিদিকে নৈঃশব্দের স্তব্ধতা। বাতাসে নিঃশ্বাস টেনে কোন গন্ধ অনুভব করার চেষ্টা করল। সূচ্যগ্র দৃষ্টি নিয়ে আঁতিপাতি করে দেখল। তারপর তাদের হাবভাব ও কথাবার্তায় নিশ্চিন্ততার ভাব ফুটে উঠল। রঞ্জনের হাত ধরে টান দিল। তাদের ইঙ্গিত বুঝে আমরা তাদের সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম।

কিছুটা যাবার পর একটি ছোট নদী দেখলাম বয়ে যাচ্ছে। একজন বলে উঠল 'বখেড়', আরও কি বলল বুঝতে পারলাম না।

আমাদের মাঝখানে রেখে তারা হাঁটতে লাগল। এবার উৎরাই, জঙ্গল থেকে বিচিত্র শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে। কোন দিকে যাচ্ছি, রাত্রি কত হল, এসব কোন চিন্তাই আমাদের মনে জাগছে না। সোঁ সোঁ করছে রাত্রি। এইভাবে আরও প্রায় দু'ঘন্টা হাঁটার পর, এক সময় তারা আমাদের হাত ধরে একটি কুটীরের দাওয়ায় তুলল।

পরিচিত কণ্ঠস্বর পেয়ে কুটীরের ঝাঁপ উঠল। তিনচারজন মেয়ে পুরুষ বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সাতটি খাটিয়া বের করে এনে দাওয়ায় পাতলো। আমরা গাঁঠরী খুলে একটি করে মোটা চাদর পাতলাম খাটিয়ায়। এইসময় কয়েকজন মেয়ে পুরুষ প্রত্যেকের জন্য এক হাঁড়ি গরম জল এনে সামনে রাখল। তার মধ্যে কয়েকরকম লতাপাতা দিল। কিছুক্ষণ পর আমাদের হাত মুখ ধোয়ার ইঙ্গিত করল। হাত পা ধুয়ে আরাম বোধ করলাম, মনে হল অনেকটা ক্লান্তি দূর হল। সারাদিন দানা-পানী পেটে পড়েনি। মা নর্মদাকে স্মরণ করে পেটপুরে নর্মদার জল খেয়ে শুয়ে পড়লাম। সবেমাত্র ঘুম এসেছে, হঠাৎ অন্ধকারেই মনে হল কেউ যেন আমার পা দুটো ধীরে ধীরে টিপে দিচ্ছে। মুখ তুলে দেখি এতখানা পথ যারা আমাদের সঙ্গে হেঁটে এসেছে, তারাই, শ্রান্ত অতিথিদের, পরিক্রমাবাসীদের সেবার জন্য কুণ্ঠাবিহীন কারুণ্যে সহজাত সংস্কার ও শ্রদ্ধার টানে প্রসারিত করে দিয়েছে তাদের নীরব দুটি হাত।

আকারে ইঙ্গিতে আমরা তাদের নিরস্ত করার বৃথা চেষ্টা করলাম। বন্য আদিবাসীদের মধ্যেও এই ধর্মবোধ ও সেবান্মুখী বৃত্তি আমাদের ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙ্গল যখন, তখন সমগ্র অরণ্যপ্রান্তর সূর্যের আলোতে ঝলমল করছে। একসঙ্গে বাইশ মাইল হেঁটে আসার ধকলও আমাদের শরীরে নেই। মনে হল যেন বেশ কয়েকদিন বিশ্রামেই ছিলাম। তাড়াতাড়ি উঠে কমণ্ডলুস্থিত নর্মদার জল স্পর্শ করলাম, গাঁঠরীটা বেঁধে গুছিয়ে ফেললাম। দাওয়া থেকে নেমে দেখলাম, বাড়ীর সকলে হাতজোড় করে চত্বরে দাঁড়িয়ে আছে। আমরাও হাতজোড় করে তাদের কাছে বিদায় নিলাম। এছাড়া আমাদের মত আকাশবৃত্তিধারী নিঃস্ব পরিক্রমাবাসীদের আর কি দিবার আছে। মাতা নর্মদার কাছে প্রার্থনা করলাম — এই দরিদ্র অতিথিপরায়ণ ভীলদের মঙ্গল কর প্রভু। তারা সুখী হোক।

পুনরায় তাদেরকে সুক্রিয়া জানিয়ে সামনের দিকে পা বাড়ালাম। কিছুদূর হেঁটে গিয়ে আমরা আর একবার পিছনের দিকে তাকালাম। তখনও তারা দাঁড়িয়ে আছে। আমাদের দিকে হাত নাড়ছে।

মাইল দুই হেঁটে যাবার পরেই সত্যই এবার রাস্তা খারাপ পেলাম। ছোট ছোট পাথরের টিলা, উঁচু টিলা নর্মদার কোল পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। কোথাও প্লাবিত করে, কোথাও বা সেইসব টিলা ভেদ করে নর্মদা বয়ে চলেছে। বামদিকে তাকিয়ে দেখি সাতপুরা পর্বত ঘন জঙ্গলে ঢেকে আছে। পায়ে চলার দাগ খুঁজে আমরা আঁকা-বাঁকা পথে হাঁটতে লাগলাম। এইভাবে প্রায় ঘন্টা তিনেক হাঁটার পর আমরা একটা বাঁধানো পরিষ্কার ঘাটে এসে পৌঁছলাম। ঘাট থেকে একটু দূরে দু'চারটে পাকাবাড়ী ও একটা মন্দিরের চূড়া দেখতে পেলাম। একটি সাইনবোর্ড দেবনাগরী হরফে বড় বড় করে লেখা — খলঘাট। কয়েকজন এগিয়ে এসে আমাদের 'নম নারায়ণায়' জানিয়ে গেল।

আমি আমার সঙ্গীদেরকে জানালাম — এখানে নর্মদার সঙ্গে সাটক নদীর সংগম হয়েছে। ঐ যে মন্দির দেখছেন ঐটি যাটলিঙ্গী মহাদেবের। উত্তরতট পরিক্রমাকালে আমি উত্তরতটেও যাটলিঙ্গী মহাদেবের মন্দির দেখে এসেছি। শুনেছি, একই স্থাপত্য-রীতিতে তৈরী বিভিন্ন ধরণের যাটটি শিবলিঙ্গ যেমন মন্দির গাত্রে খোদিত আছে, তেমনি বিভিন্ন আকার ও রং-এর যাটটি লিঙ্গ যোনীপীঠে বিরাজমান। আগ্রা থেরে বোম্বাই যাবার রাস্তায় এইখানেই নর্মদার উপর ১৫ ফুট উঁচু পুল আছে। বর্ষাকালে নর্মদায় বন্যা হলে বন্যার জল এই পুলের উপর দিয়ে বয়ে যায়। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই তীর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন —

ততো গাচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্।
স্নানমাত্রান্নরো ভক্ত্যা মুচ্যতে সর্বকল্বিষৈঃ॥

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! অনন্তর অনুত্তম কপিলাতীর্থে গমন করবে। যে এই কপিলা তীর্থে ভক্তিপূর্বক স্নান করে সে নিখিল কলুষ হতে মুক্ত হয়। হিতার্থং সর্বভূতানাম্ বিষ্ণুভিঃ স্থাপিতং পুরা — পুরাকালে সর্বভূতের হিতকামনায় ভগবান বিষ্ণু প্রভূত তপস্যা করে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জ্বলমানাত্তু কপিলা তাবৎ কুণ্ডাৎ সমুত্থিতা — তখন তাঁর (বিষ্ণু) কুণ্ডমধ্যস্থিত প্রজ্বলিত অনল হতে কপিলা জন্ম নিল। ব্রহ্মলোকাদুতা পুণ্যাং নর্মদাং লোক পাবনীম্ — লোকপালিনী কপিলা ব্রহ্মার প্রার্থনায় প্রথমে ব্রহ্মলোক হতে পূতসলিলা নর্মদাতটে এসে উপস্থিত হন। কপিলা পঞ্চ গব্যেন যঃ স্নাপয়তি শঙ্করম — যে কপিলা পঞ্চগব্য দ্বারা শঙ্করকে স্নান করায় স্নাত্বা হ্যক্তবিধানেন তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ — তার পিতৃদেবতারা তৃপ্ত হন।

আমরা ঘাটে নেমে নর্মদা স্পর্শ করলাম। হাত-মুখ ধুয়ে জল খেলাম। সেখানে থেকে ঘাটের উপর দিকে যাটলিঙ্গী মন্দির লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম। যাটলিঙ্গী মন্দিরের দুয়ারে এসে পৌঁছে গেলাম। দরজাতে ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল। এখানেও সেই একইরূপ যা আমি উত্তরতট পরিক্রমাকালে দেখে এসেছি। পাথরের দেওয়ালে যাটটি বিভিন্ন ধরণের শিবলিঙ্গ খোদাই করা আছে, আর মন্দিরের মেঝেতেও প্রতিষ্ঠিত আছেন বিভিন্ন প্রকারের শিবলিঙ্গ। আমরা 'হর নর্মদে' ধ্বনি তুলে সাষ্টাঙ্গে প্রণতি জানিয়ে দরজা টেনে বন্ধ করলাম মনে মনে ভাবছি, নর্মদা এতদঞ্চলের প্রাণের দেবী। অমরকণ্টক থেকে রেবাসংগম পর্যন্ত উভয়তটেই মা নর্মদাকে কেন্দ্র করে কত যে প্রবাদ, লোকসাহিত্য ও ছড়া তৈরী হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

আমরা এগিয়ে চললাম নর্মদার তটরেখা ধরে। রাস্তা ভালই, হাঁটতে কোন কষ্ট হচ্ছে না। এইভাবে প্রায় পাঁচ ছয় মাইল হাঁটার পর এমন ঘোরতর সেগুন বনে ঢুকে গেলাম; যেখানে সবই ছায়াছায়া অন্ধকারে ঢাকা। বেলা বড়জোর দুটা হবে। বনের প্রকৃতিটাই যেন বদলে গেল। বড় অদ্ভুত এই বন। প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখা-প্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক গাছের ডাল থেকে শেওলা ঝুলছে — সে শেওলা কোথাও কোথাও এমন লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার উপক্রম হয়েছে, বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে. কোথাও সূর্যের রশ্মি এসে পড়তে পারছে না। সবসময়েই যেন গোধূলি। চারিদিক ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরণের নিস্তব্ধতা — বাতাস বইছে, তারও কোন শব্দ নাই, ময়ূরের কেকাধ্বনি বা অন্য কোন পাখীর ডাকও শুনতে পাচ্ছি না; মানুষের গলার সুর ত নাই-ই-নাই, বনের কোন জানোয়ারেরও ডাক নাই। মনে হচ্ছে, যেন কোন অন্ধকার প্রেত রাজ্যে এসে পৌঁচেছি।

আমাদের ত থমকে দাঁড়ালে চলবে না। আমরা সাবধানে পা ফেলে ফেলে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ খ্যাঁক খ্যাঁক শব্দে চমকে উঠে তাকাতেই দেখতে পেলাম পাঁচ ছটা বেড়াল দৌড়ে আসছে, তাদের হলুদ বর্ণের ঘোলাটে চোখ আর হিংস্র দৃষ্টি দেখে আমরা এগুলিকে বাঘের বাচ্চা বলে মনে করলাম। কিন্তু তাদের পিছনে ক্রুদ্ধ আক্রোশে কয়েকটি বুনোকুকুর দৌড়ে আসতে দেখলাম তারা প্রাণপণে দৌড়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। বাঘের বাচ্চা হলে অত সহজে পালাতো না। একটি বড় গাছের আড়ালে আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। পথ পরিষ্কার দেখে আবার হাঁটতে লাগলাম। মাইল খানিক ব্যাপী গোধূলির অন্ধকারে ঢাকা এই প্রেতরাজ্য অতিক্রম করে পরিক্রমার পথে বনভূমিতে পা দিলাম। চারিদিক রৌদ্রকরোজ্জ্বল, নর্মদা ও পাহাড়ের সব গাছপালা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। পথ একই, সেই সেগুন, বেল, অগস্তি গাছের জঙ্গল, তবে সবকিছু চোখে দেখতে পাওয়ায় মনে স্বস্তি পাচ্ছি। নর্মদার জলের ধারা যেখানে, সেখান থেকে প্রায় পাঁচ ছশো ফুট উঁচুতে পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটছি। পথের দাগকে কিছুতেই অনুসরণ করতে ছাড়ি নি। সেই পথের দাগই যেন আমাকে আরও উঁচুতে এনে ফেলল চড়াই-এর পথে। এইভাবে প্রায় আরও তিন মাইল রাস্তা আমরা হাঁটলাম। একবারে নিচে নর্মদার দিকে তাকাতেই দেখলাম এক পাল নীল গাই চরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই কোন নিরাপদ আস্তানায় পৌঁছতে পারলে আমরা বাঁচি। থাকে থাকে পাহাড় ও জঙ্গল উঠে গেছে, আমি বোধহয় হাজার ফুট উপর দিয়ে হাঁটছি, নিচে নর্মদার জল চিক্‌চিক্ করছে। এইভাবে প্রায় আরও মাইল তিনেক হাঁটলাম। সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। গাছের ছায়া দেখে দ্রুত হাঁটছি। হঠাৎ বহুদূর হতে বাঘের প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কার ভেসে এল। এ ডাক আমি চিনি। সকলেই সমস্বরে 'রেবা রেবা' জপ করতে লাগলাম, আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অনুমান করতে চেষ্টা করলাম ব্যাঘ্র মহারাজ দূরে না নিকটে? তখনই দেখলাম কতকগুলি নীলগাই হুড়মুড় করে দৌড়ে গেল আমাদের কাছ হতে প্রায় পাঁচশ ফুট নিচে দিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে একটা হলুদ বর্ণের বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল। মুহূর্তের জন্য আতঙ্কে চোখ বন্ধ করলাম। চোখ খুলে দেখি আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে মাটিতে পড়ে আছি। সম্পূর্ণ চলৎ শক্তিহীন। পলকের জন্য দেখতে পেলাম কালান্তক বাঘটা গর্জন করতে করতে একটি নীলগাইকে পিঠে ফেলে জঙ্গলের দিকে পালাচ্ছে। আমরা থরথর করে কাঁপছি। আমাদের কাঁপুনি আর থামতেই চায় না। যতই উঠে দাঁড়াতে যাই ততই পথের উপর আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলাম। যাইহোক কোন রকমে মুখে চোখে জলের ঝাপটা নিয়ে কিছুটা ধাতস্থ হলাম। তাও হাত কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। আমাদের এই অবস্থায় প্রায় এক ঘন্টা কেটে গেল। বড় ক্লান্ত লাগছে, ঘামে ভিজে গেছি। নর্মদার জলে মুখ হাত ধুয়ে পেটভরে জল খেলাম। দূরে বাঘের হুঙ্কার শুনলাম। শুনেছি শিকার প্রাপ্তির পর বাঘ

এইভাবে আনন্দে হুঙ্কার দেয়। ক্রমে উৎরাই-এর পথে নামতে লাগলাম। অনেকক্ষণ হাঁটার পর নর্মদার কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। প্রায় আধ মাইল হাঁটার পর দু'জন লোককে দেখতে পেলাম। মন আনন্দে দুলে উঠল। তারা কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁটছে। হাতে তাদের কুড়ুল। হরানন্দজী এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন — এখানে কোন মন্দির আছে, যেখানে রাতে থাকতে পারি?

তারা ইঙ্গিতে আমাদেরকে অনুসরণ করতে বলল। একটা বাঁক ঘুরতে তারা আমাদেরকে এক মনোরম স্থানে উপস্থিত করল। সামনে একটি বিরাট শিবমন্দির। চারদিক বড় বড় পাথরের চাট্টান। একটি বিরাট জলপ্রপাত দেখতে পেলাম। নদীর বিস্তৃত বুকের মাঝখানে পর্বতমালার আড়ালে। পর্বতমালার একদিকে আছড়ে পড়ছে জলস্রোত, তারপর পাহাড়ের ফাঁক দিয়ে দিয়ে গা থেকে সহস্র ছোট বড় ক্ষীণ ধারায় ঝরণা হয়ে ঝড়ে পড়ছে — আবার সব কটি ধারা এক হয়ে চলেছে পশ্চিমাভিমুখী। এই ধারার নাম — সহস্রধারা। স্ফটিক স্বচ্ছ জলধারার বিপুল গর্জন শুনে মনে হচ্ছে, এ যেন সাতপুরার অট্টাট্ট হাসি।

নর্মদার ভীম ভয়াল গর্জন ও মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন আমাদের পথশ্রমের সমস্ত ক্লান্তি দূর করে দিল। ঘুরে দেখি আমাদের পথ প্রদর্শক লোক দুটি কাঠের বোঝা রেখে আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে নর্মদা বন্দনা শুরু করছেন।

রেবা রেবা জপ করো, তেরা ভালা কী কহু।
হরবখত রেবা রটতে রহো তেরা ভালা কী কহু।
রেবা মাঈকী ধ্যান ধরো দরপন উজ্জ্বল হোয়।
দরশন হো বৈ শিবকা, তিমির যায় সব খোয়া॥
তেরা ভালা কী কহু।

দুজনের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। কথায় কথায় লোকটি জানাল তার নাম রামানন্দ আর ঐ সাধুজীর নাম মঙ্গলনাথ। তার গুরু দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে মৌনী। প্রয়োজনীয় সব কাজ তিনি ইঙ্গিতে তাকে বুঝিয়ে দেন।

বিশাল মন্দির। মন্দিরের ভিতরেই আমাদেরও থাকার ব্যবস্থা হল। দেওয়ালে একটি কালো ব্ল্যাক বোর্ড ঝুলছে। রামানন্দ জানাল যে তার গুরুজীকে কোন প্রশ্ন করলে তিনি ঐ ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে সব প্রশ্নের জবাব দেন।

রামানন্দজী অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে সাগ্রহে আমাদের জানালেন — মেরে গুরুজীকা পাশ সবকুছ ঋদ্ধি-সিদ্ধি হ্যায়। দেহাত সে বহেৎ আদমী ইধর আতা হৈ, মাথা টেকতা হৈ ঔর চলা যাতা হৈ। ব্যাস ইসীমে উনলোগোঁকা দিল কা বাসনাকি পূর্তি হো যাতা হৈ। আপলোগ ইধর আজ আয়েঙ্গে। এ বাত্ পলেহেসে উনোনে বাতা দিয়া হৈ।

এই কথা শুনে আমরা খুবই অবাক হলাম। রামানন্দজীকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম মন্দিরের বারান্দাতেই রান্নার কাজ হয়। রামানন্দজী এক হাঁড়ি গরম জল দিলেন। ভাল করে মুখ হাত ধুয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। ক্ষুধায় পেট চুঁই চুঁই করছে, ক্ষুধার চোটে বিছানায় উঠে বসলাম, পেটভরে জল খেয়ে আবার শুলাম। সারাদিন পথ চলার পরিশ্রমে ঘুম আসতে দেরী হল না। কিন্তু শেষরাতে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি মন্দিরের দরজা খোলা। সাধু মঙ্গলনাথ সমকায়শিরোগ্রীব অবস্থায় বসে আছেন। নর্মদা মাতার কৃপা এঁরা পাবেন না, ত কারা পাবেন? চিন্তা করতে করতে মন্দিরের ভিতরে নিজের বিছানায় এসে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙ্গল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। রামানন্দ ও তার গুরুজী মঙ্গলনাথকে আশেপাশে কোথাও দেখতে পেলাম না। যতীশ্বরানন্দ হঠাৎ ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখলাম তাতে লেখা — আজ যাত্রাকে লিয়ে শুভ নহী হ্যায়। মৎ যাও। থোড়ী দেরমেঁ লোটেঙ্গে।

হরানন্দজী বললেন — নর্মদায় কে কী রূপে থাকেন তা একমাত্র নর্মদাই জানেন। এদের দুজনকে দেখলে কি সাধু বলে মনে হয়, মনে হয় দেহাতী ভক্ত মানুষ।

বহিরে রৌদ্রের তাপ বড় তীব্র। হঠাৎ দেখলাম, এক বুড়ীমা লাঠি ঠুকে ঠুকে শিবমন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছেন। আমি বললাম — সাধুজীরা কেউ নেই। সকালে আমাদের উঠবার আগেই বেরিয়ে গেছেন। একমাথা পাকাচুল ও ফোকলা দাঁত নিয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে মিট-মিট হাসছেন। আমাদের পাশ কাটিয়ে বুড়ী মা মন্দিরের মধ্যে ঢুকে গেলেন। দেখি মন্দিরের এক কোণে বুড়ীমা বড় একটি কাঁসার পাত্র রেখে তাড়াতাড়ি সরা চাপা দিলেন। প্রেমানন্দ বললেন — আপ্ কৌন হৈ? ইধার গাঁওকে রহেনেবালা। আপ রোজ

সাধুজীকে লিয়ে উসকে দুপহরকা খানা লাতা হৈ? মুখে আঙুল চাপা দিয়ে সংকেত করলেন চুপ করতে। বুড়ীমা নিরুত্তর। মুখে হাসিটা লেগেই আছে। তিনি ঠিক যেভাবে লাঠি ঠুকে ঠুকে এসেছিলেন ঠিক সেইভাবে লাঠি ঠুকে ঠুকে নর্মদার ধারে ধারে জলের কিনারে পূর্বদিকে বেশ দ্রুততালে হেঁটে যাচ্ছেন। অনেকখানি চলে গেছেন, সূর্য তখন মাথার ওপরে।

এমন সময় পশ্চিমদিক থেকে সাধুজী ও তাঁর চেলা 'হর নর্মদে', 'হর নর্মদে' বলতে বলতে এসে উপস্থিত হলেন। আমাদের 'নম নারায়ণায়' জানিয়ে মন্দিরের বারান্দায় যেখানে রান্নার ব্যবস্থা আছে সেখানে মাথার উপর চাপানো ঝোলা থেকে আটা, কন্দমূল, শাক ও একটি বড় কলসীর এক কলসী দুধ রাখলেন। মৌনী বাবা এক কোণে বসে রয়েছেন। তাঁর ঠোঁট দুটি নড়ছে। বুঝতে পারলাম রেবা মন্ত্র জপ করছেন। রামানন্দ একটি বড় পাত্রে আটা রেখে জল ঢালার উপক্রম করতেই আমি বললাম — একজন বুড়ীমা আপনাদের খাবার মন্দিরের ভিতরে রেখে গেছেন। মৌনী সাধু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে মন্দিরের মধ্যে ছুটে গেলেন, সরা সরিয়ে একদৃষ্টে সেই খাদ্য সম্ভারের দিকে তাকিয়ে রইলেন। পাত্রটির উপরেই টিপ করে প্রণাম করলেন। এইভাবে কিছুক্ষণ কাটার পর সাধু দৌড়ে গিয়ে নর্মদার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। রামানন্দ ও আমরাও নর্মদার ধারে দৌড়ে গেলাম। দেখলাম সাধু ভাব-বিহ্বল দৃষ্টিতে নর্মদার দিকে তাকিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন।

রামানন্দও কাঁদছেন। তিনি উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করতে লাগলেন —

ওঁ সরাংসি নদ্যঃ ক্ষয়মভ্যুপেতা ঘোরে যুগেঽস্মিন হি কলৌ প্রদবষিত,
ত্বং ভ্রাজসে দেবি জলৌঘপূর্ণা দিবীব নক্ষত্রপথে চ গঙ্গা॥
তব প্রসাদাৎ বরদে বরিষ্ঠে কালং যথেমং পরিপালয়িত্বা।
যমোঽথ রুদ্রং তব সুপ্রসাদাৎ তথা অয়ং কুরু বৈ প্রসাদম॥

— মা নর্মদা গো! এই কলিদুষিত ভীষণ যুগে সরিৎসরোবরাদি ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে আসছে, কিন্তু একমাত্র তুমি নক্ষত্রপথে স্বর্গগঙ্গা মন্দাকিনীর জলরাশি সূক্ষ্মভাবে বক্ষে ধারণ করে বিরাজ করছ। হে বরদে! তোমার প্রসাদে যাতে আমরা এই ভীষণ সময় অতিবাহিত করতে পারি। হে বরিষ্ঠে! আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়ে সেইরূপ অনুগ্রহ প্রদর্শন কর।

অল্পক্ষণ পরেই তিনি নর্মদাতে নামলেন স্নান করতে। স্নান করে আসার পরেই মৌনী বাবাকে খুব স্বাভাবিক দেখলাম। তিনি আমাদের সামনেই পাত্রের ঢাকনা খুললেন। তাঁর মুখ চোখ লাল থমথমে হয়ে উঠল, কেবল একবার অস্ফুট স্বরে যেন বললেন 'রেবা রেবা'। দেখলাম পাত্রের উপর কাঁচা শালপাতায় কতকটা চরু রয়েছে। ঢাকনা খুলতেই চরুর গন্ধ পেলাম। বড় বড় কিস্‌মিস্‌, পেস্তা, ঘি ও দুধে সিদ্ধ বিশুদ্ধ চরু। ব্রাহ্মণ মাত্রেই এই চরুর স্বাদ জানে।

চরু খেয়েই মৌনী সাধু শুয়ে পড়লেন। দেড়দিন আমারও অভুক্ত ছিলাম, তাই আমরাও মন্দিরের বারান্দায় যে যার মত শুয়ে পড়লাম। সন্ধ্যার পূর্বেই সবাই জেগে উঠলাম। সহস্রধারার অবিশ্রান্ত গর্জন মনে প্রাণে এক হিল্লোল তুলেছে।

মৌনী সাধু নর্মদার দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন। একেবারে ধ্যানস্থ। রামানন্দ মন্দিরে শিবের সন্ধ্যা আরতির আয়োজন করছেন। আমরাও যে যার আত্মকর্মে মন দিলাম। সন্ধ্যা হতেই আমরা নর্মদার তীরে গিয়ে সান্ধ্যবন্দনায় রত হলাম।

আরতির পর আমরা যে যার আসনে বসে আছি। শিবের কাছে যে মোমবাতিটা জ্বলছিল সেটাও নিভে গেল। অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ সাধুজী একটি মোমবাতি জ্বেলে ব্ল্যাক বোর্ডটির কাছে এগিয়ে গেলেন এবং লিখতে আরম্ভ করলেন — ভগবানের যিনি যথার্থ প্রেমিক, ভগবান ছাড়া তাঁর আর কোন চাওয়া-পাওয়া নাই। প্রেমের পথে ভক্ত তাঁর প্রিয়তমাকে ক্ষণে পায় ক্ষণে হারায়। যখন পায় তখন আনন্দে আত্মহারা হয়, আর যখন হারায় তখন যাতনায় ছটফট করে। প্রেমিকা প্রিয়তমকে পেয়েও পায় না, বুঝেও বুঝে না তাঁর রহস্য। তাই পেয়েও হারায়, হারিয়ে বিরহে কাতর হয়। কিন্তু একবার যদি রহস্য বুঝে তাহলে প্রিয়ের সন্ধানে আর এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয় না। তখন আপন অন্তরের মধ্যেই

তাঁকে দেখতে পায়, দেখতে পায় তার প্রিয়তম প্রভু তার হৃদয় আলো করে রয়েছেন।

এই বলে তিনি কাঁদতে আরম্ভ করলেন। কাঁদতে কাঁদতে তিনি আরও লিখলেন — আমি প্রিয়ের খোঁজে চলেছি। তাঁকে কি করে পাব, অন্তরের এই ভাবনা কিছুতেই ঘুচছে না। বন্ধু আমার নিয়তই পাশে রয়েছে তবু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না। যখন আমার চোখের পর্দা সরে গেল তখন তাকিয়ে দেখি প্রভু আমার হৃদয়েই রয়েছেন।

এরপর সাধুজী মোমবাতিটি নিভিয়ে দিলেন। অন্ধকারেই অনুভব করলাম সাধু শুয়ে পড়েছেন।

ঘুম ভাঙল সকালে। অন্যেরা সবাই উঠে পড়েছেন। যে যার মত স্নান, তর্পণ, প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে ব্যস্ত। আমি মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি অন্যদিনের মত মৌনী সাধু একদৃষ্টিতে নর্মদার দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। রামানন্দ স্নান করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিলেন এমন সময় আমাকে, রঞ্জন ও হরানন্দজীকে দেখে 'নম নারায়ণায়' জানিয়ে বললেন — আমার গুরুজী চাইছেন আপনারা এখানে আরও দু'একদিন থেকে যান তাতে আপনাদের পরিক্রমার পথ বাধা-বিঘ্নহীন হবে।

আমরা তাঁর কথায় সায় দিলাম। বেলা ন'টা নাগাদ সাধু নর্মদায় স্নান করতে নামলেন। স্নান করে শিবপূজা করার পর অন্যদিনের মত দু'জন কোথাও চলে গেলেন। আমরা মন্দিরেই রইলাম।

মহানন্দস্বামী গল্প করতে করতে বললেন — শোন তোমাদেরকে গুরুদেবের জীবনের একটা গল্প বলি। গল্প নয়, এটি গুরুদেবের জীবনের সত্যি ঘটনা। প্রত্যক্ষ ঘটনা। গুরুদেবের মুখের ভাষায় বলি — 'তখনও এ শরীর সন্ন্যাস গ্রহণ করে নি। মায়ের সঙ্গে বদরীনারায়ণ গেছলাম। আমার মা এই মঠের আচার্যদেবকে গুরু বলে মানতেন। এ মঠের আচার্যরা সন্ন্যাস দীক্ষা ছাড়া কোন দীক্ষা দেননা, শিষ্য করেন না। আমার মা'ই তাঁকে মনে মনে গুরু বলে বরণ করে নিয়েছিলেন। আমি এই মঠ আর মঠাচার্যের উপর খুবই বিরক্ত ছিলাম। মা কাশীতে থাকা কালে মঠে গেলে মঠের বাইরে দাঁড়িয়ে ঘন্টা ধরে টান দিতাম। মা বুঝতেন, আমি এসেছি, তিনি নেমে আসতেন। মা কতবার এই আচার্যকে উপরে গিয়ে দর্শন করতে বলেছেন — কিন্তু আমি কিছুতেই যাই নি। কাজেই তাঁর গুরুকে আমার দেখা ছিল না। বদরীনারায়ণ থেকে ফেরার পথে মা শুনলেন তাঁর গুরুদেব উত্তর কাশীতে এসেছেন। তাই শুনে মা জিদ্ ধরলেন, উত্তর কাশীতে একটা ঝোপড়া ভাড়া নিয়ে মা বেটাতে থাকলাম। বিকেল হলেই মা আনন্দ আশ্রমে চলে যেতেন তাঁর গুরুর সৎসঙ্গ শুনতে। আমি হেথা সেথা ঘুরে বেড়াতাম। ওখানে মিশ্রজী বলে একজন পাণ্ডার সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়েছিল সে একদিন একজন লকড়িআলাকে দেখিয়ে বলেছিল — উস্‌কা নাম কালুয়া। ও ডাকু হৈ। উস্‌কো কোভি আপকা ডেরামে ঘুস্‌নে মৎ দিজিয়ে। একদিন আনন্দ-আশ্রমে যজ্ঞ হচ্ছিল, দণ্ডী সন্ন্যাসীদের ভাণ্ডারা। হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসী হরিদ্বার লছমনঝোলা থেকে এসেছেন, মা সকাল থেকেই সেখানে চলে গেছেন। আমি দুপুরের পর বেড়াতে বেড়াতে আপনমনে পাহাড়ের উঁচু দিকটায় চলে গেছি? এক জায়গায় দেখলাম লেখা আছে —'তপোবন'। তপোবনই বটে। ফলভারে ও ফুলভারে নত গাছ, সুন্দর সুন্দর পাখীর কলকাকলি, হরিণ শিশু ঘুরে বেড়াচ্ছে। চারিদিকে একটা শান্তশ্রী! তপোবনের সাধুকে দেখবার জন্য ভিতরে ঢুকলাম। গিয়ে দেখি ওমা, অমন শান্তি ঘেরা তপোবনের সাধুটির কী কাটখোট্টা চেহারা। তিনি আবার সেই কালুয়ার সঙ্গে বসে গাঁজা টানছেন, মস্করা করছেন। গা ঘিন্‌ঘিন্ করে উঠলো। পালিয়ে এলাম, আসার পথে পাহাড়তলীর দিকে নেমে গেলাম। দূর থেকে দেখলাম একটা কুটীরের মাথায় ওঁ লেখা একটা গৈরিক পতাকা উড়ছে। একজন লোককে জিজ্ঞেস করতে বলল 'ওটা হচ্ছে ফলাহারী বাবার আশ্রম। সারাদিনে একটা মাত্র ফল খেয়ে থাকেন, বাবাকা বহুৎ সিদ্ধাই। হাতে কাজ নেই সন্ধ্যা হতেও দেরী আছে, কাজেই সিদ্ধবাবাজীকে দেখতে গেলাম! গিয়ে দেখি বাবাজীর পরণে গেরুয়া, বৌ আছে, ছেলে আছে, ছেলের গা হাত মুছিয়ে তাকে জামা প্যান্ট পরাচ্ছেন। মনটা খিঁচড়ে গেল। ফিরে এলাম। একটা পাকদণ্ডী পেরিয়েছি, মিশ্রজীর সঙ্গে দেখা। বললেন ঐ যে দূরে উদাত্ত সামগান শুনতে পাচ্ছেন — ওটা হচ্ছে স্বামী শুকদেবানন্দের গলা। কাফি বিদ্বান্, চলিয়ে প্রবচন শুনেগা — সামগানের ঝঙ্কার ভালই লেগেছিল — কাজেই গেলাম সেখানে। শুকদেবানন্দজীকে দেখলাম বেশ নধরকান্তি দেহ, পরণে সিল্কের গেরুয়া, একটা বহুমূল্য কারুকার্যখচিত সিংহাসনে বসে বক্তৃতা দিচ্ছেন। বাচনভঙ্গী চমৎকার। কিন্তু বড্ড জাঁকজমক। খুব এটা উচ্চকোটির সাধু বলে মনে হল না। হর ক্যা প্যারির কিনারে হাঁটতে হাঁটতে নিজেদের

আস্তানার দিকে এগুতে লাগলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। এক জায়গায় দেখলাম এক সৌম্যকান্তি সাধু ঐ প্রচণ্ড শীতে কৌপীন মাত্র পড়ে নদীতীরেই গভীর ধ্যানে মগ্ন। বড় ভক্তি হল। মনটা আনন্দে ভরে গেল। মনে মনে প্রণাম করে আনন্দ আশ্রমের দিকে এগিয়ে গেলাম, মাকে আশ্রম থেকে আনতে হবে। আশ্রমে পৌঁছতেই মা আজ কিন্তু জোর করে আমাকে তাঁর গুরুদেবের কাছে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি ডাকু কালুর সঙ্গী সেই কাটখোট্টা সাধুটা। দলে দলে দণ্ডী সন্ন্যাসীরা দণ্ড নামিয়ে নমো নারায়ণ জানাচ্ছেন। এখানে সে সাধু আসবে কি করে তাই লোকের ভীড় ঠেলে আরও কাছে এগিয়ে গেলাম। দেখলাম একেবারে অবিকল সেই সাধু যিনি পাহাড়তলীতে ছেলেকে জামা প্যান্ট পরাচ্ছিলেন! মা সমানে বলে যাচ্ছেন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছিস কি, প্রণাম কর। প্রণাম করে দেখি স্বামী শুকদেবানন্দজী। মাকে চেঁচিয়ে বললাম, তোমার গুরু কি ইনি? ইনি তো শুকদেবানন্দজী, ঘন্টা দেড়েক আগে মিশ্রজীর সঙ্গে এর বেদপাঠ শুনে এসেছি। মা তখন রীতিমত আমার উপর রেগে গেছেন। মহাপুরুষকে নিয়ে ইয়ার্কি! অমন যদি করবি খোকা, আমি মরলে তোর হাতে আগুন নেবো না। মা বেটার এই কথার ফাঁকে সাধুজী তখন ওখান থেকে পাশের কুটীরে চলে গেছেন। মার তখন রণচণ্ডীর মূর্ত্তি! তিনি আমার কান ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরে! নগ্নদেহে কৌপীন পরে ধ্যানাসনে সাধু বসে আছেন — মা বললেন ইনিই আমার গুরুদেব। সাষ্টাঙ্গ দে। গুরুদেব হেসে হেসে বললেন — নদী ধারে আমাকে দেখে ভক্তি তো হয়েছিল, আমার কাছে সন্ন্যাস নিবি ত? কালুয়ার সঙ্গে যাকে দেখেছিস, ছেলের জামাপ্যান্ট যে পরাচ্ছিল আর বেদগান যার শুনেছিলি সবই এই শরীরের মূর্ত্তি! আমার অর্ধেকটা মানবি — অর্ধেকটা মানবি না। এতো আর হয় না। আমার নদীধারের কৌপীনধারী মূর্ত্তিটাকে দেখে একবার যখন তোর শ্রদ্ধা হয়েছে তখন এরপর থেকে আমাকে ভালবাসতেই হবে।

যাই হোক বাবা, সেই থেকে আমি জানি, সাধুর প্রকৃত স্বরূপ জানা চেনা বড্ড কঠিন। একনজর দেখেই সাধুর সম্বন্ধে সহসা কোন মন্তব্য করতে নেই।

তাঁর গল্প শেষ হতেই দেখলাম যথারীতি সাধুজী ও তাঁর চেলা বেলা বারটা সাড়ে বারোটা নাগাদ ফিরে এসে রুটি তৈরী করতে বসলেন। খাদ্য তৈরী হয়ে যেতেই মৌনী সাধু শিবজীকে ভোগ নিবেদনের পর আসন বিছিয়ে আমাদেরকে খেতে দিলেন। বাজরার রুটি, অড়হড় ডাল ও দুধ। খাওয়ার শেষে হাত মুখ ধুয়ে শিবমন্দিরের বারান্দায় বসতেই মৌনী সাধু আমাদের কাছে এসে বসলেন। দুটি আঙুল নেড়ে রামানন্দজীকে ইঙ্গিত করতেই রামানন্দজী বললেন — সাধুজী আপনাদের পরিচয় জানতে চাইছেন।

প্রেমানন্দ বললেন — আমরা ছয়জন বেনারসের দণ্ডী সন্ন্যাসীদের প্রধান কামরূপ মঠের সন্ন্যাসী। আমাদের গুরুজী হলেন স্বামী ভোলানন্দ তীর্থ। পরম ত্যাগী, পরম নৈষ্ঠিক এবং পরম যোগী। তাঁরই আদেশে আমরা নর্মদা পরিক্রমাতে এসেছি। অমরকন্টকের কোটি তীর্থের ঘাটে রুণ্ডা পরিক্রমার শপথ নিয়ে আমরা বিমলেশ্বর পেরিয়ে ওঁঙ্কলেশ্বর পর্যন্ত গিয়েছিলাম। আমরা অমরকন্টকে ফিরে যাচ্ছি। রঞ্জনের দিকে মৌনী সাধুজী তাকাতেই রঞ্জন বলতে শুরু করলেন — আমার নাম রঞ্জন বাউল। গুরুর নাম নন্দদাস বাউল। তিনি কট্টর বাউল হয়েও কিভাবে শৈবতে রূপান্তরিত হলেন সে রহস্য আমার অজানা। তবে তাঁর শেষ নির্দেশ অনুযায়ী আমি অমরকন্টকে গিয়ে মাতৃদর্শন করতে চাই। গুরুর শেষ নির্দেশ আমি পালন করবই।

সাধুজীর মুখে চোখে একটা আনন্দের লহর খেলে গেল। কিছুক্ষণ রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে তিনি শিশুর মত খিলখিল করে হাসতে লাগলেন। হঠাৎই আমার দিকে সাধু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েই আমাকে ইঙ্গিতে চুপ করতে বলে উঠে গেলেন মন্দিরের ভিতর। ব্ল্যাকবোর্ডটি বাইরে এনে তাতে লিখলেন, 'মুঝে internal message মিলা কী আপ আপকা পিতাজীকে আজ্ঞানুসার জলেহরি পরিক্রমা কর রহা হ্যায়। আমি অবাক হয়ে তাঁর দিকে চেয়ে রইলাম। মনে মনে প্রণাম জানিয়ে বললাম 'ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহুঁ, নর্মদামেঁ এ্যায়সা হোতা হ্যায়।

সাধুজী চলে গেলেন নর্মদার সহস্রধারার নিকট। পশ্চিমগামিনী নর্মদার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সাধুজী ধ্যানমগ্ন হলেন। নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত একবারে স্থির হয়ে আছেন। সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

আমরা নর্মদা স্পর্শ করে এসে নিজের নিজের আসনে বসেই সান্ধ্য জপে মন দিলাম। আমার যখন সান্ধ্যক্রিয়া শেষ হল দেখি সাধুজী ফিরে এসে নিজের আসনে বসে আছেন। রঞ্জন তাঁকে বলল — কবীরের

পুত্র কামাল সাহেব বলেছেন —'জীবনে গুরুর অগ্নি (সত্যকে) বহন করবে। নিভানো মশাল আর নিভানো কাঠের টুকরা সংগ্রহ করে অন্ধকার ভাণ্ডারের (অজ্ঞানতার) বোঝা বাড়িওনা। গুরুকে (তাঁর সত্যকে) মেরে ফেলে সম্প্রদায়ের মঠ বাড়ী গড়ে তুলবার গৌরব লুব্ধতা ছাড়।

সাধু এ্যায়সা চাহিয়ে সচ্ কহে বনায়।
কৈ টুটে কৈ ফিন্ জুড়ে, বিন্ কহে ভরম না জায়॥

কিন্তু সংস্কার ত্যাগী সন্ন্যাসী চোখে পড়ে না — সৎ + নাশী = সন্ন্যাসীতে ভারতবর্ষ ছেয়ে আছে! তাই আপনি বলুন সদ্‌গুরু চিনবার বাহ্য লক্ষণ কি?

মৌনী সাধু ব্লাকবোর্ডটির কাছে উঠে গিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন —

বর্তমানে বাংলা মুলুকে বহু অবতারের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। কিন্তু শাস্ত্র বলেন, শ্রীভগবানজীর অবতরণ হয় না। অনন্ত কিভাবে সান্ত হবে? শাস্ত্রে নিম্নাধিকারীর নিমিত্ত মূর্তিপূজার ব্যবস্থা আছে। পরন্তু তা অক্ষর পরিচয় — স্বরে-অ স্বরে-আ লিখিবার মত। লোকে ভুল করে ঐ অ আ-তে দাগ বুলায়। জীবন কাটিয়ে দেয়। তারা সারাজীবন পাথরকে পূজা করে, পাথর কে? এই জিজ্ঞাসা তাদের জাগ্রত হয় না। দিয়াশালাই কাঠির উল্টা দিকটা যদি অবিরাম দিয়াশালাই গাত্রে ঘর্ষণ করা যায়, তাহলে কি আলো জ্বলবে? ফলং — তাদের প্রাপ্তিযোগ শূণ্য।

ঝুটা গুরুর ঝুটা উপদেশে আম-জনতা ধ্যানে বলে — রজত-গিরিনিভং শ্বেতাম্বরং সুন্দরং — আর বিল্বপত্র চড়ায় সম্মুখস্থ কালো কুচকুচে পাথরটির উপর। এটা ভাবের ব্যভিচার। সবাই শোনাউল্লা — করিমউল্লা কেউ নয়। শোনা কথার তোতা শোনাউল্লা না হয়ে করিমউল্লা অর্থাৎ ক্রিয়াবান হওয়া কর্তব্য। যারা মূর্তিপূজা সম্বন্ধে নানারকম টেক্ করে, তাদের কু-যুক্তি যেহেতু পরমাত্মা সর্বত্র আছেন, সেহেতু তিনি মূর্তিতে কেননা প্রকট হবেন? বাত্ তো সহি হ্যায়, লেকিন, অন্তরস্থ ভাবটিতো সাচ্চা হওয়া চাই, জীবন্ত হওয়া চাই। একটি বালকের যে সরলতা এবং জীবন্ত ভাব থাকে, মূর্তিপূজকদের মধ্যে তাও তো দেখি না। রাজপথে মাটি বা পাথরের মূর্তি বা প্রতিমা কাউকে বহন করতে দেখলে বাচ্চারা যুক্ত করে প্রণাম করে। বলে — ঐ দেখ মা, ঠাকুরজী যাচ্ছেন! কিন্তু বয়স্ক লোকেরা মনে মনে জানে এটি মাটি বা পাথরের মূর্তি মাত্র। তাই তারা আবাহন এবং প্রাণপ্রতিষ্ঠার অভিনয় করে।

ঝুটা সন্ন্যাসীরা ধর্ম নিয়ে যে কারবাঈ করছে, সে সম্বন্ধে মানুষের চক্ষুরুন্মীলন উত্তম কার্য। ভালাভোলা লোকগুলি প্রকৃত সন্ন্যাসী কাকে বলে তা জানে না বলে ওদের কারবার জমে উঠেছে।

শাস্ত্রে আছে — সন্ন্যাসী চার প্রকার —

১) বৈরাগ্য-সন্ন্যাসী, ২) জ্ঞান-সন্ন্যাসী, ৩) জ্ঞান-বৈরাগ্য সন্ন্যাসী এবং ৪) কর্ম সন্ন্যাসীতি।

সংসারকে বিষবৎ প্রতীয়মান হতে অন্তরে তীব্র বৈরাগ্য জন্মে। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতি বশেই তা লভ্য। তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের ইচ্ছায় — 'সংসারমেব নিঃসারম্' বুঝে যে সন্ন্যাস গ্রহণ, তার নাম — বিবিদিষা সন্ন্যাস। তত্ত্ব-জ্ঞানলাভের পর যে সন্ন্যাস গ্রহণ — 'যদাতু রিদিতং তত্ত্বং'— (যেমন যাজ্ঞবল্ক্যের) তা বিদ্বৎ সন্ন্যাস।

জ্ঞান-বৈরাগ্য-সন্ন্যাসী বিষয়ে শাস্ত্র বলেছেন — ক্রমেন সর্বসত্যস্য সর্বমনুভূয় জ্ঞান বৈরাগভ্যাম স্বরূপানুসন্ধানেন দেহমাত্রবিশিষ্ট সন্যস্য জাতজপধরো ভবতি সঃ।

ইহ ব্যতীত, চার আশ্রম মেনে পরে সন্ন্যাস গ্রহণকে কর্ম-সন্ন্যাস বলে। এটির প্রকারভেদ —

১) কুটিচক — ইঁহারা স্বপুত্র গৃহেযু আচরন্তং আত্মানং প্রার্থয়ন্তে।

উপমাস্থল — জনক, কাত্যায়ন, হরিত, হারীত, মাণ্ডব্য এবং জৈমিনী প্রভৃতি।

২) বহুদক — ত্রিদণ্ড-কমণ্ডুলু-শিখা-যজ্ঞোপবীত-কৌপীন-কাষায়-কেশধারিণঃ। সাধুবৃত্তেষু ব্রাহ্মণকুলেষু ভৈক্ষ্যাচর্যং চরন্তং আত্মানং প্রার্থয়ন্তে।

৩) হংস — একদণ্ডধারিণঃ-শিখাবর্জিতাঃ-যজ্ঞোপবীতধারিণঃ-শিরমুণ্ডনঃ-গ্রামে একরাত্র-তীর্থেযু জনপদেযু পঞ্চরাত্রং বসন্তং আত্মানং প্রার্থয়ন্তে।

৪) পরমহংস— লিঙ্গরাহিত্য অর্থাৎ কোন ভেক বা চিহ্ন থাকবে না। চারি আশ্রমে ভিক্ষা করতে পারেন। ধর্মকার্য নাই। সর্বংসহা-সর্বসমা-সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চনঃ-আত্মানং মোক্ষয়ন্ত।

৫) তুরীয়াতীত ও অবধূত — অতি উচ্চতম অবস্থা। উন্মাদবৎ, কখন পিশাচবৎ, কখন বা অতি সাধারণ। সকল বেদবিধির উর্ধে। নিত্যযুক্তেশ্বরের অবস্থা।

লোকে যদি শাস্ত্রের এই সব লক্ষণ উত্তমরূপে জানতে পারে, তা হলে প্রবঞ্চনা চলবে না। সকলেই নিজেকে পরমহংস বলে প্রচার করছে। অজ্ঞ চেলারা শাস্ত্রীয় লক্ষণ জানে না, অতি ভক্তির বশে স্ব স্ব গুরুকে পরমহংস বলে প্রচার করে। তাই পরমহংসদের সংখ্যাধিক্য। বাংলাদেশের পরমহংস রাত্রি তিনটায় উঠে শোল মৎস্য কর্ত্তন করছেন, তাঁর আমের ঝোল খাবার সাধ জেগেছে — এ দৃশ্য বহুৎ বহুৎ কৌতুকাবহ। পরমহংস কাহাকে বলে?

আশাম্বরো, নির্নমস্কারো, ন স্বধাকারো, ন নিন্দাস্তুতি, যদৃচ্ছিকো ভবেদ্ ভিক্ষুর্নাবাহনম্, ন বিসর্জনং, ন মন্ত্রং, ন ধ্যানং নোপাসন নালক্ষ্যং, ন পৃথঙ্ না পৃথঙ্, ন চাহং ন ত্বং, ন চ সর্বং চানিকেত স্থিতিরেব স ভিক্ষুঃ সৌবণদীনাং নৈব পরিগ্রহেন্ন লোকং নাবলকং চ।

তাৎপর্য হল, পরমহংস হবেন নগ্ন, যাদৃচ্ছিক, নির্বন্ধরহিত। এই যতির স্তুতিনিন্দা প্রভৃতি লৌকিক ব্যবহার নাই, কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নাই। তিনি স্থায়ী বাসের জন্য কোন মঠ বা ডেরাও স্বীকার করবেন না। সংসারে তাঁর আমি আমার বোধ নাই। সেই যতি কারও স্তুতি করবেন না, কাউকেও নমস্কার করবেন না। চল-স্বভাব শরীর এবং অচল-স্বভাব আত্মা ভিন্ন অন্য নিকেতন স্বীকার করবেন না। তিনি যদৃচ্ছাপ্রাপ্তমাত্রে দেহযাত্রা নির্বাহ করবেন।

এই রকম পরমহংস অবস্থা সাধনার উচ্চতম মার্গে লাভ হয়। তখন লক্ষণগুলি স্বয়ং ফুটে উঠে। ভারতমাতা বন্ধ্যা নন। হিমালয়ের কন্দরে কন্দরে নর্মদার তটে তটে ঐ রকম উচ্চকোটির অনেক পরমহংস আছেন। তাঁরা নিজেদেরকে অবতার বলে জাহির করেন না। যে সমস্ত জিজ্ঞাসু তাঁদের সন্ধান রাখেন, 'যুগাবতার' বলে প্রচার করতে তাঁদেরও দুর্মতি হয় না। কারণ, এইরূপ প্রচার করা হাস্যকর।

দীক্ষাকালে সদ্‌গুরু শিষ্যের পর্দা ছিন্ন করে তত্ত্ব প্রকট করেন, ইহা ধ্রুব সত্য। শিষ্যের দেহ সদ্‌গুরুর সাধন-মন্দির, তিনিই শিষ্যের জন্য ক্রিয়া করেন, ইহা গভীর উপলব্ধির কথা। দীক্ষালাভান্তে শিষ্যের কোন সংশয় থাকতে পারে না। সদ্‌গুরুকে শিষ্য চিনিতে পারে। কিন্তু দীক্ষালাভের পূর্বে সদ্‌গুরু চিনবার উপায় কি? যোগিদের মধ্যে নিম্নলিখিত সঙ্কেতগুলি গুরুপরম্পরা শ্রুতিমূলে চলে আসছে —

১) সাপুড়ের সন্নিধানে, তার ঝুলিতে যে সমস্ত বিষঘ্ন লতাপাতার মূল থাকে, তার গন্ধ প্রভাবে বিষধর সর্প যেমন বশীভূত ও শান্ত হয়, তেমনি সদ্‌গুরুর সন্নিধানে উপবিষ্ট হলে মন যতই চঞ্চল, বিষণ্ণ চিন্তাগ্রস্ত, বিরক্ত এবং বিক্ষিপ্ত থাকুক না কেন সদ্‌গুরুর দেহ-নিঃসৃত অদৃশ্য দিব্য জ্যোতিঃকণা এবং সুগন্ধে মন শান্ত ও স্থির হতে বাধ্য। সদ্‌গুরু শান্তিদাতা।

২) জলের যেমন নিজস্ব কোন আকার নাই, যে পাত্রে থাকে তার আকার ধারণ করে, তদ্রূপ সদ্‌গুরুর চিত্তবৃত্তি এবং মনোনাশ ঘটে বলে তার নিজস্ব কোন ভাবের লহর খেলে না। যে যেমন ভাবে উপস্থিত হবে লোকটির কর্ম অনুযায়ী তাঁর মধ্যে তদনুরূপ ভাব ও ভাষার প্রকাশ ঘটবে। ফলে, সদ্‌গুরুরূপী আধারটির মধ্যে আকার, প্রকার, আচরণ ও বৈখরীতে ক্ষণে ক্ষণে পটপরিবর্তন ঘটতে পারে। কখনও রুদ্ররূপ কখনও বা শান্ত প্রসন্ন মূর্তি। অত্যন্ত স্থূল ও দুনিয়াদারীর আলোচনাতেও তিনি যেমন পটু আবার তেমনি শাস্ত্রের দুরাবগাহ তত্ত্বেও তাঁর স্বচ্ছন্দে বিচরণ করবার ক্ষমতাও ক্ষণে ক্ষণে পরিলক্ষিত হবে। ধৈর্য ধরে কিছুদিন নিরীক্ষণ করলেই এই লক্ষণটি ধরা যায়।

৩) একই সময়ে বিভিন্ন লোক সদ্‌গুরুর স্থূলদেহের ফটো তুললে বিভিন্ন লোকের পৃথক পৃথক ভাবানুসারে পৃথক পৃথক ফটো উঠবে। যিনি সদ্‌গুরু, তিনি অহরহ দিব্য ভাবলোকে বিচরণ করেন। স্তর ও মণ্ডল ভেদে বিচ্ছুরিত জ্যোতিচ্ছটায় তাঁর দেহে ক্ষণে ক্ষণে পরিণাম ঘটে। স্থূল চক্ষে তা ধরা না পড়লেও শক্তিশালী ক্যামেরাতে তার ছায়াপাত ঘটে। বস্তুতঃ সদ্‌গুরুর একটি ফটো অন্যটি হতে সর্বদাই পৃথক এবং বৈশিষ্ট-ব্যঞ্জক।

৪) যং লব্ধা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতী ভবতি, তৃপ্তো ভবতি, যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিৎ বাঞ্ছতি, ন শোচতি, ন দ্বেষ্টি, ন রমতে, নোৎসাহী ভবতি তদেব ব্রহ্মঃ। ব্রহ্মকে জানলে সমুদয় তত্ত্বই বিজ্ঞাত হয়। সদ্‌গুরুর ব্রহ্মসিদ্ধির ফলে জ্ঞানসিদ্ধি হয় তাই যিনি সদ্‌গুরু তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ কারণাতীত জগতের তাবৎ প্রশ্নের

উত্তরদানে সমর্থ।

৫) সদ্‌গুরুর সম্মুখে বিভিন্ন লোক একই প্রশ্ন ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উত্থাপন করলে প্রত্যেকের মস্তিষ্ককোষের পৃথক পৃথক স্পন্দনানুসারে তিনি একই প্রশ্নের ভিন্ন ভিন্ন উত্তরদানে সমর্থ। প্রত্যেকটি উত্তরই শাস্ত্রসম্মত, যুক্তি-সিদ্ধ এবং অনুভব সিদ্ধ হবে।

৬) এমনকি যদি কোন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানের গবেষক ছাত্র কোন জটিলতম সূত্রের উদ্ভাবনের জন্য সদ্‌গুরুকে প্রশ্ন করেন, তবে তিনি ইচ্ছা করলে সেই জিজ্ঞাসুর প্রজ্ঞাক্ষেত্রে এমন এক চেতনার উন্মেষ বা এমন এক চিৎ স্পন্দনের উদ্ভব ঘটান যে সেই ব্যক্তির তদ্বিষয়ক জ্ঞান স্বতঃই উপজিত হয়। ফলে মুহূর্তপূর্বে যা তার অজ্ঞাত ছিল, তা আর অজ্ঞাত থাকে না। বুদ্ধি ক্ষেত্রে তত্ত্বটির আকস্মিক স্ফূরণ ঘটে। এই অভাবনীয় ঘটনার কারণ — সদ্‌গুরু সমাধিবান, তিনিই প্রকৃত সমাধানমূলক জীবন্ত বিগ্রহ।

৭) সদ্‌গুরুর নিকট বহু লোক বহু প্রশ্ন নিয়ে আসলে তিনি যে কোন একজনের প্রশ্নকে কেন্দ্র করে সকলের জিজ্ঞাসার সমাধান করে দেন। পৃথকভাবে আর কাউকেও কোন প্রশ্ন করতে হয় না।

৮) সদ্‌গুরু কোন বিভূতি দেখান না। এটি সদ্‌গুরু চিনবার বিশিষ্ট লক্ষণ। তাঁর বিভূতি বা যোগৈশ্বর্য তাঁর অনুগৃহীত ভক্তের মধ্যে দিয়ে প্রকট হয়। ঐ ভক্ত অবশ্যই আক্ষরিক অর্থে দীক্ষাপ্রাপ্ত হওয়া চাই। এর বিশদ অর্থ এই যে, দীর্ঘকাল যোগাভ্যাসের ফলে যে সকল যোগৈশ্বর্য যোগীর আয়ত্তে আসে, সদ্‌গুরু-আশ্রিত শিষ্যের তা বিনা সাধনে আয়ত্তে আসে। শিষ্যের ভাব, ভাবনা, ইচ্ছা এবং বাক্যদানকে সত্য করবার জন্য সদ্‌গুরুর কটাক্ষে অলৌকিক বিভূতিগুলির প্রকাশ ঘটে।

৯) জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সদ্‌গুরুর দর্শন ঘটলে সজ্ঞানে মৃত্যু হয়। সদ্‌গুরুকে সামান্য মানুষ ভেবে কেউ যদি তাঁকে গালিও দেয়, তারও সজ্ঞানে মৃত্যু হবে। ইহা দিব্যৌঘ বস্তুতত্ত্বের সংক্রমণ-জনিত অবশ্যম্ভাবী শুভ ফল।

১০) যাঁকে সদ্‌গুরু বলে অনুমান করবে, জীবনের যে কোন সঙ্কটময় মুহূর্তে যদি কেহ তাঁকে স্মরণ করে, কিংবা অনিবার্য বিপৎপাতের সম্ভাবনা দেখে সে যদি সদ্‌গুরুরূপে অনুমিত ব্যক্তিটির দোহাই দেয় তা হলে সে বিপদ নিশ্চয়ই প্রতিহত হবে। কেননা — ভক্তবাৎসল্য এবং রক্ষাকর্তৃত্ব সদ্‌গুরু সত্তার পরিচায়ক।

যোগীসমাজে উপরোক্ত দশটি সূত্র 'মরমীয়া কো দশমীয়াঁ', সংক্ষেপে 'দশমীয়াঁ' নামে প্রসিদ্ধ। এটি জানলে লোকের কল্যাণ হবে। উক্ত লক্ষণগুলির একটি বা দুইটি মিললে চলবে না। সদ্‌গুরুর মধ্যে দশমীয়াঁর সমুদয় লক্ষণগুলিই বর্তমান থাকবে।

সদ্‌গুরু শব্দের প্রয়োগেই চরম তত্ত্ব সূচিত হয়, ইহা অনাদিকালের সত্য। বৈদিক সত্য। বেদে এর নাম — 'নিষ্পন্দ সূক্ষ্ম পরাবাক্‌।' উচ্চকোটীর মাহাত্মা মাত্রেই শব্দরহস্য অবগত আছেন। বৈদিক ঋষিরা এর গোপনতম এবং বিস্তৃততম রহস্য জানতেন। বেদ স্বাধ্যায় করলে আরও কত নিগূঢ় তত্ত্ব জানতে পারবে। মোটকথা যে কোন সিদ্ধান্ত বেদমূলক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

রঞ্জন — আচ্ছা যদি কোন গুরু বরণ করার পর দেখা যায় বহুদিনেও কিছু হল না, তখন সে গুরু ত্যাগ করা যায় কি? অনেকে তো বলেন গুরু ত্যাগ মহাপাতক — এতে নরকস্থ হতে হয়। 'শিবে রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌরুষ্টে ন কশ্চন'। বৈষ্ণবশাস্ত্র আছে — 'গুরু ত্যজি গোবিন্দ ভজে, সে পাপী নরকে মজে।' 'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ী যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'' কারও ধারণা 'অবিচার্যং গুরুকুলং।' এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিমত কি?

সাধুজী — ঈশ্বরলাভের জন্য, শাশ্বত আনন্দ লাভের জন্য গুরুর প্রয়োজন, যদি কোন গুরু সে অমৃতের সন্ধান না দিতে পারেন তাহলে তাঁকে ত্যাগ করায় কোন দোষ নেই; বরং সে হেন অক্ষম গুরুকে ত্যাগ না করে তাঁর অধীনস্থ গোলাম হয়ে পড়ে থাকাটাই অপরাধ। মহাপুরুষের মধ্যে ক্রোধ থাকে না। সাচ্চাগুরু যিনি — তিনি দয়াল। মিছরির ভিতর-বাহির যেমন মধু মিষ্টিময়, তেমনি সাচ্চাগুরুও দয়াময় — শিষ্য তাঁর প্রাণবস্তু, শিষ্যের কোন ক্ষতি করতে অক্ষম। আচার্য শঙ্কর বলছেন — 'শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ' (বিবেকচূড়ামণি) — যিনি বেদবিৎ শুদ্ধচেতা কামজয়ী ব্রহ্মবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তিনিই গুরুপদবাচ্য, অনভিজ্ঞ গুরুর দ্বারা উপদিষ্ট হলে আত্মাকে সম্যকরূপে জানা যায় না — এই হল শ্রুতির উপদেশ —

'ন নরেণাবরেণ প্রোক্ত এষ সুবিজ্ঞেয়ো বহুদা চিন্ত্যমানঃ।' (কঠ ১।২।৮)

জ্ঞানের দ্বারাই জীবের হয় মোক্ষলাভ, জ্ঞানই পরাৎপর। অতএব যিনি এই পরম জ্ঞান দানে অসমর্থ সেই গুরুকে ত্যাগ করায় কোনও দোষ নেই। ক্ষুৎপিপাসায় কাতর কেউ যেমন নিরন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে খাদ্য না পেলে, যার কাছে পাওয়া যায় তার কাছে immediate গিয়ে ক্ষুধার শান্তি করে, তেমনি মুমুক্ষুর উচিত সত্যসন্ধানীর উচিত—যার কাছে সত্য ও অমৃতের সন্ধান পাওয়া যাবে না তাকে অবিলম্বে ত্যাগ করা।

সংশয় আর হতাশার আবর্তে পড়ে, ভণ্ড সাধুর মায়াজালে আচ্ছন্ন হয়ে যাতে কোনো সত্যসন্ধানীর জীবন ব্যর্থ না হয়, সাচ্চা মহাত্মার আশ্রয়লাভ করে যাতে এই জীবনেই কৃত্যকৃত্য হতে পারে, এ জন্য শাস্ত্র বজ্রনির্ঘোষে জানিয়েছে — সাচ্চা মহাত্মার দর্শন লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে, অক্ষম গুরুকে ত্যাগ করে, তৎক্ষণাৎ তাঁর শরণাগত হবে। মনুভাষ্যে মেধাতিথি বলেছেন—

'মধুলব্ধো যথা ভৃঙ্গঃ পুষ্পাৎ পুষ্পান্তরং ব্রজেৎ
জ্ঞানলুব্ধোস্তথা শিষ্যঃ গুরৌগুর্বন্তরং ব্রজেৎ।'

বিশ্ববরেণ্য পরমসন্ত কবীর দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন —

'যব তক্ না দেখো নিজ নয়নি, তব্ তক না মানো গুরুকা বাণী।''

সাচ্চাগুরু কি — তা দীক্ষা লাভের সময়েই বোঝা যায়। ঐ সময় তিনি 'ঘরমেঁ ঘর দেখিয়ে দেবেন, বস্তু উপলব্ধি করিয়ে দেবেন। যদি না হয় — তাহলে সে গুরুর বাণী মানবার প্রয়োজন নেই। 'প্রত্যক্ষদর্শন' হল না বলে সেই গুরু ত্যাগ করতে হবে এবং খুঁজতে হবে সাচ্চা গুরুকে।

'গুরু করো দশ পাঁচা, যব তক্ ন মিলে গুরু সাচা,
কবীর কহে শোন লৌঈ, সংশয় মিটে সদ্‌গুরুসৌঈ।।'

'অক্ষম গুরু ত্যাগ করলে মহাপাতক হয়' — এ সমস্ত ধর্ম ব্যবসায়ীদের অপপ্রচার মাত্র। 'দিব্যদর্শন' করাতে অক্ষম-গুরু ত্যাগে কোন দোষ স্পর্শ করবে না। এই বরং শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। মহাপুরুষের অভিমত—

'অনভিজ্ঞং গুরুং প্রাপ্য সংশয়চ্ছেদকারকম্
গুরুন্তরন্ত দত্বা স নৈতদ্দোষেণ লিপ্যতে।'

সাধুজীর আলোচনা যখন শেষ হল তখন অনেক রাত হয়ে গেছে। আমরা শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করছি। সাধুজী বললেন — কাল সকালে উঠে আপনারা ওঁকারেশ্বরের পথে এগিয়ে যান। পথ আপনাদের মঙ্গলময় হোক। আমার সঙ্গে আপনাদের আর দেখা হবে না। রঞ্জনকে জড়িয়ে ধরে বললেন — When chala is ready Guru appears. তোমার সদ্‌গুরু প্রাপ্তি আসন্ন। সাচ্চাগুরু জানেন প্রিয় মিলনের আকুলতায় কে অধীর হচ্ছে। He will come to you. কারণ সদ্‌গুরুর advent এই জন্যেই হয়েছে, আনন্দলোকের — আনন্দময় পুরুষের সন্ধান দেওয়ার জন্যই। আর শৈলেন্দ্রনারায়ণ! তুমি তোমার পুস্তকে সদ্‌গুরু চিনবার এই গুপ্ত সংকেতগুলি প্রকাশ করবে। এতে লোকের কল্যাণ হবে। মনে রেখ এই লক্ষণগুলির একটা বা দুইটি মিললে চলবে না সদ্‌গুরুর মধ্যে দশমীয়াঁর সমুদয় লক্ষণগুলিই বর্তমান থাকবে।

পরিক্রমান্তে দেশে ফিরে কোন জ্ঞাতব্য বা সমস্যা দেখা দিলে একটি কাগজে লিখে ফেললে উত্তর মিলবে।*

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন কানে ভেসে এল একতারার মৃদু টুং টাং ধ্বনি এবং গুণ্‌গুণ্ শব্দে গাওয়া গানের কলি —

আমি কোথায় পাবো তারে
আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশ্যে দেশ-বিদেশে
বেড়াই ঘুরে।

* বাবার জীবৎদশায় দেখেছি তাঁর কাছে যারা প্রায়ই আসতেন বা বাবার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন বাবা তাদেরকে বলতেন তোমাদের সমস্যা এতলোকের কাছে বলার দরকার নেই। শুধু সমস্যাটুকু লিখে নিজ হাতে আমার letter box-এ ফেলে দিয়ে যাবে। তাঁরা তাদের সমস্যাগুলি চিঠি লিখে কলকাতার বাসায় letter box-এ ফেলে দিয়ে যেতেন। বাবা চিঠিগুলি খুলেও দেখতেন না। letter box ভর্তি হয়ে গেলে চিঠিগুলি বের করে আমাকে বলতেন গঙ্গায় ফেলে আসতে। সমস্যাদীর্ণ মানুষদের মুখে হাসি ফুটত এবং তাদের কাছে শুনতাম — তাদের সমস্যা মিটে গেছে। — প্রকাশক

আকাশে সূর্যোদয়ের আভায় জেগেছে। মন্দিরের দরজা খুলে দিতেই ঘরের জমাট অন্ধকার দূর হয়ে গেল। দেখি যথারীতি মৌনী সাধু ও তাঁর চেলা আমাদের উঠবার আগেই বেরিয়ে গেছেন। আমরা প্রাতঃকৃত্য সেরে নর্মদায় স্নান করে ফিরে এলাম। প্রত্যেকে যে যার গাঁঠরী বেঁধে তৈরী। পুনরায় মন্দিরের শিবজী, সহস্রধারা, নর্মদা মাতা ও মৌনী সাধুর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে আমরা পূর্বমুখী রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম খোওয়া ও পাথর ফেলা একটা রাস্তা ধরে। এখন আমাদের লক্ষ — স্বর্ণদ্বীপ তীর্থ। এটি উত্তরতটের মহেশ্বর ঘাটের বিপরীতে অবস্থিত। যেন সমতল অঞ্চল দিয়ে হাঁটছি। ডানদিকে নর্মদা বয়ে চলেছেন। বামদিকে সুউচ্চ সাতপুরা পর্বত। সাতপুরার দিকে ঘন অরণ্য চোখে পড়ছে। কিন্তু আমাদের চলার পথে তেমন কোন জঙ্গল নেই। নাম জানা ও নাম-না জানা কিছু কিছু বন্য বৃক্ষ যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে। রাস্তার কাছে ও রাস্তা হতে দূরে অনেক ঘরবাড়ীও চোখে পড়ছে।

যতদূর এগিয়ে যাচ্ছি, সমতলের শোভা একই রকম। কোথাও দু'এক ঝাড় পাহাড়ী বাঁশ, কোথাও অদূরের শৈলশ্রেণী থেকে ছোট ছোট ঝরণা বয়ে চলেছে বন্ধুর উপলাস্তৃত পথে, কোথাও বা দেখা যাচ্ছে দূরে দু'একটা বন্যগ্রাম।

হঠাৎ একটা গাছের শিকড়ে ঠোক্কর খেয়ে সতর্ক হলাম। সতর্ক হলাম মনেও। বেলা বোধহয় দশটা বাজতে যায়। কতটা যে পথ হাঁটা হয়ে গেল বুঝতে পারছি না। মিনিট দশেক হাঁটার পরই দেখি রাস্তার কিছু দূরেই ধাওয়া এবং ধূসর বর্ণের মেহরীণ্ গাছের তলায় একটি বিশাল শিবমন্দির। চারদিকে মেয়ে পুরুষের জটলা। পুরুষদের প্রায় সকলের হাতে তীর-ধনুক, লাঠি বা টাঙ্গি। তীর-ধনুক, লাঠি বা টাঙ্গি হাতে না নিয়ে এদেশের মেয়ে পুরুষ কেউ পথ চলে না। আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। নর্মদার জল ঢেলে প্রণাম করলাম। আমি বললাম — ইনি মহাকাল।

ইষৎ রক্তময়, কান্তং স্থূলং দীর্ঘং সমুজ্জ্বলম।
মহাকালং সমাখ্যাতং ধর্মকামার্থ মোক্ষদম॥

যে শিবলিঙ্গ ইষৎ রক্তাভ, স্থূল, দীর্ঘাকার এবং অত্যন্ত দীপ্তিমন্ত, তিনিই হলেন মহাকাল। মহাকালের অর্চনা ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ — এই চতুর্বর্গের প্রাপ্তি ঘটে।

পথের ধারে যত্রতত্র ঘরবাড়ী রয়েছে। পথচারী ও সাইকেল আরোহীরও অভাব নেই। কমণ্ডলুতে জল ভরার জন্য নর্মদার ঘাটে যেতেই দেখতে পেলাম নর্মদার বিপরীত দিকের ঘাট বিশাল ও বিস্তৃত। পুরো ঘাটটাই লাল পাথরে বাঁধানো। যতদূর চোখে পড়ছে, নর্মদাতট বড় বড় লাল পাথরে যেন মুড়ে দেওয়া হয়েছে। ঘাটের উপরেই মন্দির। আমি মন্দিরটি চিনতে পারলাম। সঙ্গীদের বললাম — ঐটি নর্মদার উত্তরতটের মহেশ্বর মন্দির। এখানে যেমন দেখছেন স্ত্রী-পুরুষ সবাই যে যার মত শিবের পূজা করছেন, কিন্তু ঐ মন্দিরে দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের দাপট বেশী। তাঁরা কোন ভক্তকেই দু মিনিটের বেশী মহেশ্বরের অর্চনার জন্য সময় দেন না। মর্ত্যের শিব-কন্যা অহল্যাবাঈ ছিলেন মহেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি নর্মদার এই ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর দেহান্তও হয়েছিল এই মহেশ্বরে। ঐখানে অহল্যাবাঈ-এর সুন্দর সমাধি মন্দির আছে। একে একে মনে পড়ল ডাঃ বংশীলালের কথা, নর্মদাতটের প্রসিদ্ধ হঠযোগী মার্কণ্ডেয় ব্রহ্মচারীর শিষ্য তুরীয় ব্রহ্মচারীর যোগাশ্রম ও তাঁর আতিথেয়তার কথা। আমি তাঁদের উদ্দেশ্যে দক্ষিণতটে দাঁড়িয়ে প্রণাম জানালাম।

কিছুদূরে ঘাটের ধারে ত্রিপুণ্ড্র আঁকা শিখা উপবীতধারী এক ব্রাহ্মণ নর্মদার জলে দাঁড়িয়ে একটি পঞ্চপ্রদীপ বের করে তাতে ঘৃতসিক্ত তুলার বাতি সাজিয়ে নর্মদা মায়ীর আরতি আরম্ভ করলেন —

ওঁ নমোহস্ততে দেবি সমুদ্রগামিনী, নমোহস্ততে দেবি বরপ্রদে শিবে।
নমোহস্ততে লোকদ্বয় সৌখ্যদায়িনি — হ্যনেক ভূতৌয সমাশ্রিতেস্থহখে॥

ওহ সমুদ্রকো জানেবালী দেবি! তুম্ হে নমস্কার হৈ। হে বরদান দেনেবালী দেবি! হে কল্যাণ করণেবালী দেবি! তুম্ হে নমস্কার হৈ। হে ইস্‌লোক তথা পরলোক দোনোঁ লোকমেঁ সুখ দেনেবালী দেবি! হে অনেক প্রকারকে প্রাণীয়োঁ সে প্রশংসিত পাপরহিত দেবি! তুমহেঁ বারবার প্রণাম হৈ।

তাঁর আরতি শেষ হতেই আমরা নর্মদার তট ধরে হাঁটতে লাগলাম। দেখি নর্মদা গর্ভে একটি জীর্ণ পুরাতন মন্দিরে বহু লোকের ভীড়। একজন দর্শনার্থীকে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম এক নাঙ্গা সাধু এই মন্দিরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। চার পাঁচটা ভাষা জানেন। যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। লোকটির কথায় আমরা সাতজনে সাধুদর্শনে গেলাম।

গিয়ে দেখি, বাপরে বাপ! সাধুর যেমনি ভীমাকৃতি দেহ, তেমনি কদাকার রূপ, চোখ দুটো জবা ফুলের মত লাল! দু'তিনজন ভক্ত তাঁর কাছে দীক্ষালাভের জন্য খুব কাঁদাকাটা করছেন। এই রকম একজন কদাকার লোককে সাধক বা ঈশ্বর প্রেমী ভাবতেই আমার কষ্ট হচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিলাম, পৃথিবীতে কত বিচিত্র মানুষই না আছে। এঁকেও আবার লোকে গুরুরূপে বরণ করার জন্য অস্থির হয়। ভক্তদের মহিমাই অপার।

সহসা সাধু আমার দিকে চেয়ে বলে উঠলেন — 'সাধুর বিদ্যার বহর বা দেহের রূপ বিচার করতে নাই।

নৈবাত্র কাব্যগুণ এব তু চিন্তনীয়, গ্রাহ্যং পরং গুণবতা খলু সার এব।

সিন্দুর-চিত্র-রহিতা ভুবি রূপ-শূণ্যা পারং কিং নয়তি নৌরিহ গন্তুকামান্?

একটি নৌকা যদি সিঁদুরের দ্বারা চিত্রিত বা লতাপাতার ছবিযুক্ত দেখতে সুন্দর নাও হয়, তাহলে তা কি তোমাকে পারে নিয়ে যেতে পারে না? দেখতে হয় নৌকাটা মজবুত কি না, মজবুত কাঠের তৈরী কিনা। সাধুকা দেহ কী রূপ বিচার করোগে তো দেহকা প্রতিযোগিতা মেঁ যো আদমী Mr. Universe বা Mr. Asia হোতা হৈ, উসকো গুরু বনাও, মহাত্মা সমঝো।'

চমকে গেলাম সাধুর কথা শুনে। বুঝলাম সাধুর occult power আছে। আমি চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু আমি চুপ থাকলেও আমার সঙ্গীরা সাধুকে নানা প্রশ্ন করতে শুরু করলেন। তাদের প্রশ্নোত্তর বেশ মজার।

মহানন্দস্বামী — 'শাস্ত্রে পুনর্জন্মের অনেক কথা শুনি। মানুষ নকি কর্মানুযায়ী বিভিন্ন যোনি পরিগ্রহ করে, যেমন গতজন্মের ধনাঢ্য যদুবাবু এ জন্মে মধুবাবু হয়ে জন্মাতে পারেন আবার পরজন্মে ঐ মধুবাবুই হয়ত মাধবানন্দ রূপে জন্ম নিবেন। এ সব কথা কি সত্য?'

সাধুজী — অবিশ্বাস করার কোন হেতু নাই। হিন্দু ধর্মের বিশেষত্ব — বেদে বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং জন্মান্তরবাদের বিশ্বাস। হিন্দুরা সত্যসন্ধ ঋষিদের উপলব্ধ সত্যকে নাম দিয়েছেন শাস্ত্র। সেই শাস্ত্রে আছে, কর্মানুযায়ী মানুষের 'জাত্যায়ুর্ভোগ' ঘটে — শস্যমিব মর্ত্ত্যঃ পচ্যতে শস্যমিব জায়তে পুনঃ ॥ কঠ ১/৬॥ অর্থাৎ ব্রীহি আদি শস্য যেমন পাকার পরে পচে যায় এবং পুনরায় তা হতে যেমন নূতন শস্য উৎপন্ন হয়, সেই রকম মানুষও জরাজীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হলে এ দেহ ত্যাগ করে পুনর্দেহ প্রাপ্ত হয়। বৃহদারণ্যক শ্রুতির চতুর্থ অধ্যায়েও এ কথার সমর্থন পাই — অন্যমাক্রম্য আক্রম্য আত্মানমুপসংহরতি॥ মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন, ধ্যাননিষ্ঠার দ্বারা কেউ যদি চিদাকাশে উঠতে পারে, তাহলে সেখানে তার সংস্কারের সাক্ষাৎকার হয় এবং সংস্কার-সাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্। এটি প্রত্যক্ষ তত্ত্ব।

মনে কর তোমাদের চোখের সামনে দিয়ে 'নর্মদা' নদী বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। উৎপত্তিস্থলে নিশ্চয়ই সেটি অগভীর ছিল। এই নদী একশ মাইল প্রবাহিত হবার পর, ধর এমন এক স্থানে পৌঁছে গেল যেখানে তার পরিসর এক মাইল এবং গভীরতা পঞ্চাশ হাত মাত্র। এখন প্রাকৃতিক কারণে হঠাৎ যদি তার সমস্ত জল জমে বরফ হয়ে যায়। তাহলে তার গতি নিরুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন তার স্রোতস্বিনী রূপ দেখবে না, দেখবে 'নর্মদা'র তুহিন রূপ। যদি কিছুদিন পরে হঠাৎ সমুদয় বরফ এক নিমেষে গলে যায় তাহলে আমরা কি দেখব? দেখবো — নদীর বেগ যেখানে নিরুদ্ধ হয়ে গেছল, সেখানে হতেই সেটি আবার পূর্বের ন্যায় বেগে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। ঐ সময় নদীটিকে দেখলে মনে হবে যেন নদীটি কখনও বরফে পরিণত হয় নি এবং তার বেগও নিরুদ্ধ হয় নি। এই যে কয়েকদিন নদী বরফ হয়ে অচল ছিল, এ যেন নদীর বিশ্রাম বা নিদ্রা। বিশ্রামের পূর্বের নদী এবং বিশ্রামের পরের নদী একই নদী — এতে সন্দেহ করার কিছুই নাই এবং আশা করি কেউ সন্দেহও করবে না; আর নদীর আত্মজ্ঞান থাকলে নদী নিজেও তা বুঝতে পারত।

এই উদাহরণ থেকে এই কথাটি বিশেষভাব বুঝবার চেষ্টা কর যে, বরফ হওয়ার পূর্বের নদী এবং বরফ হওয়ার পরের নদী যেমন একই নদী, তেমনি বিভিন্ন নাম, রূপ, উপাধির অন্তরালে স্বরূপতঃ একই আত্মা বিরাজমান। যদু, মধু, রাম, রামানন্দ জীবের এক একটা অবস্থান্তর মাত্র। নদীর যে তুহিন রূপকে আমি নদীর বিশ্রাম বা নিদ্রা বলেছি, সেই সাময়িক নিরুদ্ধ অবস্থাটা যেন মৃত্যু। অর্থাৎ মৃত্যু হল এক একটা অবস্থার সাময়িক ছেদ বা বিরাম মাত্র। আত্মজ্ঞ মহাপুরুষরা এই তত্ত্বটি উপলব্ধি করে এরই নাম দিয়েছেন জন্মান্তর।

হরানন্দজী — সাধুজী, আপনার এই যুক্তির মধ্যে কিছু ত্রুটি রয়েছে বলে আমি মনে করি। আপনি বলছেন, কর্মবশে যদুবাবু মধুবাবু হয়ে জন্মাতে পারেন আবার মধুবাবুই জন্মান্তরে হতে পারেন মাধবানন্দ। কিন্তু বরফ

গলে যাওয়ার পর নদী যখন আবার প্রবাহরূপে বইতে লাগল, তখন তার আকার, গুণ ও গতিপথের সমতা ও সাদৃশ্য দেখেই আমরা যেমন বলতে পারি যে এই নদীই সেই 'নর্মদা' সেই রকম জগতে কি এমন একজন লোকও দেখা যায় যাকে দেখা মাত্রই বলতে পারি যে, এই মধুবাবুই পূর্বজন্মের যদুবাবু? যদুবাবু যে রকম অবস্থা লাভ করে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়েছিলেন, কোন নবপ্রসূত সন্তানের মধ্যে কি সে রকম অবস্থা দেখা যায়? যেখানে সর্বতোভাবে সাদৃশ্য থাকে সেখানেই দুটি বস্তুর একত্ব নিরূপণ করা যায় না, আর যেখানে সাদৃশ্য স্পষ্ট নয়, সেখানে ত একত্বের প্রশ্নই উঠতে পারে না।

যতীশ্বরানন্দ — তা ছাড়াও আর একটা কথা। আত্মার সঙ্গে আত্মার গুণের সম্বন্ধ সাধারণতঃ অত্যন্ত ঘনিষ্ট হয়। জ্ঞানী হতে তার জ্ঞানকে, প্রেমিক হতে প্রেমকে যেমন পৃথক করা যায় না, তেমনি আত্মা হতেও তার গুণের পৃথক অবস্থিতি অর্থাৎ অন্যত্র গমন এবং স্থিতি কল্পনাও করা যায় না। দেহ হতে স্বাস্থ্য বেরিয়ে এসে যেমন অপর দেহে প্রবেশ করতে পারে না, তেমনি একজনের জ্ঞান প্রেমাদি গুণ ও স্বভাবও অপর আত্মায় প্রবেশ করতে পারে না। পোষাক বদল করা যায়, জ্ঞান প্রেমাদি গুণ ও স্বভাব প্রভৃতিকে কি পোষাকের মত বদল করা সম্ভব? গুণের সঙ্গে আত্মার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক নিত্য বর্তমান। কাজেই চৈতন্য একস্থানে আর তার গুণ অন্য স্থানে রইল এ রকম কি করে কল্পনা করা যায়? একজনের মৃত্যু হবার পর সে যখন অন্য দেহ গ্রহণ করছে তখন তার পূর্বার্জিত গুণ কর্মেরই যে পুনর্জন্ম হচ্ছে তা প্রমাণ করা যায় কি? যেমন যদুবাবুর জীবিতাবস্থায় তাঁর কতকগুলি গুণ দেখা গেছল। যদি দেখা যায় মধুবাবু রূপে তিনি যখন জন্মালেন, তখন তাঁর মধ্যে সেই সব গুণ কর্ম প্রকাশিত হচ্ছে তবেই বলা যায় যে যদুবাবুর গুণ মধুবাবুতে পুনর্জন্ম পাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে কি এরকম ঘটে? বাস্তব জগতে যখন তা দেখা যায় না, তখন কি ভাবে বলি যে, যদুবাবুর গুণ ও কর্ম মধুবাবুতে জন্মান্তর লাভ করছে?

সাধুজী — তোমাদের কথায় আপাতদৃষ্টিতে যুক্তি আছে বলে মনে হলেও এই যুক্তির মূলে বিশেষ কোন মূল্য নেই। কারণ তোমরা যা বলছ তা বুদ্ধির ঘাট থেকে। তোমরা যদি অনুভবী হতে অর্থাৎ আত্মচৈতন্যে প্রতিষ্ঠিত হতে তাহলে আমার বক্তব্যের সারমর্ম বুঝতে পারতে। আত্মা স্বরূপতঃ অবিভাজ্য এবং সদৈব এক হলেও অতীত জীবনকে আহরণ করে বর্তমানে তা সঞ্চয় করা চৈতন্যের ধর্ম। এটি তার একটি বিশেষ কাজ। এই অবস্থায় চৈতন্য স্মৃতিরই নামান্তর। মানুষ স্মৃতির দ্বারা পূর্ব মুহূর্তের ঘটনা এবং বর্তমান মুহূর্তের ঘটনার সংযোগ করে থাকে এবং সেই সঙ্গে আত্মার একত্বও অনুভব করে। তোমরা নিশ্চয়ই পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক ক্যান্টের নাম শুনেছ। তাঁর বই পড়লে দেখবে তিনি এইজন্য চৈতন্যকে বলেছেন — 'Synthetic Unity of Appreception'.

মহানন্দস্বামী — সাধুজী, আপনার বক্তব্য ঠিকভাবে বোধগম্য হচ্ছে না। কারণ আপনিই স্বীকার করছেন মানুষ স্মৃতির দ্বারা পূর্ব মুহূর্তের ঘটনা এবং বর্তমান মুহূর্তের সংযোগ করে থাকে। আমরা এ তত্ত্বটি অহরহ উপলব্ধি করে থাকি। এতে দ্বিমত করবার কোন কারণ নাই। কিন্তু ঐ যুক্তি অনুসারেই তবুও মনে সংশয় জাগে, আমার যদি পূর্বজন্ম থাকত, স্মৃতিই ত তাহলে তা আমাকে বলে দিত এবং স্মৃতিই তখন সেতুস্বরূপ হয়ে 'পূর্বজন্মের আমি'র সঙ্গে 'বর্তমান জন্মের আমির' সংযোগ বিধান করত। আমাদের জীবনে তা ঘটে কি? প্রাত্যহিক জীবনে স্মৃতির পরিবর্তে বিস্মৃতির প্রভাবই ত বেশী প্রকট দেখি। এর কারণ কি?

সাধুজী — বিস্মৃতির কারণ সম্মোহ। 'আমি' — 'আমার'-বোধ, লোভ ও কামনার আস্তরণ আমাদের মন ও চিত্তের উপর যে ছাপ ফেলে তার ফলেই মানুষের স্মৃতিভ্রংশ ঘটে। সত্ত্বশুদ্ধি ও চিত্তশুদ্ধি ঘটলে তবেই ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হয়।

প্রেমানন্দ — আচ্ছা সাধুবাবা, আমাদের সুখ দুঃখ যদি পূর্বজন্মের কর্মফল হয়, তাহলে অনেক সাধু মহাত্মাদেরকে যে দুঃসহ কষ্টভোগ করতে দেখি সে কি তাঁদের পূর্বজন্মের দুষ্কৃতির ফল? শোনা যায়, তাঁরা নাকি অপরের জন্য কষ্ট ভোগ করে থাকেন। এই যে অপরের জন্য একজনকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। এটাও কি তাঁর পূর্বজন্মের অর্জিত কর্মে নির্দিষ্ট ছিল? আর এইভাবে যদি একের অপরাধে অন্যাকে কষ্ট ভোগ করতে হয় তাহলে সেটা জগদীশ্বরের কি রকম সুবিচার?

সাধুজী — সাধু মহাপুরুষদের কথা বাদ দাও বাবা। তাঁদের রহস্যময় আচরণকে তর্কের মধ্যে টেনে এনো না।

মহাপুরুষদের দৃষ্টিতে জগৎ এক অখণ্ড আত্মার প্রকাশ। তাঁরা সর্বত্র নিজেকেই দেখেন। 'অপরের জন্য দুঃখ ভোগ' — এ ভাষা আমাদের, ধর্মনিষ্ঠ সাধু মহাত্মাদের ভাষা স্বতন্ত্র — তাঁরা জগতে 'অপর' খুঁজে পান না!

রঞ্জন — সাধুজী, আপনি যদি অভয় দেন তাহলে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হয়, জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে আপনার নিজস্ব উপলব্ধি কি? আপনি কি নিজের পূর্বজন্ম ও পরজন্ম প্রত্যক্ষ করেছেন?

সাধুজী — নিজে উপলব্ধি করেই বলছি বাবা। ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং আপ্তবাক্য ছাড়াও জগতে এমন কতকগুলি ঘটনা আছে যা একটু ধীরভাবে বিচার করলে জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতে আমরা বাধ্য হই। যেমন ধর, মৃত্যুর ভয়। সামান্য কৃমিকীট হতে মানুষ পর্যন্ত সকল জীবই মরণকে ভয় করে — কেউ মরতে চায় না। এর কারণ কি? কেউ তো একই জীবনে দু'বার করে মৃত্যুমুখে পতিত হয় না। তাহলে মৃত্যু সম্বন্ধে তার ভয়ের অভিজ্ঞতা কোথা থেকে হল? তাহলে নিশ্চয়ই পূর্বজন্মে মৃত্যু সম্বন্ধে সে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে — এই ধারণাই করতে হয়।

জগতে এমন এমন লোক আছে যাকে দেখা মাত্রই আপনজন বলে মনে হয়। দেখার পর থেকেই তার সঙ্গে ক্রমে ক্রমে অন্তরঙ্গতা এবং ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপিত হল, চিরদিন সে আপন হয়েই থেকে গেল। এদিকে বিপরীত চিত্রও আছে। জন্মসূত্রে যারা আপন হয়ে থাকার কথা, যার সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক এমন কি নাড়ীর বন্ধন — সেই একান্ত আপনজনই হয়ত চিরকাল ধরে বিনা কারণেই শত্রুতা করতে থাকে। এ সবের হেতু কি? আমার মতে এ সবের একমাত্র হেতু — জন্মান্তরের সম্বন্ধ।

তোমরা কি কখনও লক্ষ্য করেছ যে, বানর শিশু জন্মগ্রহণ করার পরেই গাছের ডাল ধরে ফেলে, নাহলে সে পড়ে যাবে! গোবৎস ভূমিষ্ঠ হবার কিছু পরেই লাফাতে থাকে, ঘোটকী প্রসবের পরেই চর্মকোষের মুখ কেটে দেয়, নাহলে তার শাবক বাঁচবে না। ভালুক, নেউল প্রভৃতি জীবজন্তুকে দেখা গেছে, কোনও রোগ হলে তারা নিজেরাই বন থেকে ঔষধ খুঁজে এনে খায়। এ সব তারা কি ভাবে শিখল? কুতার্কিকরা হয়ত বলবেন, এ সব প্রকৃতির প্রেরণা — সহজাত Instinct — কিন্তু ঐ প্রেরণা, Instinct বা Impulse আসে কোথা হতে? আমার উত্তর — স্মৃতি। পূর্বজন্মের স্মৃতি থেকেই ঐ সব প্রেরণা জন্ম নেয়।

অষ্টাবক্র, শুকদেব এবং শঙ্করাচার্য অত্যন্ত বালক বয়সেই গভীর শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন। তোমরা নিশ্চয়ই পরিক্রমা পথে এমন সব মহাত্মার দর্শন পেয়েছ যাঁরা সর্বশাস্ত্রে পারঙ্গম, মহাজ্ঞানী, তত্ত্বদর্শী পুরুষ তেমন আর কাউকে দেখা যায় না কেন? একি কেবল এই জন্মের অর্জিত পুঁথিগত বিদ্যায় সম্ভব? কাশীতেই পূর্বে মৈজুদ্দিন নামে এক আশ্চর্য লোক ছিলেন, যিনি সা-রে-গা-মা না সেধেও যে কোন সূক্ষ্ম রাগ রাগিনী ও গান একবার মাত্র শুনেই তৎক্ষণাৎ তা শুদ্ধভাবে গেয়ে শোনাতে পারতেন।

তোমরা ভারত বিখ্যাত দার্শনিক, সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কলিকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের* নাম নিশ্চয়ই শুনে থাকবে। তাঁর যখন বয়স মাত্র তিন বৎসর, অক্ষর পরিচয়ও হয় নি, তখনই তিনি সেই শিশুকালেই রামায়ণ পাঠ করতে পারতেন। দুই বৎসর বয়সে 'কাঞ্চন' শব্দটির অর্থ বলে তিনি সকলকে অবাক করেছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই শিশু সুরেন্দ্রনাথকে দেখে মন্তব্য করেছিলেন, এ বালক জাতিস্মর।

আমি বললাম — স্কটিশ চার্চ কলেজে বাংলা ভাষার আমার একজন অধ্যাপক ছিলেন, নাম বিপিন কৃষ্ণ

---

* ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এম. এ., ডি. লিট্ (১৮৮৫ - ১৯৫২) — সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, কলিকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। এই ভারত-প্রসিদ্ধ দার্শনিকের প্রণীত গ্রন্থগুলি হল – A History of Indian Philosophy (5 Vols), Yoga as Philosophy & Religion Hindu Mysticism, Indian Idealism, রবি-দীপক, সাহিত্য পরিচয়, কাব্য-বিচার। তবে সাধুজী তাঁর জাতিস্মরতা সম্বন্ধে যে কথা উল্লেখ করেছেন, তৎকালীন সংবাদপত্রগুলিতেও তার সমর্থন মিলে। 'সুলভ-দৈনিক' পত্রিকায় (১৯/৪/১৮৯৪) 'অদ্ভুত বালক' শিরোনামায় ঐ সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল এবং ইংরাজী সংবাদপত্র 'Hope' ও লেখেন — 'সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত নামক নবম বর্ষীয় এক বৈদ্য বালকের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়। বালক বিদ্যালয়ে আখ্যান-মঞ্জরী এবং ইংরাজী বর্ণমালা পাঠ করে, সংস্কৃত এখনও পড়িতে শিখে নাই। কিন্তু তাহাকে ধর্ম ও দর্শনের সম্বন্ধে যে কোন প্রশ্ন করা যাউক না কেন, তৎক্ষণাৎ তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া বড় বড় দার্শনিককেও বিস্মিত করিয়া দেয়। সম্প্রতি বালককে বেঙ্গল থিয়সফি সোসাইটির গৃহে নানা লোকে নানা প্রকার কূট প্রশ্ন করে, সেই সকল প্রশ্নের উত্তর বালক দিয়াছে,' ইত্যাদি।

ঘোষ*, অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাঁর বয়স যখন সাত বৎসর, তখন সেন্ট পলস্ স্কুলে ভর্তি হতে এলে তদানীন্তন প্রিন্সিপাল তাঁকে Macbeth এর দু'চার লাইন পড়তে বলেন। বালক বিপিন কৃষ্ণ সমগ্র সেক্সপীয়র থেকে অনর্গল আবৃত্তি করতে থাকেন।

সাধুজী বললেন — তাহলে তোমরাই বল এই সব অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা কি পূর্বজন্মের সুকৃতি ছাড়া সম্ভব! শাস্ত্রেও দেখা যায়, বামদেব, জৈগীষব্য, বুদ্ধদেব প্রভৃতি জাতিস্মর ছিলেন। এ যুগেও কোথাও কোথাও জাতিস্মর বালকদের সন্ধান পাওয়া গেছে। সংবাদপত্রে তাদের যথাযথ বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে। তারা বাল্যকালেই পূর্বজন্মের মা-বাবার নাম এবং জন্মস্থানের নিখুঁত বিবরণ দিয়েছে — মিলিয়ে দেখা গেছে — তাদের কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এই সব রহস্যের তোমরা কী ব্যাখ্যা দিবে? সুশ্রুত বলেছেন —

ভাবিতাঃ পূর্বদেহেষু সততং শাস্ত্রবুদ্ধয়ং। ভবন্তি সত্ত্বভূয়িষ্ঠাঃ পূর্বজাতিস্মরা নরাঃ॥

অর্থাৎ যারা সত্ত্বপ্রধান, শাস্ত্রবুদ্ধিসম্পন্ন, পূর্বজন্মে সৎভাবে জীবনযাপন করেছে, তারাই জাতিস্মর হয়। এই জাতিস্মরতাই জন্মান্তরবাদের একটা অকাট্য প্রমাণ।

যতীশ্বরানন্দ — তর্কের সূত্র ধরে আপনাকে জন্মান্তরবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে না। কারণ, আপনি যে সব যুক্তি দেখাবেন, অপরে হয়ত তার বিপরীত যুক্তি বিস্তার করে আপনার বক্তব্যকে খণ্ডন করতে পারবেন। এ ছাড়া এর মধ্যে বিশ্বাস অবিশ্বাসেরও প্রশ্ন উঠতে পারে। আমরা হিন্দুরা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করি, বিশ্বাস করি আপ্তবাক্যে। আমরা আপনার কাছে বৈদিক সিদ্ধান্ত জানতে আগ্রহী। আপনি দয়া করে সেই কথা বলুন।

সাধুজী — 'বাবা, বেদই ত সকল জ্ঞানের উৎস। বৈদিক ঋষি জন্মান্তরবাদের তত্ত্ব উপলব্ধি করে সে কথা ঘোষণা করে গেছেন বলেই ত আমরা মান্য করি।

যজুর্বেদে আছে —

পুনর্মনঃ পুনরায়ুর্ম আগন্ পুনঃ প্রাণঃ পুনরাত্মা ম আগন্ পুনশ্চক্ষুঃ পুনঃ শ্রোত্রং ম আগন্।
বৈশ্বানরো২দব্ধস্তনুপাৎ অগ্নির্ন পাতু দুরিতাদবদ্যাৎ॥ ৪/১৫॥

'হে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর। যখন যখন আমি জন্মগ্রহণ করব, তখন তখন আমি যেন বিশুদ্ধ মন, পূর্ণ আয়ু, আরোগ্য এবং কুশলতাযুক্ত জীবাত্মা হই। অনুগ্রহ করে পুনর্জন্ম সময়ে আমাদেরকে সমুদয় দুষ্কর্ম, পাপতাপ এবং আপদ বিপদ হতে মুক্ত রাখবেন, এই প্রার্থনা করছি।' বেদের যথার্থ তত্ত্ববোদ্ধা মহর্ষি যাস্কও ঘোষণা করেছেন —

মৃতশ্চাহং পুনর্জাতো জাতশ্চাহং পুনর্মৃতঃ। নানা যোনি সহস্রানি ময়োষিতানি যানি বৈ॥
আহারা বিধি ভুক্তাঃ পীতা নানাবিধা স্তনাঃ। মাতরো বিবিধা দৃষ্টাঃ পিতরঃ সুহৃদস্তথা॥

(নিরুক্ত ১৩/১৯)

'জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জন্ম, কত যোনিতে জন্মেছি, বিভিন্ন জন্মে বিভিন্ন পিতা লাভ করেছি, বিভিন্ন মাতার স্তন্যপান করেছি, কত খাদ্য গ্রহণ করেছি, কতই না বন্ধুসঙ্গ লাভ হয়েছে।'

যাস্কাচার্য ছাড়াও অপর বেদবিৎ, মহাযোগী পতঞ্জলির বক্তব্যেও ঐ বৈদিক সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেছেন —

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্ট-জন্মবেদনীয়ঃ।। ১২, সাধনপাদ॥ এর সরল অর্থ হল, অবিদ্যাদি ক্লেশ হতে কর্মসৃষ্টি হয় এবং কর্ম হতে ধর্ম বা অধর্মরূপ কর্মের বীজ সঞ্চিত হয়। কর্ম হতে বীজ, বীজ হতে পুনরায় কর্ম — এই রকমই চলতে থাকে। যে আধার হতে এই কর্মের সৃষ্টি এবং তা যেখানে গিয়ে সঞ্চিত হয়, তারই নাম

* শ্রীযুক্ত বিপিপন কৃষ্ণ ঘোষ এম, এ (Triple), বি, টি, কাব্য-ব্যাকরণ-সাংখ্যতীর্থ — কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কটিশ চার্চ কলেজের বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন অধ্যাপক ও পরীক্ষক মনীষী বিপিন কৃষ্ণ অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী। তাঁর পরিচিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন যে, সমগ্র ইংরাজী সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্য তিনি ছেদ ও বিরাম চিহ্ন সহ অনর্গল আবৃত্তি করতে পারতেন। উভয় সাহিত্যের গদ্যাংশও তাঁর কণ্ঠস্থ। গত ৫০ বৎসর ধরে তিনি যত ছাত্রের সংস্পর্শে এসেছেন, তাদের প্রত্যেকের নাম ধাম, রোল নম্বর, কবে কে কোন ঘরে, বেঞ্চের কোন্ সারিতে বসতেন, তাও তাঁর মুখস্থ। এমন কি কবে কোন ছাত্র ক্লাসে বসে কি দুষ্টুমি করেছিলেন, কোন্ পরীক্ষায় কি বিষয়ে কত নম্বর পেয়েছিলেন ছাত্রটিকে দেখা মাত্রই তিনি তা বলে দিতে পারতেন। আবাল্য ব্রহ্মচারী ঋষিকল্প এই মানুষটি তাঁর সারাজীবনের অর্জিত লক্ষাধিক টাকা তাঁর দাদা ও মায়ের স্মৃতি রক্ষা কল্পে সেন্ট পলস্ কলেজে এবং স্বগ্রাম আন্দুলের জগবন্ধু কলেজে দান করে দিয়েছেন। বেনিয়াটোলা লেনের যে মেস বাড়ীটিতে তিনি গত ৪০ বৎসর যাবৎ বাস করেছেন, সেখানে তাঁর মায়ের শেষ নিঃশ্বাস পড়েছিল বলে মাতৃস্মৃতি বিজড়িত সেই ঘরখানির মায়া তিনি ত্যাগ করতে পারেন নি। স্বল্পালোকিত সেই জীর্ণ ঘরখানিতে, স্বেচ্ছাবৃত দারিদ্র্যের মধ্যে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যার অগ্নি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

কর্মাশয়। ঋষি বলছে এই কর্মাশয় যুগপৎ 'দৃষ্টজন্মবেদনীয়' অর্থাৎ বর্তমান জন্মেই অনুভবনীয় এবং 'অদৃষ্টজন্মবেদনীয়' বা জন্মান্তরে অনুভবনীয়। একটু বিচার করলেই বুঝতে পারবে, এ জগতে জীবমাত্রেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কত সাধ ও আশা পোষণ করছে, কত সৎ অসৎ কর্মের অনুষ্ঠান করছে, কত যে ধর্ম বা অধর্মরূপ বীজ সঞ্চয় করছে তার ইয়ত্তা নাই। এ দেখে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়, এই সকলের মূলে এমন একটি কারণ আছে, যা আছে বলেই এইরকম কর্মের পর কর্ম, বাসনার পর বাসনা, আশার পর আশা ফুটে উঠছে। সেই যে কারণ, সেই যে আধার, যা হতে এ সকলের বিকাশ তারই নাম কর্মাশয়। কর্মাশয়ের বিকাশ শুধু এই জন্মেই হয় তা নয়, জন্মান্তরেও তা বিকাশ লাভ করতে পারে। 'দৃষ্ট'জন্মের কর্ম এবং বাসনাদির বৈচিত্র্য দেখেই 'অদৃষ্ট' জন্ম নিরূপণ করাও তখন সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। কাজেই জন্মান্তর যে আছে, ঐ সব আপ্তবাক্যই তার মুখ্য প্রমাণ।

ত্রিদিবানন্দ — সাধারণ মানুষ কি করলে নিজ নিজ পূর্বজন্ম জানতে পারবে? তার কি কোন বিশিষ্ট যোগপন্থা আছে?

সাধুজী — নিশ্চয়ই আছে। ঐ পাতঞ্জল যোগদর্শনের দু' একটি সূত্র আলোচনা করলেই তার নির্দিষ্ট আভাস পাওয়া যাবে। আমি পূর্বেই একটি সূত্রের উল্লেখ করেছি — সংস্কারসাক্ষাৎ করণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানম্॥ (১৮, বিভূতিপাদ)॥ সংস্কাররাশির সাক্ষাৎকার করতে পারলে পূর্বজাতি জ্ঞানরূপা বিভূতির আবির্ভাব হয়। এখানে সংস্কার কথার তাৎপর্য হল, চিত্রক্ষেত্রে মুর্হুমুর্হু যে সব বাসনা ফুটে উঠছে তারই নাম সংস্কার। সংস্কার শব্দের সাধারণ অর্থ দাগ বা চিহ্ন। পাথরের উপর সূচ্যগ্র লৌহশলাকা দিয়ে ঘর্ষণ করলে যেমন অল্পাধিক দাগ পড়ে, সেই রকম প্রতিনিয়ত কাম-কামনা এবং নানা কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে আমাদের চিত্তেরও অহরহ অজস্র দাগ পড়ছে। এরই নাম সংস্কার। স্থিরভাবে নিজের মনের দিকে তাকালে মনে হবে, যেন কোন অব্যক্ত ক্ষেত্র থেকে এগুলি বুদ্‌বুদের মত মুহূর্ত্তের জন্য উদিত হয়ে পুনরায় অব্যক্তেই মিলে যাচ্ছে। দৃঢ় মনঃসংযমের দ্বারা এই সকল অপ্রকটিত সংস্কারকে প্রত্যক্ষ করা যায়। যে কোন ধ্যাননিষ্ঠ যোগী তা করতে পারেন।

কিভাবে সেটি সম্ভব হবে, তার positive এবং Practical পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে সাধনপাদের ৩৯ সূত্রে মহর্ষি বলেছেন — অপরিগ্রহস্থৈর্যেজন্মকথন্তাসম্বোধঃ॥ — শরীর ও জাগতিক অন্যান্য বস্তুর উপর মমতা পরিহারের নাম 'অপরিগ্রহ' আর কথন্তা' শব্দের অর্থ কিংপ্রকারতা। 'জন্মকথন্তা' মানে জন্ম ব্যাপারটা কিরূপ অর্থাৎ আমি কে ছিলাম? কি ছিলাম? এই শরীর কি? কিরূপেই বা তা উৎপন্ন হল? ভবিষ্যতেই বা কি হবে? কি ভাব হবে? ইত্যাদি বিষয়ে সম্যক জ্ঞান। এটি দৃঢ় হলেই পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত জানা যাবে।

এর আর একটি সহজ উপায়ও আছে। একথা তোমরা সবাই জান, মস্তিষ্কের সঙ্গে স্মৃতি বিজড়িত থাকে। বাল্যের অনেক কথা বার্দ্ধক্যে মানুষ বিস্মৃত হয়ে আবার স্থির ভাবে ভাবতে ভাবতে তার অনেক কথাই মনে পড়ে যায়। এখানেও ঠিক সেই রকম। মনে ত সব ঘটনার ছাপ থাকে, পরবর্তী ঘটনা এসে পূর্ব ঘটনার স্মৃতিকে চাপা দেয় মাত্র। এখন যদি কেউ যে স্তরে এটি ঘটে, সেই স্তর অতিক্রম করতে পার, তাহলে পূর্বের সব কথাই তখন মনে পড়তে বাধ্য। অতএব নিত্য ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা যখন চিত্ত স্থির হবে, তখন তুমি যদি 'পূর্বে আমি কি ছিলাম এটি জানবই' — এইরূপ দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে ধ্যানস্থ হও, তাহলে ধীরে ধীরে মন লীন হবে এবং এক রকম সমাধি জন্মাবে। সমাধি হলেই পূর্বস্মৃতি সব ধীরে ধীরে জাগতে থাকবে, যত চাপ পড়বে, ততই মনের ছাপ স্পষ্ট হবে, ক্রমে পূর্বজন্ম প্রত্যক্ষ হবে।'

সাধুর সঙ্গে আমার সঙ্গীদের ঐ রকম শাস্ত্রালাপের ঘটায় তিন ঘন্টা সময় কোথা থেকে যে কেটে গেল, বুঝতেই পারি নি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, তাই প্রণামাদি সেরে সবাই উঠে পড়বার উদ্যোগ করলাম। সহসা আমার দিকে তাকিয়ে সাধু বললেন — 'আপ্ বরাবর কেঁও খামুশ হ্যায়? কুছ মাংগতা?' বললাম — কুছ নেহি মাংগতা। তবে মায়ের জন্য মনটা খুব ব্যাকুল হয়েছে।

'ফিকর্‌কো কোঈ বাত নেহি। হরবখৎ আপকা চিন্তনমেঁ মাতাজী ডুবে রহতে হ্যায়। পরিক্রমান্তে সিধা মাতাজীকে পাশ চলা যানা। শুভমস্তু।

মন্দির থেকে বেরিয়ে নর্মদা ও নর্মদাশংকরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে কিছুটা হাঁটার পরেই যে স্থানে এসে আমরা উপস্থিত হলাম সেই স্থানটি যেমন নির্জ্জন তেমনি বিশাল অরণ্যে ঘেরা। নর্মদার গতিপথ একবার যদি

হারিয়ে ফেলি সারাজীবন ঘুরলেও বেরিয়ে আসার পথ পাবো না।

বেলা বোধহয় চারটা হবে। পশ্চিমগামিনী নর্মদা, আমরাও পূর্বদিকে হাঁটতে লাগলাম, পাহাড় ও অরণ্য ভেদ করে নর্মদা বয়ে চলেছেন ভীম গর্জনে জঙ্গলের ফাঁক দিয়ে কচিৎ সাতপুরা পর্বতস্থিত সেই বৈদূর্যপর্বতের ঝিকিমিকি চোখে পড়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বড় বড় পাথর, কাঁটাগুল্মে ভরা দৈত্যাকৃতি বিশাল বিশাল গাছের পাশ দিয়ে হেঁটে চলেছি, দুধারে নিবিড় বনানী, কত ধরণের মোটা মোটা লতা ও বনের ফুল। বন্যপ্রকৃতি এখানে আত্মহারা, লীলাময়ী, নিজের সৌন্দর্যে ও নিবিড় প্রাচুর্যে যেন নিজেই মুগ্ধ! বাক্যহারা!

বেলা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা মাণ্ডবাশ্রমে এসে উপস্থিত হলাম। এখানকার শিবজীর নাম বিশোকেশ্বর।

হরানন্দজী হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন — তুমি এত চুপচাপ কেন! এতটা রাস্তা একসঙ্গে হেঁটে এলাম, কিন্তু তুমি একটি কথাও বলনি। কি ভাবছ?

— জন্মান্তরবাদ নিয়ে সাধুর প্রতিটি কথা সত্যি। মহাত্মা যজুর্বেদ হতে আরম্ভ করে পাতঞ্জল প্রভৃতি হতে অজস্র প্রমাণ দিয়েছেন, সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। জন্মান্তরবাদ সম্বন্ধে ঋগ্বেদের স্পষ্ট ঘোষণা —

অনচ্ছয় তুরগাতু জীবমেজদ্ধ্রুবম্ মধ্য আ পস্ত্যানাম্।
জীবো. মৃতস্য চরিত স্বধাভিরমর্ত্যো মর্ত্যেনা স যোনিঃ॥ (ঋগ্বেদে ১/১৬৪/৩০)

এর অর্থ, এখানে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি দীর্ঘতমা পরাবর-দৃষ্টিতে ঐ চিন্ময় বেদমন্ত্র প্রত্যক্ষ করে বলছেন — জীবের অন্তরশায়ী ব্রহ্ম শরীরাভ্যন্তরস্থ জীবত্মাকে বিভিন্ন গতি দান করে থাকেন। মৃত্যুর পর অর্থাৎ অন্নময় কোষ হতে উৎক্রান্ত হতে প্রতি জীব আপন গুণ ও কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ প্রাপ্ত এবং এইভাবে সংসার চক্রের পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করতে থাকে। কাজেই হিন্দুর জন্মান্তরবাদ একটি অনুভব সিদ্ধ তত্ত্ব। প্রকৃত জিজ্ঞাসুর লক্ষণ, তিনি জল্প[১] ও বিতণ্ডা[২] পরিহার করে চলেন। মহাত্মাকে শ্রদ্ধাপূর্ণ অন্তঃকরণে পরিপ্রশ্ন[৩] করাই শাস্ত্রবিধি।

আমরা যখন মাণ্ডবাশ্রমে এসে উপস্থিত হই তখন মন্দিরে পুরোহিতজী ছিলেন না। লোকমুখে আমাদের আসার সংবাদ পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন। পুরোহিতজী বললেন — কোনকালে ঋষি মাণ্ডব্য ও ঋষি বিভাণ্ডক নর্মদার এই তটে তপস্যা করেছিলেন। কিন্তু এই তীর্থের মাহাত্ম্য এই যে ঋষি মন্দপাল খাণ্ডববন দহনকালে এখানে এই যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিকে আহ্বান করে তার সনাতনকে অগ্নির দহন হতে রক্ষা করেন। এই যে ধূনি দেখছেন; এই ধূনি বিনা কাষ্ঠে জ্বলছে। এই ধূনি কখনও নেবে না। আমরা বেদপন্থী, নিত্য অগ্নিসেবা ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাই আমাদের তপস্যা। সারাজীবন নর্মদাশ্রয়ী হয়ে, নর্মদাতটে দাঁড়িয়ে কোন মিথ্যাচার করছি না।

মন্দিরের ভিতরেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। নর্মদা স্পর্শ ও প্রণাম করে এসে আমি মহানন্দস্বামীকে বললাম — মহাভারতের তিন চতুর্থাংশ আপনার মুখস্থ। আপনার মত পুরাণ বিশারদ, স্মৃতিশক্তিধর আমাদের সঙ্গে আছেন; এ কি কম কথা! আপনি আমাদের ঋষি মন্দপালের কাহিনী শোনান।

মহানন্দস্বামী — অর্জুন তখন বনবাসে। বনবাসের সময় প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় এক অদ্ভুতদর্শন ব্রাহ্মণ অর্জুনের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। বললেন, আমি বহুভোজী ব্রাহ্মণ, অসীম আমার ক্ষুধা। সম্প্রতি যজ্ঞে বিপুল পরিমাণ ঘৃত খাওয়ার দরুন অগ্নিমান্দ্যে ভুগছি। এই রোগের একমাত্র প্রতিকার, মাংস ভোজন, তুমি ক্ষত্রিয়, বীর আমাকে মাংস ভোজন করাও।

অর্জুন প্রস্তাব শুনে বলেন — বলুন কোন পশুর মাংস আপনি খাবেন? ব্রাহ্মণ হেসে বলেন, এক আধটা পশুতে আমার ক্ষুধার নিবৃত্তি হবে না। সামনে দেখছ বিরাট খাণ্ডব বন। আমি পশু সমেত সমগ্র খাণ্ডব বনকে দগ্ধ করে খেতে চাই।

বিস্ময়ে অর্জুন বললেন, ব্রাহ্মণের এমন ক্ষুধার কথা আমি শুনিনি। এই বিরাট বনের সমগ্র পশু আপনি একা খাবেন কি করে?

তখন ব্রাহ্মণ নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, আমি অগ্নি, সর্বভুক্। ইন্দ্রের জন্য আমি এই খাণ্ডব বন দগ্ধ

১। পরমত খণ্ডন পূর্বক স্বমত স্থাপনের জন্য যে বিতর্ক তার নাম 'জল্প'।
২। মিথ্যা বিচার। যুক্তি থাক বা না থাক, গায়ের জোরে পরমত খণ্ডনের জন্য যে অসার বাগাড়ম্বর, তার নাম 'বিতণ্ডা'।
৩। বিনম্র জিজ্ঞাসা। গীতার — তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন ... ইত্যাদি মন্ত্রটি (৪/৩৪) দ্রষ্টব্য।

তখন ব্রাহ্মণ নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন, আমি অগ্নি, সর্বভুক্। ইন্দ্রের জন্য আমি এই খাণ্ডব বন দগ্ধ করবার চেষ্টা করলেই মেঘ-অধিপতি ইন্দ্র প্রচুর বর্ষণে আগুন নিভিয়ে দেয়। তুমি বীর, একমাত্র তুমি পার বাণে বাণে ইন্দ্রের মেঘজাল উড়িয়ে দিতে, তোমার শরণাপন্ন হয়েছি।

অর্জুন বলেন, আমি বনবাসী, রথহীন, অস্ত্রহীন, কি করে ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করবো?

তখন অগ্নি অর্জুনকে উপহার দিলেন, অর্জুনের ক্ষাত্র-শক্তির যা প্রধান অবলম্বন, গাণ্ডীব ধনুক আর অক্ষয় তূণীর, আর সেইসঙ্গে দিলেন কপিধ্বজ রথ।

অগ্নির বলে এইভাবে সজ্জিত হয়ে অর্জুন খাণ্ডব বনকে আক্রমণ করলেন। অর্জুনের রথের পিছনে পিছনে অগ্নি শতশিখায় অরণ্যকে বেষ্টন করলো। সে শিখা আকাশের বুকে গিয়ে লাগলো। ইন্দ্রের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে অর্জুন অগ্নিকে খাণ্ডব বনকে নিঃশেষে দগ্ধ করবার সুযোগ করে দিলেন। সেই বিরাট অরণ্যের মধ্যে অগ্নি কেবল তক্ষকের পুত্র অশ্বসেন, নমুচির ভ্রাতা ময়দানব ও চারটি খঞ্জন পক্ষীকে দাহ করেন নি। অগ্নি প্রায় পনেরদিন ধরে এই খাণ্ডব বন দগ্ধ করেন।

অশ্বসেন ও ময়দানবকে অগ্নি কেন হত্যা করলেন না তা আপনারা জানেন; কিন্তু চারটি খঞ্জনী পাখীকে কেন হত্যা করলেন না তা এবার শুনুন।

ধর্মযজ্ঞের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তপস্বী, ব্রতচারী এবং শাস্ত্রজ্ঞানশালী মন্দপাল নামে এক বিখ্যাত মহর্ষি ছিলেন। তিনি ছিলেন বেদপাঠী, ধর্মনিরত, তপস্বী ও জিতেন্দ্রিয়, তিনি তপস্যার সিদ্ধিলাভ করে দেহত্যাগের পর পিতৃলোকে বসবাসের জন্য যান এবং দেখেন পিতৃলোকের দ্বার রুদ্ধ। তখন দৈববাণী হল জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তপস্বীরা যজ্ঞ তপস্যা ও সন্তান এই ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ হন এবং যজ্ঞ, তপস্যা ও সন্তান দ্বারা সেই ঋণ পরিশোধ করেন। কিন্তু আপনি তপস্যা করেছেন, যজ্ঞও করেছেন কিন্তু আপনার সন্তান নেই। কারণ পুত্র পিতাকে 'পুং' নামক নরক হতে উদ্ধার করেন। আপনি সন্তানের জন্ম দিলে তবেই পিতৃলোকের দ্বার খুলবে।

ঋষি মন্দপাল এই কথা স্মরণ করে চিন্তা করতে লাগলেন — কোন স্ত্রীর গর্ভে বহুতর সন্তান জন্মাতে পারে।

এরপর মন্দপাল প্রচুর সনাতনশালী খঞ্জন পক্ষীর রূপ ধারণ করে জরিতা নামী এক খঞ্জন পক্ষিনীর সঙ্গে মিলিত হন। তার গর্ভে চারটি বেদবিদ্ পুত্র জন্মলাভ করে। তিনি সেই অণ্ডগত চার শিশুপুত্রকে ফেলে লপিতা-নাম্নী অপর এক খঞ্জন পক্ষিনীর সঙ্গে মিলিত হতে যান কিন্তু দেখেন অগ্নি খাণ্ডব বন দগ্ধ করবার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। তিনি তাঁর চারটি খঞ্জন পক্ষী রূপ শিশুপুত্রকে বাঁচাবার জন্য অগ্নি স্তব শুরু করেন।

ত্বমগ্নে! সর্বলোকানাং মুখং ত্বমসি হব্যবাট।'

হে অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবতার মুখ, তুমি যজ্ঞকার্য্যে হব্য বহন করে থাক।

ত্বমন্তঃ সর্বভূতানাং গূঢ়শ্চরসি পাবক!!
ত্বামেকমাহুঃ কবয়স্ত্বামাহুস্ত্রিবিধং পুনঃ॥

হে অগ্নি! তুমি সকল প্রাণীর হৃদয়েই গূঢ়ভাবে বিচরণ কর। জ্ঞানীরা তোমাকে এক এবং ত্রিবিধ বলে থাকেন।

ত্বামষ্টাধা কল্পয়িত্বা যজ্ঞবাহমকল্পয়ম্।
ত্বয়া বিশ্বমিদং সৃষ্টং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ।

মহর্ষি অগ্নিকে সমগ্র বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা বলে সম্বোধন করে এবং তার অষ্টবিধরূপ কল্পনা করে তাকে যজ্ঞ সম্পাদক হিসাবে নিযুক্ত করেন।

ত্বদৃতে হি জগৎ কৃৎস্নং পদ্যো নশোদ্ভুতাশন!!
তুভ্যাং কৃত্বা নমো বিপ্রাঃ স্বকর্মবিজিতাং গতিম্।।
গচ্ছান্ত সহ পত্নীভীঃ সুতৈরপি চ শাশ্বতীম্॥
ত্বামগ্নে! জলদানাহুঃ খে বিষক্তান্ সবিদ্যুতঃ॥

হে অগ্নি! তুমি আকাশস্থ বিদ্যুতে সমন্বিত মেঘ। তোমার অবর্তমানে সমস্ত জগৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণরা তোমাকে স্মরণ করে নিত্যদিন স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে কর্ম করে চিরস্থায়ী গতিলাভ করেন।

দহন্তি সার্বভূতানি ত্বত্তো নিষ্ক্রম্য হেতয়ঃ।
জাতবেদস্ত্বয়ৈবেদং বিশ্বং সৃষ্টং মহাদ্যুতে॥

হে অগ্নি! তোমার শিখায় সমস্ত বস্তু দগ্ধ হয় এবং তুমিই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছ।

তবৈধ কর্ম বিহিতং ভূতং সর্বং চরাচরম্।
ত্বয্যাপো বিহিতাঃ পূর্বং ত্বয়ি সর্বমিদং জগৎ॥

হে অগ্নি! স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীই তোমার সৃষ্টি। তোমা হতেই প্রথম জলের উৎপত্তি এবং সমস্ত জগৎ তোমাতেই আছেন।

ত্বয়ি হব্যঞ্চ কব্যঞ্চ যথাবৎ সম্প্রতিষ্ঠিতম্।
ত্বমেব দহনো দেব! ত্বংধাতা ত্বং বৃহস্পতি॥
ত্বমশ্বিনৌ যমো মিত্রঃ সোমস্ত্বমসি চানিলঃ।

হে অগ্নি! তুমি হব্যতে আছ, কব্যতেও আছ। তুমিই অগ্নি, তুমিই ধাতা এবং তুমিই বৃহস্পতি। তুমিই অশ্বিনীকুমার, তুমিই যম, তুমিই মিত্র, তুমিই চন্দ্র এবং তুমিই বায়ু।

মন্দপালের স্তবে তুষ্ট অগ্নি 'তথাস্ত, তাই হবে' বলে অন্যান্য প্রাণীকে দগ্ধ করবার ইচ্ছায় খাণ্ডব বনে জ্বলে উঠলেন।

রঞ্জন জানাল — প্রায় ১টা বেজে গেছে এবারে শুয়ে পড়ুন। তাঁর কথা শুনে সকলেই আমরা শুয়ে পড়লাম। সকালে সবার আগে ঘুম ভেঙেছে হরানন্দজীর। তিনি উচ্চৈঃস্বরে অর্ধনারীশ্বর শিবস্তোত্র পাঠ করতে আরম্ভ করতেই সকলের ঘুম ভেঙে গেল। সকলেই আমার উঠে বসলাম। হরানন্দজী উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন —

কস্তুরিকা-চন্দনলেপনায়ৈ, শ্মশানভস্মাঙ্গ-বিলেপনায়।
সৎকুণ্ডলায়ৈ ফণিকুণ্ডলায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

যিনি গৌরীরূপে অর্ধাঙ্গে মৃগনাভিসহ চন্দন লেপন করেছেন এবং হররূপে অর্ধাঙ্গে শ্মশানভস্ম মেখেছেন, অর্থাৎ যিনি মনোহর কুণ্ডলধারিণী শিবানীরূপে এবং অর্ধাঙ্গে সর্পকুণ্ডলধারী শিবরূপে বিরাজিত, শিবানী ও শিবের সেই যুগ্মরূপ অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বরকে প্রণাম করি।

মন্দারমালা-পরিশোভিতায়ৈ, কপালমালা-পরিশোভিতায়।
দিব্যাম্বরায়ৈ চ ব্যাঘ্রাম্বরায়, নমঃ শিবায় চ নমঃ শিবায়॥

যাঁর অর্ধাঙ্গ মন্দারমালায় এবং অপরার্ধ কপালমালায় পরিশোভিত (মায়ের গলায় মন্দারমালা, বাবার গলায় হাড়মালা), যাঁর মাতৃরূপা অর্ধাঙ্গে দিব্যবস্ত্রের শোভা অথচ অপরার্ধ শিবরূপে ব্যাঘ্রচর্মধারী, শিবানী ও শিবের সেই একত্রিতরূপ অর্ধ-অর্ধনারীশ্বরকে প্রণাম।

চলৎ-ক্বণৎ-কঙ্কণ-নুপূরায়ৈ, বিভ্রৎফণা-ভাসুরনূপুরায়।
হেমাঙ্গদায়ৈ চ ফণাঙ্গদায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

যাঁর শিবাণীরূপ অর্ধাঙ্গের চরণে চঞ্চল স্বর্ণ নূপুর বাজছে, কিন্তু শিবরূপ অর্ধাঙ্গের চরণেও দ্যুতিমান সর্পফণা নূপুরের মত জড়িয়ে রয়েছে, যাঁর অর্ধাঙ্গে বাহুতে সুবর্ণ-অঙ্গদ এবং অপরার্ধে ফণার অঙ্গদ. শিবগৌরীর সেই যুক্ত রূপ অর্ধনারীশ্বরকে প্রণাম।

বিলোল-নীলোৎপল-লোচনায়ৈ, বিকাশিপঙ্কেরুহ-লোচনায়।
ত্রিলোচনায়ৈ চ বিষমেক্ষণায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

ঐ রহস্যময় বিচিত্র মূর্ত্তির যে দিকটিতে দুর্গারূপ, সেই অংশের চক্ষু নীলপদ্মের মত — তাতে চঞ্চল কৃপাকটাক্ষ, কিন্তু অন্যদিকের রূপটি ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির, তাই সেদিকের চক্ষু অর্ধনিমীলিত — ঠিক যেন একটি স্ফোটনোন্মুখ পদ্ম, একাধারে ত্রিনয়না ও ত্রিনয়ন দুর্গা-শিবের সেই যুগ্ম রূপ অর্ধনারীশ্বরকে প্রণাম।

প্রপন্নভক্তে সুখাদাশ্রয়ায়ৈ, ত্রৈলোক্যসংহারকতাণ্ডবায়।
কৃতস্মরায়ৈ বিকৃতস্মরায়, নমঃ শিবায় চ নমঃ শিবায়॥

যিনি অর্ধাঙ্গে শিবানীরূপে শরণাগত ভক্তের হৃদয় আলো করে সুখে সমাসীনা, অপরার্ধে শিবরূপে ত্রিলোকের সংহারকারী তাণ্ডব নৃত্যে বিভোর, যাঁর অর্ধাঙ্গের বিভূতি কামদেবের রচনা করেন কিন্তু অপরার্ধের শিবরূপ কামান্তক, মদনভস্মকারী, উমা-মহেশ্বরের সেই একত্রিত রূপ অর্ধনারীশ্বর মূর্ত্তিকে প্রণাম (উপনিষদে আছে, তিনি এক হয়েও বহুরূপে ফুটে উঠেছেন, এই সৃষ্টি তাঁর চিদবিলাস, আনন্দবিলাস। 'স অকাময়ত'। নির্গুণ নিরাকার নির্বিকল্প পরব্রহ্মে শক্তির সংযোগ হতে হবেই তাঁর বহু হবার ইচ্ছা জেগেছিল। তাহলে শক্তিই তাঁর মধ্যে এই বহু হবার মহা ইচ্ছা বা 'কাম' জাগিয়েছিলেন। তাই এখানে শক্তিকে বলা হয়েছে কামদেবের

রচনাকারিণী। আবার পরব্রহ্মের শিবরূপ হল সৃষ্টির জাল, বহুত্বের বিভ্রম গুটিয়ে ফেলে একম্ রূপে কেন্দ্রস্থ বা আত্মস্থ হবার রূপ। শেতে ইতি শিবঃ। অন্তকালে, মহাপ্রলয়ে সমগ্র জীবজগৎ শিবে লয় পায়, কাজেই শিবকে বলা হল কামদেবের লয়কারী। পৌরাণিক আখ্যানুযায়ী শিবের ললাটাগ্নিতে মদন ভস্মীভূত হয়েছিলেন, তাই শিব মদনভস্মকারীও বটেন)।

চাম্পেয়গৌরার্দ্ধশরীরকায়ৈ, কর্পূরগৌরার্দ্ধ-শরীরকায়।
ধম্মিল্লবত্যৈ চ জটাধরায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

মা দুর্গাকে বলা হয় চম্পকবরণী, আর শিবের অঙ্গজ্যোতি কর্পূরের ন্যায় শুভ্র, তাই এই স্তবকে বলা হয়েছে — যাঁর অর্ধশরীর চম্পকফুলের ন্যায় স্বর্ণাভ এবং অপরার্ধ কর্পূরধবল, যিনি অর্ধাঙ্গে দুর্গারূপে কবরীধারিণী কিন্তু অপরার্ধে শিবরূপে জটাজুটমণ্ডিত, দুর্গা-শিবের সেই একত্রিত রূপ অর্ধনারীশ্বরকে প্রণাম।

অম্ভোধর-শ্যামল-কুন্তলায়ৈ, বিভূতি-ভূযাঙ্গ-জটাধরায়।
জগজ্জনন্যৈ জগদেকপিত্রে, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

যাঁর অর্ধাঙ্গের কুন্তল মেঘের ন্যায় শ্যামল (মাতৃমূর্ত্তিরূপে) অথচ অপরার্ধের শিবমূর্ত্তিতে যিনি বিভূতিভূষিত জটা ধারণ করেছেন, দুর্গারূপে যিনি জগতের একমাত্র জননী এবং শিবরূপে জগতের একমাত্র পিতাস্বরূপ, একাধারে জগজ্জননী ও জগৎপিতার সেই যুগ্মরূপ অর্ধনারীশ্বরকে প্রণাম।

সদা শিবানাং পরিভূষণায়ৈ, সদাঽশিবানাং পরিভূষণায়।
শিবান্বিতায়ৈ চ শিবান্বিতায়, নমঃ শিবায়ৈ চ নমঃ শিবায়॥

কুণ্ডল, হার, অঙ্গদ, মন্দারপুষ্প, নূপুর প্রভৃতিকে মঙ্গলচিহ্ন হিসাবে গণ্য করা হয়। ঐ অপূর্ব রূপের অর্ধাঙ্গের যে দিকটিতে মাতৃরূপ, সে দিকটিতে ঐ মঙ্গল-চিহ্ন অলঙ্কারাদি রয়েছে। মায়ের দিব্য অঙ্গে স্থান পাওয়ায় ঐগুলির যেন শোভা বৃদ্ধি পেয়েছে। জগতে যেগুলি অমঙ্গলচিহ্ন যেমন সর্প, নরকপাল, শ্মশানভস্ম, শিব সেগুলি ধারণ করেন, পতিতপাবন আশুতোষ করুণাসাগর শিব ভূত প্রেত পিশাচ শৃগাল কুকুর পাপী তাপী কাউকে ত্যাগ করেন না। উমা-মহেশ্বরের সেই সব মহিমা অনুধ্যান করে ভক্তি-স্নিগ্ধ ভাষায় এই শ্লোকে বলা হচ্ছে — যিনি উমা রূপে অর্ধাঙ্গস্থিত মঙ্গলময় বস্তুসমূহেরও শোভাবর্ধনকারিণী আবার শিবরূপে অমঙ্গল বস্তুসমূহেরও শোভাবর্ধক, যিনি শিবের সঙ্গে যুক্তা এবং যিনি শিবানীর সঙ্গে যুক্ত — অর্ধনারীশ্বররূপ পরব্রহ্মের সেই বিচিত্র রসঘন প্রেমঘন স্বরূপকে প্রণাম।

তাঁর স্তবপাঠ শেষ হতেই রঞ্জন জানাল — সকাল ৬টা বেজেছে মাত্র। এবার যাত্রা করাই ভাল।

নর্মদাকে চোখে চোখে রেখেই হাঁটছি। প্রায় ঘন্টাখানেক হাঁটার পর একজন নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হল। পরস্পরকে 'নমঃ নারায়ণায়' জানিয়ে মহানন্দস্বামী তাঁকে পরবর্তী গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি উত্তর দিলেন — ঔর করীব দেড় দো মীল জানেসে আগে লেপা গ্রাম হৈ। উধার নর্মদা মাকে সাথ বেদা নদী কা সঙ্গম হুয়া। উধার বেদেশ্বর শিবজী কা মন্দির হ্যায়। ইনকে দর্শন করতে হুয়ে নর্মদাকে কিনারে কিনারে আগে বাড়তে জায়ঁ।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা হাঁটতে লাগলাম। দ্রুতগতিতে হেঁটে লেপা গ্রামে এসে পৌঁছলাম। নর্মদার তটেই বেদেশ্বর শিবজীকে প্রণাম করলাম। নাগা সাধুর হিসাব অনুযায়ী দেড় মাইল রাস্তা আসতে প্রায় পাঁচ ঘন্টা সময় লেগে গেল। বেলা গড়িয়ে পড়ছে। সূর্য পশ্চিমাচলে ঢলে পড়ছেন। আমরা নর্মদাতে সান্ধ্য স্নান সেরে এসে সন্ধ্যা করতে বসলাম। সন্ধ্যা জপাদি যখন শেষ হল, তখন রাত্র দশটা বেজেছে। মা নর্মদাকে প্রণাম করে শুয়ে পড়লাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। উঠে বসলাম। নিশিতে পাওয়া লোকের মত কতকটা বিহ্বল ভাবে বাইরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালাম। অমাবস্যার রাত্রির নীরন্ধ্র জমাট অন্ধকার ঢেকে রেখেছে চারদিক। হাঁটতে হাঁটতে একেবারে নর্মদার সামনে এসে দাঁড়ালাম। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেই অন্ধকারটা যেন একটুখানি পাতলা বা স্বচ্ছ হয়ে আসছে বলে মনে হল। নর্মদার জল চক্‌চক্ করছে। নর্মদার কলকল ধ্বনি এবং কদাচিৎ দু-একটা নৈশ পাখীর কূজন দ্বারা বিখণ্ডিত যে গভীর নৈঃশব্দ্য, তা যেন আমার আন্তরসত্তাকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে নিচ্ছে। আমি মা নর্মদার ষড়ক্ষরী মহাবীজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জপ

করতে লাগলাম। বেশ খানিকটা সময় গত হলে দেখতে পেলাম নর্মদার দুটি ধারা যেন দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। মনে হচ্ছে ভুজাগাকার কুণ্ডলিনী যেন হঠাৎ দুটি ফণা বিস্তার করে বয়ে চলেছেন অনন্তের পথে। এই পটভূমিতে মহাকাল যেন অচঞ্চল। স্তব্ধ মৌন বনস্পতি শ্রেণীর মত ধ্যান সমাহিত। ঐ আকাশ, এই নিশীথ রাত্রির ঘোর নির্জনতা ও নিঃস্তব্ধতা, ঐ গভীর অরণ্য যেন কি কথা বলছে — সেই শব্দহীন বাণী নর্মদা নদীর কলগীতিতে মুখর হয়ে উঠছে প্রতিক্ষণ। ওঁকারের এই গভীর অরণ্যও আজ যেন নিঃশব্দতার সুরে সুর মিলিয়ে অন্তরাত্মার কানে তার সুগোপন বাণীটি পৌঁছে দিচ্ছে। এই বাণী নৈঃশব্দের বটে কিন্তু অমরতার বার্তা বহন করে আনছে।

এইসব অরণ্যই ভারতের আসল রূপ, সভ্যতার জন্ম হয়েছে এই আরণ্য-শান্তির মধ্যে। বেদ, আরণ্যক, উপনিষদ জন্ম নিয়েছে এইরকম অরণ্যের স্তব্ধতার মধ্যে — নগরের কলকোলাহলের মধ্যে নয়। এক প্রচণ্ড শক্তি নিহিত আছে এই গহন গভীর অরণ্যে। একেই বলে ব্রহ্মশক্তি, ব্রহ্মশক্তি রয়েছে বিশ্বের সব কিছুতে। 'যো ওষধিষু যো বনস্পতিষু' সম্পূর্ণ উপলব্ধির বস্তু। শিবপুত্রী নর্মদা ও বাবার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম স্বস্থানে। পা টিপে টিপে নিজের আসনে গিয়ে শুয়ে পড়লাম। সকলেই অঘোরে ঘুমাচ্ছেন, নানা ছন্দে তাঁদের নাসিকা ধ্বনি হচ্ছে।

হঠাৎ রঞ্জনের চিৎকারে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসলাম। রঞ্জনের তাড়ায় বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম — প্রায় শতাধিক বাল ব্রহ্মচারী, নর্মদার তটে সমবেত হয়েছেন। প্রত্যেকেই মুণ্ডিত মস্তক ও তাতে শিখা, গলায় যজ্ঞোপবীত ও হালকা কমলা রং-এর পট্টবস্ত্র পরিহিত। তারা নর্মদার দিকে তাকিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে মন্ত্রোচ্চারণের করছে —

'বিশ্বম্ভরা বসুধানী প্রতিষ্ঠা হিরণ্যবক্ষা জগতো নিবেশনী।
বৈশ্বানরং বিভ্রতী ভূমিরগ্নি-মিন্দ্রঋষিভ দ্রবিণে নো দধাতু॥ (অথর্ব, ১২।১।৬)

মাতৃভূমি আমাদের বিশ্বম্ভরা — জ্ঞানে, ঐশ্বর্যে, ঋদ্ধি ও আলোকের বাণীতে তিনি জগৎকে ভরে দিয়েছেন। ভারতমাতা তাই সর্বরত্নের খনি, সকল সত্যের, জ্ঞানের ও কর্মের প্রতিষ্ঠান, সকলের যোগ্য বাসভূমি, অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শান্তিনিকেতন। আমাদের মাতৃভূমি পরমাত্মার আশীর্বাদপূত। বৈশ্বানর এখানে বিশ্বনরের কল্যাণে চিরপ্রদীপ্ত। এই পুণ্যা জননী আমাদেরকে কল্যাণে, ধনে ও সমৃদ্ধিতে উন্নত করুন।

সত্যং বৃহদৃতমুগ্রং দীক্ষা তপো বক্ষযক্ষঃ পৃথিবীং ধারয়ন্তী।
স নো ভৃতস্য ভবস্য পত্ন্যরুং লোকং পৃথিবী নঃ কৃণোতু॥ (১২।১।১)

সত্য, বৃহৎ, ঋত, উগ্র, দীক্ষা, তপঃ, ব্রহ্ম এবং যজ্ঞ আমাদের মাতৃভূমিকে ধারণ করে আছে, যাহা কিছু ভূত — যাহা কিছু ভব্য — সকলের অধীশ্বরী এই মাতৃভূমি আমাদের জন্য বিস্তীর্ণ লোক বিধান করুন।

যৎ তে মধ্যাং পৃথিবী যচ্চ নভ্যং যাস্ত উর্জস্তন্বঃ সম্বভূবুঃ
তাসু নো ধেহ্যভি নঃ পবস্ব মাতা ভূমিং পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ॥ (১২।১।১২)

যা তোমার মধ্যদেশ, যা নাভি — যা কিছু বল তোমার দেহ হতে জাত হয়েছে তা দিয়ে তুমি আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত কর, পবিত্র কর। হে মাতা ভূমি, আমরা তোমার সন্তান।

গ্রীষ্ম স্তেভূমে বর্ষাণি শরদ্ধেমন্তঃ শিশিরো বসন্তঃ।
ঋতবস্তে বিহিতা হায়নীরহো রাত্রে পৃথিবী নো দুহতাম্॥ (১২।১।৩৬)

মাগো, তোমার গ্রীষ্ম, তোমার বর্ষা, তোমার শরৎ-হেমন্ত, শিশির বসন্ত — এই তোমার সুনিয়ত ঋতুগুলি — এই তোমার দিনরাত্রি — এরা সকলেই আমাদের উপর রস বর্ষণ করুক।

যস্তে সর্পো বৃশ্চিকস্তৃষ্টদংশ্মা হেমন্তজব্ধো ভৃমলো গুহাশয়ে।
ক্রিমির্জিন্বৎ পৃথিবী যদ্যদেজতি প্রাবৃষি তন্নঃ সর্পন্মোপ সৃপদ।
যচ্ছিবং তেন নো মৃড়॥ (১২।১।৪৬)

তোমার গ্রাম, তোমার অরণ্য, তোমার ভূমিতে যে সভা, যে মিলন, যে সমাবেশ — আমরা সে সম্বন্ধে চারু বাক্যই বলব।

যৎ বদামি মধুমৎ তৎ বদামি যদীক্ষে তৎ বনন্তি মা।
ত্বিষীমানস্মি জূতিমানবান্যান্ হন্মি দোধতঃ॥ (১২।১।৫৮)

তোমার সর্বত্র যা কিছু দেখি সবই মধুময়, তোমার সকল কিছুই আমাদের চিত্ত জয় করে। তুমি আমাদেরকে শ্রী সম্পদ ও মঙ্গলে প্রতিষ্ঠিত কর।

তাদের মন্ত্রপাঠ শেষ হবার পর তারা একজন যতির পিছনে পিছনে আমাদের বাসস্থানের বারান্দার পাশ দিয়ে চলে গেল। বালকদের বয়স কারো দশ বারো বৎসরের বেশী হবে না। তাদের মুখে বিশুদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ ও তাদের ঐরকম বেশবাস দেখে আমরা প্রত্যেকেই স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্থান, কাল ভুলে গেলাম। মনে হল, আমরা যেন প্রাচীন ভারতবর্ষের কোন বৈদিক ঋষির তপোবনে এসে পৌঁছেছি। হঠাৎ রঞ্জনের কথায় চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল।

রঞ্জন — হ্যাঁ ভাই ! বেদে কি দেশবন্দনার কথা আছে?

আমি — হ্যাঁ, বাল-ব্রহ্মচারীরা যে মন্ত্র পাঠ করল তা অথর্ববেদের। অথর্ববেদের দ্বাদশ কাণ্ডে এ রকম মোট ৬৩টি দেশপ্রেমমূলক কবিতা আছে। জননী জন্মভূমিশ্চ স্বার্গদপি গরীয়সী — মাতৃভূমির মহিমাব্যঞ্জক এই মন্ত্র সংস্কৃত সাহিত্যের কথা। রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে এই কথাগুলি বলেছিলেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের মতে ভারতবর্ষ হল 'ভারতাজির' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠের প্রাঙ্গণ। পুণ্যভূমি। বৈদিক সাহিত্যের বহুস্থলেই আমি দেশমাতার বন্দনা দেখেছি। ঐ সব বৈদিক মন্ত্র ছাড়াও পরবর্ত্তীকালের সংস্কৃত সাহিত্যেও দেশমাতৃকার বন্দনা আছে। আমাদের পূর্বপুরুষগণ কখনও দেশ বলতে মাটি কাঠ পাথরের ভূখণ্ড-বিশেষ বলে মনে করেন নি। তাঁদের চোখে দেশ চিন্ময়ী, দেশের প্রতি ঋণকে তাঁরা চিরকাল মাতৃঋণের মতই অপরিশোধ্য পবিত্র ঋণ হিসাবে গ্রহণ করার শিক্ষা দিয়ে গেছেন। তাঁদের স্তবপাঠ শুনুন,

যদন্নৈঃপোষিতঃ দেহ, যজ্জলৈর্জীবনম্ মম। যদ্‌বায়োশ্বসীম নিত্যং তং দেশং প্রণমাম্যহম্॥
পিতা পিতামহদেবাঃ যত্র মৎ পূর্ববংশজা। যত্র জাতা লয়ং জাতা তং দেশং প্রণমাম্যহম্॥

যেখানকার অন্নজলে আমার দেহ পুষ্ট, যার বায়ু গ্রহণ করে আমরা বেঁচে আছি, যেখানে আমার পিতা পিতামহ এবং পূর্বপুরুষরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, যাঁর কোলে তাঁরা শেষশয্যা গ্রহণ করেছেন সেই পুণ্যভূমি দেশমাতাকে প্রণাম করি।

বন্দে ভারতমাতরং হিতরতাং ধর্মার্থদাং মোক্ষদাম্।
আরাধ্যমৃষিসেবিতামনুপমাং শস্যান্বিতাং শোভনাম্।
ফুল্লাজাং শৈলরম্যাং সুবিমল - সলিলাং শ্যামলাং রত্নভূষাং
ত্রৈলোক্যপ্রীতিগীতাং হিমগিরি - মুকুটাং সাগরৈর্ধৌতপদাম্॥

মধুক্ষরা ভাষায় রচিত ঐ শ্লোকগুলির অর্থ সহজবোধ্য।

রঞ্জন — কবিগুরু এখানে এলে দেখতে পেতেন, স্বল্প পরিমাণে হলেও তাঁর স্বপ্নের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে নর্মদা-তটে। ঋষি কবির সেই আকুতির কথা মনে পড়ছে —

'আর বার এ ভারতে কে দিবে গো আনি
সে মহা আনন্দ মন্ত্র, সে উদাত্তবাণী
সঞ্জীবনী স্পর্শে মর্ত্তে সেই মৃত্যুঞ্জয়
পরমঘোষণা, সেই একান্ত নির্ভয়
অনন্ত অমৃতবার্তা।

বেলা দশটার সময় দেখি, সংস্কৃত টোলগৃহের কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। সঙ্গে করে আমাদের জন্য প্রচুর পরিমাণে দুধ ও মোণ্ডা ভোজনের জন্য এনেছেন। যথানিয়মে 'ব্রহ্মার্পনং ব্রহ্মহবিঃ' করা হল।

ভিক্ষা প্রাপ্তির পর আমরা যে আর আসন পেতে বিশ্রাম করতে লাগলাম। বেলা প্রায় ৪টা নাগাদ, যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সকালে বাল-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে নর্মদার ঘাটে মন্ত্রোচ্চারণের করছিলেন তিনি এলেন আমাদের বেদ-বিদ্যালয় ও ব্রহ্মচর্যাশ্রম দর্শনের জন্য আবাহন করে নিয়ে যেতে। তাঁর সঙ্গে পল্লীর শেষ প্রান্তে অবস্থিত বেদ

বিদ্যালয়ে গিয়ে উপস্থিত হলাম। চারদিক সুউচ্চ ইষ্টক প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। সাধারণ বা অসাধারণ কারও সেখানে প্রবেশ নিষেধ। কয়েকজন ব্রাহ্মণ বালকদেরকে ব্রহ্মচর্য শিক্ষা, নিত্য হবনাদি ক্রিয়া ও বেদপাঠের শিক্ষা দিচ্ছেন। প্রায় শতাধিক ব্রাহ্মণ বালক সেখানে অহোরাত্র বাস করে। চারিদিকে বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা ফুল ফলের বাগান, সামনে একটি টিনের প্লেট শালগাছে লাগানো আছে, তাতে দেবনাগরীতে লেখা — বেদচর্চাশ্রম। তপোবনের মত একটা গম্ভীর থমথমে ভাব। গাছপালা ভেদ করে একটু এগিয়ে যেতেই দেখলাম একজন ব্রাহ্মণ একটি বড় বেদীর উপর বসে ছাত্রদের পাঠ দিচ্ছেন। তিনি বলছেন — তোমাদের প্রশ্নের উত্তরে জানাই যে, সত্যাদি আচরণ না করলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না। সত্যাদি দিব্যগুণগুলিই ব্রহ্মবিদ্যার দ্বার স্বরূপ। সত্য, আর্জব, হ্রী, দম, শৌচ ও বিদ্যা প্রভৃতি গুণ থাকলে তবে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। শুদ্ধা বুদ্ধির উদয় হলে তখন আর মনের উপর মান-মোহাদির কোন অনিত্য বস্তুগত অধিকার থাকে না। এইজন্য ঐ গুণগুলিকে পার্থিব মানমোহাদির প্রতিষেধক হিসাবে গণ্য করা হয়।

বাক্য ও মনের ঐক্য ব্যতীত সত্য আচরিত হয় না। ছলের আশ্রয় না করে অপরের মনে আপন বোধের ন্যায় বোধ উদয় করানোই সত্যতা। যদি পরের মনে বোধান্তর উৎপাদন করাই বক্তার অভিপ্রায় হয়, তাহলে তা সত্য বলে গণ্য নয়। এইজন্য যুধিষ্ঠির হস্তীকে অভিসন্ধান করে 'অশ্বত্থামা হত ইতি' কথাগুলি বললেও বাক্য ও মনের অনৈক্য প্রযুক্ত তাঁকে মিথ্যাভাষণের দোষে পাপভাগী হতে হয়েছিল। যা ভ্রমবশতঃ বলা যায়, তাও সত্য নয়, শাস্ত্রমতে তা অজ্ঞানকৃত পাপের নামান্তর।

শাস্ত্রানুসারে, যা মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর, তা সত্যভাষণ হলেও তাকে যথার্থ সত্য বলা যায় না। তার নাম সত্যাভাস; সত্যাভাস পাপ। এইজন্য দেখা যায় জনৈক সত্যতপা ঋষি দস্যুগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে তাদেরকে বনিকের যথাযথ বিবরণ দেওয়ায় তাঁকে পাপভাগী হতে হয়েছিল। অপরপক্ষে পরোপকারের জন্য মিথ্যা বললে সে মিথ্যাও সত্য পদবাচ্য হয়। যেমন ধর গল্পে আছে — একদা এক ধনীর সালঙ্কারা কন্যা রক্ষী সহ পতিগৃহে যাত্রার সময় পথিমধ্যে দস্যুগণ দ্বারা আক্রান্ত হয়। রক্ষীদের সঙ্গে দস্যুরা যখন ধ্বস্তাধ্বস্তি করছিল, সেই সুযোগে কন্যাটি সকলের অলক্ষ্যে শিবিকা হতে পলায়ন করে। অনেকদূর ছুটে যাবার পর একটি চতুষ্পথের সংযোগস্থলে পৌঁছে সে দেখে, এক সন্ন্যাসী সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে ধ্যানস্থ আছেন। কন্যা তাঁর শরণ নেয় এবং সন্ন্যাসীর পশ্চাৎস্থিত কাষ্ঠস্তূপের আড়ালে আত্মগোপন করে। কিছুক্ষণ পরেই দস্যুরা সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং কন্যা কোনদিকে গেছে তা ঐ সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করল। সন্ন্যাসী ভাবলেন — যদি সত্য কথা বলি, তাহলে অবলা কন্যার প্রাণ যায়, মান যায়, যদি মৌন থাকি, তাহলে কন্যার প্রতি আমার সহানুভূতি অনুমান করে দস্যুরা আমার কুটীর অন্বেষণ করে তাকে অপহরণ করবে — আমি শরণাগতাকে রক্ষা করতে পারব না। আর যদি মিথ্যা বলি তাহলে তপোভ্রষ্ট হই। এস্থলে অধর্ম হলেও সত্যের অপলাপ করাই কর্তব্য। এইরূপ চিন্তা করে সন্ন্যাসী বললেন — মহাশয়গণ! আমি একটি কন্যাকে দৌড়ে যেতে দেখেছি বটে! এইকথা শুনে দস্যুগণ কন্যার সন্ধানে সেখান হতে চলে গেল, কন্যাও বিপদ-মুক্ত হল।

ধর্মতঃ এখানে সত্যের অপলাপ করেও সন্ন্যাসী পুণ্যভাগী হয়েছিলেন, সত্যের অপলাপ জনিত পাপ তাঁকে স্পর্শ করেনি। এই সমস্ত কারণে শাস্ত্র সত্যের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন —

যথার্থ কথনং যচ্চ সর্বলোকসুখপ্রদম্।
তৎ সত্যমিতি বিজ্ঞেয়মস্যতং তদ্বিপর্যয়ম্॥

যা লোকহিতের যথার্থ ভাষণ তাই সত্য এবং যা তার বিপরীত অর্থাৎ আক্ষরিক যথার্থ-ভাষণ হলেও যদি তার মূলে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল থাকে, তবে তা সত্য পদবাচ্য নয়।

বেদচর্চাশ্রম থেকে বেরিয়ে আমরা ফিরে আসতে লাগলাম। পথের মাঝে একটি বিরাট অশ্বত্থ গাছকে নদীর তীরে পড়ে থাকতে দেখে রঞ্জন আবৃত্তি শুরু করল —

চলে গেছ তুমি, শুধু প্রান্তর ধু ধু করে অনিবার,
চারিদিকে ক্ষীণ কাশের শীর্ষ দীনতা বাড়ায় তার।
আছে ঝটিকার প্রবল স্বনন, রোদের তীব্র জ্বালা,
নাই আর নাই ধূসর বেলায় তোমার ধর্মশালা।

যাও তরু তুমি, তোমার লাগিয়া ঝড়ে পড়ে আঁখিনীর —
যাও মঙ্গল চামরছত্র কানন রাজশ্রীর।
যাও তাপিতের দয়ালবন্ধু সবল সরণ প্রাণ,
যাও অতীতের স্তম্ভ অরুণ, প্রকৃতির মহাদান।
তরুর মধ্যে অশ্বত্থ যিনি, বড় যাঁর কেহ নাই,
তাঁরি সাথে তুমি মিশে যাও পুন, তাঁরি বুকে হোক ঠাঁই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রঞ্জন বলল — বলুন ত ভাই! এই কবিতাটি কার লেখা।

আমি — অজয়, উজানি, একতারা নূপুর, বনতুলসী, বনমল্লিকা, বীথি, শতদল, রজনীগন্ধা, স্বর্ণসন্ধ্যা প্রভৃতি কাব্যের লেখক, বাংলার কাব্য জগতের একটি স্মরণীয় নাম কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের* লেখা। এটি কবির 'প্রাচীন অশ্বত্থ' কবিতার অংশ। আমার জীবনের বহুতর সৌভাগ্যের মধ্যে এটিও একটি যে কবির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। ১৯৫১ সালে আমার জীবনের জীবন্ত ঈশ্বর বাবার দেহান্তের পর আমি যখন ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছি সেই সময় বীরভূম পরিক্রমাকালে আমি কবির স্বগ্রামে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই। বাল্যকাল হতে তাঁর কবিতা সাগ্রহে মুখস্থ করেছি, তাঁকে চোখে দেখার কৌতূহল নিয়েই গিয়েছিলাম, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। আগন্তুককে মুহূর্তে আপন করে নেওয়ার যাদু জানতেন তিনি। তাঁর ব্যবহার এবং কথাবার্তায় আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। প্রসঙ্গক্রমে তাঁর মাতাপিতার কথা উঠতেই কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন — 'আমার বাবা মা দীর্ঘকাল কাশ্মীরে ছিলেন। বাবা ছিলেন কাশ্মীর রাজষ্টেটের সুপারিনটেণ্ডেন্ট্।

---

* এর পর তাঁর সঙ্গে আমার দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ১৯৫৭ সালে কেন্দুবিল্ব গ্রামে বিখ্যাত জয়দেবের মেলায়। কবি অন্যান্য পুণ্যার্থীদের সঙ্গে কদম্ব খণ্ডির ঘাটে স্নান করছিলেন। দেখা হতেই জড়িয়ে ধরলেন, একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন — কেমন আছ, কোথায় কোথায় ঘুরলে? তোমার কাছে সাধু-মহাত্মার খবর শুনব। তুমি কি জান যে শ্মশানের কাছে অজয় নদের এই ঘাটটিতে কবি জয়দেব তাঁর আরাধ্য দেবতা রাধামাধবকে পেয়েছিলেন? চল তোমাকে মন্দির ও বিগ্রহ দেখিয়ে আনি। মন্দিরে গিয়ে দেখলাম, বিগ্রহের পাদদেশে পাথরের উপর খোদাই করা আছে, জয়দেবের গীতগোবিন্দের সেই বিখ্যাত শ্লোক :

স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং দেহি পদপল্লব মুদারম্॥

কবি বললেন — কবি জয়দেব যখন কিছুতেই অসমাপ্ত পদ মিলাতে পারছিলেন না, সেই সময় তিনি স্নান করতে গেলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং জয়দেবের রূপ ধারণ করে ঐ শেষপদটি পূরণ করে যান। এই কথাগুলি বলার সময় ভক্ত কবির চোখে মুখে যে বিশ্বাসের দৃঢ়তা এবং ব্যগ্রতা দেখলাম তা সহজে ভোলা যায় না। সেখান হতে আমাকে নিয়ে গেলেন কুশেশ্বর শিব মন্দিরে। বললেন — ঐ দেখ, জয়দেবের সিদ্ধাসন, কবি এইখানেই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। কথায় কথায় জিজ্ঞেস করলেন —'এই মেলা তোমার কেমন লাগছে?' বললাম — কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সর্বত্র আমার পরিব্রাজন শেষ হয়েছে। প্রকৃত সাধু মহাত্মাও যেমন দেখেছি তেমনি তীর্থে তীর্থে ভেকধারীদের ভীড় আমার মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই পুণ্য স্থানটিতেও দেখছি সেই একই দৃশ্য। চারদিকে সাধুর ভেকধারী ভিখারী। চোখে মুখে অসংযমের চিহ্ন, গাঁজা বা কোন নেশার ঘোরে চোখ ঢুলুঢুলু, হাতে গুপীযন্ত্র বাজিয়ে বাবাজী মাতাজীরা বাউল গান গাইছেন। গানের কলিতে , মুখের ভাষায় উচ্চ দেহ-তত্ত্বের গুহ্যকথা কিন্তু তাদের চোখে মুখে কোথায় সেই পবিত্র আলোর চিহ্ন যা দেখে তীর্থকামী মানুষ কিছু পাথেয় সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে? আজকাল পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু যে বলেছেন সাধুদেরকে সমাজের কোন কাজে লাগাবেন, এই সব দেখে শুনে মনে হয়, ধর্মের নামাবলী পরা এই সব ভেকধারী ও ভিখারীদেরকে প্রশ্রয় দান নিছক মনুষ্য শক্তির — Wastage of man power মাত্র। তপস্যা ও ঈশ্বর লাভ এত সহজ বস্তু নয়। পূর্বজন্মের সুকৃতি, একাগ্র ধ্যান নিষ্ঠা ও পূর্বজন্মের অনুশীলন ছাড়া ঐ বস্তু সহজলভ্য নয়। যাঁরা সত্যকার পরম পথের পথিক, তাঁরা সত্যই শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র। তাঁদের সাধনোপযোগী অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজের কর্তব্য, না করলে প্রত্যবায়, কিন্তু ঋষি সেবিত ভারতবর্ষে ধর্মে মানুষের নিষ্ঠা আছে বলে একদল লোক তার সুযোগ নিয়ে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করবে — এটা কিছুতেই সহ্য করা যায় না।

আমার এই কথায় কুমুদরঞ্জনের মত শান্ত, সৌম্য, ভক্ত যেন দপ করে জ্বলে উঠলেন। চোখে মুখে তখন তাঁর স্পষ্ট বিরক্তির চিহ্ন। অত্যন্ত উচ্চ কণ্ঠে বললেন ভিখারী তুমি কাকে বলছ। তুমি কি করে জানলে যে ঐ সব বাউলদের মধ্যে কোন বামাক্ষেপা নাই! কে সাধু কে অসাধু তা কি তাঁর কোন বাহ্যিক আচরণ দেখে চেনা যায়? সাধু আর অসাধু তা নির্ধারণের মাপকাঠি কি? রাজনীতিকদের সার্টিফিকেটের জোরে কি সাধু অসাধুর বিচার হবে? ভগবানের নামে এঁরা ঘর ছেড়েছেন, 'ভগবান' নাম মুখে নিয়েই এঁরা জীবন কাটাচ্ছেন। সবাই হয়তো সিদ্ধ হতে পারেন নি, কিন্তু পথে ত বেরিয়ে পড়েছেন, চলেছেনও, পথ চলা ত বন্ধ হয়নি। কয়লা তো আগুনে পুড়লে এক মুহূর্তে পরেই জ্বলন্ত অঙ্গারে পরিণত হয়। সাধুদের ধরে ধরে রাস্তা ঘাট বা কলকারখানা বানানোর কাজে লাগানো আর শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাদাম ভেঙে খাওয়ার একটি মাত্র নাম দেওয়া যেতে পারে — ধৃষ্টতা।

আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের সনাতন ধারায় তাঁর অন্তরসত্ত্বা এইরকমভাবে অভিস্নাত ছিল বলেই অক্লান্তভাবে তিনি তাঁর কাব্যে ভক্তিসিদ্ধ ভাষায় আবেগ ও নিষ্ঠাভরে আমাদের লোকজীবন সংস্কৃতির এত মহিমা কীর্তন করতে পেরেছিলেন। ১৯৭০ সালে ১৪ই ডিসেম্বর কবির দেহান্ত হয়। কবি.ও আমার একটি পত্রালাপ শেষ খন্ডের পরিশিষ্টে প্রদত্ত হবে।

তিনি হিন্দী উর্দু পুস্তু মাতৃভাষার ন্যায় বলতে পারতেন। খুবই ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষ, বাইরে কঠোর হলেও হৃদয় ছিল খুবই কোমল। তিনি সর্বদা তামাক খেতেন। আমি তামাক খাই না শুনে বাবার জনৈক বন্ধু বলেছিলেন — 'তোমার বাবা যে তামাক খান তার ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তোমাদের তিন পুরুষ কেটে যাবে।'

কথার মাঝখানেই কবি একবার বললেন এই দেখ তোমাকে কেবলই ব্যক্তিগত কথা শোনাচ্ছি। কিন্তু কি করি বল, দরিদ্র পূজারী যেমন বড় বড় দেবতা অপেক্ষা তার গৃহদেবতার কথা বলে এবং তাঁর মহিমা প্রচার করে আনন্দ পায়, আমিও তেমনি আমার মা বাবার কথা বলতে আনন্দ পাই।

আমার মা অত্যন্ত ধর্মবতী ছিলেন। তাঁকে ভক্তিমতী এবং পুণ্যময়ী বলে সকলেই ভক্তি ও সম্মান করতেন। মা-ই ছিলেন আমার জীবনের সর্বস্ব। প্রতিদিন তুলসীমূলে এমন ভক্তিসহকারে প্রণাম করতেন যে মনে হত তাঁর প্রত্যেকটি প্রণাম শ্রীভগবানের চরণে গিয়া পড়ছে — রাঙা চরণ আরো রাঙা হয়ে উঠছে।

মা বাবা যখনই কাশ্মীর হতে আসতেন আমি বর্ধমান ষ্টেশন গিয়া সারা দিনরাত অপেক্ষা করতাম। মা বাবা এসে পৌঁছালেই আমার বুক আনন্দে নেচে উঠত, আমার মনে হত ষ্টেশন যেন নব কলেবর ধারণ করেছে। আজও বর্ধমান ষ্টেশনে গেলে মা-বাবার যুগলমূর্ত্তি এবং ষ্টেশনে অবতরণ ইত্যাদির দৃশ্য জীবন্ত হয়ে ভেসে ওঠে। কিন্তু হায়,

আজিকে আমি যে আশ্রয়হীন মাতৃ-পিতৃহারা,
কাতর কণ্ঠে মা বলিয়া ডাকি — আর ত পাইনে সাড়া
আসে যায় ট্রেন ব্যাকুল নয়নে তেমনি তাকায়ে থাকি
হয়ত হেরিব সে পুণ্যছবি — স্নেহ ছলছল আঁখি।
জ্ঞান ত এখন অনেক বেড়েছে — বেড়েছে বয়ঃক্রম
এখানে এলেই ছেলে হয়ে যাই — করি যে তেমনি ভ্রম।
দেখিয়া হাসেন মাতাপিতা মোর — আজিকে স্বর্গবাসী
বর্ধমানের ইষ্টেশনটি বড্ডই ভালবাসি।

কবিতাটি বলতে বলতে কবির চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল। তিনি যেন আত্মহারা। একটি খাতা খুলে আমাকে বললেন, এই দেখ মার ধ্যান করতে করতে এই কবিতাটি লিখেছি —

মাগো আমার পুণ্যময়ি, তুমিই আমার জগন্মাতা,
জনম জনম পেলাম তোমার এই করুণা এই মমতা।
গুল্ম হয়ে বসুন্ধরে স্তন্য তোমার টেনেছি গো,
পূর্ণিমা তোর সুধার আদর চকোর হয়ে জেনেছি গো।
পক্ষিনী মা বুঝতে পারি এই বুকেতে তা দিয়েছ,
এক ঠাঁয়ে আজ সব পেয়েছি জনম জনম যা দিয়েছ।
বৎস হয়ে শ্যামলী তোর সাথে সাথে ছুটেছিলাম,
হরিণ শিশু তোমার সাথে কোথায় তৃণ খুঁটেছিলাম।
তুমি ভীমা ভয়ঙ্করী, তুমি আমার ডাকিনী মা,
উষ্ণতা এই রক্তে দিলে দুগ্ধ তোমার বাঘিনী মা।
শবরী মা, আঁচল দিয়ে বুকে আমায় বেঁধেছি গো,
দুঃখিনী মা আমায় নিয়ে ভিক্ মাগিয়া কেঁদেছ গো।
দোলনাতে মা জনম জনম তুমিই আমায় দোল দিয়েছ,
আমি যখন কুসুম কোরক লতা হয়ে কোল দিয়েছ।
আমার লাগি প্রাসাদ রচি আপনি থাকো শ্মশানে মা,
চণ্ডী হয়ে আমার লাগি তুমিই ছোট মশানে মা।
তোমার ডাকে চাঁদ আমারে টিপ দিয়ে যায় বরণ করি,
সাঁঝের প্রদীপ লয় মা আমার আলাই বালাই বরণ করি।

জনম জনম মা হয়েছ, জনম জনম হবেও মা
ডাকবে আমায় স্তন্য তোমার, আমার কাজল, তোমার চুমা।

মাতৃচিন্তায় বিভোর কবির বাক্‌রোধ হল। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে বসে থাকলেন। দরবিগলিত অশ্রু। মনে হচ্ছিল তিনি মা বাবাকে প্রত্যক্ষ করছেন। ১৩৪২ সালে তাঁর মাতৃদেবীর গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে। দীর্ঘকাল পরেও তাঁর মর্মদেশের মণিকোঠায় মায়ের স্নেহ বিহ্বল করুণা ছলছল মূর্ত্তি খানি অম্লান রয়েছে। সাধারণতঃ এই নির্মম সংসারে জীবিতকালে মাতাপিতার প্রতি যাঁর অপার ভালবাসা দেখা যায় তিনিও পরে কালের নিয়মে পুত্রপৌত্রাদি বেষ্টিত হয়ে তাদের প্রতিই বেশী আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শ্রদ্ধা-ভক্তি হয়ত ঠিকই থাকে কিন্তু যার নাম ভালবাসা সেই আকুলভরা পাগলকরা টানটুকু ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসে, হৃদয়ের সেই পবিত্র পদ্মমধু অন্য স্থলে অর্পিত হয়। কিন্তু কবির ধন্য মাতাপিতৃভক্তি।

বেদে আছে — মাতৃদেবা ভব। পিতৃদেবা ভব। পরবর্তীকালে অনেক যত্নে এই মন্ত্রের সাধন আমি পেয়েছি। কিন্তু মাতাপিতাই যে জীবন্ত ঈশ্বর, অসীমের সসীম রূপ, সচল প্রকট মূর্ত্তি, মন্ত্রের জ্বলন্ত দীক্ষাবীর্য এই কবির কাছেই আমি প্রথম লাভ করি।

কবির কাছ হতে বিদায় নিয়ে আসার পূর্বে আমি তাঁর কাছে অনুরোধ করি আমার ডায়েরীতে কিছু লিখে দিতে। কবি সানন্দে লিখে দেন —

লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম হই আমি যেন হইগো হিন্দু,
যার দেবাগার শ্যামল পাহাড়, যার দেবাসন সুনীল সিন্ধু,
দেবতার নামে হয় নিশিভোর, দেবতার নামে প্রভাত কৃত্য,
দেবতার নামে শত্রু মিত্র, পুত্র কন্যা, প্রভু ও ভৃত্য।
তীর্থ যাহার নদ-নদী কূলে, অতল সাগরে, অচল শৃঙ্গে
হরিনাম যার কুঞ্জে কুঞ্জে, গায় প্রতিদিন বিহগ ভৃঙ্গে।
যোগবলে লভি বিপুল শক্তি, চাহে না যে রাঙা চরণ ভিন্ন,
দেবতা যাহার বহেন বক্ষে, নিয়ত ভকত-চরণ চিহ্ন।
দেবময় যার অনল, অনিল, প্রখর তপন, শীতল ইন্দু
লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম, হই যেন আমি হইগো হিন্দু।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ১লা মার্চ বর্ধমান জেলার উজানিতে কবির জন্ম হয়। গ্রামখানির বর্তমান নাম - কোগ্রাম।

১৯০৫ সালে বি এ পাশ করে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে 'বঙ্কিমচন্দ্র স্বর্ণপদক' লাভ করেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি বর্ধমান জেলারই মাথরুণ স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে কাজ করেন। ছাত্রদের কাছে যেমন তিনি আদর্শ শিক্ষক, গ্রামের মানুষরাও তাঁকে তেমনি অত্যন্ত কাছের মানুষ একান্ত আপনজন বলেই ভাবতেন। তাঁর মাথায় অবিশ্রস্ত চুল, গলায় তুলসীমালা, মুখে স্মিত হাসি এবং ব্যবহারে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবোচিত দৈন্য দেখলে তাঁকে প্রথম দর্শনেই একজন সাধক বলে মনে হত।

শুধু মনে হওয়া নয়, কার্যতঃ তিনি সাধকই ছিলেন, বৈষ্ণব সাধক। তাঁর যে কোন একটি কাব্যগ্রন্থ পড়লেই অনুভব করবেন যে তাঁর কাব্যের মূলে আছে বাঙ্গালীর জাতিগত একটি বিশিষ্ট ভাব সাধনা — বৈষ্ণব সাধনার প্রভাব। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের মত তাঁর মন প্রাণও ছিল প্রেম ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। বৈষ্ণব কবিদের কবিতাতে যে প্রাণের আর্তি ও আকুলতা লক্ষ্য করা যায় সেইরকমই সহজ ভাষায় প্রাণের ভাষায় কুমুদরঞ্জনের ভক্তিরসাশ্রিত কবিতাগুলিও রূপ পরিগ্রহ করেছে। বৈচিত্র্যে, ছন্দে, উপমা-অলঙ্কারে, গীতি-কবিতার মত সুরমাধুর্যে এবং আন্তঃসৌন্দর্যে সেই একই ভক্ত প্রাণের উৎসার। কবি যে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের একজন যোগ্য উত্তরসাধক সে কথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে। কবির জীবন-বেদ এবং কাব্যের বিষয়বস্তু যদি চিন্তা করা যায় তাহলে মনে হবে কবির জীবন যেন একটি ছোট্ট নদীর ধারা কুলুকুলু ধ্বনিতে বয়ে চলেছে আর এই ধারা এমনই অভিনব যে এর দুই ধারে শুধু ফুলের সৌরভ, বাঁশ ঝাড়ের আন্দোলন, তুলসী-মঞ্জরীর গন্ধ, আর চাষাভুষো আউল বাউল প্রভৃতি সরল মানুষের আনাগোনা। বহুমূল্য স্বর্ণ বা হীরকখচিত অলঙ্কার কিংবা পদ্ম, গোলাপ, কুমুদ, কেতকী, কহ্লার, চম্পক, যুথী মল্লিকা এবং কন্দফুলের অজস্র মাল্যসম্ভারের মধ্যেও

একটি তুলসী বা বচমালা থাকলে পবিত্রতাগুণে যেমন তার একটি আলাদা মহিমা থাকে তেমনি সত্যি কথা বলতে কি রবীন্দ্রযুগে জন্মেও রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের মধ্যে বাস করেও কুমুদ প্রতিভার স্নিগ্ধ দ্যুতি লক্ষ্য করার মত। আন্তরিক ভক্তি প্রবণতা এবং পৌরাণিক ঐতিহ্যে লালিত সরল জীবন বিশ্বাসই কুমুদ কাব্যের প্রাণ। তাঁর কবিতাগুলির ভাব ভাষা অনুধ্যান করলেই মনে হয় গ্রাম বাংলার ছায়া শীতল কোন এক তুলসী মঞ্চ, হরি মন্দির বা মাধবীকুঞ্জে বসে এক বাউল একতারা বাজিয়ে চলেছেন। কবিশেখর কালিদাস রায়ের ভাষায় — 'তিনি (কুমুদরঞ্জন) যেন বৃন্দাবনী সুরে মনের আনন্দে গোপীযন্ত্র গাব্‌গুবাগুব্' বাজিয়েছেন কাব্যের সর্বত্র। কবি সম্বন্ধে কবি-বন্ধুর এই চিত্রকল্প বর্ণনা অত্যন্ত সার্থক।

কুমুদরঞ্জন বৈষ্ণব কবি এবং বাউলদের ঘরানা হলেও গ্রাম-বাংলার কবি হিসাবেই তিনি বিশিষ্টতম। কবি মোহিতলাল মজুমদারের ভাষা — 'বাংলার মাটি হোল বাংলার হৃদয় ধর্ম, বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে যদি এদেশের কোন কবির কাব্যের গভীর সংযোগ না থাকে, তবে তিনি বিশ্বকবি হতে পারেন — বাংলার কবি নন। কুমুদরঞ্জনই বাংলার আসল কবি।' নগর-কেন্দ্রিক সভ্যতার সর্ববিধ চাকচিক্য ও আড়ম্বর হতে বহু দূরে নদীমাতৃক গ্রামাঞ্চলের পথে পথে যে স্নিগ্ধলাবণ্য ছড়িয়ে আছে কুমুদরঞ্জন ছিলেন সেই দূরায়ত গ্রাম-জীবনের কবি।

পল্লীপ্রেমিক কবি সারাজীবন গ্রামে কাটিয়েছেন। জন্মভূমি এবং জন্মভিটার প্রতি তাঁর এতই অবুজ বালকের মমতা ছিল যে বারবার অজয় তাঁর ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ভদ্রাসনকে, পুত্রকন্যা নিয়ে নিজের ভিটাতে তাঁবুতে বাস করেছেন তবুও শত আবেদনে নিবেদনেও অজয়ের তীর ছেড়ে যান নি। গ্রামের অশ্বত্থ, বট, আম, জাম এমনকি ভাঁট কলসীটিও তাঁর প্রিয় ছিল। গ্রামের চাঁদ, জোনাকি, জ্যোৎস্না, আলো-অন্ধকার, এমন কি ডোবা-পুষ্করিণী, দীঘি সব কিছুরই প্রতিই ছিল তাঁর অপার মমতা। গ্রামের শালিক,'বউ কথা কও' পাখীর ডাক, গৃহ-কপোতের অবিশ্রান্ত কুজন, 'ঝিঁঝির ডাক' — সবই তাঁর কানে মধু ঢালত। তাঁর অজস্র কবিতায় এগুলির অপূর্ব সুন্দর চিত্ররূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন — সে সব চিত্র শুধু রেখায় স্পষ্ট নয়, রঙেও উপভোগ্য। গ্রাম এবং গ্রামের দৃশ্য নিয়ে তিনি যত কবিতা লিখেছেন সেগুলি পড়লেই মনে হয়, তাঁর কবিতা রচনা কেবল শব্দ, ভাব ও ভাষা দিয়ে মালা গাঁথা নয় — যেন দেবার্চনা। গ্রাম তাঁর কাছে জড় প্রকৃতি ছিল না। গ্রাম ছিল তাঁর কাছে একটি জীবন্ত সত্ত্বা-মা। গ্রাম সম্বন্ধে তাঁর হৃদয়ের গভীর ও অকপট অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর একটি পত্রে। তিনি তাঁর এক গুণগ্রাহী বন্ধুকে লিখেছিলেন — "প্রাচীন অশ্বত্থ ও বটবৃক্ষগুলি পল্লীর সম্পদ, তাহাদিগকে আমি গ্রামের সম্ভ্রান্ত প্রাচীন বুনিয়াদী জীবন্ত অধিবাসী বলে মনে করি। বর্ষায় অজয়ের বন্যা, অন্য সময়ে তাহার লহরীমালার নৃত্য, এমন কি তাহার ধূসর বালুচর দেখিয়া আমি ক্লান্ত হই না। দিনের পর দিন দেখি।"

এ কয়টি কথার মধ্য দিয়েই তাঁর কবিমানস পরিস্ফুট। অন্যত্রও তিনি গেয়েছেন —

দীনকবি আমি, যা চাই পেয়েছি, ধূলিধূসরিত পল্লীগ্রামে
শঙ্খ-ঘন্টা খোল করতালে শুনি হরিনাম ডাইনে বামে,
জল-বাহু দিয়ে ঘিরে আছে নদী ফুলে ফলে বাড়ী ভরিয়া আছে,
পেয়েছি কান্তিমতী বসুমতী শান্তিতে আছে মায়ের কাছে।

পল্লী-জননী সম্বন্ধে তাঁর উক্তি স্তববাক্য — 'তিনি বিশ্বাস তিনি নিঃশ্বাস, তিনিই মা রাজরাজেশ্বরী।'

গীতোক্ত একভক্তিবিশিষ্ট একান্ত ভক্ত যেমন ভগবানের লীলানুধ্যানে সারাজীবন আনন্দে কাটিয়ে দেন কবি কুমুদরঞ্জনও তেমনি পল্লীপ্রকৃতির রূপরসে সারাজীবন আত্মনিমগ্ন ছিলেন।

এই রসদৃষ্টির ফলেই পল্লীর ছোট-সুখ, ছোট কথা, ছোট দুঃখ, ছোট ব্যথা — সামান্য তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় তাঁর চোখে অপরূপ রূপে ধরা পড়ে ছিল। শ্রদ্ধার রসে নিষিক্ত করে গ্রাম বাংলার লোকজীবন সংস্কৃতির পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নানা বিষয় তাঁর কবিতাকে দিয়েছে এমন বিরল সৌন্দর্য যা মুহূর্তে পাঠকের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে তৃপ্তি দেয়, আনন্দ রসে ভরিয়ে তোলে। এদেশে মাটির মধ্যে যে কোমলতা, তরুলতার মধ্যে যে শ্যামলতা (শ্যামল সৌন্দর্য) এবং বাতাসের মধ্যে যে স্নিগ্ধতা তাই যেন সঞ্চারিত হয়েছে কবির কাব্যে। তাই তাঁর যে কোন একটি কবিতা পড়লেই মনে হবে একটি বর্ণবিরল সুগন্ধিফুল নিজের সহজ সৌন্দর্য এবং সুবাসে

কখন আমাদের মন হরণ করে নিয়েছে।

হঠাৎ সমগ্র বনভূমিকে প্রকম্পিত করে গুড় গুড় কড়াৎ করে এক ভয়ঙ্কর শব্দ হল। ভাবলাম, বনের মধ্যে হয়ত কোন পশুরাজের হুঙ্কার, কিন্তু হঠাৎ চোখে বিদ্যুত ঝলসে উঠতে বুঝলাম মেঘের শব্দ, বাইরে সোঁ সোঁ বাতাসের শব্দে ঝড়ের আভাষ পেলাম। একটু পরেই প্রচণ্ড বৃষ্টি নামল। রঞ্জন বলল — কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হল। বৃষ্টির চেয়ে মেঘের গর্জন অনেক বেশী। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে। মনে হচ্ছে আজ রাতেই যেন প্রলয় ঘটবে। মড়্মড়্ শব্দে গাছের ডাল ভেঙে পড়ছে, বড় বড় বনস্পতির পতনেরও শব্দ পাচ্ছি। প্রায় দু'ঘন্টা পরেই বৃষ্টি থেমে গেল, ঝড়ের বেগও শেষ হল।

হরানন্দজী মন্দিরের দরজা খুলে বাহিরের দিকে তাকিয়ে বললেন — অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। প্রকৃতি কিরকম শান্ত রূপ ধারণ করেছে দেখুন। এত যে ঝড়বৃষ্টি হল কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বেশ গরম পড়েছিল। আজ রাতে ভালই ঘুম হবে। এই বলে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন।

আমার ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙলো তখনও নিবিড় অন্ধকারে ঢেকে আছে মহারণ্য, গাছপালা নর্মদা পাহাড় কোন কিছুই আর চোখে পড়ছে না। নানারকম শব্দ মন্দির গাত্রে যেন স্পন্দন তুলছে, দেওয়াল ভেদ করে আমার কানে এসে বিঁধছে। উঠে বসলাম। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম সেই শব্দের ভাষা কোন বুঝতে পারি কিনা। বুঝলাম মহারণ্যের নিজস্ব সঙ্গীত আছে, মহারণ্যেরও একটা রূপ আছে, ভাষা আছে; অরণ্য-প্রকৃতির সোঁ সোঁ শব্দ ক্রমশঃ ওঁকার-নাদে পরিণত হয়ে গেল।

কখন যে আবার ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই, সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন দেখি পুরোহিতজী মন্দিরে পূজার আয়োজন করছেন। আমার সঙ্গীরা সবাই নর্মদার ঘাটে গেছেন স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। মন্দিরের বাইরে এসে চুপচাপ বসে থাকলাম। দিনের বেলায় মহারণ্যের মনোহারিণী রূপ, অপরূপ সবুজের সমারোহে সে যেন এক উদ্ভিন্ন যৌবনা নারী-ঢলঢল ললিত লাবণ্যে ভরা। কখনও বা তার অন্য রূপ — যেন এক ধ্যানগম্ভীর তাপসী, রৌদ্রে সাজে সেজে রুদ্রাণীর রূপ নিয়েছে।

প্রাতঃকৃত্যাদি শেষে নর্মদাতে স্নান করতে নামলাম। স্নান সেরে গোটা কয়েক বনফুল হাতে নিয়ে মন্দিরে ঢুকলাম। পূজা সাঙ্গ হতেই পুরোহিতজী বললেন — জঙ্গলে বাস করলেও সংসারী লোকের হাতে সাধুদের পরিত্রাণ নেই। তাই প্রাচীনকালে ঋষিরা নির্জন গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন সেরকম কয়েকটি গুহা আমি আপনাদের দেখিয়ে নিয়ে আসব।

কাওয়াডোল, বরাবর এবং নগরযোনি নামে বিখ্যাত, গ্রানাইট পাথরের তৈরী এই পাহাড়গুলির মধ্যেই ঐ গুহাগুলি অবস্থিত। এগুলি দু হাজার বৎসর পূর্বের প্রাচীন বৌদ্ধ ভগ্নাবশেষ বলে মনে হয়। গুহাগাত্রে মাহারাজ অশোকের কয়েকটি শিলালিপি দেখে মনে হয়, এগুলি তাঁর সময়ে নির্মিত হয়েছিল। কাওয়াডোল পাহাড়ের ৩ মাইল উত্তর-পূর্বে পাহাড়টির নাম বরাবর, এর সংস্কৃত নাম প্রবর গিরি। এই পাহাড়ের মধ্যে চারটি গুহা এবং নিকটস্থ নগরযোনি পাহাড়ে তিনটি গুহা — এই সাতটি গুহা আছে বলেই এর অপর নাম সাতঘর। বৌদ্ধযোগীদের জন্য মহারাজ অশোক এবং তার পৌত্র দশরথ এইগুলি ক্ষোদিত করে ছিলেন বলে মনে হয়। তারপর তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে শার্দুল বর্মা এবং অনন্ত বর্মা নামে দুজন হিন্দু রাজা সেখানে কাত্যায়ণী এবং শিবলিঙ্গ স্থাপন করেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে ভয়ঙ্করনাথ নামে এক যোগী এখানকার একটি গুহাতে বাস করতেন। গুহাগাত্রে তাঁর নাম ক্ষোদিত আছে।

১) কর্ণবোপর গুহা — এই গুহাটি দৈর্ঘ্যে ৩৪ ফুট এবং প্রস্থে ২৪ ফুট। গুহার পশ্চিম কোণে একটি বেদী আছে, বেদীর গায়ে আছে একটি শিলালিপি। প্রাচীন পালি ভাষায় সেখনে যা লেখা আছে তার অর্থ — 'অশোক রাজার উনিবিংশ বৎসরে এই গুহা ক্ষোদিত এবং উৎসর্গীকৃত হয়।' এ ছাড়াও পালি ভাষায় বোধিমূলম্, দরিদ্র-কান্তার, কর্মচণ্ডাল, মহীত্রাণসার, বিকটতুঙ্গশিব, এই কয়েকটি কথাও ক্ষোদিত আছে দেখেছি।

২) সুদাম গুহা — পূর্বোক্ত গুহার পশ্চিম দিকে এই গুহাটি অবস্থিত। আকারে বৃহত্তর। এর প্রবেশ দ্বারে পালিতে লেখা আছে, 'এজনা পিয়দশিনা দুবারিস বসাভা' অর্থাৎ প্রিয়দর্শী অশোক রাজার রাজত্ব কালে দ্বাদশ বর্ষে — বাকি কথাগুলি মুছে গেছে, পড়া যায় না।

৩) রোমশ-ঋষি গুহা — বৌদ্ধ যুগের পূর্বে পুরাণ বর্ণিত রোমশ ঋষি এখানে তপস্যা করতেন। এই গুহা গাত্রেও পালি অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় কতকগুলি শ্লোক থেকে জানা যায় বৌদ্ধ যুগের শেষে হিন্দুরাজা যজ্ঞবর্মার রাজত্ব কালে তাঁর পৌত্র অনন্ত বর্মা এখানে কৃষ্ণ মূর্তি স্থাপন করেছিলেন।

৪) বিশ্বামিত্র গুহা — অন্যান্য গুহাগুলির তুলনায় এটি অপেক্ষাকৃত ছোটো। সুদাম গুহার অনুরূপ শ্লোক এখানেও পালি ভাষায় ক্ষোদিত আছে।

৫) নগরযোনি গুহা — বরাবর পাহাড়ের উত্তর পূর্বে দিকে একটি ছোট পাহাড়ের উপর এই গুহাটি অবস্থিত। এটি বৃহত্তম। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৭ ফুট, প্রস্থ ১৯ ফুট এবং উচ্চতা ১১ ফুট। গুহাচিত্র অতিশয় মসৃণ। এখানকার শিলালিপি দৃষ্টে বোঝা যায়, অশোকের পৌত্র দশরথ বৌদ্ধ যোগীদের জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন। এর প্রাচীন নাম গোপীকা কুভা বা গোপীকা গুহা। সস্কৃত ভাষায় পালি অক্ষরে লিখিত অপর একটি শিলালিপিতে এখানে একথাও লেখা আছে যে, 'স্বধর্মনিষ্ঠ রাজা অনন্তবর্মা এই স্থানে কাত্যায়নী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।' মুসলমানদের রাজত্বকালে এখানে একজন পীর সাহেব বাস করতেন। কোন মুসলমান রাজা তাঁর বসবার জন্য একটি বেদী নির্মাণ করে দিয়েছিলেন, সেটি এখনও বর্তমান।

৬) বাপিয়া গুহা — নগরযোনী পাহাড়ের উত্তর দিকে একটি উঁচু টিলার উপর অবস্থিত এটি একটি ছোট গুহা। একজন মাত্র যোগীর বাসোপযোগী। গুহার নিকটে বহু প্রাচীন একটি কূপও আছে। তার জল আজও স্বচ্ছ এবং সুপেয়। দশরথের ক্ষোদিত লিপি ছাড়াও এখানে আরও অনেকগুলি শিলালিপি আছে। তার একটিতে লেখা আছে — 'আচার্য শ্রীযোগানন্দঃ প্রণমতি সিদ্ধেশ্বরম্', স্পষ্টতঃই বুঝা যাচ্ছে, যোগানন্দ নামে কোন সিদ্ধ যোগী এখানে তপস্যা করেছিলেন।

৭) বদাতি-কা-কুভা — পূর্বোক্তি বাপিয়া গুহার সন্নিকটস্থ এই গুহারও নির্মাতা রাজা দশরথ। এখানেও যথারীতি হিন্দু রাজা অনন্ত বর্মা বুদ্ধমূর্তি উঠিয়ে দিয়ে শিবলিঙ্গ স্থাপন করেছিলেন।

প্রত্যেকটি গুহাই তপস্যার উপযুক্ত ক্ষেত্র। নির্জন পাহাড়ের কোলে অবস্থিত এই গুহাগুলিতে কোন লোক আসে না বললেও চলে। শিলালিপির বর্ণনা থেকে আশা করি বুঝতেই পারছেন বৌদ্ধ, হিন্দু বা মুসলমান যে ধর্মভুক্তই হোক না কেন, কেবল সিদ্ধিযোগীরাই এখানে বাস করে গেছেন।

আমি গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের কোলে একটি বিচিত্র গুহা দেখেছি। প্রকৃতির হাতে তৈরী এরকম প্রস্তর নির্মিত সুন্দর গুহা ভারতবর্ষে আর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নাই। বস্তুতঃ এই গুহা পাহাড়েরই অংশ। গুহার তলদেশস্থ প্রস্তরময় মেঝে সংলগ্ন দু'ফুট দীর্ঘ এবং একফুট নয় ইঞ্চি চওড়া একটি ছোট্ট দরজা দিয়ে এই গুহার মধ্যে প্রবেশ করতে হয় — ভিতরের প্রকোষ্ঠটির দৈর্ঘ্যে ৮ ফুট, প্রস্থ ৮ ফুট এবং উচ্চতা ৭ ফুট। এই প্রকোষ্ঠের দক্ষিণ দিকে মেঝে সংলগ্ন আর একটি ২ ফুট দীর্ঘ এবং ১ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া দরজা রয়েছে। তার মধ্যে প্রবেশ করলে আর একটি ঘর। সেই ঘরের খাড়া পাথরের দেওয়ালের উপরিভাগে পূর্বোক্ত পরিমাপের আর একটি ছোট্ট প্রবেশ দ্বার আছে। সেই দরজা দিয়ে ঢুকলে দোতলাতে আর একটি ৮ ফুট দীর্ঘ, ৮ ফুট প্রস্থ এবং ৬ ফুট উচ্চ প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এই তিনটি প্রকোষ্ঠ সমন্বিত গুহাটি ছিল মহর্ষি কপিলের সাধন পীঠ। শতাধিক বৎসর পূর্বে পরমযোগী শ্রীশ্রীগম্ভীরনাথজী এই গুহাতেই তপস্যামগ্ন ছিলেন। পরে, এখানে তাঁর নিবাসকালেই তাঁর সঙ্গে এসে মিলিত হন কর্ণালের মহাযোগী শ্রী সহজগিরির শিষ্য শ্রী রতনগিরি মহারাজ। এঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল প্রতাপ সিংহ, পাঞ্জাবের নাভা পাতিয়ালা স্টেটের রাজকুমার। তিনিও দীর্ঘকাল এই গুহাতে সাধনা করে গেছেন। গুহার সম্মুখে একটি বেদী আছে তার নাম ভৈরবী বেদী। গম্ভীরানাথজী, রতনগিরি মহারাজ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এবং পওহারী বাবা — এই চারজন মহাপুরুষ এই বেদীতে বসে নিজেদের মধ্যে ইষ্টগোষ্ঠী এবং সদালাপ করতেন। বর্তমানে এই গুহাকে কেন্দ্র করে কপিলধারা আশ্রম গড়ে উঠেছে। সিদ্ধযোগীদের ধ্যান-গুহা এখন জনকল্লোলে মুখরিত!

বিচিত্র গুহা দেখে ফিরে আসার পথে রঞ্জন গুণগুণ করে গান ধরল —

যার দেবাগার শ্যামল পাহাড়, যার দেবাসন সুনীল সিন্ধু,
দেবতার নামে হয় নিশিভোর, দেবতার নামে প্রভাত কৃত্য,
দেবতার নামে শত্রু মিত্র, পুত্র কন্যা, প্রভু ও ভৃত্য।

তীর্থ যাহার নদ-নদী কূলে, অতল সাগরে, অচল শৃঙ্গে
হরিনাম যার কুঞ্জে কুঞ্জে, গায় প্রতিদিন বিহগ ভৃঙ্গে।
যোগবলে লভি বিপুল শক্তি, চাহে না যে রাঙা চরণ ভিন্ন,
দেবতা যাহার বহেন বক্ষে, নিয়ত ভকতচরণ চিহ্ন।
দেবময় যার অনল, অনিল, প্রখর তপন, শীতল ইন্দু
লভি যদি পুনঃ মানব জন্ম, হই যেন আমি হইগো হিন্দু।

— কাল থেকে আপনার মুখে আপনাকে লেখা কুমুদরঞ্জনের কবিতা আমার মনে অলোড়ন তুলেছে। যদিও আমি দর্শনশাস্ত্রে বি. এ. পাশ করেছি তবুও দুরূহ দর্শনতত্ত্ব বুঝতে হলে যে পরিমাণ নিষ্ঠা এ অনুসন্ধিৎসার প্রয়োজন তার অবকাশ আমি পাই নি। আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতই শুধু প্রাণধারণের ও দিন যাপনের গ্লানিতে কাটলেও তবে বংশগত ঐতিহ্য এবং জন্মগত সংস্কারের বশে হিন্দুধর্ম এবং সংস্কৃতির উপর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা পোষণ করি। হিন্দু ভারতবর্ষে হিন্দু হয়ে জন্মেছি বলে যথেষ্ট গৌরববোধ করি। ছাত্রজীবন থেকেই একটি প্রশ্ন আমার মনে বার বার পীড়া দেয়, সেটি ঐ হিন্দু শব্দটি নিয়ে। ইতিহাসে পড়েছি আমাদের পূর্বপুরুষরা সিন্ধু নদীর তীরে বাস করতেন বলে আমাদেরকে হিন্দু বলা হয় এবং মুসলমানরা নাকি হিন্দু অর্থে কাফের এবং কালো আর ইংরাজরা নাকি Heathen এবং Black Native অর্থে অবজ্ঞা ভরেই আমাদের 'হিন্দু' অভিধা দিয়েছে। এখন আমার প্রশ্ন — বিদেশীদের প্রদত্ত ঐ কদর্থব্যঞ্জক শব্দটি আমরা আবহমানকাল ধরে কেন বহন করে আসছি? সিন্ধু নদ থেকেই যদি হিন্দু বা হিন্দু ধর্মের নামকরণ হয়ে থাকে, বিদেশীদের নামকরণ পূর্বে সিন্ধুতীরবাসীরা নিজেদেরকে কি নামে এবং কোন্ ধর্মাবলম্বী বলে পরিচয় দিত? নিশ্চয় আত্মধর্ম এবং আত্মজাতির পরিচয় দানের জন্য তারা আদিতে একটা নাম ব্যবহার করতেন, সেটি কি? কেনই বা এবং কখন তাঁরা সেই আদিনাম পরিত্যাগ করে পরদত্ত নাম দ্বারা নিজেদের পরিচয় দিতে আরম্ভ করলেন? হিন্দুধর্মের প্রচারক কে? প্রতিষ্ঠাতাই বা কে? সংস্কৃতে কি হিন্দু শব্দ আছে? আমরা জানি ভৌগোলিক স্থান বা বস্তু যথা দেশ নদী সাগর পর্বত প্রভৃতি নাম হতে ধর্মের নামকরণ হয়ে থাকে — যেমন শিব হতে শৈব, সূর্য হতে সৌর, গণপতি হতে গাণপত্য, বিষ্ণু হতে বৈষ্ণব, বুদ্ধ হতে বৌদ্ধ খ্রীষ্ট হতে খ্রীষ্টান ইত্যাদি। এমতাবস্থায় হিন্দুধর্মের বেলাতেই কেবল উপাস্য দেবতা বা ধর্মপ্রবর্তককে বাদ দিয়ে একটা নদী বা পরজাতিদত্ত কদর্থব্যঞ্জক একটা শব্দকে বেছে নেওয়া হল এটি কেমন করে সম্ভব? আমি ইতিপূর্বে এই প্রশ্ন অনেক জ্ঞানী গুণীকেই করেছি, কিন্তু কোন সদুত্তর পাই নি। তাই হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি জানার আগ্রহ আমার বহুদিনের।

প্রথমেই জেনে নিশ্চিত হোন যে পরপ্রদত্ত কদর্থব্যঞ্জক শব্দই আমরা বহন করছি না। হিন্দু শব্দ সংস্কৃতে আছে এবং বৈদিক যুগ থেকে আমরা নিজেদের হিন্দু নাম গূঢ় এবং গভীর অর্থেই ব্যবহার করে আসছি। আমাদের হিন্দু নামের কারণ —

আসিন্ধুসিন্ধুপর্যন্ত্যা যস্য ভারতভূমিকা
পিতৃভূঃ পুণ্যভূশ্চৈব স বৈ হিন্দুরিতিস্মৃতঃ।

অর্থাৎ সিন্ধুদেশ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে সিন্ধু অর্থাৎ সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীর তাবৎ পুণ্য সংস্কার, পুণ্য আচার, পুণ্য অনুষ্ঠান, পুণ্য জ্ঞানের বিমল ধারা যেখানে পিতৃভূঃ অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করেছে সেই পাবন ক্ষেত্রে আমরা বাস করি বলে আমদের পিতৃপুরুষরা নিজেদেরকে হিন্দু নামে অভিহিত করতেন। হিন্দু এবং আর্য শব্দ সমার্থক। বৈদিক যুগে এই পুণ্য ভূখণ্ডের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আর্য বলে পরিচয় দিলেও এবং আর্য শব্দটি তাঁদের কাছে অধিকতর প্রিয় হলেও মনে রাখতে হবে ভারতবর্ষে বৈদিক যুগ এবং বেদ প্রকট হওয়ার পূর্বেও মনুষ্যজাতির বাস ছিল। তাঁরাই আমাদের পূর্বপুরুষ। তাঁরাই হিন্দু। বৈদিক যুগে আর্যদের যে শাখাটি সম্প্রদায়গত বিরোধের জন্য ইরাণে চলে যান, তাঁরা তাঁদের এখানকার জাতিদেরকে হিন্দুই বলতেন। আবার এখানকার অধিবাসীরা বিদেশবাসী জ্ঞাতি ভাইদের বাসস্থানকে আর্যস্থান বলতেন — ইরাণ < ঐড়ান < এরিয়ান < আর্যস্থান। এখন যাঁদেরকে আমরা পারসিক বলি তাঁরা ঐ ঐড়ান বা আর্যস্থানের অধিবাসী।

প্রাচীন পারস্য ভাষায় হপ্তহিন্দু কথাটি রয়েছে। এই হপ্তহিন্দু বেদোক্ত 'সপ্ত সিন্ধু'। প্রাচীন পারসিকরা 'স' উচ্চারণ করতে পারতেন না, তাঁদের ভাষায় 'স' এর উচ্চারণ 'হ'। এজন্য তাঁরা সোমকে হোম, সিন্ধুকে হিন্দু,

সপ্তকে হপ্ত, স্বর (স্বর্গ) কে হুর্ বলতেন। যে কারণে সেই সুপ্রাচীন যুগে আমাদের আদি পূর্বপুরুষরা ইরাণকে বলতেন আর্যস্থান, ঠিক সেই একই কারণে তাঁরাও পূর্বস্মৃতির স্মারক হিসাবে সিন্ধুনদ হতে সমুদ্র পর্যন্ত মূল ভূখণ্ডের অধিবাসী অর্থাৎ আমাদেরকে হিন্দু বলতেন।

ঐ একইভাবে পারসিকদের হাতে হেন্দ > ইন্দাস > ইংরাজদের মুখে ইণ্ডিয়া — এই নামকরণ হয়েছে। কাজেই হিন্দু বা ইণ্ডিয়ান বললে তার মধ্যে আমরা অগৌরবের কিছু দেখি না। পারসিক ভাষাতেও হিন্দু শব্দের কোন দোষাবহ অর্থ নাই।

সত্য বটে, F. Streingah Ph. D প্রণীত A comprehensive Persian English Dictionary (ইংরাজী পারসিক অভিধান) দেখলে সেখানে হিন্দু শব্দে কৃষ্ণবর্ণ, ভৃত্য, ক্রীতদাস, পৌত্তলিক, ঈশ্বর বিশ্বাসহীন ইত্যাদি অর্থ পাওয়া যাবে। কিন্তু একটু বিচার করলেই বুঝা যায়, পারস্য ভাষায় কোন ধাত্বর্থানুসারে, ব্যুৎপত্তি অর্থে হিন্দু শব্দ নিষ্পন্ন নয়, সাহেব বর্ণিত ঐরকম কোন অর্থও হয় না। পারসিক শব্দে 'হিন্দব' বলে একটি শব্দ আছে কিন্তু তা গৌরব ও সম্মান জ্ঞাপক। 'হন্দ্' বলে একটি শব্দ হিব্রুতেও আছে। হন্দ্ শব্দের অর্থ তেজ ও বিক্রম প্রকাশক। হিব্রু ভাষার হন্দ্ শব্দই পুশ্‌তু ভাষায় হন্দ্ রূপ ধারণ করে। অতএব হন্দ্ < হন্দু < হিন্দু। হন্দু হতেই হিন্দু শব্দের উদ্ভব হয়েছে।

কেউ কেউ বলেন আর্যগণ হিমালয় হতে বিন্দু সরোবরের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে বাস করতেন। সেজন্য হিমালয়ের আদ্য অক্ষর 'হি' এবং বিন্দুর শেষ অক্ষর 'ন্দু' উভয়কে মিলিয়ে তাঁরা নিজেদেরকে হিন্দু বলে পরিচয় দিতেন। আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে যে ভাবে গূঢ় ব্যঞ্জনাময় সংস্কৃত শ্লোকাদি রচনার শৈলী প্রচলিত ছিল, তাতে আমরা ঐ যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারি না।

প্রত্যেকেই জানেন, উচ্চারণের বিকৃতিতে সাধারণ জনতার মুখে অনেক মূল ভাষায় একটি লোকায়ত রূপ নেয়, যেমন ধরুন সংস্কৃত হতে তৎকালীন জনতার ভাষা পালি ভাষার জন্ম হয়েছে। তেমনি পূর্বে গান্ধার দেশে (বর্তমান যার নাম আফগানিস্থান) সেখানে লোকে মুখে মুখে উচ্চারণের দোষে সংস্কৃত হতে একটি নূতন ভাষা রূপ নেয়। এর নাম বাখ্‌তারি। এই ভাষার দুটি আঞ্চলিক রূপ ছিল, একটি বিশ্ববিখ্যাত সংস্কৃত আর একটি অবেস্তান। সংস্কৃতের 'স' অবেস্তান ভাষাতে উচ্চারিত হত 'হ'। অবেস্তান ভাষায় সিন্ধু মানে স্বচ্ছ জলের দেশ। পুশ্‌তু ভাষাতেও সিন্দ্ মানে বহু নদী। ভারতবর্ষ নদীমাতৃক — এখানে বহু নদী - হিন্দু নামের এটাও একটা কারণ। বিখ্যাত আফগান ভাষাবিদ্, কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক শ্রী ফল রাবচি পালবাক গবেষণা করে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন।

তবে কেউ যদি বিদ্বেষ বশে কোন জাতিকে তাদের ভাষায় কদর্থে অভিহিত করে তাতে মূল নামে কোন কদর্থ প্রকাশ পায় না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ম্যাকলে (Macanlay) সাহেব তো বাঙালী জাতির অনেক নিন্দা করেছেন, এজন্য কি বাঙালী জাতি দূষিত হয়েছে? মুসলমান রাজত্বের সময় মুসলমানদের গ্রন্থে বা ইংরেজদের রাজত্বের সময় ইংরেজদের গ্রন্থে তারা যদি অন্ধ বিদ্বেষ এবং হিংসা বশে হিন্দু অর্থে Heathen বা কাফের বলে গালি দিয়ে থাকে সেটা তাদেরই নীচতার পরিচয়। সেজন্য হিন্দু শব্দটিতে কোনভাবেই গ্লানি স্পর্শ করে না।

ম্যাকলে সাহেবের সগোত্রদেরকে Tory এবং মুসলমানদের 'ফেরেস্তা' এই শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলেই মুখের মত জবাব দেওয়া যায়। Torry মূল Irish শব্দ Toraidhe শব্দ থেকে এসেছে। এর অর্থ robber বা ডাকাত। কিন্তু ইংরেজরা কি বিজয়ী Irish জাতিপ্রদত্ত ঐ অর্থের জন্য Torry শব্দটিতে দূষিত মনে করেন? ইংলণ্ডের Torry বা Conservative Party ইংলণ্ডের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়েই গঠিত। ঠিক এমনি ভাবে সংস্কৃত প্রেত শব্দটি আরবীতে ফেরেস্তা শব্দে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। আমরা খারাপ অর্থে প্রেত শব্দ ব্যবহার করলেও মুসলমান ভাষায় ফেরেস্তা শব্দ মর্যাদাসূচক। আন্তর্জাতিক ধ্বনি পরিবর্তনের নিয়মানুসারে একই শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কিরূপ রূপ এবং অর্থ পরিবর্তন করে তার কিছু প্রমাণ দিচ্ছি। প্রেত শব্দ আগেই বলেছি আমাদের কাছে নিন্দাবাচক হলেও মুসলমানদের কাছে মর্যাদাসূচক 'ফেরেস্তা', বৌদ্ধদের কাছে 'পেরেস্ত' ইউরোপীয়দের কাছে 'Priest'। 'Priest' শব্দটি আবার 'Preost' এই ফরাসী শব্দ থেকে এসেছে। পুরোহিত শব্দটি আমাদের কাছে কতই না মর্যাদাসূচক। কিন্তু এই শব্দটি অন্য ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন করে কি দশা লাভ

করেছে দেখুন — Purohita<Fulohida<Folohia<Follosi<Follis< ইংরাজীতে Foolish ! দুর্ভাগ্য যে, সম্প্রদায়গত এবং জাতিগত বিদ্বেষের ফলে এক জাতি অন্য জাতির নানা শব্দ নানা অর্থে এইভাবে কুৎসা করে থাকে। আমাদের দেশে এমন কি বৈদিক যুগেও দেব এবং অসুর জাতি একই আর্যজাতির শাখা হলেও উভয়ের মধ্যে যখন দ্বন্দ্ব এবং দ্বেষ তুঙ্গে উঠেছিল তখন অসুর শব্দে কদর্থ আরোপ করেছিলেন। এইভাবেই এক ভাষায় উল্লাস অন্য ভাষায় alas, এক ভাষায় হল-হলা অন্য ভাষায় হলাহল, এক ভাষায় হর হর অন্য ভাষায় horror, এক ভাষায় হরিবোল অন্য ভাষায় horrible এ পরিণত হয়েছে। কাজেই হিন্দু শব্দে বিদেশীরা যে অর্থই আরোপ করুক না কেন আমাদের কাছে হিন্দু শব্দ পরম আদরণীয় শব্দ।

হিন্দু কোন ধর্ম নয়। এজন্য এর কোন প্রতিষ্ঠাতা নাই। হিন্দু কোন জাতি নয়, হিন্দু বলতে কোন সম্প্রদায়কেও বোঝায় না। হিন্দু শব্দের অর্থ উদার বিশ্বজনীনতা, হিন্দু শব্দ সংস্কৃতি বাচক। বেদের মতই এটিকে অপৌরুষেয় শব্দ বলা চলে। প্রাচীন ব্রহ্মাবর্তবর্ষ ভারতবর্ষ তথা হিন্দুস্থান নামক বিরাট ভূখণ্ডে আর্য বৌদ্ধ শৈব গাণপত্য সৌর খ্রীষ্টান, এমন কি মুসলমান প্রভৃতি সকল অধিবাসীরাই হিন্দু নামের যোগ্য —

হীনতা বর্জনকারী মানব নিচয়।
হিন্দু বলে আপনার দেয় পরিচয়।

যিনিই হীনতা ত্যাগ করতে পারবেন — তিনিই হিন্দু। প্রাচীন মেরুতন্ত্রানুসারে এর ধাতুগত অর্থই হল —

হীনঞ্চ দূষয়ত্যেব হিন্দুরিত্যুচ্যতে প্রিয়ে।

ব্যাকরণের নিয়মানুসারে হীন + দুষ-ডু-যে — নিপাতনে। নিপাতনে সিদ্ধ এই পদ পৃষোদরদিত্বাৎ সাধুঃ। রামকোষ নামক প্রাচীন অভিধানেও হিন্দু শব্দের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে,

হিন্দুর্দুষ্টনৃহঃ প্রোক্তোহনার্যনীতি বিদূষকঃ।
সদ্ধর্ম-পালকো বিদ্বান্ শ্রৌতধর্মপরায়ণঃ॥

— অর্থাৎ দুষ্টের দণ্ডদাতা, অনার্য নীতির বিরোধী সদ্ধর্মের পালক ব্যক্তিই হিন্দু।

এইবার হিন্দু ধর্মের কিছু বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলেই আমার বক্তব্য আরও পরিস্ফুট হবে। হিন্দুধর্মের উপদেশ কি? এই জগৎ ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, সকল কিছুর মধ্যেই এক পরম চৈতন্যসত্তা আছেন, তুমি স্বরূপতঃ চৈতন্য কাজেই আত্মানাং বিদ্ধি — নিজেকে জান। ভগবান মনুর উপদেশ —

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যাসত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।

— ধৈর্য্য ক্ষমা, ইন্দ্রিয়-সংযম, বুদ্ধি, বিদ্যা, সত্য প্রভৃতি মানবিক সদ্গুণই ধর্ম। ধৈর্য রক্ষা করবে আবার যেখানে আবশ্যক সেখানে তেজও দেখাবে। ঋষিরাও অন্যায়ের প্রতিকার করতেন, দুর্ধর্ষ বলদর্পী সম্রাটদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেও তাঁরা দ্বিধা করতেন না।

'লোকো বিধ্রিয়তে যেন কুকার্যাৎ কলুষাৎ সদা।
স ধর্ম ইতি বিজ্ঞেয়ঃ সংসার স্থিতিসাধকঃ।

— যে ধর্মের অনুষ্ঠানে কুকার্য ও কলুষতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং সংসারে যেটি স্থিতির কারণ, তাই হিন্দুধর্ম। আমাদের যজুর্বেদের উপদেশ হল — মিত্রস্য চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষান্তাম্। মিত্রের চোখে সকলকে দেখবে, নিজের কল্যাণকে বড় করে দেখো না, ব্যষ্টির কল্যাণে সমষ্টির কল্যাণ, আবার সমষ্টির কল্যাণেই ব্যষ্টির কল্যাণ। এ জগতে প্রত্যেকেই প্রিয়ব্যক্তি বা আপনজনের কল্যাণ চান, কিন্তু যশ্চ মাৎ দ্বেষ্টি লোকেহস্মিন্ সোহপি ভদ্রানি পশ্যতু —যে আমাকে হিংসা করে সেও তোমার মঙ্গলপদ দর্শন করুক, তারও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক — শত্রুর জন্যও এই যে মঙ্গল কামনা, এমন কোন্ ধর্ম শিক্ষা দিয়েছে আমার জানা নাই। ঐ বিশ্বমৈত্রী ও বিশ্বোদর ভাব ভাবনাই হিন্দু শব্দে ব্যঞ্জিত আছে।

অন্যান্য ধর্ম — মতবাদ, কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্ম হল — জীবন, একে উপলব্ধি করতে হয় এবং সেই উপলব্ধি অনুসারে সমগ্র জীবনকে পরিচালিত করতে হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে — হিন্দু ধর্মের উপদেশ এবং উপলব্ধি বাস্তব সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সারকথা হল, যাঁরাই বস্তুর উপাসনা না করে চৈতন্যের উপাসনা করেন এবং প্রাত্যহিক দিনচর্যায় সর্বপ্রকার

হীনতা, এবং হিংসাকে বর্জন করে চলেন, সেইসব সদ্ধর্মপালক ব্যক্তিরাই হিন্দুপদ বাচ্য। এই মহত্তম অর্থেই আমরা হিন্দুনাম ব্যবহার করে আসছি।

রঞ্জন — হিন্দু সন্তান হয়ে এতকাল হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি জানতাম না। বিদেশী ঐতিহাসিক এবং তাঁদের ছায়ানুসরণকারীদের বিকৃত তথ্য থেকে হিন্দু শব্দটির যে কদর্থ সাধারণের মধ্যে প্রচারিত, তা আমার মনকে নিয়ত পীড়িত করে। আপনি হিন্দু শব্দের উৎপত্তি রহস্য সহ হিন্দু ধর্মের সারমর্মটি ব্যাখ্যা করে মহৎ উপকার করলেন।

বেলা একটা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম, আমাদের আস্তানায় — বেদেশ্বর শিবমন্দিরে। 'জয় ভোলে বাবা, জয় শিব শম্ভু' শব্দ শুনে বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি কয়েকজন দেহাতী লোক দুধ, মিছরি এবং নানাবিধ ফলমূল নিয়ে মহাদেবের পূজা করতে এসেছেন। তাঁরা মহাদেবের অর্চনা করে বেরিয়ে এসে আমদের দেখতে পেয়ে বললেন — আপ্‌লোগ পরকরমাবাসী বা? আপলোগকোঁ দর্শন মিলতে হী হামলোগ ধন্য হো গয়ী। আপলোগ কিরপা করকে হমারা ভেট লিজিয়ে।

তারা আমাদের হাতে কলা, আপেল, পেয়ারা ও আমলকী দিয়ে চলে গেলে আমরাও নর্মদার ঘাটে নেমে মুখ হাত ধুয়ে এলাম। পুরোহিতজী বাড়ী থেকে ঘিয়ে মাখানো চাপাটি, সজী ও দুধ নিয়ে এলেন।

রঞ্জন — এত কষ্ট করে আপনি খাবার আনতে গেলেন কেন? ভক্তদের ফলমূলই আমরা খেয়ে নিতাম।

পুরোহিতজী — ঐসব ফলমূলে কামনা-বাসনা জড়ানো। ঐ ফল খেলে আপনাদের পরিক্রমা খণ্ডিত হয়ে যাবে। ঐ ফলমূল ভোজন শ্রাদ্ধান্ন ভোজনের সমতুল্য। কথা বললতে বলতেই তিনি মহাদেবকে প্রদত্ত দুধ, মিছরি ও ফলমূল বাইরে নিয়ে গিয়ে একটি সদ্য গজিয়ে ওঠা বেলগাছের গোড়ায় ঢেলে দিতে দিতে বললেন। কাল দেখবেন ঐ বেলগাছটি মরে গেছে। মা নর্মদা আপনাদেরকে রক্ষা করেছেন।

খাওয়া দাওয়ার পর আমরা মন্দিরে বিশ্রাম করতে লাগলাম। পুরোহিতজী তাঁর বাড়ী ফিরে গেলেন। পুরোহিতজীর কথায় আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

হরানন্দজী — কাল এখান থেকে যাত্রা করব ভেবেছিলাম। কিন্তু বেলগাছের মৃত্যু না দেখে আমি নড়ছি না। আপানদের তাড়া থাকে তো আমাকে ছেড়ে আপনারা যাত্রা করতে পারেন!

আমি — তা হচ্ছে না। আমরাও পুরোহিতজীর কথার সত্যাসত্য নিজের নিজের চোখে দেখে যেতে চাই। তবে জানবেন — তথাকথিত ভক্তরা কখনও ঈশ্বর প্রেমিক নয়। কোটিতে একটাও ঈশ্বর বিশ্বাসী নয়, তারা সব লালসা ও হতাশার প্রতিমূর্ত্তি! মন্দির ও সাধুর কাছে যায় এই বিশ্বাসে যে সাধুর miracles এবং supernatural power -এর দ্বারা তাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হবে, এই অভিসন্ধিতে! মঠ, মিশন সাধু সন্ন্যাসীর আখড়াতে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রত্যেক ভক্তের মুখচন্দ্রমাটা একটু লক্ষ্য করবেন, দেখবেন তাদের মুখে চোখে প্রেমের মধুবুলি আর অন্তরে 'কি পাই কি পাই, কেমনে বাগাই'!!

একবার বাবা আমাকে নিয়ে কালীঘাট মন্দিরে যান। মন্দিরে পৌঁছেই বললেন — যাও কালীদর্শন করে এস। আমি যাব না। বাবা মন্দিরের বাইরে একটা বাড়ীর বারান্দায় বসে থাকলেন। এদিকে মন্দিরে প্রচণ্ড ভীড়। কোনমতে কালীদর্শন করে ফিরে এসে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম — তুমি গেলে না কেন? বাবা বললেন — মন্দিরে দেবতা থাকলে তবে তো দেখতে যাব। ভক্তদের ভীড় দেখে বেচারী কালী বহুকাল আগেই পরণের বস্ত্র বগলে নিয়ে ন্যাংটো উদম নাচ নাচতে নাচতে পড়ি কি মরি করে আদি গঙ্গার ওপারে পালিয়ে গেছেন। কারণ ভক্তরা ৺আনার (পাঁচ আনা) ডালা দিয়ে নানা দাবী পুরণের ডোলের বোঝা চাপাতে চায়। আবার ঐ ডালার হিসাবটাও তার কলিজাতে লিখে রাখে। তোমাকে শুধু দেবীর রূপ দেখবার জন্য পাঠিয়েছিলাম।

সবাই চুপচাপ বসে মন্দিরের চারদিকের পাহাড়ের শোভা উপভোগ করছি। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। এমন সময় সন্ধ্যারতি করার উদ্দেশ্যে পুরোহিতমশাই এসে উপস্থিত হলেন। আমরাও মহাদেবের সামনে এসে দাঁড়ালাম আরতি দেখতে। মন্দিরের প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে বড় বড় মোমবাতি জ্বলছে। পুরোহিতজী আচমনাদি সেরে আরতি শুরু করলেন — ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ। ওঁ ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ। ওঁ ঈশানায় সূর্যমূর্তয়ে নমঃ।

মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে, কখনও অর্ধনত মস্তকে প্রণামের মুদ্রায় আরতি করতে লাগলেন। তাঁর মধ্যে যেন নটরাজের আবেশ ঘটেছে। নৃত্যের নানাবিধ মুদ্রা ও ক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর শরীরে প্রকাশ পাচ্ছে।

পুরোহিতজীর আরতি দেখে আমাদের সারা শরীর ও মন এক অব্যক্ত পুলকে ভরে আছে। এমন সময় যতীশ্বরানন্দ বললেন — আমার পিতা ছিলেন শ্রীগুরুর চরণে একান্ত নিবেদিত প্রাণ। একটি আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে মানুষ হওয়ার ফলে আমার মধ্যেও অতীন্দ্রিয় বস্তুতে বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল সহজাত। আমার পিতার গুরু অর্চনাকালে তাঁর নৃত্যের ছন্দোদোদুল, লীলায়িত নানা ভঙ্গীমাকে দেখে মনে হত তিনি যেন দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুভব করতেন দেহাতীতকে। তাই যৌবনে এই নৃত্য-বিদ্যা আমার খুব প্রিয় ছিল। নৃত্যকলাও ভগবদ সাধনা। পবিত্রতা এবং একাগ্র নিষ্ঠা থাকলে দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আনন্দম্ এর স্পর্শ পাওয়া যায়। নৃত্যকালে আমার দেহে কখনও কখনও এমন অসহ্য পুলকের ঢল নামে, মনে হয় আমি যেন দেহ ছেড়ে চলে যাব। অ্যানাটমিতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যে সব বিবরণ আছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ লীলাবিলাস নৃত্যের মাধ্যমে পরিস্ফুট করা সম্ভব। ভরতমুনি প্রণীত 'নাট্যশাস্ত্র' এবং অভিনব গুপ্ত কৃত নাট্যশাস্ত্রের টীকা আমি পড়েছি। এই টীকা না পড়লে নাট্যশাস্ত্রের দুরূহ শ্লোকের পারিভাষিক অর্থ কিছুতেই বোধগম্য হবে না। নৃত্য হল 'সম্ভাবো ব্রহ্মনির্মিতঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মা হতে এই শাস্ত্রের উৎপত্তি। ভরতমুনি ব্রহ্মাকে প্রণাম ও পরিগ্রহ অর্থাৎ সম্মান প্রদর্শন পূর্বক নাট্যবেদ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে নৃত্যকলাও ঈশ্বর প্রাপ্তির সাধনা বিশেষ। হঠযোগ রাজযোগ ক্রিয়াযোগাদির মত এটিও একটি যোগ পদ্ধতি।

বড়ই দুর্ভাগ্য যে বর্তমান যুগে নৃত্য ও সঙ্গীতাদির চর্চা বা অনুষ্ঠান নাচ-গান হল্লাতে পরিণত হয়েছে। দেশের সর্বত্র তথাকথিত ফাংশনের অভাব নাই। কিন্তু নৃত্য সঙ্গীতাদি ক্রিয়া বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য যে পরিমাণ সংযম, শুচিতা এবং নিষ্ঠার প্রয়োজন হয় তা প্রায়শঃই দৃষ্ট হয় না। মদ্যপ ও ব্যাভিচারীদের মুখে চোখে সাধারণতঃ যে রকম কলুষতার ছাপ পড়ে, সেইরকম কালিমা যুক্ত অবয়ব, কোটরাগত চক্ষু, ক্ষীণ ও জীর্ণ শরীর নিয়ে যখন কোন নর্তক নামধারী শিল্পী নৃত্যের নামে নানারকম স্থূল দৈহিক কসরত দেখায়, তখন সেই কসরতকে সাধনা বলে ভাবতে কষ্ট হয়।

অথচ দেখ, ঋষিরাই ছিলেন এই নৃত্যকলাদি বিষয়ের প্রণেতা এবং প্রয়োগকর্তা। ভরতমুনির ঐ বই-এর দুই এবং তিন নম্বর শ্লোকে ঐ সব বিষয়কে 'নাট্যবেদ' বলা হয়েছে। জপ ও ধ্যানাদির পর ভরতমুনি হৃদয় যখন প্রশান্ত ও প্রফুল্ল, সেই সময় তাঁকে ঐ নাট্যবেদ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন তাঁর তাপস পুত্রগণ এবং জিতেন্দ্রিয় সংযতচিত্ত আত্রেয় প্রভৃতি মুনিবৃন্দ। সাত নম্বর শ্লোকে ভরতমুনি বলছেন — 'আপনারা শুচি এবং অবহিত চিত্তে এই নাট্যবেদ বিষয়ে শ্রবণ করুন।' কাজেই যে শাস্ত্রের বক্তা একজন সিদ্ধমুনি, শ্রোতা হলেন জিতেন্দ্রিয় শুদ্ধচিত্ত অপরাপর মুনিবর্গ এবং নাট্যবেদ আখ্যা দিয়ে যে বিষয়কে অসাধারণ মর্যাদা দান করা হয়েছে তাকে সাধনা ছাড়া আর কি বলা যায়? ঈশ্বর সাধনার জন্য যে পরিমাণ শুচিতা সংযম এবং নিষ্ঠা প্রয়োজন হয় তা যদি কোন শিল্পীর থাকে, তবে তার দ্বারাই সে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে পারবে এই হল আমার ধারণা।

আমার এই ধারণার কারণ, নৃত্যকলার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করলে জানা যায়, মনের ভাবটিকে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করার জন্যই নৃত্যের উৎপত্তি। আনন্দ, দুঃখ, বেদনা, ক্রোধ, অনুকম্পা এবং মধুর ভাব প্রভৃতি যাবতীয় ভাব প্রকাশ করার তাগিদেই দেহের মধ্যে মুখে চোখে প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যে সব ভাবের স্ফুট ও অস্ফুট অভিব্যক্তি ঘটে তারই প্রকাশ নৃত্যশিল্পে। তাই ভারতীয় নৃত্যের আদর্শ ইউরোপীয় নৃত্য ক্লাসিক ও ব্যালেট প্রভৃতি হতে সম্পূর্ণ পৃথক। ভারতীয় দৃষ্টিতে নৃত্য নিছক Art নয় — অর্ধনগ্ন ভাবে নানা চটুল অঙ্গভঙ্গী লম্ফঝম্পকেও নৃত্য বলা হয় না। জীবনকে কোনমতেই উচ্ছৃঙ্খল হতে না দিয়ে তাকে ছন্দোবদ্ধ করার জন্যই ভারতীয় নৃত্যকলার সৃষ্টি। এই জন্য ইউরোপের নৃত্যশিল্প যেখানে রূপ-প্রধান, সেখানে আমাদের নৃত্যে রিরংসার (কামচর্চার ইচ্ছা) দ্যোতক কিন্তু ভারতীয় নৃত্যভাব প্রধান বলে তা আধ্যাত্মিকতার পোষক। এইজন্য দেখ, আমাদের দেবতারা নৃত্য রসিক, স্বয়ং যোগেশ্বর নটরাজ শিব নৃত্য করেন, সত্ত্বগুণপ্রধান স্বর্গেও তাই

অপ্সরাদের নৃত্যের আসর বসে, অর্জুন নৃত্যকুশলী ছিলেন, মহাপুরুষ চৈতন্যদেবও তাঁর দিব্য মহাভাবগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে উদ্দণ্ড নৃত্য না করে পারেন নি। বাৎস্যায়ন ও ভরতমুনির মত মুনিবর্গও নৃত্য বিষয়ে চিন্তা করেছেন, চর্চা করেছেন। প্লেটোর মত নীতিবাগীশ দার্শনিককেও বলতে শুনি — 'A good education consists in knowing how to sing and dance well'. নিট্‌সেত উচ্ছ্বসিতভাবে বলেছেন — My Style is dance. Everyday I count wasted in which there has been no dancing.'

ভরতমুনি লিখিত প্রথম নাটক 'অমৃত-মন্থন' স্বর্গে অভিনীত হওয়ার পর তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'ত্রিপুরদহ' এর অভিনয় হিমালয়ে শিব নিকেতনে। শিব এই অভিনয় দেখার পরেই ভরতমুনিকে নাটকে নৃত্যকলা যোজনা করার জন্য পরামর্শ দেন। হস্ত, পদ, কটিদেশ, পার্শ্বদেশ, উদর পৃষ্ঠদেশ এবং বক্ষদেশের নানা প্রকার ভঙ্গীতে কখন ধীরে কখন দ্রুততালে যে সমস্ত গতি হয় তার নাম 'মাতৃকা'। নৃত্যে তিন বা চার রকমের মাতৃকার সমাবেশ ঘটলে তার নাম হয় 'করণ'। নৃত্যশাস্ত্রে এই রকম ১০৮ প্রকার করণের উল্লেখ আছে। বিভিন্ন রকম করণের সমাবেশকে বলা হয় 'অঙ্গহার'। অঙ্গহারও ৩২ রকম।

মহাদেব স্বয়ং এই সমস্ত নৃত্যকলা তণ্ডু মুনিকে শিক্ষা দিবার পর তা ভরতকে শিক্ষাদানের জন্য তণ্ডুকে আদেশ করেন। তণ্ডুর নামানুসারেই নৃত্যকলার একটি বিশেষ শাখার নাম হয়েছে 'তাণ্ডব নৃত্য'। মুনিগণ একবার ভরতকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন — 'নাট্যাভিনয়ে নৃত্য সংযোজনার প্রয়োজন কি? নাটকের আখ্যান বস্তুর বিশ্লেষণে বা পরিণতি বিষয়ে ত অভিনয় কলাই যথেষ্ট, তাহলে অভিনয় নৃত্যের সার্থকতা কি?' তদুত্তরে নাট্যাচার্য মুনি বলেছিলেন — 'নৃত্য অভিনয়ে রসের অভিব্যক্তি ঘটিয়ে অভিনয়ের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। শুধু অভিনয় কলা কেন, মানুষের শরীর ও মনের যাবতীয় ভঙ্গী ও ভাবকেও নৃত্য ছন্দোময় করে তোলে।

নৃত্যের মধ্যে এমনই উচ্চভাবমণ্ডিত কল্যাণশ্রী রয়েছে বলেই নৃত্য একটি উচ্চাঙ্গের শিল্প। এইজন্যই দেখা যায়, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র দু'হাজার বছর আগে রচিত হলেও তাতে পেশাদার নর্তক-নর্তকীর উল্লেখ রয়েছে। অর্থাৎ যথেষ্ট সমাদরের সঙ্গে আরও বহুকাল পূর্ব হতেই আমাদের দেশের নৃত্যশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল। বৌদ্ধযুগে বাংলাদেশে 'বৌদ্ধনাটক' এবং বাজিল নাচ' নামে দুটি নাটক নৃত্য সংযোগে দেখানো হত। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে চৈনিক দূত মাহুয়ান বাংলায় এক ধরনের 'ধর্ম-নৃত্য' দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছলেন। দক্ষিণী পণ্ডিত পুণ্ডরীকে বিঠ প্রায় ৮০০ বছর আগে তাঁর লিখিত 'নর্তক নির্ণয়' নামে এক পুস্তকে নৃত্যের মহৎ দিক গুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ঐ সমস্ত প্রামণ্য পুস্তকগুলি হতেই জানা যায়, ভারতীয় নৃত্যের দুটি অঙ্গ — তাণ্ডব ও লাস্য। তাণ্ডবের দুটি রূপ — 'লেবলি' আর 'বহুরূপ'; লাস্যেরও তাই — স্ফুরিত ও যৌবত। লেবলি নৃত্যে — স্বল্প অভিনয়, অঙ্গ বিক্ষেপেরই বাহুল্য বেশী। বহুরূপে — ভাব প্রকাশের জন্য চোখ মুখের নানা রকম ভঙ্গীর সমাবেশ থাকে। 'স্ফুরিত নৃত্য' — আলিঙ্গন চুম্বনাদিযুক্ত কিন্তু 'যৌবতে' ঐ সব ভাব অনেক সংযত এবং তাল মান লয় যুক্ত। 'ভক্তি রত্নাকার' নামক গ্রন্থ স্ফুরিত ও যৌবত নৃত্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন —

যত্রাদ্যেহভিনয়ে ভাবৈ রসৈরাশ্লেষ চুম্বনৈঃ
নায়িকা নায়কো যত্র নৃত্যতঃ স্ফুরিতং হি তৎ।
মধুরাবদ্ধলীলাভির্নটিভিঃ যত্র নৃত্যতে
বশীকরণবিদ্যাভাং তল্লাসং যৌবতং মতম্‌॥

নৃত্যের অধিকারী কে সে বিষয়েও আমাদের শাস্ত্রে যথেষ্ট আলোচনা আছে। শুচিতা, সংযম, কলাজ্ঞান, সংবেদনশীলতা ছাড়াও তারা দৈহিক রূপলাবণ্যের উপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে আছে —

নৃত্যনালমরূপেন সিদ্ধির্নাট্যিস্য রূপতঃ।
চার্ব্বধিষ্ঠানবনৃত্যং নৃত্যমন্যদ্‌বিড়ম্বনা॥

অর্থাৎ যিনি রূপবান ও রূপবতী তাঁরই নৃত্য চিত্তাকর্ষক। রূপ থেকেই নাট্যের সিদ্ধি, নৃত্য চারু অধিষ্ঠান, যার রূপ নাই, নৃত্য তার পক্ষে বিড়ম্বনা। আমাদের গর্ব ও গৌরব, ভারতীয় নৃত্যশিল্পের নমস্য দিকপাল উদয়শঙ্করের দিকে তাকালেই তাঁর আলোকসামান্য ঈশ্বরদত্ত প্রতিভা ছাড়াও অপরূপ দেহ-সৌষ্ঠবও যে তাঁর সিদ্ধিলাভে সাহায্য করেছে এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায়।

'সঙ্গীত দামোদর' নামক পুস্তকটি তে প্রকৃত নৃত্যের সংজ্ঞা দেওয়া আছে। সার্থক নৃত্য হল —

দেবরুচ্যা প্রতীতো যস্তালমানরসাশ্রয়ঃ
সবিলোসোঽঙ্গঃ বিক্ষেপো নৃত্যমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
লয়াদুত্তিষ্ঠতে বাদ্যং বাদ্যাদুত্তিষ্ঠতে লয়ঃ
লয়ঃ তাল সমারব্ধং ততো নৃত্য প্রবর্ততে॥

বৈদিক যজ্ঞের মতই আমাদের ভারতীয় নৃত্য অনুষ্ঠানবহুল এবং আগাগোড়াই নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। এতে অঙ্গ সঞ্চালনই আছে অনেক প্রকারের। শুধু মস্তক সঞ্চালনের পদ্ধতিই উনিশ রকম। তারপর দৃষ্টি চার প্রকারের — রসদৃষ্টি, স্থায়ীদৃষ্টি, সঞ্চারীদৃষ্টি ও ব্যভিচারী দৃষ্টি। মুখরাগের প্রকার চার, ভ্রূবিকারের সাত, বাহু সঞ্চালনের আঠারো। নৃত্যে অনুরাগজনক ও অর্থপ্রকাশক যে অঙ্গুলি বিন্যাস, তার নাম 'হস্তক'। সংযুক্ত হস্তক আটত্রিশ রকমের, অসংযুক্ত হস্তক ও নৃত্য হস্তক বত্রিশ রকমের।

বাঁশী বা অন্যরূপ লয় যন্ত্রের অনুগমন করে যে নৃত্যের অনুষ্ঠান তার নাম 'চালক'। নৃত্যের উপযুক্ত চরণের সাধন ও লক্ষণও তের রকমের। অঙ্গে অনুরক্তিজনক অঙ্গ সন্নিবেশের নাম স্থানক। স্থানকও আবার সাতাশ প্রকার। চরণ, জঙ্ঘা, বক্ষ ও কটি আয়ত্ত করাকে 'চারী' বলে; চারী আছে বিরাশী রকমের।

হাতে হাতে , পায়ে পায়ে বা হাত পায়ের যে একত্র সংযোগ তার নাম করণ। করণ ষোল প্রকার। এই সমূহ কলা-কৌশলের সুসমঞ্জস্য সমাবেশ ঘটলে তবে খাঁটি ভারতীয় নৃত্যের পরিপূর্ণ রূপটির প্রকাশ ঘটে। ভারতীয় নৃত্য নানাবিধ — কমলবর্ত্তনিকা, মায়ূরী, চক্রবন্ধ, নাগবন্ধ, বৃতলতিকা, নেরি, করণ-নেরি, রবিচক্র ও পদ্মবন্ধ।

ভারতীয় নৃত্যের প্রধান কথা ভাব — ভাবেই এর উৎপত্তি, ভাবেই এর পরিণতি। যেমন ধর, শ্রীকৃষ্ণের বিরহে রাধা কাতর, তিনি উন্মাদিনীর মত ধূলায় গড়াগড়ি দিচ্ছেন কিংবা কোন বিশালনেত্রা ভৈরবী যখন — স্ফটিকোচ্চ গেহে পঙ্কেরুহৈ ভৈরবমর্চ্চয়ন্তী — স্বচ্ছ সরোবরের মধ্যে স্ফটিক নির্মিত উচ্চ গৃহে পদ্মহস্তে মহাদেবের অর্চনা করছেন, এই সব ভাব যদি কোন নর্তক নর্তকীকে নৃত্যের মধ্যে দেখাতে হয়, তাহলে ঐ সব ভাবের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তদ্‌গতচিত্ত অর্থাৎ নিজেকে না হারিয়ে ফেললে কিছুতেই তা মূর্ত করতে পারবে না? এ কি সাধনা নয়? তাই বলছি, উচ্চ শ্রেণীর নর্তক হতে হলে শুধু নৃত্যশাস্ত্রের ব্যাকরণ জানলেই হবে না বা রূপ লাবণ্য থাকলেই চলবে না, তাকে সাধকের মতই নিষ্ঠাবান হতে হবে।

সাধনা থাকিলে হইবে সিদ্ধি, বিধি মিলাইবে পুরস্কার।

আমি বললাম — আপনাদের নৃত্যে কৈশিকী বলে একটি শব্দ আছে। নাট্যবেদের ৪৪ ও ৪৫ নম্বর শ্লোকে দেখি তিনি বলছেন — হে ভগবন্ কৈশিকীর সম্যগরূপে প্রযোজক দ্রব্য প্রদান করেন। এই কৈশিকী কাকে বলে?

'কৈশিকী' একটি বৃত্তি বিশেষ। বৃত্তি কি? না, শাস্ত্রে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই যে চতুবর্গের কথা আছে, বৃত্তি হল তার সাধনা। বৃত্তির অর্থ বর্তমানতা, ব্যাপার বা চেষ্টা। অভিনব গুপ্ত বৃত্তি শব্দের অর্থ করতে গিয়ে বলেছেন, যখনই কোন কর্ম আরম্ভ করা যায়, তখন তার মধ্যে আমাদের বাক্য মন এবং শরীরের নানাবিধ ক্রিয়া বা চেষ্টা থাকে। এই সকল ক্রিয়া আবার প্রত্যেক লোক আপন প্রকৃতি অনুসারে নানাভাবে সম্পন্ন করে থাকে। যাঁরা উত্তম প্রকৃতির লোক, তাঁদের অনুষ্ঠিত প্রতিটি ক্রিয়ার মধ্যেই বাক্য মন এবং শরীরের একটা অপরূপ ছন্দ, শ্রী, সৌষ্ঠব ও লালিত্যের প্রকাশ ঘটে থাকে। সেই সৌষ্ঠবময় সুষমা এবং লাবণ্যমণ্ডিত ক্রিয়াদির নামই বৃত্তি। এই বৃত্তি চার প্রকার — ভারতী, সাত্ত্বতী, আরভটি এবং কৈশিকী।

বাক্যঘটিত ক্রিয়া এবং ব্যাপারের নাম 'ভারতী'। সুন্দর বাচনভঙ্গী এবং মনোহর শব্দ বিন্যাসই এর বৈশিষ্ট্য। মনঃ সম্বন্ধীয় বিষয়কে সাত্ত্বতী বলে। এটি হল মনের সংবেদন। আর আরভটি শব্দটি 'অর' শব্দ হতে নিষ্পন্ন। এর অর্থ হল নিরলস উদ্যম বা উৎসাহব্যঞ্জক ক্রিয়া। নাটকাদিতে ভট, ভৃত্য এবং সৈনিকদের ক্রিয়ার মধ্যে যে অভিব্যক্তি দেখা যায়, তারই নাম আরভটি।

কৈশিকী শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল কেশ সম্বন্ধীয় বৃত্তি। এর তাৎপর্য হল, কেশ কোন প্রয়োজন সাধনা না করলেও তা যেমন দেহের শোভা, তেমনি যে কোন বিষয়েই যখন সৌন্দর্য ও লাবণ্যের অভিব্যক্তি ঘটে, তখন তাকেই বলা হয় কৈশিকী বৃত্তি।

সার্থক নাটক বা নৃত্যকলায় এই কৈশিকী বৃত্তির ব্যঞ্জনা অবশ্যই প্রয়োজন। ৪৪ নম্বর শ্লোকে মুনি কৈশিকীর বিশ্লেষণ দিয়েছেন — নৃত্তাঙ্গহার সম্পন্না, রস-ভাব-ক্রিয়াত্মিকা, শ্লক্ষ্ম-নেপথ্যা, শৃঙ্গার-রস-সম্ভবা ইত্যাদি।

নৃত্ত শব্দের অর্থ নর্তন। অঙ্গহার শব্দের অর্থ অঙ্গের হরণ অর্থাৎ নির্দোষরূপে অঙ্গ প্রতঙ্গের ক্রিয়া প্রকাশ। কোন অঙ্গ বা উপাঙ্গের সবিলাস রসশ্রিত বিক্ষেপকে (যথা, নৃত্যকালে হস্তের সবিলাস বিক্ষেপ সহকারে কটি দেশে সংযোগ ইত্যাদি) নৃত্তাঙ্গহার সম্পন্না বলা হয়। রসভাব-ক্রিয়াত্মিকার অর্থ — কবি, নট, দর্শক ও শ্রোতা সকলের মধ্যে রস সঞ্চারিত করে দেওয়াই যে সকল ক্রিয়ার প্রাণ বা স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য।

শ্লক্ষ্ম শব্দের অর্থ সুসঙ্গত, উজ্জ্বল, সুকুমার। এখানে নেপথ্য শব্দের অর্থ পরিপাটি বেশভূষা। নর্তক বা নটের বেশভূষাই শুধু নয়, তার আঙ্গিক সংলাপ, ভ্রূভঙ্গ এবং কটাক্ষ প্রভৃতিও এমন রসালো ও মধুর হওয়া চাই যে, যাতে মধুর ও শৃঙ্গার রসের স্ফূর্তি ঘটে।

নাট্য-কোবিদ মুনি বলেছেন, এইরকম নৃত্তাঙ্গহার-বিশিষ্টাদি কৈশিকী বৃত্তির প্রকাশ শঙ্করের নৃত্যকালে পরিপূর্ণভাবে মূর্ত হয়েছিল। এর কারণ, তিনি স্বয়ং যোগেশ্বর, আনন্দ এবং রসের মূর্ত বিগ্রহ। তাই একমাত্র নটরাজের নৃত্যকালেই পুর্ণরস এবং পূর্ণ আনন্দের পূর্ণস্ফূর্তি ঘটেছিল। অভিনব গুপ্তের মতে, মধুকৈটভের সঙ্গে যুদ্ধকালে ভগবান বিষ্ণু লীলায়িত দেহ-ভঙ্গিমা সহকারে যখন শিখা বন্ধন করেছিলেন, তখন তাঁরও দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অপূর্ব বৈচিত্র্য এবং সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটেছিল এবং তাও ছিল ঐ কৈশিকী বৃত্তিরই পূর্ণ ব্যঞ্জনা —

'বিচিত্রৈরঙ্গহারৈস্তু দেবো লীলাসমুদ্ভবৈঃ।
ববন্ধ যচ্ছিখাপাশং কৈশিকী তত্র নির্মিতা॥'

ভগবান নটরাজ এবং বিষ্ণুর মধ্যে নৃত্য বা যুদ্ধকালে তাঁরে দিব্যদেহে কৈশিকী বৃত্তির যে রস-স্ফূর্তি ঘটেছিল, তা আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে আশা করতে পারি না। তবুও কোন শিল্পী যদি শুচিতা এবং সংযমের দ্বারা শুদ্ধ চিত্তে নৃত্যকলার সাধনা করেন তাহলে নৃত্যকালে তাঁর অনুষ্ঠিত মুদ্রাদির মধ্যেও সহসা এমন রসের প্রকাশ ঘটতে পারে যে, তাঁর দেহের তটভূমিতে আনন্দের ঢল নেমে তাঁকে উছলিত এবং উচ্ছ্বসিত করে দিতে পারে।

মোট কথা, নৃত্যকলাদি বিষয় হল প্রকৃতপক্ষে দেহের মধ্যে দেহাতীতকে আবাহন — দেহের থালিতে দেহাতীতের জন্য রসের নৈবেদ্য সাজানো — রূপের মধ্যে অরূপের সন্ধান।

আলোচনা শেষ হতেই রাত্রি দশটা নাগাদ আমরা শুয়ে পড়লাম। পরদিন যখন ঘুম ভাঙলো তখন বেলা সাড়ে সাতটা। উঠে দেখি ঘরে রঞ্জন ছাড়া আর কেউ নেই। রঞ্জন বলল রাত্রে গরমের জন্য ভালো ঘুম হয়নি। আমি তোমার জন্য বসে আছি। সকলেই প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সারতে গেছে। আমিও কম্বল গুটিয়ে গামছা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে রঞ্জনের সঙ্গে প্রাতঃকৃত্য ও স্নান সারার জন্য নর্মদার ঘাটে উপস্থিত হলাম। নর্মদা প্রবলবেগে বয়ে চলেছেন।

ঘাটে পৌঁছে রঞ্জন বলল — কাল থেকে আপনার একটা কথা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। সেইজন্যও হয়ত রাতে ঘুম হয় নি।

আমি বললাম — কি কথা!

রঞ্জন — হিন্দু শব্দের ব্যুৎপত্তি রহস্য ও হিন্দু ধর্মের সারমর্ম ব্যাখ্যাকালে আপনি বললেন — হিন্দু ও আর্য শব্দ সমার্থক। বৈদিক যুগে ভারতবর্ষের অধিবাসীরা নিজেদেরকে আর্য বলে পরিচয় দিলেও ভারতবর্ষে আসবার পূর্বে আর্যগণ কোথায় ছিলেন?

আমি বললাম — নিশ্চয়ই বলব, তবে দু'চার মিনিট অপেক্ষা করুন। আমি এখনই আসছি এই বলে আমি তাড়াতাড়ি ঘাটে নামলাম। ঘাটে নেমে আমি উদাত্ত কণ্ঠে প্রার্থনা করলাম —

যত্তে ভুবং চ ভব্যাং চ মনো জগাম দূরকম
তত্ত আবর্ত্তয়ামসীহ ক্ষয়ায় জীবসে॥ (ঋ১০/৫৮/১২)

তোমার যে আত্মা সুদুরে ভূত ও ভবিষ্যতে বিলীন হয়ে গিয়েছে তাকে আমরা পুনরায় আহ্বান করি — সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

রঞ্জন আমার দিকে বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি তার কাছে ফিরে এসে বললাম — আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে আমি মা নর্মদার কাছে প্রার্থনা জানালাম বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক শ্রী জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে।

ভারতীয় সংস্কৃতির বিশ্বদূত * জগদীশচন্দ্র আর্য জাতির আদি নিবাসস্থান ভারতবর্ষে আসবার পূর্বে আর্যগণ কোথায় ছিলেন, তাঁদের বিভিন্ন উপনিবেশগুলির ভৌগোলিক সংস্থান এবং আর্য সভ্যতার ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে প্রচলিত সিদ্ধান্তের বিরোধী এমন সব মৌলিক অকাট্য যুক্তিসিদ্ধ এবং অভিনব তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন আমি একে একে সেগুলি উপস্থাপিত করছি।

১) ভারতীয় আর্যগণ ভারতে আসবার পূর্বে পন্টাশ (কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরে) এবং আরমেনীয়া প্রদেশে বাস করতেন এবং তাঁরাই প্রাচীন ব্যবলিন, মিশর, ঈজিয়ান ও হিব্রু জাতির জাতীয়তা ও সভ্যতার সৃষ্টি করেছিলেন। এই কয় জাতির পূর্বপুরুষ ও চৈনিকদের পূর্বপুরুষ দুই পরস্পর সংসৃষ্ট প্রদেশে পাশাপাশি বাস করতেন।

২) ঋগ্বেদের ভৌগোলিক বিবরণে নির্ভর করলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, আর্যগণ শুধু যে পন্টাশ ও আর্মেনীয়া অঞ্চলে বাস করতেন, তা নয়, ককেশিয়া এশিয়া-মাইনর ও ক্রীট দ্বীপেও তাঁদের বাস ছিল। বেদে যেরূপ বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তা ঐ সকল স্থানের সঙ্গে যথাযথ মিলে গেছে। এমন অনেক নগর নদী ও পর্বতের উল্লেখ দেখা যায়, যা ভারতে নাই, অথচ ঐ সকল প্রদেশ এখনও অবিকৃত নামে পরিচিত আছে। আর্যগণ কখন ভারতে আসেন, এই প্রসঙ্গে জগদীশবাবু বলেন,

৩) শুধু যে বেদ লিখিত হওয়ার পরে, আর্যরা ভারতে আসেন, এমন নয়, এমন কি, রামায়ণ মহাভারত বর্ণিত যুদ্ধও আর্য জাতির ভারতে আসবার পূর্বে সংঘটিত হয়েছিল। কুরুপাণ্ডবের ও রামরাবণের যুদ্ধ ভারতীয় ঘটনা নয়। যবদ্বীপ বা বলী দ্বীপের সঙ্গেও এ সমস্ত ঘটনার কোন সম্বন্ধ নাই।

৪) বুদ্ধদেবের জন্মের কিছু পূর্বে আর্যগণ ভারতে আসেন। সেই জন্যেই ভারতে এমন কিছু Archaelogical প্রমাণ বর্তমান নাই যার দ্বারা মহাভারত ও রামায়ণে বর্ণিত আর্যকীর্তি সপ্রমাণ হতে পারে। প্রতীচ্য পণ্ডিতগণ এই জন্যই বলেন যে, মহাভারত ও রামায়ণে ঐতিহাসিক সত্য নাই। বুদ্ধের একজন শিক্ষকের নাম ছিল আলার কালাম। এটি ব্যবলনীয় নাম। একজন ব্যবিলনীয় রাজাও এই নামে পরিচিত ছিলেন, বুদ্ধের সময় পর্যন্তও আর্যগণ পূর্ব প্রথায় নামকরণ করতেন।

৫) হিটাইট ও ফিনিশীয়ান। কুরুগণই হিটাইট নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাচীন গ্রীকদের মতে, এঁরা পন্টাস্থ (করতোয়া?) খরস্রোতা (Kharshut) নদীর তীরে খাটি নামক স্থানে বাস করতেন। Boghozkui তে অনেক বৈদিক দেবতার নাম ক্ষোদিত শিলাখণ্ড পাওয়া গেছে। ঐ সকল শিলাখণ্ডে কৃবী বা পঞ্চালগণের উল্লেখ আছে এবং Orontes নদীতীরে যে প্রদেশ 'হস্তিনা' (Hattina) নামে পরিচিত, তা আমাদের হস্তিনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

৬) ফিনিশীয়ান ও পাঞ্চাল একবংশ-সম্ভূত। কাশী ও কোশলগণ Kassits ও kosaeans নামে পরিচিত হয়েছেন।

---

*'মনের সূক্ষ্মস্তরে নানা মানসিক চিন্তাবৃত্তির চেয়ে আত্মার গভীরে আত্মার দ্বারাই যেখানে সকল ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয় সেই আধ্যাত্মিক ভূমিতেই আমরা ঐক্য এবং শান্তির সন্ধান পেতে পারি। বাহ্য প্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন বিজ্ঞানীদের যে বিপুল কৃতিত্ব আধুনিক জগৎকে চমৎকৃত করেছে তাতে মানুষ হয়ে উঠেছে Nuclear Jaint. কিন্তু নৈতিক চরিত্রের বিচারে দেখা যায় আদিম প্রবৃত্তির আয়ত্তে এখনও সে Ethical Infant. তার চরিত্রের চপলতা এবং মনের অপুষ্টি দেখলে বুঝা যায় যে সে এখনও একটি অপরিণত শিশুমাত্র। এই অপরিণত শিশুর অন্তর পুষ্ট এবং পরিশুদ্ধ করার জন্যই আধ্যাত্মিকতার চর্চা এবং অধ্যাত্ম পরিবেশের সৃষ্টি সর্বাগ্রে আবশ্যক।'

ভারতের এই মর্মবাণীকে যিনি কুম্বুকণ্ঠে তুলে ধরেছিলেন তিনিই হলেন আচার্য জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বার বার ঘুরে বেড়িয়েছেন, বক্তৃতা দিয়েছেন এবং বলেছেন — "যত্রবিশ্বভবত্যেকনীড়ম্" — ভারতীয় সাধনার এই মূল সুরের মধ্যেই বিবদমান বিশ্বে সামগ্রিক কল্যাণের বীজটি নিহিত। সত্য কথা বলতে কি, বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আচার্য জগদীশচন্দ্রই ছিলেন বিশ্বের দরবারে ভারতের সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত। তাঁর রচিত পুস্তক ভারতীয় যোগ ও দর্শনের ক্ষেত্রে অমূল্য সম্পদ। তাঁর প্রধান কীর্তি হল — যার জন্য তিনি চিরকাল ভারতবর্ষে অমর এবং নমস্য হয়ে থাকবেন — তা হল প্রাচীন কাশ্মীরী ত্রিক শাস্ত্রের উপর গবেষণা। এই ত্রিক্ শাস্ত্রের উপর ভিত্তি করেই তিনি লুপ্তপ্রায় শৈবাগম সাধনাকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলেন। এ বিষয়ে তাঁকে authority বলে গণ্য করা হয়। কাশ্মীরের অবন্তীপুরে যে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্যের ফলে প্রাচীন ভারতের অনেক বিস্ময়কর তথ্য জানা গেছে তাঁর মূলেও তাঁরই অবদান সর্বাধিক। জগদীশচন্দ্র শুধু দার্শনিকই ছিলেন না, তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। পরাধীনতার জ্বালা তাঁর অন্তরকে মথিত করতো। তাই দেখি, তিনি ভারতের অপর প্রাণ-পুরুষ বাল গঙ্গাধর তিলকের মুক্তির জন্য ম্যাক্সমুলারকে এমন একটি পত্র লেখেন যে সেই চিঠি পড়ে ম্যাক্সমুলার অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন। প্রধানতঃ ম্যাক্সমুলারের প্রভাবে এবং নৈতিক চাপেই বৃটিশ সরকার তিলকজীকে মান্দালয় জেল থেকে তাড়াতাড়ি মুক্তি দেন। দেশপ্রেম, দর্শনচিন্তা এবং বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির এমন সমন্বয় এ জগতে দুর্লভ। তাঁর জীবনব্যাপী গবেষণার মধ্যে একটি নিজস্ব মৌলিক চিন্তাধারা ছিল। আনন্দকানন কাশীতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত নীলকমলেশ্বর বেদশালায় সারা বিশ্বের দার্শনিকরা এসে তাঁর কাছে যোগ ও দর্শনের দীক্ষাবীর্য গ্রহণ করতেন।

৭) জগদীশবাবুর সিদ্ধান্ত এই যে, বাঙালীদের কতক অংশ ফিনিশীয়ান আর্য। Pargiter এর মতে, যে আর্যগণ সমুদ্রপথে আগমন করেন, তাঁরাই বাঙালীর কোনও কোনও বংশের পূর্বপুরুষ।

৮) বেদে যারা 'দাস' নামে পরিচিত তারা ভারতের আদিম নিবাসী নন। বেদে এদেরকে 'অনাস্য' বলা হয়েছে। সায়ণ বলেছেন, এই অনাস অর্থে নাসাশূণ্য অর্থাৎ যে জাতির নাক ছিল না। অল্প অর্থেও 'নঞ' এর প্রয়োগ হয়। এই অর্থই বোধ হয় সায়ণের উদ্দিষ্ট। জদগদীশবাবু বলেন — সায়ণের এই সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য নয়। কারণ, অনাসদের পূর্বপুরুষ অনাসগণের উল্লেখ ব্যবিলনের প্রাচীন পুরাবৃত্তে পাওয়া যাচ্ছে।

৯) সুমেরীয় ও বৈদিক ভাষায় ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।

১০) বেদ বর্ণিত ভৌগোলিক বৃত্তান্তের একটি উদাহরণ এই যে, রাজা সুদাসকে 'পৈজবনী' বলা হয়েছে। তিনি (Pizvon) 'পিজবনে' রাজত্ব করতেন। এই Pizvon ইউফ্রেটিস্ নদীর তীরে অবস্থিত।

১১) তুর্বস, শিমু, কবশ, পুরু, ভেদ, সম্বর, ভালান, আলিনস, শিব, অজ, সিগ্রু ও যক্ষেরা এই Pizvon এর উত্তরে বাস করতেন।

১২) মথুরা, ইরাবতী, অযোধ্যা, লঙ্কা, হস্তিনা, কাশী এই সকল দেশেই ছিল।

১৩) সোমসুস্ম, হরিকযি, চমুর, বিপাসি-অর্জিকীয়, ক্রুম্, কুভ, তৃষ্টমা, সিন্ধু বিধরণী, এই সকল স্থান কৃষ্ণ সমুদ্রের তীরবর্তী প্রদেশে পাওয়া যাচ্ছে। ভারতে এই সকল নামে অভিহিত কোনও স্থানের উল্লেখ বা অস্তিত্ব নাই।

১৪) রামের মিত্র গুহক চণ্ডাল Chaldea বংশ সম্ভূত।

আমার মনে হয় তাঁর এইরকম চিন্তাধারা প্রত্নতত্ত্ব জগতে বিপ্লব ঘটাবে। সভ্যতার ইতিহাসে হিন্দু প্রথম স্থান অধিকার করবে। প্রতীচ্য মনীষীদের সিদ্ধান্ত এই যে, সভ্যতার পর্যায়ে প্রথম ফিনিসীয়া, দ্বিতীয় ব্যাবিলন, তৃতীয় মিশর এবং চতুর্থ ভারত। কিন্তু এই তত্ত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় আর্যগণের আদিপুরুষগণই জগদ্গুরুর গৌরবের অধিকারী হতে থাকবেন।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলায় বেলগাছের কাছে গিয়ে দেখি — সত্যি সত্যিই বেলগাছটার পাতাগুলি নেতিয়ে পড়েছে। গাছের গায়ে কালো কালো ছোপ দাগ। বেদেশ্বরের পুরোহিতজী বললেন — দেখলেন তো; আমার কথা সত্যি কিনা। আপনাদের এখানে ত্রিরাত্রি বাস হয়ে গেল। কাল আমি ভোজনের পর আপনাদের মর্কটি সঙ্গমের তীর্থ মাহাত্ম্য শুনাবো। এই তীর্থ এক এক যুগে এক এক নামে পরিচিত। আপনারা বরং সকালের পূজা সমাপ্ত করে কমলভারতীজীর সমাধি আশ্রম ঘুরে আসতে পারেন। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরো জানালেন যে মার্কণ্ডেয় মুনি ওঁকারেশ্বরে যে শিলাতে বসে তপস্যা করেছিলেন সেই মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে দীর্ঘকাল কাটিয়ে কমলভারতীজী 'চব্বিশ অবতারে' চলে যান। সেখানে থেকে আসেন এই মর্কটি সঙ্গমে। সেই সিদ্ধযোগী এই মর্কটি সঙ্গমেই নর্মদার সঙ্গে লীন হন। চব্বিশ অবতার ও মর্কটি সঙ্গমে তাঁর নামে দুটি আশ্রম আছে। এই দুই আশ্রমের বর্তমান মোহান্ত শংকরভারতীজী। কমলভারতীজী ও গৌরীশংকর ব্রহ্মচারীজীর মত শংকরভারতীজীও প্রতি বৎসর জমাত্ নিয়ে অমরকন্টক পর্যন্ত যাতায়াত করেন। কিন্তু কমলভারতীজীর ধারা থেকে এই ধারা বর্তমানে পৃথক হয়ে গেছে। শংকরভারতীজীরা যখন পরিক্রমায় বের হন তখন তাঁর সঙ্গে থাকে নিশান, তাম্বু, ছড়ি এবং ভোজ্যবস্তু বহন করার লোকজন ছাড়াও প্রায় দু'হাজার সাধু। জব্বলপুরের অনেক ধনী শেঠ এঁর শিষ্য। বর্তমানে শংকরভারতীজী এখানে বিরাজমান।

পরের দিন স্নান, প্রাতঃকৃত্যাদি ও পূজা সেরে মন্দিরের পিছন দিকে পাহাড়ের উঁচু দিক দিয়ে কমলভারতীজীর সমাধি স্থানে এসে পৌঁছে গেলাম। সমাধি স্থলটি সুন্দর। কমলভারতীজীর মর্মর মূর্তিটি ভারী জীবন্ত। সমাধি স্থান দর্শনের পর আমরা চলে আসার উপক্রম করছি এমন সময় একজন ব্রহ্মচারীজী সবিনয়ে জানাল আমাদের গুরুমহারাজ আপনাদের দর্শনপ্রার্থী। তিনি আমাদের সমাধি মন্দিরের পাশ দিয়ে একটি বড় হলঘরে নিয়ে এলেন। দেখলাম একটি বিরাট বাঘছাল পাতা আসনে শংকরভারতীজী সমাসীন। শ্বেতশ্মশ্রু ও জটাধারী এক বৃদ্ধ মহাত্মা। তিনি উঠে এসে আমাদের জড়িয়ে ধরে 'নম নারায়ণায়' জানিয়ে তাঁর পাশের আসনে বসালেন। তাঁর সামনে উপবিষ্ট ভক্তদের চলে যাবার ইঙ্গিত করলেন। পরিচয়পর্বের পর তিনি বললেন — আমার গুরুদেবের ঋদ্ধি ও সিদ্ধি ছিল করতলগত। তিনি প্রায়ই বলতেন — ১) আমি ভাগ্য গণনা করতে পারি না।

২) টাকা পয়সা দিতে পারি না, ৩) মামলা-মোকদ্দমায় জয়, ৪) ছেলের চাকরী ও মেয়ের বিয়ে কবে হবে বলতে পারি না। ৫) আলুর দোকানে পটল, পটলের দোকানের জিলিপি, জিলিপির দোকানে রেভিনিউ কি পাওয়া যায়? ঠিক সেইরকম পরমার্থের দরবারে অর্থ চাইলে পাবে না হে, পাবে না। ৬) এই স্বার্থপর জগতে প্রকৃত প্রেম বলে কিছু নেই। এ জগতে কেউ কাউকে ভালবাসে মানে তার পিছনে স্বার্থ আছে। প্রেমময় পুরুষকে লাভ করতে হলে চাই প্রাণের আকুতি, গভীর প্রেম এবং গুরুর কৃপা আর চাই শ্রদ্ধা, কঠোর সংযম ও সাধনা। ৭) আমাকে তোমরা Charitable dispensary বা Employment exchange এ পরিণত কোর না। ৮) আমি নর্মদা মায়ীর একটা পাণ্ডা ছাড়া আর কিছুই নই। যে সে পথে চলতে চাইবে, আমি তার সহায়। আমি কেবলমাত্র পথ দেখিয়ে মন্দির দুয়ার পর্যন্ত্য পৌঁছে দিতে পারি। আর কিছু পারি না। ৯) ভক্তি ভালো, তবে ভক্তির ভাঁড়ামো ভালো নয়। ধর্মে উচ্ছ্বাস আবেগের স্থান নেই। ভক্ত হতে হলে গুপ্ত হতে হবে।

প্রকৃত প্রেম যেমনি মোহন।
তেমনি কঠোর তেমনি গোপন॥

১০) আমার লোক তৃষ্ণাও যত, লোক ভয়ও তত। যারা ভজন-ভুখা, আমি তাদের জন্য তৃষিত চাতকের মত আকুল প্রতীক্ষায় আছি আর যারা ভোজনের ভুখা তাদেরকে আমার বড্ড ভয় করে। ১১) মনে রেখ ঋষিরা এক হিসাবে বড় বিপজ্জনক ব্যক্তি। তিনি তোমার কর্ম adjust করতে জানেন। কিন্তু তুমি তাঁর কাছে যত স্বার্থের বক্‌বকম্ করবে ততই তিনি তোমার কর্মের বিন্দু থেকে সরে আসবেন। তুমি ফাঁসবে, তুমি ডুববে। পরপর কর্মের ঢেউ-এ তুমি হাঁসপাঁশ করবে। আর যদি নীরব থাক — শুধু চুপিসারে যাও আস, তাহলে তিনি প্রতি দৃষ্টিপাতে কর্মবিন্দুটি তরল করে দেবেন। তখন দুঃখটাকে সেইমত ভোগ করিয়ে নিয়ে তোমার কুঁড়েঘরে সুখের জ্যোৎস্না এনে দেবেন।

১২) শালগ্রাম শিলা দিয়ে বাটনা বাটতে বা মশারির পেরেক পুঁততে চেও না। সাধুরা রয়েছেন তোমাকে অমৃতের দেশে অভয় আনন্দলোকে নিয়ে যেতে। তাঁকে সংসারের তুচ্ছ কামনা-বাসনা পূরণে লাগিও না।

১৩) প্রেমময় 'প্রীতম' কে ভালবাসতে হলে প্রথমে চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। অন্তর যদি সর্বত্র কলুষিত ও কর্দমাক্ত থাকে তবে তিনি বসবেন কোথায়। প্রথমে তাঁকে বসার মত একটু 'ঠাঁই' না দিলে অর্থাৎ তাঁর প্রতি একটু টান না থাকলে তিনি বসতে পারেন না। তিনি প্রেমের কাঙাল অথচ স্বার্থপর জগতে কারও এতটুকু প্রেম তাঁর প্রতি আছে? তিনি চান আমাদের কাছে প্রেম আর ভক্তি। আমরা যত কাদাই মাখিনা কেন তাঁকে যদি একটু আসন পেতে বসবার স্থান করে দিতে পারি, তিনি সমস্ত কর্দম ও কলুষ পরিষ্কার করে তাঁর জিনিষ তাঁর কাছে টেনে নেন।

শংকরভারতীজী নীরব হলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলতে শুরু করলেন — বর্তমানে চৈতন্যের সঙ্গে জ্ঞান-বিচারের মাত্রাও নেমে গেছে। সারা বিশ্বের মনীষী বেদ-উপনিষদকেই (পুরাণ তন্ত্র নয়!) প্রামাণ্য ও ভারতের শ্রেষ্ঠ গৌরব বলে মেনে নিয়েছেন। সব পুরাণই ভাগবত-পুরাণের মত মিশ্র-নৈতিক নয়, তবে ভাগবতের অর্বাচীনত্ব এবং তার মধ্যে সহজিয়ারা যে আদিরস smuggle করেছে — বুঝবার জন্য মণ্ডন মিশ্রের স্ত্রীর শরণাপন্ন হতে হবে না। তা এত স্পষ্ট এবং প্রাঞ্জল যে একমাত্র ধর্মের নেশায় যারা বুঁদ তন্দ্রাচ্ছন্ন তারা ছাড়া সবাই বুঝবেন — ভাগবত কোন ঋষি প্রণীত শাস্ত্র নয়।

আমি — কোণারকের চিত্র দেখে আমারও অনেক কথা মনে হয়েছিল। বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পার্ষদ রায় রামানন্দ প্রভৃতি গুপ্তভাবে সহজিয়া সাধনের রসে মগ্ন ছিলেন। রামানন্দ ও নিত্যানন্দের ধারা বলে পরিচয় দেয় এমন ২/৪ জন বৈষ্ণবদের সঙ্গে পরিচয় করে অনেক কষ্টে জানতে পেরেছি — তাদের ন্যক্কারজনক সাধনার ক্রম! তলে তলে তান্ত্রিকদের প্রভাবও কম যায় না। রাসলীলার পূর্বে কাত্যায়ণী উপসনার রোচক কাহিনীটি ভাগবতে তান্ত্রিকদের যোজনা! সহজিয়া বৈষ্ণবদের কিশোরী ভজন, তান্ত্রিকদের চক্রে বসে ভৈরবী সাধক — উভয়তন্ত্রের রস ভাগবতে মিশে গেছে, Dr. R. C. Hazra প্রমাণ করেছেন ভাগবৎ পুরাণ বিষ্ণু ও বায়ুপুরাণের (গুপ্তযুগে) বহু পরে। তাদের ২/৩ শতক আগে হয়ত এক নৈতিক অবনতি ঘটেছিল! বৌদ্ধ-সিদ্ধদের দোহা পাঠ (৯০০ খৃঃ) জানা যায় তখন ডোমনীয় নারী ছিল মন্ত্রদাত্রী গুরু!

শংকরভারতীজী — ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পরিক্রমা করে জেনেছি বহু গবেষক পণ্ডিত ভাগবতের

রচনাকাল এবং রচয়িতা কে তা জানেন, ভাগবত যে বেদব্যাসের লেখা নয় — অন্ততঃ সে সম্বন্ধে অনেকেই নিঃসন্দেহ। বিশুদ্ধ ট্র্যাজেডি এই যে তাঁদের গবেষণা অপার পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর হলেও সাধারণে যে আবার দেখা যায় ভাগবত শ্রবণ করতে করতে দরবিগলিত অশ্রু হতে। নিজের বাড়ীতে রাসযজ্ঞ রাসোৎসব ভাগবত পাঠ ইত্যাদিতে একটা মোটা টাকা ব্যয় করতে। জাতীয় চরিত্রে একটা অধোমুখীন গতি দেখা দিয়েছে; চিন্তা জগতেও দারুণ দৈন্য! দল উপদলের প্রচার বিভ্রাটের মহিমায় জ্ঞানী গুণীদের দৃষ্টি আজ ঝাপসা। Mass mind এ আসন হারাবার ভয়ে সাধারণের বিশ্বাস ও সংস্কার বিরোধী তত্ত্ব ও তথ্য প্রকাশে পলায়নী মনোবৃত্তির পরিচয় পাই। গুরুবাদ অবতারবাদের চেয়েও মারাত্মক। দাদাবাদ এবং তৈলতন্ত্রের মহিমায় নিজেদের অনুভবকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় প্রকাশ করতেও তাঁদের দ্বিধা। স্থায়ী আসন গেড়ে বসেছেন তথাকথিত ধর্মগুরু আর তৈলতন্ত্রের চক্রেশ্বররা!

আমি — আপনি ঠিক বলেছেন। ভাগবত বেদব্যাসের লেখা হতেই পারে না। ভাগবতের টীকাকার শ্রীধরস্বামী খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক। ইনি আচার্য শঙ্করের পরে এসেছিলেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে শঙ্কর আবির্ভূত হয়ে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করে যান। তিনি প্রধান প্রধান উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতার টীকা ভাষ্যাদি রচনা করে গেছেন। ঐ সময় পর্যন্ত যদি এই ভাগবতের অস্তিত্ব থাকত তাহলে তিনি খণ্ডন বা মণ্ডনের জন্য এই বই-এর সম্বন্ধে কিছু লিখতেন। কিন্তু তাঁর প্রচারের মধ্যে ভাগবতের নামগন্ধও নেই। তাতেই মনে হয়, এই বৈষ্ণবমান্য ভাগবতটি আচার্য শঙ্করের পরে এবং শ্রীধরস্বামীর পূর্বে লিখিত হয়েছে। বিশেষ করে ভাগবতেরই দ্বিতীয় স্কন্ধের সপ্তম অধ্যায়ে এবং চতুর্থ স্কন্ধের ঊনবিংশ অধ্যায়ে জৈন বৌদ্ধ তান্ত্রিক কাপালিক ধর্মাদিকে 'পাষণ্ড মত' বলে নিন্দা করা হয়েছে। কাজেই জৈন ও বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষে প্রচারিত হওয়ার পরে যে ভাগবত রচিত এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই করা যেতে পারে না। কাজেই বেদব্যাসের লেখা কি করে হতে পারে? আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত মহর্ষি দয়ানন্দের মতে শ্রীমদ্ভাগবত 'হেমাদ্রি' গ্রন্থ রচয়িতা বোপদেবের লেখা (সত্যার্থ প্রকাশ)। 'হেমাদ্রি' গ্রন্থে লেখা আছে,

"শ্রীমদ্ভাগবতং নাম পুরাণঞ্চ ময়েরিতম্।
বিদুষা বোপদেবেন শ্রীকৃষ্ণস্য যশোঽন্বিতম্।"

ভাগবত যে বোপদেবের লেখা, সে কথা নগেন সরকার প্রণীত বাংলা 'বিশ্বকোষ' এবং সুবল মিত্রের বাংলা অভিধান গ্রন্থেও উল্লেখ করা আছে।

ভাগবতের সঠিক লেখক কে, কোন সময় লেখা হয়েছিল সে সমন্ধে আমি কোন বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়ে, ঐ ভাগবতের ঘটনা এবং বিষয়বস্তুর অসংলগ্নতা, অসামঞ্জস্য এং অসারতা বিচার বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিয়ে দিয়ে প্রমাণ করতে পারি এই অর্বাচীন গ্রন্থটির লেখক আর যেই হোন না কেন — মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র এবং গীতা প্রণেতা মহর্ষি বেদব্যাসের লেখনী থেকে ঐ রকম পরস্পর বিরুদ্ধ ঘটনা, তত্ত্ব, তথ্য এবং সংকীর্ণ ভাবধারায় পরিপূর্ণ সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ লিখিত হতে পারে না।

প্রথমেই বিচার করে দেখুন, শুকদেব পরীক্ষিৎকে এই ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন বলে যে বর্ণনা আছে — এটি কত বড় প্রচণ্ড মিথ্যা!

কারণ, মহাভারতে বৈশম্পায়ন কৃত ভীষ্ম বাক্য বর্ণনায় জানা যায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই শুকের দেহান্ত হয়েছিল।

ভীষ্ম উবাচ —

'নারদেনাভ্যনুজ্ঞাতঃ শুকো দ্বৈপায়নাত্মজঃ।
অভিবাদ্য পুনর্যোগমাস্থায়াকাশমাবিশৎ॥'৯

নারদের অনুজ্ঞা নিয়ে শুকদেব যোগাবলম্বন করতঃ আকাশে আবেশ করলেন। অনন্তর তিনি প্রজ্বলিত বিধুম পাবকের ন্যায় নিত্যনির্গুণ লিঙ্গবর্জিত আদিত্যান্তর্য্যামী পরব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত হলেন —

'ততস্তস্মিন্ পদে নিত্যে নির্গুণে লিঙ্গবর্জিতে।
ব্রহ্মণি প্রত্যতিষ্ঠৎ স বিধুমোঽগ্নিরিব জ্বলন্॥'

শুকদেবের বিদেহ কৈবল্য লাভ হল; তিনি সর্বগত, সর্বতোমুখ এবং সর্বাত্মা হয়ে গিয়েছিলেন —

'শুকঃ সর্বগতো ভূত্বা সর্বাত্মা সর্বতোমুখঃ। ২৩
অন্তর্হিতঃ প্রভাবং তু দর্শয়িত্বা শুকস্তদা
গুণান্ সন্ত্যজ্য শব্দাদীন্ পদমভ্যগমৎপরম্।।' ২৬

শুকের এই মহাপ্রয়াণ হওয়ায় ব্যাসদেব পুত্রশোকে অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়লেন। মহাদেব তখন আবির্ভূত হয়ে তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিলেন —

'স গতিং পরমাং প্রাপ্তো দুষ্প্রাপাম জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
দৈবতৈরপি বিপ্রর্ষে! তং ত্বং কিমনুশোচিসি।।' ৩৬

(মহাভারত, শান্তিপর্ব, ৩৩৩ অধ্যায়)

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই যাঁর দেহপাত হয়ে গেল তাঁর পক্ষে পুনরায় যুদ্ধশেষের বহু পরে, দ্বাপরের ব্রহ্মশাপগ্রস্থ পরীক্ষিতকে সেই শুক কর্তৃক ভাগবতরূপী হরিকথা শোনানো কি করে সম্ভব? এই রকম হাজার হাজার অসংলগ্ন বাক্যে ভাগবত পরিপূর্ণ। মহাভারত এবং ভাগবতের মধ্যে এত অসামঞ্জস্য আছে — তা তুলনামূলকভাবে দেখতে গেলে একটা বড় বই হয়ে যাবে। যদি ভাগবত বেদব্যাসেরই রচনা হয় তাহলে একই ব্যক্তির রচিত মহাভারত এবং ভাগবতের ভাব, মতবাদ, সিদ্ধান্ত এমন কি বিভিন্ন চরিত্র বর্ণনায় এত তফাৎ কেন? যদি 'অপ্রাকৃত চিন্ময় শ্রীবিগ্রহ' বৈষ্ণবদের মত বলেন যে, পরীক্ষিতের নিকট শুকদেব অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ নিয়ে প্রকট হয়ে ভাগবত কথা শুনিয়ে গেছেন তাও যুক্তিতে দাঁড়ায় না। কারণ, ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে পরীক্ষিত গঙ্গাতীরে যখন প্রয়োপবেশনে ছিলেন মুনিগণ পরিবৃত হয়ে, তখন শুকদেব 'যদৃচ্ছক্রমে ভ্রমণ করতে করতে' সেখানে এসে পৌঁছলেন। ভাগবতকার শুকদেবের বর্ণনা দিচ্ছেন 'তং দ্ব্যষ্টবর্ষং সুকুমারপাদ তাঁর বয়স ষোল বৎসর। দেহ শ্যামবর্ণ, গঠন সুবলিত, বেশ দিঙমাত্র (উলঙ্গ), কেশজাল ধূলিধূসরিত —'দিগম্বরং বক্রবিকীর্ণ কেশং ... স্ত্রীণাং মনোজ্ঞ রুচিরাস্মিতেন'— ইত্যাদি।

যদি অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহেই তিনি উপদেশ দিয়ে থাকেন তাহলে সেই চিন্ময় সূক্ষ্মদেহের কি ষোল বছর পরিমাণ পরিচ্ছিন্ন বয়স নির্ণয়, কেশজাল শ্যামবর্ণ ইত্যাদি থাকবে। কোন চিন্ময় বস্তুর যে দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বয়স, বর্ণ, প্রাকৃতিক গঠন পরিপাট্য ইত্যাদি থাকতে পারে না, সর্বজ্ঞ বেদব্যাসের কি সেই জ্ঞানটুকু নেই? কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বেই যাঁর দেহান্ত হয়েছে, তাঁর মুখ দিয়ে পরীক্ষিতকে ভাগবত শোনানোর আখ্যায়িকা বেদব্যাস কি করে বর্ণনা করতে পারেন? জীবন্মুক্ত শুকদেবের পিতা ঋষি বেদব্যাসের কখনও এ ভ্রম হতে পারে না, তিনি ভাগবত রচনাও করেন নি।

শংকরভারতীজী নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' বলে আদর করতে লাগলেন। বললেন — আভি চলিয়ে মন্দির পরিক্রমা করুঙ্গা। আমরা তাঁর সঙ্গে শিবমন্দিরে ফিরে এলাম। আমাদের সঙ্গে শংকরভারতীজীকে দেখে পুরোহিতজী দৌড়ে এলেন। বললেন — বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে চিন্তা করছিলাম। আপনাদের ভোগ প্রস্তুত। পুরোহিতজী শংকরভারতীজীকেও প্রসাদ গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। কিন্তু তিনি রাজী হলেন না। আমাদের হাত ধুয়ে বসতে না বসতেই পুরোহিতজীর বাড়ী থেকে খাবার এসে গেল। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর আমরা যে যার মত বিশ্রাম করছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পুরোহিতজীর কণ্ঠস্বরে আমরা জেগে উঠলাম। তিনি বলতে লাগলেন — আপনারা পরিক্রমাবাসী তাই আপনাদেরকে এই পীঠের কাহিনী বলছি। মন দিয়ে শুনুন। এই তীর্থ এক এক যুগে এক এক নামে পরিচিতি লাভ করেছে। সত্যযুগে এই তীর্থের নাম ছিল সপ্ত-সারস্বত। এই যুগে সরস্বতী নদী এক এক স্থানে এক এক নামে বিরাজিত। এই নামগুলি হল — সুপ্রভা, কাঞ্চনাক্ষী, বিশালা, মনোরমা, ওঘবতী, সুরেণু ও বিমলোদা। পূর্বকালে পূজনীয় ব্রহ্মা পুষ্কর তীর্থে মহাযজ্ঞে রত হয়ে সরস্বতী নদীকে স্মরণ করলে তিনি সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলে তাঁর নাম সুপ্রভা। মুনিরা নৈমিষারণ্যে এসে বেদচর্চা ও হোমকালে মহাভাগা ও পবিত্রা সরস্বতী নদীকে স্মরণ করলে তিনি সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলে তাঁর নাম হয় কাঞ্চনাক্ষী। গয়রাজা গয়দেশে এক মহাযজ্ঞের আয়োজন করে সরস্বতী নদীকে স্মরণ করলে তিনি সেই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলে তাঁর নাম হয় বিশাল। উত্তর কোশল দেশে উদ্দালক মুনি ও তরুবল্কল ও মৃগচর্মধারী এক বিশাল মুনিমণ্ডল সমবেত হয়ে যজ্ঞকালে সরস্বতী নদীকে স্মরণ করলে তিনি সেই যজ্ঞস্থলে আবির্ভূতা হলে তাঁর নাম হয় মনোরমা। মহাত্মা

বশিষ্ঠ কুরুক্ষেত্রে যজ্ঞকালে দিব্যজলা সরস্বতীকে আহ্বান করলে তাঁর নাম হয় ওঘবতী। রাজর্ষিগণ সেবিত পবিত্র ঋষভ দ্বীপে এবং কুরুক্ষেত্রে মহাত্মা কুরুরাজের যজ্ঞে মহাভাগা সরস্বতী নদীর আবির্ভাব হলে তাঁর নাম হয় সুরেণু। ব্রহ্মা হিমালয় পর্বতে যজ্ঞকালে সরস্বতী নদীকে আহ্বান করলে তাঁহার নাম হয় বিমলোদা।

এই সাতটি সরস্বতী নদী এক হয়ে এই তীর্থে এসে যজ্ঞ করেছিলেন বলে এই তীর্থের নাম সপ্তসারস্বত।

ইস তীর্থকা দুসরা কিস্সা এহি হ্যায় কী — ত্রেতাযুগে সত্যসেন নামে এক রাজার স্ত্রীর নাম ছিল শৃঙ্গারবল্লরী। তার মুখমণ্ডল ছিল মর্কটাকৃতির। সেই রাজা-রাণী একবার শিকারে বেরিয়ে এই নর্মদাস্থিত বেদা-সঙ্গমে এসে উপস্থিত হয়ে শিকারের পিছনে ছুটতে ছুটতে রাজা রাণীকে ছেড়ে গভীর বনে প্রবেশ করেন। এখানের বেদেশ্বর শিবজীর সুরম্য উদ্যানে বেড়িয়ে, নর্মদায় স্নান করে ও শিবপূজা করে শৃঙ্গারবল্লীর দিন কাটতে থাকে। যথাকালে রাজা শিকার থেকে ফিরে স্ত্রীর মুখাকৃতির পরিবর্তন দেখে হতভম্ব হয়ে যান।

এই বেদেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাতা কে তা জানা না গেলেও এই মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করেন জগন্নাথ মণ্ডল সংবৎ ১৬৩৫ সালে।

ইস্ তীর্থকী তিসরা কিস্সা শুনিয়ে। দ্বাপর যুগের দ্বিতীয় ভাগে মংকনক নামে ঋষি এই বেদা সংগমে শিবের আরাধনায় মগ্ন থাকাকালে শিবের আশীর্বাদে বিশ্বরূপ দর্শন করেন এবং আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করতে থাকেন। তাঁর নৃত্যে তিনলোকই কাঁপতে থাকে এবং তিনলোক ধ্বংসের সম্মুখীন হয়। তখন ব্রহ্মাজী অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে শিবের কাছে উপস্থিত হয়ে মংকনকের তাণ্ডব নৃত্য থামিয়ে ত্রিলোককে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রার্থনা জানান। শিবজী অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে এই তীর্থে উপস্থিত হয়ে ঋষিকে নৃত্য বন্ধ করার কথা বললে ঋষি বলেন আমি আমার শরীরের মধ্যে বিশ্বকে দর্শন করে সেই আনন্দে নাচছি। তখন শিবজী তাঁর আঙ্গুল দিয়ে মুনিকে স্পর্শ করেন। সঙ্গে সঙ্গে মুনি ভস্মীভূত হন। তাঁর দেহ নিঃসৃত ছাই থেকেই এই বেদেশ্বর শিবের উৎপত্তি। এর অপর নাম মংকনেশ্বর।

তাঁর কথা শেষ হল, সূর্যাস্তও হয়ে গেল। আমরা মন্দিরের বারান্দায় বসে রইলাম। পুরোহিতজী উঠে গিয়ে শিবের আরতি আরম্ভ করলেন। আরতি শেষ হতে সন্ধ্যা সাতটা বেজে গেল। রঞ্জন আমাকে জিজ্ঞাসা করলো — আমাদের মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা চলে আসছে এমনভাবে যে অসুর বলতেই বিকটদর্শন, রক্তপিপাসু, নরখাদক দস্যু, নারীহরণকারী আর গোটা মানুষ জীবজন্তু গিলে ফেলাই তাদের স্বভাব; বলুন তো ভাই, আপনিও কী এই মত পোষণ করেন।

— না, অসুররা যে মনুষ্যাকৃতি কিংবা মানুষের দৈহিক সৌন্দর্যের চেয়েও আরও রূপবান ছিলেন, সে সমন্ধে মহাভারত এবং অন্যান্য শাস্ত্রেও প্রমাণ পাওয়া যায়। মহর্ষি কশপ্যের ঔরষে দিতির গর্ভে দৈত্যরা, দনায়ুর গর্ভে দানবরা জন্মেছিলেন, এঁরা ব্রাহ্মণ ছিলেন। এইজন্য বৃত্রাসুরকে বধ করায় ইন্দ্রকে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হতে হয়েছিল। দৈত্য দানব অসুরদের সঙ্গে, মানুষের বিবাহ সম্বন্ধ ছিল, যযাতি দৈত্যরাজ বৃষপর্বার কন্যা শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করেছিলেন। এঁরা জ্ঞান বিজ্ঞান পরাক্রমে মহা উন্নত ছিলেন। মহাভারত বিষ্ণুপুরাণ অগ্নিপুরাণাদি পাঠ করে, এ বিশ্বাস আমার আছে যে ঐ সব অসুর সম্বন্ধে যতই কাল্পনিক আজগুবি গল্প প্রচার হোক না কেন, এঁরা যে মনুষ্যাকৃতি, মানুষেরই সমগোত্রীয় , উন্নত ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দেবতার শত্রু হিসাবে অসুরদের সম্বন্ধে শাস্ত্রে যে চিত্রই থাকুক না কেন, আমার তো মনে হয় তাঁরাও সুসভ্য মনুষ্যদেহধারী ছিলেন। পুরাণকারদের মুক্তকচ্ছ কল্পনার স্রোতে এবং যাত্রাদলের মহিমায় হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু মধুদৈত্য ও লবণাসুররা হয়েছে ভয়ানক — বিকটদেহী, হয়গ্রীব হয়েছে ঘোড়ামুখো, অসিলোমার গায়ে অসির মতো ধারালো লম্বা লম্বা চুল, আর ভস্মাসুরের মুখ থেকে তো অনবরত ভস্ম উড়ছে। তাদের নৃশংস ও পৈশাচিক কার্যকলাপের কুসুমিত পল্লবিত কাহিনীতে পুরাণের পাতাগুলি পরিপূর্ণ। কিন্তু পুরাণকাররা যাই বলুক, অসুররা ছিলেন এক বিরাট সংস্কৃতির ধারক ও বাহক।

এ বিষয়ে আমার নিজেরও কিছু অনুসন্ধান আছে। আমি তখন দশম শ্রেণীর ছাত্র। বাবার সঙ্গে সিংভূম গিয়েছিলাম। তখন গাঙ্পুর ষ্টেটের সভাপণ্ডিত ছিলেন পণ্ডিত তিতারাম বাচস্পতি। তিনি বাবার বন্ধু ছিলেন, তাঁরই আমন্ত্রণে আমরা সিংভূম হয়ে গাঙ্পুর যাই। সিংভূম হয়ে গাঙ্পুর পর্যন্ত প্রায় ৮০ মাইল জায়গা জুড়ে অজস্র তামার খনির নিদর্শন দেখা যায়। শুনেছিলাম ভূতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে সেখানে অনেক Dolmen

পেয়েছিলেন। ঐ বিরাট অঞ্চলটার নাম — অসুরগড়। মহানন্দার সামান্য একটু পূর্বে একটি দুর্গের ধ্বংসাবশেষ দেখেছিলাম, সেই দুর্গটির নামও — অসুরগড়। বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম — 'এখানে কি কোন অসুর থাকতো?' বাবা বলেছিলেন — 'অসুর বলতে দৈত্যদানা মানুষখেকো কোন জীব ভাবিস্ নে! অসুররা ভারতেরই একটি সভ্য জাতি। আমি হায়দ্রাবাদেও একটি স্থান দেখেছি, তারও নাম অসুরগড়, সেখানেও তামার খনি আছে। অসুররা তামা ভালবাসতেন। দ্রাবিড়রা ঐ অসুরগড়কে বলেন —'রাক্ষসগুড়িয়ম্'।

পরবর্তীকালে Indian Antiquary তে কীলহর্ণ সাহেবের সম্পাদিত একটি তাম্রশাসনের অনুলিপি দেখি। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কীলহর্ণ ঐ তাম্রশাসনটি সম্পাদনা করেন। তাতে লেখা আছে —

'ওঁ স্বস্তি শ্রীপ্রয়াগসমীপ-গঙ্গাতটবাসে-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীবিজয়পালদেব-পদানুধ্যাত-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীরাজ্যপালদেব-পাদানুধ্যাত-পরমভট্টারক-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-শ্রীমন্ত্রিলোচনপালদেবঃ অসুরাভক বিষয়ে লেড়ুগুাকগ্রামে সুমপগতান্ রাজপুরুষান্ ব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ।"

তাম্রশাসনটির তারিখ - ১০৮৪ বিক্রমাব্দ। এর অর্থ হল — পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর রাজ্যপালদেবের পাদানুধ্যাত ত্রিলোচন-পাল প্রয়াগ সন্নিকটে গঙ্গাতীরে বাসকালে (অসুরাডক) বিষয়ান্তর্গত লেড়ুগুাক গ্রামে যে সমস্ত রাজপুরুষ এবং ব্রাহ্মণোত্তরগণ উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদেরকে সংবাদ দেন। এখানে অসুরাডক শব্দটি লক্ষ্য করুন, এর অর্থ — অসুররাজদের অধিকারভুক্ত। অর্থাৎ বিজয়পালদেব, রাজ্যপালদেব এবং ত্রিলোচনপালদেব প্রভৃতি অসুরবংশের রাজা ছিলেন। তাঁদের নিরীহ নামগুলি থেকে কি তাঁদেরকে পাতাল বা সমুদ্রগর্ভবাসী কোন অন্ধকার রাজ্যের বীভৎস কোন জীব বলে মনে হচ্ছে?

আসল কথা — অসুররা আমাদেরই মত মানুষ। ভারতেরই একটি সুপ্রাচীন জাতি। এই অসুরদেরই একটি শাখা ইরাণে গিয়ে বসবাস করেছিল। ইরাণীদের ধর্মগ্রন্থ আবেস্তাতে 'অহুর' শব্দটি অসুর শব্দেরই অপভ্রংশ। শব্দটি খুবই মর্যাদাসূচক। আহুর মাজদা তাঁদের পরমেশ্বরের নাম। বেদে ১০৫ বার অসুর শব্দের উল্লেখ আছে। তার মধ্যে ৯০ বারই ভাল অর্থে ব্যবহৃত। যেমন — অসুরঃ অসু ক্ষেপণে শত্রুণ্ ইত্যসুরঃ। যারা শত্রুদের উপর ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপে পটু তারা অসুর। কিংবা — অসুন্ প্রাণান্ রাতি দদাতি ইত্যসুরঃ। যারা প্রাণদান করে, যাদের মধ্যে দুর্দম প্রাণশক্তির প্রকাশ দেখা যায়, সেই সমস্ত বলিষ্ঠ বীররাই অসুরপদবাচ্য। যাস্ক তার নিঘন্টু ও নিরুক্ত গ্রন্থে (৩/৮) বলেছেন যে অস্ ধাতু হতে অসুর শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। তাঁর মতে অস্ শব্দ — যার অর্থ শ্বাসবায়ু — তা হতেও অসুর শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে। তাঁর মতে অসু শব্দ — যার অর্থ শ্বাসবায়ু — তা হতেও অসুর শব্দ নিষ্পন্ন হতে পারে।

বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে যারাই শৌর্যে বীর্যে বড় হতেন, তাঁরাই অসুর উপাধিতে ভূষিত হতেন। রুদ্র, মরুৎ, দ্যৌ, বরুণ, ত্বষ্টা, অগ্নি, বায়ু, পুষা, সবিতা, পর্জন্য — এঁদের অলৌকক শক্তি ছিল বলে এঁদেরকে বৈদিক ঋষিরা অসুর বলতেন। যথা —

মরুৎ (ঋগ্বেদ ৬৪/২)	—	তে জজ্ঞিরে দিব ঋষ্বাস উক্ষণো রুদ্রস্য মর্যাসুরাঃ অরেপসঃ।
রুদ্র (ঋগ্বেদ ৫/৪২/২১)	—	যক্ষ্বামহে সৌমনসায় রুদ্রম্ নমোভির্দেবং অসুরং দেবস্য।
দ্যৌ (ঋগ্বেদ ৩১/১)	—	ইন্দ্রায় হি দ্যৌরসুরো ইত্যাদি
ইন্দ্র (ঋগ্বেদ ৫৪/৩)	—	বৃহচ্ছবা অসুরো বর্হনা কৃতঃ পুরো হরিভ্যাং বৃষভো রথো হি ষঃ।
বরুণ (ঋগ্বেদ ২/২৭/১০)	—	ত্বং বিশ্বেষাং বরুনাসি রাজা যে চাদেবা অসুর যে চ মর্ত্তঃ।
অগ্নি (ঋগ্বেদ ৫/১২/১)	—	প্রাগ্নয়ে বৃহতে যজ্ঞিয়ায় ঋতস্য অসুরায় মন্ম।

সেযুগে ধর্মীয় আচার আচরণকে কেন্দ্র করে ভারতীয়রা দুটি ভাগে ভাগ হয়ে গেছলেন। একদল বেদ মানতেন। সেই বেদপন্থীদের মধ্যে ভৃগু অগ্নিপূজার প্রচলন করেন। তাঁরা যজ্ঞ নিয়ে মেতে রইলেন; এঁদেরই নাম হল — দেব। শতপথ ব্রাহ্মণে তাই দেবের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে — যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ (১-৫/৫/২৬); আর যাঁরা যজ্ঞ করতেন না, তাঁদের নাম হয়ে গেল - অসুর। প্রথম প্রথম দেব ও অসুরের মধ্যে খুব সৌভ্রাতৃত্ব ছিল। কিন্তু পরে খুব শত্রুতা দেখা দেয়, অনেক বড় বড় যুদ্ধ হয়। দেবতাদের নেতা ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করেন। শত্রুতা সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'অসুর' শব্দটি খারাপ অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকলো — যেমন অসুরাঃ রাক্ষসাঃ দেবনিন্দকাঃ ইত্যাদি। ১০৫ বারের

মধ্যে ৯০ বার বাদ দিলে বাকী ১৫ বার ঐ রকম খারাপ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। তাই থেকেই কল্পনা-সম্রাট পুরাণকার থেকে আরম্ভ করে ঠাকুরমার ঝুলির রচয়িতার হাতে পড়ে অসুররা এক ভীতিপ্রদ অমানুষের পর্যায়ে নেমে গেল।

বৈদিক যুগের শেষভাগে যজ্ঞবাদী আর্যদের সঙ্গে অসুরদের বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। অসুরজাতির অধিকাংশ ভারত ত্যাগ করে পারস্য ও তুর্কীস্থানে গিয়ে বাস করতে থাকেন। বাকী যাঁরা রইলেন, তাঁরা প্রয়াগ, ছোটনাগপুর, তিব্বত বা কামরূপের দিকে চলে যান। পূর্বে যে তাম্রশাসনের উল্লেখ করেছি, সেই তাম্রশাসন বর্ণিত প্রয়াগের ত্রিলোচনপালদেব প্রভৃতিরা এই অসুর জাতিরই শাখা। ছোটনাগপুরে এখনও একটি জাতির সন্ধান পাওয়া যায় — সংখ্যায় অল্প হলেও এরা অসুর জাতি নামে পরিচিত। এরাও তাম্রপ্রিয়, ছোটনাগপুরের তাম্রখনিতে কাজ করে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌রা এদেরকে সেই প্রাচীনকালের বিধ্বস্ত ও বিতাড়িত অসুরদেরই বংশধর বলে মনে করেন।

ওদিকে, অসুরদের যে বড় দলটি ভারতের বাইরে গেলেন, এখন হতে ৫ হাজার বছর পূর্বে তারাই ব্যাবিলনের শতক্রোশ উত্তর পশ্চিমে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্যের নাম হয় 'অসুর' বা 'আসীরিয়া'। টাইগ্রীস নদীর উপকূলে এঁদের যে রাজধানী স্থাপিত হয় তার নাম হয় — অস্‌সুর। আসীরিয়দের এক গ্রাম্য দেবতার নামও হয় — অস্‌সুর। আসিরীয়দের সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রাম্য দেবতা জাতীয় দেবতায় পরিণত হয়। আসিরীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার একটি। ব্যাবিলনের বন্দর এরিডুতে যে দেবতার পূজা হত, তাঁরও নাম ছিল অসরি (Asari)। এই নাম যে অসুর শব্দের অপভ্রংশ তা ধারণা করা চলে। ব্যাবলনীয়দের রাজন্যবর্গের নামমালার মধ্যে অসরু (Asuru), অসুর-নসির-পাল (Asurnasipal), অসুর-বনিপাল (Asurbanipal) নামগুলি পাওয়া যায়। মোট কথা, যাদের বাসস্থানের নাম আসিরীয় বা অসুর, রাজাদের নাম অসুর উপাধিযুক্ত এবং উপাস্য দেবতার নাম অসরি বা অস্‌সুর তারাই অসুর নামে অভিহিত।

ভারতীয় অসুরগণ দুর্গ নির্মাণে পটু ছিলেন। বেদে তার বহু প্রমাণ পাই। শম্বর অসুরের ছিল ৯০টি দুর্গ (ঋগ্বেদ ১/১৩০/৭)। বর্চী অসুরের লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ছিল, তিনি নিজেও ছিলেন দুর্দান্ত বীর (ঋ ১০/১৫১/৩)। পিপ্রু অসুরেরও বড় কেল্লা ছিল। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দেখি ইন্দ্র পিপরুর কেল্লা নষ্ট করে দিয়েছিলেন (১০/১৩৮/৩)।

এদিকে আসিরীয় অসুরদের যে পরিচয় পাই, তাতে তারাও যে যুদ্ধবিদ্যায় পটু ছিলেন তারও ইতিহাস সম্মত প্রমাণ আছে। তাঁদেরও দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। কালক্রমে বাহুবলে এশিয়া মাইনর হতে ককেশাস পর্বত পর্যন্ত নিজেদের অধিকার বিস্তার করেছিলেন।

ভারতের অসুরজাতি এবং আসিরীয় অসুরজাতি যে একই জাতি তা বলবার আরও তিনটি কারণ আছে —

(ক) আসিরীয়রা দুরকম শ্মশান তৈরী করতেন। একটি ছিল তাঁদের তাঁবুর আকৃতি আর একটি ডিম্বাকৃতি। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখি — দেবতাদের শ্মশান ছিল চতুরস্রাকার আর অসুরদের শ্মশান ছিল গোলাকৃতি —

যা আসূর্য প্রাচ্যাস্তদ্ যে ত্বৎ পরিমণ্ডলানি শ্মশানানি কুর্বতে। (১৩/৪/১/৫)

(খ) দ্বিতীয়তঃ আসীরীয় অসুররা মার্ডুকের প্রতীক পূজা করতেন। এই প্রতীক বাণাকৃতি। Strom God এর পূজাও এদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এদিকে ভারতীয় অসুররাও ছিলেন রুদ্রোপাসক। বেদে রুদ্রও Storm God রূপে চিত্রিত। বাণাসুরের পতাকায় যে 'বাণ' প্রতীক থাকতো, তার বর্ণনা আমরা মহাভারতে পাই।

(গ) তৃতীয়তঃ, ভারতীয় অসুররা মায়া বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। যার জন্য তাঁদেরকে 'মায়াবী' বলা হয়। আসিরীয় অসুরগণও যে অলৌকিক মায়া বিদ্যার অনুশীলন করতেন তা ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে G. Smith Assyrian Discoveries নামক গ্রন্থে বহু গবেষণামূলক তথ্যের দ্বারা প্রমাণ করেছেন। তিনি আসিরীয়দের কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবদেবীর মূর্তিও উদ্ধার করেছেন। এগুলি British Museum এর Bab. Room এ (No. 996-1009) রক্ষিত আছে।

ঐ সমস্ত বৈদিক, ঐতিহাসিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের বলে আমরা কি এখন তাহলে নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে অসুররা ভারতেরই একটি প্রাচীন জাতি, ভারতের আর্য জাতির বংশধর, তাঁরা আমাদেরই মত মনুষ্যদেহধারী এবং আসিরীয়রাই সেই অসুরজাতির বংশধর?

জপ সেরে রাত্রি ১০টা নাগাদ সবাই শুয়ে পড়লাম। কিন্তু সাতপুরা পর্বতের কোলে এই নির্জন তটভূমিতে

মনে হচ্ছে, রাত যেন কত গভীর, কতই নিশুতি। আমি শুয়ে শুয়ে মায়ের কথা ভাবতে লাগলাম। আমার বুকটা গুমরে গুমরে উঠল। আমি নীরবে কাঁদতে লাগলাম। কিছুতেই ঘুম এল না। অত্যন্ত গরম লাগছে। একটি নিশাচর পাখী ডাকছে — 'ক্যার্ ক্যার্ ক্যারর ক্যার। আমি বিছানা থেকে উঠে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসে বসে রইলাম। আমি মা নর্মদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম —

তব আনন্দ-নন্দন হতে নেমে এস ধরণীতে
অধম পুত্র ডাকিছে আজিকে ভক্তি ব্যাকুল চিত্তে।
সকল স্বরূপ হারায়ে যেথায় হয়েছ নিরঞ্জনা,
সেথা হতে আজি নিয়ে এসো মাগো, তোমার প্রসাদকণা।
আসন পেতেছি জননী আমার হৃদয় পদ্মদলে
প্রকটিত হও নিজ মহিমায় ঠাঁই দাও পদতলে
নাহি জানি মাগো পূজা অর্চনা জানিনা পরণারতি
তবু দাও তবে পুণ্য আশিস্ অভয় শরণাগতি।
তৃষিত কণ্ঠে কাঁদে সন্তান, কাঁদে আজ স্নেহহারা
বক্ষে ধরিয়া দাও মা অধরে স্তন্য-পীযূষ-ধারা।
বুকভরা তব স্নেহবন্যায় আমারে ডুবায়ে মাগো
জড়তার মোহ বিদূরিত করি করুণা রূপিনী জাগো!

চারিদিকে এখনও ঘুরঘুটি অন্ধকার, আমি মা নর্মদাকে প্রণাম করে ধীরে ধীরে ফিরে এলাম নিজের বিছানায়। বেদেশ্বর মন্দিরে আরও এক রাত কাটল। সকালে ঘুম ভাঙল রঞ্জনের গানে। তিনি গুণগুণ্ করে আপনমনে গেয়ে চলেছেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বরের মধুর গানের ভাষা বুঝবার জন্য কান পাতলাম। তিনি গেয়ে চলেছেন —

সাধুসঙ্গ ভাল সঙ্গ, বলি সেই সঙ্গ আমার হইল কই।
শুনি সাধুসঙ্গ নিলে পরে এই জন্ম থেকে উদ্ধার হই॥
সোনাতে সোহাগা দিলে কঠিন সোনা যায়রে গলে
সাধুর বাক্যে পাষাণ গলে মোর পাষাণটা গলে কই।
যদি সত্যি সাধুর দেখা পেতাম সাধুর সাথে চলে যেতাম
সাধুর রঙে রং মিশাইতাম, সেই রঙ আমার হোল কই?

তিনি গান করতে থাকলেন, আমরা প্রাতঃকৃত্য সারতে বাইরে গেলাম। এসে দেখি, তিনি সবার গাঁঠরী বেঁধে ফেলেছেন। নর্মদার তীরে তীরে হাঁটা শুরু হল। একই পথ, এবড়ো খেবড়ো পাথরের রাস্তায় হাঁটতে লাগলাম। সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে। আরও আধ মাইলটাক রাস্তা এইভাবে হাঁটার পর দেখলাম নর্মদার গতিপথ আবার বেঁকে গেল। বাঁক ঘুরতেই দেখি নর্মদার তীর থেকে সাতপুরার ধার পর্যন্ত্য এ দিকটা শ্যামল উপত্যকা। রাস্তার ধারে বুনো নিম, তুলো এবং শালগাছ বেশী। মাঠে নানাবিধ ফসলের চাষ হয়েছে, পথঘাট সূর্যরশ্মিতে ঝলমল করছে। নর্মদার উপত্যকা অঞ্চলে হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। বেলা বারটা নাগাদ সাতপীপলীঘাটে পৌঁছে গেলাম। এখানে একটা গাছের তলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। প্রচণ্ড গরম। আর একবার স্নান করবার জন্য নর্মদায় নামলাম।

আমরা উত্তরদিকে মুখ করে স্নান করছিলাম, পেছনদিকে মুখ ফেরাতেই দেখি একজন সৌম্যকান্তি সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ সাধু হাতজোড় করে আমাদেরকে স্বাগত জানালেন — সোমতীর্থমে স্বাগতম্, সুস্বাগতম্। তিনি আমাদের প্রত্যেকে সঙ্গে কোলাকুলি করার পর তাঁর আশ্রমে নিয়ে এলেন। আশ্রমটি পাথরের তৈরী একতলা বাড়ী। সোমনাথ শিবমন্দিরের সংলগ্ন আশ্রম। সাধুজীর অনুমতি নিয়ে আমরা মন্দিরে ঢুকলাম। প্রায় তিন ফুট লম্বা কালো শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের মধ্যস্থলে উজ্জ্বল হলুদবর্ণের বিন্দু ফোঁটার মত জ্বলজ্বল করছে। অর্ধনারীশ্বর শিবলিঙ্গ। আমরা ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। চমকে উঠলাম সাধুজীর কণ্ঠস্বরে। আভি আইয়ে। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে আশ্রমে এসে খেতে বসলাম। সাধুজীর দুজন সেবক পরিবেশন করলেন চাপাটি, অড়হরের ডাল, কড়াই প্রসাদ ইত্যাদি। পরিতৃপ্তসহ ভোজন পর্ব সমাধা হল।

আশ্রমের একটি বড় ঘরে আমাদের থাকার ব্যবস্থা হল। ঘরে রেড়ির তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালানো হয়েছে। সন্ধ্যার পর আশ্রমের বারান্দায় আমরা গল্প করতে বসলাম।

আমি সাধুজীকে তাঁর গুরুর কথা বলতে অনুরোধ করলাম। তিনি জনালেন — তাঁর গুরু পাগল হরনাথ ছিলেন মহাযোগী। কঠোর সাধনার দ্বারা পাগল হরনাথ মহাযোগেশ্বর পদে উন্নীত হন। অষ্টাদশ সিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত ছিল। উনোনে মুর্দাকো জিন্দা করনে বালা মহাত্মা থে। উনকো নাম আপ নাহি শুনা?

আমি উত্তর দিলাম — হ্যাঁ, তাঁর নাম আমি শুনেছি। বাঙালী মাত্রেই বোধহয় তাঁর নাম জানেন। তাঁর জন্ম ১২৭২ সাল, ১৮ই আষাঢ়। জন্মস্থান বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী। পিতৃদত্ত নাম — হরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পিতা - জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়। মাতার নাম - ভগবতী। হরনাথের বয়স যখন মাত্র কুড়িদিন তখন তাঁর পিতার দেহান্ত হয়। মা ভগবতী দেবীই তাঁকে মানুষ করেন এবং স্বগ্রামে কুসুমকুমারী নামে এক ব্রাহ্মণ বালিকার সঙ্গে বিবাহ দেন। শিক্ষাজীবনে তিনি ৩ বার পরীক্ষা দিয়েও বি. এ পাশ করতে পারেন নি কিন্তু পূর্বজন্মার্জিত তপস্যার বলে বিনা আয়াসেই পরাবিদ্যার সর্বোচ্চ ডিগ্রী তিনি লাভ করেছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি অযোধ্যা নামক গ্রামের মাইনর স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে কাশ্মীরের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী স্বগ্রামবাসী মহেশচন্দ্র বিশ্বাসের সহায়তায় কাশ্মীরে চাকুরী লাভ করেন। তাঁর সংসার জীবনটি সুখের ছিল না। জীবদ্দশাতেই তাঁকে তিনকন্যা ও একপুত্রের মৃত্যুশোক সহ্য করতে হয়েছিল। তাছাড়াও জ্ঞাতিবিদ্বেষ, ভ্রাতৃবিরোধ ও তজ্জনিত মামলা মোকদ্দমার হাঙ্গামাও তাঁকে ভোগ করতে হয়েছিল। তিনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ছিলেন না কিন্তু তৎসত্ত্বেও এই ভক্তিসিদ্ধ মহাজন গৃহকেই তপোবনে পরিণত করে গার্হস্থ্যাশ্রমেই নিত্যযুক্ত অবস্থায় বাস করতেন এবং ভজনানন্দে কালাতিপাত করতেন, বর্তমান প্রজন্মে হরনাথের নাম বেশী শোনা না গেলেও একসময় পাগল হরনাথের নাম বাংলা তথা সমগ্র ভারতের ঘরে ঘরে অত্যন্ত ভক্তির সঙ্গে উচ্চারিত হত। মহাত্মা শিশির ঘোষ, মহামহোপাধ্যায় শ্যামাদাস বাচস্পতি, দীনেশচন্দ্র সেন, কবিশেখর কালিদাস রায়, জলধর সেন ও গুরুসদয় দত্ত প্রভৃতি বহু বরেণ্য বাঙ্গালী তাঁকে জীবন্ত দেবতা জ্ঞানে ভক্তি করতেন। বরোদার গাইকোয়াড়, দেওয়াস ষ্টেট মহারাজা, ইন্দোরের মহারাজা এবং ছত্রপুরের মহারাজরা ছাড়াও একমাত্র অন্ধ্রপ্রদেশেই তাঁর ২ লক্ষ ভক্ত ছিল। সারা ভারত জুড়ে পুরী, মাদ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর, বিহার, সিমলা, ডেরাডুন, মথুরা, অযোধ্যায় এবং আমেদাবাদে তাঁর আশ্রম ছিল, এখনও অন্ধ্রে ভদ্রাচলম্, নেলোর, গোদাবরীতটের আত্রেয়পুরম এবং গুন্টুর প্রভৃতি স্থানে তাঁর আশ্রমগুলি সগৌরবে বিরাজমান। তাঁর জীবনের দুটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বলে আমি মনে করি — বিচিত্র দীক্ষা এবং অভিনব মৃত্যু। তাঁর বাল্যকালে একজন রহস্যময় সন্ন্যাসী তাঁর বাড়ীতে আসেন এবং কিছুকাল তাঁর দিকে একদৃষ্টিতেই তাকিয়ে কারো কোন কথার উত্তর না দিয়ে চলে যান। যৌবনকালে কলিকাতায় বাসকালে তিনি ভূতানন্দ নামে জনৈক সন্ন্যাসীর দ্বারা প্রভাবিত হন। সেই সময় ঐ সন্ন্যাসী একদিন সহসা আবির্ভূত হয়ে ভূতানন্দের সঙ্গ করতে নিষেধ করেন। কাশ্মীরে যখন তিনি চাকরি করছিলেন, সেই সময় আর একদিন ঐ সন্ন্যাসী তাঁর সঙ্গে দেখা করে ইঙ্গিতে একটি নির্জন স্থানে নিয়ে গিয়ে দীক্ষা দেন। আজকাল সাধারণ গুরুনামধারী সাধু সন্ন্যাসীরা যেমন একটি মন্ত্র মুখে না বলে কাগজে লিখে শিষ্যদেরকে মুক্তির ছাড়পত্র দেন, ঐ দীক্ষাপর্বে ঐ রকম গতানুগতিক ছিল না। দীক্ষাকালে হরনাথ লক্ষ্য করেন ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে দ্বিদল পদ্মে জ্যোতির্ময় দেহ প্রকট হয় এবং ধীরে ধীরে তা পুনরায় স্বদেহে লীন হয়। মহাত্মা শিশিরকুমার ১৯০৭ সালে Hindu Spiritual Magazine এর December সংখ্যায় Fit of Trance নামক প্রবন্ধে হরনাথের ঐ অলৌকিক দীক্ষা এবং স্বদেহে বিভাজন তত্ত্ব সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। কৃষ্ণগতপ্রাণ পরম বৈষ্ণব পাগল হরনাথ ছিলেন একাধারে যোগসিদ্ধ এবং ভক্তিসিদ্ধ। বাহ্যতঃ তিনি সাধারণ গৃহীর মতই সাধারণভাবে বাস করতেন অথচ তাঁকে ঘিরে অলৌকিক যোগৈশ্বর্য স্বতঃই প্রকট হয়ে পড়ত। তাঁর মৃত্যুর ঘটনা আরও বিচিত্রতর এবং রহস্যঘন। সেদিন ছিল ১৩৩৪ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, উত্তরায়ণকাল। তিনি সোনামুখীর পাশ্বর্বর্তী গ্রাম মাছডোবাতে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে স্বগ্রামে অনন্তকুণ্ড নামে এক পুষ্করিণীর তীরে এসে তাঁর সঙ্গীশিষ্য ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়কে বললেন — আমি মরলে এখানে দাহ করবে। বাড়ীতে এসে একজন নাপিতকে ডেকে সকলকে ক্ষৌরকার্য করে নিতে বললেন। আরও বলেন — আমি যদি মরে যাই তোমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ভাঁড়ারে চন্দন কাঠ ও ঘি সংগ্রহ করে রেখেছি। সন্ধ্যাবেলা স্ত্রীকে পুনরায় ডেকে বললেন — ঘুম পাচ্ছে কয়েক রাত্রি ভাল ঘুম হয়নি, দোতলায় একটা নির্জন

ঘরে শোবার ব্যবস্থা করে দাও। রাত্রি ৯টায় খাবার জন্য ডাকতে গিয়ে কুসুমকুমারী দেখলেন — সমস্ত শরীর হিমশীতল। কান্নার রোল পড়ে গেল, দেহরক্ষা করেছেন এই সংবাদ বিদ্যুতের মত চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর পূর্বচিহ্নিত স্থানে দাহ করতে গিয়ে আর এক আশ্চর্য কাণ্ড। প্রজ্জ্বলিত চিতার মধ্যে হরনাথের দেহ সহসা উত্থিত হয়ে পদ্মাসনে বসার ভঙ্গীতে আকারিত হল, হাত দুটি উপরে উঠে গেল ভরাভয়ের ভঙ্গীতে এবং দু এক মিনিট পরে পুনরায় তা পূর্ববৎ চিতার মধ্যে লুটিয়ে পড়ল। তাঁর এই অলৌকিক মৃত্যুরহস্য আশ্চর্যজনক নয় কি? আমাদের দেশে স্বেচ্ছা ঘোষিত বা ভক্তগণ প্রচারিত যুগদেবতা, যুগপ্রধান, যুগাবতার ও জগদ্গুরু প্রভৃতিদের নানা রকম উৎকট ব্যাধিতে ভুগে ভুগে যে মৃত্যুর কথা শুনি, তার তুলনায় পাগল হরনাথের এই যোগিজন বাঞ্ছিত অলৌকিক মৃত্যু রহস্য আশ্চর্যজনক নয় কি?

তাঁর পুণ্য স্মৃতিচারণ শেষ হতে না হতেই শুনতে পেলাম বৃদ্ধ মহাত্মা বলে উঠলেন 'নারায়ণ! নারায়ণ! আপ মেরে গুরুজীকা জীবনচরিত আচ্ছিতরেসে বর্ণন কিয়া। যহী নর্মদা কিনারমেঁ গুরুজীকা সাধন গুফা ভি হৈ। চলিয়ে হমারা সাথ, হম্ দেখায়েঙ্গে।'

আমরা তাঁর সাধনগুহা দেখে আশ্রমে ফিরে এলাম। কথায় কথায় জেনে নিয়েছি এই মহাত্মার নাম প্রবোদানন্দ। হরনাথজীর শিষ্য। মন্দির থেকে ফিরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — কিন্তু তুমি বোধহয় একথা শোননি যে মহাত্মা হরনাথ প্রায় চার বৎসরকাল ধরে নর্মদার তটে তটে পরিক্রমা করেছিলেন।

আমি বললাম — মহাত্মা হরনাথ যে নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন, একথা আমার জন্য ছিল না। আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম।

— গুরুদেব যখন পরিক্রমা করতেন সে সময় তিনি সাধনার উপযোগী স্থানে সাধনায় ডুবে যেতেন আবার চলতে আরম্ভ করতেন নর্মদার তট ধরে। তিনি বলতেন — কেবলমাত্র পদব্রজে নদীটির দু পাড় ঘুরে আসাই পরিক্রমার উদ্দেশ্য নয়। তাতে তীর্থের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণ রূপে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয় না। যে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবাহ বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে পবিত্র প্রভাবে সাধনার দ্বারা বহির্মুখীন চিত্তবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে অন্তর্মুখীন করাই পরিক্রমার উদ্দেশ্য। চঞ্চল চিত্তে, চঞ্চল ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে যাঁরা তীর্থ ভ্রমণের কর্তব্যটি 'যেন-তেন-প্রকারেণ' শেষ করেন, তাঁদের পক্ষে তীর্থভ্রমণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা কোনমতেই সম্ভব হয় না। মূলকথা — বৈদিক যুগের বহু ঋষি হতে আরম্ভ করে এ যুগের সাধু মুনিরা যে যেস্থানে বা ঘাটে বসে তপস্যা করেছিলেন, সেইসব স্থানে পর্যাপ্ত সময় ধ্যান করলে সেইসব স্থানের চৈতন্য প্রবাহ সাধকের তপস্যার পথ খুলে দিতে সাহায্য করে।

পরিক্রমায় বেরিয়ে বিভিন্ন তপস্থলীতে সমাধিযোগ অভ্যাস করলে সাধনার পথ সুগম হয়। বিপদসঙ্কুল পথে চলতে চলতে মন নিরাশ্রয়ের আশ্রয় গুরু বা ভগবানকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে অভ্যস্ত হয়। নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় নিতান্ত অপরিচিত স্থানেও যখন ভিক্ষা জুটে যায়, তখন সহজেই উপলব্ধি হয় যে ভগবানই যোগক্ষেম বহন করে চলেছেন। পরিক্রমাকালে নানা সম্প্রদায়ের নানা সাধু ও মহাত্মার সংস্পর্শে নানাবিধ সাধনার গুহ্য পদ্ধতি ও কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায়। উচ্চকোটির সিদ্ধ মহাত্মাদের তীব্র বৈরাগ্য, সাধন নিষ্ঠা এবং অলৌকিক উচ্চাবস্থা দেখে নিজেরও মুমুক্ষতা এবং সাধনার ঐকান্তিকতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

আসর ভাঙল। কথায় কথায় রাত হয়ে গেল। আমরা শোবার জন্য ঘরে গেলাম। ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। শৌচাদি সেরে আসতে আসতে দেখি 'হর নর্মদে হর' বলতে বলতে প্রবোদানন্দজী কমণ্ডলু হাতে আশ্রম বাড়ীতে ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ সূর্য উঠেছেন। রৌদ্র করোজ্জ্বল পর্বত ও নর্মদা অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। আমরা সকলেই স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদির পর গাঁঠরী বেঁধে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

— যাবার পূর্বে নর্মদার এই ঘাটের তীর্থ মাহাত্ম্য আমার কাছে শুনে যান — প্রাচীন সময়মেঁ এক মহাত্মা ইহাঁ বিরাজতে থে। উনহোনে ইধার যজ্ঞ কিয়া থা। উসকী যজ্ঞকুণ্ডসে আভিতক সুগন্ধী ভস্ম নিকলতী হ্যায়। এক সময় ইস্‌কা পাশ এক ব্রাহ্মণ আয়া আর মহাত্মাকো কহা কী মেরে হাতসে ব্রহ্মহত্যা হুয়া। আপ মুঝে ব্রহ্মহত্যা কী পাপ সে বাঁচায়। ইহ প্রার্থনা শুনকর মহাত্মানে ব্রাহ্মণকা উপর প্রসন্ন হুয়া আর এক পিপলকী লকড়ী উস্ ব্রাহ্মণকো দিয়া ঔর কহা কী আর্যাবর্তকী সভী তীর্থমেঁ যাকর পূজন করিয়ে ঔর জো নদী মিলেগা উস নদীমেঁ এহী লকড়ীকো স্নান করায়েগা। জিস্ তীর্থমেঁ ইস লকড়ীসে অঙ্কুর নিকলেগা ওহী স্নান দান করনেসে ব্রহ্মহত্যাকী পাপ মিট জায়গা।

ব্রাহ্মণনেঁ ইস লকড়ীকে সাথ জগৎকে সভী তীর্থভ্রমণ করনে লগে। পরন্তু উস্ লকড়ী সে অঙ্কুর নেহী নিকলী। ফির উহ্ নর্মদা তীরকা এহি স্থানমেঁ আ পৌঁছা ঔর নিত্যকর্মানুসার নর্মদাজীমেঁ লকড়ী ডুবনেকা বাদ লকড়ী সে সাত অঙ্কুর নিকলী। ইহ দেখকর ব্রাহ্মণনেঁ স্নান, দান, পিতৃতর্পণ ও ব্রাহ্মণ ভোজন করায়া। ব্রহ্মহত্যা মিট গই। ব্রাহ্মণনেঁ লকড়ীসে নিকলী হুই সাত অঙ্কুর ইস্ নর্মদা তীর্থমে রোপন কিয়া ঔর সাত পিপল বৃক্ষ হুয়া; উসমেঁ অব দো জীবিত হ্যায়। সাত পিপল বৃক্ষসে উৎপন্ন হুয়ে ইস্ তীর্থকা নাম হুয়া সাতপিপলী ঘাট। ইসে গৌধারী ঘাট ভী কহতে হ্যায়। আমরা উচ্চৈঃস্বরে হর নর্মদে, হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে নামতে লাগলাম নীচের দিকে। আমাদের কণ্ঠস্বর শুনে মন্দিরে যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁরাও আনন্দে জয়ধ্বনি দিলেন। ভক্ত এবং পরিক্রমাবাসীদের চলার দাগে পা রেখে ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে নামতে লাগলাম পর্বতের তলদেশের দিকে।

হরানন্দজী বললেন — এগিয়ে এসো তোমরা। নিচে নর্মদার ধারা ত দেখাই যাচ্ছে। এসো, এই উৎরাই পথ ধরে নর্মদার কাছে পৌঁছে দেখি, এই পথ আমাদের কোথায় নিয়ে যায়। প্রায় আধ ঘন্টা হেঁটে আমরা নেমে এলাম উপত্যকায়। মা নর্মদাকে দেখতে পেয়ে ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। যে পথ দিয়ে আমরা যাচ্ছি, সে পথ খুব ভাল নয়। একে ছোট ঝাড়িপথ বলাই সঙ্গত। আমি দু'চারবার হোঁচট খেলাম। রাস্তার দু'ধারেই ঝোপ ঝাড়। মাঝে মাঝে বড় বড় শাল সেগুন ও পাকুড় গাছও দেখতে পেলাম। ঝোপঝাড় ও শালচারার ছোটমত জঙ্গল পেরিয়ে আমরা নর্মদার ঘাটে এসে পৌঁছলাম। বেলা তখন ১টা। পরিক্রমাবাসীদের দেখে এক ব্রাহ্মণ যুবক এগিয়ে এল। সে জানাল — এটি রাজা ময়ূরধ্বজের তপস্যাক্ষেত্র। এটিকে ময়ূরধ্বজ তীর্থও বলা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হতে আর তিনদিন বাকী, সূর্যের তাপে চলার পথও তেঁতে উঠেছে। আমরা নর্মদার ঘাটে নেমে স্নান পূজা শেষ করলাম। ব্রাহ্মণ যুবকটি আমাদের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দাঁড়িয়ে রইল।

— আপনারা ওঁঙ্কারেশ্বর ঝাড়ির প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। ওঁঙ্কারতীর্থ এখান থেকে বেশী দূর নয়। এ কথা বলতে বলতে যুবকটি আমাদের নিয়ে একটি সংকীর্ণ রাস্তা পেরিয়ে উঠে এল বিশাল এক চাতালের সামনে। মোটা মোটা পাথরের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম মন্দির চত্বরে। বিরাট এক প্রস্তরময় আয়তক্ষেত্র। তার ধার ঘেঁসে কালো পাথরের স্তম্ভের পর স্তম্ভ কুড়ি ফুট করে উঁচু, তার উপর ছাদ ছিল কিন্তু সে ছাদ এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। স্তম্ভগুলিতে এবং মন্দিরের উঁচু ভিত্তিগাত্রে পাথর কুঁদে কুঁদে বহু হস্তীমূর্তি মনুষ্যমূর্তি ও নারীমূর্তি খোদিত আছে। এইসব মূর্তির ভঙ্গিমা নিপুণ ভাস্করদের শিল্প প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। স্তম্ভগুলিতে আরও বহু কারুকার্য আছে।

আমাদের সঙ্গী যুবক সুন্দর সিং জানাল কালক্রমে মন্দির জীর্ণদশায় পতিত হয়েছে। তবুও দেখুন প্রতিটি স্তম্ভের মাথায় মোটা মোটা খিলানের উপর চড়ানো রয়েছে পাথরের ভারী ভারী কড়ি। তার উপরে আর কিছু নাই। সহজে অনুমান করা যায়, প্রবল পরাক্রান্ত ময়ূরধ্বজের আমলে এখানে স্বর্ণযুগ ছিল। মনে হয় এইসব খিলান কড়ি আর স্তম্ভরাজির মাথায় ছাদ ও স্বর্ণকমলসহ স্বর্ণখচিত চূড়াও ছিল। অদ্ভুত নির্জন পরিবেশ। সুন্দর সিং তার ফতুয়ার পকেট থেকে একটি মোমবাতি ও দেশলাই বের করলো। মোমবাতিটি জ্বেলে সে একটি গুহার ভিতর প্রবেশ করল। ভিতরে বিরাজ করছেন মন্দ্রমূর্তি ময়ূরেশ্বর মহাদেবের লিঙ্গরূপ। যোনীপীঠ হতে প্রায় দু'ফুট উঁচু সবুজ বর্ণের ময়ূরেশ্বরের কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। কমণ্ডলুর জল ঢেলে হাত দিয়ে ঘসে লিঙ্গটিকে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। লিঙ্গ হতে অত্যুজ্জ্বল আভা যেন ঠিকরে পড়ছে। লিঙ্গগাত্রে বিন্দু বিন্দু ঘামের মত দেখা যাচ্ছে। আমার নিত্যসঙ্গী 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' নামক বইটি ঝোলা থেকে বের করে এই শিবলিঙ্গের লক্ষণ মিলিয়ে স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলাম। পাতার পর পাতা উলটিয়ে অবশেষে 'হেমাদ্রিধৃত-লক্ষণকাণ্ডে দেখতে পেলাম অহর্নিশ লিঙ্গ গাত্রে এইরকম ঘর্মবিন্দু দেখা গেলে তাকে অমৃতস্রাবী লিঙ্গ বলা হয়।

সুন্দর সিং মন্দিরের পাশেই আর একটি গুহায় আমাদেরকে নিয়ে এসে হাজির করল। গুহার ভিতরে পাথরের একটি বিশাল সিংহাসন বিরাজ করছে। হয়ত কোন সময় ময়ূরধ্বজ এখানে বসে রাজ্যশাসন করতেন।

প্রাচীন সব মহলের ধ্বংসাবশেষ অতিক্রম করে এলাম রাণী অহল্যাবাঈ-এর দ্বারা নির্মিত নর্মদার ঘাটে।

সুন্দর সিং জানালো ময়ূরধ্বজ তীর্থ হতে বড়বাহ তীর্থ প্রায় বিশ মাইল। এই তীর্থে আসতে হলে পিপলিয়া গাঁও পর্যন্ত মোটরে আসা যায়। রাবেরখেড়ী পর্যন্ত আমাদেরকে এগিয়ে দিয়ে আসতে সুন্দর সিং আগ্রহ প্রকাশ করায় আমরা সাগ্রহে তাতে সম্মত হলাম। সুন্দর সিং আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। প্রায় চার মাইল রাস্তা হাঁটার পর আমরা উজ্জ্বল রৌদ্রকিরণে দেখতে পেলাম একটি জলধারা একটি পাহাড়ের চূড়া থেকে নেমে এসে মিলিত হয়েছে নর্মদার সঙ্গে। সেই জলধারার কাছেই একটি বড় শিবমন্দির দেখা যাচ্ছে। হরানন্দজী ঐ স্থানের পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই সে পরিচয় দিল — উহ্ হ্যায় খড়ক নদী। নর্মদা কা সাথ সংগম হুয়া। উহাঁ গালব ঋষিনেঁ তপ করকে মহাদেওজীকা প্রসন্ন কিয়া থা।

প্রেমানন্দ মহানন্দস্বামীকে অনুরোধ করলেন — আপনি আমাদেরকে গালবের কথা শোনাতে থাকুন। এখনও দেখছি পাহাড় ও জঙ্গল চারদিকে, নুড়ি পাথর আর কাঁটা সামলে সাবধানে হাঁটতে থাকুন গল্প করতে করতে। মহানন্দস্বামী গালব সম্বন্ধে বলতে আরম্ভ করলেন —

মাত্র নয় বৎসর বয়সে গালব এসেছিলেন সমিৎপানি হয়ে ঋষি বিশ্বামিত্রের আশ্রমে। বালক আর সমাবর্তনের শেষে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নি। গুরুগৃহে থাকাকালেই তাঁর মাতাপিতা গত হন। সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় গুরুগৃহে কাল কেটেছে গালবের। ঋষিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন এই শিষ্যটিকে। সর্ববিদ্যায় পারংগম, সেবা-তৎপর গালবের বিশেষ গুণ বেদের সমগ্র শাখায় তাঁর অনায়াসে বিচরণক্ষমতা। অন্তেবাসী মাত্রেই জানেন গালব অসাধারণ বিচারমল্ল।

কিন্তু তাঁর সেই পাণ্ডিত্য এবং অতুলনীয় বিচার ক্ষমতাকে কেন্দ্র করে একবার অভিযোগ আসে ঋষি বিশ্বামিত্রের কাছে যে 'গালব বৃদ্ধান্ অবজানাতি' — বিচারকালে গালব বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধদের সম্মান রাখেন না।

প্রিয় শিষ্যের নামে অভিযোগ শুনে জ্বলন্ত পাবকের মত মৃগচর্মে সমাসীন গায়ত্রীর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি গুরু বিশ্বামিত্রের মুখাবয়বে দেখা দিল ভ্রূকুটিরেখা। সমগ্র ব্রহ্মাবর্তে তাঁর আসন বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। অসংখ্য তাপস ঋষি বালক, ঋত্বিক অধ্বর্যু তাঁকে ঘিরে রয়েছেন। পবিত্র হোমধূমে চারিদিক সুরভিত। এহেন শান্ত ও স্নিগ্ধ পরিবেশেও ক্ষুব্ধ কণ্ঠে গুরু বলছেন — গালব কবে তুমি তর্ক ও জল্প ছেড়ে মৌন অবলম্বন করবে? কবে তুমি মুনি হবে? বৃত্তেন হি ভবত্যার্যো ন জ্ঞানম ন বিদ্যয়া। গালব মনে রেখো বৃত্ত অর্থাৎ পরিশীলিত আর শ্রদ্ধান্বিত জীবনচর্চা দ্বারাই লোকে আর্য হয়। গালবের সতীর্থদের কাছে এ দৃশ্য কল্পনাতীত। বিনীত কণ্ঠে অথচ সপ্রতিভ ভাবে গালব নিবেদন করলেন — অধুনৈব, অধুনৈব প্রভো! আপনি আশীর্বাদ করলে এখনই পারি।

সেই থেকে গালব হলেন মৌনব্রতী। কখন কুরু, কখন পাঞ্চাল, কখনও বা পুষ্করের গহন অরণ্যে অবধূতের ন্যায় বিচরণ করতে লাগলেন গালব। এইভাবে প্রব্রজ্যা করতে করতে একদিন গালব রাজা অশ্বপানির অন্তঃপুরে দৈবাৎ প্রবেশ করেন। কোন দিকে দৃক্‌পাত নাই, আত্মানন্দে তিনি বিভোর। কিন্তু প্রতিহারীরা সঙ্গে সঙ্গে এই নির্লজ্জ অবধূতকে বন্দী করে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ক্রুদ্ধ রাজার আদেশে তখনই তাঁর একখানি হাত কেটে ফেলা হল, এতে কিন্তু গালব কোন ভ্রূক্ষেপ করলেন না। মাটিতে ছিন্ন হস্ত পতিত হল। রক্তের ধারা ঝরে পড়ছে। অথচ আহত ব্যক্তি উদাসীন। মুখে কোন ব্যথা বেদনার বিকার নেই। কোন আর্তনাদ নাই। এই অভাবনীয় দৃশ্য দেখে সপারিষদ রাজা স্তম্ভিত। তিনি বুঝলেন যে এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই কোন সিদ্ধ তাপস। তাঁরা সবাই পদতলে পড়ে বারংবার ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলেন। প্রসন্ন হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল অবধূতের মুখ। তিনি অস্ফুট কণ্ঠে বললেন — অপিধভৎস্ব। ভীত সন্ত্রস্ত রাজা শশব্যস্তে হাতখানি তুলে নিয়ে যথাস্থানে সংলগ্ন করলেন — ক্ষত চিহ্ন নিমেষে গেল মিলিয়ে — হাতটি যথাপূর্বং তথাস্থিতং। গালব তাঁদেরকে আশীর্বাদ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন সেখান থেকে।

এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে গালব একদিন গভীর রাত্রিতে এক তপোবনের ব্রীহি যবাদির গোলার কাছে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। আশ্রমের ব্রহ্মচারীরা ভাবলেন এই ব্যক্তি নিশ্চয়ই তস্কর। তারা লগুড় হস্তে গালবকে প্রহার করতে উদ্যত হতেই তিনিও তাদেরকে নিবারণ করার জন্য হাত তুললেন। আশ্চর্যের বিষয় ধ্যানস্থ যোগী এবং আশ্রম রক্ষকদেরকে সারারাত্রি ঐ অবস্থাতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। প্রত্যুষে গালব চলে যাবার পর

ঐ নিশ্চল অবস্থা থেকে আশ্রম রক্ষকরা মুক্তি পায়।

জনপদে জনপদে ছড়িয়ে পড়ছে গালবের অত্যাশ্চর্য কাহিনীর কথা। আপামর জনসাধারণ গালবকে দেখলেই শ্রদ্ধায় বিগলিত হয়ে পড়ছে। গালবের কিন্তু কোনদিকে লক্ষ্য নেই। অর্ন্তলক্ষ্য বহিঃদৃষ্টি, সর্বত্র সমদর্শন সদানন্দময় গালব এগিয়ে চলেছেন গুরুদর্শনের তীব্র আকাঙ্খা বুকে নিয়ে। পথে আবার এক বিভ্রাট দেখা দিল। জঙ্গল হতে কাঠ কেটে বয়ে নিয়ে চলেছে কাঠুরিয়াদের দল। তারা গালবকে চেনে না। দলের সর্দার শক্ত সামর্থ গালবকে জোর করে কাষ্ঠভার বহন করতে বাধ্য করল। মাহাপুরুষের কিছুতেই আপত্তি নেই — কোন ক্লেশেই তিনি কাতর নন। কাঠের বিপুল বোঝা মাথায় নিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন কাঠুরিয়াদের সঙ্গে। দলনেতা মহাখুশী। দুর্বিপাক দেখা দিল একটু পরেই। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে কাঠুরিয়াদের স্তূপীকৃত কাঠের রাশির উপর তিনি বোঝাটি ফেলে দেবার পরেই দেখা গেল আশ্চর্য অগ্নিকাণ্ড। সমস্ত কাঠই ভস্মীভূত হয়ে গেল।

ঘটনাটি ঘটল গুরুর অশ্রম হতে নাতিদূরস্থ অরণ্যের এক উপান্তে। কাজেই সেসব কথা বিশ্বমিত্রের কর্ণগোচরে হতে বিলম্ব হল না। গালব আশ্রমে পৌঁছে গুরুর চরণে ভূলুণ্ঠিত হলেন। কিন্তু গুরু প্রণাম গ্রহণ করলেন না। দীর্ঘকাল পরে প্রাণাধিক প্রিয় শিষ্যকে প্রত্যাগত দেখেও স্নেহময় ঋষি কোন স্বস্তিবচন উচ্চারণ করলেন না। বরং তিনি বেদানহত কণ্ঠে বললেন — গালব তোমার পাতিত্য দোষ ঘটেছে। বিভূতির প্রকাশ দেখিয়ে তুমি সাধনার ব্যাভিচার ঘটিয়েছ। বৈদিক ভারতবর্ষের এটি চিরাচরিত বৃত্ত নয়। অত্যন্ত নিম্ন কোটীর যোগীরাই অস্মিতা ও অবস্পন্দনের দোষে আচ্ছন্ন বলেই তাদেরকে ঘিরে অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটে যায়। বিভূতি আত্মজ্যোতির অবস্পন্দন বা কুফল মাত্র। বৎস, জ্ঞানসিদ্ধিই ঋষিদের আরাধনার বস্তু। মনে রাখবে,

শ্রমেন তপসা সৃষ্টা ব্রহ্মণা বর্ততে শ্রিতা
সত্যেনাবৃতা শ্রিয়া প্রাবৃতা যশসা পরীবৃতা।
স্ব ধয়া পরিহিত শ্রদ্ধয়া পর্যূঢ়া দীক্ষয়া গুপ্তা
যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতা লোকো নির্ধনম॥

যে অমৃতবিদ্যা মানুষের জীবনকে প্রদীপ্ত করে, পরিতৃপ্ত করে এবং প্রসন্ন করে — সেই বিদ্যাই জ্ঞানসিদ্ধির পথ। তা কোন অলৌকিক শক্তির যাদুক্রীড়া নয়, লোলচমৎকারী ইন্দ্রজাল প্রদর্শন করাও নয়। এই অমৃতবিদ্যা কখনও অনায়াস লভ্য নয়, তার জন্য চাই অবিশ্রান্ত যত্ন, চাই অবিরাম তপস্যা। শ্রম ও তপস্যায় সেই ব্রহ্মবাণী সৃষ্ট হয়, ভক্তি ও জ্ঞানে তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই সুগভীর সত্য ঋতে আশ্রিত, সত্য তার আবরণ, সত্য তার বিজয়শ্রী, কল্যাণে তা প্রাকৃত, যশে তা পরিবৃত। দিব্যশক্তিকে সংগোপনে অবলীলাক্রমে ধারণ করে তা আত্মসাৎ করার মধ্যে কৃতকৃত্যা। যাও অযথা লোক সংগ্রহ বা বৃথা পরিব্রাজন ত্যাগ করে নির্জনে গভীর তপস্যায় নিমগ্ন হও। বেদজ্ঞান আহরণ করার তপস্যাতেই জীবনে আসে অভ্যুদয়। আসে উদয়ণ।

নতমস্তকে গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করে গালব চলে গেলেন তপস্যার জন্য। এক নির্জন গিরিগুহায় ধ্যানাসনে বসলেন তিনি। দিন যায়, বর্ষ যায়, অবিচলিত নিষ্ঠায় ধ্যানমগ্ন রইলেন গালব। বৎসরের পর বৎসর উৎক্রান্ত হয়ে গেল, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষার উপদ্রব, তুষারের প্রবল বিড়ম্বনাও তিনি হাসি মুখে সইতে লাগলেন। অবশেষে সেই পরম বাঞ্ছিত দিনটি তাঁর জীবনে দেখা দিল। তিনি দেখলেন — সমগ্র হিরন্ময় আকাশ, ভর্গজ্যোতির চকিত চমকে ভাস্বর হয়ে উঠলো, তাঁর অন্তরসত্তা ও বহির্সত্তা দ্যুলোক ভূলোক ব্যপ্ত করে প্রকট হয়ে উঠল বেদবাণী —

ওঁ জিতমস্মাকমুদ্ভিন্ন ম স্মা কমভ্যাইং বিশ্বাঃ পৃতনাঃ আরতীঃ॥ ১
তদগ্নিরাহ তদুসোম আহ পুযামা ধাতু সুকৃতস্য লোকে॥ ২
অগন্মস্ব' সরগন্ম সং সূর্যস্য জ্যোতিষগন্ম॥ ৩
বস্যো ভূয়ায় বসুমান্ যজ্ঞো বসু বংশিবীয় বসুমান ভূয়ামং বসু ময়ি ধেহি॥ ৪

জ্যোতির পুত্র আমরা — উদ্বোধন আমাদের, অভ্যুদয় আমাদের — আমাদের জন্যই পরমাস্থিতি আনন্দচকিত ভূমি, বিদ্বেষ এবং দ্রোহ যেন পরাজয় লাভ করে। এই কথা বলেছেন অগ্নি — যার দিব্যজ্যোতি জীবনকে ভাস্বর করে তোলে। এই কথা বলেছেন সোম — যার আনন্দপ্রবাহ বিচিত্র এবং মুক্তছন্দ। আমরা পেয়েছি অমৃতলোকের স্বরূপজ্যোতিঃ — পেয়েছি পরাসংবিদের পরমাদ্যুতি। যাঁর তেজের দিব্যরাগিনীতে দ্যুলোক

অনুপ্রাণিত এবং উজ্জীবিত — সেই আদিত্যের পরম জ্যোতিস্বরূপকে আমরা জেনেছি — আমরা পেয়েছি আলোর অমৃতভাণ্ডার। আহারে! এত আলো এত জ্যোতি এত অমৃতের মধুচ্ছন্দরূপ, সে যে প্রতি জীবের চিদ্গুহাতেই সংগুপ্ত আছে। জীব! ওঠ, ওঠ, জাগো জাগো, এই পরাকষ্ঠার জন্য এই দিব্য প্রৈতির জন্যই যে তোমার মনুষ্যদেহে অবতরণ। জীবনটা তো তোমার যজ্ঞ ছাড়া কিছু নয়। এই যজ্ঞ বসুমান, জীবনের হবি দিয়ে এই যজ্ঞকে পূর্ণ কর। তোমার ঊর্ধরতি রসান্বিত রসায়িত হোক। যে জীবন উৎসৃজিত, যে জীবন ঊর্ধের অভিসারে আকুল, সেই জীবনেই তো জেগে উঠে সচ্চিদানন্দের চিদ্‌বিলাস। সংসার অভিযানে ক্লান্ত আমরা। আমরা চাই এই পরমানন্দের পরিস্ফূরণ। দুঃখের অরণি মন্থন করে আমরা জ্বালাতে চাই যে ক্রতুময় বহ্নিশিখা। আমাদের জীবনের তপস্যায় জেগে উঠুক আনন্দ সমুদ্রের কল-কল্লোলে। জীবনের পরমা হ্রী ও শ্রী এই পথে এই পথে ওঁ বসুমান ভূয়ামং বসুময়ি ধেঁহি।

ব্যুত্থানের পর গালব দেখলেন ঋষি বিশ্বামিত্র তাঁর সম্মুখে দণ্ডায়মান রয়েছেন। গুরু আনন্দে আত্মহারা। বুকে জড়িয়ে ধরে বারবার আলিঙ্গন করে গালবকে পরিয়ে দিলেন অক্ষমালা। গদগদকণ্ঠে বললেন — গালব, আজ থেকে তুমি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুলে স্থান পেলে। তোমার নিকট প্রকটিত বেদমন্ত্রে জ্যোতির অক্ষরে লেখা থাকলো মানুষের পরম ঊর্ধায়ণের কথা। আলোর পিপাসা আর তার পরিতৃপ্তি এবং অমৃতের পথে তার উত্তরণের পরমা আশ্বাস বিধৃত হয়ে উঠল ঐ বাণীতে। ঐ দেখ পরমেষ্ঠী গুরুকুল ঋষিকুল বদ্ধ করে তোমাকে প্রণাম জানাচ্ছে। দক্ষিণা দাও বৎস, দক্ষিণা দাও।

মুগ্ধ, আবিষ্ট, পরম পরিতৃপ্ত, আপ্তকাম গালব নিবেদন করলেন — আদেশয়! যত্তে মনসি বর্ততে। আপনি যা আদেশ করবেন তাই আমি পালন করব। বিশ্বামিত্র বললেন — আমার প্রথম দাবী - পরম বেদবিৎ আচার্য শাকলের সাহচর্যে থেকে তুমি বেদমন্ত্রের ক্রমবিভাগ কর। বেদের স্বর ও ছন্দের অনুসরণে মন্ত্র সংহিতা এবং ব্রাহ্মণের একটি ক্রমানুসারিণী রচনা কর ভবিষ্যৎ উত্তরপুরুষদের জন্য। আর রচনা কর এমন একটি ব্যাকরণ যা পূর্ণাঙ্গ দর্শনের মর্যাদা পায়। কেননা পদ ও পদার্থের বোধ ব্যতীত তন্মূলক বৈদিক বাক্যার্থের সম্যক জ্ঞানোপলব্ধি সম্ভবপর হয় না। বেদমন্ত্রের আলোক দীপিকা স্বয়ং মহশ্বেরের রচিত। প্রাচীনতম মাহেশ ব্যাকরণ, ইন্দ্র রচিত ঐন্দ্র ব্যাকরণ, ভাগুরীমুনি রচিত ভাগুরীয় ব্যাকরণ, মহর্ষি কাশকৃৎস্ন রচিত কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণ প্রভৃতি ব্যাকরণগুলি কালের স্থূল হস্তাবলেপে জীর্ণ এবং বিস্মৃত হতে বসেছে। তুমি সেইগুলিতে সমকালীন শব্দ ও পদ সংযোজিত করে তাকে আরও উজ্জ্বল ও পরিমার্জিত করে তোল। শিক্ষা ঘ্রাণং তু বেদস্য মুখং ব্যাকরণং স্মৃতম্। শিক্ষাশাস্ত্র যদি বেদের প্রাণ হয়, ব্যাকরণ হল তার মুখ। ব্যাকরণ শাস্ত্র তোমার হাতে পড়ে এমন নির্বচন লাভ করুক যাতে শুধু বিবিধ প্রকারেণ আত্রেয়িন্তে শব্দা অনেনেতি ব্যাকরণম্ কেবল বিভিন্ন রূপে শব্দের পরপর রূপান্তরে শব্দ ভাণ্ডারের সমৃদ্ধি ঘটাবে না, তাতে যেন লক্ষ্য ও লক্ষণও সমুদিত হয় — ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে অর্থবওয়া প্রতিপাদ্যন্তে শব্দা যেনেতি — ব্যাকরণের মধ্যে এমনভাবে সমুচ্চ দার্শনিক ভাব উপ্ত করে দাও যাতে তা পাঠ ও মনন করলেই লক্ষ্যবস্তু ব্রহ্ম যেন প্রকটিত হয়ে পড়েন। পূর্ব পূর্ব কল্পে প্রকটিত বেদমন্ত্রে ঘোষিত হয়েছে যে, একঃ শব্দঃ সম্যগ্ জ্ঞাতঃ শাস্ত্রারন্বিতঃ সুপ্রযুক্তঃ স্বর্গে লোকে কামধুগ্ ভবতি। ঋষির সেই পরম ঘোষণাকে তুমি সার্থক কর। শাস্ত্র এমন হোক যা মানুষের সকল বিচিকিৎসায় সকল জিজ্ঞাসার ইতি ঘটিয়ে তাকে পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত করে।

গালব গুরুর দুটি ইচ্ছাই পূর্ণ করলেন। একদিকে তিনি যেমন বেদের ক্রমবিভাগ করে তার স্বর ও ছন্দ বিন্যাস করেছিলেন তেমনি অন্যদিকে ব্যাকরণ রচনা তাকে উন্নত করেছিলেন দর্শনের পর্যায়ে। তাঁর রচিত এই ব্যাকরণ গালব ব্যাকরণ নামে বিখ্যাত। দুঃখের বিষয় বর্তমানে গালব ব্যাকরণ দেখতে পাওয়া যায় না। তবে একসময় যে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এই ব্যাকরণের পঠন পাঠন হত এবং পরবর্তীকালে পাণিনি রচিত ব্যাকরণের পূর্ববর্তী সময়ে রচিত সেনশীয় ব্যাকরণ, কাশ্যপি ব্যাকরণ, স্ফোটায়ণ ব্যাকরণ, আপিশন ব্যাকরণ, ব্যাড়িয় ব্যাকরণ, শাকল্য ও শাকটায়ণ ব্যাকরণ প্রভৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বিখ্যাত অষ্টাধ্যায়ীর একটি সূত্রে আমরা পাই — ইকো হ্রস্বোহ। গালবস্য (৬/৩/৪১) ৭ম অধ্যায়ে (৭/১/৭৪) তৃতীয়াদিষ্য ভাষিত পুংস্কংপুংবদ্ গালব্য, ৮/৪/৪৭ অধ্যায়ে। নোদাত্তস্বরিতোদয়ম গার্গ্যকাশ্যপগালবানাম প্রভৃতি মন্ত্রে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ গালব ব্যাকরণের অস্তিত্ব ও মহত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ। লঘুবৃত্তিকার পুরুষোত্তমও বলেছেন

ইকংযণ্ভির্ব্যবধানং ব্যাড়িগালবয়োরিতি বক্তব্যম্। এই সকল সূত্র উপপন্ন করে যে, পাণিনির পূর্বে গালবের ব্যাকরণ খুবই সুপ্রচলিত ছিল এবং তিনি অবশ্যই দেখে থাকবেন।

মহাভাষ্যে পতঞ্জলির আর একটি সূত্রও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে — ইতি গালবাঃ এব হ্রস্বান্ প্রযুঞ্জীরণ প্রাক্ দৈব হি ফিন স্যাৎ।

এই স্থানে গালবাঃ এই বহুবচনান্ত শব্দটি দেখে মনে হয় গালবের ব্যাকরণ শুধু গালব নামেই প্রসিদ্ধ ছিল না, যাঁরা ঐ ব্যাকরণের পর্বণ পার্বণ করতেন তাঁদেরকেও গালব বলা হয়। সুতরাং গালবের একটি বহু অধীতি বোধ সম্পন্ন সম্প্রদায় ছিল এবং সেই সম্প্রদায়ের লক্ষ্য করেই মহর্ষি পতঞ্জলি গালবাঃ এই বহুবচনান্ত পদটি প্রয়োগ করেছেন। আসুন আমরা সকলে মিলে মন্ত্রদ্রষ্টা এবং ব্যাকরণবিধ এই ঋষিকেই স্মরণ করি —

স্বদেশে ঐতিহ্যের মহান্ মহিমালয়ে
করি প্রতিষ্ঠিত, ধন্য করি দিলে জন্মভূমি
শাশ্বত স্বাক্ষরে। সারস্বত সাধনার সিদ্ধমন্ত্রে তব
মূক যাহা হল তা বাঙ্ময়।

তাঁর অমর আত্মার প্রতি প্রার্থনা জানাই —

যত্তে বিশ্বমিদং জগন্মানো জগাম দূরকম।
তত্ত আ বর্ত্তয়ামসীয় ক্ষয়ায় জীবসে॥ (ঋ ১০।৫৮।১০)

তোমার যে আত্মা সুদূরে নিখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছে, তাকে আমরা পুনরায় আহ্বান করি — সে আমাদের মধ্যে চিরকাল বাস করুক ও জীবিত থাকুক।

মহাতপা গালবের কথা শুনতে শুনতে কত বেলা যে হয়ে গেছে, এটা যে শ্বাপদসঙ্কুল জনহীন মহারণ্য সে বিষয়েই কোন হুঁশ ছিল না। মহর্ষির উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে, কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে আমরা আমাদের আশ্রয়স্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

যাই হোক, মাত্র এক মাইল যাবার পরেই সুন্দর সিং ডানদিকে বাক নিল, জঙ্গল পড়ে রইল বামদিকে। প্রায় আধ-ঘন্টা হাঁটার পর একটি কুটির দ্বারে এসে হাঁক পাড়ল — বাবুজী, বাবুজী।

পুত্রের গলার আওয়াজ পেয়ে একজন মাঝবয়সী লোক বেরিয়ে এল। আমদের দেখে সে সকলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল এবং তাদের ঝোপড়ার পাশেই আর একটি ঝোপড়ায় অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিল। আহারে জন্য দিল দু তিনরকমের সুমিষ্টি ফল ও দুধ। সুন্দর সিং আমাদের সেবাযত্নের কোন ত্রুটি রাখল না।

খুবই পরিশ্রান্ত ছিলাম। তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে প্রাতঃকৃত্য ও নর্মদার জলে স্নান সেরে নর্মদা মায়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম গঙ্গেশ্বর তীর্থের পথে। যে পথে গতকাল এসেছিলাম সেই পথ ধরে কিছুটা এসে বাঁদিকে মোড় নিয়ে সুন্দর সিং ও তার বাবা আমাদের নিয়ে এল রাবেরখেড়ী ঘাটে। অর্জুন সিং জানাল — এই রাবেরখেড়ী ঘাট থেকে নর্মদা অতিক্রম করে প্রথম বাজীরাও উত্তর ভারত অভিযানে যান। উত্তর ভারত জয়ের স্মারক হিসাবে ওখানে এই রামেশ্বর শিবজীর মন্দির, অন্নসত্র আর ধর্মশালা বানান। আর ঐ মন্দিরের পাশেই যে মন্দির দেখা যাচ্ছে ঐ হচ্ছে পেশোয়ার প্রথম বাজীরাও-এর সমাধি মন্দির। কিন্তু কালের প্রভাবে একমাত্র রামশ্বের শিবজীর মন্দির ছাড়া আর সবেরই প্রায় ভগ্ন-দশা।

সুন্দর সিং কিছুটা পথ আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেল। রাস্তার দু'ধারেই শাল, সেগুন, অশ্বত্থ, বেল, অঞ্জন, ধাওয়া ও আমলকী গাছ চোখে পড়ছে। আমরা নিরুদ্বেগে হেঁটে চলেছি। প্রায় ঘন্টাখানেক পার্বত্য পথে হাঁটার পরেই আমরা ক্রমশঃ ঘন জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লাম। গাছপালার ফাঁক দিয়ে অতিকষ্টে নর্মদার ধারাকে লক্ষ্য করতে হচ্ছে। আমি ইতিহাসে পড়া প্রথম বাজীরাও-এর জীবন অনুধ্যান করতে করতে চলেছি।

১৭২০ খৃঃ বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁর সুযোগ্য পুত্র প্রথম বাজীরাও পেশোয়া নিযুক্ত হন। তিনি সুদক্ষ, রণনিপুণ, চতুর কূটনীতিবিদ ছিলেন। তাঁকে মারাঠা জাতির নেপোলিয়ন বলা হয়। শিবাজীর পর তিনি সর্বপ্রথম গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছিলেন। তিনিই মুঘল সাম্রাজ্যের অবক্ষয়

লক্ষ্য করে, মারাঠা সর্দারদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নেন। বরোদার গাইকোয়াড়, বেরারের ভোঁসলে, ইন্দোরের হোলকার, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া প্রভৃতি শক্তিকে নিয়ে মারাঠা রাজ্য সংঘ গঠন করেন।

যেহেতু বাজীরাও শিবাজীর নীতি ও আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন সেহেতু শিবাজীর হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলতে হিন্দু পাদ-পাদশাহী গঠনের নীতি গ্রহণ করেন। কৃষ্ণা থেকে সিন্ধু পর্যন্ত মারাঠা পতাকা উড্ডীন করার লক্ষ্যে প্রথম বাজীরাও দক্ষিণে নিজামের সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হন। সেই চুক্তি অনুসারে নিজামকে কৌশলে মারাঠাদের পক্ষে রেখে উত্তর ভারত অভিযানে অগ্রসর হন।

এরপর তিনি একে একে মালব, গুজরাট, বুন্দেলখণ্ড জয় করেন। ১৭৩৭ খৃঃ বাজীরাও গঙ্গা যমুনার তীরবর্তী স্থানে এসে হাজির হলে মুঘল সম্রাট শাহ নিজামের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৭৩৮ খৃঃ ভূপালের যুদ্ধে নিজামের পরাজয় ঘটে। নর্মদা থেকে চম্বল পর্যন্ত পেশোয়ার কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। ১৭৪০ খৃঃ মাত্র ৪২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

হঠাৎ বহুলোকের কোলাহলে সর্তক হলাম মনে। ধরণীর উচ্চাবচ ভূমিরেখা এখানে সুপরিস্ফুট, বন তাদের ঢাকেনি। যত মন্থর গতিতে হাঁটি না কেন তিন মাইল রাস্তা প্রায় হেঁটে ফেলেছি। দেখলাম হাট বসেছে। হাট এদের কাছে উৎসবের জায়গা। সাতদিন পরে গাঁয়ের লোকজনের সঙ্গে দেখাশোনা হয়, গল্পগুজব হয়। গোঁড়, ওয়াঞ্চি ভীল নারী পুরুষদের বেশও বিচিত্র। হাটের মধ্যে দিয়েই পথ। দেখি হাটে বিক্রী হচ্ছে মাটির হাঁড়িকুড়ি মহুয়ার তেল, তাঁতে তৈরী মোটা কাপড় ও গামছা, বাসন, শাকসব্জী ও নানা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ। হাটের এক পাশে মাদলের তালে তালে মেয়ে পুরুষ কোমর জড়াজড়ি করে গোল করে নাচছে। হাট থেকে কিছুদূরে একটি বড় মাঠে গরু, মহিষ, ছাগল, মুরগী, হাঁসও বিক্রী হচ্ছে।

আমরা হাট পেরিয়ে কিছুটা আসার পরই শুরু হল চিৎকার, চেঁচামিচি ও দৌড়াদৌড়ি। লাঠি, বল্লম, তীর-ধনুক দিয়ে একে অপরকে লক্ষ্য করে যথেচ্ছভাবে মারতে লাগল। লোকজন ভয়ে পালাতে লাগল। আমরাও দৌড়ে গিয়ে একটি বাড়ীতে আশ্রয় নিলাম। হরানন্দজী এর মধ্যেই খবর দিলেন, আগের হাটে কিছু জিনিষ ওয়াঞ্চিরা গোঁড়দের বিক্রী করেছিল। কিন্তু বাড়ী গিয়ে দেখে সেসব জিনিষ ওজনে কম আছে। যেহেতু গ্রামে গোঁড়দের প্রাধান্য বেশী তাই তারা ওয়াঞ্চিদের হাটে বসতে দেবে না। গোঁড়রা ওয়াঞ্চিদের জিনিষপত্র লুঠপাঠ করছে।

প্রায় ঘন্টাখানিক পরে হৈ হট্টগোল থামল। আমাদেরও যাত্রা হল শুরু। চলতে চলতে ত্রিবিদানন্দ বললেন — সামান্য ওজন কম দেওয়া নিয়ে কি কাণ্ডটাই ঘটল! জোর যার মুলুক তার। এদের দড়িপাল্লা ও বাটখারাগুলো দেখেছেন। বাটখারা বলে সেগুলি ব্যবহার হচ্ছে ওগুলোর পাথরের টুকরো। কারো পাথরের টুকরো বড়, কারো ছোট। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন —

— আপনি তো বেদাধ্যায়ী। ব্রাহ্মণ সন্তান হিসাবে বেদমন্ত্র পাঠ, শ্রবণ এবং মনন আপনার জীবনের অঙ্গ। বলুন তো, বৈদিক যুগে পরিমাপক সংখ্যা (Unit of measurement) কি নামে অভিহিত হত?

বৈদিক সাহিত্যে পরিমাণ জ্ঞাপক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। স্মরণাতীত কাল হতে ভারতীয় আর্যরা দ্রব্যাদির পরিমাণ জ্ঞাপক সংজ্ঞা ও অভিধা নির্ণয় করেছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের সকল দিকে প্রাত্যহিক জীবনের আদান প্রদানের জন্য নানা বস্তুর unit of mesurement নির্ণয় করেছিলেন। ইউরোপীয় এবং কোন কোন অর্বাচীন ভারতীয় পণ্ডিতরা যতই বলুন যে মিশরবাসীদের কাছে এবং দ্রাবিড়দের কাছেই আর্যরা সর্বপ্রথম মাপের উপায় শিক্ষা করেন, তাঁদের এ কথা কোনমতেই সত্য নয়। প্রকৃত সত্য হল, ভারতের পরিমাণ জ্ঞাপক চিহ্ন বা অভিধা কাল আর্যদের নিজস্ব উদ্ভাবিত পদ্ধতি।

প্রথমে জমির পরিমাণ জ্ঞাপক একক থেকেই ধরা যাক। বিঘা শব্দ যাবনিক এবং একর শব্দ ইংরাজী। অনেক বিদেশী ও দেশী পণ্ডিতরা বলে থাকেন যে প্রাচীন ভারতবর্ষে জমির পরিমাণজ্ঞাপক কোন উপযুক্ত শব্দ ব্যবহৃত হত না। বিঘা একর প্রভৃতি বিদেশী শব্দের আর্বিভাবের পরেই নাকি সঠিকভাবে জমি জরীপ সম্ভব হয়েছে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। ক্রোশ ও যোজন শব্দগুলি যেমন দূরত্বজ্ঞাপক তেমনই ঐগুলি পরিমাণ জ্ঞাপকও বটে। যেমন,

পঞ্চক্রোশং গয়াক্ষেত্রং ক্রোশমেকং গয়াশিরঃ
তন্মধ্যে সর্বতীর্থানি ত্রৈলোক্যে যানি সন্তি বৈ।

অর্থাৎ গয়াক্ষেত্রের পরিমাণ পাঁচ ক্রোশ আর গয়াশীর্ষের পরিমাণ এক ক্রোশ। তার মধ্যে সকল তীর্থই আছে। এখানে ক্রোশ দূরত্বজ্ঞাপক নয় অর্থাৎ বিস্তারহীন রেখা মাত্র নয়, এখানে ক্রোশ শব্দ জমির বিস্তার বা পরিমাণ জ্ঞাপক। নতুবা যার বিস্তার নাই তার মধ্যে সর্ব তীর্থ থাকতে পারে না। একক্রোশ অর্থে এখানে এক বর্গ ক্রোশ, পাঁচ ক্রোশ অর্থে পাঁচ বর্গ ক্রোশ। যদি বলা হয় অমুক বনটা দশ যোজন সেখানে জমি লম্বায় দশ যোজন বুঝায় না। তা বিস্তারেও দশ যোজন বুঝায়। সুতরাং প্রাচীন ভারতে ভূমির পরিমাণ জ্ঞাপক কথা ছিল না — একথা বলা মূর্খতা সূচক।

মহাভারতের টীকাকার নির্বতন নামক এক ভূমি পরিমাণের উল্লেখ করেছেন। বিংশতিবংশ-পরিমিত ভূমিকে নির্বতন বলে। এটিও দৈর্ঘ্য মাত্র পরিমাপক গণিতের রেখার ন্যায় অশরীরী দৈর্ঘ্য মাত্র জ্ঞাপক রেখা নয়, এটি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে উভয় দিকেই একবিংশ বাঁশ পরিমিত।

নির্বতন ছাড়া জমির পরিমাণ জ্ঞাপক আর একটি শব্দের নাম ব্যাম্। বিস্তৃত বাহুদ্বয়ের এক হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হতে অন্য হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যন্ত যে মাপ তাই হল এক ব্যামের পরিমাণ। এই দশ ব্যাম্ বা শত ব্যাম্ পরিমাণে সে যুগে আমাদের দেশে জরীপের কাজ নির্বাহ করা হত।

শুধু বেদ থেকেই সংখ্যা ও পরিমাণ গণনার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি। ঋগ্বেদে সংহৃতির ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৭ সূক্তের ২২ ও ২৩ নং মন্ত্রে 'কোশ' ও 'কোশয়ী' শব্দের উল্লেখ আছে। যথা —

প্রস্তোক ইন্নু রাধাসত্ত ইন্দ্র দশ কোশয়ীদর্শ বাজিনোহদৎ।

'হে ইন্দ্র। প্রস্তোক তোমার স্তবকারী (আমাকে) সুবর্ণপূর্ণ দশ সংখ্যক কোশ ও দশটি অশ্ব দিয়াছেন।'

দশাশ্বান্ দশ কোশান্ দশ বস্ত্রাধিভোজনা।
দশ হিরণ্যপিণ্ডান্ দিবোদাসাদসানিষৎ।

'আমি দিবোদাসের নিকট হইতে দশটি অশ্ব, দশটি সুবর্ণকোশ, বস্ত্র প্রচুর ভোজ্য ও দশটি হিরণ্যপিণ্ড পাইয়াছি।'

উপরোক্ত দুইটি ঋকে কোশ ও কোশয়ী শব্দে যে কোন নির্দিষ্ট ওজন বা মাপ বুঝাচ্ছে, তা সহজেই বোঝা যায়। ঔরংজেবের সময় ভারতভ্রমণকারী বিদেশীরাও ভারতে এসে ঐ ওজনের তোড়া দেখেছিলেন।

ঋগ্বেদে এবং অথর্ব সংহিতায় 'নিষ্ক' শব্দের উল্লেখ দেখা যায়। যদিও সায়ণাচার্য 'নিষ্ক' শব্দের 'হার' অর্থ করেছেন, কিন্তু বহু পূর্বকাল হতেই 'নিষ্ক' বলতে বিশেষ ওজনের সুবর্ণ মুদ্রাকেই বুঝাত।

কাজেই সায়ণ যাই অর্থ করুন, হিরণ্যং সুবর্ণং শতমানম্ (১২/৭/২) যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণের এই মন্ত্র এবং মাধবের কালনির্ণয়-ধৃত 'সুবর্ণশলাকানি যাবত্রয় পরিমিতানি' মন্ত্রটি নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে যে বৈদিককালে পরিমাণ প্রথা এবং পরিমাণ জ্ঞাপক শব্দের প্রচলন ছিল।

শতপথ ব্রাহ্মণে যে 'শতমান' শব্দ আছে, মনুসংহিতার মতে এটি পরিমাণ বিশেষ। কাত্যায়নের বার্তিকেও এই শতমানের উল্লেখ আছে। মাধবাচার্য যে সুবর্ণশলাকার উল্লেখ করেছেন কেউ কেউ মনে করেন সেটাই হল ভারতের প্রাচীনতম ছেনিকাটা মুদ্রা। পাণিণির একটি সূত্র উল্লেখ করেই এই প্রসঙ্গ শেষ করতে চাই। সূত্রটি হল ঃ— রূপদাহত প্রশংসয়োর্যপ (৫/২/১২০)

অর্থাৎ আহত বা প্রশংসার্থে রূপ শব্দের উত্তর মত্বর্থে বপ্ প্রত্যয় হয়। এখানে আহত রূপ্য অর্থাৎ টাকার মত দ্রব্য বুঝাচ্ছে। কাশিকাকারের বৃত্তিতেও এই অংশটি সম্বন্ধে পাই — 'আহতং রূপমস্য, রূপ্যো দীনারঃ।'

আমার মতে এই রূপ্য হতেই এখনকার Rupee শব্দের উৎপত্তি। বৈদিক যুগে লোকসমাজে প্রচলিত রূপ্য শব্দই উচ্চারণ বৈষম্যে ইংরাজী শব্দে রূপান্তরিত হয়েছে।

এই সমস্ত তথ্যই প্রমাণ করে যে নির্দিষ্ট আকার বা ওজনের মুদ্রা বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিল। এ ছাড়া বৈদিক কালে হোমাদি সময়ে বিশেষ বিশেষ তৌলের পরিমাপের ঘি ব্যবহার করা হত। বেদে তার উল্লেখ আছে।

আমরা আরও এক ঘন্টা হেঁটে বিকাল তিনটার সময় কাঁকরিয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। নর্মদার প্রায় মাঝখানে গঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরকে ঘিরে নর্মদার ধারা দু'দিক দিয়ে বয়ে চলেছেন। মন্দিরে যাবার জন্য ঘাটে নৌকা আছে। পরিক্রমাবাসীকে মাঝিরা বিনা শুল্কে পারাপার করিয়ে দেয়।

— আপলোক ক্যা উস্‌পার যায়েঙ্গে? আইয়ে হমারা নাওমেঁ সওয়ারী হো যাইয়ে। আমরা নৌকাতে উঠে বসলাম। নর্মদার নিস্তরঙ্গ শান্ত সবুজ স্বচ্ছ জলের উপর দিয়ে নৌকা তরতর করে বেয়ে চলল। আমরা নর্মদার জয়ধ্বনি দিতে লাগলাম। ঘাটে পৌঁছে আমরা নাটমন্দিরে নিজেদের গাঁঠরী ফেলে রেখে প্রথমেই নর্মদার ঘাটে গেলাম হাত মুখ ধুতে। হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি পুরোহিতজী আমাদের ভোজনের জন্য ভোগ এনেছেন। চাপাটি ও মালাই। ভোগের থালা রেখে পুরোহিতজী চলে গেলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর পুরোহিতজী এসে উপস্থিত হলেন।

— ইস স্থান কী বিশেষতা ইহ হ্যায় কী নর্মদাজী আপনে দোনো কিনারোঁ পর পশ্চিম দিশামেঁ বহতী হ্যায়, পরন্তু বীচমেঁ ইস চবুতরে কী দোনো তরফ বড়ে বেগসে পূর্ব দিশামেঁ বহতী হ্যায়। ইস্ দৃশ্য ভূভারতমেঁ আর কাঁহী নাহী হ্যায়। এসব দেখকর সবকো বড়া আশ্চর্য হোতা হ্যায়। প্রাচীনকালমেঁ ইস্ স্থানকে পাশ শ্রীনর্মদাজীকে কিনারে মাতঙ্গ ঋষি নিবাস করতে থে। উনকে পাশ এক সময় কুছ ঋষি আঁয়ে। উনহোনে মাতঙ্গ ঋষিকা আতিথ্য শ্রীগঙ্গাজীমেঁ স্নান করনেকে বাদ স্বীকার করনে কী ইচ্ছা প্রকট কী। মাতঙ্গ ঋষিনে আপনে তপোবলসে শ্রীনর্মদাজীকা প্রবাহকী বীচমেঁ পূব দিশাকী ঔর পরিবর্তিত কর দিয়া। পশ্চিম দিশামেঁ বহতী হুয়ি শ্রীনর্মদাজী গঙ্গারূপ হো গঈ। ঋষিয়োঁনে প্রেমসে ইহাঁ স্নান কিয়া ঔর মাতঙ্গ ঋষিকা আতিথ্য গ্রহণ কিয়া। কিসী ভক্তনে ইহ গঙ্গেশ্বর মহাদেবকী স্থান পক্কা চবুতরসে বনা দিয়া হ্যায়। গঙ্গেশ্বরকে সামনে শ্রীনর্মদাজীকে উত্তরতট পর গঙ্গাখেড়ী গ্রাম হ্যায়। দক্ষিণতটমেঁ থোড়ী দূরপর শ্রীনর্মদাজীকা জল কিনারে পর কুছ ক্ষারা হোগয়া হ্যায়। উসমেঁ ডাল নহী পকতী হ্যায়।

সন্ধ্যা হতেই পুরোহিতজী আরতি করে প্রদীপে রেড়ির তেল ভর্তি করে দিয়ে নৌকা করে গঙ্গেশ্বরের ঘাটে চলে গেলেন। আমরা রইলাম নর্মদা বক্ষের এই গঙ্গেশ্বর ক্ষেত্রে।

আমরা নাটমন্দিরের ভিতর ঢুকে বিছানা পাতলাম। কর্পূরের গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর এখনও সুরভিত। আস্তে আস্তে অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল। সান্ধ্যাক্রিয়ার পর সবাই নাটমন্দিরের বারান্দায় এসে বসলাম। নির্মেঘ আকাশ ফিকে জ্যোৎস্নার আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নর্মদার জলও ঝিক্‌ঝিক্ করছে। হঠাৎ রঞ্জন নর্মদার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বলে উঠলেন — দূর শালা, পরিক্রমা অনেক হয়েছে। কি হবে পরিক্রমার কষ্ট সয়ে। আমি আর পরিক্রমা করব না। এই অপরূপ দৃশ্যাবলীর মধ্যে নর্মদার কোলেই আমি থাকব। নর্মদার জল ও গাছের ফল খেয়ে সাধনায় ডুবে গেলে জীবনের স্বর্ণফসল নিশ্চয়ই কিছু না কিছু সংগ্রহ করতে পারব। আর তা যদি নাও হয়, তবুও নর্মদার কলকল্লোলে, নৈশ বাতাসে কীচকের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে বাঁশী বাজবে নিস্তব্ধ নিশীথে তা শুনবো আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে। রঞ্জন নীরব হল।

রঞ্জনের ভাব-বিহ্বলতা কাটাবার জন্য আমি বলে উঠলাম — মর্দানা ঘাট থেকে রাবেরখেড়ী পর্যন্ত সুন্দর সিং যেভাবে পথ চিনিয়ে নিয়ে এসে নিজের ঝোপড়াতে রেখে আমাদের সেবাযত্ন করল তা আমাকে আর এক সুন্দর সিং-এর কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। কৈলাস মানস সরোবর পরিক্রমাকালে আমি বেরিনাগ নামক এক সমৃদ্ধ গ্রামে তিনদিন ছিলাম। সেই গ্রামের পাটোয়ারী (মোড়ল) ছিল সুন্দর সিং। সে আমার পরিক্রমা পথের সাথী হয়েছিল। সে সঙ্গে থাকায় পথ চিনতে বা ঘোড়া ঝাব্বু* প্রভৃতি সংগ্রহ করতে আমার কোন কষ্ট হয় নি।

হরানন্দজী রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন — আপনি বা আমার সাথীরা কি কখনও কৈলাস মানস সরোবর পরিক্রমা করেছেন? রঞ্জন নিরুত্তর। প্রেমানন্দ বললেন — আসুন, এই সুন্দর রাত্রিতে আমরা বরং শৈলেন্দ্রনায়ারণজীর মুখ থেকে শিবসুন্দরের ক্ষেত্র কৈলাস মানস সরোবরের বর্ণনা শুনি।

আমি শুরু করলাম — আলমোড়া থেকে যেদিন প্রথম যাত্রা করেছিলাম, সেখান থেকে ৯০ মাইল দূরবর্তী ধারচুলা পৌঁছতে সাধারণতঃ ৭/৮ দিন লাগে, আমার লেগেছিল ১৫ দিন। কারণ পথিমধ্যে বারচিনা, ধলচিনা, শেরঘাট, নাড়ুয়াঘোড়, বেরিনাগ এবং আসকোট প্রভৃতি স্থানে দু-একদিন থেকে বিশ্রাম করে তবে ধারচুলায় গিয়েছিলাম। ধলচিনা গ্রামে জোঁকের উপদ্রব বড় জ্বালাতন করছিল। এখানকার লোকেরা জোঁককে বলে পিশু। সমস্ত গ্রাম বিশেষতঃ বেরিনাগ ও আসকোট নামক দুটি সমৃদ্ধ গ্রামের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। ধারচুলা থেকে

* তিব্বতের চামরী জাতীয় বৃষ ও ভারতীয় গাভী হতে জন্ম শঙ্কর জাতীয় গরু। দেখতে মহিষের মত। এরা যাত্রীসহ তিন চার মণ মাল অবলীলাক্রমে বয়ে নিয়ে যেতে পারে। দুর্ভেদ্য পাহাড় পথে এগুলি যাত্রীদের নিরাপদ বাহন।

কালী নদীর ধারে ধারে খেলা, পঙ্গু, কালী পাহাড়ের নীচে সিরদাং, সামথেলা বুধি প্রভৃতি গ্রাম পেরিয়ে গার্বিয়াং পৌঁছতেও আমার ১২ দিন সময় লেগেছিল। অনেক যাত্রী ধারচুলা থেকে গার্বিয়াং পর্যন্ত ৫৫ মাইল পথ ৫ দিনেই পাড়ি দেয়। গার্বিয়াং হল ব্যাসের তপস্যা ক্ষেত্র, এটি শেষ ভারতীয় গ্রাম। এখানে কালী নদীর ধারে ৩ মাইলব্যাপী বিরাট মাটি ও বালির দেওয়াল আছে যা সত্যই বিস্ময়কর। এখানে ডাকঘর, স্কুল, বাজার সবই আছে। পথের নয়নাভিরাম দৃশ্য দিন তারিখের হিসেব রাখতে দেয় না। কপালগুণে আমার সঙ্গীটিও জুটেছিল সেইরকম। তার কাছে দিন বার আর মাসের হিসেব পাওয়ার আশা করা বৃথা। পথে ১৫ দিনই কাটুক আর ২০ দিনই কাটুক তাকে জিজ্ঞাসা করলেই সে বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে আঙ্গুল গুণে হিসেব করবে — সোমবার এপা, মঙ্গল তিগর, বুধ নিশে, বৃহস্পতিবার সুম্, শুক্রবার পি, শনিবার ঙুই, রবি টুকু, সোম দুন্, মঙ্গল গুই, বুধ চি — এহিতো চৌদ্দ দিন হুয়া। সাতাইশ দিন কাহাল বা'?

গার্বিয়াং থেকে ঝাব্বু ভাড়া করেছিলাম। কালী নদীর ধারে ধারে প্রায় ১১ মাইল দূরবর্তী কালাপানি গ্রাম পেরিয়ে সঙ্চিং-এ পৌঁছবার পর সামনে পড়েছিল দুর্ভেদ্য লিপুলেক পাহাড়। চারিদিকে শুধু বরফ আর বরয — পেঁজা তুলার মত ঝিরঝির করে বরফের কণা ঝরছে তো ঝরছেই। মানুষ জীবজন্তুর চিহ্ন মাত্র নাই, গাছপালাও নাই, চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, মনে হচ্ছিল মেঘের মধ্য দিয়ে অস্পষ্ট ছায়ালোকে আমরা কোন গ্রহান্তরে এসে পৌঁচেছি। চড়াই অতিক্রম করার সময় ভীষণ শ্বাসকষ্ট, তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়। ভীষণ কষ্ট হয়েছিল তাকলাকোটে পৌঁছতে। এইখানে থেকেই তিব্বতের সীমান্ত শুরু। এখানে মণ্ডী অর্থাৎ বাজার আছে। একটা ব্যবসাকেন্দ্র। তিব্বতীরা এই বাজারকে বলে পুরাং। শ্রেণীবদ্ধ বরফের পাহাড় তাকলাকোটকে ঘিরে রেখেছে, পাহাড়গুলির নাম জাস্কর রেঞ্জ (Zeadskar Range)।

তাকলাকোটে তিনদিন বিশ্রাম করেছিলাম, এখান থেকে বারো মাইল দূরে বিখ্যাত খেচরনাথের মন্দির। সুন্দর সিং-এর আগ্রহে খেচরনাথ দেখতে গিয়েছিলাম কিন্তু এক পরম বিস্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছিল সেখানে। কর্ণালী নদীর তীর দিয়ে আধমাইলটাক পথ যাওয়ার পর গুকুং গ্রামে দেখা হল এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে। কিছু চেলাচামুণ্ডাসহ সন্ন্যাসী একটি কুঠিয়াতে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। সন্ন্যাসী দেখলেই সুন্দর সিং-এর প্রণাম করা চাই। অশীতিপর এই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী আমাকে দেখে বললেন 'তোমাকে তো বাঙালী বলে মনে হচ্ছে হে। বাড়ী কোথায়?'

নামধাম এবং পিতৃপরিচয় নিয়ে হঠাৎ তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে দুগালে চুমু খেতে লাগলেনে। বললেন, তুমি আমার শশীর ছেলে, শশী আমার ভাগ্নে। তুমি শোন নি যে তোমার এক দাদু সন্ন্যাসী হয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেছে। আমিই সেই মেদিনীপুর জেলার বাদাড় গ্রামের নগেন্দ্র বটব্যাল।

তখন আদর যত্নের ঘটা দেখে কে? খেচরনাথ যাবো শুনে তিনি বললেন, 'খেচরনাথ বা খেচরীনাথ এ সব নাম নয় হে। এর নাম খোজরনাথ। চল, আমি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যাব। এখানে শালা আবার জুম্পান পুসোর নামে তিব্বতী এক অফিসার আছে তার permission নিতে হয়, আমিই করিয়ে নিচ্ছি। খোজরনাথের সুন্দর বিষ্ণুমূর্তি দেখে তুমি মুগ্ধ হয়ে যাবে।'

পথে যেতে যেতে তিনি গল্প বললেন, তিব্বতীদের কৈলাস পুরাণে আছে একবার সাতজন ভারতীয় মুনি কয়েক মণ রূপার তাল এনে করদুং-এর রাজা জাম্বিয়াং থাকপার কাছে জমা দেন। রাজা একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান স্বর্ণকারকে ডেকে রূপো গলিয়ে একটি মূর্তি গড়ার আদেশ দেন। দুই কারিগরেরই যখন রূপো গলানো শেষ হয়েছে, সহসা সেই গলানো রূপা থেকে খোজরনাথের মূর্তি আবির্ভূত হয়েছিল। দেখাবো চলো স্বয়ম্ভু মূর্তি।

মন্দিরে পৌঁছে অত্যুজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো মূর্তির রূপ দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অপূর্ব তার কারুকার্য। বললাম' দাদু এটি তো বিষ্ণুমূর্তি নয়, মঞ্জুঘোষ মূর্তি — বোধেসত্ত্বেরই একটি রূপ।' তিনি বললেন, 'ও শালা, একই কথা, যিনিই বিষ্ণু, তিনিই বুদ্ধ।' ফিরে এসে তাঁর কুঠিয়াতে তিনি একদিন জোর করে আমাদেরকে রেখে দিলেন। আমার কৈলাসযাত্রার ইচ্ছা শুনে বললেন, 'ও পথে ভীষণ কষ্ট ওখানে গিয়ে নতুন আর কি দেখবে? এখানে দাঁড়িয়ে যা দেখছো, ওখানেও ত সেই একই জিনিস, শুধু বরফের পাহাড়। আমি একবার গিয়েছিলাম তারপর শালা ওপথে আর মাড়াই নি। তুমি কি ভেবেছো গিয়ে দেখবে শিব পার্বতী নন্দী ভৃঙ্গীকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে বসে আছেন?'

'আপনি তাহলে কেন গিয়েছিলেন? এখনও বা কেন এই বরফ আর এই পাহাড়ের দেশে এসে বাস করছেন?'

তিনি বললেন, 'পাহাড়ের একটা নেশা আছে হে। সমতলে গিয়ে তিষ্ঠাতে পারি না। নিশির ডাকের মত পাহাড়ের ডাক উতলা করে তোলে। এ আশ্রম বা কুটির আমার নয়, তোমাদের কালিয়াড়া গ্রামের মেথরা জেলা, যে তোমার জন্মের বহু আগেই যুবা বয়সেই সংসার ত্যাগ করেছিল সেই এক লামার শিষ্য হয়ে সিদ্ধিলাভ করে, তার নতুন নাম হয়েছিল — লামা উগ্রনাথ। সাধনার বলে তার দেহের রূপান্তর ঘটেছিল। বছর চারেক হল দেহান্ত হয়েছে। সেই আমাকে এখানে বসিয়ে গেছে। যদি কয়েক বছর আগে আসতে তার উজ্জ্বল মূর্তি দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে। দেখলেই প্রণাম করতে ইচ্ছে হত কিন্তু প্রণাম করতে পারি নি। বামুনের ছেলে হয়ে একটা জেলেকে নমস্কার করবো?'

'এত উন্নত সাধক হয়েও আপনার এখনও সংস্কার আছে?'

'সংস্কার কি সহজে যায় হে সেও তো আমাকে দেখলে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তো'।

এবার বিদায় নিতে হবে। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই দেখি তাঁর চোখে জল। বললেন, 'আচ্ছা গুরু পাকড়েছিল শশী, ফাল্গুন মাসে উত্তরায়ণ কালে সজ্ঞানে ইষ্টনাম জপতে জপতে চলে গেল সে। সেদিন ছিল মহাসিদ্ধ রসিকানন্দদেবের পুণ্য তিরোভাব তিথি। বাদাড়ের জগন্নাথ মন্দিরের পুরোহিত আমার চেলা। তার চিঠিতে সব খবর পেয়েছি। তোর মাকে বলবি, তাদের মামা এখনও মরে নি'।

'দেশে ফিরতে ইচ্ছা হয় না আপনার?'

চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'ইচ্ছা হয় বৈকি। এই শালা পাহাড়ের দেশে মরব নাকি ভেবেছো? আমি তো শালা বহ্‌তা পানির মত রমতা যোগী। চারিদিকে ঘুরে বেড়াই। আমার ইচ্ছা মরবার আগে ফিরে যাব আমার সেই বাদাড় গ্রামে, যেখানে আমার বাপ পিতামহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। আমার হাড় কয়খানা সেখানে মাটিতে মিশে গেলেই আমি শান্তি পাব।'

'আচ্ছা দাদু! আপনি ঈশ্বর দেখেছেন?'

'নারে ভাই এখনও ধরা-ছোঁওয়ার মধ্যে পাই নি, তবে আশা করছি, একদিন-না-একদিন তাঁকে পাবই।' এই বলে তিনি উর্দুতে এক বয়েৎ শোনালেন,

> 'কোই -এ-নাউমেদি মা মারো উমেদ হা অস্ত্।
> সেই-এ-তারিকি মা রো খুরসেদ হা অস্ত্।।'

— জীবনে আশাও আছে, নৈরাশ্যও আছে। তবে আশা থাকতে নিরাশ হব কেন? আশাই আমার সাধনা। চারদিকে এত আলো, আকাশে রয়েছে সূর্য চন্দ্র। তবে, এখনও পাই নি বলে, কোনোদিনও পাব না, এ আঁধারকে, নৈরাশ্যকে কেন মেনে নেব বলো?''

পুনরায় প্রণাম করে আশীর্বাদ ভিক্ষা করলাম। বললেন,

> 'জীবনের কেন্দ্রে জাগে যে শক্তি তোমার,
> সে দেবে পাথেয়, তারে কর অবিষ্কার।'

শিবানং সন্তু পন্থানঃ — পথ তোমার মঙ্গলময় হোক।'

ফিরে এলাম তাকলাকোটে, একদিন সেখানে থেকে কৈলাসের পথে পুনরায় যাত্রা হল শুরু। এইখানে ঝাব্বু ভাড়া করে এগিয়ে চললাম। কর্ণালী নদীর কূল পেরিয়ে রুংগাং হয়ে যখন বলডাকে পৌঁছলাম, তখন প্রবল জ্বরে আমি শয্যাশায়ী, সেখানে সাতদিন থাকতে বাধ্য হয়েছিলাম। সেখানে থেকে তিব্বতের বিখ্যাত পাহাড় গুরেলা-মান্ধাতা স্পষ্ট দেখা যায়। এর তিব্বতী নাম মিমো-নাম মিমারী।

পুরাণ মতে এটি মান্ধাতার তপস্যা ক্ষেত্র। বলডাক থেকে খাড়া চড়াই, চিহ্নিত কোন পথ নেই। বৃষ্টি ও বরফের মধ্যে সে কী প্রাণান্তকর কষ্ট। এত উঁচুতে অক্সিজেনের অভাবে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছিল। পাশেই অতলান্ত খাদ, একটি পা পিছলে গেলেই ১৬ হাজার ফুট নীচে পড়ে মৃত্যু অনিবার্য।

যাই হোক এই চড়াই যেখানে শেষ হয়েছিল, সেখান থেকে সামনের দিকে বামকোণেই রাবণ হ্রদ; সেখানে সব সময় তুষারের ঝড় বইছে। — A Playground of Storms — আমাদের শরীরের যে যে অংশটুকু

ঢাকা ছিল না, তার প্রতিটি অংশ ফেটে রক্ত ঝরছিল। এটি রাবণের তপস্যাক্ষেত্র। এর অপর নাম রাক্ষস-তাল। স্নান তো দূরের কথা, অপবিত্র জ্ঞানে কেউ এর জলও স্পর্শ করে না। তিব্বতীরা একে বলে লা-ঙগা-সো (La-nga-Tso), সংক্ষেপে লাঙ্চো। তিব্বতী ভাষায় লা মানে পর্বত, ঙগা মানে পাঁচ সো মানে হ্রদ। জনশ্রুতি এই , কোন এক সময় প্রাকৃতিক কোন কারণে পাঁচটি বড় বড় পর্বত এই হ্রদের জলে ডুবে গেছে। এর কতকাংশ দেখতে জলার মত। ভয়ানক বিপজ্জনক, চোরাবালি এর যত্রতত্র। পড়লে একটা গোটা মানুষ তিন মিনিটের মধ্যে তলিয়ে যাবে। রাক্ষসের মত এই সর্বগ্রাসিতার জন্যই একে সবাই রাক্ষসতাল বলে। এখানে গাছপালা আদৌ নেই। গাছের মধ্যে আছে ব্রাহ্মীশাকের মত পাতাবিশিষ্ট একরকমের কাঁটা জঙ্গল। জীবজন্তুর মধ্যে মাঝে মাঝে দেখেছি দু একটা চমরী গাই এবং টাট্টুর চেয়ে ছোট একরকম বিচিত্র বনঘোড়া, তিব্বতীদের ভাষায় — ফায়াং। এরা যখন দৌড়ায় তখন চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে খেতে ছুটতে থাকে।

রাক্ষসতালের আয়তন ৭৪ মাইল, এর ভাঙাচোরা কাঁটার মত সূচালো তটের উপর দিয়ে মানস সরোবর যেতে হয়। তিব্বতীরা মানস সরোবরকে বলে সোম-মা-ভাং (Tso-ma-vang)। মানস সরোবরের চারপাশে ইয়াংগু, টুগু, গোসুল, জিউ (Chiu) প্রভৃতি আটটি তিব্বতী মঠ আছে। মঠগুলিতে নাকি অতীশ দীপঙ্করের আমলে আনা অনেক পুঁথি সংরক্ষিত আছে। দুর্নিবার আগ্রহ থাকলেও দুর্ধর্ষ লামাদের জন্য গোম্ফায় সুরক্ষিত ঐ সব পুঁথি দেখবার সুযোগ মেলে নি।

এখানে একটা কথা বলে রাখা ভাল, মানস সরোবর সম্বন্ধে পুরাণে যেসব লোভনীয় দৃশ্যের বর্ণনা আছে, সেসব কিছুই আমার চোখে পড়ে নি। তাঁদের বর্ণিত স্বর্ণপদ্ম বা রাজহংস একটাও দেখলাম না। ঙঙ্বা নামে একজাতীয় জলজ পাখী অবশ্য দেখেছি। বিচিত্র ধরণের পাখী। এর ঠোঁট হলদে, ঠোঁটের অগ্রভাগে একটি ছোট্ট কালো টিপ, দেহের উপরাংশে কালো, নীচের অংশ সাদা, পা-গুলি কমলা রঙ-এর। কল্পনাপ্রিয় পুরাণকারের রঙিন চোখে ঙঙ্বা যদি রাজহংস হয়, তাহলে অবশ্য কিছু বলবার নেই। মানস সরোবরে যাঁরা স্বর্ণপদ্মের কথা বলেন তাঁদেরকে নিছক মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তবে স্বর্ণপদ্মকে বা রাজহংস সেখানে কেলি করুক আর না করুক নীল আকাশের তলে চারিদিকে তুষারাচ্ছাদিত পাহাড়ের কোলে ৫৪ মাইল দীর্ঘ ঘন নীল অগাধ জলরাশির যে সৌন্দর্য, তা অবর্ণনীয়।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এর বুকে ক্ষণে ক্ষণে দৃশ্য পরিবর্তনের যে জাদু তা মনকে বিহ্বল করে দেয়। সকালে সূর্যকিরণ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে গোটা সরোবর জুড়ে অজস্র ঢেউ তলদেশ থেকে ফুলে ফেঁপে ফুঁসে যেন আকাশে গিয়ে ধাক্কা মারতে চায়। তার ফলশ্রুতি হিসাবে চোখে পড়ে জল নয় — শুধু দুগ্ধফেননিভ নর্তনশীল তুলার রাশির মত বরফের কুচি। মধ্যাহ্নের কাছাকাছি এর বুকে আর এক দৃশ্য, যেন কোন জাদুকরের জাদুদণ্ড স্পর্শে হঠাৎ মানস সরোবর শান্ত ও স্থিরভাব ধারণ করে। ঢেউ তো দূরের কথা, জলে তখন একটা কম্পনও জাগে না। কোথা থেকে কি ভাবে যে জল ঘন সবুজ পান্নার মত দেখতে হয় তা দুর্বোধ্য। এই সময়েই দূরবর্তী তুষারশুভ্র কৈলাস চূড়ার প্রতিবিম্ব দেখা যায় জলের মধ্যে। সূর্যাস্তের সময় আবার পট পরিবর্তন। মধ্যাহ্নের সেই পান্নার মত সবুজ জল অস্তগামী সূর্যের লাল রশ্মিছটায় রক্তিম আকার ধারণ করে। মনে হয় যেন জল নয় একটা বিরাট আধারে তাজা রক্ত থৈ থৈ করছে। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিছটার সে কি অপরূপ খেলা। মানস সরোবরতটে দাঁড়িয়ে গুরেলা মান্ধাতার দিকে চোখ পড়তে দেখলাম, গোটা পাহাড়টাই যেন জ্বলছে, আগুনের লেলিহান শিখা যেন লকলক করে আকাশ স্পর্শ করতে চাইছে। গুরেলা-মান্ধাতা হল মান্ধাতার তপস্যা ক্ষেত্র। সূর্যাস্ত কালে এই পাহাড়কে চিরজীবী মান্ধাতার প্রজ্বলিত হোমকুণ্ড ভাবলে কোন দোষ হয় না।

ডানদিকে মানস সরোবর এবং বামদিকে রাক্ষসতালকে রেখে ২৮ মাইল তুষার পথ অতিক্রম করার পর তারচেনে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। কৈলাসের তলদেশেই তারচেন। তারচেন পেরিয়ে ফুদুর ময়দান কৈলাসের পাদমূল। তারচেন থেকে ফুদু আসতে গৌরীকুণ্ডের চড়াই পেরিয়ে যথাক্রমে নিয়ান্দী গোম্পা, ডিরপু গোম্পা, জুংটুলপু গোম্পা অতিক্রম করতে হয়েছিল। কৈলাস পর্বতের পরিধি ৩২ মাইল। কৈলাস পরিক্রমা কালে এক এক দিক থেকে কৈলাস পর্বতের এক এক রূপ চোখে পড়ে, কখনও মনে হয়েছে বিশাল গজমুণ্ডের মত, কখনও বা উপবিষ্ট একটি হনুমানের মত। কৈলাসকে তিব্বতীরা বলে কাং-রিং-পো। তাদের মতে এটি গ্যালপো-নরজিঙ্গি-ফোপরাং (Gylpo-Norjingi-Phop Rang) অর্থাৎ কুবেরের ধন ভাণ্ডার।

পুরাণকাররা কৈলাস পাহাড়ের যা বর্ণনা দিয়েছেন, আমার দুর্ভাগ্য আমি তার কিছুই দেখলাম না। এমন কি মহাকবি কালিদাস তার 'মেঘদূত' নামক অমর কাব্যে লিখেছেন, সেখানে নাকি 'কোটি সূর্যের প্রকাশ'। যক্ষের মুখ দিয়ে তিনি বলিয়েছেন, কৈলাসের উপর অলকাপুরীতে 'দেববালাদের হস্তে লীলাকমল অলকে নববিকশিত কুন্দপুষ্প, তাঁদের বদনশোভা লোধ্র-কুসুমের পরাগ দ্বারা পাণ্ডুতাপ্রাপ্ত কেশপাশে জড়িয়ে আছে অভিনব কুরুবক কুসুম, শ্রবণ পুটে মনোরম শিরীষ পুষ্প, আর সে স্থান দিবানিশি সঙ্গীত মুখর মুরজধ্বনিতে নিনাদিত, মণিকুট্টিমে পরিশোভিত, সেখানকার সৌধরাজি বিদ্যুদ্‌বিলসিত, ইন্দ্রধনুর্মণ্ডিত —

'যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংসশ্রেণীরচিতরসনা নিত্যপদ্মা নলিন্যাঃ। (উত্তর মেঘঃ, ১—৩)

হায় হায়, স্বর্ণপদ্মের পরিবর্তে তাল তাল বরফ, গন্ধর্ব কিন্নর ও দেবতার পরিবর্তে কিছু লামা, ভুটিয়া লোক এবং সুন্দরী দেববালাদের পরিবর্তে জন্মে যারা স্নান করে নি, এমন কিছু কদাকার হুনিয়া রমণী ছাড়া আমার চোখে আর কিছু পড়ে নি। ভ্রমরের গুঞ্জন, পুষ্প এবং বলাকা শ্রেণী সে সব তো দূর-স্ত!

তবে হ্যাঁ, তুষারবৃত উত্তুঙ্গ কৈলাস পাহাড়ের সামগ্রিক বহিঃদৃশ্যটি সম্বন্ধে মহাকবির বর্ণনা অভ্রান্তভাবে সত্য। তিনি বলেছেন — 'সদ্যঃ কৃত্ত-দ্বিরদ-দশন-ছেদ-গৌরস্য তস্য' অর্থাৎ সদ্যোছিন্ন একটি হস্তিদন্তকে পুনরায় চিরে ফেললে তার ভেতরটি যেমন শ্বেতশুভ্র তেমনি বা ততোধিক শুভ্র ঐ কৈলাস পর্বত। সত্যি কথা বলতে কি তুষার মণ্ডিত এই পর্বত না দেখলে ঋষি বর্ণিত 'রজতগিরিনিভ' এবং 'শ্বেতাম্বর' কথা দুটির তাৎপর্য বুঝতে পারতাম না। মহাকবি যেখানে কৈলাসকে এককথায় প্রকাশ করেছেন — 'রাশিভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ — সেখানে তিনি ক্রান্তদর্শী তাঁর ভাবদৃষ্টিতে উদ্ভাসিত কৈলাস সত্যই,

অসংখ্য তার শুভ্রশিখর, কুমুদফুলের তুল্য সাদা।
শিবের যেন অট্টহাসি যুগযুগান্তে জমাট বাঁধা॥

সার্থক বর্ণনা। বাস্তব বর্ণনা। এই বর্ণনায় কবি কল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষের রাখী-বন্ধন ঘটে গেছে।

কিন্তু কৈলাসের ঐ ঐশ্বর্য এবং সৌন্দর্য সম্পূর্ণ অনুভবগম্য! এ কথা প্রত্যেকের জেনে রাখা ভাল, কাব্য এবং পুরাণের বর্ণনাকে সম্বল করে যাঁরা কৈলাস ও মানস সরোবরের নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখবার আকর্ষণে এখানে আসবেন, আমি বলছি সেই সব বাহ্যিক সৌন্দর্য পিয়াসীদের এত কষ্ট সহ্য করে কৈলাসে আসার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ তাকলাকোট থেকে কৈলাস পর্যন্ত ৯২ মাইল এই সুদীর্ঘ পথে বরফ ছাড়া আমি কোন গাছপালা দেখি নি। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য রম্যতা এবং রমণীয়তা বলতে যা বোঝায়, তা এখানে এসে কেউ পাবেন না। প্রশ্ন উঠতে পারে, যুগ যুগ ধরে মুনি ঋষিদের ধ্যানের বস্তু শিবভূমি কৈলাসের কি তবে কোন সৌন্দর্যই নেই? আছে। পূর্বেই বলেছি তা অনুভবগম্য, ধ্যানগম্য। নানা সুন্দর বেশভূষায় সুসজ্জিত কুঞ্চিত কেশদাম-বিশিষ্ট একজন সুদর্শন কান্তি যুবাপুরুষের সৌন্দর্য আর মুণ্ডিত মস্তক ধ্যানসিদ্ধ যোগী পুরুষের শান্ত মুখশ্রীর মধ্যে যে তফাৎ, রূপ-রস-গন্ধভরা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের বাহ্যদৃশ্যের সঙ্গে কৈলাসেরও সেই প্রভেদ বিদ্যমান। চিত্রকূট পঞ্চবটী দণ্ডকারণ্যের কোলে নবদুর্বাদলশ্যাম রামচন্দ্র বা বৃন্দাবনের পটভূমিতে নওলকিশোর শ্যামসুন্দরকে যেমন মানায়, তেমনি নিঃসীম নীলাকাশের পটে তুষারশুভ্র কৈলাসের ধ্যানাসন মহাযোগেশ্বের দিগম্বর মহাদেবকে সেইরকমই মানায়। নির্লিপ্ত মহাযোগীর যেন নিস্তব্ধ নিষ্পন্দ নিথর সমাধিমগ্ন স্থূলরূপ এই কৈলাস। দিগন্তবিস্তৃত তুষারময় অর্ধলিঙ্গাকৃতি এই পর্বত নিবিষ্ট চিত্তে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করলেই এক নির্মল নিরূপম ভাবাবেশে মন আবিষ্ট হয়। এখানে সৌন্দর্য আছে কিন্তু সেই সৌন্দর্য নিরাকারের সৌন্দর্য। এখানে অনুভূতি হয়, কিন্তু সে অনুভূতি অনন্তের অন্তহীন উপলব্ধি।

এই হল কৈলাস ও মানস সরোবর। যুগ যুগ ধরে লক্ষ কোটি লোক এই জাগ্রত শিবক্ষেত্রকে ধ্যান করে আসছে। ধ্যানের ধনই বটে। দূর থেকে কৈলাস এবং মানস সরোবর দৃষ্টিপথে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর সিং-এর ভাবান্তর লক্ষ্য করার মত। আমাদের উভয়েরই পোষক তখন শতছিন্ন — থলে আসকোট প্রভৃতি গ্রাম পেরিয়ে, রামগঙ্গা গৌরীগঙ্গা ও ধৌলীগঙ্গার ধারে ধারে চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে বরফের উপর দিয়ে ক্রমাগত হাঁটার ফলে পায়ে তখন ঘা হয়েছে, তাকলাকোটে (১৫০০০ ফুট শ্রেণীবদ্ধ বরফের পাহাড়) একটা ভারী সুন্দর উলের 'থুলমা' কিনেছিলাম সেইটা কোনমতে গায়ে জড়িয়ে কাঁপছি। কিন্তু সুন্দর সিং? কৈলাস

ও মানস সরোবর দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম সে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে পড়ল, অপলক তার দৃষ্টি, অবিরাম ধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে, সারা শরীরে তার পুলক ও রোমাঞ্চ।

এই হল হিন্দু ভারতবর্ষের হিন্দু। ভক্তের ভালবাসাই যার ভালা-বাসা, দর্শনের একাগ্র অভিলাষই যার কৈলাস — ভোগের ক্ষীর সর নয়, বীতরাগের বিরাগ নয়, বৈরাগ্যের সুর বা রাগের স্বরও নয় — অনুরাগের শর যাঁকে জরজর করে তাঁরই নাম ঈশ্বর এবং এই ঈশ্বরকেই যুগ যুগ ধরে সুন্দর সিং-এর দল অনুসন্ধান করে আসছে তীর্থে তীর্থে। মানস সরোবর বলুন, রাবণ হ্রদ বলুন, এমন কি হাঁটা পথে যত অখ্যাত গ্রাম পড়েছে কোথাও দেখেছি, মনোহর দৃশ্য, কোথাও দেখেছি দিগন্ত বিস্তৃত সাদা বরফে ঢাকা অত্যুচ্চ পর্বত শ্রেণী। কোন চড়াই-এর কেন্দ্রস্থল থেকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব উদ্ধ অধঃ — সবদিকটার ছবি মনের মধ্যে অনুভব করতে গেলেই দেখেছি, একটা বিরাট শূণ্যতা যেন থম্ থম্ করছে। কিন্তু ঐ সবরকমের সুন্দর প্রশান্ত এবং গম্ভীর দৃশ্যকে ছাপিয়েও কালী নদীর ভয়ঙ্করী রূপ আমার মনে চিরকাল আঁকা থাকবে। 'Dangerous and ferocious Kali river' বললে কালী নদীর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না, কর্ণপটহ ছিন্নকারী, ভীষণ গর্জনশীলা এই নদীতে টিলার মত উঁচু উঁচু বড় পাথর সামান্য এক টুকরো কাগজ বা কাঠির মত ডুবছে উঠছে — এত বেগ এবং স্রোত এই নদীর। কালী নদীর ধারে দাঁড়ালে বিশেষতঃ যখন এর উপর দড়ির সেতু (rope bridge) ধরে পারাপার হয়েছি তখন বুকের রক্ত হিম হয়ে গিয়েছিল। ভয়ঙ্করী এই নদীর প্রলয়ঙ্কারী ভীষণা রূপের মধ্যে শিবের রুদ্ররূপটি যথার্থ ভাবে প্রকটিত বলে আমি মনে করি।

মানস সরোবরের পথে সর্বত্র যদি সত্য শিব সুন্দরের সুন্দর রূপের সাক্ষাৎ মেলে, তবে কালী নদী নিঃসন্দেহে রুদ্ররূপের প্রকাশ! এই কালী নদীকে অতিক্রম করেই আমাদেরকে মানস সরোবর পৌঁছতে হয়েছিল — ভয়ঙ্করকে অতিক্রম করতে পারলে তবেই তো, নিরবধি কাল ধরে বোধিও যাঁর অবধি পায় না সেই শুভঙ্করের দ্বারে পৌঁছান যায়। আমরা রুদ্রের ভ্রূকুটিতে ভয় পাই নি বলেই অবশেষে তাঁর বরাভয় দক্ষিণ মুখ অর্থাৎ সত্যশিবের সুন্দর রূপের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম কৈলাস ও মানস সরোবরের পথে পথে।

ভারতবর্ষ পরিব্রাজন না করলে তার মহিমামণ্ডিত রূপটি কখনই ধরা যাবে না। পরিক্রমায় বেরিয়ে আমার বারবার মনে হয়েছে, আমাদের দেশ কেবল মাটি কাঠ পাথরের ভূখণ্ড মাত্র নয় একটি মন্ত্রময় দেহ আছে, শুধু কৈলাসই শিবক্ষেত্র নয় সারা ভারত জুড়েই তাঁর আবাস। ভারতের এক একটি ভৌম রূপের মধ্যে ঋষিরা ব্যক্ত করে দিয়েছেন সেই সর্বব্যাপ্ত ভূমার এক একটি তত্ত্বকে। যাঁর চোখ আছে তিনি দেখেন, যাঁর কান আছে তিনি শোনেন নদী সমুদ্র ও ঝর্ণার কলতানের মধ্যেই উদ্‌গীথ নাদ-ধ্বনি।

শঙ্করভাষ্য না পড়লে যেমন উপনিষদ বুঝা যায় না তেমনি দুঃখ কষ্ট সয়ে সারা ভারত পরিক্রমা না করলে শিবশঙ্করের জীবন্ত ভাষ্য এই দেশের মহিমা কিছুতেই বুঝা যাবে না।

আমার যখন কৈলাস মানস সরোবর সম্বন্ধে কথা শেষ হল তখন অনুমান করলাম রাত্রি ১১টা বেজে গেছে। এই নির্জন দ্বীপে জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত্রির শোভা দেখবার মত। পাহাড়ের কোল জুড়ে অজস্র ফুল। বিচিত্র রং-এর সমারোহ। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে মিষ্টি গন্ধ। চন্দ্রকিরণের জোয়ার তরঙ্গিত হয়ে এমন এক মায়ালোকের সৃষ্টি করেছে যেন মনে হচ্ছে স্বয়ং বনদেবী এই জনহীন নিশীথে ধীর পদক্ষেপে নেমে এসেছেন মা নর্মদা ও মহাদেবের পূজা করতে। হাতে যেন তাঁর পূজার ডালি। বন পুষ্পের অপরূপ সৌরভে আমোদিত হয়ে উঠছে চারদিক। না দেখলে এ দৃশ্যের বিরাট মহনীয়তা, গাম্ভীর্য, ভয়, বিস্ময়, সৌন্দর্য কিছুই বোঝানো যাবে না কাউকে। রঞ্জনের শরীর একই রকম নিথর, নিস্পন্দ, চিত্রার্পিতবৎ। আমরা রঞ্জনকে ঘিরে যে যার আসনে বসে রইলাম। এমন সময় অন্ধকারের মধ্যেই অনুভব করলাম রঞ্জনের উপবিষ্ট ভঙ্গিমার আকৃতিটি জ্যোতির রেখায় ফুটে উঠেছে। আমার স্তম্ভিত। এই দিব্যমূর্তি দেখতে দেখতে আমাদের চোখের পাতা ক্রমশঃ ভারী হয়ে আসছে। আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ বন্ধ করলাম।

আমি নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আমি বসেই আছি। তাকিয়ে দেখি সবারই অবস্থা তথৈবচ। তবে বসে বসেই রাত কাটিয়েছি? কিন্তু শরীরে ক্লান্তি কোথায়? অবসাদ কোথায়? বরং শরীর অনেক হালকা মনে হচ্ছে। ঝরঝরে লাগছে। তৃপ্তিবোধ হচ্ছে। সকল স্নায়ুতন্ত্রীকে স্নিগ্ধ এবং সতেজ দেখছি।

এমন সময় সমগ্র দ্বীপ ও মন্দিরকে প্রকম্পিত করে মহাত্মা সোমানন্দের দৈববাণীর মত কণ্ঠস্বর ভেসে এল

— বলি, ওলো ও রেবা! তুই ত মা বিয়েও করিসনি বাচ্চাও হয়নি। আঁটকুড়ি বাঁজি! সন্তানের বেদনা তুই বুঝবি কি করে লো!

জল খাবি ত খানা মুখপোড়া! ওটা নর্মদার জল! তুই মুখপোড়া আমার পীরিতের কুটুম ত! তোর জন্যই ত ছুটে এসেছি।

এই বলেই তিনি আমার কমণ্ডলুটা নিয়ে রঞ্জনের মুখ হাত দিয়ে চেপে ধরে জল ঢেলে দিলেন। মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিলেন। তিনি ঘরের মাঝখানে বসে শুধু দুলেই যাচ্ছেন। আর কোন কথাই বলছেন না।

একটু পরেই উঠে গিয়ে রঞ্জনের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন — যেয়েও আছে, থেকেও নেই। তেমনি তুমি আর আমি যে ভাই! আমরা মরে বাঁচি, বেঁচে মরি! গোঁসাই-এর একী বিষম চাতুরী! গোঁসাই এর এ কী বিষম চাতুরী! নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়, নমঃ শিবায়। আস্তে আস্তে রঞ্জনের সারা শরীরে স্পন্দন দেখা দিল। রঞ্জন ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

মহাত্মা কারো দিকে না তাকিয়ে ভাববিহ্বল কণ্ঠে মা নর্মদার দিকে তাকিয়ে আপনমনে বলে যেতে লাগলেন — মাগো। সকলেই তোর জলময়ী রূপটাই দেখে, ভাবে, তোর তটে তটে দুর্গম পাহাড় পর্বত আর ঘনঘোর জঙ্গল ছাড়া আর কী-ই বা আছে! তবু কেন ঋষিরা বৈদিক যুগ থেকে তোরই তটে বসে তপস্যা করে গেলেন? যোগাসনে বসে নাক মুখ খিঁচে, শ্বাস টেনে নানা মুদ্রার কসরৎ করলেই কী যোগ হয়। তবে তোকে মা! যারা কেবল নীরাকার দেখে, তারা জানে না, তোর কত রূপ।

এ জগৎ বটে মা তোমার অলংকারের সাজানো থাল
প্রাতর্মধ্যসায়ংকালে সাজায়ে দেন মহাকাল;
আবার নিশাকালে বদলে পরায়
তাতে আলো আঁধার দুই-ই দেখা যায়,
বল্ মা তবে কার মা আছে এত অলঙ্কার!

রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে বললেন — আমার গুরু করার ইচ্ছা নেই!

— গুরু করার ইচ্ছা নাই ত ভারোচে পৌঁছে উত্তরতটের তবরাতে ছুটে গেছিলি কেন? কি দেখলি সেখানে? দেখলি তোর বাউল গুরুও এক শৈবগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে শিবনামে বিভোর হয়ে আছেন। তাঁর দেহান্ত হলে দক্ষিণতটে এসে শৈলেনের সঙ্গী হলি। জগদ্‌গুরুর কাছে পৌঁছতে হলে গুরু তোকে করতেই হবে। তোর একতারার তার যাবে ছিঁড়ে। তখন গুরুই হবেন একমাত্র সেতু তোমার আর তাঁর মধ্যে। দুস্তর পারাবার অতিক্রম করে তোমার আর তাঁর মধ্যে গুরুই পারবেন মিলন ঘটাতে। ঘুড়ি উড়বে কি করে আকাশে, কেউ যদি না ধরে লাটাই?

শিব এবং নর্মদার স্বরূপ কি তুই কখনও দেখেছিস। যাঁকে চোখে দেখিসনি যাঁদের স্নেহ ভালবাসার স্বাদ কোনদিন পাসনি তাঁদের নাম জপে কি ফলটা ফলবে শুনি? অদৃষ্টপূর্ব বস্তুকে কি স্মরণ মনন করা যায়, হর, হরজায়া এবং হরকন্যার স্বরূপ তোর দেখা আছে? নর্মদা বললে নর্মদার জলের প্রবাহ ছাড়া আর কি ভাসবে তোর মনে? কিন্তু বাবা বা মাকে স্মরণ করলে তাঁদের কাল্পনিক স্থূলরূপ ফুটে ওঠার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা নাই। মা বাবা সন্তানের অন্তর্সত্ত্বা ব্যেপে সতত বিরাজ করছেন। মা বাবার স্নেহ ঢলঢল মুখচ্ছবি, সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য লেখাপড়া তপস্যা, নাম যশে তাঁদের উল্লাস আবার কোন বিষয়ে পুত্রকন্যা অকৃতকার্য হলে তাঁদের বিষাদময় মুখচ্ছবিতে যে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এমন আর কারো মধ্যে দেখেছিস? এই জন্যেই বেদের নির্দেশ — মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব।

তুই প্রচণ্ড মাতৃভক্ত। বাবার উপর অভিমানে মায়ের স্মৃতি বুকে নিয়ে বাড়ী ছাড়লি, দেশ ছাড়লি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পেরেছিস বাবার কথা! প্রতি রাতেই বাবার কথা ভেবে ভেবে চোখের জলে বালিশ ভিজিয়েছিস। শেষ বয়সে তোর বাবাও তোর জন্য খুব কেঁদেছে রে। আমি তোর খবর তাকে পৌঁছে দিয়েছি। তোর জন্যই তার প্রাণটা আটকে ছিল। উত্তরায়ণকালে সজ্ঞানে চলে গেলেন তোর বাবা। কিরে! নর্মদার তটে তটে এতদিন ঘুরলি, কতনা মাথা ঠুকলি, কিন্তু বাবাকে প্রণাম করার আনন্দ আর কোথাও পেলি! কাল থেকে শৈলেনের কাছে শিখে নিয়ে পিতৃপুরুষের তর্পণ করবি। ১১ দিনের দিন বাবার শ্রাদ্ধান্তে আমি তোমায় সন্ন্যাস

দীক্ষা দেব, ওঁকারেশ্বরে মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে। শাস্ত্রে আছে মা বাবার অনুমতি ছাড়া সন্ন্যাস গ্রহণ যারা করে তারা ভ্রষ্ট সন্ন্যাসী। তারা যতই তীব্র তপস্যা বা যোগানুষ্ঠান করুক তাদের সিদ্ধি সুদূর পরাহত। স্বয়ং যোগিগুরু আচার্য শঙ্কর যতক্ষণ মায়ের অনুমতি পান নি, ততক্ষণ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নি।

এই তপোভূমি নর্মদার তটে তপস্যা করলে সিদ্ধি তরান্বিত হয়। এজন্য বৈদিক ঋষিরা সবাই এখানে এসে তপস্যা করেছিলেন। যেসব বৈদিক ঋষি নর্মদাতটে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন তাঁরা সকলেই মাতৃপিতৃভক্ত। আর যাঁরা নর্মদাতটে তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করতে পারেননি তাঁরা কখনই মাতৃপিতৃভক্ত ছিলেন না। একথা ধ্রুব সত্য মা বাবা উভয়ে মিলে অর্ধনারীশ্বর। মাকে জানলে বাবাকে এবং বাবাকে জানলে মাকেও শ্রদ্ধা ভালবাসা জানানো হয়। পুত্রের যেকোন কারণে চোখে জল ঝরলে সদা ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির টনক নড়ে, মা নর্মদারও আসন টলে — একথা সত্য সত্য সত্য। বাবা এই নরলোকে প্রত্যক্ষ জীবন্ত ঈশ্বর আর মা হলেন, নরদেহে প্রকটিতা জীবন্ত ঈশ্বরী।

স্বরূপের বাজারে থাকি। শোন্ রে খেপা বেড়াস্ একা, চিনতে নারলে ধরবি কি। কালার সঙ্গে বোবার কথা হয়। মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়। জেয়ান্তে ধরতে গেলে হাবুডুবু খায়, সে মড়া নয়গো রসের গোড়া, তার রূপেতে দিয়ে আঁখি।

তাঁর কণ্ঠ নীরব হল। মহাপুরুষ উঠে দাঁড়ালেন। ঘরের মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। বুঝলাম, তিনি চলে গেলেন।

রঞ্জন আস্তে আস্তে ধাতস্থ হচ্ছে। উঠবার চেষ্টা করল। কিন্তু পারল না। রঞ্জনকে দেখে মনে হচ্ছে এক অনাস্বাদিত পূর্ব তৃপ্তির আবেশে তার অস্থি সন্ধি শিথিল হয়ে আছে। প্রেমানন্দ রঞ্জনকে ধরে সোজা করে তুলে বসিয়ে দিলেন। সম্মুখের শৈলচূড়ার অন্তরাল হতে বালসূর্য নিজের মহিমায় ধীরে ধীরে অত্মপ্রকাশ করছে, পর্বতের বড় বড় শিখরগুলিতে কেউ যেন সিঁদুর আর সোনার রেণু ছড়িয়ে দিল। যেদিকে চাই, সেদিকেই চোখে পড়ছে অজানা কোন আকাশপরীর অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল। বড় সুন্দর, বড় সার্থক তপোবনের এই সুস্নিগ্ধ প্রভাত। প্রেমানন্দ রঞ্জনের হাত ধরে নাটমন্দিরে ভিতরে নিয়ে এসে তার বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

রঞ্জনের শরীর খুব হাল্কা মনে হল। প্রেমানন্দ যখন তাকে ধরে নিয়ে এলেন তখন তার পা যেন মাটিতে পড়ছিল না। শুইয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জন নাক ডেকে ঘুমাতে লাগল।

প্রায় আটটা বাজতে যায়। আমি রঞ্জনের কাছে বসলাম। আর সবাই প্রাতঃকৃত্য ও স্নান করার জন্য নর্মদার ঘাটে গেলেন। তাঁরা ফিরলে আমি মন্দিরস্থ মহাদেবকে প্রণাম করে নর্মদার ধারে নেমে নর্মদাকে স্পর্শ করলাম।

আমি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করলাম —

গতং তদৈব মে ভয়ং তদম্বু বীক্ষিতং যদা মুকণ্ডু সূনু শৌনকাসুরারিসেবি সর্বদা।
পুনর্ভবাব্ধিজন্মজং ভবাব্ধিদুঃখবর্মদে ত্বদীয় পাদ পঙ্কজং নমামি দেবি নর্মদে॥

— মার্কণ্ডেয় শৌনকাদি ঋষি তথা সমস্ত দেবতারা মাগো! তোমার নিরন্তর সেবা করেন। সেই মুহূর্তে আমি তোমার জল দর্শন করেছি, সেই মুহূর্তেই আমার জন্মমরণের দুঃখ এবং সংসারের সকল তাপ হতে আমি মুক্ত হয়ে গেছি। সংসাররূপী সমুদ্রের যতেক দুঃখ দূরকর্ত্রী। মা নর্মদে তোমার চরণ কমলে প্রণাম করছি। তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ কর মা জননী।

বেলা নয়টা নাগাদ দেখি পুরোহিতজী ঘাটের দিক থেকে উঠে আসছেন। নমঃ নারায়ণায় জানিয়ে আমরা আজ এখানে থাকব কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। মহানন্দস্বামী বললেন — আমাদের পায়ে খুব ব্যথা। এখানে দু'চারদিন থাকব। আপনার কোন আপত্তি নেই তো।

— আমার কিসের আপত্তি! এই মন্দির ও তৎসংলগ্ন নাটমন্দির তো পরিক্রমাবাসীদের জন্যই। আপনারা আনন্দে যতদিন ইচ্ছা থাকুন। প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আপনাদের সেবার জন্য ফল, দুধ চাপাটি পৌঁছে দেব।

পূজা করে পুরোহিতজী চলে গেলেন। বেলা এগারোটা নাগাদ রঞ্জনের ঘুম ভাঙল। শুয়ে শুয়ে সে গুণগুণ করে গাইতে থাকল —

পিতঃ! অনন্ত আকাশ জুড়ি তোমার বিশাল আঁখি,
জগতের প্রতি দৃশ্যে ও দুটি নয়ন দেখি;
নয়নে নয়ন পড়ে যখন যেদিকে চাই
স্নেহময় আঁখি দুটি সতত দেখিতে পাই।
এ দৃশ্য জগৎ ছেড়ে অন্তরে খুঁজিলে দেখি
প্রেমভরে চেয়ে আছে স্নেহমাখা দুটি আঁখি।
গোপনেই চেয়ে থাক গোপনে বাসগো ভালো
মন্ত্রমূর্তি প্রকাশিয়া করিলে হৃদয় আলো॥
নিজেকে দেবতারূপে যে স্লান মুকুরে
স্বাধ্যায় মনন বলে কিংবা মন্ত্রবলে
মরে বেঁচে উঠি,
আকাশ-কুসুমে গাঁথি জয়মাল্য, অবারিত দূরে
মাধুর্যের রসমূর্তি তুমি পিতঃ। তোমা পানে
যেতে চাই ছুটি!

রঞ্জনের মনোহারী কণ্ঠস্বরে এক অপূর্ব তান ও সুর ফুটে উঠেছে, ভাষার মনোহারিত্ব মনকে মাতিয়ে তুলল, ভাব ও ভাষা যেন নৃত্যের তালে তালে নেচে চলেছে। মূর্ত হয়ে উঠেছে এক অপূর্ব ছন্দ।

— চলুন ভাই, আপনার সঙ্গে নর্মদার ঘাটে যাই। মহাপুরুষ বলে গেছেন — আপনাকে সঙ্গে নিয়ে পিতৃপুরুষের তর্পন করতে।

মহাদেবকে প্রণাম করে রঞ্জনকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গেশ্বরের ঘাটে নামলাম। বললাম — শিবশিবানীর মধ্যে যেমন কোন পৃথকত্বের বোধ রাখতে নাই, তেমনি পিতামাতা উভয়েই একাত্মা এবং অভিন্ন। এরপর তাঁকে মাতৃপিতৃ মন্ত্রে তর্পণ করলাম শুক্ল যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৪ নম্বর কণ্ডিকার মন্ত্র পাঠ করে।

ওঁ উর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলালং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়তে মে পিতৃন্।

— হে আমার ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তবৃত্তিনিবহ। তোমরা আমার পিতৃপূজার প্রধান উপকরণ। তোমরা পিতৃপুরুষদের নিকট আমার ভক্তি উপহার বহন করে নিয়ে চল। পিতৃলোককে তৃপ্ত কর। পিতৃলোক স্বরূপ জ্যোতির্ময় ব্রহ্মে লীন হলে তবেই পিতৃপুরুষগণ তুষ্ট হন, আমি যেন ভক্তিবলের দ্বারা তাঁদের তৃপ্তিসাধন করতে পারি।

ক্রমে ক্রমে তাঁর পিতার মাতার নাম জেনে পাঠ করালাম

বিষ্ণুরাম ...গোত্রে ... দেব/দেবি তৃন্যতানেতৎ পুণ্যোদক তস্যৈ স্বধা।

সূর্যের দিকে তাকিয়ে অঞ্জলিবদ্ধ জল অর্পণ করতে করতে রঞ্জন ডুকরে কেঁদে উঠল। কান্না আর কিছুতেই থামে না। কোনমতে একটু প্রকৃতিস্থ হতেই তাঁকে ঘাটের পৈঠায় জোর করে বসিয়ে দিয়ে বললাম — গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে থাকুন।

আমিও পিতৃলোককে আবাহন করে নর্মদার জলে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করলাম। যখন তীরে উঠলাম, তখন সূর্য মধ্যগগনে। বোধহয় বেলা ১২টা বেজে গেছে। গঙ্গেশ্বরের মাথায় নর্মদার জল দুদিক দিয়ে দুজনে ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলাম —

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে। সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং। উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ। মৃত্যোর্মুক্ষীয় মা অমৃতাৎ। ওঁ নমঃ শিবায়।

ইতিমধ্যে পুরোহিতজী আমাদের জন্য প্রসাদ নিয়ে এসেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গেই খেতে বসলেন। কিছু সজীর তরকারী, রুটি ও দুধ। আমরা খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। খাওয়ার পর আমরা নাটমন্দিরের বারান্দায় শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আমার ঘুম এল না। আমি ডায়েরী লিখতে বসলাম। একটু পরেই পুরোহিতজী আমাদের ঘরের প্রদীপে রেড়ীর তেল ভর্তি করে দিলেন। মন্দিরে সন্ধ্যারতির আয়োজন হচ্ছে। আমি মহাত্মা প্রলয়দাসজী প্রদত্ত পুঁথিটি বের করে মহর্ষি তণ্ডিকৃত মহাদেবের অষ্টোত্তর সহস্রনাম পাঠ করতে থাকলাম। পাঠ শেষে সকলে

মিলে নর্মদাতে গিয়ে নর্মদার জল স্পর্শ করে মন্দিরে এসে বসলাম। পুরোহিতমশাই আরতির পর নর্মদার ঘাটে কর্পূর জ্বেলে পাঠ করতে লাগলেন —

স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং
পূজার্থং বা কদাচিদ্‌বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বদলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকশিতা গন্ধধূপৌ ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো!'

আরতি দেখে এবং মন্দিরে সন্ধ্যা সেরে ফিরে এলাম নাটমন্দিরে।

মহানন্দস্বামী — পুরোহিতমশাই যে শিবপরাধভঞ্জন স্তোত্রটি পাঠ করলেন সেটা কী শঙ্করাচার্য রচিত বলে কি মনে হয়? আমি যতটুকু বই পড়ে জেনেছি — আচার্য শঙ্কর মূর্তিপূজা ইত্যাদির কোন বাহ্য অনুষ্ঠন করতেন না।

রঞ্জন — আচার্য শঙ্কর যদি সত্য সত্যই বাহ্যপূজার বিরোধী ছিলেন তবে তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রধান চারটি মঠের শঙ্করাচার্য উপাধিকারী মহাত্মাগণকে কেন নানা দেবদেবীর মূর্তির পূজা করতে দেখি? জ্যোতির্মঠে দেবী পূর্ণাগিরি এবং শৃঙ্গেরী মঠের শারদাদেবীর প্রতিষ্ঠা শঙ্করাচার্য করে গেছলেন। এখনও তাঁদের নিত্যপূজা হয় এটি কি করে সম্ভব? তাঁর রচিত 'দেবী সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে' থেকে আরম্ভ করে প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুং, ভবান্যষ্টক, দুর্গাপরাধভঞ্জন স্তোত্র, কাল্যপরাধভঞ্জন স্তোত্র, গণেশাষ্টক প্রভৃতি স্তোত্র তো পুরোপুরিভাবে দেবদেবীর বাহ্যপূজার পরিচয় বহন করছে।

আমি — সব স্তোত্র শঙ্করের রচিত নয়। ঐগুলি প্রক্ষিপ্ত। শঙ্করাচার্যের নামে প্রকাশিত তাবৎ গ্রন্থকে তাঁর লেখা বলে স্বীকার না করলে তাতে তাঁর মহিমা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না। গ্রন্থকারের কৃতিত্ব সংখ্যাধিক্যের উপর নির্ভর করে না, বিষয় গৌরব, বস্তু গৌরব, চিন্তার স্বকীয়তা ও গভীরতা, সর্বোপরি গ্রন্থনিহিত বোধির দীপ্তিই গ্রন্থকারকে অমরতা দান করে।

ভারতের ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আচার্য শঙ্কর ছিলেন কোহিনুর স্বরূপ — কোহিনুরই বা বলি কেন, তিনি ততোধিক। কোহিনুর বহুবার লুণ্ঠিত হয়েছে, তুর্কী-মোগল-ইংরেজ অনেকের কাছেই হস্তান্তরিত হয়েছে বারবার, তাতে আমাদের স্থায়ী কিছু ক্ষতি হয়েছে বলে আমি মনে করি না। কিন্তু যদি শঙ্করাচার্যের মূল একখানি গ্রন্থও চিরতরে অপহৃত বা নষ্ট হত তাহলে দেশের যে ক্ষতি হত তা অপূরণীয়। ১৫০/২০০ টির পরিবর্তে মাত্র ৩৫টি গ্রন্থকে তাঁর প্রকৃত রচনা বলায় আপনি ক্ষুণ্ণ হচ্ছেন, কিন্তু মাত্র ৩২ বৎসর আয়ুষ্কালের মধ্যে ৩৫ খানা কালজয়ী গ্রন্থ লেখাও কি কম কথা? আমার মতে তিনি যদি কেবল ব্রহ্মসূত্রের শারীরিক ভাষ্য লিখে যেতেন, অন্য কোন বই লেখার সুযোগ তাঁর নাও হত — তাহলেও তিনি মৃত্যুঞ্জিৎ কীর্তির অধিকারী হতেন।

প্রাচীনকাল হতে বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন ভাষায় ভাষ্য, প্রকরণ গ্রন্থ এবং স্তোত্রাদি মিলিয়ে প্রায় ২০০ খানা গ্রন্থ শঙ্করের নামে প্রচলিত আছে। তার মধ্যে ব্রহ্মসূত্রের উপর বিখ্যাত শারীরক ভাষ্য, ঈশ-কঠ-মুণ্ডক-ঐতরেয়-ছান্দোগ্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপর রচিত উপাদেয় ভাষ্যরাজি, গৌড়পাদকৃত মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্য, বিষ্ণুসহস্রনাম ভাষ্য, শ্রীমদ্ভগবদগীতা ভাষ্য, মণ্ডলব্রাহ্মণোপনিষদের উপর রাজযোগ ভাষ্য, বিবেকচূড়ামণি, সর্ববেদান্তসিদ্ধান্তসংগ্রহ, উপদেশসহস্রী, অদ্বৈতানুভূতিঃ, অনাত্মশ্রীবিগর্হনপ্রকরণম্, মঠাম্নায়ঃ, মোহমুদ্গরঃ, নির্বাণদশকম্, আত্মবোধঃ, অদ্বৈতপঞ্চক, কেবলোহম্ গুর্বষ্টকম্, দক্ষিণামূর্তিস্তোত্রম্, পরাপূজা, নির্গুণমানসপূজা, প্রবোধসুধাকর, স্বাত্মপ্রকাশিকা, প্রশ্নোত্তরমালিকা, মণিরত্নমালা, বিজ্ঞান-নৌকা (স্বরূপানুসন্ধানম্), ব্রহ্মজ্ঞানাবলীমালা, ব্রহ্মানুচিন্তনম্ এবং নির্বাণষটকম্ প্রভৃতি গ্রন্থ যে আদি শঙ্করাচার্যের রচিত এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। নিশ্চিত প্রমাণের ভিত্তিতে পণ্ডিতরা সকলেই এ বিষয়ে একমত। কিন্তু আপনার উল্লেখিত ভবাণ্যষ্টক, গঙ্গাষ্টক, গণেশাষ্টক, শিবস্তুতি, দুর্গাপরাধভঞ্জনস্তোত্র প্রভৃতি প্রায় ৭৫ খানি স্তবস্তুতি গ্রন্থ সহ শঙ্করের নামাঙ্কিত আরও কয়েকটি ভাষ্য ও উপদেশগ্রন্থ সম্বন্ধে আমার মনে ঘোরতর সংশয় অছে। নিম্নলিখিত প্রমাণ ও বিশ্লেষণের ভিত্তিতে নির্দ্বিধায় বলা যায় যে শঙ্করের নামে প্রচলিত অনেক পুস্তকই প্রকৃত পক্ষে অন্য লোকের দ্বারা রচিত হয়ে তাঁর নামে আরোপিত হয়ে আসছে ঃ —

(ক) উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই 'জ্ঞানগঙ্গাশতক' এবং 'বোধসারঃ' নামক দুইখানি গ্রন্থের কথাই ধরা যাক। ১২৯২ সালে জনৈক অন্নদাপ্রসাদ বসু ঐ দুখানি পুস্তক কলিকাতা হতে প্রকাশ করেন। রচনার লালিত্য, রস এবং উপাদেয়তা লক্ষ্য করে তিনি ভুলক্রমে এইগুলিকে স্বয়ং শঙ্করাচার্যের লেখা বলে প্রচার করেন। কিন্তু পরে পণ্ডিতরা আবিষ্কার করেন যে বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যকার এবং দার্শনিক বিদ্বদ্বর্য নরহরি নামক জনৈক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ঐ বই দুখানির লেখক। প্রকৃত তথ্য হল, অন্নদাপ্রসাদ বসু নরহরি রচিত 'বোধসারঃ' হতে ২৫০টি শ্লোক সঙ্কলন করেছিলেন মাত্র। নরহরি বাংলা ১২২০ সালে 'বোধসারঃ' রচনা করেন এবং তাঁর প্রিয় শিষ্য দিবাকর ১২২৩ সালে (১৭৩৮ শকাব্দে) তার টীকা রচনা করেন। তাঁরা কেউ শঙ্করাচার্যের নাম উল্লেখ করেন নি। জ্ঞানগঙ্গাশতক এবং বোধসারঃ এর গ্রন্থকার যে শঙ্করাচার্য নন তার একটি বড় প্রমাণ ঐ বই দুটিতে শঙ্কর প্রবর্তিত সন্ন্যাস ধর্মের বিধি ও চিহ্নাদি ধারণের নিন্দা আছে। তাছাড় গ্রন্থমধ্যে ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত মধুসূদন সরস্বতীর বহু উদ্ধৃতিই প্রমাণ করে যে বইটি শঙ্করাচার্যের রচনা নয়।

(খ) কাল্যপরাধভঞ্জন স্তোত্রটিও শঙ্করের রচিত নয়। কারণ, স্তোত্রটি গুপ্তার্ণব তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। যিনি তন্ত্রমত খণ্ডন করে তার উচ্ছেদ সাধন ঘটিয়েছিলেন এবং যার জন্য বহু স্থানে তাঁর তান্ত্রিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ ঘটেছিল, এমন কি একসময় একজন কাপালিকের হাতে তাঁর প্রাণ যাওয়ারও উপক্রম ঘটেছিল, সেই শঙ্কর কোন তান্ত্রিক ভাবধারামণ্ডিত স্তোত্র রচনা করবেন বলে মনে হয় না।

(গ) আচার্যের নামে প্রচারিত দুর্গাপরাধভঞ্জন স্তোত্রটি সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। একথা সবাই জানেন, পণ্ডিতমহলেও একথা স্বীকৃত সত্য যে আচার্য শঙ্কর ৭৮৮ খৃঃ — ৮২০ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৩২ বৎসর বয়স পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। এমতাবস্থায় স্তোত্রটিকে শঙ্কর রচিত বলে স্বীকার করলে তিনি ৮৫ বৎসর পর্যন্ত জীবিত ছিলেন বলে মানতে হবে। কারণ ঐ স্তোত্রের মধ্যে রচয়িতা স্বীকারোক্তি করেছেন — 'মা দুর্গে! অন্য দেবতা পরিত্যাগ করে পঁচাশি বৎসর বা তদধিক কাল পর্যন্ত তোমারই সেবা করে এলাম। এখন তুমি যদি আমায় কৃপা না কর, তাহলে আমি আর কার শরণ নিব?

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
অপীদানীং মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণম॥

(ঘ) আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন আমাদের এই বাংলাদেশেও একজন শঙ্করাচার্য ছিলেন। লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরীতে রক্ষিত 'তারারহস্যবৃত্তিকা' নামে একখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। নেপাল দরবার লাইব্রেরীতেও ঐ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি রয়েছে। ঐ প্রতিলিপির তারিখ লক্ষ্মণসংবৎ ৫১১ (১৬৩০ খৃঃ)। গ্রন্থের পুষ্পিকায় লেখক আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে, তিনি বাঙালী এবং কৌল। তাঁর পিতার নাম কমলাকর, পিতামহের নাম লম্বোদর (Descriptive Catalougue of Sanskrit Mss in India Office Libary 4/2603)। এই গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য রচিত 'মৃত্যুঞ্জয় পূজা', 'প্রপঞ্চসার' এবং 'সৌন্দর্যলহরী' প্রভৃতি গ্রন্থ বৈদান্তিক চূড়ামণি জ্ঞান-গুরু শঙ্করের নামে অবলীলাক্রমে প্রচলিত হয়ে আসছে।

(ঙ) প্রকৃতপক্ষে শঙ্করের রচিত নয় অথচ তাঁর নামে প্রচলিত হয়ে আসছে এমন গ্রন্থগুলিকে তাঁর মূল রচনার সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বিচার করলেই যে কোন নিরপেক্ষ পাঠকের চোখে উভয় শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে ভাষাগত ও ভাবগত অসামঞ্জস্য ধরা পড়ে। যেমন — শ্বেতাশ্বতর ও নৃসিংহতাপনীয় উপনিষদের তথাকথিত শঙ্করভাষ্য। ঐ দুটি ভাষ্যের লেখক পৌরাণিক প্রসঙ্গ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু আদি শঙ্করাচার্যের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, তিনি তাঁর লেখার মধ্যে উপনিষৎ প্রমাণকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। এ ছাড়া ঐ দুখানি ভাষ্যে ব্যাকরণ অশুদ্ধিও রয়েছে। এতেই বুঝা যায় যে, ঐ দুটি ভাষ্যের ব্যাখ্যাতা আর যিনিই হোন, তিনি কদাপি আদি শঙ্করাচার্য নন।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ ভাষ্যের একস্থানে গৌড়পাদের একটি কারিকার (৩/৫৫) উল্লেখ এইভাবে করা হয়েছে — 'তথা চ শুকশিষ্যো গৌড়পাদাচার্যঃ' অর্থাৎ শুকের শিষ্য কোন এক গৌড়পাদাচার্য ইত্যাদি। শঙ্করাচার্যের মত মহাজ্ঞানী শিষ্যের আচার-বিরুদ্ধ এইরকম লঘু ভাষায় লঘু চালে নিজ পরমগুরুর নাম স্মরণ করবেন — একথা বিশ্বাস করা কঠিন।

(চ) কেনোপনিষদের পদভাষ্য এবং বাক্যভাষ্যও শঙ্করের নামে প্রচলিত। কিন্তু যে কোন অনুসন্ধানী পাঠক

একটু খুঁটিয়ে বিচার করলেই দেখতে পাবেন এই উভয় ভাষ্যের কোন কোন অংশে মূলের ব্যাখ্যা পরস্পর ভিন্ন এবং বিপরীত। মূল ২/১/২ এর পাঠ পদভাষ্য মতে 'নাহম্' কিন্তু বাক্যভাষ্য মতে 'নাই'। লেখক একজন হলে বিশেষতঃ শঙ্করের মত মহাপণ্ডিত এর রচয়িতা হলে এই ধরণের ভাবগত ও ভাষাগত ভুল কখনও সম্ভব নয়।

(ছ) সম্প্রতি বর্তমান ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শী মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ প্রণীত 'ভারতীয় সাধনার ধারা' নামে একখানি অমূল্য গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই বই-এ তিনি দেখিয়েছেন যে, মাণ্ডুক্য উপনিষদের ভাষ্যও আদি শঙ্করের নয়। এর দুটি মঙ্গল শ্লোক অত্যন্ত নিকৃষ্ট ভাষায় রচিত। দ্বিতীয় শ্লোকে ত পরিষ্কার ছন্দোভঙ্গের দোষ। শ্লোকের প্রথম তিন পঙ্‌ক্তি মন্দাক্রান্তা এবং চতুর্থ পঙ্‌ক্তি স্রগ্‌ধরা ছন্দে লিখিত। অন্তিম তিন শ্লোকে ব্যাকরণগত অশুদ্ধিও বর্তমান। এই সব মারাত্মক ত্রুটি কি শঙ্করাচার্যের লেখায় সম্ভবপর?

সম্ভব যে নয় তা বিচারশীল লোকমাত্রই স্বীকার করতে বাধ্য। তবুও যে নানা অবৈদিক মতবাদে কণ্টকিত (কোন কোন ক্ষেত্রে শঙ্করের জীবন-দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারায় পরিপূর্ণ) গ্রন্থও অবলীলাক্রমে তাঁর নামে কিভাবে চলে আসছে, তার কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে আমাদের দেশের দু' একটি বিশিষ্ট প্রাচীন রীতি এবং বিচিত্র মানসিকতাকেই দায়ী করতে হয়। সাম্প্রদায়িক স্বার্থ এবং অতিভক্তির জলাভূমিতেই এই রীতি ও মানসিকতার জন্ম। স্বরচিত গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধির জন্য অনেকেই আমাদের দেশে নিজ নাম গোপন করে প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ মহাত্মা ও মনীষীর নামে গ্রন্থরচনা করে গেছেন — অনেকে আবার নিজ মতবাদকে জনপ্রিয় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রসিদ্ধ আকরগ্রন্থের মধ্যে স্বরচিত অনেক শ্লোকও সুকৌশলে প্রক্ষেপ (Interpolation) করেছেন; পরবর্তীকালে অনেক গবেষক পণ্ডিতের চোখে এ রহস্য ধরাও পড়েছে। হাজার হাজার বছর ধরে অভিসন্ধিপরায়ণ লোকেরা বিশেষতঃ নানা মঠ মিশনের মোহান্ত মহারাজের দল এইরকম অপকার্য করে এসেছেন। এখানে কিছু ঘটনার উল্লেখ করছি। যেমন — রামের দুর্গাপূজা প্রসঙ্গ। রাম দুর্গাপূজা করেন নি, মূল বাল্মীকি রামায়ণে দুর্গাপূজার উল্লেখ নাই। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম দুর্গাপূজার অনুষ্ঠান করেন। তাঁর সভাপণ্ডিত ও পুরোহিত পণ্ডিত রমেশ চন্দ্র শাস্ত্রীই দুর্গাপূজার পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি রচনা করে রাজাকে দিয়ে পূজা করান। ডক্টর দীনেশ চন্দ্র সেনের লেখা 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' নামক বই-এ এই প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে এবং রাজা কংসনারায়ণের সাক্ষাৎ বংশধর, কাশীস্থ ভারতীয় ধর্ম মহামণ্ডলের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক রাজা শশিশেখরেশ্বর রায়ও প্রাচীন দলিল ও কাগজপত্র দৃষ্টে এই তথ্য সমর্থন করেছেন। কিন্তু রাজার সভাকবি কৃত্তিবাস তাঁর বাংলা রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের নামে এই মহাপূজা আরোপ করার পর থেকে সারাদেশে দুর্গাপূজা প্রচলিত হয়ে গেল। এখন আবালবৃদ্ধবনিতা বিশ্বাস করেন যে রাম দুর্গাপূজা করেছিলেন এবং মহামুনি বাল্মীকিই যেন ঐ পূজাপদ্ধতির প্রবর্তক।

বুদ্ধদেবের কথা ভেবে দেখুন — যে বুদ্ধদেবের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের মূল মন্ত্রই ছিল ক্ষমা, প্রেম, মুদিতা, করুণা ও অহিংসা, যে বুদ্ধদেব ঈশ্বর সম্বন্ধে সারাজীবন নীরব থেকেছেন, মূর্তিপূজা ও বহিরাচারকে যিনি অসার ও নিরর্থক বলেছেন, তন্‌হা অর্থাৎ তৃষ্ণা দূর করে নির্বাণলাভই ছিল যাঁর ধর্মে পরম পুরুষার্থ, সেই অমিতাভ বুদ্ধের মৃত্যুর পর কি দেখা গেল? দেখা গেল, তথাগতের ধর্ম কতকগুলো ভ্রষ্টাচারী ভিক্ষু ভিক্ষুণীর স্বকপোলকল্পিত তান্ত্রিক পূজাপাঠ এবং গুহ্য ক্রিয়াকৌশলে পরিণত হয়ে গেল! একদিকে যেমন তা মহাযান, হীনযান, বজ্রযান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হল, অন্যদিকে তেমনি তা দণ্ডেশ্বরী, বজ্রেশ্বরী, চক্রেশ্বরী প্রভৃতি বহুতর দেবদেবীর অনুষ্ঠানসর্বস্ব পূজাপদ্ধতিতে হল পর্যবসিত। যেহেতু বৌদ্ধধর্মের কোন কোন সম্প্রদায়ে ঐ সব অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে, এজন্য কি কেউ বলবেন যে বুদ্ধদেব ঐ সব মূর্তিপূজা এবং তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ করতেন?

আমি বলতে চাই যে রাম ও বুদ্ধদেবের মত নির্বিশেষে ব্রহ্মবাদী শঙ্করাচার্যের নামে নানা দেবদেবীর আরাধনা এবং তদনুকূল স্তোত্রমন্ত্রাদি প্রচলনের মূলেও ঐ একই মনোবৃত্তি বর্তমান। প্রক্ষেপের ভূত ভারতের ধর্মজগতে অনেক অঘটন ঘটিয়েছে, অনেক অনাচারেরই জন্ম দিয়েছে। এই ভৌতিক উপদ্রব থেকে ব্যাসদেব এমন কি স্বয়ং ভূতনাথও রক্ষা পাননি। বোম্বাই এর ক্ষেমরাজ কোম্পানী দেবনাগরী অক্ষরে একখানি পুরাণ

প্রকাশ করেছেন। নাম — ভবিষ্যপুরাণ। অন্যান্য পুরাণ-গ্রন্থের মত এটিও ব্যাসদেবের রচিত বলে অপপ্রচার করা হয়েছে। বইটিতে আছে — 'মহাদেবেন লোকার্থে ভবিষ্যং রচিতং শুভম্' — লোকহিতের জন্য মহাদেবই যেন বইখানির প্রণেতা। লক্ষ্য করুন, এখানে লেখক এক ঢিলে দুই পাখী মারার আশ্চর্য মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। শিব ও ব্যাসদেব দুজনকেই জড়িয়েছেন। দুইজনের পুণ্য নামকে যথেচ্ছভাবে অপব্যবহার করেছেন। ভাবখানা এই বইটি originally মহাদেবের দ্বারা লিখিত হলেও এই অধরম ধরাধামে ব্যাসদেবই তার প্রকাশক। শিবের উক্তিতে কলিকাতারও উল্লেখ করা হয়েছে — 'কলিকাতা-পুরী রম্যা প্রসিদ্ধাভুৎ মহীতলে' (৪র্থ খণ্ড)। শান্তিপুরেরও নাম বাদ যায়নি — 'গঙ্গামূলে শান্তিপুরং রচিতং তেন ধীমতা'। 'তেন' অর্থাৎ রাজা শান্তিবর্মা গঙ্গাতীরে শান্তিপুর নগর নির্মাণ করলেন আর তাঁর পুত্র নদীবর্মা গৌড়দেশে গড়ে তুললেন 'নদীহা' অর্থাৎ নদীয়া — 'চকার নগরীং রম্যাং নদীহাং গৌড়রাষ্ট্রভাক্' (শ্লোক ২৫) শিব একে ত্রিনয়ন তায় ত্রিকালদর্শী। কাজেই মতলবী গ্রন্থকার তাঁর মুখ দিয়ে রামানন্দ, শ্রীধরস্বামী ও তাঁর গীতার টীকা, জয়দেব-পদ্মাবতী এবং গীতগোবিন্দ, চৈতন্য-শঙ্কর-রামানুজ, কবীর-নানক-নিত্যানন্দ, বিল্বমঙ্গল, তুলসীদাস — সকলের কথাই বলিয়েছেন। স্থান-কাল-পাত্র, সমীচীনতা-অসমীচীনতা কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই।

ভবিষ্যপুরাণের শিব শুধু অসাধারণ ভবিষ্যৎ-দৃষ্টিরই অধিকারী নন, হিন্দু অহিন্দু সকলের প্রতিই তাঁর সমান করুণা। শুধু হিন্দুর কথাই তিনি বলেন, মুসলমান বা ইংরেজদের কথা বলবেন না, এমন ত আর হয় না। তাই তিনি পৃথ্বীরাজের প্রতিমূর্ত্তির গলায় সংযুক্তার মাল্যদান এবং জয়চন্দ্র পৃথ্বীরাজের যুদ্ধপর্ব বর্ণনার পরেই কুতুবুদ্দিন সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন — 'পৈশাচঃ কুতুবুদ্দিনঃ'। ইংরাজদের বেলায় শিবকে একটু গদগদ দেখা যায়। তাঁর মতে ইংরাজরা বড় ভাল লোক। তারা ঈশ্বরের পুত্র যীশুর মতাবলম্বী, বাণিজ্যের জন্যই তারা এদেশে এসেছে — 'ঈশ-পুত্র-মতে সংস্থা তেষাং হৃদয়মুত্তমম'। তাদের কে রাজা এবং সে রাজার সিংহাসন কোথায় সে সব কথাও পঞ্চানন পঞ্চমুখে ব্যক্ত করেছেন —

'বিকটে পশ্চিমে দ্বীপে তৎপত্নী বিকটাবতী'

বিকট অর্থাৎ অতি দুর্গম পশ্চিম দ্বীপে রাজার পত্নী বিকটাবর্তী অর্থাৎ রাণী ভিক্টোরিয়া। তিনি বর্তমানে আটজন কৌঁসলী অর্থাৎ কাউন্সিলারের সাহায্যে রাজ্যশাসন করছেন।

'অষ্ট কৌশলমার্গেণ রাজ্যমত্র চকার হ'।

একেই বলে কলি-কৌতুক।

সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হলেই তা যেমন শাস্ত্র হয় না, তেমনি 'শিব উবাচ', 'ব্যাস-উবাচ' বলে নিজেদের সংস্কার বিশ্বাস এবং মতবাদ প্রচারের প্রয়াসও কখনও মান্য ও প্রামাণ্য বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। শঙ্করাচার্যের গদীতে বসে কেউ ফরমান জারী করলেও না।

ভবিষ্যপুরাণের শিব ও ব্যাসের উক্তিতে যেমন কৌতুক সৃষ্টি করা হয়েছে, তেমনি কৌতুক সৃষ্টি করা হয়েছে সাক্ষাৎ বেদান্ত মূর্ত্তি আচার্য শঙ্করকে নিয়ে। ভবিষ্যপুরাণের শুদ্ধ ও সরল সংস্কৃত ভাষার কোন ব্যাকরণ গত দোষ নাই। তাই তা যেমন শিব ও ব্যাসের রচনা বলে চালাতে কোন অসুবিধা নাই, তেমনি লালিত্যমণ্ডিত ছন্দোবদ্ধ সংস্কৃতে নানা শ্লোক ও স্তোত্রমন্ত্রাদি রচনা করে শঙ্করের নামে প্রচার করলে সাধারণ মানুষের পক্ষে তাও সহজে ধরার উপায় নাই। সূক্ষ্ম মনন ও বিচারের আলো ফেলে শঙ্করের নামাঙ্কিত কোন্ কোন্ গ্রন্থে তাঁর জীবন-দর্শনের সম্পূর্ণ বিপরীত তত্ত্ব সুকৌশলে পরিবেশন করে সম্প্রদায়ীরা তাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধি চরিতার্থ করেছে, কয়জনই বা তা খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে বলুন? তাই অগণিত মানুষ আজও সহজিয়া ভক্তিবশে আচার্যের নামাঙ্কিত প্রতিটি রচনাকেই তাঁরই মূল রচনা বলে মনে করেন। যিনি ছিলেন জ্ঞানগঙ্গার নব ভগীরথ, অদ্বৈতবাদের মহান্ উদ্গাতা, যাঁর অভেদ দৃষ্টিতে সর্বত্র সর্ব বস্তুতে অদ্বয় ব্রহ্মের প্রকাশ ছাড়া আর কিছু ভাসত না, তাঁর পক্ষে 'দেবী! সুরেশ্বরী ভগবতে গঙ্গে' বলে ভৌম গঙ্গার স্তবস্তুতি এবং বাহ্যিক পূজারাধনামূলক মন্ত্রাদি রচনা সম্ভব কিনা তা একবারও কেউ বিচার করে দেখে না। যিনি স্বরচিত 'আত্মপূজা' বা 'পরাপূজা'তে ব্রহ্মযজ্ঞের ভাব এবং 'নির্গুণমানসপূজা'তে বাহ্যিক পূজাঙ্গ ষোড়শোপচারাদির নিগূঢ় তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে কিভাবে দিব্যভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে নির্গুণের ধ্যান করতে হয়, তা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বিশদভাবে বুঝিয়ে গেলেন, তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মঠের মঠাচার্যরা তবু কেন যে পূর্ণাগিরি, শারদাদেবী, প্রভৃতির জড়োপসানার ঠাঁট

সাড়ম্বরে বজায় রেখেছেন, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। ঐ সমস্ত মূর্ত্তির পূজা যে তাঁর অন্তর্ধানের পর শিষ্য প্রশিষ্যদের দ্বারাই প্রচলিত হয় নি, তার কি কোন নিশ্চিত প্রমাণ আছে?

সত্য বটে, আচার্য তাঁর 'মঠাম্নায়ঃ' নামক অনুশাসন-গ্রন্থে সিদ্ধেশ্বর, নারায়ণ, জগন্নাথ, ভদ্রকালী, বিমলা ও পূর্ণাগিরি প্রভৃতি দেবদেবীর নামোল্লেখ করেছেন। কিন্তু তা কি অর্থে? তাঁর ঐ সনদ বা অনুশাসনে পূজা করার কোন নির্দেশ নাই, প্রধান চারটি মঠের পরিচয় দিতে আচার্য ঐ সব দেব-দেবীর কথা প্রসঙ্গক্রমে বলেছেন মাত্র। যেমন শারদা মঠের পরিচিতিতে বসেছেন —

দ্বারকাখ্য হি ক্ষেত্রং স্যাৎ দেবঃ সিদ্ধেশ্বরঃ স্মৃতঃ।
ভদ্রকালী তু দেবী স্যাদাচার্যো বিশ্বরূপকঃ।

মঠটি কোথায়? না — দ্বারকাক্ষেত্রে, যেখানে সিদ্ধেশ্বর ও ভদ্রকালী রয়েছেন, সেখানকার প্রথম আচার্য হবেন বিশ্বরূপ অর্থাৎ সুরেশ্বর।

গোবর্দ্ধন মঠ সম্বন্ধে আচার্যের বিজ্ঞপ্তি —

পুরুষোত্তমং তু ক্ষেত্রং স্যাজ্ জগন্নাথোঽস্য দেবতা।
বিমলাখ্যা হি দেবী স্যাদাচার্য্যঃ পদ্মপাদকঃ।

অর্থাৎ গোবর্দ্ধন মঠটি পুরুষোত্তমক্ষেত্র অর্থাৎ পুরীতে অবস্থিত — যেখানে জগন্নাথ ও বিমলা দেবী আছেন, সেখানকার প্রথম আচার্য হবেন পদ্মপাদ। এখানে 'অস্য দেবতা' বলতে মঠের আরাধ্য দেবতা নন, অস্য ক্ষেত্রস্য দেবতা। পুরীক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ দেবতা জগন্নাথ, জগন্নাথের নামেই পুরীর নাম পুরুষোত্তম বা জগন্নাথক্ষেত্র। গোবর্দ্ধন মঠের অভ্যন্তরে জগন্নাথের কোন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত নাই, আচার্যও তাঁর পূজার কথা বলছেন না।

জ্যোতির্মঠ সম্বন্ধে বলেছেন —

বদরিকাশ্রমঃ ক্ষেত্রং দেবো নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
পূর্ণাগিরি চ দেবী স্যাদাচার্যস্তোটকঃ স্মৃতঃ॥

এই মঠটি বদরিকাশ্রমে অবস্থিত — যেখানে ক্ষেত্রদেবতা নারায়ণ এবং পূর্ণাগিরির মন্দির আছে — সেখানে প্রথম আচার্য হবেন তোটকাচার্য।

সর্বশেষে আচার্য শৃঙ্গেরী মঠের অবস্থান নির্দেশ করেছেন এইভাবে —

রামেশ্বরাহ্বয়ং ক্ষেত্রমাদিবরাহ দেবতা।
কামাক্ষী তস্য দেবী স্যাৎ সর্বকামফলপ্রদা।
পৃথ্বীধরাখ্য আচার্যস্তুঙ্গভদ্রেতি তীর্থকম্॥

শৃঙ্গেরী মঠটি কোথায়? না — রামেশ্বরক্ষেত্রে, তুঙ্গভদ্রা নদীতীরে — এই তীর্থের দেবতা হলেন আদিবরাহ এবং দেবী কামাক্ষী। পৃথ্বীধর এখানকার প্রথম আচার্য হবেন।

আপনি যদি কাউকে আপনার বাসস্থান কলিকাতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন যে, এই শহর গঙ্গাতীরে অবস্থিত, হিন্দুরা গঙ্গাকে তীর্থ বলে মনে করেন, এখানে কালীঘাটের কালী প্রধান দেবতা, এখানে নকুলেশ্বর শিবের মন্দির এবং ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল রয়েছে, তাহলে তাতে যেমন আপনি ঐ ভদ্রলোককে কালী নকুলেশ্বর প্রভৃতিকে পূজা করতে বলছেন একথা মনে করা চলবে না, তেমনি মঠাম্নায়ে দেবদেবীর উল্লেখ আছে বলেই আচার্য তাঁদের পূজার বিধান দিয়েছেন এ কথা ভাবাও যুক্তিসঙ্গত নয়। আচার্যের আবির্ভাবের পূর্ব হতেই তাঁর মঠগুলির সন্নিহিত স্থানে ঐ সকল দেবদেবীর মন্দির বর্তমান ছিল, তিনি সেগুলির উল্লেখ করে নিজের মঠের অবস্থান (Location) বর্ণনা করেছেন।

তবুও যদি বলেন তবে কেন মঠাচার্য 'জগদ্গুরুর' দল ঐ সব মূর্ত্তিপূজা করেন, তার একমাত্র উত্তর — তাঁদের সংস্কার বদ্ধতা এবং প্রচলিত সামাজিক বিধিবিধান পালন করে জনতার তুষ্টি বিধানের মনোবৃত্তিই এর জন্য প্রধানতঃ দায়ী। এইভাবে তাঁরা অদ্বৈতবেদান্ত এবং বহিরাচারকে জোড়াতালি দিয়ে আপোষরফা করেছেন এবং প্রতিষ্ঠা বজায় রেখেছেন। আমার যুক্তির অনুকূলে আরও কিছু প্রমাণ দিচ্ছি। 'ন তস্য প্রতিমা অস্তি যস্য নাম মহদ্‌যশঃ'— যজুর্বেদের (৩২/৩) এই বিখ্যাত মন্ত্রের অর্থ আচার্য অবগত ছিলেন একথা আশা করি,

সকলেই স্বীকার করবেন। 'ন প্রতীকে ন হিঃ সঃ'— ব্রহ্মসূত্রের (৪/১/৪) মন্ত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, জড়মূর্ত্তি কোনমতেই নির্বিশেষ ব্রহ্মের প্রতীক হতে পারে না। 'মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করবে — এটি আধ্যাত্মিক প্রতীক। আকাশ ব্রহ্ম — এটি আধিদৈবিক প্রতীক ইত্যাদি' (শারীরিক ভাষ্যের অনুবাদ)। শুধু তাই নয়, গীতার ১৮অ/৫০ শ্লোকে ঈশ্বরপ্রাপ্তির পদ্ধতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বলেছেন — 'সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে' — সেখানে সেই শ্লোকের ভাষ্য করতে গিয়ে জ্ঞান-ভাস্করের বক্তব্য কত স্পষ্ট শুনুন। যাঁরা নিরাকার পরমাত্মার বুদ্ধিতে ধারণার জন্য মূর্ত্তির দরকার বলে থাকেন, তাঁদের সেই অসার যুক্তি খণ্ডন করতে গিয়ে আচার্য কতকটা যেন উষ্ণ কণ্ঠেই বলছেন — 'কেচিত্তু পণ্ডিতম্মন্যা নিরাকারত্মাদাত্মবস্তু নোপৈতি বুদ্ধিরতো দুঃসাধ্যা সম্যগ্ জ্ঞাননিষ্ঠেতাহুঃ। সত্যমেবং গুরুসম্প্রদায়রহিতানাং অশ্রুতবেদান্তানাং অত্যন্তবহির্বিষয়াসক্তবুদ্ধীনাম্ সম্যক্ প্রমাণেষকৃতশ্রমানাং — অর্থাৎ কোন কোন পণ্ডিতম্মন্য বলে থাকে যে পরমাত্মা নিরাকার বলে তাঁকে মনুষ্যবুদ্ধি ধারণা করতে পারে না, কাজেই দুঃসাধ্য। সত্য বটে, যারা সদ্গুরুর কোনদিন সেবা করেনি, বেদান্ত শ্রবণ মননের সৌভাগ্য যাদের হয়নি, ন্যায়াদি প্রমাণ বিষয়ে কিছুমাত্র পরিশ্রম করে নি, সেই সব অত্যন্ত বহির্মুখ বিষয়াসক্তরাই তো ঐ রকম বলবে।"

সাকার উপাসনা সম্বন্ধে যাঁর মন্তব্য এতই কঠোর, তিনি তাঁর মঠে পূর্ণাগিরি, শারদা ইত্যাদি পূজার নির্দেশ দিয়ে যাবেন এ কথা বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। যিনি প্রকৃত আচার্য তিনি নিজে যা বলেন, কার্যতঃ তাই আচরণ করেন। শঙ্কর ছিলেন আচার্যনাং আচার্যঃ — তাঁর practice এবং preaching এর মধ্যে বিরোধিতা (Self-contradiction) ত আমি ভাবতেই পারি না।

বস্তুগতি যখন এই প্রকার, কীর্তিমান্ শঙ্করপন্থীদের হাতেই যখন শঙ্করের ভাবধারা এইভাবে বিপর্যস্তঃ এবং বিকৃত, তখন কোন গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে তাঁরই লেখা, তা নির্ণয় করা দুরূহ সন্দেহ নাই। তবুও আমার মতে এর একটি সহজ উপায় অছে। সবাই জানেন গ্রন্থ হল লেখকের মানস-দর্পণ। গ্রন্থের ভাবধারা দিয়েই চেনা যায় লেখককে এবং তাঁর লেখাকে।

আদি শঙ্করাচার্যের ভাবধারাও তাঁর কৃত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বিধৃত রয়েছে; বিধৃত রয়েছে তাঁর গীতা এবং উপনিষদগুলির ভাষ্যের মধ্যে, ভাষ্যধৃত তত্ত্বের নিগূঢ় তাৎপর্য বিদ্যারণ্যকৃত পঞ্চদশী, বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকা, মধুসূদন সরস্বতীর অদ্বৈতসিদ্ধিঃ নামক গ্রন্থ এবং আরও অনেক বার্ত্তিক ও টীকা টীপ্পনীর মধ্যে অত্যন্ত যুক্তিসিদ্ধ ভাবায় আম্নাত রয়েছে। সেইগুলি দেখলেই এই অদ্বৈতবাদী পরমযোগীর জীবন-দর্শনের সম্যক্ পরিচয় পেতে কারও অসুবিধা হয় না। এখন যদি এইসব চিন্তাধারার বিপরীত কোন তত্ত্ব কোন গ্রন্থে দেখা যায়, তাহলে অবিলম্বে আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসা উচিত যে ঐ সব তথাকথিত গ্রন্থ শঙ্করের নামে প্রচারিত ও প্রচলিত হলেও তা নিশ্চয়ই শঙ্করের নয়।

এই ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষের মহত্তম স্থিতি এবং সর্বোত্তম গতির কথা একবারটি চিন্তা করে দেখুন। যিনি বলতে পেরেছিলেন —

> অহং নির্বিকল্পো নিরাকাররূপো বির্ভুব্যাপী সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্।
> ন বা বন্ধনং বৈ মুক্তির্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোহহম্ শিবোহহম্।। ৬ (নির্বাণষটকম্)

'আমি বিকল্পশূণ্য, সর্বত্রব্যাপ্তিহেতু, আমি নিরাকার, সকল সময়ে সকল ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে সম্বন্ধরহিত হওয়ায় আমি ইন্দ্রিয়াতীত, আমার যুক্তি বা বন্ধনের বালাই নাই, আমি সচ্চিদানন্দ শিব অর্থাৎ স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ,'— যিনি অনুভব করেছিলেন —

> যদর্কেন্দুবিদ্যুৎপ্রভাজালমালা বিলাসাম্পদং যৎ স্বভেদাদিশূন্যম্।
> সমস্তং জগদ্ যস্য পাদাত্মকং স্যাদ্ যতঃ শক্তিভানং তদেবাহস্মি।। ১০ (নির্বাণমঞ্জরী)

'যিনি সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎপ্রভাসমুহের বিলাসের আশ্রয়, যিনি স্বগতাদিভেদশূণ্য, সমস্ত জগৎ যাঁর এক চতুর্থাংশস্বরূপ, যা হতে সমস্ত শক্তির উদ্ভব ও প্রকাশ ঘটে, আমি সেই ব্রহ্মস্বরূপ।' যিনি পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করে গেছেন — 'নির্বিকার, নির্বিশেষ, নির্গুণ, চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা কখনও দ্বৈতভাবে উপাস্য নন, কেবল অহং ইত্যাকার জ্ঞানেই উপলভ্য,' তাঁর পক্ষে কখনও কি 'ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ প্রকটিতবদনে কামরূপে করালে'

ইত্যাদি বলে সগুণ দেবতার পূজাপাঠ বা স্তবস্তুতি রচনা সম্ভব?

যিনি 'নির্গুণমানসপূজাতে' প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন —

অখণ্ডে সচ্চিদানন্দে নির্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতিহদ্বিতীয়ভাবেহস্মিন্ কথং পূজা বিধয়ীতে॥

তিনিই আবার —

'স্নাত্বা প্রত্যুষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং,
পূজার্থং বা কদাচিদ্‌বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বদলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকশিতা গন্ধধূপৌ ত্বদর্থং
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো!' (শিবপারধভঞ্জন স্তোত্র)

ইত্যাদি বাহ্যপূজামূলক স্তোত্রাদি রচনা করেন কি করে? অত্যন্ত সহজ বুদ্ধিতেই ধরা পড়ে, প্রথমটি শঙ্কর-রচিত হলে দ্বিতীয়টি নিশ্চয়ই তিনি লেখেন নি। 'নির্গুণমানসপূজা' যে আদি শঙ্করাচার্যের লেখা, সে কথা সকল পণ্ডিতরাই স্বীকার করেন। কাজেই 'শিবপরাধভঞ্জন' স্তোত্রটি শঙ্কর-রচিত নয়, একথা বলাই বাহুল্য মাত্র। নিজের ইষ্টের প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই কোন শিবভক্ত শঙ্করাচার্যের নাম অপব্যবহার করেছেন।

দীর্ঘকাল ধরেই এই অপকার্য চলে আসছে। আমি পূর্বেই বলেছি সম্প্রদায়ীদের নিজ মতবাদ প্রতিষ্ঠার দুরভিসন্ধি ছাড়াও এর মূলে আরও একটি কারণ রয়েছে, তার নাম দিয়েছি — অতিভক্তির জলাভূমি। ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির গবেষক মাত্রেই জানেন যে প্রাচীনকালে গুরুগতপ্রাণ শিষ্যরা গ্রন্থ রচনা করে স্বীয় গুরুদেবের নামে উৎসর্গ করতেন গুরুর নামেই তা প্রকাশ করতেন। এই পদ্ধতি গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা সন্দেহ নাই কিন্তু ব্রহ্মবিদ্ গুরু নিজে ভূমার ভূমিতে উঠে আপন উপলব্ধ সত্য যেমন ভাবে প্রকাশ করতে পারেন তেমনিভাবেই তাঁর কোন শিষ্যের পক্ষে তা কখনও নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। প্রশিষ্যরা প্রকাশ করলে ত আর কথাই নাই। আদিগুরুর ভাবধারার সঙ্গে তাঁদের ভাবধারার উপলব্ধিগত তারতম্য ঘটতে বাধ্য। উদাহরণস্বরূপ, নানক ও কবীরের কথা চিন্তা করে দেখুন। বিখ্যাত 'গ্রন্থসাহেবের' সকল চৌপাই বা দোঁহা নানকের স্বরচিত নয়। তাঁর তিরোধানের পর গুরু অঙ্গদ হতে আরম্ভ করে গুরু অর্জুনদেব, হরকিষণজী, গুরু গোবিন্দ সিং প্রভৃতি অপর ৯ জন গুরুর বহু উপদেশও 'নানক কহে' এই বয়ানে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কবীরের নামে যে অজস্র দোঁহা প্রকাশিত হয়েছে, তার প্রত্যেকটি কবীরের রচিত নয়। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্য রচিত দোঁহাও 'কহত কবীরা শুন ভাই সাধু'! বলে কবীরের নামে প্রচলিত হয়ে আসছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই ঐ সব দোঁহাতে যে স্থানে স্থানে ভাববিভ্রাট এবং তত্ত্বগত বিভ্রাট ঘটেছে তা যেকোন বিচারশীল পাঠকের চোখে ধরা পড়বে।

জ্ঞানগুরু শঙ্করের ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে আদি শঙ্করাচার্য ছাড়াও আরও অনেক 'শঙ্করের' সন্ধান পাওয়া গেছে। আমি পূর্বেই এক গৌড়ীয় শঙ্করাচার্যের কথা বলেছি। আচার্য প্রতিষ্ঠিত প্রধান চারটি মঠের মোহান্ত মাত্রেই শঙ্করাচার্য নামে অভিহিত হয়ে আসছেন অর্থাৎ তাঁরা প্রত্যেকেই 'শঙ্কর'। শৃঙ্গেরী মঠের গুরু পরম্পারাতেও বিদ্যাশঙ্কর ও ভারতীশঙ্কর নামে দুজন প্রসিদ্ধ 'শঙ্কর' ছিলেন। ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের 'ত্রিপুরাতন্ত্র' নামে একখানি গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থমতে শঙ্করাচার্যে ১৪ জন শিষ্য ছিলেন, তার মধ্যে ৫ জন সন্ন্যাসী এবং ৯জন গৃহী। ঐ ৫ জন সন্ন্যাসী শিষ্যের মধ্যে একজনের মূল নামই ছিল 'শঙ্কর'। এ ছাড়া কাঞ্চী-কামকোটি পীঠের গুরুপরম্পরাতে কৃপাশঙ্কর, উজ্জ্বলশঙ্কর, মূকশঙ্কর এবং অভিনবশঙ্কর নামেও কয়েকজন বিদ্বান্ সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ঘটেছিল। অভিনবশঙ্করের তিরোভাব কাল ৮৪০ খৃষ্টাব্দ। আর আদি শঙ্করাচার্যের তিরোভাব কাল ৮২০ খৃষ্টাব্দ। অর্থাৎ আদি শঙ্করাচার্যের সমসাময়িক কালে ত বটেই তাঁর তিরোভাবের পরও কিছুকাল ঐ অভিনবশঙ্কর বর্তমান ছিলেন। এই সমস্ত 'শঙ্করের' রচিত অনেক গ্রন্থই নামসাম্য হেতু আদি শঙ্করের নামে প্রচলিত হয়ে আসছে বলে আমার ধারণা। বিশেষতঃ শঙ্করের নামে প্রচলিত যাবতীয় শক্তিবিষয়ক স্তবস্তুতি যে পূর্বোক্ত কৌলসাধক গৌড়ীয় শঙ্করাচার্য এবং ত্রিপুরাতন্ত্রোক্ত শঙ্করের দ্বারা রচিত হয়েছে, সে বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। কবীর নানকের শিষ্য প্রশিষ্যরা যেমন স্বরচিত রচনা স্ব স্ব গুরুবর্গের নামে প্রকাশ করে স্বেচ্ছায় আত্মবিলোপ ঘটিয়েছেন, তেমনি ঐ সমস্ত 'শঙ্কর মহারাজরাও' কেউ নিজ মতবাদ

প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আবার কেউ বা গুরুভক্তির পরাকাষ্ঠা স্বরূপ নিজেদের রচনা আদি শঙ্করাচার্যের নামে স্বেচ্ছায় প্রচলিত করে থাকতে পারেন। তার ফলে তাঁদের ভাবধারাও শঙ্করাচার্যের ভাবধারা বলে অবলীলাক্রমে ভ্রমবশতঃ পরিগৃহীত ও পরিগণিত হয়ে আসছে।

এমতাবস্থায় গুরুমুখী বা হিন্দী ভাষায় রচিত যে কোন দোঁহার অন্তে 'নানক কহে' কিংবা 'কহত কবীরা' থাকলে তাকে যেমন নিঃসংশয়ে নানক বা কবীরের রচিত বলা যায় না, তেমনি সংস্কৃত ভাষায় রচিত যে কোন গ্রন্থের অন্তে ইতি শ্রীমদ্ভগবৎ-পূজ্যপাদ-গোবিন্দপাদাচার্যশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য-শ্রীশঙ্করভগবৎপূজ্যপাদ বিরচিতং' ইত্যাদি ছাপা থাকলেই তা স্বয়ং আদি শঙ্করাচার্যের দ্বারা লিখিত একথা বলা যুক্তিসঙ্গত নয়, এই হল আমার সিদ্ধান্ত। অলমিতি।

আমরা কিছুক্ষণ বসে বসে সপ্তাক্ষর শিবমন্ত্রের সঙ্গে নর্মদা মায়ের সপ্তাক্ষরী বীজমন্ত্র জপ করলাম। শোবার পূর্বে বাইরে এসে বাইরের রূপ দেখে এমন মুগ্ধ হলাম যে চিত্রার্পিতবৎ দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাথার উপর ঝক্‌ঝকে তারা ছিটানো আকাশ, চারধারে শৈলশ্রেণী, তাদের ছোট-বড় চূড়া যেন অকাশের গায়ে ঠেকেছে। পূর্ণচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নাধারায় এই নিবিড় নির্জন অরণ্যাণীর শোভা কী অদ্ভুত ও গম্ভীর। গভীর বনের মধ্যে, চক্ষুর আড়ালে জ্যোৎস্না স্নাত এই নির্জন আকাশতলে তার এই প্রাণঢালা আত্মনিবেদন নিশ্চয়ই ব্যর্থ হচ্ছে না।

সহসা গভীর বনের মধ্যে থেকে দু'একটা রাত - জাগা পাখীর ডাক শুনতে পেলাম। একটা গহন গভীর রহস্য যেন আজ এই রাত্রিতে এই দ্বীপভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। সত্য শিবসুন্দরের সর্বত্র যেন বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে আজ। মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। ঘুমিয়ে পড়েছি, রাত্রি তখন কত আন্দাজ করতে পারলাম না। সহসা কানে এল পাগলা সাধুর কণ্ঠস্বর। আমি, রঞ্জন, হরানন্দজী, প্রেমানন্দ সহ সকলেই জেগে উঠলাম। তিনি বলে চলেছেন — নর্মদার ঘাটে ঘাটে ঘুরে এতদিনে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝেছ নর্মদা তটে প্রায় তাবৎ বৈদিক ঋষি এবং দেবতাবৃন্দ তপস্যা করে সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। আমি চাই, পরিক্রমান্তে তোমরা যখন আপন স্থানে ফিরে যাবে তখন যেন তোমাদের মনে বহুল প্রচলিত অন্তরিন্দ্রিয়-লোভ, বাসনা বিচার, আহার বিচার, মন জয়ের গুহ্য কৌশল, মনের পরিবীক্ষণ ও পরিবিষ্ঠি, আসন বিচার, প্রাণায়ামের প্রহেলিকা, ষটচক্ররহস্য ও কুলকুণ্ডলিনী, সমাধি সমীক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলিতে যেন কোন ভুল ধারণা না থাকে। তোমরা যেমন মা নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে পরিক্রমা করছ তেমনি তোমরা সবসময়ে আমার চোখে চোখে রয়েছ। যোগের নামে আমাদের দেশে আসন মুদ্রা ও নানাবিধ গুহ্য ক্রিয়া কৌশল চলে। জানবে, যোগের পথে প্রধান অন্তরায় মনের চঞ্চলতা। আমাদের শাস্ত্র অনন্ত তার ব্যাখ্যাও অনন্ত। নানা মুনির নানা মত। কারও মতে রেচক পূরক কুম্ভকাদি নানা রকম শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া করলে মন সংযত হয়। কারও মতে আহার-সংযম এবং ইন্দ্রিয় সংযমই মন দমনের একমাত্র উপায়। যাইহোক, মায়ের নির্দেশেই আমি যোগের এই তত্ত্বগুলির প্রকৃত তত্ত্ব এক একটি রোজ ব্যাখ্যা করে শুনাবো। আজ আমি তোমাদের অন্তরিন্দ্রিয় লোভ, বাসনা-বিচার সম্বন্ধে বলব। সারাদিন তা তোমরা মনন করবে।

অন্তরিন্দ্রিয় লোভ ও বাসনা বিচার : — বৈদান্তিকদের মতে এই সংসার হল চিৎ জড়ের গ্রন্থি। চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে এই যে যোগসূত্র তারই বিভিন্ন অবস্থার নাম মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার। এইগুলিকে অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়। মনের স্বভাব সংকল্প ও বিকল্প। বুদ্ধি হল নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি অর্থাৎ discriminating faculty, যা নিয়ত অনুসন্ধান করে এবং সঞ্চয় করে সেইরূপ বৃত্তিকে বলা হয় চিত্ত আর আমি দেখি, আমি করি, এটি আমার ইত্যাদি যে অভিমানাত্মিকা বৃত্তি বেদান্তে তারই নাম দেওয়া হয়েছে — অহঙ্কার। একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্য সহজতর হবে। যেমন তোমার কোথাও একটি ফুল দেখলে — সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে প্রশ্ন জাগল — এটি কি ফুল? বেলফুল? না, গোলাপফুল? ফুলের স্বরূপ নির্ণয় করতে পারছ না, মনে সংশয় জাগছে। সহসা তোমার অন্তরে আর এক বৃত্তির উদয় হল, নানাদিক বিচার করে সে জানাল — উভয় ফুলে গন্ধ আছে বটে তবে মনে হয় এটা বেলফুলই হবে, গোলাপ নয়, কারণ গোলাপ ফুলের গাছে কাঁটা থাকে। যে প্রশ্ন তুলেছিল সে মন আর এইভাবে যে discriminate করে দিল তার নাম বুদ্ধি। মনকে আমি বলি সেক্সপীয়রের Eternal Hamlet, 'To be' or 'not to be' এই indecision এর Victim, কিন্তু বুদ্ধি যে করে হোক একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায়।

যাক্ আমার ফুল দেখা হয়ে গেল। তার লক্ষণ স্বরূপ ইত্যাদি বিষয়ে ধারণা একটি বিশেষ স্তরে সঞ্চিত হয়ে থাকল। এর পর যদি বেলফুল দেখি তখন আর প্রথমবারের মত সংশয় বা সংকল্পের দোলা মনকে নাড়া দেবে না। এইভাবে এই ফুল দর্শন রূপ অভিজ্ঞতা যেখানে সঞ্চিত হয়ে রইল, ছাপ পড়লো সেই Record Room টির নাম বেদান্তের পরিভাষায় 'চিত্ত'। পুরাণকাররা রূপকের ভাষায় এরই নাম দিয়েছেন - 'চিত্রগুপ্তের খাতা'। পুরাণের মতে চিত্রগুপ্তের খাতায় অহরহ জীবের প্রতিটি কর্ম পাপপুণ্যের হিসাব লেখা হচ্ছে অর্থাৎ জীবের প্রতিটি ভাবনা, চিন্তা ও কর্ম — সব কিছুর ছাপ পড়ছে, ঠিক যেন একটি শক্তিশালী স্বয়ংক্রিয়া Sensitive Film। আমি ফুল দেখেছি, রামবাবু দেখেন নি — এবম্বিধ যে অভিমান, এই বৃত্তিরই নাম — অহংকার।

এই অহংকারই স্বরূপবোধের অন্তরায় — এই লৌহযবনিকা না সরলে সান্ত জীব অনন্তের স্বাদ পায় না, অনন্তের নিঃসীম ভূমিতে তার জাগরণ ঘটে না।

মনই সকল ইন্দ্রিয়ের নিয়ামক, সেই রাজা — তারই দাপট বেশী। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ — এই তিনগুণও মনের ধর্ম। এই মনের সঙ্গে বাহ্যিক বস্তুর সংযোগহেতুই বাসনার উদয় হয়। বাসনাই বন্ধন, বাসনাই স্বরূপবোধের একটি শ্রেষ্ঠ আবরক। বাসনা শব্দের মধ্যেই বাসনার গূঢ় অর্থ লুক্কায়িত। বাসনা অর্থাৎ বাস-না, বাস নাই, থাকা নাই, অধিষ্ঠান নাই। বাসনাশূণ্য না হলে অধিবাস, সোঽহংভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়।

এই বাসনাই আবার লোভের জনয়িত্রী। নরহরি কবিরাজ লোভের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন —

লোহার্গলো ভদ্রহরো লোলতাঙ্কো ভয়প্রদঃ।
লুনাত্যুভৌ চ যল্লাকৌ তেন লোভঃ প্রকীর্তিতঃ॥ (বোধসারঃ)

'ল' এর অর্থ লোহার অর্গল (হুড়কা), 'ভ' এর অর্থ ভদ্রনাশক। ভদ্রপদ, কল্যাণপদ প্রাপ্তির পথে যা দুর্লঙ্ঘ্য বাধাস্বরূপ তারই নাম লোভ। 'লো' এর অর্থ চাঞ্চল্যযুক্ত এবং 'ভ' এর অর্থ ভয়দায়ক — যা হতে চাঞ্চল্য ও ভয় উৎপন্ন হয় এটি লোভের দ্বিতীয় অর্থ। লোভ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তৃতীয় অর্থ হল — লুনাতি উভৌ লোকৌ'— যা ইহলোক ও পরলোককে বিনষ্ট করে।

ঐ ভয়ঙ্কর লোভ ও ভয়ঙ্করী বাসনার উৎপত্তি ক্ষেত্র মন। কাজেই মন যে কি রকম বিপজ্জনক বস্তু তা সহজেই অনুমেয়।

ধর্মাধর্ম, পাপপুণ্য, সুখ দুঃখের অনুভূতি এবং যাবতীয় প্রবৃত্তি মনেই উদয় হয়, মনই জগৎপ্রপঞ্চ এবং নানাত্ব কল্পনা করে, মনই সৃষ্টি করে জীবভাব। বাস্তবিকপক্ষে স্বরূপতঃ আমি চিন্ময় আত্মা, নির্গুণস্বভাব — আমার বাসনা নাই, পাপপুণ্য, সুখদুঃখ, ধর্মাধর্ম, জন্মমৃত্যু প্রভৃতি কিছুই নাই। যতক্ষণ এই মন লয় না হয় ততক্ষণ জীব বুঝতে পারে না যে সে কে? সৃষ্টি কি? স্রষ্টা কে? স্রষ্টার সঙ্গে তার সম্বন্ধই বা কি? মন লয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আত্মজ্ঞানের উদয় হয়।

কিন্তু বাসনারূপ ইন্ধন যতক্ষণ আছে, মনরূপ বহ্নি ততক্ষণ কিছুতেই নির্বাপিত হবে না। স্ত্রীপুত্র ধন মান যশ লাভের বাসনা, স্বর্গ, ঈশ্বর, সমাধি এমন কি মোক্ষলাভের বাসনা — এ সকলই মনরূপ বহ্নির ইন্ধন রূপে কাজ করে। তাই যতক্ষণ বাসনা থাকে, ততক্ষণ মন লয় হয় না। বাসনাশূণ্য মন প্রপঞ্চ ত্যাগ করে আত্মতত্ত্বে লীন হয়ে তবেই স্বরূপাবস্থান সম্ভব হয়।

এদিকে জোর করে বাসনা ক্ষয় করা যায় না। বাসনার তৃপ্তি হলেই বাসনার নিবৃত্তি হবে এমন কোন কথা নাই। এক বাসনা পূর্ণ হলেই অন্য বাসনার উদ্ভব হয়। বাসনার একমাত্র প্রতিষেধক ঔষধ সন্তোষ। সর্বাবস্থায় যদৃচ্ছলাভে সন্তুষ্ট থাকা অভ্যাস করতে পারলে ধীরে ধীরে বাসনার ক্ষয় হয়। এটি এক রকমের মানসিক প্রস্তুতি, অভ্যাস বিশেষ। যারা সব সময় খুঁতখুঁত করে, কোন কিছুতেই তৃপ্তি পায় না, তাদেরকে ইন্দ্রত্ব দান করলেও শান্তি নাই। এই শ্রেণীর জীবরাই হতাশার শিকার হয়। মনে রাখা দরকার, Even the father is not satisfied with a grumbling child ! মনের সন্তোষ বজায় রাখার চেষ্টা কষ্ট সাধ্য বটে তবুও এই অভ্যাস অসাধ্য নয়। অনেকে এ জন্য জোর করে সংসার ত্যাগ করে। এটি তাদের সম্পূর্ণ ভ্রান্ত পদক্ষেপ। কারণ, যে সংসারের মূল বাসনা, সেই সংসার শুধু বাইরে নাই, মনের ভিতরেই তার বাসা। গভীর অরণ্যেই যান আর গিরিগুহাতেই প্রবেশ করুন সংসার সঙ্গে থাকবে। এই জন্য ব্রহ্মবিদ্ গুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন

— বাসনা এব সংসারঃ। তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তৎ চিকিৎস্যা প্রযত্নতঃ॥

মৃত্যু সকলের জীবনে অবধারিত পরিণাম জেনেও লোকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত আশার জাল বোনে তাই আচার্যের বিখ্যাত উক্তি — কালঃ নিমেষাৎ হরতি আয়ুস্তদপি ন মুঞ্চতি আশা বায়ুঃ। বিরক্তি বা বিদ্বেষবশতঃ কিংবা সহসা কোন মর্মযাতনা পেয়ে যারা সংসার ত্যাগ করে, তাদের অন্তঃস্থলে সংগুপ্ত কামনা বাসনা যখন তখন স্মৃতিপথে উদিত হয়ে চিত্তের বিক্ষেপ সৃষ্টি করে। এটি যোগপথের পরম বিঘ্ন। যে সকল বাসনা জীবের প্রকৃতিগত তা বিচারযুক্ত ভোগের দ্বারা এবং যে সকল বাসনা অপরের সুখ ভোগ ও বিলাস দেখে বুভুক্ষাবশতঃ জেগে ওঠে, তা কেবল বিচারের দ্বারাই ক্ষয় করা যায়। শ্রবণ-মননাদির দ্বারা মনকে দমন করা সম্ভব নায়।

দ্বিতীয় দিনে একই ভাবে একই সময়ে মহাত্মা ব্যাখ্যা করলেন — আহার বিচার।

আহার বিচার ঃ — যোগের পথে সাত্ত্বিক আহারের বহুতর প্রশংসা শোনা যায়। গীতাতেও কোন্ খাদ্য সাত্ত্বিক, কোন্‌টি রাজসিক এব কোন্‌টি তামসিক সে সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ বিস্তারিত আলোচনা করেছেন (গীতা ১৭/৭/১০)। অনেক সাধককে দেখা যায় তাঁরা সাত্ত্বিক আহারের নামে নিরামিষ ভোজ্য এবং ফলমূল আহার করেন, কেউ বা দিনান্তে, সপ্তাহন্তে আহারের দ্বারা দেহকে নির্যাতন করে রিপু দমন করতে প্রয়াস পান। এতে ক্রমে শরীর দুর্বল ও নিস্তেজ হয়, এমনকি গুরুতর ব্যধি দেখা যায়। ফল হয় এই যে, শারীরিক দৌর্বল্যের সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলিও দুর্বল ও নিস্তেজ হয় এবং ক্রমে মানসিক শক্তিও হ্রাস পায়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুকে এইভাবে অবদমন করার চেষ্টাতে ধারণাশক্তি, চিন্তাশক্তি, সাহস এবং একাগ্রতা নষ্ট হয়, জোর করে অধম প্রবৃত্তিগুলি দমন করতে গিয়ে উত্তম প্রবৃত্তিগুলিও হীনপ্রভ হয়। পরিণামে সে কি সাংসারিক কি পারমার্থিক সকল কাজেই অপটু হয়ে পড়ে। Suppression বা Repression এর দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় করা যায় না। প্রয়োজন Sublimation.

বারব্রত, একাদশী, উপবাস প্রভৃতির সঙ্গে রিপুর কোন বিশেষ সম্পর্ক আছে বলে আমি মনে করি না। পরিমিত ও নিয়মিত পুষ্টিকর আহারের দ্বারা শরীর সুস্থ এবং সবল থাকলে তবেই মন সতেজ ও সবল থাকে, যোগসাধনা, উচ্চচিন্তা, সূক্ষ্মচিন্তা সুস্থ ও সবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। যে সামান্য আহার বা অনাহারের দ্বারা অসুস্থ ও দুর্বল, সে কিভাবে নিস্তেজ মস্তিষ্ক নিয়ে সূক্ষ্মচিন্তা করবে? আমি তাকে সৎ বা অসৎ যে কোন কাজের পক্ষেই অনুপযুক্ত বলে মনে করি।

অনেকে নিরামিষ ও আমিষ আহারের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। তাঁদের মনে নিরামিষ আহার সাত্ত্বিক খাদ্য, আমিষ ভোজনে রজোগুণ ও তমোগুণের বৃদ্ধি ঘটে। আমিষ ও নিরামিষ ভোজনের অনুকূলে ও প্রতিকূলে জগদ্‌বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অনেক মতামত বর্তমান। যে যার রুচিমত ইচ্ছামত খাদ্য খেয়ে সেই খাদ্যের পরিপোষক অজস্র প্রামাণিক উক্তি উদ্ধৃত করেন।

কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা এই যে মৎস্য মাংসাহারীদের চেয়ে নিরামিষভোজীদের কামক্রোধ বা তমঃগুণ কম এইরকম কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তৃণাহারী ছাগের কামপ্রবৃত্তি ও মহিষের অকারণ ক্রোধপ্রবৃত্তি মাংসাহারী জন্তুগণের চেয়ে বরং শতগুণ প্রবলই দেখা যায়। চটকপাখী সামান্য তণ্ডুলকণাদি খেয়ে জীবন ধারণ করে কিন্তু দিনে পঞ্চাশবার রমণ করে অথচ সিংহ সম্পূর্ণতঃ মাংসভোজী হয়েও বৎসরে মাত্র একবার সিংহীর সঙ্গ করে। জীব জগতে এই রকম বহু দৃষ্টান্ত দেখেও যাঁরা আমিষ ভোজন ও নিরামিষ ভোজনকে তমঃ ও স্বত্ত্বগুণের পরিবর্দ্ধক বলে মনে করেন তাঁরা এই সত্যটি ভুলে যান যে, মনই কর্তা, শরীর আজ্ঞানুবর্তী দাসমাত্র, মনের উত্তেজনা ছাড়া ইন্দ্রিয়সকল কখনও উত্তেজিত হয় না। মনকে সংযত না করে শরীরে কষ্ট দিলে কোন ফললাভের সম্ভাবনা নাই। বহিরিন্দ্রিয় নিগ্রহের দ্বারা অন্তরিন্দ্রিয়কে নিগ্রহ করা কদাপি সম্ভব নয়, মিথ্যাচার বিশেষ। ছেদিত-মুষ্ক ছাগলাদি জীবজন্তু তার জ্বলন্ত প্রমাণ। রোগ বা বার্ধক্যবশতঃ পুরুষত্বহীন ব্যক্তিরাও অতৃপ্ত বাসনার দাস হয়ে সর্বদা ইন্দ্রিয়সুখ কামনা করে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বস্তুতঃ রিপুর উত্তেজনা শরীরগত নয়, মনোগত।

পুরাণ বর্ণিত অনেক গল্পে আছে — কোন কোন ঋষি বা মুনি নির্জন পর্বতগুহায় বাস করে গলিত পত্র বা বায়ু ভক্ষণ করে সহস্র সহস্র বৎসর তপস্যা করা সত্ত্বেও একদিন দৈবাৎ উর্বশী মেনকা রম্ভা তিলোত্তমা বা অপর কোন সুন্দরীকে দেখে ধৈর্যচ্যুত হয়েছেন, প্রথম রিপুর উত্তেজনায় তাঁর ইন্দ্রিয় বৈকল্য ঘটেছে। এ হল

অতৃপ্ত বাসনা এবং শরীর নির্যাতন করে রিপুদমন চেষ্টার ফল। নিম্নাঙ্গে কৌপীন এঁটে নিত্য নিম্বপত্র ভক্ষণ করলেই যে ইন্দ্রিয়দমন হয় এমন কোন কথা নাই। মুনি হিসাবে পরাশরের এত নাম ডাক অথচ দেখা গেল দুশ্চর তপস্যা শেষে তিনি ধীবর কন্যা সত্যবতীকে দেখে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। সত্যবতী বললেন তাঁর শরীরে মৎস্যের দুর্গন্ধ, মুনি বললেন — তিনি তা অবিলম্বে পদ্মগন্ধ করে দিচ্ছেন। মৎস্যগন্ধা স্বাভাবিক ব্রীড়াবশতঃ প্রকাশ্য দিবালোকের কথা তুললেন। মুনি যোগবলে স্বতন্ত্র দ্বীপ ও কুয়াশা সৃষ্টি করলেন। তিনি যোগবলে এতসব ঘটনা ঘটাতে পারলেন অথচ কামজয় ও রিপুদমন করতে পারলেন না। পুরাণের ঐ সব বর্ণনায় কিছু কিছু অতিশয়োক্তি থাকলেও পুরাণ লেখকগণ সচরাচর জগতে যা দেখেছেন, যা প্রায়শই ঘটে থাকে, তারই বাস্তব রেখাচিত্র যে এঁকেছেন এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। আমার বক্তব্য হল, দীর্ঘকাল লোকলোচনের অন্তরালে রিপুদমনাদির বাহ্যকলাকৌশল, যোগের নামে নানা ক্রিয়াকলাপ অভ্যাস করে, এমন কি অলৌকিক বিভূতিলাভ করেও যে ইন্দ্রিয়কে দমন করা যায় না, অন্ততঃ পুরাণের বিশ্বামিত্র পরাশররা পারেন নি, তা কেবল আমিষ-ভোজন নিরামিষ-ভোজনের উপর নির্ভর করে একথা বিশ্বাস করতে আমার প্রবৃত্তি হয় না।

আমার মতে যার যা পেটে সয়, তাই তার পক্ষে সাত্ত্বিক খাদ্য। বাংলাদেশে পেঁয়াজরসুনাদি তামসিক খাদ্য বলা হয়, এখানে অনেক আমিষভোজী ব্রাহ্মণ পরিবারে ঐ সব খাদ্য গ্রহণ একেবারে নিষিদ্ধ। অথচ উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের কট্টর নিরামিষভোজীরাও পেঁয়াজ রসুনকে অখাদ্য বলে মনে করেন না। দুধ খেলে কারও পেটে অত্যধিক বায়ু ও অম্ল হয়, নিরামিষ শাকসব্জী ভক্ষণে হজমের গোলমাল হয়, তার পক্ষে আমার মতে দুধ ও শাকসব্জী তামসিক খাদ্য। মাছ মাংস খেলে যদি শরীর ভাল থাকে তাহলে তার পক্ষে তাই সাত্ত্বিক খাদ্য হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। আবার আমিষ ভোজন করলে যদি কারও বিবমিষা দেখা যায় তাহলে তার পক্ষে অবশ্যই সেটি তামসিক খাদ্য। অর্থাৎ যে খাদ্য যার পক্ষে সুপাচ্য, লঘু, পুষ্টিকর এবং তৃপ্তিদায়ক তাই তার পক্ষে সাত্ত্বিক খাদ্য হিসাবে গণ্য হওয়া উচিত। আর একটি কথা আমাদের মনে রাখা দরকার, কোন বস্তুর উৎকর্ষ বাড়াতে হলে সেই বস্তুর উপাদানই প্রয়োজন হয়। স্বর্ণালঙ্কারে উৎকর্ষ বাড়াতে হলে সোনাই দরকার হয়, কাঠ বা মাটি দিয়ে তা হয় না। তেমনি পঞ্চভূতাত্মক দেহের পুষ্টির জন্য পঞ্চভূতাত্মক খাদ্যই আবশ্যক। মন পঞ্চভূতাত্মক নয় সুতরাং ভাবের শুদ্ধাশুদ্ধি এবং বৃত্তিনিরোধে জড়খাদ্য কার্যকরী হয় না।

আমার এই আলোচনা থেকে তোমরা কেউ যেন মনে কোরো না যে আমি আমিষ ভোজনের পক্ষে কোন ওকালতি করছি। আসলে আমি আমিষ নিরামিষ কিংবা তথাকথিত সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক হিসাবে চিহ্নিত কোন খাদ্যের উপরেই বিশেষ কোন গুরুত্ব দিচ্ছি না। মুখবিবরের মধ্য দিয়ে কি জাতীয় খাদ্য পেটে প্রবেশ করানো হল, জিহ্বা কিসের রসাস্বাদন করল, তার উপর মনের সত্ত্বগুণ বা তমোগুণের কোন হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। আমি পূর্বেই বলেছি খাদ্য হওয়া চাই সুপাচ্য, পুষ্টিকর এবং তা অবশ্যই হওয়া চাই পরিমিত ও নিয়মিত। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ব্যক্তিভেদে, জলবায়ুভেদে খাদ্যের তারতম্য আবশ্যক। আবশ্যক constitution মাফিক। বিষম খাদ্য যথা, তিক্ত ও অম্ল. তিক্ত খাদ্যের সঙ্গে ঘৃত, একত্রে মাছ মাংস দধি ও দুগ্ধজাতীয় খাদ্য তথা পচা ও বাসি খাদ্য সর্বথা বর্জনীয়।

তুলসীপত্র ও গঙ্গাজল সহযোগে কাঁচকলা ও আতপচালের হবিষ্যি করলেই মনের ভাবশুদ্ধি ঘটে না। শাস্ত্রকাররা বলেছেন — যোগাভ্যাসীর পক্ষে আহার সংযম আবশ্যক। অত্যন্ত খাঁটি কথা। কিন্তু তাঁদের ব্যবহৃত ঐ উপদেশের ব্যাপক ও নিগূঢ় অর্থ আছে। আহার কাকে বলে? আহরণং ইতি আহারঃ। ইন্দ্রিয় যা আহরণ করে তার নাম আহার। সে কি শুধু জিহ্বা-ইন্দ্রিয়ের আহরণ? অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের আহরণ কার্যের দিকেও লক্ষ্য রাখা দরকার। জিহ্বা গ্রহণ করল। বহু প্রশংসিত সাত্ত্বিক খাদ্য যথা — দুধ, মধু, দধি ফলমূল পরমান্ন ইত্যাদি কিন্তু অন্যদিকে যদি চক্ষুরিন্দ্রিয় অহরহ অসৎভাবোদ্দীপক কুদৃশ্য দর্শন করে মনোইন্দ্রিয় যদি কুচিন্তায় মত্ত থাকে তাহলে কি সৎভাবের পুষ্টি সম্ভব? একটি শিশু যদি সারাদিন নর্দমার পাঁক ঘাটে আর সন্ধ্যাবেলা যদি তার মা সাবান মাখিয়ে, পরিষ্কার জামাকাপড় পরিয়ে সুন্দর বেশভূষা করে দেন, তাহলে কি শিশুর স্বাস্থ্য ভাল থাকবে? চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে তেইশ ঘন্টা অসৎ পরিবেশে অসৎ ভাবভাবনার মধ্যে থেকে মাত্র একঘন্টা কেউ যদি ধ্যানধারণা করেন তাহলে তাতে কি আহারশুদ্ধি তথা মনের ভাবশুদ্ধি ঘটবে? বলা বাহুল্য ঘটবে

না। এ সম্বন্ধে শ্রুতির সুস্পষ্ট নির্দেশ,

আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতির্লম্ভে সর্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥ (ছান্দোগ্য)

ঐ মন্ত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে শঙ্কর বলেছেন — 'বিষয়োপলব্ধিলক্ষণস্য বিজ্ঞানস্য শুদ্ধিঃ আহারশুদ্ধি-রাগদ্বেষ-মোহ-দোষৈরসংসৃষ্টবিষয়বিজ্ঞান-মিত্যর্থঃ।' অর্থাৎ রাগদ্বেষাদি-দোষ-সংস্পর্শরহিত শব্দাদি বিষয়ের যে অনুভূতি, সেই বিষয় বিজ্ঞানের শুদ্ধি হলে পর আহারশুদ্ধি হয়। ইন্দ্রিয় বিষয় হতে যে রূপ রস গন্ধ স্পর্শাদির সুখ আহরণ করে তাই আহার পদবাচ্য। সেই আহরণ ক্রিয়া শুদ্ধ ভাবপূর্ণ হলে তবে সত্ত্বশুদ্ধি ঘটে। সত্ত্ব শুদ্ধ হলে ভূমা আত্মার সম্পর্কে ধ্রুবাস্মৃতি লাভ হয় অর্থাৎ তদ্‌বিষয়ক জ্ঞান আর বিলুপ্ত হয় না। ধ্রুবা স্মৃতি লাভ হলে জন্মজন্মান্তরের বাসনাবদ্ধ গ্রন্থিসমূহের বিপ্রমোক্ষ (বিশেষরূপে মোক্ষ বা বিনাশ) হয়ে যায়। যেহেতু আহারশুদ্ধিই উত্তরোত্তর অবস্থিত এই সমস্ত সাধনের মূলীভূত কারণ, সেজন্য আহারশুদ্ধি অর্থাৎ মনের বিকার দূর করা বিষয়ে শাস্ত্র এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আমিষ-নিরামিষ খাদ্য প্রসঙ্গে বৈদিক ঋষিরা যা বলেছেন, তাই আমার মতে চরম কথা। তাঁরা বলেছেন — বিষয়াভিলাষং আমিষং, তদ্‌রাহিত্যং নিরামিষং বা। বিষয়ের প্রতি আসক্তিই আমিষ ভোজন। মন আসক্তি শূণ্য হলে নিরামিষ ভোজন হয়। শাস্ত্রে যেখানে নিরামিষ ভোজনের প্রশংসা আছে তার একমাত্র উদ্দেশ্য — মনকে আসক্তি শূন্য করতে হবে। মন আসক্তি শূন্য হলেই আত্মজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হয়।

মহাত্মার কণ্ঠস্বরের গমগমানি ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল। রঞ্জনের ঘড়িতে দেখলাম সাড়ে চারটা বেজেছে। সমগ্র বনস্থলীতে প্রাণের সাড়া জেগেছে। ভোর হয়ে আসছে। যে কণ্ঠস্বর এতক্ষণ প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের এই হলঘরটাকে নিনাদিত করে রেখেছিল এবং আমরাও যে স্বর এতক্ষণ ধরে তন্ময় হয়ে শুনছিলাম, তা বন্ধ হয়ে গেলেও, আমরা তাঁর কণ্ঠমাধুর্যের তানে বেশ কিছুক্ষণ তন্ময় হয়ে রইলাম। আমাদের কারো বাক্যস্ফূর্তি হল না।

বেশ কিছুক্ষণ ঐভাবে থাকবার পর মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে দেখি উদীয়মান সূর্যের লাল-রশ্মি নর্মদার স্বচ্ছ জলে হিল্লোলিত হয়ে অপূর্ব দৃশ্যের রচনা করেছে। আমরা করজোড়ে সূর্য-বন্দনায় রত হলাম। এরপর নর্মদাকে স্পর্শ ও প্রণাম করে প্রত্যেকেই নিজ নিজ নিত্যকর্মে মন দিলাম।

যথারীতি তৃতীয় দিনে একই সময়ে একই ভঙ্গীতে মহাত্মা ব্যাখ্যা করলেন — মন জয়ের গুহ্য কৌশল।

মন জয়ের গুহ্য কৌশল ঃ — মনের Complete Transformation এবং Sublimation ছাড়া যোগের রাজ্যে কখনও প্রবেশ করা সম্ভব হয় না। মন স্বভাব-চঞ্চল। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছিলেন

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্॥ (৬/৩৪)

হে কৃষ্ণ, মন অত্যন্ত চঞ্চল। বাতাসকে হাতের মুঠোয় পুরা যেমন কষ্টকর তেমনি মনকে দমন করাও তেমনি বা ততোধিক দুঃসাধ্য। শ্রীকৃষ্ণ কথাটিকে উড়িয়ে দিতে পারেন নি। অর্জুনের ঐ উক্তিকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন — অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা দুরন্ত মনকে নিগ্রহ করা যায়, সংযত করা যায়। প্রায় তাবৎ টীকাকারদের মধ্যে 'অভ্যাস' শব্দের কেউ অর্থ করেছেন ধ্যানের practice, কেউ নানারকম যোগ প্রক্রিয়া pactice আবার কারও মতে নিরন্তর কৃষ্ণনাম জপের practice ! আর 'বৈরাগ্য' শব্দের অর্থ তাঁদের মতে বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণ বশতঃ সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাস গ্রহণাদি। আমি টীকাকারদের সঙ্গে একমত নই। কারণ তাই যদি হত, তাহলে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রাপ্তি মাত্র অর্জুন হয় ধ্যান জপাদি যোগাভ্যাসে লেগে পড়তেন নয়ত কৌপীন সম্বল করে গিরিগুহায় আশ্রয় নিতেন! অর্জুনের জীবনে বাস্তবে তা ঘটেছিল কি?

আমার মতে — অভ্যাস শব্দের অর্থ আত্মার সমুখস্থ হওয়া, আত্মমুখী হওয়া, আত্মার সঙ্গে একত্ববোধ, সামরস্যলাভ বা আত্মতত্ত্বে আরূঢ় ও অধিষ্ঠিত থাকা। কারণ, অভ্যাস শব্দের ব্যুৎপত্তিই হল — অভি - অস্‌+ ঘঞ্‌ (ভাবে)। অতি উপসর্গের অর্থ সম্মুখস্থ হওয়া, একীকরণ এবং বিদ্যমানতা। অস্‌ ধাতুর অর্থ হওয়া বা থাকা। 'বৈরাগ্য' শব্দটিও এসেছে রনজ্‌ ধাতু হতে। বি-রনজ্‌ + ঘঞ্‌ (ভাবে) - বিরাগ; বিরাগ + ষ্ণ্য প্রত্যয় করে বৈরাগ্য শব্দের উৎপত্তি। রনজ্‌ ধাতুর অর্থ রাঙানো। বিশেষ রঙে রাঙিয়ে যাওয়া। আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, স্বরূপতঃ আমি আত্মা — এই বিশেষ বোধে, বিশেষ ভাবে এবং বিশেষ রঙে রেঙে উঠা অর্থাৎ প্রতিবোধিত হওয়াই প্রকৃত বৈরাগ্য। বলা বাহুল্য, এই অর্থে অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে জয় করা যায়।

কোন কোন মহাত্মা বলেন মনকে জয় করার দুটি উপায় — ১) হঠ্‌সে ২) ঔর প্রেমসে। রোচক উদাহরণের মাধ্যমে এই তত্ত্ব বুঝাতে গিয়ে তাঁরা বলেন, মনকে নানা বারব্রত উপবাস এবং যোগ ক্রিয়াদির দ্বারা নিগ্রহ করাটা কিরকম? যেমন হঠাৎ কোন দুষ্ট বলদ দড়ি ছিঁড়ে যদি পালিয়ে যায় আর গৃহস্বামী যদি সেই বলদের পেছনে মাঠে মাঠে দৌড়াতে থাকেন তাহলে অনেক দৌড়াদৌড়ি করার পর শেষে হয়ত বলদটিকে তিনি ধরতে পারবেন কিন্তু তখন দেখা যাবে গৃহস্বামীর ক্লান্ত, বলদটিও হাঁপাচ্ছে। সেই বলদ দিয়ে তখন আর শ্রমসাধ্য কোন কাজ লাঙ্গল টানা ইত্যাদি সম্ভব হবে না। ঠিক এই রকম, কৃচ্ছসাধনের (হঠ্‌সে) দ্বারা ক্লিষ্ট দেহে মনকে অন্তে নিগ্রহ করতে পারলেও তখন গৃহস্বামী সেই মন দিয়ে ব্রহ্মচিন্তা সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, বলদটি দড়ি ছিঁড়ে যখন পালাতে থাকে যদি অহেতুক দৌড়াদৌড়ি না করে, কিছু বাঁশপাতা বা ঘাস নিয়ে 'আয় আয়' বলে আদরভরে ডাকতে থাকে তাহলে বলদটি খাদ্যের লোভে, প্রথমে কিছুটা ইতস্ততঃ করলেও ধীরে ধীরে এগিয়ে আসবে, ধরা পড়বে। গৃহস্বামীর ক্লেশ হবে না, গরুটিও ক্লান্ত হবে না। দুষ্ট মনকেও এইভাবে সপ্রেম যত্নের দ্বারা বশীভূত করা যায়। এই সব রোচক গল্প বলতে ভাল লাগে, শুনতে ভাল লাগে। নিগ্রহ ও কৃচ্ছসাধনের চেয়ে প্রেমের পথ যে সহজতর, ঐ সব কথা তার পরিপোষক দৃষ্টান্ত হলেও এর কোন বাস্তব মূল্য নাই।

দুরন্ত বিক্ষিপ্ত মনকে নিগ্রহের পথে অবদমন করা যায়, জয় করা যায় না একথাও যেমন সত্য, তেমনি মিষ্ট কথার জারক রসে মনকে dilute ও dissolve করার এই মধুর কল্পনাও একটি বাতুল চিন্তা মাত্র। মন জড়, এই জড় মনকে নিষ্ক্রিয় করতে পারলেই যে আত্মচৈতন্যের অনুভূতি লাভ হবেই এমন কোন কথা নাই। তবে, যোগের পথে অভীষ্ট লাভ করতে হলে উদ্দাম মনের বহুমুখীন্ বৃত্তিগুলি যে সংযত করা প্রয়োজন একথা অবশ্যই স্বীকার্য। তাই মন জয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় এবং প্রায় লোকের কাছেই শোনা যায় — 'ধ্যানের সময় মন কিছুতেই একাগ্র ও স্থির হতে চায় না। ইষ্ট চিন্তার পরিবর্তে স্ত্রীপুত্র পরিজন অফিস আদালত নানাবিধ সংসার চিন্তা মনে এসে ভীড় করে। এই চঞ্চল মনকে একাগ্র করার উপায় কি?

আমার মতে মনের চঞ্চলতা নিয়ে অহেতুক কাতর হওয়া বা মনের উপর অযথা গুরুত্ব দিবার প্রয়োজন নাই। ধর, ধ্যানে বসেছ, চাইছ ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে মন একাগ্র হোক, ধ্যেয় বস্তুতেই লগ্ন থাকুক কিন্তু মন ছুটে চলল কখনও প্রিয়জনের দিকে, কখনও বা তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে, বহু বিরক্তিকর সমস্যার অকিঞ্চিৎকর দৃশ্যান্তরে। প্রাথমিক স্তরে এই রকম অভিজ্ঞতা সকলেরই হয়। এই অবস্থা হতে অব্যাহতি লাভের একটি গুহ্য উপায় আছে। প্রথমেই স্মরণ কর, কার ধ্যান করছ? তাঁর স্বরূপ কি? ধ্যেয় বস্তু সান্ত না অনন্ত? তিনি সর্বব্যাপী, না একদেশী? তোমাদের উপাস্য যদি ব্রহ্ম হন, আত্মদর্শনই যদি তোমাদের লক্ষ্য হয়, তাহলে মনের প্রেক্ষাপটে যত লহরই উঠুক না কেন, আমি ত মনে করি তোমাদের ধ্যান ও মনন ঠিক মতই হচ্ছে। কারণ সাক্ষাৎকৃতধর্মা ঋষিরা বলেছেন — ব্রহ্ম সর্বব্যাপী, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। এ তাঁদের অপরোক্ষানুভূতির বাণী। কাজেই কাকে স্ত্রী পুত্র পরিজন, বিষয়ান্তর বা আজে বাজে চিন্তা বলে ভাবছ? ব্রহ্ম ছাড়া তো কিছু নেই, কেউ নাই — তুমি নিজেও ব্রহ্ম, সর্বত্র নাম রূপ উপাধির অন্তরালে ত সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্মই বিরাজিত। যা দেখছ মন যে চিত্রই সামনে আনছে সে ত ব্রহ্মেরই রূপ। কাজেই ক্ষুণ্ন হবে কেন? তোমাদের ধ্যেয় বস্তুই ত আসছে — নানা রূপে, নানা সাজে। অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা যায়, আত্মারই বহুধা প্রকাশ দেখছ — ঐ যে নানা দৃশ্য দৃশ্যান্তর, বর্ণাঢ্য নানা বীচিবিভঙ্গ — ঐগুলি ত তোমারই চিদ্‌বিলাস। কেবলই বারবার বলছ 'মন চঞ্চল মন বর্হির্মুখ', কিন্তু সেই অদ্বিতীয় পরমসত্তা ছাড়া মন নামক আর কোন কি দ্বিতীয় বস্তু আছে? মনকেও ভাব তারই প্রকাশরূপে। কাজেই মনের চাঞ্চল্য নিয়ে এত উৎকণ্ঠার প্রয়োজন কি? ধ্যানকালে যার রূপই ভাসুক সে ত ব্রহ্মেরই রূপ, যে চিন্তাই জাগুক সেখানে ত ব্রহ্মই জাগছেন কেবল ভিন্নতর রূপে।

এই পদ্ধতির অবশ্যম্ভাবী ফল হয় এই যে এতে ধীরে ধীরে সকল বিক্ষেপেরই ইতি ঘটে — Repulsion এর ধারা কেন্দ্রমুখী হয়, মন অবরোহের পথ ছেড়ে আরোহের পথে যায়, এরই নাম মনের উলট্ গতি বা ঊর্ধ্বগতি। তখন মন আর 'মন' থাকে না, উল্টে গিয়ে তা হয় নম — নমো নমঃ — ন মম, ন মম — অর্থাৎ মমত্বের অবসান। অহং এর যবনিকা এইভাবেই অপসারিত হয়। মন 'নমঃ' হওয়া মানেই ব্রহ্মানুভূতিতে জীবাত্মার সমুত্থান। 'নম' ত শুধু নমস্কার নয়, তাতো ব্রহ্মই। কারণ 'নমঃ' ব্রহ্মেরই পর্যায়বাচী শব্দ। ভট্ট ভাস্করের রুদ্রাধ্যায় ভাষ্যে আছে — 'ওঁ স্বাহা স্বধা বষট্ নম ইতি ব্রহ্মণো নামানি', ওঁ, স্বাহা, স্বধা, বষটকার এবং নমঃ — এগুলি ব্রহ্মেরই নামান্তর। বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে আত্মস্বরূপের সঙ্গে ঐক্যচিন্তন, একত্ববোধই নমঃ

শব্দের তাৎপর্য।

সোমানন্দজীর কণ্ঠস্বর থেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র মন্দিরাভ্যন্তর বিদ্যুতের ঝলকানিতে আলোকিত হয়ে গেল। বুঝলাম, তাঁর অন্তর্ধান ঘটলো।

সকালবেলায় স্নান, তর্পণ, শিবপূজা ও মহাত্মার বিভিন্ন যোগতত্ত্বের আলাপ-আলোচনা এবং সবশেষে বিশ্রাম করেই দিন কাটতে লাগল। মহাত্মার কণ্ঠস্বর শোনার আশায় রাত্রে দু'চোখের পাতা এক করতে পারি না, পাছে ঘুমিয়ে পড়লে মহাত্মার যোগের ব্যাখ্যা শোনা থেকে বঞ্চিত হই। উদগ্র আকাঙ্খা এবং উৎকণ্ঠা নিয়ে বসে থাকলেও আমাদের চোখ ঘুমে আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে ঢুলছি, আবার জেগে উঠে রঞ্জনের ঘড়ি দেখছি।

চতুর্থ দিনে যথাসময়ে ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠস্বর। তিনি ব্যাখ্যা করলেন — মনের পরিবীক্ষণ ও পরিবিষ্টি।

মনের পরিবীক্ষণ ও পরিবিষ্টি ঃ — মুখে যাই বলা হোক, ঐভাবে সর্বত্র সর্ববস্তুতে ব্রহ্মবুদ্ধি ও ব্রহ্মবোধ সম্ভব কিনা? আমার মতে সম্ভব। বেদান্তের সাধকমাত্রেই এই রহস্য অবগত আছেন। একটি Concrete Example দিই। মনে কর ধ্যানে বসেছ, মন সহসা চলে গেল কাপড়ের দোকানে। একটি সুন্দর কাপড়ে মন নিবদ্ধ হল। তখনই ভাবতে হবে, ঐ কাপড় আসলে ব্রহ্মই। কেন? কি ভাবে? ভেবে দেখ, কাপড়টি প্রকৃত পক্ষে কি? কাপড় ত কতকগুলি সুতার সমষ্টি। সুতা এসেছে কোথা হতে? তুলা হতে। তুলা এসেছে তুলার গাছ হতে। গাছ এসেছে একটি বীজ হতে। বীজটি মরা হলে ত গাছ জন্মাত না। জীবন্ত বীজ গাছের মূল কারণ। জীবন্ত বীজ মানেই তার মধ্যে আছে চিৎধারা। কাজেই বস্ত্রখানি মূল চিৎ এরই প্রকাশ বিকাশ নয় কি? এইভাবেই প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ — সারা দিনমানে প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় মধ্যে যে যে ব্যক্তি, বস্তু বা দৃশ্যের সংস্পর্শে আসবে, প্রত্যেকের মধ্যেই ব্রহ্মত্ব আরোপ করতে থাক। করতে থাক মূলের অনুসন্ধান। শয়নে স্বপনে ধ্যানে জাগরণে তোমাদের সর্বক্ষণের চিন্তা হোক —

ভোজন আমার আহুতি প্রদান,
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ জ্ঞান
শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম —
প্রতি কথা মোর মন্ত্র।
যে ভাবেই বসি সেই ত আসন,
প্রতি অঙ্গভঙ্গী মুদ্রা বিরচন,
যে চিন্তাই করি তাঁরই ধ্যান করি —
এ জীবন তাঁর যন্ত্র॥

যেহেতু মানুষ মাত্রেই কর্মপরায়ণ এবং বহির্মুখী, এইজন্য এইভাবে কর্মের মধ্য দিয়ে প্রতিটি ভাবনা চিন্তার মধ্য দিয়ে আত্মার সঙ্গে যোগসাধন আবশ্যক। প্রকারান্তরে এটি হল বুদ্ধিক্ষেত্রে বুদ্ধিতত্ত্বেই আত্মার সন্ধান। মন প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়ের চেয়ে বুদ্ধি সূক্ষ্মতম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ তত্ত্ব। বুদ্ধি আত্মারই প্রতিবিম্ব, স্বরূপ বস্তু — আত্মার একান্ত সন্নিহিত তত্ত্ব। অপর সকল তত্ত্বই বুদ্ধির তুলনায় বিপ্রকৃষ্ট বা স্থূল। এইজন্য মনে চিন্তার যে বুদবুদই উঠুক, যেদিকেই সে ছুটে যাক, বুদ্ধির দ্বারা, বিচারের দ্বারা তাতে ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপ করে, তার মধ্যেই ব্রহ্মস্বরূপতা নির্ণয় করতে হবে। এ যেন স্ব অর্থাৎ আত্মার অধ্যায় (chapter) তন্ন তন্ন করে মনযোগ সহকারে অধ্যয়ন — স্বাধ্যায়। স্বাধ্যায় শব্দের অর্থ - স্ব এর, সচ্চিদানন্দরূপ আত্মার অধিগম বা জ্ঞানলাভ। প্রথমে বৃত্তিসারূপ্যরূপে পরে নির্বিশেষরূপে এই অধ্যায়ের অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়। ফলে ফুলে আকাশে বাতাসে কাষ্ঠে প্রস্তরে জীবে জীবে ঘটে ঘটে সর্বত্র, আবার কামে ক্রোধে ক্ষুধায় পিপাসায় শোকে দুঃখে সর্বত্র — এক কথায় বাইরে এবং অন্তরে এইরকম বৃত্তিসারূপ্যপ্রাপ্ত আত্মাকে বুদ্ধি দ্বারা অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন বা দর্শন করতে পারলে তখন মন ও ইন্দ্রিয় সকল বিষয়রূপে, জড় পদার্থরূপে যাই এনে উপস্থিত করুন না কেন, তা যে বাস্তবিক পক্ষে জড় নয় — তা আত্মা, ক্রমে ক্রমে এই বোধ দৃঢ় হয়। সমগ্র অন্তরাকাশ বোধির আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই গুহ্য পদ্ধতির নাম মনের পরিবীক্ষণ ও পরিবিষ্টি। দুশ্চিকিৎস্য বিষয় রোগে জর্জরিত মনের পরিচর্যা এবং পরিশেষে তার সকল ক্ষুদ্রতাকে ভূমাতে ব্যাপ্ত করে দেওয়ার এটি একটি শ্রেষ্ঠ পন্থা। পরিবীক্ষণ শব্দের অর্থ অভিনিবেশ সহকারে অবলোকন এবং পরিবিষ্টি শব্দের অর্থ ব্যাপ্তি এবং পরিচর্যা। বুদ্ধি

দ্বারা উপরোক্ত পদ্ধতিতে ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপ করতে পারলে মনের পরিচর্যা, মনের ব্যাপ্তি এবং ব্রহ্মাবলোকন এই তিন কাজই সম্পন্ন হয়।

আচার্য শঙ্কর এই ভাবনার সূত্র ধরেই 'পরাপূজাতে' বিধান দিয়েছেন —

............প্রাণাঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিবিধোপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ॥
বায়ু রূপে তুমি সখা মোর পঞ্চপ্রাণ,
এ শরীর তোমারি ত প্রিয় বাসস্থান।
উপভোগ তরে মোর যে ভোগ রচনা
তোমারি ত সে সকল পূজার বিধান,
নিদ্রা সে ত সমাধিতে সুখে অবস্থান!

প্রতিনিয়ত এই thought association এর ফলে ক্রমশঃ ভাবশুদ্ধি হয়, মলের পরিপাক ঘটে। প্রাথমিক অবস্থাতে এই প্রণালীর মধ্যে দ্বৈতবোধের যে ভাবটি স্ফুটতর, ক্রমে তারও পর্যান ঘটে অদ্বৈতবোধের মহাসাগর-সঙ্গমে। তখন চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতি সর্বত্র অবাধ এবং নিরবচ্ছিন্ন হয়।

বস্তুতঃ সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি আরোপরূপে ভাব-সঙ্গমই (Cosmic Intercourse) মহাচেতন সমুত্থানের (Cosmic Illumination) সিদ্ধমন্ত্র।

সোমানন্দজীর ভাষণ শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের ঝলকানিতে বুঝতে পারলাম মহাত্মা অন্তর্হিত হয়েছেন। আবিষ্ট চিত্তে প্রত্যেকে গড়িয়ে পড়লাম যে যার নিজের বিছানায়।

এরপর সোমানন্দজী পঞ্চম থেকে অষ্টম দিন পর্য্যন্ত একে একে ব্যাখ্যা করলেন নিম্নলিখিত তত্ত্বগুলি।

আসন বিচার ঃ— বেদান্ত প্রতিপাদিত এই সিদ্ধ পদ্ধতিতে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ ও স্নান, বহিরাচারের অনুষ্ঠান. পদ্মাসন-বীরাসন-সিদ্ধাসনাদির অভ্যাস এবং প্রচলিত পদ্ধতিতে প্রাণায়ামের কোন মূল্য নাই। বেদান্ত যোগীর কাছে 'আত্মতীর্থং পরম তীর্থং অন্য তীর্থং নিরর্থকং।'

আমাদের দেশে সাধুসমাজে হঠযোগ, লয়যোগ, রাজযোগ প্রভৃতির অনুষ্ঠানকালে বহুবিধ আসন ও মুদ্রাদির অভ্যাস প্রচলিত আছে এবং যোগাভ্যাসী মাত্রেই ঐ সব ক্রিয়াকৌশলের কসরৎকে যোগের অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করেন। বিভিন্ন জীবজন্তুর নিজ নিজ অঙ্গাদির গঠনানুসারে উপবেশনের posture অনুসারেই ঐ সকল আসন কল্পিত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সব আসন সিদ্ধি দ্বারা ব্যায়ামের সুফল লাভ, স্বাস্থ্যের উন্নতি ও রোগ নিরাময়াদি ছাড়া প্রকৃত যোগের ফল — জীবাত্মার ও পরমাত্মার মিলন বা ঐক্যসাধন — কখনও সম্ভব হয় না। যম নিয়মের অভ্যাস পরিপক্ক হলে আসনসিদ্ধি সহজেই হয়ে থাকে, নচেৎ আসন জয় তথা চিত্তের স্থিরতা লাভ অসম্ভব। শাস্ত্রে পূর্বোল্লিখিত বহুবিধ আসনের বর্ণনা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে যে আসনে বসলে সুখে ও আরামে বসতে পারবে, স্থির হয়ে বসতে পারবে, হাঁটু কন্‌কন্‌, কোমরব্যথা ইত্যাদি কোনরকম কষ্ট হবে না, মন ব্যথার স্থানে দেহের বিশেষ জায়গায় নেমে আসবে না, চঞ্চলতা জাগবে না, সেইরকম সুখকর আরামপ্রদ অবস্থাতে বসবে, এমন কি শবাসনে বা অন্য কোন posture এ শুয়ে শুয়েও আত্মধ্যান করতে পার। যোগসাধনে কোন Mechanical process অবলম্বনের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। শাস্ত্রের বিধান —

সুখেনৈব ভবেদ্ যস্মিন্ অজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্ বিজানীয়াৎ অন্যে তু সুখনাশকম্॥

— অর্থাৎ যে ভাবে বসলে অনায়াসে ব্রহ্মচিন্তা করা যায়, তাই আসন পদবাচ্য, তা ভিন্ন অন্য সকলই সুখনাশক।

আসনের স্থান নির্বাচন নিয়েও অনেকের মধ্যে বিচিত্র ধারণা রয়েছে কিন্তু ব্রহ্মসূত্রে বেদব্যাস স্পষ্টভাবে নির্দেশ দিয়েছেন — যত্রৈকাগ্রতা তত্রাবিশেষাৎ — অর্থাৎ যেখানে ও যেভাবে বসলে মনের একাগ্রতা সাধনের সুবিধা হয়, সেই স্থানেই আসন করবে।

এইভাবে যথোক্ত আসনে বসেও যদি দেখেন চিত্ত স্থির হচ্ছে না, মনের চঞ্চলতা যাচ্ছে না, তাহলে পাতঞ্জল যোগদর্শনোক্ত প্রযত্নশৈথিল্য ও অনন্তসমাপত্তিরূপ উপায় অবলম্বন করবে —

(সাধনপাদ, ৪৭)
প্রযত্নশৈথিল্যানন্তসমাপত্তিভ্যাম্॥

(ক) প্রযত্নশৈথিল্য — প্রযত্নশৈথিল্য শব্দের মর্ম গা-ছাড়া ভাব, সতত কর্মোন্মুখ অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ইন্দ্রিয়াদিকে শিথিল করা, আমি দেহ নই, দেহ আমার নয়, এইরকম ভাব আনা। দেহ এবং আত্মা পরস্পর পৃথক, এই জ্ঞান

চিন্তার দ্বারা দৃঢ় করতে পারলেই এটি সম্ভব। মৃত্যুর সঙ্গে যা দেহ হতে উৎক্রান্ত হয়ে যায় এবং যা উৎক্রান্ত হলে প্রিয়জন শোকে হাহাকার করতে করতে দেহটাকে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে দাহ বা সমাধিস্থ করতে বাধ্য হয়, সেই 'আমি' দেহের মধ্যে আছে কিন্তু আমি দেহ নই, মনে মনে এই ভাবনা করতে করতেই প্রযত্ন শৈথিল্য আসে।

(খ) অনন্তসমাপত্তি — অনন্তসমাপত্তি শব্দের অর্থ অসীমভাব প্রাপ্তি। 'আমার শরীর শূণ্যবৎ হয়ে আনন্দ আকাশে মিলে গেছে, আমি আকাশবৎ শূন্য' ইত্যাকার ভাবনাকে অনন্তসমাপত্তি বলে কারণ এইরূপ ভাবনা দ্বারা অনন্তকে সমাপত্তি অর্থাৎ সম্যক প্রাপ্তি ঘটে। সাধক অনন্ত ভাবতে ভাবতে খণ্ডিত সকল বস্তুর কথা ভুলে যায় তখন আর পরিচ্ছিন্ন দেহের দিকে মন থাকে না।

আসন প্রতিষ্ঠার এই দুইটিই লক্ষণ — এই দুটি উপায় মন জয় করার অমোঘ পদ্ধতিও বটে। আসন প্রতিষ্ঠা হলে এ দুটি লক্ষণ প্রকাশ পাবেই, এই হল পতঞ্জলির অভিমত। কাজেই আসনসিদ্ধির এই লক্ষণ বিচারেই আশা করি বুঝতে পারছ যে অন্ধপরম্পরাক্রমে কতকগুলি কসরৎ কোনমতেই pose posture এর উপর নির্ভর করে না।

আসন শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং পূজাকালে অবশ্য অনুষ্ঠেয় বহু প্রসিদ্ধ আসনশুদ্ধির মন্ত্র বিচার করলেও আমার বক্তব্যই প্রতিপন্ন হবে। আসন শব্দ আস্ ধাতু হতে নিষ্পন্ন। আস্ ধাতুর অর্থ — উপবেশন, অবস্থান। কাজেই আসনের অর্থ স্থিরভাবে উপবেশন বা অবস্থান। শরীর মনে যেন কোনরূপ চঞ্চলতা না আসে। এটি কি করে সম্ভব? কি করলে আসন স্থির হবে? স্থিরতা কে দিতে পারে? যিনি স্বয়ং স্থির, তিনিই স্থিরতা দিতে পারেন, যে স্বয়ং চঞ্চল সে অন্যকে কিভাবে স্থিরতা দিবেন? ব্রহ্মই স্থির পদার্থ, দৃশ্যমান সকল পদার্থই ত নিত্য চঞ্চল। কিন্তু এই ব্রহ্মশক্তিকে ত প্রাথমিক অবস্থাতে সাধক দেখতে পান না, তবে কার কাছে তিনি স্থিরতা প্রার্থনা করবেন? সাধক একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবেন পৃথিবীর উপর কত বস্তুই না চলিষ্ণু কিন্তু তার মধ্যেও সকলকে বুকে ধারণ করে পৃথিবীই স্থির আছেন। এই জন্য পূজার পূর্বে আসনশুদ্ধির উপর ঋষিরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছেন এবং গভীর ভাবোদ্দীপক একটি মন্ত্র রচনা করেছেন —

পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥

এই মন্ত্র কেবল তোতাপাখীর মত আওড়িয়ে একটা ফুল আসনের উপর ছুঁড়ে দিলেই চলবে না, গভীর ভাবে ভাবতে হবে যে, সত্যিই ত পৃথিবীই একমাত্র আমার বা সকল বস্তুর আধার। যা সকলকে ধারণ করে রাখে তার উপরই ত আমার আসন হয়। ভূঃ বা পৃথিবীই সকলকে ধারণ করে রাখে (ধৃতা লোকা)। স্বর্গেও 'ভূঃ' আছে, ভুবর্লোকেও 'ভূঃ' আছে। ধারণশক্তিরই অপর নাম 'ভূঃ'। একটি আধ্যাত্মিক তত্ত্বের দ্বারা আমি তোমাদের তা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

মূলাধারাদি চক্র এক একটি শক্তি বা তত্ত্বের বাচক। মূলাধার কি? পৃথিবী তত্ত্ব। তার উপর জল তত্ত্ব তার উপর অগ্নি তত্ত্ব, তার উপর বায়ু তত্ত্ব, তার উপর আকাশ তত্ত্ব। শ্রুতি বলেছেন — আত্মা হতে আকাশ, আকাশ হতে বায়ু, বায়ু হতে তেজঃ (অগ্নি), তেজ হতে জল এবং জল হতে পৃথিবীর উৎপত্তি। এইভাবে প্রকৃতির পরিণামটি যদি চিন্তা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে সকলের শেষ পরিণাম — পৃথিবী। যে পরিণামের পরে বা নিম্নে আর কোন পরিণাম নাই, তাই সকলের আধার। মন্ত্রের প্রথমাংশে বলা হয়েছে — 'হে পৃথিবী, তুমি সকলকে ধারণ করে আছ'। এ শুনে মনে হবে, শক্তিটা পৃথিবীরই, ব্রহ্মের কিছু নয়। যাতে এই ভ্রম না হয়, এজন্য শেষে আবার বলছেন — 'দেবি, ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা'। যে যে — শক্তি দ্বারাই ধৃত হয়ে থাকুক, সকলের মূল আধার-শক্তি হচ্ছে বিষ্ণুর সন্ধারণশক্তি। বিষ্ণুর অর্থ ব্যাপ্নোতি ইতি — সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে, এই ব্রহ্মচৈতন্যই প্রকৃত আসন।

মন্ত্রটির অর্থ আর একটি ব্যাপকভাবে মনন করা যাক্। প্রার্থনায় বলা হয়েছে — 'তুমি আমাকে নিত্য ধারণ করে রাখ, আমার যেন দেহে মনে চাঞ্চল্য না দেখা দেয়, আমি যেন ধ্রুব হয়ে যাই, মৃত্যু না হয়, যেন অমরত্ব লাভ করি। কোনমতেই আমার যেন ধ্রুবত্ব নষ্ট না হয়, মরণ বা চঞ্চলতার অধীন আমি যেন না হই। স্বরূপতঃ আমি বিষ্ণুশক্তি, আমার যেন আসনচ্যুতি না ঘটে!

মন্ত্রোদ্দিষ্ঠ ভাব-বিশ্লেষণ হতে আশা করি এখন বুঝতে পারছ যে আসন হল এক বিশেষ ধরণের চিদ্‌ভাবনা

— যে চিদ্‌ভাবনা হতে স্থৈর্য ও সুখ উৎপন্ন হয়।

এই নিগূঢ় ভাব মনে রেখেই মহাযোগী পতঞ্জলি আসনের সংজ্ঞা দিয়েছেন — স্থিরসুখমাসনম্ (সাধনপাদ, ৪৬) অর্থাৎ যাতে চিত্তের স্থিরতা এবং সুখলাভ হয়। বলা বাহুল্য, চিত্তের স্থিরতা ও ভাব বিশেষ কোন অঙ্গ ভঙ্গিমার উপর নির্ভর করে না। পদ্মাসন, সিদ্ধাসন, স্বস্তিকাসন, বজ্রাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, কাকাসন, বীরাসনাদিতে মুদ্রিত চোখে বসে থেকে কারও মন যদি বিষয়ভোগে আসক্ত ও চঞ্চল হয়ে বাইরে ভ্রমণ করে থাকে, তাহলে তার ঐ সব তথাকথিত যৌগিক আসনে কি লাভ হবে?

আসন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। কেউ একবারও ভেবে দেখে না, ঐ সব আসনে বসে 'সমকায়শিরোগ্রীবঃ' না হলে যদি যোগসিদ্ধি না ঘটে, তাহলে ঋষি অষ্টাবক্র যাঁর দেহে আটটি বাঁক ছিল, তাঁর কি তাহলে মুক্তি হয় নি? অনেক অনেক বৃদ্ধ মহাত্মাকে দেখা গেছে বয়সের ভারে তাঁরা কুব্জ পৃষ্ঠ ন্যুজ দেহ হয়ে পড়েন। যেহেতু সে সময় তাঁর ঐ সব তথাকথিত যৌগিক আসনাদিতে বসবার সামর্থ্য থাকে না, এজন্য কি তাঁদের আত্মার উৎক্রমণ ঘটবে না? মৃত্যুকালে মানুষ বসে থাকুক, শুয়ে থাকুক, কিংবা তার দেহ আঁকা বাঁকা কুঁকড়ানো যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন, তার যখন মৃত্যু হয় অর্থাৎ লিঙ্গদেহকে আশ্রয় করে আত্মার এই স্থূল অন্নময়কোষ ত্যাগ করতে যেমন কোন বাধা হয় না, তেমনি যোগী যে কোন অবস্থাতেই থাকুন না কেন তাঁর দেহত্যাগে তথা অনন্তে মিলিত হওয়ার পথে দেহের স্থিতি বা ভঙ্গী কোন বাধা হতে পারে না। সময়কায়শিরোগ্রীবঃ বা আসনবদ্ধ না হয়েও যখন চিৎক্ষেত্রে সূক্ষ্মচিন্তা ও প্রজ্ঞার সাহায্যে বিজ্ঞান বা দর্শনের জটিল সমাধান সম্ভব হয় তেমনি চিদ্‌ভাবনার দ্বারাও চিত্তে সুখ ও স্থৈর্যলাভ তথা অনন্তে বিশ্রান্তি ও পর্যাবসান সম্ভব। আসনের মূল রহস্যই হল পরমাত্মার সন্নিহিত হওয়া, পরমাত্মাই সুখস্বরূপ, একমাত্র তাঁতে অধিষ্ঠিত হলে তবেই বৈষম্যের ইতি হয়, অনন্ত স্থৈর্য, প্রশান্তি এবং সামরস্য লাভ হয়।

যথা সমুদ্রং সমবাপ্য নদ্যঃ প্রশান্তকল্লোলরয়া ভবন্তি।
ভূতেন্দ্রিয়াণি তথৈব আত্মনি বিকারমুক্তানি লভন্তে শান্তিম্॥

— নদীসকল যেমন মহাসাগরে মিলিত হয়ে তরঙ্গ ও কোলাহল হতে মুক্ত হয়, তেমনি পঞ্চমহাভূত এবং ইন্দ্রিয়াদি যাবতীয় বিকার হতে মুক্ত হয়ে আত্মক্ষেত্রে মিলিত হলে তবেই অনন্ত শান্তিলাভ করে। মহাসাগর যেমন নদীগুলির লয় ও স্থৈর্যের ক্ষেত্র অর্থাৎ যথার্থ আসন পদবাচ্য তেমনি বেদান্ত-যোগীর কাছে জ্যোতিঃস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ পরমাত্মাই মূল আসন — যথার্থ আসন। অন্য আসন বিড়ম্বনা মাত্র।

প্রাণায়ামের প্রহেলিকা ভেদ ঃ — জ্ঞানমার্গীর দৃষ্টিতে প্রাণায়াম পদ্ধতি স্বতন্ত্র। কামারের ভস্ত্রার মত বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগকে বেদান্তযোগী কোনমতেই প্রাণায়াম বলে মনে করেন না। প্রাণায়াম শব্দের অর্থ প্রাণের অয়মন্ বা বিস্তার। চিৎএর অবস্পন্দনের ধারাই প্রাণ। অবরোহের পথে চিৎধারার যে বক্রগতি দেহস্থিত আবেষ্টনীর মধ্যে আমরা সতত উপলব্ধি করি তার আমরা নাম দিয়েছি প্রাণশক্তি (Pranic Current)। এটি প্রাণের সঙ্কোচন অবস্থা। এই প্রাণধারা যখন আরোহের পথে অবস্পন্দনের দোষমুক্ত হয় এবং বক্রগতি ত্যাগ করে তার আন্তররূপ চিৎশক্তির সঙ্গে এক হয়ে যায়, তখন তাকেই বলা হয় — প্রাণের বিস্তারলাভ। প্রাণের এই ঊর্ধ্বগতি, বোধির আলো না পড়লে সম্ভব হয় না। তাই বেদান্তযোগী ১৬, ৩২, ৬৪ ক্রমে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে শুধু শ্বাসপ্রশ্বাসের ক্রিয়াকে প্রাণায়াম বলে ভাবেন না।

বর্তমান সাধক সমাজে প্রচলিত যে প্রাণায়াম বিধি, তাতে রেচক, পূরক ও কুম্ভক অভ্যাস করতে হয়। নাসিকা দ্বারা প্রাণবায়ুকে অন্তরে আকর্ষণ করার নাম পূরক, যতক্ষণ পারা যায় ততক্ষণ সেই বায়ুকে ভিতরে বিশেষতঃ মস্তকে অবরুদ্ধ করে রাখার নাম কুম্ভক এবং পরে তা নাসিকা দ্বারা ত্যাগ করার নাম রেচক। সাধারণ যোগীরা ভ্রমবশতঃ শ্বাসবায়ুর ঐ রকম রেচক পূরক কুম্ভককেই প্রাণায়াম বলে মনে করেন। তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না যে, মানুষের শরীরে বায়ু ও রক্তের যে চলাচল ক্রিয়া তা প্রাকৃতিক নিয়ম, স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে তার গতিরোধ করতে নাই — করলে শরীর ব্যাধির আকর হয়। পরিণামে মস্তিষ্ক ও হৃদযন্ত্রে নানা উৎকট ব্যাধি যথা — উন্মাদরোগ, যক্ষ্মা, হাঁপানী প্রভৃতির আক্রমণ তথাকথিত প্রাণায়ামভ্যাসী কত 'যোগীর' জীবনই যে এভাবে বিড়ম্বিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নাই।

প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টিতে রেচক পূরক কুম্ভকের অর্থ হল — মন যখন বহির্মুখী ও বিক্ষিপ্ত থাকে এবং এই

প্রপঞ্চকেই সত্য বলে মনে করে তখন সেই অবস্থার নাম রেচক। বহির্মুখী জীবমাত্রই সাধারণতঃ এই রেচক অবস্থাতেই আছে। এটি বদ্ধ অবস্থা। সাধক যখন মনকে নানা নামরূপ হতে গুটিয়ে এনে পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ আত্মাতে সংযুক্ত করতে পারেন, তখন সেটি পূরক অবস্থা। আর, তীব্র সাধন বলে পরমাত্মার সঙ্গে যখন অভেদ জ্ঞান জন্মে, তখন তা কুম্ভকের অবস্থা। অর্থাৎ অজ্ঞান অবস্থার নাম রেচক, জ্ঞান অবস্থার নাম পূরক এবং স্বরূপ অবস্থার নাম কুম্ভক। জীবভূমি হতে বিচার করলে জীবের স্বপ্নাবস্থা রেচক, জাগ্রৎ অবস্থা পূরক এবং সুষুপ্তি অবস্থার নাম কুম্ভক। ঐ একই তত্ত্ব পরাবর দৃষ্টিতে বিচার করলে বলতে হয় — পরব্রহ্ম যখন আপন ইচ্ছানুসারে (একোহহং বহুস্যাম প্রজায়েয় ইত্যাদি) নিরাকার অবস্থা থেকে সাকার বিরাটস্বরূপ নাম রূপে বিস্তার হন, তখন সেই অবস্থার নাম রেচক, যখন পরমাত্মা নাম রূপকে ত্যাগ করে (নামরূপং বিহায়), নাম রূপের আধার এই জগৎকে সঙ্কোচ করে আপনার স্বরূপ কারণে লয় ঘটাতে প্রবৃত্ত হন, তখন তা পূরক এবং যখন তিনি স্বয়ং কারণরূপে কারণেই থাকেন, থাকেন 'স্বে মহিম্নি' — তখন তা কুম্ভকের অবস্থা।

জ্ঞানযোগী ব্যুত্থানের পর বাইরে দৃষ্টি মেলে যখন বিচারবলে বুঝতে পারেন যে, আমি আত্মস্বরূপ, আত্মারূপে আমিই সর্বত্র বিরাজিত ও ব্যাপ্ত, যৎ যৎ বস্তুতে দৃষ্টি পড়ছে তৎ সমুদয়ই আমারই প্রকাশ — বিকাশ, তখন, তাঁর রেচকের অবস্থা বাইরের দৃষ্টি গুটিয়ে যখন তিনি অন্তরের দিকে স্বস্বরূপে দৃষ্টি মেলেন, তখন তা পূরকের অবস্থা। আর যখন সেই অবস্থায় অস্মিতা বোধের লয় ঘটে, পূর্ণতঃ নিজেতে নিজে রমণ করেন অর্থাৎ যখন রেচকও নাই, পূরকও নাই — সম্পূর্ণভাবে যেটি লয় ও নির্বাণের অবস্থা, তখন সেই স্থিতিটির নাম কুম্ভক। এই হল প্রকৃত প্রাণায়াম তথা রেচক-পূরক-কুম্ভকের নিগূঢ় রহস্য। পাতঞ্জল যোগদর্শনের কয়েকটি সূত্র আলোচনা করলেই বুঝতে পারবে, প্রাণায়ামের এই ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ভগবান পতঞ্জলি দ্বারাও স্বীকৃত। তাঁর মতে প্রাণায়ামের বিধি ঃ

প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাম্ বা প্রাণস্য॥ (সমাধিপাদ, ৩৪)

তথাকথিত সাংখ্যযোগাচার্য এই মন্ত্রের ভাষ্যানুবাদ ও টীকা করেছেন — 'অভ্যন্তরের বায়ুকে নাসিকাপুট দ্বারা প্রযত্ন বিশেষের সহিত বমন করা প্রচ্ছর্দ্দন। পরে রেচিত হলে বায়ুগ্রহণ না করে যথাসাধ্য সেইরূপ স্থির শূণ্যবৎভাবে অবস্থান করাই বিধারণ। এর দ্বারাও মনের স্থিতি সম্পাদন করা যেতে পারে।' এক বিখ্যাত বেদভাষ্যকার এই মন্ত্রের অর্থ করেছেন — 'অত্যন্ত বেগের সহিত বমন হলে যেমন অন্নজল বের হয়ে যায় সেইরূপ বলপূর্বক প্রাণকে বহির্নিক্ষিপ্ত করে যথাশক্তি বাইরেই নিরুদ্ধ করবে। যখন বাহির হতে ইচ্ছা করবে তখন মূলেন্দ্রিয়কে উর্ধ্বদিকে আকর্ষণ করে রাখবে। ততক্ষণ পর্যন্ত প্রাণ বাইরে থাকবে। এইরূপে প্রাণ অধিক সময় বাইরে থাকতে সমর্থ হবে। যখন অস্থিরতা আসবে তখন ধীরে ধীরে বায়ুকে ভিতরে এনে পুনরায় সামর্থ্য ও ইচ্ছানুসারে সেইরূপ করতে থাকবে এবং মনে মনে ওঙ্কার জপ করতে থাকবে। এইরূপ করলে আত্মা ও মন পবিত্র ও স্থির হবে। প্রথমতঃ 'বাহ্যবিষয়ক' অর্থাৎ প্রাণকে বহুক্ষণ বাইরেই নিরোধ করা, দ্বিতীয়তঃ 'আভ্যন্তর' অর্থাৎ প্রাণকে ভিতরে যতক্ষণ নিরোধ করা যায়, ততক্ষণ নিরোধ করা; তৃতীয়তঃ 'স্তম্ভবৃত্তি' অর্থাৎ একসঙ্গেই যে স্থানের প্রাণ সেই স্থানে যথাশক্তি রোধ করা; চতুর্থতঃ 'বাহ্যান্তরক্ষেপী' অর্থাৎ যখন প্রাণ ভিতর হতে বহির্গত হতে থাকে তখন তার বিরুদ্ধে তাকে বাহির হতে না দিয়ে, বাহির হতে ভিতরে আনবে। যখন প্রাণ বাহির হতে ভিতরে আসতে আরম্ভ করবে তখন তাকে বাহির হতে ভিতরের দিকে ধাক্কা দিয়া রোধ করতে থাকবে। এইরূপে একের বিরুদ্ধে অন্যের ক্রিয়া করলে, উভয়ের গতি রুদ্ধ হওয়াতে প্রাণ নিজ বশে আসবে এবং মন ও ইন্দ্রিয়ও নিজের অধীন হবে। তাতে বল ও পুরুষকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় বুদ্ধি তীব্র ও সূক্ষ্মরূপ হয় এবং অত্যন্ত কঠিন ও সূক্ষ্ম বিষয় শীঘ্র গ্রহণ করতে পারে। এতে মানব শাস্ত্র বুঝে আয়ত্ত করবার সামর্থ্য জন্মে।'

বলা বাহুল্য, যোগদর্শনের এই সূত্র ব্যাখ্যায় সাংখ্যযোগাচার্য এবং বেদভাষ্যকার উভয়েই স্থূল শ্বাসবায়ুর ক্রিয়ার দিকে লক্ষ্য রেখেছেন, ফলে ঐ রকম স্থূল ব্যাখ্যায় ভগবান পতঞ্জলির হৃদ্‌গত আশয় যথার্থতঃ অভিব্যক্ত হয় নি। এখানে ঋষি বলছেন — প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ করতে হবে। প্রচ্ছর্দ্দন শব্দের অর্থ বমন। কিন্তু তা বমনক্রিয়ার মত 'প্রাণকে' অর্থাৎ শ্বাসবায়ুকে 'বহির্নিক্ষিপ্ত করে যথাশক্তি বাইরেই নিরুদ্ধ করা' নয়। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বাহ্যবস্তু সমূহে আপন প্রাণসত্তার অনুভব। অন্তরে যিনি প্রাণরূপে, প্রত্যক্ চৈতন্যরূপে প্রতিনিয়ত অনুভবযোগ্য হচ্ছেন, তিনিই বাইরে দৃশ্য রূপে, জ্ঞেয় রূপে পরিদৃশ্যমান হয়ে রয়েছেন

— এইরকম প্রত্যক্ষ অনুভূতি ও সম্বেদনের নাম 'প্রচ্ছর্দ্দন'। আর 'বিধারণ' শব্দের অর্থ বিশেষভাবে ধারণ করা, অনুভব করা। এটিও অন্তরের ক্রিয়া। কাম ক্রোধাদি বৃত্তি রূপে কিংবা ভাব সংকল্প প্রভৃতির আকারে যা প্রকাশ পায় তা যে প্রাণই, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ চৈতন্য অন্য কিছু নয় — জ্ঞানবিচারের দ্বারা ('দৃষ্টি জ্ঞানময়ীং কৃত্বা') এইরকম পুনঃ পুনঃ অনুভব করাকেই বিধারণ বলে। সূত্রে বা শব্দের অর্থ এব অর্থাৎ নিশ্চয়ই। এইরকম ভাবে প্রাণের প্রচ্ছর্দ্দন ও বিধারণ দ্বারা নিশ্চয়ই বিষয়বতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হয়। রূপ রসাদি বিষয়কে অবলম্বন করে যে বৃত্তি উৎপন্ন হয় তার নাম বিষয়বতী প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তির অর্থ শব্দ স্পর্শাদি বিষয়ে প্রকৃষ্টা সূক্ষ্ম বৃত্তি। এ সম্বন্ধে বিশদ করে বুঝানোর জন্য পরবর্তী সূত্রে ঋষি বলেছেন,

বিষয়াবতী বা প্রবৃত্তিরূৎপন্না মনসঃ স্থিতিনিবন্ধনী।' (সমাধিপাদ, ৩৫)

মন্ত্রের সরল অর্থ — বিষয়াবতী প্রবৃত্তি উৎপন্ন হলে চিত্ত নিশ্চয়ই স্থিতিপদ লাভ করে। সূত্রটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল — মনে কর তোমরা একটি ফুল দেখেছ, ফুলে যদি প্রাণের পূর্বকথিত প্রচ্ছর্দ্দন করতে থাক তাহলে কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করতে পারবে যে ফুল বলে কোন পৃথক বস্তু ওখানে নাই। তোমাদের প্রাণই অর্থাৎ 'আমিই' ফুল আকারে প্রকাশ পাচ্ছে। যে 'আমি' ফুলের দ্রষ্টা হয়ে বাইরে দৃশ্য রূপে ফুলকে নিতান্ত পৃথক বস্তু রূপে দর্শন করছিল, সেই 'আমিই' — সেই প্রত্যক্ চৈতন্যই ঐ ফুলের আকারে আকারিত হয়ে রয়েছে। এইরকম যে প্রত্যক্ষ অনুভূতি তারই নাম প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির উদয় হলেই যতক্ষণ যে বিষয়ে মন সংযুক্ত রাখতে ইচ্ছা ততক্ষণ সেই বিষয়ে মন লাগিয়ে রাখা যায়। ফলে ক্রমে চিত্তের স্থৈর্য লাভ হয়। চিত্তস্থৈর্য লাভ করলে আর কি বিশেষ লাভ হয়? ঋষি পরবর্তী সূত্রে বলেছেন —

বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী। (সমাধিপাদ, ৩৬)

অর্থাৎ তখন বুদ্ধি বিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে 'বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতী প্রজ্ঞাতে পরিণত হয়। বুদ্ধিসত্ত্ব জ্যোতির্ময় আকাশকল্প। বুদ্ধিসত্ত্বকেও প্রাণের প্রকাশ বলে অনুভব করতে পারলে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়ে সংবিদে পরিণত হয়। অনুভূত হয় যে ঐ সংবিদের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে 'আমিও' বর্তমান। তখন আর ব্রহ্মবিয়োগজনিত দুঃখ শোক থাকে না, মন অনাবিল, অনাস্বাদিত আনন্দরসে পূর্ণ হয়ে উঠে। তাই ঐ বুদ্ধিসত্ত্বের নাম — বিশোকা। এই সময় ব্রহ্মের জ্যোতির্ময় প্রকাশসত্তা ধারণা করার ক্ষমতা জন্মায়। তখন যে জ্যোতির প্রকাশ ঘটে, সেই জ্যোতিঃ তেজ নয়, তা সূক্ষ্ম বিষয়ের প্রকাশকারী অপরিমেয় জ্ঞানলোক, জ্ঞানালোকের আতিশয্য হেতুই ঋষি ঐ সাত্ত্বিক প্রকাশের নামকরণ করেছেন — জ্যোতিষ্মতী।

এই ব্যাখ্যা থেকে আশা করি বুঝতে পারছ যে, ব্রহ্মকে ধারণা করার উপযোগী সংবিদের প্রকাশ যে প্রাণায়ামের ফল, তা নিশ্চয়ই স্থূল শ্বাসবায়ুর ক্রিয়া নয়।

পরবর্তী অধ্যায়ে অর্থাৎ সাধনপাদে ভগবান পতঞ্জলি এই বিষয়টি আরও স্পষ্টীভূত করেছেন। প্রাণায়ামের সংজ্ঞা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঋষি বলেছেন —

তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ॥ (সাধনপাদ, ৪৯)

যথারীতি সেই সাংখ্যযোগাচার্য্য এই সূত্রের অর্থ করে বসেছেন — 'বায়ুর শ্বাসরূপ যে আভ্যন্তরীণ গতি এবং প্রশ্বাসরূপ যে বহির্গতি তার বিচ্ছেদই প্রাণায়াম অর্থাৎ শ্বাসগতি ও প্রশ্বাসগতি রোধ করাই প্রাণায়াম'।

কিন্তু তাকে পতঞ্জলির উপলব্ধ সূত্রানুযায়ী বলে গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা, সূত্রটির সরল অর্থ — তস্মিন্ সতি অর্থাৎ তাহা হলে। কি হলে? আলোচ্য সূত্রের পূর্ববর্তী ৪৬ ও ৪৭ সূত্রে ঋষি আসন কি এবং কিভাবে আসনসিদ্ধি হয় তা ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে তারই প্রসঙ্গ টেনে বলছেন — 'তাহা হলে অর্থাৎ আসন জয় হলে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিবিচ্ছেদরূপ ব্যাপারটি কি তার সন্ধান নেওয়া যাক্। এ কথা সবাই জানে যে প্রাণের স্থূল প্রকাশ হল শ্বাসপ্রশ্বাস, নাসিকাপথে তা নিয়ত যাতায়াত করছে। যে উৎস থেকে শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ত গমনাগমন করছে সেই উৎসই তার এমন একটি 'জংশন' যেখানে পৌঁছলে উভয়ের গতিবিচ্ছেদ হয়। যোগী মাত্রেই জানেন সেটি হল ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থান। সেখানে মন লগ্ন হলে স্বতঃই *চিতিশক্তির দীপ্তি প্রকট হয় এবং

* চিতিশক্তি — যোগশাস্ত্রে চিতিশক্তির পাঁচটি বিশ্লেষণ দেওয়া আছে। যথা - শুদ্ধা, অনন্তা, অপরিণামিনী, অপ্রতিসংক্রমা ও দর্শিত বিষয়া। শুদ্ধা অর্থাৎ তা গুণত্রয়ের মত আবরণশীল, চলনশীল বা প্রকাশশীল নয়। অনন্তার অর্থ চিতিশক্তি পূর্ণ অখণ্ড ও স্বপ্রকাশ। অপরিণামিনী অর্থাৎ বিকারশূন্যা। দর্শিত বিষয়া = বিষয় সকল যার নিকট বুদ্ধির দ্বারা দর্শিত হয় অর্থাৎ যার সত্তায় চেতনবতী হয়ে বুদ্ধিস্থ বিষয়ে সকলের সম্বেদন হয়। বিষয় সকল প্রকাশিত হয় বলে যে সেই স্বপ্রকাশ শক্তি কিছুমাত্র বিকৃত হয় তা নয়। এইজন্য বলা হয়েছে 'অপ্রতিসংক্রমা' অর্থাৎ প্রতিসংক্রম (বিষয়ে সংক্রান্ত হওয়া) শূন্য অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়া ও নির্লিপ্তা।

তখন শ্বাস প্রশ্বাসের যে স্বাভাবিক গতি তা নিরুদ্ধ হয়ে যায়। ৪৮ নং সূত্রে ঋষি দেখিয়েছেন যে দ্বন্দ্বাতীত বস্তুর সমীপস্থ হলে (যা প্রকৃত আসন পদবাচ্য) তবেই শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বন্দ্ব বা বৈষম্য কেন, সুখ দুঃখ, শীত উষ্ণ প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির যাবতীয় দ্বন্দ্বকে জয় করা যায়। সে অবস্থা জ্ঞানময় দৃষ্টিতে বিচার, মনন ও নিদিধ্যাসনের দ্বারাই সম্ভব, বাহ্য পদ্ধতিতে, কোন কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসপ্রশ্বাসকে নিয়মিত বা নিরুদ্ধ করতে সেজন্য গলদঘর্ম হওয়ার প্রয়োজন নাই। ৪৭ নং সূত্রের মূলমন্ত্রে ঋষি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন, আমিও ইতিপূর্বে আসন বিচার প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছি যে চিত্তের অনন্ত সমাপত্তি আসনসিদ্ধির লক্ষণ। এই অনন্ত সমাপন্ন চিত্ত হতেই প্রাণের আয়াম বা প্রসারতা জন্মায়। এই অবস্থায় পূর্বোক্ত প্রচ্ছর্দ্দন - বিধারণ রূপ প্রক্রিয়া প্রভাবে প্রাণের মহাপ্রসার উপলব্ধি যোগ্য হতে থাকে। সাধারণতঃ প্রাণ বলতে যে কেবল হৃদয়দেশে (ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে, আজ্ঞাক্ষেত্র) অনুভবযোগ্য একটুখানি অজ্ঞেয় বস্তুমাত্রের ধারণা হয় তা তখন দূর হয়ে যায়, তখন প্রাণই যে বিশ্বময় পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে তা অনুভব হতে থাকে। যোগের পরিভাষায় একেই বলা হয় প্রাণময় গ্রন্থিভেদ। প্রাণময় গ্রন্থিভেদ হলেই অন্তর বাহির পরিপূর্ণকারী অখণ্ড প্রাণসত্তার অনুভূতি জাগে। এইটাই যথার্থ প্রাণায়ামের অবস্থা। শ্রদ্ধাপ্লুত অন্তরে একনিষ্ঠ হয়ে একাগ্রচিত্তে পুনঃ পুনঃ প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণ রূপ কৌশলের সাহায্যে প্রাণের প্রসারতা ধারণা করার জন্য চেষ্টা করতে করতেই প্রাণায়াম স্বতঃই উপস্থিত হয়। এই রকম প্রাণায়ামই প্রাণায়াম।

যোগীশ্বর পতঞ্জলি প্রাণায়ামকে বিভিন্ন অবস্থানুসারে তিনটি প্রধান ভাগে এবং তিনটি উপবিভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রধান বিভাগ ঃ ১) বাহ্যবৃত্তিরূপ প্রাণায়াম, ২) আভ্যন্তর প্রাণায়াম ৩) স্তম্ভবৃত্তিরূপ প্রাণায়াম। অপ্রধান বিভাগ ঃ ১) দেশবৃত্তিরূপ প্রাণায়াম, ২) কালবৃত্তিরূপ প্রাণায়াম ৩) সংখ্যাবৃত্তিরূপ প্রাণায়াম।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ॥ (সাধনপাদ, ৫০)

বাহ্যবিষয়ে রূপ রসাদি গ্রাহ্য পদার্থ সমূহে যখন প্রাণের অনুভব হতে থাকে তখন তার নাম বাহ্যবৃত্তি। সমাধিপাদের ৩৪ সূত্রে এরই নামান্তর — প্রচ্ছর্দ্দন। এটি আরম্ভ হওয়ার পর অন্তরপথে যখন নানাবিধ ভাবের আলপনা, কল্পনা এবং কামক্রোধাদি বৃত্তির মধ্যেও প্রাণের অনুভব হতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় আভ্যন্তর বৃত্তি। তারপর যখন এই উভয়বিধ বৃত্তি পরিত্যাগ করে কেবল প্রাণসত্তাই অনুভূত হতে থাকে, তখন তার নাম স্তম্ভবৃত্তি।

অর্বাচীন যোগশাস্ত্রে ঐ বাহ্য, আভ্যন্তর ও স্তম্ভবৃত্তিকেই রেচক পূরক ও কুম্ভক নামে অভিহিত করা হয়েছে। হিরণ্যগর্ভ * হতে পতঞ্জলি পর্যন্ত সুপ্রাচীন ঋষি মুনি, যোগীশ্বর এবং দার্শনিকরা শ্বাসবায়ুর নানাবিধ কসরৎ তথা 'নাক টেপা-টেপির' ব্যাপারকে যেমন প্রাণায়াম বলতেন না, তেমনি তার অঙ্গ রেচক পূরক কুম্ভক প্রভৃতি শব্দও তাঁরা কখনও ব্যবহার করেন নি। রেচক পূরক কুম্ভক শব্দগুলির উল্লেখ প্রাচীন যোগগ্রন্থগুলিতে কোথাও দেখা যায় না।

সে যাই হোক, প্রকৃত সাধক মাত্রেই প্রথম প্রথম ঐ বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি ও স্তম্ভবৃত্তিকে অবলম্বন করেই প্রাণায়াম অভ্যাস করতে থাকেন। পরে অভ্যাসের পরিপক্ক অবস্থায় দেশ কাল ও সংখ্যারূপ সূক্ষ্ম প্রাণায়াম উপস্থিত হতে থাকে। আমার প্রাণই অবকাশ রূপে এই দৃশ্যমান যাবতীয় পদার্থের আধার রূপে অবস্থান করছে, এই রকম অনুভবের নাম দেশবৃত্তি প্রাণায়াম। আমার প্রাণই অখণ্ড দণ্ডায়মান কাল রূপে জগদ্ব্যাপারের আধার রূপে অবস্থান করেছে এই রকম যখন অনুভূতি হয় তখন তার নাম কালবৃত্তি প্রাণায়াম। ঐ দেশ ও কালরূপ আধারে আধেয় রূপে অবস্থিত যে সকল পদার্থ বা ক্রিয়া সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করলেই যে এক, দুই তিন প্রভৃতি সংখ্যাবাচক প্রতীতি ফুটে ওঠে — তাও যে আমারই প্রাণ ছাড়া আর কিছু নয়, যখন এইরকম অনুভূতি জাগে তখন তার নাম সংখ্যাবৃত্তি প্রাণায়াম। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থূল পদার্থের চেয়ে যেহেতু এই দেশ কাল ও সংখ্যা অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম এবং এই অবস্থায় অখণ্ড প্রাণসত্তার অনুভব দীর্ঘকাল ধরে স্থায়ী হয় সেই জন্য

* হিরণ্যগর্ভ — বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি, ভারতীয় ঋষিসমাজে যোগের আদি উপদেষ্টা হিসাবে পূজিত। দক্ষমুনি বলেছেন — 'একমাত্র যোগের দ্বারাই তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়। জন্মান্ধ যেমন ঘটাদি পদার্থের চাক্ষুষ জ্ঞান পায় না, কুমারী যেমন স্ত্রী সুখ বুঝতে পারে না, সেইরকম অযোগীও স্বসংবেদ্য ব্রহ্মের বিষয় কিছুই জানতে পারে না। তাই জীবের মুক্তির উপায় হিসাবে পরম কারুণিক হিরণ্যগর্ভ পৃথিবীতে যোগপন্থার প্রবর্তনা করেছেন।' যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের মত অবশ্য অন্যরূপ। তাঁর মতে — পৃথিবীতে যোগ চিরবর্তমান, হিরণ্যগর্ভও যোগের অনুস্মারক ও বক্তা — 'হিরণ্যগর্ভো যোগস্য বক্তা নান্যঃ পুরাতনঃ।

শেষোক্ত তিনটি প্রাণায়ামকে 'দীর্ঘসূক্ষ্ম' নামে অভিহিত করা হয়।

উপরোক্ত বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি প্রভৃতি প্রত্যেকটির অনুষ্ঠানে যথার্থ প্রাণায়াম অর্থাৎ প্রাণারামে স্থিতির পথে উত্তরণ ঘটলেও মহর্ষি পতঞ্জলি বাহ্যান্তরক্ষেপী নামে আর একটি চতুর্থ প্রাণায়ামের মহত্তম অবস্থার কথাও উল্লেখ করেছেন —

বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়ক্ষেপী চতুর্থঃ॥ (সাধনপাদ, ৫১)

অর্বাচীন যোগীরা শ্বাসবায়ুর রেচক পূরক বিহীন যে নিরোধ অবস্থাকে আজকাল 'কেবলী কুম্ভক' বলে প্রচার করেন এবং তাঁদের অনুষ্ঠিত ঐ কেবলী কুম্ভককেই 'বাহ্যাভ্যন্তর ক্ষেপী প্রাণায়াম' মনে করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন, বলা বাহুল্য এ দুটি জিনিষ এক নয়। বাহ্যাভ্যন্তরক্ষেপী প্রাণায়াম কোনমতেই ক্রিয়াসাপেক্ষ নয়। এটি প্রাণপ্রতিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা, স্বতঃই উপস্থিত হয়; সেই অবস্থায় উপনীত হলে অনুভব করা যায় যে — 'শূন্যই আমার স্বরূপ, পূর্ণতাই আমার ধর্ম, সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিত হয়েও আমি সর্বেন্দ্রিসমন্বিত'।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্॥ (সাধনপাদ, ৫২)

তখন আত্মার উপর থেকে কর্মমল, মায়িকমল ও আণবমল প্রভৃতি যাবতীয় আবরণ ক্ষয় হয় — তখন চৈতন্যের শুভ্রজ্যোতির সতত প্রকাশ। প্রাণায়ামের চরম ফল এইটি। এইজন্যেই এই ধরণের জ্ঞানমূলক অন্তঃপ্রাণায়মকেই শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলা হয়। আপাতদৃষ্টিতে এই অন্তঃপ্রাণায়াম বিধিকেও ক্রিয়া বলে মনে হবে কিন্তু মনে রাখতে হবে এবম্বিধ ক্রিয়ার যে জ্ঞান হয়, সেই জ্ঞান অজ্ঞানকে নাশ করে।

এতক্ষণ ধরে প্রাণায়াম সম্বন্ধে যা আলোচনা করলাম তাতে আশা করি বুঝতে পারছ যে, প্রাণায়ামের মধ্যে প্রগাঢ় ধ্যানক্রিয়া মনন ও জ্ঞানবিচার ওতপ্রোতভাবে অনুস্যূত আছে। এ শুধু শ্বাস টানা ফেলা এবং রুদ্ধ করা নয়। মহাভারতে বেদব্যাস বলেছেন —

যদ্যদৃশ্যতে মুঞ্চন্ বৈ প্রাণান্মৈথিলসত্তম।
বাতাধিক্যং ভবত্যেব তস্মাত্তং ন সমাচরেৎ॥ (মোক্ষধর্ম, ৩১৬ অ)

অর্থাৎ ধ্যানশূন্য প্রাণায়াম করলে বায়ুর প্রকোপ ও চিত্তচাঞ্চল্য বাড়ে। অতএব মিথিলসত্তম, ঐরূপ অনুষ্ঠান করা উচিত নয়। 'শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ' — প্রাণকে শূন্যভাবে যুক্ত করবে। তীব্র ভাবনা দ্বারা শুধু প্রাণকেই অনুভব করার চেষ্টা করবে, আর কোন সংকল্প যেন না জাগে। তবেই স্থিতিলাভ করবে নচেৎ নয়।

'যোগদর্শন' অনুসারে চিত্তনাশের দুইটি উপায় — ১) বৃত্তিনিরোধ ২) তত্ত্বজ্ঞান। বৃত্তিনিরোধের দ্বারা মনের বিক্ষেপ শক্তিকে এবং তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিষয়ের অস্তিত্ববোধকে নষ্ট করতে হয়। এই দুটি উপায় এক সঙ্গে চালিত না হলে চিত্ত বিনাশ হয় না। একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যাক্। ভেবে দেখ শিশুকালে আমাদের প্রত্যেকেরই পুতুল খেলার ঝোঁক ছিল, পুতুলের উপর আস্তিক্যবুদ্ধি ছিল অর্থাৎ পুতুলগুলি সর্বাংশে মানুষেরই মত এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাই পুতুলকে খাওয়ানো, পুতুলকে ঘুম পাড়ানো, পুতুলকে নানা সাজে সাজিয়ে তার বিয়ে দেওয়া প্রভৃতি কত খেলাই না ছিল। তখন মা বাবা প্রভৃতি গুরুজনদের মধ্যে কেউ বাধা দিলে, আমাদের পুতল খেলায় কোন অরুচি হত কি? হত না। বাধা পেলে তখনকার মত খেলা বন্ধ করতে হত বটে কিন্তু মনে পুতুল খেলার তীব্র ইচ্ছা থাকায় তাঁরা আড়ালে হলেই তাঁদেরকে লুকিয়ে আবার খেলায় মত্ত হতাম। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পুতুলের উপর মনের আস্তিক্যবুদ্ধি থাকায় (মানুষ ও পুতুল সমকক্ষ এরূপ বোধ) কোন বাধাই শিশুকে খেলা হতে নিবৃত্ত করতে পারে না। পরে কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন বিচার করে বুঝতে শিখলাম যে পুতুল নিষ্প্রাণ পদার্থ, পুতুল খেলায় বৃথা সময় নষ্ট হয় ইত্যাদি বুদ্ধি জন্মাতে লাগল, পুতুল খেলায় আর মজা পেলাম না, পুতুল খেলা ত্যাগ করলাম। বাল্যে কৈশোরে যৌবনেও প্রত্যেকের মনে ব্যক্তিভেদে রুচিভেদে নানারকম ঝোঁক, প্রবৃত্তি, সখ ও সাধ জাগে। কিন্তু যখনই বিচারের দ্বারা সেগুলিকে অসার বলে মনে হয় তখন প্রত্যেকে তা ত্যাগ করে অর্থাৎ কিনা তৎ তৎ বিষয়ে নাস্তিক্যবুদ্ধি জাগবার পরেই সেই সব প্রবৃত্তির নাশপ্রাপ্ত হয়। ঠিক এই রকম যে পর্যন্ত আমাদের মনে প্রপঞ্চের অস্তিত্বে বিশ্বাস থাকবে সে পর্যন্ত মনের ভোগবাসনা কিছুতেই ঘুচবে না। তত্ত্ববিচার না করে শ্বাসবায়ুরোধ বা অন্য কোন ক্রিয়াকৌশল অবলম্বনের দ্বারা মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ করা যায় না। ঐ সব প্রক্রিয়া. মনের বৃত্তি সুষুপ্ত ব্যক্তির মনোবৃত্তির মত ক্ষণিকের জন্য চাপা পড়ে মাত্র, পরক্ষণেই সেগুলি উজ্জীবিত হয়ে ক্রিয়া করতে থাকে।

অনেককেই বলতে শোনা যায়, রেচক, পূরক ও কুম্ভকের দ্বারা প্রাণবায়ু আকর্ষণ করতে করতে ক্রমে বায়ু স্থির হয় — 'তন্‌থির, পবন থির, পবন থিরে মন থির'। অর্বাচীন যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষতঃ হঠযোগী, ক্রিয়াযোগী, নাথযোগী, বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের কোন কোন শাখায় এবং মুসলমান সুফীদের 'মারফতি' ক্রিয়ায় শ্বাসবায়ুর রেচক পূরক কুম্ভকের উপর অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা অল্পবিস্তর সকলেই বিশ্বাস করেন যে, বায়ু নিরোধ হলেই নাকি চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে অতি সহজেই সমাধিলাভ হয়, এমনকি আকাশগমনাদিরও ক্ষমতা জন্মে। ঐ সব কথার যে কোন বাস্তব মূল্য নাই একটু বিচার করলেই তা ধরা পড়বে। প্রমাণস্বরূপ, যে কেউ এখনই তার শ্বাসবায়ু নিরোধ করে দেখ, শ্বাসবায়ু রুদ্ধ থাকলেও তাঁর মন যে কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে পারবে, রুদ্ধ শ্বাসবায়ু মনের যদৃচ্ছা বিচরণে কোন বাধার সৃষ্টি করতে পারবে না। অতএব বায়ুনিরোধে মনের গতি রুদ্ধ হয় — 'পবন থিরে মন থির' — এ সব কথা অবাস্তব এবং অযৌক্তিক। এ কথা সকলেই জানেন, যে বস্তু যত সূক্ষ্ম, তার শক্তিও তত বেশী। মন শ্বাসবায়ু অপেক্ষা বহুগুণে সূক্ষ্ম, বায়ু মনের চেয়ে অনেক স্থূল, কাজেই এই স্থূল বায়ুর দ্বারা অসীম শক্তিশালী অতি সূক্ষ্ম মনের গতি কিছুতেই রোধ করা সম্ভব নয়। তাই বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে বলেছিলেন — মন এব সমর্থঃ স্যাৎ মনসো দৃঢ়নিগ্রহে — একমাত্র বিচারশীল মন নিজেই নিজের গতিরোধ করতে সমর্থ। মন বিচারশক্তি বলে নিজেই নিজের গতিরোধ না করলে, জগতে এমন কোন শক্তি নাই যা দিয়ে তা সম্ভব হবে। যাঁরা এই বিপরীত কথা বলেন তাঁরা মিথ্যা উপদেশ দেন মাত্র। একমাত্র বিচার-বৈরাগ্য বলেই মনোবৃত্তি সকল নিরুদ্ধ হয়, এ হল শাস্ত্রের বাণী, প্রত্যক্ষ উপলব্ধির বিষয়।

আর যদি তর্কের খাতিরে ধরেই নিই যে শ্বাসবায়ুর ক্রিয়ার দ্বারা মনোলয় হয়, তাতেই বা কি লাভ হবে? প্রাণবায়ু রুদ্ধ হলেই যদি মনোলয় এবং সমাধিলাভ সম্ভব হয়, তাহলে দৈনিকই ত সুষুপ্তি অবস্থায় প্রত্যেকেরই মন স্বকারণে লয় হয়ে থাকে তখন মনের সমাধি ঘটে না কেন? এতেই প্রমাণিত হয় যে মনোলয়, চিত্তবৃত্তিনাশ এবং সমাধিলাভের জন্য প্রাণবায়ু নিরোধের কোন আবশ্যকতা নাই। বিচার দ্বারা মনে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের উদয় হলে তবেই মন স্ব ইচ্ছাতেই লয় হয়ে থাকে। যে কেউ একটু পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝতে পারবে, জন্মাবধি আজ পর্যন্ত কত শত মনোবৃত্তি প্রত্যেকের মনে অহরহ উদিত হয়েছে, বিচার শক্তির ক্রমবর্ধমান প্রভাবে সেগুলির আপনা হতেই নিবৃত্তি ঘটেছে, লয় পেয়েছে। এ ত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। সেজন্য কি কাউকে কখনও অস্বাভাবিক পন্থায় কৃত্রিম উপায়ে প্রাণাবায়ুকে রুদ্ধ করতে হয়েছিল কি? চিন্তা করে দেখ, শিশুকালে আমাদের পুতুলখেলা প্রভৃতি যে সব মনোবৃত্তি ছিল, এখন সেগুলি নাই। তা নাশ করার জন্য কি আমাদেরকে বায়ুরোধ করতে হয়েছে? শৈশবে ত প্রাণবায়ু কাকে বলে সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই শিশুর থাকে না। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিচারশক্তি বৃদ্ধি পায় তার ফলেই ক্রমে সেগুলি নিরুদ্ধ হয়েছিল। এখনও যদি কারও মনে কোন অসৎ বৃত্তি জাগে সে কি ভাবে তা রুদ্ধ করবে? সে কি সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ করে কিংবা শ্বাসবায়ুর রেচক পূরক করে তা দমন করতে লেগে পড়বে? অসৎ চিন্তার নিবৃত্তি কিসে হয়? বিবেকের অনুশাসন এবং বিচারের বলেই কি তা হয় না? এখন কি আমাদের কারও মনে শৈশবের সেই পুতুল খেলার মনোবৃত্তি জাগে কি? কেন জাগে না? তার একমাত্র কারণ, বিচার ও জ্ঞানশক্তি বেড়ে উঠে সেই সব বৃত্তি নাশ করে ফেলেছে বলেই না সেই সব শিশুসুলভ মনোবৃত্তির উদয় আর হচ্ছে না? ঠিক এই রকম ভাবেই জ্ঞান ও বিচারশক্তি প্রভাবে যখন জগতের নশ্বরত্ব ও মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা জন্মাবে, নিজের ধ্রুব সত্তায় ধ্রুব আস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে তখনই, একমাত্র তখনই চিত্তনিরোধ রূপ যোগ আয়ত্ত হবে, বায়ুরোধ করে চিত্তবৃত্তি রোধের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। অধিকাংশ মানুষ গড্ডলিকা প্রবাহে সংস্কার বশে গা এলিয়ে ভেসে যেতে ভালবাসেন। তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা নাক দিয়ে যে বায়ুস্রোত চলে সেই বায়ুর গতি ক্ষীণ করে দিতে পারলেই মনের সঙ্কল্প বিকল্প স্রোত এবং বিষয়চিন্তা স্রোত বন্ধ হয়ে যাবে? তাঁরা একবারও ভেবে দেখেন না যে চিন্তা বুদ্‌বুদ্ ত উঠে মনে, জ্ঞান ও বিচার ছাড়া মনের সেই স্পন্দন - সংকল্পবিকল্পের স্রোত আর কিভাবে রোধ করা সম্ভব?

আরও একটি কথা ভেবে দেখা দরকার। স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে জগৎ দুই প্রকার। স্থূল জগতের ক্রিয়া দ্বারা সূক্ষ্ম জগতে প্রবেশ করা সম্ভব নয়। অথচ সাধারণ লোকে যোগাভ্যাসের নামে স্থূল জগতের বায়ু আকর্ষণ রূপ একটা স্থূল ক্রিয়া দ্বারাই সেই সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম মনোবৃত্তিকে নিরোধ করতে চায়! এর চেয়ে বাতুল চিন্তা আর কি হতে পারে?

মাটি জল তেজ বায়ু ও আকাশ — এই স্থূল পঞ্চভূতে আমাদের দেহ সৃষ্টি সুতরাং মন স্থির করার জন্য আদি ও অনন্তর অন্য চারটি মহাভূতকে বাদ দিয়ে তাদের মধ্যে থেকে কেবল বায়ুকেই 'মনথির' এর প্রধান

সম্বল করা হল কেন? এর কি সদুত্তর? যদি কেউ বলেন, বায়ু সূক্ষ্ম, তাই সূক্ষ্ম মনকে রোধ করার জন্য সূক্ষ্ম বায়ুকেই গ্রহণ করা হয়েছে, তাহলে তাঁদেরকে প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, বায়ু অপেক্ষা সূক্ষ্মতর আকাশকে আশ্রয় করে মন স্থির করার ব্যবস্থা হঠযোগী ও ক্রিয়াযোগীরা করলেন না কেন? অনেক অর্বাচীন যোগীকেই বলতে শুনি, 'বায়ুর সমতা হলেই ইন্দ্রিয় ও মনের সমতা হয়, ইন্দ্রিয় মন ও বায়ুর সমতাই যোগ — সমত্বং যোগমুচ্যতে'। বলা বাহুল্য এই ব্যাখ্যা ভুল, ঋষি বাক্যের ইচ্ছাকৃত বিকৃতি।

ইন্দ্রিয়, মন ও বায়ুর সমতায় কখনও তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না। বিচারের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বৃদ্ধি হলে তবেই বরং ইন্দ্রিয়ের সমতা, মনের সমতা এবং বায়ুর সমতা ঘটে। এইরকম সমতার (সমত্বং) নামই যোগ, 'সমত্বং' এর প্রকৃত অর্থ সামরস্য লাভ, জ্ঞানের উচ্চাবস্থাতে তা লাভ হয়। যদি ইন্দ্রিয়ের সমতা হলেই জ্ঞান জন্মাত তবে ত বালকমাত্রেরই তত্ত্ববোধ জন্মাত! যদি মনের সমতায় তত্ত্ববোধ জন্মাত তবে, ত সকলেরই সুষুপ্তি অবস্থায় তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণ ঘটত! আর বায়ুর সমতায় তত্ত্ববোধ হলে সর্পাদি সরীসৃপেরও তত্ত্বজ্ঞান লাভ হত। কারণ তারা ছয়মাস শ্বাসরোধ করে থাকতে পারে।

অন্যদিকে, যোগের দ্বারা আকাশগমনাদি যে সব শক্তিলাভের কথা বলা হয়, সে সম্বন্ধে প্রথম কথাই হল — ঐ সব বিভূতিলাভ যোগের লক্ষ্য নয়। আকাশগমনাদি ক্ষমতা জন্মালেই আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। তা যদি হত, তাহলে আকাশে বিচরণশীল চিল শকুনি প্রভৃতি পক্ষীকুল এবং এরোপ্লেনে আকাশগামী লোকেরা সর্বাগ্রে ভববন্ধন মুক্ত হয়ে পরমাশক্তির অধিকারী হত। বাহ্যিক বায়ুনিরোধের দ্বারা যদি উর্ধ্বে উঠা সম্ভব হত, তাহলে ত বায়ুপূর্ণ ফুটবলও পৃথিবীর অভিকর্ষ অতিক্রম করে আপনা হতেই উপরের দিকে উৎক্ষিপ্ত হতে পারত। যদি বায়ুনিরোধ দ্বারাই মন স্থির হত তাহলে ত ভেক, কচ্ছপ, বাজিকর প্রভৃতি — যারা দীর্ঘকাল বায়ু-নিরোধ করে থাকতে পার, তাদের ত তাহলে পরমপদে স্থিতিলাভ সহজসাধ্য হত! উদরে বেশী পরিমাণ বায়ু ভরে ফেলতে পারলেই যদি পরমার্থ লাভ হত, তাহলে কামারের ভস্ত্রাও যোগীপুরুষ আখ্যা পেত। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে, বায়ুর নিরোধে কখনও বোধির উদয় হয় না, বোধির উদয় না হলে তত্ত্বজ্ঞান লাভও সুদূরপরাহত। প্রাণায়াম সম্বন্ধে ব্রহ্মবিদ্যার আলোক দিশারী জ্ঞানগুরু শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের মতে —

চিত্তাদিসর্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে॥
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচনাখ্যঃ সমীরণঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিতঃ॥
ততস্তদ্বৃত্তিনৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ।
অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানাম্ অজ্ঞানং ঘ্রাণপীড়নম্॥ (অপরোক্ষানুভূতি)

অর্থাৎ চিত্তাদি সকল ভাবপদার্থে ব্রহ্মত্ব ভাবনা বশতঃ যখন সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তির নিরোধ হয় তখন তাকে প্রাণায়াম বলে। প্রপঞ্চের নিষেধ অর্থাৎ মন জাগতিক যে যে বিষয়ে বিক্ষিপ্ত হয়, বিচারের দ্বারা সেই বিষয়ের মিথ্যাত্ব পরিজ্ঞানই যথার্থ রেচক। 'এক ব্রহ্মই সর্বময়' এইরূপ দৃঢ় নিষ্ঠা বলে বিষয় হতে মনকে ফিরিয়ে আনাকেই পূরকবায়ু বলে। অনন্তর, 'এক ব্রহ্মই সর্বময়' — এইরূপ মনোবৃত্তি যখন নিরুদ্ধ হয় অর্থাৎ মনের মধ্যে আর কোন বৃত্তির স্পন্দন উঠে না, তখন তাকে কুম্ভক বলে। এই রকম রেচক পূরক কুম্ভকাত্মক প্রাণায়ামই জ্ঞানীদের প্রাণায়াম। কেবল মুর্খরাই নাসিকা দ্বারা শ্বাসবায়ুর গ্রহণ, বর্জন বা নিরোধ করাকেই প্রাণায়াম বলে ভুল করে।

প্রকৃত প্রাণায়াম যে কোনমতেই নাসাপীড়নাদির ব্যাপার নয়, উপরোক্ত শঙ্কর-বাক্যই তার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। অলমিতি। শিবং ভূয়াৎ। শিবং ভূয়াৎ।

মহাত্মা অন্তর্হিত হলেন।

ভোরে উঠে নর্মদাঘাটে স্নান, গঙ্গেশ্বরের পূজা, রঞ্জনকে তর্পন করানো, পুরোহিতজী প্রদত্ত ভোগ গ্রহণ এবং মহাত্মা সোমানন্দজীর রাত্রিকালীন আলোচনা বিষয়ে নিজেদের মত আদান প্রদানের ভিতর দিয়ে আমাদের দিনগুলি আনন্দেই কাটতে লাগল। ষষ্ঠ দিনের আলোচনা শেষে আমি যখন নিত্যকর্ম সমাপ্ত করে মহাত্মার বিভিন্ন সময়ে বলা বিভিন্ন বানী-বচনের অনুধ্যান করছিলাম সেই সময় অর্বাচীন যোগীদের রেচক, পূরক, কুম্ভক, প্রাণায়ামের ফলে জীবন বিড়ম্বিত হয় এমন কোন দৃষ্টান্ত আমার জানা কিনা জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম — আমার চোখে দেখা দু'একটি ঘটনার উল্লেখ করছি। ১৯৪৭ সালে পূজার ছুটিতে এলাহাবাদ

গিয়েছিলাম। ত্রিবেণী তটস্থ বাঁধের পূর্বদিকে হাড়োয়া বাবা নামে এক হঠযোগী বাস করতেন। বাঁধের পশ্চিম দিকে থাকতেন সুদত পুরী নামে আর এক সাধু, তিনিও হঠযোগী। সকালে ও সন্ধ্যায় দলে দলে লোকে আসতেন তাঁদের আশ্রমে। সুদত পুরীকে সবাই বলতেন 'আসন সিদ্ধ', হাড়োয়া বাবাকে বলতেন — 'প্রাণায়াম সিদ্ধ'। সুদত পুরীর শিষ্যরা প্রচার করতেন যে আকাশগমনাদি ব্যাপার তাঁদের গুরুর কাছে নিতান্ত ছেলেখেলা বিশেষ! যদি কাউকে জিজ্ঞেস করতাম, 'আপনি কি নিজের চোখে এ সব দেখেছেন?' উত্তর পেতাম 'অমুকের কাছে শুনেছি, উনোনে বোলা...'। সেই 'অমুককে' খুঁজে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিতেন — 'তমুকের কাছে শুনেছি, তমুক খুদ্ আঁখসে দেখা হ্যায়।' এই অমুক তমুকরা ধর্মজগতে সাধুবাবাদের আদি ও অকৃত্রিম প্রচারক, তাঁদের কথা সকলের কানে ভেসে আসে, তাঁদের কেউ দেখা পায় না, আমিও পাই নি। যাই হোক, দুই সাধু বাবারই খ্যাতি তখন তুঙ্গে। যোগাভ্যাসীদের 'জয় বজরংবলী' ধ্বনিতে উভয়েরই আশ্রম মুখর থাকত। যে কোন ভাবে হোক, আমার উপর হাড়োয়া বাবার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি পড়েছিল। তিনি তাঁর আশ্রমের একটি কুটিরেই আমাকে থাকতে দিয়েছিলেন। যখনই এলাহাবাদ যেতাম, তাঁর কুটীরেই থাকতাম। দেখতাম যোগাভ্যাসীরা সুদত পুরীজীর আশ্রমে বজ্রাসন, ময়ূরাসন, কাকাসন, পরশুরামাসন, মৎস্যেন্দ্রাসন, শাম্ভবী, যোনিমুদ্রা, জালবন্ধমুদ্রা, মহামুদ্রা প্রভৃতি অভ্যাস করছেন। তাঁরাই আবার হাড়োয়া বাবার আশ্রমে এসে অভ্যাস করতেন উজ্জায়ী, ভস্ত্রায়ী, কেবলী প্রভৃতি প্রাণায়ামবিধি। অনেকে আবার খেচরী সিদ্ধ হওয়ার বাসনায় জিহ্বার ছেদন দোহনাদি ক্রিয়া একনিষ্ঠভাবে অভ্যাস করতেন। একটু দূরেই হাড়োয়া বাবার এক শিষ্য, নাম বিষ্ণুদেবানন্দ পুরী বাঁধের নীচে এক বিরাট গর্ত করে তার মধ্যে থেকে 'গুহাসাধনা করতেন। জমজমাট ব্যাপার, চারদিকে শুধু 'যোগীপুরুষের' ভীড়! সুদত পুরী একদিন গুহ্যদ্বার দিয়ে নাড়ীভুঁড়ি বের করে দেখিয়েছিলেন। একদিন দেখলাম, এলাহাবাদ শহরের একজন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক হাড়োয়া বাবাকে পরীক্ষা করতে এলেন। 'জয় বজরংবলী' হুঙ্কার দিয়ে শালপ্রাংশু মহাভুজ হাড়োয়া বাবা যোগাসনে বসলেন — সঙ্গে সঙ্গে শিবনেত্র। দৃষ্টি স্থির। আধঘন্টা পরে ডাক্তার স্টেথোস্কোপ দিয়ে পরীক্ষা করে বললেন, বুকের মধ্যে কোন স্পন্দন নাই, নাড়ীর গতিও রুদ্ধ। আমি নিজেও তাঁর বুকে হাত দিয়ে দেখেছিলাম হৃদপিণ্ডে সত্যই কোন স্পন্দন ছিল না। দু'ঘন্টা পরে হাড়োয়া বাবা চোখ মেলে তাকালেন।

· দুর্ভাগ্যক্রমে এই 'যোগীর' সঙ্গে নানা কারণে আমার সদ্ভাব নষ্ট হয়। যোগের নামে নানাবিধ কসরৎ ও ভোজবাজীতে সিদ্ধপীর এই যোগীবরের প্রাত্যহিক জীবনচর্চা আমার চোখে মহাপুরুষোচিত বলে মনে হয় নি। 'ঐ সকল আসন ও প্রাণায়ামে কি চিত্তবৃত্তির নাশ হয়? আসন ও প্রাণায়ামে এত নৈপুণ্য সত্ত্বেও জীবনধারাতে ইন্দ্রিয় জয়ের চিহ্ন কেন পরিলক্ষিত হয় না? যে সব যোগ প্রণালীতে প্রজ্ঞা স্ফুরণের কোন লক্ষণ দেখা যায় না, তা কি যোগ পদবাচ্য?"— এবম্বিধ প্রশ্নজালে জর্জরিত হয়ে হাড়োয়া বাবা আমার উপর বিষম ক্রুদ্ধ হন। কয়েক বৎসর পরে কুম্ভমেলাতে গিয়ে শুনলাম, 'গুহাসাধনার ফলে বিষ্ণুদেবানন্দ বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়, সংবাদ পেয়ে তার আত্মীয় স্বজন এসে তাকে রাঁচির পাগলা গারদে রেখে এসেছেন, গুহ্যদ্বারের পথে নাড়ীভুঁড়ি নিষ্কাশনের কসরৎ দেখাতে গিয়ে আন্ত্রিক রক্তক্ষরণের (Intestinal Haemorrhage) ফলে অপর যোগী সুদত পুরীজী কালগ্রাসে পতিত হয়েছেন। হাড়োয়া বাবার আশ্রমে গিয়ে দেখলাম তাঁরও অন্তিম দশা আগতপ্রায়। হায়? তাঁর সেই বিশাল 'যোগসিদ্ধ' দেহের এ কী অবস্থা! উৎকট হাঁপানী রোগে তাঁর দেহ কঙ্কালসার। হাঁফের টানে এক একবার মনে হতে লাগল তাঁর চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে! দমকে দমকে কাশি, কাশির টান কমলেই ক্ষীণকণ্ঠে বলে চলেছেন 'হাঃ প্রাণায়াম! প্রাণ গয়া রাম!' কোথায় গেল সেই 'জয় বজরংবলী' হুংকার আর অট্টনাদ। এ কী শোচনীয় দশা! ইঙ্গিতে কাছে ডেকে আমাকে বললেন — 'সচ কহ, ইস্ প্রাণায়াম বেগারমেঁ জ্ঞানকা প্রাপ্তি নাহি হোতি। হাঃ প্রাণায়াম! প্রাণ গয়া রাম। হাড়োয়া বাবা সাধুপুরুষ সন্দেহ নাই।

কলিকাতায় ফিরে আসার কিছুদিন পরেই হাড়োয়া বাবার মৃত্যুসংবাদ পাই। তাঁর সেই করুণ আর্তনাদ এখনও আমার কানে বাজে —'হাঃ প্রাণায়াম। প্রাণ গা রাম!' অথচ সোমানন্দজী বলেছেন — সত্যকার প্রাণায়াম ত প্রাণঘাতী নয়। প্রাণায়ামকে শ্রেষ্ঠ তপস্যা বলে বর্ণনা করেছেন। প্রকৃত প্রাণায়াম ও প্রাণারাম সমার্থক শব্দ, প্রাণায়ামে সত্য সত্যই চিত্তবৃত্তির বিরাম ঘটে। ভগবান পতঞ্জলির মতে প্রাণায়াম রূপ যোগাঙ্গের অনুষ্ঠানে অশুদ্ধি ক্ষয় হয়, অশুদ্ধি ক্ষয় হলে বিবেকখ্যাতি পর্যন্ত জ্ঞানদীপ্তি হয়ে থাকে। (সাধনপাদ, সূত্র ২৮) ভগবান মনু বলেছেন

'দহ্যন্তে ধনায়মানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিয়ানাং দহ্যন্তে দোষাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ॥ (মনু ৬/৭১)

অর্থাৎ অগ্নিতে দগ্ধ করলে যেমন সুবর্ণাদি ধাতুর মল নষ্ট হওয়ায় তা শুদ্ধ ও উজ্জ্বলতর হয় তেমনি প্রাণায়াম করলে মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়কৃত দোষ নষ্ট হয়।

ট্রাজেডি এই, অনেকেই ভেবে দেখেন না শাস্ত্রে যে প্রাণায়ামের এত বহুতর প্রশংসা, সে কি কেবল শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়াবিশেষ? শ্বাসযন্ত্রের কসরতের দ্বারা কী ভাবে প্রজ্ঞার উদয় ও ইন্দ্রিয়সকলের দোষমুক্তি সম্ভব? শ্বাসবায়ুর তাড়ন-কৌশলের উপর কি কর্মমল মায়িকমল ও আণবমল প্রভৃতির শোধন বা চৈতন্য স্ফুরণ নির্ভর করে? নিগ্রহের অর্থ কেবল তাড়না, দমন বা পীড়ন নয়। 'নিগ্রহ' শব্দে সংযম, নিয়মন এবং বক্রদোষ দূরীকরণ প্রভৃতিকেও বুঝায়। অবস্পন্দনের ফলে প্রাণধারা যে ছন্দ হারিয়ে ফেলেছে, বক্রগতি দূর করে পুনরায় তাকে ছন্দায়িত করে তোলাই মনু কথিত 'প্রাণনিগ্রহ' শব্দের তাৎপর্য।

শৈলেন্দ্র! যে যোগাভ্যাসীদের প্রাণায়ামের প্রভাবে প্রাণ গয়া রামের প্রত্যক্ষ ঘটনা বর্ণনা করেছে এবং কাল পর্যন্ত আমি যে যোগজ তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছি তা তোমরা ভালভাবে বুঝতে পেরেছ বলে তোমরা আমার আশীর্বাদ গ্রহণ কর।

আমরা যে, যে অবস্থায় ছিলাম সেই অবস্থায় তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানালাম। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন —

ষটচক্ররহস্য ও কুলকুণ্ডলিনী ঃ — বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে ষটচক্রভেদ রহস্যও স্বতন্ত্র। আমাদের দেশে তাবৎ ধর্মসম্প্রদায়ে বিশেষতঃ অর্বাচীন যোগীদের মধ্যে ষটচক্র নিয়ে অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। অনেক যোগের বই-এ ষটচক্রের ছবি, মূলাধার সাধিষ্ঠান মণিপুর অনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা ও সহস্রার এবং কিভাবে সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী মূলাধার থেকে এঁকে বেঁকে হেলে দুলে সহস্রারাভিমুখে গমন করছে, তার সাড়ম্বর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। চক্রগুলিকে দেখানো হয়েছে পদ্মের মত। কোন্ চক্রের বা পদ্মের কতকগুলি করে পাপড়ি সেগুলির রঙই বা কিরকম তারও বর্ণাঢ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঐ সব চক্রভেদের ফলশ্রুতি হিসাবে বলা আছে সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী মূলাধার হতে সহস্রারে পৌঁছলেই ইষ্টদর্শন তথা কালী, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতির দর্শন ও মুক্তিলাভ হয়। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর লিখিত যাবতীয় পুস্তকে, স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' এবং Sir John Woodroff কৃত The Serpent Power নামক গ্রন্থে পদ্ম বা চক্র ভেদ করে একটি সাপ ফণাবিস্তার করে উঠছে তার রোমাঞ্চকর ছবি আছে। প্রায় তাবৎ যোগী ও সাধকগণ ঐ সব পুস্তকপাঠে বিশ্বাস করেন এবং আশা করেন যে ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে নানারকম ক্রিয়াকৌশলের দ্বারা গুরুকৃপায় জপ ও যোগশক্তি প্রভাবে সত্য সত্যই গুহ্যমূলে 'নিদ্রিতা ভুজগাকারা' কুলকুণ্ডলিনী জেগে উঠবেন। তান্ত্রিকরা বলেন —

সাপি কুণ্ডলিনীশক্তিঃ কামকলাস্বরূপিনী। সঞ্চিন্ত্য সাধকশ্রেষ্ঠঃ ত্রৈলোক্যং বশমানয়েৎ॥ (শ্রী ক্রম)

— সেই কুণ্ডলিনীশক্তি কামকলাস্বরূপিনী। সাধকশ্রেষ্ঠ তাঁকে চিন্তা করে ত্রৈলোক্য বশ করতে সমর্থ হন।

কিঞ্চিৎ ক্রিয়াকৌশল অনুষ্ঠানের দ্বারাই যদি সমগ্র ত্রৈলোক্য বশীভূত করা যায়, মন্দ কি! কাজেই এই তুক্‌টি বর্তমান যোগাভ্যাসীদের কাছে একটি বাড়তি আকর্ষণ।

বলা বাহুল্য, ষটচক্র ও কুণ্ডলিনী রহস্য একটি প্রহেলিকা বিশেষ। বেদ-বেদান্তের মূলগ্রন্থে ঐ সব চক্র ও কুণ্ডলিনী প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ কোথাও দেখিনি। স্বয়ং আচার্য শঙ্কর ষটচক্রভেদাদি বিষয় খণ্ডন করে গেছেন। আচার্যের অনুবর্তী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী আনন্দগিরি তাঁর লিখিত 'শঙ্কর বিজয়' নামক গ্রন্থে আচার্যের সেই সব যুক্তি অধ্যাহার * করেছেন। আমি এখানে ঐ বিখ্যাত বই-এর 'যোগমতনিবর্হণ' নামক ৪১ প্রকরণ হতে কয়েকটি পংক্তি উদ্ধার করে দেখাচ্ছি ঃ—

'বিবিক্তদেশে চ সুখাসনস্থঃ শুচিঃ সমগ্রীব শির ইত্যাদি লিখিতমেবেতি যদুচ্যতে তথা ন বক্তব্যম্, বক্তব্যম্ তদাদি বাক্যৈরিহ দহরবিদ্যৈব প্রতিপাদিতা ন যোগঃ। অজপা বিদ্যায়ামাগমোক্তবলাৎ যোগ ইতি যদুচ্যতে

* অধ্যাহার — অর্থবোধের প্রয়োজন হেতু কোন পদ ব্যবহৃত না থাকলেও বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সেই পদ বা ভাবের বিন্যাসকে অধ্যাহার বলে।

তদপি ন সম্ভবতি। অজপামূলমন্ত্রস্য হংসরূপত্বেন সোহহমিত্যর্থ নির্দ্ধারিতে— পরজীবয়োর্ভিদো গন্ধলেশভাবাৎ কথং যোগ ইতি বক্তুং শক্যতে? মন্ত্রবশাৎ যোগস্য অপ্রাপ্তাবপি কুণ্ডলিন্যা ষটচক্রভেদমাত্রং যোগ ইতি যদুচ্যতে তদপি ন মান্যম্ মুক্তিমার্গাভাবাৎ সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি, সংপশ্যন্ ব্রহ্মপরং যাতি নান্যেন হেতুনা। ইতি নিষেধস্যান্যপরত্বাৎ।

— অর্থাৎ হে যোগমতাবলম্বিগণ! তোমরা যোগমতের বৈদিকত্ব দেখাবার জন্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ কথিত নির্জনেদেশে শুচি হয়ে সুখাসন করতঃ শিরোগ্রীবা প্রভৃতি সমভাবে স্থাপনপূর্বক যে যোগানুষ্ঠানের ব্যবস্থা দেখাচ্ছ তা তোমাদের কথিত যোগ নয়, সে সকল কথার দ্বারা ছান্দোগ্য উপনিষদের দহর পুণ্ডরীক বিদ্যাই* প্রতিপন্ন হয় কিন্তু তোমাদের কথিত যোগ প্রতিপন্ন হয় না। যদি বল আগমসম্মত অজপাবিদ্যাবলম্বনে তোমাদের যোগ নিষ্পন্ন হয়, তাহাও সম্ভব নয়। কারণ অজপা মন্ত্রের প্রকৃতার্থ সোহহং-ই নির্দিষ্ট আছে। এতে জীব ও পরব্রহ্মে একতা কথিত হয়। কিন্তু কোনক্রমে জীব ও ব্রহ্মে ভেদের লেশমাত্র থাকতে পারে না। তোমাদের প্রক্রিয়া কিন্তু অন্যরূপ। তোমরা মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে জাগিয়ে তার সঙ্গে জীবকে নিয়ে সহস্রারে গমন কর, তথায় পরব্রহ্মের সহিত কুণ্ডলিনীর মিলন ঘটিয়ে তদুৎপন্ন অমৃত জীবকে পান করাও বলে দাবী কর। তোমাদের এইরূপ বাক্য এবং বোধে জীব, ব্রহ্ম ও কুণ্ডলিনী এই তিনটি পদার্থ থাকে। সুতরাং তা সোহহং এর বিপরীত ভাবাপন্ন হয়ে পড়ছে। এই কথা শুনে আজপা মন্ত্রে যোগ হয় এই আপত্তি পরিত্যাগ করতঃ কেবল কুণ্ডলিনী দ্বারা ষট্চক্র ভেদ করা মাত্রই যোগ, যদি এরূপ বলতে চাও, তাহাও পার না। তোমাদের ঐরূপ প্রক্রিয়াতে মোক্ষমার্গের অভাব হয়। তার কারণ এই যে শাস্ত্রে রয়েছে, 'আপনাকে সকল ভূতের মধ্যে ও সকল ভূতকে আপনার মধ্যে দর্শন করে পরব্রহ্মে প্রবেশ করতে হয়, তদ্ভিন্ন অন্য কোন হেতু দ্বারা ব্রহ্মলাভ ঘটে না। তোমরা সর্বভূতকে আপনাতে দেখা দূরে থাকুক, নিজ শরীরের ছয়চক্র পরিত্যাগ করে একমাত্র সহস্রারে গিয়া থাক। এতে সর্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে সর্বভূতকে দর্শনের বাধা ঘটে এবং উহা ছাড়া ব্রহ্মলাভের অন্য কোন উপায়ও নাই। তোমরা এই শেষোক্ত নিষেধ বাক্যের মধ্যে পড়ছ।'

আচার্য শঙ্কর ছাড়াও আরও অনেক অনুভবী মহাত্মা যোগাভ্যাসীদেরকে ষটচক্রের গোলকধাঁধা হতে রক্ষা করার জন্য সময়োচিত সাবধানবাণী উচ্চারণ করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ পরমহংস ** শিবনারায়ণ স্বামীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলেছেন, 'ষটচক্র প্রকৃতপক্ষে যাকে বলা হয়, সে সম্বন্ধে লোকের দৃষ্টি নাই।' ষট্চক্রের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন — যে ষটচক্র বিরাট ব্রহ্মের মধ্যে আছে, সেই ষটচক্র তোমাদের মধ্যেও আছে। বিরাট ব্রহ্মের পৃথিবীচক্র তোমাদিগের মধ্যে অস্থিমাংসচক্র। বিরাট ব্রহ্মের জলচক্র তোমাদের মধ্যে রক্তরসনাড়ী চক্র। বিরাট ব্রহ্মের অগ্নিচক্র তোমাদের মধ্যে অগ্নিচক্র — যার দ্বারা ক্ষুধা লাগছে, আহার করছ, অন্ন পরিপক্ব হচ্ছে ও কথা বলছ। বিরাট ব্রহ্মের বায়ুচক্র তোমাদের মধ্যে নাসিকা দ্বারে শ্বাসপ্রশ্বাস চলছে, বিরাট ব্রহ্মের আকাশচক্র তোমাদের অন্তরে কর্ণদ্বারে শ্রবণ করছ, বিরাট ব্রহ্মের চন্দ্রমাজ্যোতিশ্চক্র যা আকাশে দেখছ ঐ চন্দ্রমাজ্যোতিশ্চক্র দ্বারা তোমরা ভিতরে তোমাদিগের মনোরূপে বোধাবোধ করছ যে এটা আমার, ওটা উহার এবং নানাবিধ সঙ্কল্প ও বিকল্প উদয় হচ্ছে। মন অন্যমনস্ক হলে

---

* **দহর পুণ্ডরীক বিদ্যা**- দহর পুণ্ডরীক বিদ্যার সাধন ছান্দোগ্য মতে (৮৫ প্রপাঠক, ১ম খণ্ড, ৫৬৬/১) — অথ যদিদমস্মিন ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরোহস্মিন্নন্তারাকাশস্তস্মিন্ যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যং তদ্বাব বিজিজ্ঞাসিতব্যম্, ইতি॥ এই ব্রহ্মপুরে (শরীরে) যে ক্ষুদ্র পুণ্ডরীকে বেশ্ম অর্থাৎ পদ্মাকার গৃহ (হৃদয় পুণ্ডরীক) আছে, তাহার মধ্যে যে দহর অর্থাৎ অন্তরাকাশ, তাহাতে আকাশবৎ সূক্ষ্ম ও সর্বগত ব্রহ্ম আছেন, তাঁহাকে অন্বেষণ করতে হবে, তাঁহাকেই বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করা কর্তব্য।' সূর্যকিরণ বহুদেশব্যাপী হলেও যেমন সর্বত্র তার প্রতিফলন হয় না, কাচ, স্ফটিক প্রভৃতি স্বভাব-স্বচ্ছ নির্মল পদার্থেই প্রতিফলন ঘটে, তেমনি সর্বব্যাপী ব্রহ্মও সর্বত্র প্রতিফলিত হন না, পরন্তু কাচের মত স্বভাব-স্বচ্ছ, সত্ত্বপরিণামে বুদ্ধিতেই প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকেন। এখানে সেই বিশুদ্ধ-সত্ত্ব বুদ্ধি (প্রজ্ঞা) 'দহর-পুণ্ডরীক নামে অভিহিত হয়েছে।

** **পরমহংস শিবনারায়ণ স্বামী** — সূর্যোপাসক রূপে ভারতপ্রসিদ্ধ এই ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ হতে বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত বিরাজিত ছিলেন। বাংলা ১৩১৫ সালে তিনি নির্বাণ লাভ করেছেন। ধর্মজগতের গ্লানি ও নানা কুসংস্কার দূর করার জন্য পরিব্রাজক রূপে তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র নিয়ত পরিভ্রমণ করতেন এবং শুদ্ধ জ্ঞানমার্গ প্রচার করতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন সূর্য ছিলেন 'সাক্ষাৎ ব্রহ্মদূতী', তেমনি মহাত্মা শিবনারায়ণের দৃষ্টিতে সূর্য ছিলেন 'সূর্যনারায়ণব্রহ্ম', বিরাট জ্যোতির্ময় প্রকাশ। তাঁর রচিত অমৃত-সাগর, পরমকল্যাণ গীতা, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, সারনিত্যক্রিয়া প্রভৃতি গ্রন্থ ধর্মজগতের মূল্যবান সম্পদ।

কোন ভাবই বুঝা যায় না। এই মন বা চন্দ্রজ্যোতিঃ পর্যন্ত ষটচক্র জানবে। বিন্দু সূর্য্যনারায়ণ মস্তকে জ্যোতিঃ বা জ্ঞানরূপে প্রকাশমান ষটচক্রভেদ করে সহস্রদলে পৌঁছলে অর্থাৎ অজ্ঞান লয় হয়ে জ্ঞানোদয় হলে আপন মস্তিষ্কে জীব ব্রহ্ম অভেদ দর্শন করে জীব মুক্তস্বরূপ হয়। পঞ্চতত্ত্ব ও চন্দ্রমাজ্যোতিঃ নিয়ে যাকে অজ্ঞানবশতঃ ঈশ্বর হতে পৃথক ষট্‌চক্র বোধ হচ্ছে, জ্ঞান হলে তাকে আর পৃথক বোধ হয় না, কেবল একমাত্র সর্বশক্তিমান্ পূর্ণ পরব্রহ্মই প্রত্যক্ষ কারণ সূক্ষ্ম স্থূলরূপে ভাসমান হন। এই প্রকার বোধ হওয়াকে ষট্‌চক্রভেদ জানবে। (সারনিত্যক্রিয়া)॥

পূজনীয় আনন্দগিরি এবং শিবনারায়ণ স্বামীর উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্যেই ষট্‌চক্রের গূঢ় ও গভীর মর্ম উদ্‌ঘাটিত হলেও তন্ত্র এবং রাশি রাশি যোগের বই-এ প্রলোভনের তবকে মুড়ে ষট্‌চক্র সম্বন্ধে যে সব রহস্যময় ভ্রান্ত ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, দুঃখের বিষয়, বর্তমান যোগাভ্যাসীদের মধ্যে তারই প্রচার বেশী। ইয়া বড় বড় স্বামীজীদের, নামীদামী মহারাজদের, আউল বাউল সাঁই, ক্ষ্যাপা অর্ধক্ষ্যাপা, সিদ্ধ-অর্ধসিদ্ধ-অবধূত, সুরাসিদ্ধ-গঞ্জিকাসিদ্ধ-হংস-পরমহংস-যুগাবতার-মহাবতার প্রভৃতি আখ্যায় বিভূষিত 'গুরুজী'দের এ সম্বন্ধে কত কথা! সে সব রসের কথা। ভাবের কথা। গুহ্য কথা। কোথাও শিব বলছেন পার্বতীকে কানে কানে, গুরু বলছেন চেলাকে ফিস্‌ফিসিয়ে প্রাণে প্রাণে, কার্য কারণ সম্বন্ধ বিহীন দুর্বোধ্য এমন সব মন্ত্র ও অনুষ্ঠানও তাঁরা ষট্‌চক্রভেদকে কেন্দ্র করে জুড়ে দিয়েছেন যে সমস্ত ব্যাপারটাই গোপনতার মোড়কে বদ্ধ হয়ে এক নতুন মাদকতা সৃষ্টি করেছে। ঐ সব 'মহাত্মারা' রসিয়ে রসিয়ে আজ পর্যন্ত 'প্রত্যক্ষ উপলব্ধির' নামে যত ইন্দ্রজাল ও ধূম্রজাল রচনা করেছেন, দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য জানি না, সব রকমের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করে যদি সত্য কথা বলতে হয় তবে তোপের মুখে দাঁড়িয়েও আমি অকম্পিত কণ্ঠে ঘোষণা করতে পারি যে, মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে চক্র ও কুণ্ডলিনী কাহিনী — সম্পূর্ণ কাল্পনিক ভাবের বিকার মাত্র!

প্রকৃত রহস্য এই যে, ঐ কুণ্ডলিনী, সর্প এবং চক্রাদি শব্দ রূপকের ভাষায় এক একটি গূঢ় তত্ত্বের দ্যোতক। যেমন ঘরের দেওয়ালে ভারতের একটি মানচিত্র টাঙ্গানো আছে। এবার তোমরা কাউকে মানচিত্র চিনাতে গিয়ে বলছ — এই আমাদের পশ্চিমবঙ্গ, এই দেখ এখানে হাওড়া, পূর্বে দেখ আসাম, পশ্চিমে বিহার, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। এই বললে যেমন সত্য সত্যই ঘরের দেওয়ালে ঐ সব স্থান নাই, তেমনি সর্বব্যাপ্ত চৈতন্যধারার সঙ্গে জীবদেহের সম্পর্ক ও স্থিতি বুঝানোর জন্যই বলা হয় এই যদি মূলাধার অর্থাৎ চৈতন্যমণ্ডলের নিম্নতম স্থান হয় (If that be the lowest plexus), তাহলে চৈতন্যধারার আরোহপথে অন্যান্য চিৎকেন্দ্র হল স্বাধিষ্ঠান মণিপুর ইত্যাদি। আমাদের ভূতশুদ্ধির মন্ত্রে আছে — দীপকলিকাকার আত্মানাং পরমাত্মনি সংযুজ্য অর্থাৎ দীপকলিকাকার আত্মাকে পরমাত্মাতে সংযুক্ত করে ইত্যাদি। এই আত্মক্ষেত্র কোথায়? কোথায় কোন্ স্থানে আত্মার অধিষ্ঠান ক্ষেত্র? ঋষিরা প্রত্যক্ষ করেছেন, আজও প্রকৃত মরমী সাধকমাত্রই উপলব্ধি করেন যে ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী গুহায়িত চিদ্‌ক্ষেত্রই আত্মার স্থান, সর্বব্যাপী ব্রহ্মজ্যোতিঃ জীবদেহে ঐ স্থানেই বিরাজিত। অধ্যাত্মমার্গ শব্দটির অর্থ হল আত্মার অধিরোহণ মার্গ। আমি জীবাত্মারূপে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র অন্তরপথে ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে নিবাস করছি। আমারই অধিরোহণ হবে, আমিই যাত্রা করবো অনন্তের পথে।

হৃদিস্থানে রেখাবলয়ং কৃত্বা জীবাত্মারূপং জ্যোতিরূপমণুমাত্রং বর্ত্ততে — হৃদয়পদ্মে জ্যোতিরূপ অনুমাত্র জীবাত্মা অবস্থিত (ধ্যানবিন্দু উপনিষৎ)। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানই প্রকৃত হৃদয়, তার মধ্যেই ছান্দোগ্য বর্ণিত দহর অর্থাৎ অন্তরাকাশ, ব্রহ্মজ্যোতির প্রকাশ ঐখানে। তাহলে ব্যাপারটা দাঁড়াল, আমরা কেউই জীবাত্মারূপে লিঙ্গমূলে পড়ে নেই, তুমি আমি রাম যদু ইত্যাদি বিভিন্ন নাম রূপ উপাধির দ্বারা যাকে চিহ্নিত করতে আমরা অভ্যস্ত সেই জীবাত্মা আছেন ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানে! এখন যদি জীবাত্মার অধিরোহণ ঘটে তাহলে ঐ ক্ষেত্র হতেই তার যাত্রা হবে শুরু। ঐ ক্ষেত্রটিই Starting point! মূল কেন্দ্র, মূল আধার। কেউ যদি পাঁচতলায় থাকে, আর তোমাদের গন্তব্যস্থল যদি হয় সাততলায় তাহলে কি তোমরা একতলায় নেমে এসে সাততলার দিকে যাত্রা শুরু করবে? এ সম্বন্ধে ঋষিবাক্য —

'ভ্রূবোর্মধ্যং তু সংভিদ্য দহরং যাতি সাধকঃ।

ধ্যানের দ্বারা ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল ভেদ পূর্বক সাধক দহরাকাশে গমন করে (যোগকুণ্ডলী)। প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারী ব্রহ্মবিদ্ গুরুর কৃপায় ধ্যান ও বিচার প্রভাবে ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থান ভেদ করার পূর্ব মুহূর্তে সহসা

জ্যোতির আবির্ভাব ঘটে। এই জ্যোতিঃ হঠযোগী ক্রিয়াযোগীদের অনুষ্ঠিত যোনিমুদ্রা প্রভৃতির সহযোগে কোন কৃত্রিম উপায়ে নাক কান বন্ধ করে জ্যোতিঃ দর্শন নয়, ঐ রকম জ্যোতিকে জ্যোতিঃ বলা হয় না।

অকল্পিতোদ্ভবং জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ প্রকাশিতম্।
অকস্মাৎ দৃশ্যতে জ্যোতিস্তৎ জ্যোতিঃ পরমাত্মনি॥

— যে জ্যোতি বিনা কল্পনায় এবং বিনা প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়, যে জ্যোতি স্বয়ং প্রকাশিত হয় এবং যে জ্যোতি সহসা দেখা যায় সেই জ্যোতিই পরমাত্মায় অবস্থিত। সেই জ্যোতির্দর্শন ও জ্ঞানের উদয়ে সাধক বুঝতে পারেন, হৃদয়ে ন্যস্ত পুণ্ড্র মধ্যে অর্থাৎ হৃদয়কমলে নীল মেঘের কোলে বিদ্যুৎলেখার মত দীপ্তিশীল উড়ি ধান্যের সূক্ষ্ম অগ্রের ন্যায় যে সূক্ষ্ম পরমাত্মা দহরাকাশে বিরাজিত*, তিনিই মূল আধার, প্রধান অবলম্বন ও আশ্রয়। এই অবস্থা লাভ হলে যোগের পরিভাষায় বলা হয়, মূলাধার চক্র ভেদ হল। উপলব্ধির পরিপক্ক অবস্থায় যখন ঐ স্থিতি দৃঢ়তর হয় তখন জীবাত্মার জীবভাব লুপ্ত হয়ে স্বরূপ জ্যোতির সাক্ষাৎকার হয়। যোগের পরিভাষায় এরই নাম স্বাধিষ্ঠান চক্র ভেদ অর্থাৎ স্ব তে অধিষ্ঠান। এইভাবে উর্ধ্বরতির পথে যে চিৎকেন্দ্রটিতে অধিরোহণ ঘটলে আত্মজ্যোতির অনবচ্ছিন্ন ধারার আর কোন ক্রমেই স্খলন বা চ্যুতি ঘটে না, তখন সেই স্থিতিটির পারিভাষিক নাম অনাহত চক্র ভেদ। অনাহত শব্দের অর্থ ন আহত, মায়িকমল ও কর্মমল সম্পূর্ণতঃ অপসৃত হওয়ার ফলে কোনমতেই আর পতনের ভয় থাকে না। আরও উর্ধ্বতর ঋতি (গতি) ঘটলে বিশুদ্ধসত্ত্ব বুদ্ধিতে (যার নাম সংবিদ্) ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হন। যোগের পরিভাষায় এর নাম বিশুদ্ধচক্র ভেদ ইত্যাদি। কাজেই সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনী কুণ্ডলী পাকিয়ে লিঙ্গমূলে পড়ে আছে, অর্বাচীন যোগীদের মধ্যে বহুল প্রচারিত এই ধারণা সম্পূর্ণ হাস্যকর।

বলা হয়, মূলাধার চক্র চারিদল বিশিষ্ট — তার মানে এই নয় যে সত্য সত্যই সেখানে চার পাপড়ি বিশিষ্ট কোন পদ্ম আছে। যাঁরা তা ধ্যানে দেখেন সেটা তাঁদের Hyper Sensitive brain-এর প্রতিক্রিয়া মাত্র। মূলাধার পদ্মের চারি দলের অর্থ — মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহংকার প্রভৃতি চারিটি বৃত্ত। তেমনি স্বাধিষ্ঠান চক্র ছয় দল বিশিষ্ট মানে কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ ও মাৎসর্য্য প্রভৃতি বৃত্তির দ্যোতক। মণিপুর চক্রের দশটি দল হল দশ ইন্দ্রিয়ের দশগুণ। দশ ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি হল অনাহত চক্রের বারটি বৃত্তি। দশ ইন্দ্রিয়, চারি অন্তঃকরণ বিদ্যা ও অবিদ্যা — এই ষোলটি বৃত্তিকে বলা হয় বিশুদ্ধ চক্রের ষোলটি পদ্মপাপড়ি। আজ্ঞাচক্র বা দ্বিদল হল প্রকৃতি ও পুরুষের (বিরাট ব্রহ্মের) প্রতীক। অনন্ত অখণ্ড সর্বব্যাপ্ত চৈতন্যের কেন্দ্রস্থলই হল রহস্য বিদ্যায় সহস্রার নামে অভিহিত। বাসনাশূণ্য ও বৃত্তিশূণ্য হলে চিৎশক্তির পূর্ণ অভিব্যাক্তি ঘটে। চিৎশক্তির স্ফূরণ হলেও কোটি কোটি কুল বা জন্ম হতে সঞ্চিত যে কর্মসংস্কার, তা নাশপ্রাপ্ত হয়। রূপকের ভাষায় কুণ্ডলীকৃত, পুঞ্জীভূত এই সংস্কারের নাশই কুণ্ডলিনীর জাগরণ।

এখানে একটি কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে যে, কুণ্ডলিনী শব্দটির অর্থ পরবর্তী কালে তান্ত্রিক ও তথাকথিত নামধারী যোগীদের হাতে পড়ে বিকৃত হলেও যিনি সর্বপ্রথম ঐ শব্দটি চয়ন ও আবিষ্কার করেছিলেন, কুণ্ডলিনীকে সর্পাকৃতি বলেছিলেন, সেই রহস্যবিদ্ মহাত্মা ঐ শব্দ প্রয়োগের দ্বারা একটি অতি নিগূঢ় বৈদিক সত্যকেই প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন বলে মনে হয়। বৈদিক বিজ্ঞানমতে প্রাক-সৃষ্টিকালীন শান্তাতীত (Undefined and Unspecified Source of Origin) অবস্থায় সৃষ্টিক্রিয়ার প্রারম্ভে একটি বিন্দু (defined and specified Source of origin) নির্দিষ্ট হয় এবং তারই বিস্ফোরণে আকাশতত্ত্বের উদ্ভব। সুতরাং বিস্ফোরণের মধ্যে একটি প্রাণাগ্নি শক্তি বায়ুহীন অবস্থাতেও ক্রিয়া করে এবং তার ফলেই ব্যোম বা আকাশ (space continuum) সৃষ্টি হয়। এই আকাশ ব্রহ্ম ও প্রাণ এক ও অভিন্ন, অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত — 'আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ। অতএব প্রাণঃ॥ (ব্রহ্মসূত্র ১/১/২৩, ২৪)

আবার ঐ বিন্দুর বিস্ফারণ (Expansiveness) হতেই এক বিরাট স্পন্দন (The Cosmic Vibration) বৃত্তাকারে বিশ্বভুবনময় বিস্তারিত হওয়ার ফলেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে (শব্দপ্রভবঃ জগৎ); প্রত্যেকটি পদার্থ ঐ তরঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নয়। আবার প্রত্যেকটি তরঙ্গে পূর্বোক্ত মতে আদিশক্তি

---

* ন্যস্তহৃদয়পুণ্ড্রমধ্যে বা হৃদয়কমলমধ্যে বা তস্যমধ্যে বহ্নিশিখা অণীয়োর্দ্ধা ব্যবস্থিতা।
নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুৎলেখব ভাস্বরা। নীবার শূকবৎ তন্বী পরমাত্মা ব্যবস্থিতাঃ॥

(Cosmic Power and Energy) বিদ্যুৎরূপে অবস্থিতা। অতএব ঐ শক্তিই বিদ্যুৎরূপা হয়ে বৃত্তধর্মী তরঙ্গরূপে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃজন ও পরিচালনা করছেন, প্রাণী মাত্রেরই কম্পন, বিচলন, বায়ুর সঞ্চার, জলের নিয়ত স্পন্দন, এমন কি সূর্যেরও উদয় এক কথায় সামান্য পরমাণুর স্পন্দন হতে মহতের স্পন্দন পর্যন্ত সকল কিছুর মূলেই রয়েছে ঐ বিদ্যুৎরূপা আদিশক্তি — এই হল বৈদিক ঋষিদের অভিমত।

এখন ঐ বিরাটশক্তি শক্তিতরঙ্গের ধর্ম অনুধ্যান করলে তার যে ধর্ম ও বিচিত্র বিভঙ্গ অনুভব করা যায়, স্থূল জগতে সমুদ্রের জলতরঙ্গের ফুলে ফেঁপে উঠা, পরক্ষণেই ছড়িয়ে পড়া এবং গড়িয়ে যাওয়া প্রভৃতি ধর্মের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে।

প্রথমতঃ হাতের কনুই ভাঙার মত ঐ শক্তিতরঙ্গ উর্ধ্বে উত্থিত হয় আবার নিম্নে পতিত হয়, এই লক্ষণের দিকে লক্ষ্য রেখে এর নাম দেওয়া হয়েছে ভুজগ (ভুজ অর্থাৎ বাহুর কনুই এর মত গমন করে)। এই শক্তি যেন তর্‌তর্‌ করে গড়িয়ে গড়িয়ে তরঙ্গের মত অগ্রসর হয় এবং পুনরায় উর্ধ্বে উৎসারিত হয়। এই উৎসর্পিনী ভঙ্গীর জন্য এর নাম দেওয়া হয়েছে সর্প (সর্প শব্দ সৃপ্‌ ধাতু হতে নিষ্পন্ন, সৃপ্‌ ধাতুর অর্থ তর্‌তর্‌ করে গড়িয়ে পড়া ও উৎসারিত হওয়া)। আবার সমদ্রের ঢেউ উঠবার সময় এবং অগ্রসর হওয়ার সময় যেমন কুণ্ডলী (হ্বর) পাকায় তেমনি ঐ শক্তি তরঙ্গও উদ্ভূত হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে অগ্রসর হয়। সেইজন্য অলঙ্কারের ভাষায় এর নাম দেওয়া হয়েছে কুণ্ডলিনী (হ্বার)। সমুদ্রের ঢেউ যেমন কুণ্ডলী পাকিয়ে স্প্রিং এর মত তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠে, সেই রকম ঐ বিরাট শক্তিপ্রবাহও ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে বেগে উৎসারিত হচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে প্রতি অনুপরমাণুতে। সেই জন্য এর অপর নাম — পৃথাকু। দূর প্রান্তের পরিধি পর্যন্ত ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু জল যেখানে ছিল সেখানেই থাকে, আর এগিয়ে যায় না — ন + আগ অর্থাৎ নাগ।

এইভাবে বাস্তব জগতে সর্প নামক সরীসৃপের মধ্যে ঐ সমস্ত গুণ ও ধর্মই দেখা যায়, তাই গুণসাদৃশ্য হেতু ঐ বিরাট শক্তিপ্রবাহকে সর্পের প্রতিশব্দ ভুজগ, সর্প, হ্বার, পৃথাকু, নাগ ও কুণ্ডলিনী প্রভৃতি আলঙ্কারিক শব্দে ভূষিত করা হয়েছে। এটি এমন একটি সত্ত্বাশক্তি যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেকটি পদার্থে বিদ্যুৎরূপে অবস্থিত, ঐ বিদ্যুৎ বা তড়িৎশক্তিই জীবের প্রাণের উৎস। ঋগ্বেদের ঋষিরা অনুভব করেছিলেন এই শক্তিপ্রবাহ এবং সূর্যরশ্মির অন্তর্নিহিত তড়িৎকণা একই শক্তি —

সসপরীবাক্‌ বহুধা মহান্তি মর্ত্ত অমর্ত্তেন স যোনিঃ॥

— মর্ত্ত্য ও অমর্ত্ত্যলোকের সৃজনী ধারা ঐ শক্তির দ্বারাই সৃষ্টির ঐশ্বর্য বহুধা বিকশিত হয়ে চলেছে, জড় ও চেতন জগতে যে শৃঙ্খলা, ছন্দ ও ঋতম্‌, তারও মূলে ঐ শক্তি — এই শক্তি প্রভাবেই সব কিছু বিধৃত।

ঋগ্বেদের 'সর্পরাজ্ঞী সুক্তে' (১০/১৮৯) এবং অথর্ববেদের কয়েকটি মন্ত্রে (৬ কাণ্ড) ঐ দিব্য শক্তিব্যূহের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বৈদিক ঋষি গেয়েছেন—

আয়ং গৌঃ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্‌ মাতরং পুরঃ। পিতরং চ প্রয়ন্ত স্বঃ॥ ১

'বিচিত্র বরণ হের এই শক্তিব্যূহ
ভূলোক হইতে ছুটে দ্যুলোকের পানে।
মাতৃসম্মুখেতে বসি আক্রমিছে তাঁরে
স্বর্গলোকে ধাইতেছে পিতৃ প্রতি পুনঃ॥

অন্তশ্চরতি রোচনাস্যা প্রাণাদপানতী ব্যখন্মহিযো দিবম্‌॥ ২

জ্যোতিযোগে অন্তরীক্ষে হয়ে চরমান
স্বর্গপ্রাণ হতে নিম্নে সাধিছে অপান,স্বর্গলোক পুনঃ ব্যক্ত করিছে সূর্যেরে॥

ত্রিংশদ্ধাম বি রাজতি বাক্‌ পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতি বস্তোরহ দ্যুভিঃ॥ ৩

পতঙ্গ (তেজ) রূপেতে পুনঃ ত্রিংশদ্ধাম ব্যাপী
বিরাজ করিছে ইহা — সে পতঙ্গ মাঝে,
বাক্‌শক্তি হইয়াছে স্বয়ং আশ্রিতা —
দ্যুতিযোগে প্রতি বস্তু অহো! প্রতিভাত॥

আমার মনে হয়, বৈদিক ঋষিদের উপলব্ধিই কুণ্ডলিনী কল্পনার আদি বীজ ও উৎস। কিন্তু দুঃখের বিষয়

কালক্রমে বেদচর্চার অভাবে সেই উচ্চকোটির সাধনতত্ত্ব ও তার নিগূঢ় ভাব-ব্যঞ্জনা সাধারণের কাছে দুর্জ্ঞেয় রহস্যে পরিণত হল। তান্ত্রিক ও অর্বাচীন যোগীদের হাতে পড়ে সেই বৈদিক 'সসর্পরী বাক্' বা 'সর্পরাজ্ঞী' বর্তমানে কুলকুণ্ডলিনী রূপে লিঙ্গমূল আশ্রয় করেছেন!

সমাধি সমীক্ষণ : — সমাধি সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে নানারকম কৌতুকপ্রদ ধারণা বর্তমান। প্রায় কমবেশি সকলেরই ধারণা, সমাধিকালে হাত-পা শিথিল হবে, ঠাণ্ডা হবে, চোখ বন্ধ থাকবে নতুবা উর্ধ্বনেত্রে স্থানুবৎ থাকবে। কেউ কোন ভক্তিমূলক গান বা কীর্তন শুনতে শুনতে যদি উপরের দিকে হাত তুলে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ে বা চোখ বন্ধ করে ঢলে পড়ে, ভক্তেরা বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে বলে উঠে — 'বাবার সমাধি হয়েছে।' সমাধি সম্বন্ধে মানুষের মনে এই রকম বহু বিচিত্র ধারণা থকার ফলে ভণ্ডদের acting and posing এর সুবিধা হয়। তাই দুর্লভতম নির্বিকল্প সমাধির দাবীদার বাজারে অনেক।

বলা বাহুল্য, প্রকৃত সমাধির লক্ষণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাধি সম্ + অ + ধা - কি, সমাধীয়তে অস্মিন্ মনো জনৈরিতি কিঃ অর্থাৎ মন চিত্ত বা অন্তঃকরণকে এক ধ্যেয় বস্তুতে আধান বা স্থাপন করার নামই সমাধি। যোগাচার্য ভগবান পতঞ্জলি সমাধির লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছেন — তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূণ্যমিব সমাধিঃ (৩/৩) — ধ্যান যখন অর্থ নির্ভাস হয় অর্থাৎ ধ্যান যখন এমন প্রগাঢ় হয় যে ধ্যেয় বিষয়মাত্রের সত্তই কেবল উপলব্ধি হতে থাকে এবং নিজের প্রত্যয়াত্মক স্বভাবও শূণ্যবৎ হয় অর্থাৎ 'আমি ধ্যান করছি' এ বোধও যখন থাকে না, তখন সেই ধ্যানকে সমাধি বলা হয়। এখানে প্রত্যয় শব্দের অর্থ অনুভূতির একাগ্রতা — 'মনসোহ্যমনীভাবঃ'।

যাজ্ঞবল্ক্যের মতে —

সমাধিঃ সমতাবস্থা জীবাত্মা-পরমাত্মনোঃ।
ব্রহ্মণ্যেব স্থিতির্বা সা সমাধি প্রত্যাগাত্মনঃ।। (যোগী যাজ্ঞবল্ক্যম্ ১০/২)

অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার সমতাবস্থা এবং অভেদজ্ঞানই সমাধি। এটি যুগপৎ ব্রহ্মানন্দ রসাবেশ ও জ্ঞানসিদ্ধির অবস্থা সন্দেহ নাই।

এই মহত্তম অনুপম অবস্থা কোনক্রমেই মনের মূর্চ্ছাগ্রস্ত অবস্থা বা তন্ময়ত্ব নয়। অথচ অনেক সাধক ও প্রেমিক ভক্ত তন্ময়ত্বকেই সমাধি মনে করে বিভ্রান্ত হন। অনেকেই দেখেছে দ্বৈতসাধক তাঁর আরাধ্যের ধ্যান করতে করতে তীব্র ভাবনা ও দৃঢ় ইচ্ছাবলে বাহ্যজগৎ ভুলে গিয়ে আরাধ্য বস্তুতে ডুবে যান। আবার, কোন সাধনা ছাড়াই বালক যুবা বৃদ্ধা প্রায় প্রত্যেকেই নিজের কাজ বা কাম্য বস্তুর চিন্তাতে, এবং প্রেমিক প্রেমিকা আপন আপন প্রেমাস্পদের চিন্তায় স্থানকালপাত্র ভুলে গিয়ে সম্পূর্ণ বিভোর ও মগ্ন হয়ে যান, এমন ঘটনাও আমরা অহরহ প্রত্যক্ষ করি। আমার এক সহপাঠীকে দেখেছি, সে লেখাপড়ার সময় এমনই তন্ময় হয়ে পড়ত যে তার জানালার পাশ দিয়ে বাদ্যভাণ্ড সহ কোন মিছিল গেলেও তার তন্ময়তার কোন ছেদ পড়ত না। গ্যালিলিও যখন তাঁর বিখ্যাত ক্ষেত্রতত্ত্ব নিয়ে অঙ্ক কষায় মগ্ন ছিলেন, তখন তাঁর চারদিকে যে উদ্যত তরবারি হস্তে গ্রীক সৈন্যগণ তাঁকে হত্যা করতে উপস্থিত, সে দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল না। শুনেছি, দার্শনিকশ্রেষ্ঠ আচার্য ব্রজেন্দ্র নাথ শীল, ছাদের উপর বসে নক্ষত্রখচিত আকাশ দেখতে দেখতে এতই তন্ময় হয়ে পড়তেন কখন যে রাত্রি প্রভাত হয়ে যেত, তা তিনি জানতে পারতেন না। এই যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিভেদে বস্তুভেদে বিভিন্ন শ্রেণীর তন্ময়ত্ব — একে কোনমতেই সমাধি বলে ভুল করা উচিত নয়। কারণ ঐ ধরনের তন্ময়তা সম্পূর্ণভাবে মনেরই ক্রিয়া, মন বস্তুবিশেষে বিশেষভাবে লিপ্ত হয় মাত্র। এই অবস্থায় ধ্যান ধ্যেয় ধ্যাতা তিনই বিদ্যমান থাকে। অথচ প্রকৃত সমাধিতে দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন, ধ্যেয় ধ্যাতা ধ্যান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞান — এই ত্রিপুটির লয় হয়।

প্রতিদিন নিদ্রান্তে যে কেউ লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে, সুষুপ্তি ভঙ্গে জাগ্রৎ অবস্থায় জগৎ জ্ঞান উপস্থিত হওয়ার পূর্বক্ষণে ক্ষণকালের জন্য একটা শূণ্যময় অবস্থা ভাসে। এর নাম নির্বিকল্প স্থিতি। অনেক যোগী ঐ স্থিতিকে লক্ষ্য করে সমাধিস্থ হওয়ার চেষ্টা করেন অর্থাৎ ভাবেন যে ঐ স্থিতি দীর্ঘতর ও স্থায়ী করতে পারলেই বুঝিবা সমাধির অবস্থা আসবে। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। মানুষের জীবনে কত রকম ভাবে যে নির্বিকল্প স্থিতি দেখা দেয় সে সম্বন্ধে শাক্তাগমের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ত্রিপুরারহস্যের' জ্ঞানকাণ্ডে বিশদ আলোচনা আছে। সমাধির

স্বরূপটি ভালভাবে জানার জন্য তৎসদৃশ যতগুলি অবস্থা আসে (যথা-মনের মূর্চ্ছা, তন্ময়তা, নির্বিকল্পতা, মুগ্ধাবস্থা, জড়াবস্থা ইত্যাদি) সাধকের মনে সমাধি সম্বন্ধে ভ্রম উৎপাদন করে অর্থাৎ যেগুলিকে সাধারণ ভক্ত ও সাধকের দল ভুলক্রমে সমাধি বলে মনে করেন সেগুলি সম্বন্ধে সর্বাগ্রে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই আমি একটু আগে তন্ময়তা সম্বন্ধে কিছু বলেছি, এখানে নির্বিকল্প স্থিতি প্রসঙ্গে 'ত্রিপুরারহস্য' হতে কিছু উদ্ধৃত দিচ্ছি —

যচ্চিরাদ্বাবাঞ্ছিতং কিঞ্চিদলভ্যত্বেন নিশ্চিতম্। অকস্মাৎ তস্য সম্প্রাপ্তির্যদা ভবতি বৈ মুনে।। ৬
তদা ন বেদ বাহ্যং বাপ্যান্তরং বা ক্ষণং নরঃ। তিষ্ঠেন্নিদ্রয়াক্রান্তঃ স সমাধিরুদীরিতঃ।। ৭

— লৌকিক ব্যবহারিক জীবনে চিরবাঞ্ছিত কোন বস্তু যখন অলভ্য বলে সুনিশ্চিত ধারণা জন্মে, তখন যদি অকস্মাৎ দৈববশে সে বস্তু প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন প্রাপক জীব ক্ষণকালের জন্য বাহ্য বা আন্তর সর্বপ্রকার অনুভূতিরহিত স্থিতি প্রাপ্ত হয় অথচ নিদ্রিতও থাকে না এই স্থিতিই নির্বিকল্প স্থিতি। তখন ক্ষণকালের জন্য জীব স্বস্বরূপে স্থিতই থাকে কিন্তু সেই স্বরূপস্থিতি সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ হয় না। মুহূর্তকাল পরেই বিষয়প্রাপ্তি জনিত আনন্দানুভূতি তাকে আচ্ছন্ন করে।

অতিপ্রিয়ং স্বপুত্রাদি বিভুং চ গৃহকর্মণি। অরোগিনং যদকস্মাৎ সংশৃণোতি মৃতং কিলঃ।। ১০
তদা ন বেদ বাহ্যং বাপ্যান্তরং বা ক্ষণং নরঃ। তিষ্ঠেন্নিদ্রয়াক্রান্তঃ স সমাধিরুদীরিতঃ।। ১১

— ব্যবহারিক জীবনে উপার্জনরত ও পরিবারের সর্বময় কর্তা স্বাস্থ্যবান্ অরোগী একমাত্র গুণবান পুত্রের অকস্মাৎ মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তিতেও জীবের ক্ষণকালের জন্য বাহ্য ও আন্তর সর্বপ্রকার অনুভূতিরহিত এক নির্বিকল্প স্থিতি উপস্থিত হয় অথচ নিদ্রাভিভূত থাকে না, কিছুক্ষণ পরেই অসাড় দেহমনে পুত্রবিয়োগ ব্যথার অনুভূতি জাগে, সে শোকাভিভূত হয়।

নির্বিকল্প স্থিতির এই রকম আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। নবপরিণীতা স্ত্রীর সঙ্গে সম্পরিষ্বক্ত অবস্থায় অথবা সহসা ব্যাঘ্রাদি দর্শনেও মনে অনুরূপ স্থিতি দেখা দেয়। কোন অতি দূরবর্তী বস্তুকে দৃষ্টিগোচর করার জন্য মন যখন একাগ্র হয় তখন মন জলৌকার মত দীর্ঘ হয়ে যায় (অর্থাৎ জলৌকা যেমন এক তৃণ হতে অপর তৃণে যাবার জন্য দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয় মন তখন তেমনি ভাবে দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়) এবং যে পর্যন্ত না সেই বস্তু প্রত্যক্ষ হয়, সেই পর্যন্ত এই উভয় অবস্থার সন্ধিস্থলে অন্তবর্তীকালটুকুতে দেহবোধও থাকে না, বস্তুবোধও জাগে না — এমন একটি আংশিক নির্বিকল্প স্থিতি দেখা দেয়। বৈজ্ঞানিকগণ যখন গবেষণায় মগ্ন থাকেন, তখন তাঁদের মধ্যেও তদ্গত অবস্থায় নির্বিকল্প স্থিতি দেখা যায়। এই নির্বিকল্প স্থিতিকালেই তাঁদের নিকট প্রকৃতির আবরণ উন্মোচিত হয়, তাঁরা অভীষ্ট সত্য আবিষ্কারে সমর্থ হন।

মানুষের জীবনে সকলেরই চিত্তে এক বৃত্তিজ্ঞান বিলয়ের পরেই অপর বৃত্তিজ্ঞান ভাসে। খণ্ড খণ্ড পৃথক বৃত্তিজ্ঞানের প্রবাহ নিয়েই আমাদের জীবনযাত্রা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এক বৃত্তিজ্ঞানের বিলয় ও অপর বৃত্তিজ্ঞানের উদ্ভবের সন্ধিক্ষণে প্রতি জীবই নির্বিকল্প দশায় স্থিতি লাভ করে থাকে — 'তদন্তরক্ষণৌঘেষু নির্বিকল্পদশাস্থিতা'।

নির্বিকল্প স্থিতির এত সব বিবরণ দেওয়ার পর কিন্তু ত্রিপুরারহস্যকার মন্তব্য করেছেন যে ঐ সমস্ত স্থিতি সমাধি শব্দে বা সংজ্ঞায় অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। স্বাভাবিক ব্যবহারিক জীবনের পূর্ববর্ণিত নির্বিকল্প স্থিতির অনুকরণে, যাঁরা তদনুরূপভাবে দীর্ঘকাল নির্বিকল্প স্থিতিতে থাকবার চেষ্টায় প্রাণস্পন্দন নিরোধ ও চিত্তস্পন্দন নিরোধ করে সমাধিলাভ হয়েছে বলে মনে করেন, গ্রন্থকার তাঁদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করে বলেছেন যে ঐ রকম তথাকথিত সমাধিস্থিতি শশশৃঙ্গবৎ অসৎ — 'সমাধিরস্তি চান্যস্য সমাধিঃ শশশৃঙ্গবৎ'। সমাধিবৎ নির্বিকল্পস্থিতি অজ্ঞান সমাধি, জড় সমাধি বা মূঢ় সমাধি নামের যোগ্য। শাক্ত্যাগমের ঐ অনুভবী সাধকপ্রবরের মতে,

সমাধির্বৈ স্বরূপস্য বিমর্শো নান্য উচ্যতে। নির্বিকল্পস্বরূপং তু সর্বাশ্রয়াতয়া সদা।। ১১৩

অর্থাৎ অবিচ্ছেদে আত্মস্বরূপানুসন্ধানের নামই সমাধি। নির্বিকল্প জ্ঞানস্বরূপ পরমাত্মা সর্বাধিষ্ঠানরূপে বর্তমান বলেই সর্ববস্তু স্ফূর্তি পায়, স্বপ্রকাশ আত্মচৈতন্যই অজ্ঞান ও অজ্ঞানমূলক জীবজগতের ভাসক। 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বৃত্তি দ্বারা সেই নিত্যস্ফূর্তি আত্মচৈতন্য প্রত্যয়ের একতানতাই সমাধি নামের যোগ্য।

প্রথম জীবাবস্থা থেকে সমাধি অবস্থায় যাবার সময় মুগ্ধাবস্থা এসে যোগীর গতিরোধ করে। ধ্যানকালে অকস্মাৎ জ্যোতিদর্শন, অতীন্দ্রিয় দৃশ্য দর্শন বা অলৌকিক শব্দ শ্রবণ করলে যোগীর মন বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধীভূত হয়ে পড়ে। এই অবস্থার নাম মুগ্ধাবস্থা। মুগ্ধাবস্থাতে জগৎ জ্ঞান এবং স্বীয় অস্তিত্ব জ্ঞান থাকে না। এই অবস্থা হতে হঠাৎ জাগ্রত হয়ে সাধক উপলব্ধি করেন যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁর আত্মসত্তা এবং সৃষ্টির সত্তা লোপ পেয়েছিল! এটি কিন্তু সুষুপ্তির মতই জীবের অবস্থা বিশেষ। কিন্তু অনেক প্রবীণ সাধকও এই মুগ্ধ অবস্থাকেই সমাধি অবস্থা মনে করে ভ্রমে পতিত হন এবং অভ্যাস দ্বারা এই অবস্থারই স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে প্রয়াস পান। তাঁরা এই সত্যটি ভুলে যান যে, সৃষ্টিজ্ঞান এবং দেহাত্মক জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যে শুদ্ধ চিন্ময় নির্গুণ আত্মসত্তাতে অবস্থিতি একমাত্র তাকেই সমাধি অবস্থা বলা যায়। মুগ্ধাবস্থাতে আত্মসত্তার অবিদ্যমানতা বোধ হলেই তাকে সমাধি বলা যাবে না। লয় বা নির্মাণ অবস্থাতেও সৃষ্টিজ্ঞান ও আত্ম অস্তিত্ব জ্ঞান লুপ্ত হয়। কিন্তু সুষুপ্তি বা মুগ্ধাবস্থা এবং লয় বা নির্মাণ অবস্থাতে প্রভেদ এই যে, মুগ্ধাবস্থা বা সুষুপ্তি হয় জীবের, জীব স্বীয় খণ্ড-অস্তিত্ব-জ্ঞান হতে ঐ দুটি অবস্থাতে প্রবেশ করে এবং তা হতে ব্যুত্থিত হয়ে পুনরায় খণ্ড-অস্তিত্বরই অনুভব করে। যেমন, কেশবের মোহ বা সুষুপ্তি অবস্থা হয় এবং কেশবই জাগ্রত হয় কিন্তু প্রকৃত সমাধিতে জীবভাব লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশুদ্ধ নির্গুণ আত্মসম্বিৎ এর উদয় হয়। ব্যুত্থানের পরেও তার আর জীবভাব থাকে না। অনেক সাধককেই দেখা যায়, খেচরী মুদ্রা সহযোগে (জিহ্বাকে বিপরীত দিকে তালুকুহরে প্রবেশ করিয়ে) মাটির নীচে সমাহিত অবস্থায় দীর্ঘকাল থাকার পর পুনরায় উত্থিত হন, কেউ বা ঊর্ধ্ববাহু, কেউ এক পদে দণ্ডায়মান, কারও বিশাল জটাভারের মধ্যে তৃণগুল্মাদির জঙ্গল, কেউ বা দীর্ঘকাল পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে নির্বাত দীপশিখার মত চলৎশক্তিহীন অবস্থায় দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিচ্ছেন। সাধারণ লোকে ঐ সব চিত্তচমৎকারী দৃশ্য দেখে মনে করেন যে ঐ সমস্ত সাধক নিশ্চয়ই সমাধির রস আস্বাদন করেছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত কঠোর তপস্বীদের মধ্যে সকলেই যে যথার্থ সমাধির অবস্থা লাভ করেছেন এ কথা শাস্ত্র স্বীকার করেন না। শাস্ত্রমতে ঐ রকম অধিকাংশ সাধকের সমাধিই জড়সমাধি বা মূঢ় সমাধি মাত্র। মূঢ় সমাধি বা জড় সমাধির অপর নাম অজ্ঞান সমাধি। ঐ রকম সমাধি চিত্তের সপ্ত অবস্থার (জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা, মূঢ় সমাধি, মৃত্যু, তুরীয়) এক একটি অবস্থা বিশেষ। তার দ্বারা চিত্ত নাশ হয়। ঐ রূপ সমাধি তপস্যার ফল বটে, অনেক সময় তার দ্বারা অনেক অলৌকিক শক্তি অর্থাৎ বিভূতিলাভও সম্ভব হয়। কিন্তু জড়সমাধি দ্বারা মোক্ষলাভ হয় না বরং মোক্ষ সুদূর পরাহত হয়, কেননা সমাধি ভঙ্গে দৃঢ় অহংবোধ সহ চিত্ত পুনরুত্থিত হয়ে দৃঢ়তর বন্ধনের হেতু হয়। তদ্‌যথা —

> সিদ্ধিকামনয়া যৈস্তু তপ উগ্রং কৃতং মহৎ। দেহেহপি বিস্মৃতৈস্তেস্তু ক্রিমিকীটাদিভক্ষিতঃ॥ (৩৪/১৭)
> নেয়ং মূর্চ্ছা ন রোগেহয়ং ন মৃত্যুর্জীবনাদয়ম্। সুষুপ্তানন্দবিরহান্ন সুষুপ্তিরিতি স্ফুটম্॥ (৩৪/১৮)
> স্বরূপ লাভ বিরহান্মূঢ়স্থান্ন তুরীয়কম্। দৃশ্যভানং তু নাত্যাসু তাবতা ন কৃতার্থতা॥ (৩৪/১৯)
> ব্যুত্থানানন্তরং তেষাং সংসারোহপি যদা স্থিতঃ। যদাত্মদর্শনং নাস্তি সংসারোহবর্ধিততস্ততঃ॥ (৩৪/২০)
>
> (বিদ্বদ্বর্য নরহরি বিরচিত বোধসারঃ)

— অত্যুৎকট উগ্র কঠোর তপস্যা দ্বারা সিদ্ধিলাভের ইচ্ছায় জড় সমাধি কালে যাঁরা দেহ বিস্মৃত হন এমন কি ক্রিমিকীটাদি দ্বারা ভক্ষিত হতে থাকলেও যাঁরা জানতে পারেন না, তাঁদের সেই সমাধি অবস্থা মূর্চ্ছা নয়, যেহেতু তা রোগাদি জনিত নয়; ঐ অবস্থা মৃত্যু পদবাচ্যও নয় যেহেতু প্রাণবিয়োগ ঘটে না; সুষুপ্তিও নয় কেননা সুখানুভূতি থাকে না এবং তুরীয়বস্থাও নয়, যেহেতু সে সময় স্বয়ং প্রকাশ আত্মচৈতন্যের অনুভূতি নয়। এর একমাত্র যোগ্য নাম - মূঢ় সমাধি। কেবল দৃশ্যবোধ না থাকলেও কেউ কৃতার্থতা লাভ করে না। জড় সমাধিবান যোগী যেহেতু আত্মদর্শনের পথে জ্ঞান-সমাধি লাভ করেন না, এই জন্য তাঁদের ব্যুত্থানের পর পুনরায় জীবজগৎ রূপ সংসার ভেসে উঠে।

পুরাণাদিতে হিরণ্যকশিপু, রাবণ প্রভৃতি দৈত্য ও রাক্ষসগণের উগ্র তপস্যার বিবরণ আছে। তাঁরা নাকি বায়ুমাত্র আহার করে দীর্ঘকাল যাবৎ নিস্পন্দ অবস্থায় তপস্যা করেছিলেন। সেই সময় তাঁরা যে সমাধি লাভ করেছিলেন, তা জড় সমাধি বা মূঢ় সমাধি। ব্যুত্থানের পর দেখা গেছে তারা যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা স্বর্গজয় ও পৃথিবী জয় করেছিলেন। মূঢ় সমাধিতে আত্মজ্ঞানের অভাবে এইভাবে ভোগ বাসনা অর্থাৎ সংসার বীজরূপে থেকে যায়।

এতক্ষণ ধরে সমাধি সম্বন্ধে আমি এই কথাটাই বুঝাতে চাইছি যে, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বৃত্তি দ্বারা আত্মস্বরূপে স্থিতিলাভই সমাধি। সে পথ জ্ঞানের পথ, বিচারের পথ। আত্মবিমর্শহীন* কোন ক্রিয়া বা পদ্ধতি অবলম্বন করে যত কঠোর তপস্যা করা যাক না কেন, তাতে যথার্থ সমাধিলাভ কখনই সম্ভব নয়। এ সম্বন্ধে পূর্বতন সকল ঋষিই একমত। সুপ্রাচীন কাশ্মীরী শৈবাগমের পুস্তক 'শিবসূত্রম্' নামক মহাগ্রন্থে (যার রচয়িতা স্বয়ং মহাযোগেশ্বর মহাদেব) এইভাবেই ব্যক্তিত। সেখানে শিব বলেছেন — মগ্নঃ স্বচিত্তে প্রবিশেৎ॥ শিবসূত্রম্ ৩/২১।

এই মন্ত্রে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শ্রীমদ্ আচার্য ভট্ট ভাস্কর বলছেন —

স্বাত্মন্যেব নিমগ্নঃ স্যাৎ প্রবৃত্ত্যুপরমে সতি। এবং নিমেষবশতঃ শিবো ভূত্বা স্বচেতসা॥

(শিবসূত্রবার্ত্তিকম্ ৩/২১)

— অর্থাৎ বহির্মুখ চিত্তকে অন্তর্মুখ করার নাম নিমেষ, নিমীলন বা আবৃতচক্ষু। চিত্তকে বহির্বিষয় হতে উপরত করে কেবল আত্মাতে নিমগ্ন করলে তবেই শিব-তাদাত্ম্য লাভ হয় অর্থাৎ জীব শিবস্বরূপ পরমাত্মার সঙ্গে ঐক্য লাভ করে। এইভাবে চিত্তকে আত্মনিমগ্ন করার নামই শিবসমাপত্তি বা সমাধি।

ঐ অবস্থা লাভের জন্য প্রত্যেক সাধকের পক্ষেই কতকগুলি প্রাথমিক তথ্য নিত্য স্মরণে রাখা কর্তব্য। তাঁদের জানা দরকার যে, যোগসাধনের প্রথম অবস্থাতে মন যখন বাহ্য জগৎ ত্যাগ করে অন্তর্মুখী হয়, তখন নানা রকমের জ্যোতিদর্শন ও শব্দের ঝঙ্কার শ্রুতিগোচর হয়, সে সব উপলব্ধি বড় বিচিত্র। এই জ্যোতিমাত্র দর্শনকে যাঁরা যোগের চরমসীমা বলে মনে করেন তিনি জ্যোতিতে ব্রহ্ম ভ্রম করে জ্যোতিঃস্বরূপ বলে গেছেন এবং 'আমার ব্রহ্মদর্শন হল' মনে করে আপ্যায়িত হয়েছেন। যাঁর শব্দ শ্রবণ মাত্রই চরম সীমা, তিনি শব্দ ব্রহ্ম, প্রণব ব্রহ্ম, ওঁকার ব্রহ্ম ইত্যাদি বলে গেছেন এবং শব্দ শ্রবণকেই চরম অনুভূতি বলে ডঙ্কানাদ করেছেন। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি আত্মযাজী বৈদান্তিকের দৃষ্টিতে এ সকলই ভ্রম। বেদান্তের সাধক জানেন যে ঐ সমস্ত দর্শন ও শ্রবণ অন্তর্মুখী মনেরই কার্য।

প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তর্মুখী মন যখন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হয়ে বিশুদ্ধ সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন তা যদি আত্মসত্তা অবলম্বন করে তবে তা আত্মাতেই বিলীন হয়ে যায় এবং প্রকৃত সমাধির অবস্থা উপস্থিত হয়। সাধনার লক্ষ্যই হল জীবভাব থেকে মুক্ত হয়ে ব্রহ্মভাবে স্থিতি। বাল্যকালে যেমন শত সাধনাতেও যৌবন আসে না, যৌবনে বার্ধক্য আসে না, বাল্যাবস্থার লয়ে যেমন যৌবনের উদয় ও যৌবনের লয়ে যেমন বার্ধক্যের উদয় হয়, সেই রকম জীবাবস্থার অবসানে ব্রহ্মাবস্থা আপনা হতেই উদিত হয়। ব্রহ্মাবস্থা এবং জীবাবস্থা আত্মারই অবস্থান্তর মাত্র। আত্মাই বদ্ধাবস্থায় জীব এবং মুক্তাবস্থায় ব্রহ্ম।

একমাত্র আত্মাতে সমাপত্তি লাভের সাধনা ছাড়া আর কোন ভাবেই জীবভাবের আবরণ অপাবৃত হয় না। জগতে অন্যান্য যতরকম সাধনা আছে, সে সব সাধনায় বহুতর বিচিত অনুভূতি ও ঐশ্বর্য লাভ হলেও ব্যুত্থানের পর সংসারক্ষেত্র অবলম্বন মাত্র সাধকের মন মলিনতা ও জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় কিন্তু যদি মুহূর্তের জন্য আত্মাকে অবলম্বন করে সমাধিলাভ করা যায় এবং 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বোধে জাগরণ ও সমুত্থান ঘটে তাহলে বহির্জগতে প্রত্যাবর্তন অর্থাৎ ব্যুত্থানের পরও সেই সাধক নিত্য ব্যুত্থিত ও নিত্য সমাধিস্থ থাকেন। জীবভাবের উদ্বোধক মন নামক কোন পদার্থের ক্রিয়া তিনি অনুভব করেন না। শাস্ত্র বলেছেন, সেই আত্মজ্ঞ সাধকের মন তখন 'দগ্ধাবস্ত্রাবভাসঃ' অর্থাৎ অগ্নিদগ্ধ বস্ত্রখণ্ডের মত আভাসমাত্র বিদ্যমান থাকে, বস্তুতঃ সেই মনের কোন ক্রিয়া থাকে না। এটি নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা। নির্বিকল্প সমাধিবান যোগীর ব্রহ্মাত্মতা লাভের ফলে বুদ্ধিও নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আচার্য শঙ্কর বলছেন —

ব্রহ্মানন্দরসাবেশাদেকীভূয় তদাত্মনা। বুদ্ধে র্যা নিশ্চলাবস্থা স সমাধিরকল্পকঃ॥

(সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ। ৮৯৯)

অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দ রসাবেশে ব্রহ্মস্বরূপের সঙ্গে একাত্মতা লাভ করলে বুদ্ধির যে নিশ্চলাবস্থা হয় তার নামই নির্বিকল্প সমাধি।

---

* আত্মবিমর্শহীন - বিমর্শ শব্দটির অর্থ বিশেষভাবে বিচার। আত্মবিমর্শ শব্দের দার্শনিক অর্থ — আত্মার অবিচ্ছেদে অনুসন্ধান। বেদান্ত প্রতিপাদিত তত্ত্বমস্যাদি বাক্য বিচারই তার একমাত্র পন্থা। যে সমস্ত সাধনায় জ্ঞানের পথে আত্মবিচার অর্থাৎ স্বরূপ সন্ধানের সম্বন্ধ নাই, সেই সমস্ত সাধনা আত্মবিমর্শহীন।

শেষ কথা, শাস্ত্র-স্বাধ্যায়ের ফলে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, সমাধি হল সম্যকভাবে এবং সমভাবে অধিষ্ঠান, চৈতন্যের জাগরণ।

সবসময় সর্বত্র যে কোন অবস্থাতেই সেই অখণ্ড পরমানন্দ, সমরস, রসস্বরূপ, জ্যোতিস্বরূপে সমভাবে, নিরবচ্ছিন্নভাবে অধিষ্ঠিত থাকাই সমাধি। সমত্বং যোগমুচ্যতে। যখন সমত্ব বোধ সব কিছুতে হয় তখনই হয় সমাধি। যখন যোগী ধ্যানযোগে সচ্চিদানন্দময়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যান, সর্বভূতান্তরাত্মার সঙ্গে একাত্মবোধ হয়, তখন তাঁর কোন বিভেদ বোধ থাকে না। এই নির্বিকল্প সমাধি অবস্থায় আচার্য শঙ্কর বলে উঠেছিলেন — 'অহং নির্বিকল্পো নিরাকারোপেবিভূর্ব্যাপী সর্বত্র সর্বেন্দ্রিয়াণাম্''। আবার যেহেতু এই অবস্থায় চিদাকাশে সম্যক জ্ঞানের উদয় হয়, সেহেতু বিশ্বের সকল রহস্যেরও সমাধান তাঁর কাছে হয়ে যায়। যোগীর তখন কিছুই অজানা থাকে না, পূর্ণভাবে জানা হয়ে যায়। কাজেই সমাধিবান ঋষি বা যোগী ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে যান। তার পূর্ণতম প্রজ্ঞা, পূর্ণতম আনন্দ লাভ হয়।

তখন অনুভবী সাধক তাঁর অনুভবের স্তর থেকে সমাধিস্থ অবস্থায় কিরকম অনুভূতি হয় তা বলতে গিয়ে বলেছেন —

উপেক্ষ্য নামরূপে দ্বে সচ্চিদানন্দ বস্তুনি।
সমাধিং সর্বদা কুর্যাদ্ হৃদয়ে বাথবা বহিঃ॥
স বিকল্পোঽবিকল্পশ্চ সমাধির্দ্বিবিধো হৃদি।
দৃশ্যশব্দানুবেধেন সবিকল্পঃ পুনর্দ্বিধা॥
কামাদ্যাশ্চিত্তসাদৃশ্যাত্তৎ সাক্ষিত্বেন চেতনাম্।
ধ্যায়েদ্দৃশ্যানুবিদ্ধোঽয়ং সমাধিঃ সবিকল্পকঃ॥
অসঙ্গঃ সচ্চিদানন্দঃ সপ্রভো দ্বৈতবর্জিতঃ।
অস্মীতি শব্দবিদ্ধোঽয়ং সবিকল্প সমাহিতঃ॥
স্বানুভূতিরসাবেশাদ্দৃশ্য শব্দানুপেক্ষ্য তু।
নির্বিকল্প সমাধিঃ স্যান্নির্বাতস্থলদীপবৎ॥

অর্থাৎ 'সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু। নামরূপ কল্পিত বা মিথ্যা; এইটে নিশ্চয় করে, নামরূপকে পরিত্যাগপূর্বক, অন্তরে বা বাহ্যে, সর্বদাই সমাধি আশ্রয় করবে। আন্তর সমাধি — সবিকল্প নির্বিকল্প ভেদে দুই প্রকার, আবার নির্বিকল্প সমাধিও দুই প্রকারের — (১) দৃশ্যানুবিদ্ধ, (২) শব্দানুবিদ্ধ। ভাবাভাব চিত্তের কামাদি বৃত্তিগুলিও ভাব অভাব ধর্মযুক্ত। কারণ চিত্তের সদ্ভাবে তাদের সদ্ভাব চিত্তের অভাবে তাদের অভাব। জাগ্রতাবস্থায়, ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃত্তিগুলি প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ এক বৃত্তির পর অপর বত্তির উদয় হয়। চিত্ত কখনও বৃত্তিশূন্য থাকে না, এক বৃত্তির লয় হলে আবার অন্য বৃত্তির উদয় হয়। পরন্তু সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদি অবস্থাতে চিত্তের লয় হওয়ায় আর কোন বৃত্তিরও উদয় হয় না। সেই চিত্তবৃত্তির বিবিধ প্রকার বিকৃতাবস্থা, তার ভাব ও প্রভাব এবং তদুভয়ের সন্ধিস্থল যিনি স্বপ্রকাশরূপে প্রকাশ করেন, তিনি প্রত্যক্ষ চৈতন্যরূপ আত্মা। অপরোক্ষভাবে এটি অবগত হয়ে তাঁর ধ্যান করবে — ইহাই দৃশ্যানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি। এই দৃশ্যানুবিদ্ধ সমাধি দ্বারা প্রত্যেক্ চৈতন্যস্বরূপ আত্মার অনুভূতি দৃঢ় হলে, সেই অসঙ্গ, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মচৈতন্য উপলব্ধি হয়ে থাকে। এইরূপ দৃঢ় ভাবনাকে শব্দানুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে। পূর্বোক্ত দৃশ্য ও শব্দানুবিদ্ধ সমাধি দ্বারা চিত্ত যখন সুস্থির হয়ে স্বরূপের সঙ্গে একত্ব লাভ করবে, তখন দৃশ্য ও শব্দ উভয়ই অন্তর্হিত হয়ে যাবে। তখন কেবল স্বয়ংসাক্ষী ও সাক্ষ্যভাবরহিত অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণানন্দরসে নিমগ্ন থাকবে, চিত্তনির্বাহ দীপকলিকার ন্যায় নিশ্চল হয়ে তদাকার অবস্থা প্রাপ্ত হবে, এই হল নির্বিকল্প সমাধি।'

কাল সকালেই এখান থেকে চলে যেও খেড়ীঘাটের পথে। পথে পড়বে গোমুখ ঘাট। একরাত্রি সেখানে কাটাবে। আবার দেখা হবে ওঁঙ্কারেশ্বর ক্ষেত্রে। শৈলেন্দ্র! এই কয়দিন যোগের যে গুহ্য-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করলাম তা তোমার ডায়েরীতে নির্ভুলভাবে লিখতে পেরেছ বলে খুশী হয়েছি। শিবমস্তু। কণ্ঠস্বর নীরব হল, ঘরের ভিতর বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। বুঝলাম, তিনি চলে গেলেন।

সকালে ঘুম ভাঙতেই মনে পড়ল মহাত্মা সোমানন্দজীর নির্দেশ। আজ আমাদের যাত্রার দিন। এবার সকলেই তৈরী হয়ে নিন এই কথা বলতে বলতেই রঞ্জন উঠে পড়েই নিজের বিছানা গুটিয়ে বেঁধে ফেললেন। তাঁর দেখাদেখি আমরাও নিজেদের ঝোলা গাঁঠরী বেঁধে তৈরী হয়ে গেলাম।

— এ স্থান আমার স্মৃতিপথে অক্ষয় হয়ে গাঁথা থাকবে, এইখানে এসে মহর্ষির কৃপা, মা নর্মদার কৃপা বেশী করে উপলব্ধি করতে পেরেছি।

রঞ্জনের এই কথা শুনে আমরা একযোগে বলে উঠলাম — আলবৎ! একথা লাখ কথার এক কথা! মঙ্গলারতির পর পুরোহিতমশাইকে 'নম নারায়ণায়' বলে 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে আমরা গাঁঠরী তুলে নিলাম। বাঁ হাতে কমণ্ডলু, ডান হাতে লাঠি। গঙ্গেশ্বরজী ও মাতা নর্মদাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে নৌকায় উঠে বসলাম। তরতর করে নৌকা এগিয়ে চলেছে এই গঙ্গেশ্বর মন্দির হতে নর্মদার দক্ষিণতটে।

নৌকা থেকে নর্মদার ঘাটে নেমে জলস্পর্শ করে চড়াই-এর পথ ধরলাম, সূর্যকিরণে ওপারের উত্তরতটসহ নর্মদার জলও চিক্‌চিক্ করছে। পাথরের খাঁজে খাঁজে সাবধানে পা দিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে উঠতে লাগলাম উপরের দিকে। শাল, সেগুন, বেড়াই বেড়ী এবং মহানিম গাছ থাকে থাকে উঠে গেছে উপরের দিকে। মহানিম গাছের ডালে ডালে প্রায় প্রতিটি শাখাতেই অজস্র বন্য বানর দেখলাম। আমাদের দেখেই হুঁপ হাঁপ শব্দে এক ডাল হতে অন্য ডালে লাফাতে লাগল। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এদের হুঁপ হাঁপ শব্দে অতিষ্ঠ হয়ে আমরা মহানিম গাছের তলা ছেড়ে আরও উপরের দিকে উঠতে লাগলাম লাঠি ঠুকে ঠুকে। দূর থেকে একটা বাঘের গর্জন ভেসে উঠল। বাঘের গর্জন শুনেই আমরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলাম।

রঞ্জন বলল — আমরা সোমানন্দজীর চোখে চোখে আছি। ভয় কিসের। আজ সামনে বাঘ পড়লে সোহং স্বামীর মত আমি বাঘের সঙ্গে লড়ে যাব। চলুন আমরা উঠতে থাকি। এই পাহাড়টি মনে হচ্ছে স্তরে স্তরে বিভক্ত। হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে উঠতে লাগলাম সবাই। একটা পাথরে হোঁচট খেলাম। ডান পায়ের বুড়ো আঙুল থেকে রক্ত বেরুচ্ছে। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতে লাগলাম। দূর থেকে একটা কুলু কুলু ধ্বনি কানে ভেসে আসছে — এ কি কোন ঝরণা? না — নর্মদার স্রোতধ্বনি। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম, মনে হচ্ছে যেন বাঁদিক থেকে ভেসে আসছে। আমরা সেই দিকেই এগোলাম। ময়ূরের কেকাধ্বনির সঙ্গে ধনেশ পাখীর কর্কশ রব মিশে এই নির্জন পাহাড়ের বনভূমিতে অদ্ভুত একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। অপরাহ্নের ছায়া পড়ে এসেছে, রোদ হলদে হয়েছে, সামনে পিছনে যেদিকে তাকাই, দেখতে পাচ্ছি, কি সুন্দর বনের বড় বড় গাছ এবং পাষাণময় উচ্চ শির। আরও আধ ঘন্টা হেঁটে একটা প্রাচীন পাথরের শিবমন্দিরে পৌঁছে গেলাম। কোথাও কেউ নেই। শিবলিঙ্গের উপর ফুল ও বেলপাতা চাপানো আছে। কেউ হয়ত পূজা করে গেছেন। মন্দিরের গায়ে শ্বেতপাথরে লেখা নীলকণ্ঠেশ্বর। আর এর জীর্ণোদ্ধার করেছেন প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী রাণী অহল্যাবাঈ। মন্দিরের পাশেই একটি কুণ্ড। নীলগঙ্গা কুণ্ড। এর জল একটি গোমুখ দিয়ে নর্মদায় পড়ছে বলে এর নাম গোমুখ ঘাট।

হঠাৎ মন্দিরের পিছন দিক থেকে এক জটাজুট সাধু এসে উপস্থিত হলেন। তিনি আমাদের সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। অস্ফুট স্বরে 'রেবা রেবা' জপ করতে করতে কমণ্ডলু নিয়ে নর্মদায় গেলেন এবং এক কমণ্ডলু জল নিয়ে এসে শিবের মাথায় ঢেলে শিবলিঙ্গের ভাল করে মার্জনা করলেন। নিজের গায়ের ওড়না দিয়ে শিবলিঙ্গের গা মুছিয়ে দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে শিবের আরতি আরম্ভ করলেন। আমরাও ইতিমধ্যে নর্মদা স্পর্শ করে তাঁর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছি। সাধু নিবিষ্ট চিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন —

তেজসামপি যত্তেজস্তপসামপি যত্তপঃ। শান্তানামপি যঃ শান্তো দ্যুতীনামপি যা দ্যুতিঃ॥
দান্তানামপি যো দান্তো ধীমতামপি যা চ ধীঃ। দেবানামপি যো দেব ঋষীণামপি যস্তৃষিঃ
যজ্ঞানামপি যো যজ্ঞঃ শিবানামপি যঃ শিবঃ। রুদ্রাণামপি যো রুদ্রঃ প্রভা প্রভবতামপি
যোগিনামপি যো যোগী কারণানাঞ্চ কারণম্। যতো লোকাঃ সম্ভবন্তি ন ভবন্তি যতঃ পুনঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতস্য হরস্যামিততেজসঃ। অষ্টোত্তরসহস্রন্তু নাম্নাং সর্ব্বস্য মে শৃণু।
যচ্ছ্রু ত্বা মনুজব্যাঘ্র! সর্ব্বান্ কামানবাপ্স্যসি।

যিনি তেজেরও তেজ, যিনি তপস্যারও তপস্যা, যিনি শান্তদিগের মধ্যে প্রধান শান্ত, যিনি প্রভা সকলেরও

প্রভা, যিনি দান্তদিগের মধ্যে প্রধান দান্ত, যিনি জ্ঞানীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, যিনি দেবতাদেরও দেবতা, যিনি ঋষিগণেরও ঋষি, যিনি যজ্ঞসমূহেরও যজ্ঞ, যিনি মঙ্গলকারীদেরও মঙ্গলকারী, যিনি রুদ্রগণেরও রুদ্র, যিনি প্রভাবশালীদেরও প্রভাব, যিনি যোগিগণের মধ্যে প্রধান যোগী, যিনি কারণেরও কারণ এবং যাঁ হতে লোকসকল উৎপন্ন হয়, আবার যাঁতেই লয় পায়; সর্বভূতের আত্মা, সংহারকর্ত্তা ও অমিততেজা সেই মহাদেবের অষ্টোত্তরসহস্র নাম আপনি আমার নিকট শ্রবণ করুন; মনুষ্যশ্রেষ্ঠ! আপনি যা শুনিয়া সমস্ত অভীষ্ট লাভ করবেন।

আমি চমকে উঠলাম মন্ত্র শুনে। আমার মনে পড়ে গেল। 'এই স্তবরাজই ত আমাকে ওঁকারেশ্বরে দান করেছিলেন মহাত্মা প্রলয়দাসজী। চারদিক সুগন্ধে ভরে গেছে। প্রায় এক ঘন্টা ধরে শিব বন্দনার পর তাঁর একটি ছোট ঘন্টার একটানা ধ্বনি ও ববম্ ববম্ গালবাদ্য শুনে বুঝলাম, স্তবপাঠ শেষ হল। সাধুজীর আরতিও শেষ হয়েছে।

সাধুজী তাঁর ঝোলা থেকে দুটি বড় মোমবাতি বের করে জ্বালালেন। মন্দিরেরর মধ্যে আলো দেখে চোখ জুড়ালো, যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। আমার পায়ে ক্ষত দেখে ঝোলা থেকে দু'তিনটি তাজাপাতা বের করে হাতে দলে আমার পায়ের বুড়ো আঙুলের ক্ষতস্থানে বেঁধে দিলেন। বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি কোন কথাই কানে তুললেন না। আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। সাধু আপনা হতেই নিজের প্রসঙ্গে অনেক কথা শুনালেন। তিনি জানালেন — আমি প্রবাসী বাঙালী। বেনারসেই আদি বাড়ী। সংস্কৃতে বি.এ. পাশ করার পর সরকারী চাকরিতে যোগ দেই, আমার জীবনে দুবার বিবাহের যোগ আসে। প্রথমবার অকস্মাৎ মায়ের মৃত্যুর জন্য বিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। দ্বিতীয়বার পিতৃবিয়োগ ঘটে, আমি বিবাহ না করার মনস্থ করি। একদিন ভোরবেলা যখন আমি শিবালা ঘাট থেকে স্নান করে উঠে আসছি তখন দেখি এক জটাজূট সাধু আমার নাম ধরে ডাকছেন। আমার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল শ্বেতপিঙ্গল বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি অবাক হয়ে তাঁর কাছে যাই। তিনি আমাকে অনুসরণ করতে বলেন। আমি মন্ত্র তাড়িতের মত তাঁর সঙ্গে হাঁটতে থাকি। তিনি বেনারসের বনপুরিয়া নামক এক নির্জন স্থানে নিয়ে আসেন। আমাকে অপেক্ষা করতে বলে উধাও হয়ে যান। প্রায় ঘন্টা চারেক পরে ফিরে এসে বলেন — তোমার নিজের বলতে তো কেউ নেই। আজ থেকে তুমি গৃহত্যাগী হলে। আমি তোমায় মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টকে নিয়ে যাব।

কিন্তু তাঁর কথার এমনই মোহ ছিল যে আমি তাঁকে কোন কথা বলতে বা জিজ্ঞাসা করতে পারি নি। যথাসময়ে অমরকন্টকে উপস্থিত হই। নর্মদার উৎসস্থলে বসে গুরুজী আমাকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেন। নাম রাখেন প্রত্যজ্ঞানন্দ। আমরা নর্মদা পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ি। আমি দু'বার নর্মদার উভয়তট পরিক্রমা করেছি। গুরুজীই আমাকে বেদ বেদান্ত পড়ান। অবশেষে গুরুজী আমাকে এই নীলকণ্ঠেশ্বর মন্দিরে দীক্ষা দেন এবং বলেন এখান থেকে যেন কোথাও না যাই। সেই থেকে আমি নর্মদার এই তট ছেড়ে কোথাও যাইনি। তাও দেখতে দেখতে প্রায় ১০০ বছর কেটে গেল।

বল, তোমাদের মনে কি প্রশ্নের উদয় হয়েছে। তার আমি নিরসন করবার চেষ্টা করব।

আমি বললাম — আচ্ছা অবতার বলতে আমরা বুঝি তাঁর অবতরণ। ভগবান জন্মগ্রহণ করেন, এই মর পৃথিবীতে, মরণশীল মানুষ যাতে তাঁকে দেখতে পায়, জানতে পারে, মানুষীদেহ ধারণ করে তিনি আসেন লীলা রসাস্বাদনের জন্য, সীমাবদ্ধ জীব যাতে সেই অসীম তত্ত্বকে জানতে পারে। অবতারবাদ সমর্থনের জন্য অনেকেই এই গীতাবাক্যটি সমর্থন করে —

যদা যদাহি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানং ধর্মস্য তদাত্মান সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, হিরণ্যক্ষ হিরণ্যকশিপু রাবণাদি দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য তিনি এসেছিলেন। এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত কী?

গীতার ঐ শ্লোক দুটিতে অবতারবাদ কদাপি সমর্থিত হয় না। ঐ গীতামন্ত্রের উদ্দেশ্য Indirect অনুশাসন, প্রেরণাদান, সৎকর্মে প্রচোদনা আর অসৎ কর্ম হতে নিবৃত্তি। 'সতেরা আশ্বস্ত হবে, অসতেরা পাপ কাজ করতে

ভরাবে। গীতার ঐ দুইটি শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ বলে গেছলেন বলেই আমাদের দেশে অবতারের ভীড় পড়ে গেছে! রাজর্ষি ব্রহ্মজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ আত্মভূমিতে দাঁড়িয়ে ঐ দুইটি শ্লোক বলেছিলেন, যেন সমাজ জীবনে তেমনি ধর্মরাজ্যেও যখন নানা বিশৃঙ্খলা এবং অনাচার দেখা দেয়, তখন সমাজে যেমন সংস্কারক বিপ্লবী দেখা দেয়, তেমন ধর্মরাজ্যেও অনেক মহাত্মার ভিতর দিয়ে ভগবানের বিভূতি প্রকাশ হয় — তাঁরা সত্য দৃষ্টি, সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যগ্ জ্ঞান, সত্য বিচার এবং আলোক বাণী শুনিয়ে জনসাধারণের চেতনার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক কল্যাণপ্রসূ পরিবর্তন এনে দেন। তাই বলে তাঁরা যে 'পূর্ণ ব্রহ্ম, সাক্ষাৎ ঈশ্বর' — তা নন।

সাক্ষাৎ পরমাত্মা সেই সর্বব্যাপক মহাচৈতন্য কোন দিন জন্মগ্রহণ করেন না। যিনি অসীম, অনন্ত, সর্বব্যাপী পরমাত্মা, তাঁর পক্ষে একটি ক্ষুদ্র গর্ভাশয়ে আসা অসম্ভব।

১। অজ একপাৎ। (যজুর্বেদ ৩৪, ৫৩)

২। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণ মস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।

কবির্মনিষী পারভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যাতোহর্থান্ ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ (ঈশপোনিষদ্ ও যজুর্বেদ, ৪০, ৮)

'ভগবান সর্বব্যাপী, শোকরহিত, স্থূলদেহরহিত, পূর্ণ, পবিত্র, সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ঠ সর্বাশ্রয়; তিনি বহু বৎসর ব্যাপিয়া সত্য বিষয়সমূহের প্রকাশ করেছেন।' — ইত্যাদি বাক্যে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে সর্বব্যাপক ঈশ্বর জন্মগ্রহণ করেন না। 'মরণশীল মানুষ যাতে তাঁকে দেখতে পায়' এজন্য তাঁর একটি মরদেহ ধারণের কোন প্রয়োজন নেই। একটি বিশেষ সম্প্রদায় একমাত্র মুক্তি উপস্থাপিত করেন, 'অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ' — অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে তিনি যদি সবই পারেন, তাহলে মনুষ্য দেহ নিতে পারবেন না কেন? ঠিক ঐ যুক্তিতেই আপনারা বুঝতে পারবেন, তিনি 'অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে', মানুষ দেহ গ্রহণ না করেও কেন না, মরণশীল মানুষকে — ভক্তকে দর্শন দিতে পারবেন?

মুমুক্ষু ভক্তজন সমাধিধৌত হৃদয়ে তাঁকে দর্শন করেন। উপনিষদ বলছে —

সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যগ্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্,
অন্তঃশরীরে জ্যোতির্ময়ো হি শুভ্রঃ, পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ।

সত্য, ব্রহ্মচর্য্য এবং তপস্যা প্রভাবে নির্মলহৃদয় যতিগণ অন্তঃশরীরে সেই জ্যোতিস্বরূপ পুণ্যময় পরমাত্মাকে দর্শন করেন। ফুলের মধ্যে যেমন সুগন্ধি, কাঠের মধ্যে যেমন আগুন, দুগ্ধে যেমন ঘৃত থাকে, তেমনি সকলের মধ্যেই সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মা বিরাজিত। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ যেমন অগ্নির প্রকাশ হয়, দুগ্ধকে মন্থন করে জ্বাল দিলে যেমন ঘৃত পাওয়া যায়, তেমনি ধ্যানদণ্ড-মন্থনের দ্বারা যম নিয়ম ধ্যান ধারণা সমাধি গুরুকৃপা প্রভৃতিতে যোগী বা ভক্তের হৃদয়ে তিনি প্রকট হন, প্রেমিক ভক্তকে দর্শন দেওয়ার জন্য তাঁকে মানুষ দেহ গ্রহণ করতে হয় না। শৈবালাচ্ছন্ন পুষ্করিণীতে বা ধূলি মলিন আয়নাতে যেমন চন্দ্র বা সূর্যের প্রকাশ দেখা যায় না (দেখা না গেলেও যে তাতে চন্দ্র ও সূর্যের কিরণ বা প্রতিবিম্ব পড়ে না তা নয়, পড়ে, কেবল আবরণের জন্য দেখা যায় না), কিন্তু ঐ শেওলা বা ধূলি আবরণ দূর হলেই যেমন চন্দ্র এবং সূর্যের পূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়, তেমনি ঈশ্বর সকলের হৃদয় আলো করে থাকলেও কোটি কোটি জন্মের কর্মের আবরণ, বাসনার জাল, মানুষের চিত্তরূপ হৃদয় বা দর্পণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাধন প্রভাবে ঐ আবরণ দূর হলেই মুমুক্ষু প্রেমিক ভক্ত সেই হৃদয়স্থ পরমাত্মাকে, অমৃতস্বরূপকে পেয়ে জেনে কৃতকৃত্য হতে পারেন এবং হয়েও থাকেন। তার জন্য শ্রীভগবানের অবতারবাদ স্বীকার করে, তাঁর পরিণামশীল দেহ গ্রহণ আর জঠর যন্ত্রণা ভোগ করার কথা না স্বীকার করলে ভক্তদের কিছু ভক্তির হ্রাস বৃদ্ধি হবে না!

অনন্ত জলরাশির কোন কোন অংশ যেমন শৈত্যের সংস্পর্শে জমে বরফ হয়, তেমনি ভক্তি-হিমের সংস্পর্শে, ভক্ত-হৃদয়ে সেই স্বতঃপ্রকাশ, অনন্ত পরমাত্মা ভক্তমনলোভা বাঞ্ছিতরূপ গ্রহণ করে প্রকট হন, ভক্ত হৃদয়ে তাঁর Manifestation হয়। ভক্ত যখন তাঁকে দর্শন করেন, তখন তিনি স্থূল দেহধারী হলেও, ইন্দ্রিয়পরিচ্ছিন্ন দেহের মধ্যে তাঁর মন বা চিত্ত থাকে না, ভূমার ভূমিতে উধাও হয়ে যায়; পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মনচিত্তাদি অন্তরেন্দ্রিয় — কোন ইন্দ্রিয় দিয়েই সে ইন্দ্রিয়াতীতকে জানা যায় না। জীবাত্মা, ইন্দ্রিয়ের সীমাগণ্ডী অতিক্রম করে, পঞ্চকোষের আবরণ ভেদ করে — তার চিন্ময় সত্তা দিয়েই, সেই পরমাত্ম বস্তুকে অনুভব করে। কাজেই ভক্তকে দর্শন দেওয়ার জন্য সর্বব্যাপক পরমাত্মারও স্থূলদেহ ধারণের, 'মানুষী তনু আশ্রয়ের'

কোন প্রয়োজন নেই।

আকাশ ব্যাপক বলে তা যেমন কোথাও যায় না, আসেও না, সর্বত্র সমভাগে বিদ্যমান, তেমনি সর্বব্যাপক পরমাত্মাও কোথাও যান-ও না, আসেন না। 'তিনি সর্বব্যাপক বলে তাঁর গমনাগমন হতে পারে, যিনি নিত্যপূর্ণ, সর্বব্যাপী, তিনি কি গর্ভাশয়ে ব্যাপক ছিলেন না, যে অন্য স্থান থেকে আসলেন? (মহর্ষি দয়ানন্দ) 'তিনি পরিচ্ছন্ন দেহ গ্রহণ করে জন্মগ্রহণ করেন বললে তাঁর ব্যাপকত্ব এবং অসীমত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, যিনি দেহ ধারণ করে আসেন তিনি কখনই সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মা হতে পারেন না।" (সোহহং স্বামী)

যাঁদেরকে আপনারা অবতার বলে পূজা করেন বা ভক্তিতে গদগদ হন, তাঁদের মৎস্য কূর্ম বরাহ নৃসিংহ প্রভৃতি মূর্তি একেবারে কাল্পনিক, বাস্তবে তাঁদের কোন দিনই অস্তিত্ব ছিল না, আর রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ প্রভৃতি ঈশ্বরদর্শী মহাপুরুষ হতে পারেন, সাক্ষাৎ পরমাত্মা কেউ কখনই ছিলেন না। যে যার সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠার জন্য, বিশ্বাস বা মোহগ্রস্ত মনে বহু অবতার কল্পনা করে, কল্পনার আতিশয্যে যিনি অজ, তাঁকে জন্মগ্রহণ করিয়ে, যিনি নিত্য পূর্ণ তাঁকে খণ্ড করে, যিনি ব্যাপক তাঁকে পরিচ্ছন্ন করে, মনোমত কল্পনার বিচিত্র রং এ চিত্রিত করে বসে আছে। অবিবেকী যারা — সেই সব কল্পনাপ্রিয় ভক্তদল সদৃচ্ছা কল্পনা করতে পারেন, তাঁরা তাঁদের ভগবানকে শিখিপুচ্ছধারী, গোচারণরত, স্ত্রী বিহনে কেঁদে আকুল, শোকাচ্ছন্ন পরকীয়া প্রেমরত, নানারকম উৎকট বিকট কার্য্যকারী, এমন কি সাপ, শকুন, ব্যাঙ, ভালুক, কচ্ছপ, বরাহ বা নরপশুরূপে কল্পনা করে ফেলতে পারেন, তাঁদেরকে পূর্ণ ভগবান জ্ঞানে প্রতিমূর্তি গড়িয়ে, পুষ্প-চন্দন নৈবেদ্য-ডালি দিয়ে ধূলি ধূসরিত হয়ে গোড়ালুটি দিতে পারেন — কিন্তু বিবেকী জনের কাছে তা অগ্রাহ্য। কেননা, সর্বজনমান্য বেদ-উপনিষদের সিদ্ধান্ত হল —

দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রোহ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।। (মুণ্ডকোপনিষদ ২, ১ ২)

দিব্য, শুদ্ধ, অমূর্ত, সকলের মধ্যে পূর্ণ, অন্তরে বাহিরে নিরন্তর ব্যাপক, প্রকাশ স্বরূপ — ইত্যাদি পরমেশ্বরের বিশেষণ; তিনি 'অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ।'

পরমাত্মার এই ধরাধামে অবতীর্ণ হওয়ার দ্বিতীয় কারণরূপে অনেকে বলছেন "লীলা রসাস্বাদনের জন্য"! কৈ কৃষ্ণ তো অর্জুনকে কোথাও বলছেন না যে, 'আমি গোচারণের জন্য, পরের বাড়ীর ক্ষীর সর ছানা ননী চুরি করে খাওয়ার জন্য, পরনারীর বস্ত্র হরণ করে তাদের ঈষৎ অক্ষত যোনি (ভাগবত মতে!) দর্শন করে কৃতার্থ হওয়ার জন্য, কিংবা গভীর নিশীথে কামবর্ধন বাঁশী বাজিয়ে, পরস্ত্রীকে জঙ্গলে এনে তাদের সঙ্গে শৃঙ্গার লীলা করবার জন্য — ইত্যাদি নানারকমের ছল বল কৌশলরূপ লীলা রসাস্বাদনের জন্য কিংবা পরবর্তীকালে আমাগতগণপ্রাণ-ভক্তগণ যাতে সখীবেশ ধারণ করে, কিশোরী ভজন নায়িকা ভজনাদি পরকীয়া প্রেমের মধুর রস আস্বাদন করতে পারে, এই জন্য — কেবল তাদেরই মুখ চেয়ে, যে কোন লীলা খেলা যাতে তারা আমার সৎদৃষ্টান্ত (!) অনুযায়ী সমর্থন করতে পারে, এ জন্য আসি! আমি অবতীর্ণ হই"!! বর্তমানে নানা লীলা রসাস্বাদনকারী ভক্তরাজগণকে চুপিসারে তাঁদের কৃষ্ণচন্দ্র যা বলে গেছেন, তা সেই নর ঋষির অবতার প্রাণপ্রিয় সখা অর্জুনের কাছে বলেন নি কেন? তাঁর অবতীর্ণ হওয়ার কারণ স্বরূপ "লীলা রসাস্বাদনের" ঐ সব বিচিত্র ঘটনার বর্ণনা করতে তিনি কিঞ্চিৎ লজ্জা অনুভব করেছিলেন বুঝি?

যখন কোন ভক্ত তাঁকে দর্শন করেন, তখন সেই প্রেমিক ভক্তের যৎ যৎ বস্তুতে দৃষ্টি পড়ে, সকলের মধ্যেই দেখেন, তাঁরই চিন্ময় সত্তার প্রকাশ বিকাশ — "সদ্‌গুরু নূর তামাম্" (কবীর); সর্বভূতে তখন তিনি তাঁকেই দেখেন, প্রতি ঘটনার পশ্চাতে দেখেন তাঁরই মহান্ ঐশী লীলা, সর্বত্রই এক দিব্য সুষমা, দিব্য শৃঙ্খলা, সবই ছন্দোময়, সবই সত্য শিবসুন্দর; প্রতি কর্মই তখন তাঁর পূজা হয়ে ফুটে ওঠে, প্রতি ধূলিকণা অণুপরমাণু পর্যন্ত তাঁর কাছে আনন্দমের অভিব্যক্তি, আনন্দময় আনন্দ-পরিপ্লুত বলে মনে হয় — ফলে, প্রত্যেক বস্তুতে, প্রত্যেক কর্মেই তাঁর হয় সেই সচ্চিদানন্দ ভাগবত সত্তার রসাস্বাদন, ভক্ত ভগবানে এ লীলা নিত্যই চলছে। অণুর মধ্যে সেই মহতো মহীয়ানের দিব্যপ্রকাশ লীলা বা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর খেলার — অনুভূতি দেওয়ার জন্য পরমাত্মাকে স্থূল মানবদেহে ধারণ বা মৎস্য কূর্ম বরাহরূপ গ্রহণের কোন ও প্রয়োজন হয় না। 'তিনি যেহেতু অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন — এজন্য তিনি মানুষ হয়ে জন্মান' — এইরূপ বিশ্বাস পোষণ করে, বেদ, উপনিষদ

বিরুদ্ধ, অনুভব-বিরুদ্ধ ধারণার ঘূর্ণিপাকে ঘূর্ণমান — বিভ্রান্ত হওয়ার চেয়ে — তিনি যেহেতু অচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন সেইজন্যে তিনি জন্মগ্রহণ না করেও, সব ভক্তকে, সব সময়, সমকালে, সমভাবে ধন্য করতে পারেন। পূর্ণকাম করতে পারেন, এই ধারণা করতে কি কুসংস্কারাচ্ছন্ন ক্লেদাক্ত হৃদয়ে ব্যথা লাগে? তাঁর অচিন্ত্য শক্তির এই মর্ম গ্রহণ করলে সম্প্রদায় টিকে না বুঝি? 'লোকানুগ্রহার্থ,' নিজ মায়াকল্পিত দেহধারণ করে, জনম মরণশীল জীবের ন্যায় উৎপন্ন, বর্দ্ধিত, কর্ম্মানুষ্ঠানরত এবং পরিশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ারূপ লীলা — পরমাত্মা করেন না; তবে তাঁতে ওগুলি আরোপ করে, ব্যক্তিবিশেষকে অবতার বলে প্রচার করে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং সম্প্রদায়ের বিস্তৃতি সাধনের কূট কৌশল — ঐ সব ভক্তদেরই লীলাখেলা বলতে পারেন।

অবতারবাদের এবার তৃতীয় কারণটি পর্যালোচনা করা যাক্। গীতানুসারে বলা হয়, সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ধর্মসংস্থাপনের জন্য এবং দুষ্কৃতকারীর বিনাশের জন্য, সর্বব্যাপী, অসীম, অনন্ত যিনি, তিনি জন্মগ্রহণ করতে পারেন না। যিনি 'সর্বশক্তিমান্,' তিনি কি মানুষরূপে জন্মগ্রহণ না করে কি সাধুকে রক্ষা করতে পারেন না? তাঁর 'সর্বশক্তিমত্তা' এবং 'অচিন্ত্যশক্তির' কত সংকীর্ণ অর্থ করা হয়েছে দেখুন! ধর্ম লুপ্ত হলে তবে সংস্থাপন অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে স্থাপনের প্রশ্ন আসে, কিন্তু সত্যের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, সত্য এবং পরমাত্মা একই অর্থবোধক। পরমাত্মা সত্যস্বরূপ, ধারণাৎ ধর্মমিত্যাহুঃ, সেই জগদাধার অনন্ত চৈতন্য সত্তাই অখিল ব্রহ্মাণ্ড, সমগ্র জীবজগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি কি মাঝে মাঝে লুপ্ত হন, না, ধ্বংস হয়ে যান যে ধর্মকে সংস্থাপনের প্রয়োজন হয়? অবশ্য যদি 'সংস্থাপন' বলতে 'সম্প্রদায় স্থাপন' বোঝায়, তাহলে অবশ্য বহু ব্যক্তিগত ভগবানের উৎপন্ন হওয়া এবং অবতরণ সিদ্ধ হয়!!

'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' — দুর্জন বিনাশের জন্য নাকি নিত্য, পুণ্য, সর্বব্যাপী ভগবানকে জঠর যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। একটু গভীরভাবে বিচার করে দেখুন — ঐ দেদীপ্যমান সূর্যের চেয়ে অনেক লক্ষ লক্ষ গুণ বৃহত্তর তারকা নক্ষত্র আছে, এই সৌরমণ্ডলের সূর্য যেমন ঐটি, তেমনি বহু সৌরমণ্ডলে বহু সূর্য আছে, তাদের চেয়ে বহু কোটি কোটি গুণ বৃহদাকার তারা আছে; এই অসংখ্য গ্রহ তারকারাজি সূর্যসহ সৌরমণ্ডল তাঁরই সৌরমণ্ডল, তাঁরই অচিন্ত্য শক্তিপ্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর শক্তির অনুপাতে কারণজগৎ (Casual universe) কিছু নয়, কারণ জগতের তুলনায় সূক্ষ্মজগৎ, ক্ষুদ্রতর, সূক্ষ্মজগতের (Subtle universe) তুলনায় ঐ অসংখ্য গ্রহতারামণ্ডল সমন্বিত স্থূলজগৎ (Gross universe) নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর; সমগ্র স্থূলজগতের তুলনায় সূর্য একটি বিন্দু মাত্র, আমাদের পৃথিবী আবার এই সূর্যের তুলনায় একটি বিন্দু (dot) মাত্র! এই পৃথিবীর কোটি কোটি জীবের তুলনায় একটিমাত্র জীবের অস্তিত্ব (তিনি যত বড়ই হোন) — নিতান্তই নগন্য! ঐ একটা মানুষকে সর্বশক্তির মূলাধার পরমাত্মার সঙ্গে তুলনা করাই বাতুলতা; এহেন একটা নগন্য জীবকে — হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু রাবণ কংসাদিকে বধ করবার জন্য পূর্ণ পরমেশ্বরের অবতরণ কল্পনা একেবারে প্রলাপপোক্তি!

তিনি সর্বব্যাপক বলে ঐসব দুষ্কৃতকারীর মধ্যেও আছেন — ইচ্ছা করলেই তিনি অতি সহজেই তাদের যবনিকাপাত ঘটাতে পারেন; তাছাড়া কালবশে সবাইকে মৃত্যুমুখে পতিত হতে হয়, কাজেই পরমেশ্বর কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করলেই, স্বাভাবিক কালবশেই তারা মৃত্যুমুখে পতিত হত কিংবা কোন উৎকট ব্যাধির বীজাণু বিশেষকে হুকুম করলেই ভগবানের বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ — এই মহৎ কার্য অল্পায়াসেই সম্পন্ন হতে পারত, তার জন্য দয়াল হরিকে কচ্ছপ শূকর বা বিভিন্ন মানুষ মূর্তি গ্রহণ করার কষ্ট স্বীকার করতে হত না, সত্যসন্ধ ঋষিদের বেদ উপনিষদ মুখে 'অজ একপাৎ' ইত্যাদি যে সত্য প্রকাশ করেছিলেন, এক এক অবতারে, ভিন্ন ভিন্ন পরস্পর বিরোধী বাক্য বলে স্বমত খণ্ডন বা মণ্ডনও করতে হত না!!

এই অবতারবাদ দেশের বহু সর্বনাশ করেছে। এই অবতারবাদের জন্যই বিভিন্ন সম্প্রদায়, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে দ্বেষাদ্বেষী, এক সম্প্রদায়ের অবতার অন্য সম্প্রদায়ের মান্য নয়, বহু স্বকপোলকল্পিত গ্রন্থ রচিত হয়ে নানা বিকৃত সত্য পরিবেশন চলে আসছে। চিন্তা করে দেখুন, যত অবতার এসেছেন — এই ভারতবর্ষে। কেন? ভারতবর্ষেই কি শুধু সাধু জন্মান এবং তাঁরা দুর্জনদের দ্বারা নির্যাতিত হন? এইজন্য কি বেছে বেছে কেবল ভারতবর্ষেই কি ভগবানকে বার বার 'পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম' জন্ম নিতে হয়েছে? শুধু ভারতবর্ষেই কি ধর্ম মাঝে মাঝে রসাতলে চলে যায়, এইজন্য 'ধর্ম সংস্থাপনার্থায়' তাঁকে এইখানেই আসতে

হয়? আশ্চর্য ঈশাবতারে ভগবান যা বলে গেলেন, মুসাবতারে তার বিরোধী বাক্যে শোনা যায় — খ্রীষ্ট ভগবানের ভক্তগণ, মহম্মদ ভগবানের কথা মানতে রাজী নয়! রাম অবতারে তিনি যা বলে যান, কৃষ্ণ অবতারে তাঁর উক্তিতে অন্য রকম দেখা যায়। একই ভগবানের বারবার জন্মগ্রহণের ফলে বুঝি যোগচ্যুতি ঘটে? স্মৃতিভ্রংশ দেখা যায়? বুদ্ধরূপে তিনি যা বলে যান এই ভারতবর্ষে, শঙ্কররূপে জন্মগ্রহণ করে তিনি আবার তা খণ্ডন করেন। চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়ে আবার পূর্বজন্মের কথা ভুল বলে, 'মায়াবাদীর মিথ্যা উক্তি' বলে খণ্ডন করে যান! এইরকম এক একটি ব্যক্তিগত অবতারের দল এসে এমনভাবে এক একটা মতবাদের সৃষ্টি করে যান, যাতে তাঁরই পরমবাক্য বেদ উপনিষদও পাত্তা পায় না। ভগবান এক একবার জন্মে এক এক অবতাররূপে স্বীয় ভক্তগণকে যা বলে যান, অন্য অন্য অবতারের ভক্তরা তাতো মানেই না, বরং পরস্পর পরস্পরকে 'নাস্তিক', 'পাষণ্ডী', 'মায়াবাদী', 'অসুর' ইত্যাদি মুখরোচক বাক্যে আপ্যায়িত করে থাকেন!!

ভগবান নাকি মৎস্যরূপে, কূর্মরূপে, বরাহরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন; Theory of Evoluton অনুযায়ী তাই বলে কিন্তু মৎস্য কূর্ম বরাহের বংশগুলি উন্নত বা দিব্যরূপ হতে পারে নি কিংবা ভগবান ঐ সব রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন বলে ঐ গুলি প্রতীকরূপে কোথাও পূজিতও হয় না। বরং ভক্তরা ভগবানের ঐ মূর্তি— মৎস্য কূর্ম বরাহাদির বংশগুলিকে 'হৃদয়স্থ' না করে 'উদরস্থ' করতে ব্যগ্র! হৃদয় বিহারী ভগবান 'লীলা রসাস্বাদনের' নিমিত্ত যে সব মূর্তি পরিগ্রহ করেছিলেন, ভক্তরাজগণ সেগুলি 'উদারবিহারী' হলে কেমন হয় সেই রসনার তৃপ্তিকর রসাস্বাদন করে চলেছেন!!

অন্যান্য অবতারদের অবশ্য মূর্তি, অর্চ্চা, খড়া, চূড়া, জুতা, জামা, দাঁত, হাড় সকল কিছুরই পূজা হয়, আবার বলা হয় এগুলি নাকি নিত্য! চিন্ময়! অপ্রাকৃত! এক একদল উপাসক আবার Measurement করে কোন্ ভগবান এক আনা, কোনটি দু' আনা, চারি আনা, ছয় আনা, বার আনা, কোনটি পুরাপুরি ষোল আনা তাও নিখুঁতভাবে পরিমাপ করে ফেলেছে!!

প্রত্যেকেই নিজ নিজ উপাস্য অবতারকে নিত্য ভেবে ভগবানের অন্য অবতারবৃন্দকে কোন্ যুক্তিতে উপেক্ষা বা হেয় করে? যদি সকল অবতারের দেহ 'নিত্য', অপ্রাকৃত হয় এবং সকলেই স্ব স্ব ধামে পরিবারসহ নিত্যলীলার রসাস্বাদনে ব্যাপৃত থাকেন, তাহলে জগৎকারণ পরমেশ্বরের বহু নিত্যদেহে অধিষ্ঠান স্বীকার করতে হয়। কিন্তু ভগবানের বহুত্ব স্বীকার্য কি? শুধু ভারতবর্ষের প্রতিই শ্রীভগবানের পক্ষপাতিত্ব আছে — তাই এখানের সাধুগুলিকেই পরিত্রাণ এবং দুর্জনের বিনাশের জন্য তাঁকে বারবার অবতীর্ণ হওয়ার শ্রম স্বীকার করতে হয়, তিনি যে কেবল ভারত-উদ্ধারের জন্যই Duty bound — এমন কি স্বীকার করা যায়? যদি বলেন যে, না — না, তিনি সর্বত্রই জন্মাচ্ছেন এবং শুধু এই ব্রহ্মাণ্ডের নয়, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডেরও সাধু-পরিত্রাণ, দুর্জন বিনাশরূপ পবিত্র কর্ম তাঁকে করে মরতে হয়, এবং প্রতি জন্মের প্রতিবারের দেহই নিত্য হয়, তাহলে বেচারার শ্রীভগবানেরই ত Cycle of birth and death এর গোলকচক্রে ঘুরে মরতে হচ্ছে!! 'সর্বজ্ঞ' পুরাণকাররা এবং 'লীলা রসাস্বাদনকারী' ভক্তরাজ প্রভুপাদরা ছাড়া এই 'অপ্রাকৃত তত্ত্ব' কোন যুক্তিবাদী বিবেকী পুরুষের হৃদয়ঙ্গম হওয়া শক্ত!

মৎস্য অবতারের বর্ণনায় পুরাণকার বলছে — প্রলয়ঙ্কর প্লাবনে পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার সময় মনু যখন তর্পণ করছিলেন, হঠাৎ পরমেশ্বর পুঁটি মৎস্যরূপে তাঁর অঞ্জলি মধ্যে পতিত হলেন। দেখতে দেখতে পুঁটি ভগবানের কলেবর বিংশতি অযুত যোজন ব্যাপী বড় হল আর জলমগ্না কূর্মরূপে মন্দার পর্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করলেন, দেবদৈত্য প্রাণপণে সমুদ্র মন্থন করল, শ্রীভগবানকেও ভক্তানুগ্রহকল্পে মন্থনাঘাতে কিরকম রসের সঞ্চার হয় — সেই রসটুকু আস্বাদনের জন্য মন্থনদণ্ডাঘাত সহ্য করতে হল! অহো অবিদ্যাগ্রস্ত ভক্তদের জন্য ভক্তবৎসল প্রভুকে কত না দুঃখ ভোগ করতে হয়। ঐ মন্থনদণ্ড যন্ত্রণা ভোগের পুরস্কারও ভগবান পেলেন — সমুদ্রমন্থনকালে শ্রীদেবী সমুদ্র থেকে উত্থিত হয়ে মুকুন্দকে বরণ করলেন! তারপর অমৃত নিয়ে দেব দৈত্যে লাগল বিরোধ। শ্রীভগবান এই মোহিনী মূর্তি দেখে অসুরদের মনে সত্ত্বগুণের উদয় হওয়ার পরিবর্তে তারা কামোন্মত্ত হয়ে উঠল। মুগ্ধ হয়ে তারা অমৃত কুম্ভটি মোহিনীর হাতে দিয়ে বিরোধ মীমাংসা করে দেওয়ার প্রস্তাব করল। দেব ও অসুরদেরকে দুই পৃথক পংক্তিতে বসিয়ে, ঐ মোহিনী ওরফে শ্রীভগবান দৈত্যদেরকে

নানা ছলাকলায় ভুলিয়ে, বঞ্চিত করে, দুরস্থ দেবতাদেরকে অমৃত পান করালেন (ভাগবত, ৮ স্কন্ধ) — এই না হলে লীলা। রাহু ছদ্মবেশে অমৃত পান করে ফেলেছিল, চন্দ্র সূর্য তা চিনিয়ে দিতে, সর্বজ্ঞ কামিনী-ভগবান তখন জানতে পেরে, নিজমূর্তি ধারণ করে চক্র দ্বারা রাহুর মাথা কেটে ফেললেন। কিন্তু সে অমৃত পান করেছিল, তাই মরল না এবং সেই আক্রোশে আজও রাহু চন্দ্র সূর্যকে গ্রাস করে থাকে (ভাগবত, ৮ স্কন্ধ)। এখানে ভূগোল এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানের সঙ্গে সবজান্তা পুরাণকারের কিঞ্চিৎ বিরোধ দেখা যাচ্ছে। তা হলই বা, এখানে 'নিখিলশাস্ত্র রাজচক্রবর্তী' (বৈষ্ণবমতে) ভাগবতের কাছে বিজ্ঞানের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।

তারপরে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র থেকে অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ বরাহ শিশু ওরফে বরাহ-ভগবানের উৎপত্তি !

'ইত্যাভিধ্যায়তো নাসা বিবরাৎ সহসা অনঘ!
বরাহতোকো নিরগাদঙ্গুষ্ঠ পরিমাণকঃ॥'

হিরণ্যাক্ষ বধ, পৃথিবীর গর্ভে নরক নামক অসুর-উৎপাদন আর জলমগ্না পৃথিবীর উদ্ধার সাধন — এই তিনটি মহৎ কার্যের অনুষ্ঠানেই বরাহ-ভগবানের লীলা পর্য্যবসান! হিরণ্যাক্ষ পৃথিবীকে মাদুরের ন্যায় জড়িয়ে শুয়েছিল। বরাহ ভগবান 'ঘ্রাণেন পৃথ্ব্যাঃ পদবীং বিজিঘ্রন্' — পশুর ন্যায় ঘ্রাণ নিতে নিতে ঘোঁত্ ঘোঁত্ করতে করতে (!!) দৌড়ে এসে তার মস্তকের নিম্নদিক দিয়ে পৃথিবীকে দন্তে তুলে ধরলেন। বিষম যুদ্ধ, অন্তে হিরণ্যাক্ষ বধ। 'হিরণ্যাক্ষ বধ ভগবানের পক্ষে সহজ সাধ্য। পৃথিবী শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, কাজেই তার গর্ভে পুত্রোৎপাদনও সম্পূর্ণ ব্যাকরণ সঙ্গত!" (সোহহং স্বামীর শ্লেষ)॥

শ্রীভগবানের ঐ লীলাদর্শন করে, স্মরণ করে এবং পাঠ করে, 'অপ্রাকৃত' ভক্তজনের অবিরলধারে অশ্রুবর্ষণ ও লীলাস্ফুরণ অসম্ভব নয়। কিন্তু আমাদের মত যে সব প্রাকৃতজন 'অপ্রাকৃত' ভক্ত হয়ে বিবেক বস্তুটি শ্যামকুণ্ড বা যমুনার জলে বিসর্জন দিয়ে বসে নি, তাদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে — পৃথিবীকে যদি মাদুরের মতই জড়িয়ে হিরণ্যাক্ষ শুয়েছিল, তাহলে সে কিসের উপর দাঁড়িয়ে বরাহ-ভগবানকে ভীষণ গদাপ্রহারে 'লীলা রসাস্বাদনের' সুযোগ দিয়েছিল? ভগবানের কথা বাদ দিলাম, কেন না 'লীলা রসাস্বাদনকারী' 'অপ্রাকৃত' ভক্তগণ তাঁর জন্য বুক পেতে দিতে পারেন। কিন্তু ভক্তবৃন্দের আশ্রয় ভূমি কি ছিল?

তারপর দয়াময় ভগবান বিকট নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করে হিরণ্যকশিপুর নাড়িভুড়ি ছিন্ন করলেন। কান্ডজ্ঞানহীন ব্রহ্মা যে এভাবে মাঝে মাঝে অসুরগুলোকে বর দিয়ে তাঁকে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করেন, এজন্য মৃদু তিরস্কার করলেন। যে প্রহ্লাদের উর্দ্ধতন একুশ পুরুষ ছিলই না, লীলাবৈকল্যে, ভক্ত প্রেমে বিগলিত অর্দ্ধনর-অর্দ্ধপশু শ্রীভগবান তাঁর উর্দ্ধতন একুশ পুরুষেরই উদ্ধারের ব্যবস্থা করে ফেললেন। পুরাণকারদেরই মতে— 'সত্যযুগে পূর্ণং পূর্নং পাপং নাস্তি — তবুও সত্যযুগে ভগবানকে ভাগবতকার চার চারবার জন্মগ্রহণ করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে! সত্যযুগে পাপই যদি ছিল না, তাহলে পৃথিবীকে দু' দু'বার জলমগ্ন করে পাপ প্রক্ষালনের রহস্যটা যে কি তা কেবল ভাগবতকার এবং 'অপ্রাকৃত লীলাবিগ্রহের অপ্রাকৃত ভক্তজনেরই' সহজবোধ্য!!

ত্রেতাযুগে ভগবান বামনরূপে কশ্যপ গৃহে জন্ম নিলেন। এই অবতারে সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান, 'সদা সত্যনিষ্ঠ বিশ্ববিজয়ী বদান্যবর বলীকে যাচক বেশে ছলনা করেছিলেন; এবং তার সাম্রাজ্য কাপুরুষ গুরুপত্নীগামী পাষণ্ড ইন্দ্রকে প্রদান পূর্বক পৌরাণিক ভগবানোচিত সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেছিলেন!' (সোহহং স্বামী)॥ দান করে বলি হলেন পাতালস্থ। ওখানে যদি তিনি পাষণ্ড ইন্দ্রকে দলন করে বলীকে পুরস্কৃত করতেন তাহলে বরং দুস্কৃতের বিনাশ এবং সাধুর পরিত্রাণ যথার্থ ভাবে হত। ব্রহ্মা যখন বললেন — 'হে ভুতেশ! এই হৃত সর্বস্ব বলীকে মোচন করুন। এ নিগ্রহ যোগ্য নয়। সত্যরক্ষার জন্য অকাতরে সর্বসম্পদসহ নিজেকেও আপনার চরণে বিলিয়ে দিয়েছে!' তদুত্তরে ভাগবতকারের ভগবান বললেন —

ব্রহ্মণ্। যমনুগৃহ্নামি তদ্বিশো বিধুনোম্যহম্।
যন্মদঃ পুরুষং স্তব্ধো লোকং মাঞ্চাবমন্যতে॥ (ভাগবত, ৮, ২২, ২৪)

—'হে ব্রাহ্মণ্। আমি যাকে অনুগ্রহ করি, তাকে সকল সম্পদ হতে বঞ্চিত করি। কারণ, পুরুষ সম্পদে মত্ত ও অবিনীত হয়ে সমস্ত লোককে, এমন কি, আমাকেও অবজ্ঞা করে।' ভগবানের এই প্রাণতোষিণী অমৃত বাক্য শ্রবণ করে ভক্তদের প্রাণ ঠাণ্ডা হতে পারে, কিন্তু প্রাকৃতজনদের মনে স্বতঃই প্রশ্ন জাগে — তাহলে কি তিনি বলীকে সর্বহারা পাতালবাসী করে অনুগ্রহ করে অনুগ্রহ (!) করলেন আর ইন্দ্রকে করলেন নিগ্রহ (!)

স্বর্গদান করে? পূর্ব অবতারে যে ইনি মোহিনী মূর্তি ধারণ করে দৈত্যদেরকে বঞ্চিত করে দেবতাদেরকে অমৃতদান 'নিগ্রহের' নামান্তর? কী অপূর্ব লীলা! প্রভু কি তাহলে বলীর সর্বসম্পদ হরণ করলেন, পাছে বলী মত্ত হয়ে অবিনীত হয়, তাঁকে অবজ্ঞা করে? কিন্তু বলীর চরিত্রে ত, অন্ততঃ সেদিনকার ব্যবহারে কোন দম্ভ বা দুর্বিনীত ভাব দেখা যায় নি। ভগবানকে অবজ্ঞা করা ত দূরের কথা, বামনদেব বলীর যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হওয়া মাত্রেই, তিনি তাঁর পাদদ্বয় ধৌত করে, পাদোদক মস্তকে ধারণ করে, ভক্তিবিনম্র চিত্তে আবাহন জানিয়ে বলেছিলেন —

অদ্য নঃ পিতরস্তৃপ্তা অদ্য নঃ পাবিতং কুলম্।
অদ্য স্বিষ্টঃ ক্রাতুরয়ং যদ্-ভবানাগতো গৃহান্॥ (ভাগবত, ৮, ১৮, ৩০, ৩২)

অদ্য আমার পিতৃগণ তৃপ্ত হলেন, কুল পবিত্র হল, এই যজ্ঞ সার্থক হল, যেহেতু আপনি আমার গৃহে আগমন করেছেন। বলির এই কথাগুলির কি সম্পদ মত্ততা বা দম্ভের লক্ষণ? বামনাবতার বিনিময়ে বর দিলেন — "এখন সুতলে বাস কর, সার্বর্ণি মন্বন্তরে তুমি ইন্দ্র হবে।' দয়াময় হরি কী অপূর্ব স্বেচ্ছায় দান করে দিচ্ছেন, ভাগবতকারের ভগবান তাঁকে সার্বর্ণি মন্বন্তরে — সেই ইন্দ্র হওয়ার বর দিয়ে চরিতার্থ করেছেন। পুরাণকারদের এই অবতারতত্ত্ব শুনে ভক্তের রোমাঞ্চ হতে পারে, প্রেমাশ্রুও ঝরতে পারে কিন্তু যার বিবেক আছে, তিনি নিশ্চয়ই রক্তে উষ্ণতা অনুভব করবেন।

পরশুরামরূপে ভগবানকে এবার অবতীর্ণ করালেন পুরাণকার! এই অবতারে প্রভু মাতৃহত্যা এবং ক্ষত্রিয়দের আবালবৃদ্ধবনিতাকে একুশবার নাকি কুঠারে করে কেটে কুচি কুচি করেছিলেন! এই অবতারে তিনি বীভৎস উগ্র ও ভয়ানক রসের লীলা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এও বাহ্য — ইনি বেঁচে থাকতে থাকতেই শ্রীভগবান অর্ধাংশে রাম, সিকি অংশে ভরত, লক্ষ্মণ, শত্রুঘ্ন দু' দু'আনা অংশে জন্মালেন। কী ভীষণ প্রহেলিকা! পরশুরামরূপে ভগবান জন্মগ্রহণ করে কুঠার হস্তে মার মার কাট কাট লীলা যখন করে চলেছেন, তখনই আবার তিনি চারি অংশে জন্ম নিলেন? রাম বনাম পরশুরাম, দুই ভগবানে যে একবার শক্তি পরীক্ষাও হয়েছিল, রসিক ভক্তজন তারও রসাল বর্ণনা দিয়েছে। বাল্মীকির রামচন্দ্র আদর্শ মানব, সম্প্রদায়ীরা তাঁকেই 'অবতার' 'পূর্ণ ভগবান' বলে খাড়া করেছে। তাঁর দেহান্তকালে নাকি গরু, গাধা, শৃগাল, শকুন, তির্য্যকযোনি সবাইকে ব্রহ্মা শতকোটি দিব্য বিমান এনে স্থাবর জঙ্গম প্রাণী সহ বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেন। অথচ এই সর্বজ্ঞ প্রভুর পত্নী বিরহে বিলাপ, পথে ঘাটে প্রান্তরে 'হা সীতা, হা সীতা' বলে ক্রন্দনের সুন্দর আলেখ্য, উপাসনারত শম্বুক বধ (শূদ্র বলে!) এবং কিঞ্চিৎ ছলনা করে বালী বধ — ইত্যাদিরও বর্ণনা আছে। ঘরে ঘরে তাই চলেছে রামের মূর্তিপূজা, সলাঙ্গুল হনুমানও মন্দিরে মন্দিরে পূজিত। বাল্মীকি যে সত্যসন্ধ, মহাব্রত, পিতৃভক্ত, প্রজাবৎসল, মানবপ্রেমিক রামের বর্ণনা দিয়েছেন — সেই মহত্তম আদর্শ সম্প্রদায়ী ভক্তরা গ্রহণ করে নি।

তারপর ভগবানকে জন্মাতে দেখি হলধর বলরাম ও কৃষ্ণরূপে। বলরামরূপে প্রভু সদা কাদম্বরী সুরাপানে মত্ত থাকতেন। নিরীহ বৃদ্ধ সুতহত্যা, কৃষ্ণের গোপিনীদের সঙ্গে সরস লীলা, যমুনা জল ক্রীড়া করতে রাজী না হওয়ায় হলদ্বারা জোর করে আকর্ষণ করায় পৌরাণিক ভগবান সুলভ বিক্রম প্রকাশাদি ছাড়া আর কোন লীলাবিস্তার করেছিলেন কি না পুরাণকার সে বর্ণনা দেয়নি। অবতারতত্ত্ব প্রতিষ্ঠাকারী পুরাণকারদের মতে 'চাংশ কাল পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং'! কৃষ্ণরূপে পরমাত্মা বস্ত্রহরণ, রাসলীলাদি সাধ্বী পরিত্রাণমূলক অনেক গোপন লীলারসের অনুষ্ঠান করে তাঁর ভক্তদের সামনে 'পূর্ণ ভগবত্ত্ব' প্রামণ করে গেছেন। ঐ সব অশ্লীল লীলা রসাস্বাদনে অপ্রাকৃত রসিক ভক্তদের তৃষিত প্রাণ এমনই পরিতৃপ্ত যে, তারা এঁর, নিত্যবৃন্দাবনে 'বেদবিধির অগোচর রতনবেদিকোপরি' শ্রীমতির সঙ্গে পরকীয়া প্রেমাপ্লুত অবস্থার ধ্যানে রসাবিষ্ট! 'যৎযদাচরতে শ্রেষ্ঠ— শ্রেষ্ঠ জন যা আচরণ করে যান, ইতর জন তাই অনুসরণ করে" — এই কৃষ্ণ বাক্যানুযায়ী, সেজন্য কৃষ্ণভক্তগণ গোপন রাসলীলা এবং পরকীয়া প্রেমের অনুসরণ ও অনুকরণ করে কত যে প্রাকৃতজনের ভববন্ধন মোচন করে চলেছেন — তার ইয়ত্তা নেই। (মনে রাখবেন, এসব ভাগবতকারেরই সৃষ্টি — মহাভারতের বেদব্যাস এ সব লিখেন নি।)

ভাগবতকার বুদ্ধকেও অবতার বলে বর্ণনা করে বলেছে — তিনি 'নাস্তিকাবতার'। ভগবান বুদ্ধাবতার হয়ে পাষণ্ডবেশে অসুরদিগকে নানা উপধর্মের উপদেশ দেন'। (ভাগ, ২য় স্কন্ধ, ৭ অধ্যায়)। তাহলে, করুণাঘন

বুদ্ধদেব যাঁদেরকে উপদেশ দিয়ে গেলেন, তাঁরা অসুর? পাষণ্ড? পৃথিবীর চারিদিকে যত বৌদ্ধ জৈন তাঁরা সবাই পাষণ্ড, অসুর আর একমাত্র যারা গোপীজনবল্লভের সেবায় সখী অনুগত ভজন করছেন সেই সব কৃষ্ণভক্তরাই বুঝি একমাত্র প্রকৃত ভক্ত? একই ভগবান এক একবার জন্মে বুঝি খামখেয়ালি করে যান? এই অবতারবাদের মূলে যে জঘন্য সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থবোধ এবং কুৎসিত বিদ্বেষভাব আছে তা সহজেই অনুমেয়।

এইবার দশম অবতার কল্কির আসার কথা! পুরাণকারদের মতে, এইবার ভগবান কল্কিরূপে জন্মে 'অশ্বমাশুগমারুহ্য অসিহাসাধুদমনম্' অর্থাৎ দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে অসি হস্তে দুষ্কৃতগণকে দমন করে লীলা দেখাবেন। তিনি যে বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মাবেন — এ সমস্তও তিনি বোধ হয় কোন অপ্রাকৃত Telephone যোগে (!) জানিয়ে দিয়েছেন। তবে, ভক্তদের মনোভিলাস এবং অসার ভবিষ্যদ্বাণী পুরণের জন্য কেন যে এখনও তিনি জন্মাচ্ছেন না, সেইটে ভাবনার বিষয়! মনে হয়, অজ্ঞ পুরাণকারদের অস্ত্রজ্ঞানের দৌড় ত অসি পর্যন্ত, কাজেই তারা ত অসি হস্তে অবতীর্ণ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করে চলে গেছে, ইতিমধ্যে যে প্রাকৃত জন অ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমাদি ভীষণ মারাত্মক আগ্নেয় অস্ত্র আবিষ্কার করে ফেলেছেন। সামান্য অসি হস্তে এই সমস্ত সাধুদের (!) সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব হবে কিনা, হয়ত সেই চিন্তাতে তিনি ভাবিত আছেন। তাছাড়া, সময়ও ত এখনও আছে, পুরাণকারের মতে কলির পরিমাণ ৪২০০০০ বছরের মধ্যে ৫০০০ বছর গত হয়েছে মাত্র। কিন্তু তাঁর ঐ দীর্ঘসূত্রতা এবং ভীতির জন্য ত আর সাধুর পরিত্রাণ, দুষ্কৃত বিনাশ কিংবা ধর্ম সংস্থাপনাদি কার্য বন্ধ থাকতে পারে না। কাজেই তাঁকে এখন নারদ ব্রহ্মাদি অমাত্যসহ শলা-পরামর্শ করার সময় দিয়ে, তাঁর ভক্তরাই ইত্যবসরে বহু অবতার সৃষ্টি করে ফেলেছে! এক এক সম্প্রদায় তাদের উপাস্য বা প্রতিষ্ঠাতাকেই স্বয়ং ভগবান অবতার দাঁড় করিয়েছে।

জৈমিনী পূর্ব-মীমাংসাতে বলেছেন যে, যাতে অনুশাসন, উপদেশ, আদেশ এবং নিষেধ থাকে তাই শাস্ত্র নামের যোগ্য। কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠিত এবং পরিনিষ্ঠিত তত্ত্বের কথা থাকলে তাকে শাস্ত্র বলা যায় না। জৈমিনী এই দৃষ্টিতেই বেদের জ্ঞানকাণ্ড খণ্ডন করেছেন যে, বেদের জ্ঞানকাণ্ডে পরিনিষ্ঠিত বিশুদ্ধ সত্যের প্রকাশ থাকলেও তাতে উপদেশ রয়েছে। অতএব তা শাস্ত্রের মর্যাদা পাবার যোগ্য। গীতার উপরোক্ত শ্লোকে পরোক্ষ উপদেশ এবং প্রেরণা রয়েছে — এই দৃষ্টিতেই তা মনন করা উচিত।

বেদ বলেছেন — একোহহং বহুস্যাম বহু সৃষ্টিং প্রজায়েয়। ইন্দ্রঃ মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। অবতারবাদীরা অবতারবাদ সমর্থনের জন্য বহুস্থলেই এই মন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু এখানে ইন্দ্রের অর্থ কি? ইন্দ্র ব্রহ্মবাচক। তিনি তদ্দৃষ্টাতদেবানুপ্রাবিশৎ — এক তিনিই আছেন, আর কিছু নাই। তা হলে অবতার কোথা হতে আসবেন? এই সৃষ্টি, আপনি, আমি সব মিথ্যা — যেন একটা স্বপ্ন। সৃষ্টি নাই, জগৎ নাই। যথাপূর্বমকল্পয়ৎ। তিনি কল্পনা করেছিলেন। সবই কল্পনা — ব্রহ্ম ও মায়ার মধ্যে তৃতীয় নাই — ঈশ্বরই বা কোথায়? তার আবার অবতার।

দৃষ্টান্তমাত্রেই সামগ্রিকভাবে ত্রুটিহীন নয় — যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম। বেদান্তের এই উপমাটি কেবল অধ্যাস বুঝাবার জন্য। এখানে রজ্জু — ব্রহ্ম আর আমরা অর্থাৎ সমগ্র জীবজগৎ — অধ্যস্ত বস্তু নিচয় হল সর্প। এই ভ্রম কার হবে? যার হবে, তার মনে তো সর্পের সংস্কার থাকা প্রয়োজন। কারণ, যে অনুভব করবে সেও তো অধ্যস্ত বস্তুর অন্তর্গত! ব্রহ্মের জ্ঞান কি পূর্ব হতে থাকা সম্ভব? মনে যে সংস্কার নাই, তৎ বিষয়ক ভ্রম বা স্বপ্ন কদাপি হতে পারে না। গণ্ডার দেখেছি, সিংহও দেখেছি। এখন স্বপ্নের মধ্যে মন সিংহের মস্তকে খড়গ দিয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব দেখাতে পারে। এমন কি এলাহাবাদের ময়দানে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলও দেখাতে পারে। কিন্তু উভয়স্থানই পূর্বে দেখা চাই — অন্ততঃ উভয়স্থান সম্বন্ধে পুস্তক বা লোক মারফৎ কিঞ্চিৎ শ্রবণ করা চাই, তবেই স্বপ্নে দর্শন সম্ভব। যেমন ধরুন, কাশীর কোন গৃহে নিদ্রিত এক ব্রাহ্মণ দেখেছেন। Brain Centre এ মন একটি সূক্ষ্ম অণু বস্তু — সে স্বপ্নের জাল বুনেছে। স্বপ্নে ব্রাহ্মণ দেখেছে — সে হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় গেছে, অনেক সাধুসন্ত দর্শন করতে করতে এক মহাত্মার নিকট গিয়ে বসল। ব্রাহ্মণ তাকে বলল — 'আমাকে ঈশ্বর সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দিন'। মহাত্মা বললেন — 'আচ্ছা দেখি, ঈশ্বর কে? জগৎ কে? ...' তিনি ধ্যানস্থ হলেন।

একটু বিচার করলেই বোঝা যাবে যে, ঐ মহাত্মা যতই ধ্যান করুন, তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর এবং জগৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব হবে না। কারণ সমস্ত ঘটনাটাই absurd, মনে রাখতে হবে — সমগ্র ঘটনাটি ব্রাহ্মণ

তাঁর কাশীস্থ স্বগৃহে শয়নপূর্বক নিদ্রিত অবস্থায় দর্শন করেছেন — বাস্তবে ব্রাহ্মণই আছেন — আর কেহ সেই গৃহে নাই, তাঁর স্বপ্নদৃষ্ট হরিদ্বার, কুম্ভমেলা, সাধু সন্ত, মহাত্মা, মহাত্মার কথোপকথন এবং ধ্যান — সবই মিথ্যা।

তাৎপর্য এই যে, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, আর কেহ নাই। অজ্ঞাত ও বিকারের ঘোরেই অজ্ঞরা অবতার দেখছে।

আপনাদের অপূর্ব ব্রাহ্মীস্থিতির একটা ঘটনা বলি। আমার মতে সোহং স্বামীর মত এতবড় তত্ত্বজ্ঞ আচার্য শঙ্করের পর আর কেউ জন্মান নি। সেই সোহং স্বামীর ভগ্নী স্বয়ম্ভাতি দেবী ছিলেন ব্রহ্মবিদুষী গার্গী এবং সুলভার সগোত্রীয়া। একদিন তিনি একটি খাটিয়াতে শুয়েছিলেন। কাশীতে প্রচণ্ড শীতের জন্য সোহং স্বামীজীর ধর্মপত্নী খাটিয়ার পাশে একটা উনুন রেখেছিলেন। ভাবাবস্থায় তাঁর একটি পা উনুনের উপর পড়ে। কাঁচামাংস পোড়ার দুর্গন্ধ পেয়ে স্বামীজীর পত্নী, স্বয়ম্ভাতি দেবীর ঘরে ছুটে যান এবং নানা প্রক্রিয়ার দ্বারা তাঁর সমাধি ভঙ্গ করেন। সমাধি ভঙ্গ হবার পরেই স্বয়ম্ভাতি দেবী যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েন এবং অনেক হা-হুতাশ করতে থাকেন। তা দেখে মা বলেন, 'ঠাকুর ঝি! তুমি এতবড় তত্ত্বজ্ঞানী। তোমার এইরকম হাহুতাশ কেন? উত্তরে স্বয়ম্ভাতি দেবী বলেন — 'যার কষ্ট হচ্ছে সে যদি একটু হা হুতাশ করে আরাম পায়, পাক না কেন?' এই রূপ অপূর্ব ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মীস্থিতির কণামাত্রও আজকালকার 'অবতার' 'যুগাবতার' নামে প্রচারিত তথাকথিত সিদ্ধপুরুষদের মধ্যে দেখতে পেলে ধন্য হতাম।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে প্রত্যজ্ঞানন্দজীর কথা শুনছিলাম। সাধু আর কথা বললেন না। জপে বসলেন। আমরা শুয়ে পড়লাম। এই মন্দিরের ভিতর আমাদের সকলের শয্যা সংকীর্ণভাবে এমনভাবে পাতা হয়েছে যাতে শরীরটা কোনমতে নিজেদের আসনে পড়ে থাকতে পারে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গেল। প্রদীপটি জ্বলছে, সাধু দেখছি তখনও একাসনে বসে। প্রচণ্ড গরমের জন্য ঘুম ভেঙে গেছে বুঝতে পারলাম। কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে অনুভব হল, বাইরের জঙ্গলের সোঁ সোঁ ধ্বনি ক্রমে ওঁকারনাদে পরিণত হল। জাগরণও নয়, নিদ্রাও নয়, এমন একটা অবস্থার মধ্যে দেখতে পেলাম, মন্দিরের দরজা ঠেলে, হাতে কমণ্ডলু নিয়ে বাবা ঢুকলেন, শিবলিঙ্গে জল ঢাললেন, পরে আমার হাতে কমণ্ডলু দিয়ে শিবের মাথায় জল ঢালতে হুকুম দিলেন।

মগ্নচৈতন্যর ভূমি হতে জাগ্রত চেতনায় ফিরে এলাম। দেখলাম ভোর হয়ে গেছে, সাধু গভীর নিদ্রামগ্ন। শিবলিঙ্গের উপর সদ্য জল ঢালা হয়েছে দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল। পড়ে গেলাম। কতক্ষণ জ্ঞান হারিয়ে পড়েছিলাম জানি না, শুনতে পেলাম বাবার কণ্ঠস্বর। তিনি যেন আমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। মূর্চ্ছা যখন ভাঙলো, তখন দেখি চারিদিক সূর্যকিরণে ঝলমল করছে। সঙ্গীরা সবাই নর্মদাতে গেছেন স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সারতে। আমিও কমণ্ডলু নিয়ে স্নান করতে গেলাম।

স্নান করে ফিরে পূজা করলাম নীলকণ্ঠেশ্বর শিবলিঙ্গের। যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। সাধুজী প্রত্যেকের হাতে কলা, মিছরী দিলেন। আমি বললাম — এখানে কোন সদাবর্ত আছে?

এটি ভয়ঙ্কর ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ী। খেড়ীঘাট পর্যন্ত একটি মানুষও চোখে পড়বে না। জঙ্গল মেঁ শের ভল্লু বগেরা জানোয়ার হৈ।

সাধুকে প্রণাম করে আমার হেঁটে চলেছি, নর্মদামায়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে করতে। স্বচ্ছতোয়া কলনাদিনী নর্মদা কখনও পাহাড়ের গা বেয়ে, কখনও পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করে, অরণ্যের ঢালকে কোথাও বাঁদিকে, কোথাও ডানদিকে রেখে আপনমনে বয়ে চলেছেন। ভাষায় এ দৃশ্য আঁকা যায় না, বর্ণনাও করা যায় না।

দ্রুততালে হাঁটার ফলে গা গরম হয়ে উঠেছে। নর্মদার উত্তরতটের বিন্ধ্য পর্বতমালার শীর্ষদেশে চোখ পড়তে বিস্ময়ে 'থ' হয়ে গেলাম। একবার বামদিকে নীল আকাশের গায়ে বিন্ধ্য পর্বতমালার বাদামী ধূসর আলিম্পন, আর একবার ডানদিকে সাতপুরা পর্বতমালার রূপালী আলিম্পন, সূর্যরশ্মি পড়ে তা ঝলমল করছে। এদৃশ্য এতক্ষণ আমি চোখ মেলে দেখি নি।

আমরা মনে মনে নর্মদার কৃপা ভিক্ষা করে হাঁটতে লাগলাম দ্রুতপদে, পার্বত্যপথে ইচ্ছা করলেও দ্রুত হাঁটা যায় না। যাইহোক যতদূর সম্ভব দ্রুত হেঁটে চলেছি।

বেলা বোধহয় বারোটা। সূর্যদেব তখন মধ্যগগনে। আমরা একটি বড় ঘোড়কা নিম গাছের তলায় বিশ্রাম করতে বসলাম। ঝোলা থেকে সাধুজী প্রদত্ত কলা ও মিছরি বের করে শিবস্মরণের পর খেতে আরম্ভ করলাম। মিনিট দশেকের মধ্যে খাওয়া শেষ হলে আমরা যাত্রার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। গাঁঠরী, কমণ্ডলু লাঠি হাতে এগিয়ে চললাম।

— আপলোগ কাঁহাসে আতে হৈ? পরিক্রমাবাসী হৈ? এহি খেড়ীঘাট হ্যায়। আজ গাঁও মেঁ চার পাঁচঠো চিতা জঙ্গলসে আকর হামলা কিয়া হ্যায়। হোঁশিয়ার সে জাবেগা। উত্তরতটকী ওঁকারেশ্বরকী ঝাঁড়ি ইহাঁসে প্রারম্ভ হোতী হ্যায় ঔর দক্ষিণতটকী ঝাড়ি ইহাঁ সমাপ্ত হোতী হ্যায়। ইস্ ঘাটকে সমীপ শ্রীনর্মদাজী পর রেলকা পুল হ্যায়। ঘাটকা পাস ধর্মশালা ঔর মন্দির হ্যায়।

লোকটির কর্কশ কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। নর্মদার দক্ষিণতটস্থ এই পার্বত্য পথের বেশ কতকটা জুড়ে সারি সারি তাল ও শালগাছ রয়েছে। আমরা সেই লোকটিকে 'সুক্রিয়া' জানিয়ে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলাম। সন্ধ্যার আগেই মন্দিরে পৌঁছে যেতে চাই। অস্তগামী সূর্যরশ্মি নর্মদায় পড়ে নর্মদার গতিপথকে দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন একটা রূপার চওড়া পাত পড়ে আছে। নর্মদাঘাটের সেই দৃশ্য আমি চোখ ভরে, মন ভরে উপভোগ করতে করতে কিছুক্ষণ এগিয়ে যেতেই পেলাম খেড়ীঘাটের মন্দির। মন্দিরের জীর্ণদশা। রাতে এতজনের সেখানে থাকা হবে না। নর্মদার জলে নেমে স্নান করতে লাগলাম। স্নান জপাদি সেরে আমরা ধর্মশালায় এলাম। ধর্মশালার কোঠারী রঘুবংশ খুব আদরের সঙ্গে আমাদের ধর্মশালার ঘর খুলে দিল। ঘরটি খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোঠারী ঘরের মধ্যে দুটি মোমবাতি জ্বেলে দিলেন।

আমি ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে নর্মদার বাঁধানো ঘাটে একা একা বেড়াতে লাগলাম। এমন সময় চমকে উঠলাম একজনের কণ্ঠস্বরে, আরে ভেইয়া সাধুজী! হম্ ত পহেলে দফেই আপ্‌কো হোশিয়ার কর্ চুকা না, ইধর চিতাকা ডর হ্যায়। কথা বলতে বলতে লাঠি হাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন বিকেলে দেখা সেই লোকটি। একই কর্কশ কণ্ঠস্বর। আমাকে বললেন — আভি চলা যাইয়ে ধর্মশালামেঁ। আমি তাকে 'সুক্রিয়া' জানিয়ে মন্দিরের পথ ধরলাম।

আমরা ধর্মশালার বাইরেরর বারান্দায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছি। সামনে দিয়ে বয়ে চলেছেন মা নর্মদা। উত্তরতটেরও নাম খেড়ীঘাট। এই ঘাট যেমন নির্জন তেমনি উত্তরতটের ঘাট লোক সমাগমে মুখর। ঘাটে বহু লোক ঘুরে বেড়াচ্ছেন। মন্দিরে শিঙা ডম্বরু কাঁসর ঘন্টাসহ আরতি হচ্ছে। দক্ষিণতটের মন্দিরেও আরতি হচ্ছে। কিন্তু এখানে লোক সমাগম অনেক কম। গরমও পড়েছে প্রচণ্ড। উত্তরতটের নর্মদার ঘাটে এক জায়গায় গ্যাসবাতি জ্বলছে। নারী-পুরুষ মিলিয়ে বোধহয় শতখানিক লোক বসে আছেন শ্রদ্ধাবনত চিত্তে। কথক ঠাকুর কথকতা শুরু করলেন। তিনি বলছেন — আজকের অলোচ্য বিষয় হল স্ত্রী-ধর্ম। সংসারে দুটি বস্তু মোহকারী — অর্থ ও নারী। মানুষ এই দুটি নিয়েই মত্ত থাকে। কিন্তু সংসার জীবনের আকর্ষণ এই দুটি জিনিষই মানুষকে আঘাত দেয় বেশী। তাহলেও মেয়েরা অন্নপূর্ণার জাত, মায়ের জাত। দেশে দু'দশজন ব্যাভিচারিণী থাকতে পারে, সকল কালেই ছিল এখনও আছে, কিন্তু সতী সাধ্বীরও অভাব নেই। এ জগতের রূপ রস ও মধুর উৎস হলেন নারী। ন + অরি, স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করেও নারী শব্দ সিদ্ধ হয়। নারীকে কোনমতেই সাধনার পথে বাধা বলা যায় না, অরি বা শত্রু ভাবা যায় না। পুরুষ ও নারীর অন্তরস্থ কামলোলুপতা বা চঞ্চল ইন্দ্রিয়বর্গই আসল অরি। নারীর শুধু কাম কটাক্ষই নেই, তার হৃদয়ে আছে অপার মমতা স্নেহ সেবা ও ভালবাসার উৎস। চোখের সামনেই রয়েছেন মা নর্মদা এবং চিরস্মরণীয়া অহ্যলাবাঈ-এর স্মৃতিচিহ্ন। কারণ মা হলেন অলৌকিক জ্ঞানসম্পন্না, স্বর্গলোক মধ্যে শ্রেষ্ঠা। মা নিজে প্রকৃত স্ত্রীধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন — বিবাহকালে অগ্নি সাক্ষী রেখে স্ত্রী স্বামীর সহধর্মচারিণী হন।

যে স্ত্রী সৎস্বভাবা, প্রিয়ভাষিণী, সচ্চরিত্রা, সুদৃশ্যা, অনন্যচিত্তা ও সুমুখী — সেই স্ত্রী স্বামীর সধর্মচারিণী হতে পারেন।

যে সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে সর্বদা দেবতার ন্যায় দর্শন করেন; তিনি নামে ধর্ম-পরমা হন এবং ধর্মভাগিনীও হয়ে থাকেন।

অনন্যচিত্তা, অবিরুদ্ধমনা, সুনিয়মা ও সুখদর্শনা যে নারী দেবতার ন্যায় স্বামীর শুশ্রূষা ও অনুসরণ

করেন; তিনিও ধর্মভাগিনী হন।

যে সাধ্বী স্ত্রী পুত্রের মুখের ন্যায় স্বামীর মুখও সর্বদা সস্নেহে দর্শন করেন এবং সংযতভোজনা হন, তিনি ধর্মচারিণী হয়ে থাকেন।

যে নারী মুনিগণ প্রবর্ত্তিত মঙ্গলজনক দম্পতিধর্মরূপ সহধর্ম শ্রবণ করে স্বামীর সমান ব্রতচারিণী হন; তিনি সেই ধর্মের গুণে প্রধান হয়ে থাকেন।

সাধ্বী স্ত্রী সর্বদাই স্বামীকে দেবতার ন্যায় দর্শন করেন। পতি ও পত্নীর এই মঙ্গলময় ধর্মকেই মুনিরা সহধর্মরূপে প্রবর্ত্তিত করেছেন।

যে নারী প্রসন্নচিত্তা, সুনিয়মা, সুখদর্শনা, অনন্যচিত্তা ও প্রফুল্লবদনা হয়ে বশীভূতভাবে দেবতার তুল্য পতির শুশ্রূষা ও নিকটে বিচরণ করেন, সেই নারী ধর্মচারিণী বলে গণ্য হন।

স্বামী নিষ্ঠুর বাক্য বললেও কিংবা রুক্ষ দৃষ্টিতে দর্শন করলেও যে নারী অত্যন্ত প্রসন্নবদনাই থাকেন; সেই নারী পতিব্রতা।

যে নারী পতি ব্যতীত চন্দ্র সূর্য্য কিংবা পুরুষ নাম বিশিষ্ট কোন বৃক্ষের প্রতিও সকাম দৃষ্টিপাত করেন না, সেই নারীই উত্তমা স্ত্রী ও ধর্মচারিণী বলে গণ্য হন।

পতি দরিদ্র, রোগগ্রস্ত, দুঃস্থ বা পথশ্রান্ত হলেও যে নারী পুত্রের ন্যায় তাঁহার শুশ্রূষা করেন; সেই নারী ধর্ম্মচারিণী।

যে নারী সংযতা ও গৃহকার্য্যনিপুণা হন কিংবা যে নারী পুত্রবতী হয়েও পতিব্রতা এবং পতিপ্রাণাই থাকেন, সেই নারীই ধর্মভাগিনী হন।

যে নারী সর্ব্বদা প্রসন্নচিত্তা হয়ে স্বামীর শুশ্রূষা ও নিকটে বিচরণ করেন এবং স্বামীর অত্যন্ত বিশ্বস্তা ও বিনয়সম্পন্না থাকেন, সেই নারীই ধর্মভাগিনী।

যে নারী প্রত্যহ অন্নদান করে পরিজনবর্গের ভরণ করেন এবং যে নারীর পতির প্রতি যেমন আকর্ষণ থাকে; তেমন আকর্ষণ কামে, ভোগে, প্রভুত্বে ও সুখে থাকে না; সেই নারীই ধর্মভাগিনী।

যে নারী প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করেন, গৃহের শোভা সম্পাদন করে থাকেন, গৃহকে পরিমার্জ্জিত রাখেন এবং গোময়দ্বারা গৃহ লেপন করেন; সেই নারীই ধর্মভাগিনী হয়ে থাকেন।

যে নারী প্রত্যহ পাক প্রভৃতি করায় অগ্নিকার্য্যপরায়ণা থাকেন; দেবতাকে নিত্য পুষ্প উপহার দেন, পতির সহিত দেবতা, অতিথি ও ভৃত্যদিগকে অন্নদান করে নিজে শেযান্ন ভোজন করেন এবং প্রত্যহ যথানিয়মে ও যথাবিধানে পরিবজনবর্গকে হৃষ্টপুষ্ট করে থাকেন; সেই নারী ধর্মভাগিনী হন।

গুণবতী যে নারী সর্বদা শ্বশ্রূ ও শ্বশুরের চরণযুগলের সেবা করেন এবং মাতা ও পিতাকে ভক্তি করেন; সেই নারী তপোধনা বলিয়া অভিহিত হন।

যে নারী অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণ, দুর্বল, অনাথ, দরিদ্র, অন্ধ ও ক্ষুদ্র লোকদিগকে ভরণ করেন; সেই নারী পতিব্রতাধর্মের অধিকারিণী হন।

যে নারী সর্বদা পতিগতচিত্তা ও পতির হিতকারিণী হয়ে একাগ্রচিত্তে দুষ্কর ব্রত করেন, তিনি পতিব্রতা ধর্মের অধিকারিণী হন।

যে নারী পতিসর্বস্বা, পতিব্রতা ও সতী হন; সেই নারীর পক্ষে, এই পতিসেবা পুণ্যের হেতু, তপস্যা ও সনাতন স্বর্গস্বরূপ হয়ে থাকে।

নারীর পক্ষে পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গতি; আর নারীর পক্ষে পতির তুল্য আশ্রয় নাই এবং পতি যেমন দেবতা, তেমন দেবতাও নাই।

পতির অনুগ্রহ বা স্বর্গ এই দুইই নারীর নিকট সমান কিংবা সমান নাও হতে পারে (অর্থাৎ নারীর পক্ষে স্বর্গাপেক্ষাও পতির অনুগ্রহ শ্রেষ্ঠ); সুতরাং মহেশ্বর! আপনি অসন্তুষ্ট হবার সম্ভব হলে আমি স্বর্গও ইচ্ছা করি না।

দরিদ্র বা কোন প্রকার রোগগ্রস্ত, বিপন্ন, শত্রুহস্তগত কিংবা ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হয়ে পতি যদি কিছু বলেন; তবে তা যদি অকর্ত্তব্য বা পাপের কার্য্য কিংবা প্রাণনাশকও হয়; তথাপি ভার্য্যা আপদ্ধর্ম লক্ষ্য করে নিঃশঙ্ক চিত্তে তা করবেন।

দেব! এই আমি আপনার আদেশে স্ত্রীধর্ম বললাম। যে নারী এইরূপ হন, তিনি পতিব্রতাধর্মের অধিকারিণী হয়ে থাকেন।'

কথকতা শেষ হতে রাত্রি আটটা বাজল। অন্যান্যদের সঙ্গে আমিও ধর্মশালার ঘরে ঢুকে এক কমণ্ডলু জল পান করে আমার একমাত্র সম্বল কুশাসন শয্যার উপর বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। বাবার আশীর্বাদে কন্টকাকীর্ণ শূলপাণির ঝাড়ি এবং ঘনঘোর ওঁকারেশ্বর যাইহোক করে অতিক্রম করে এসেছি। মুণ্ডমহারণ্যের ঝাড়িতে কি ঘটবে জানি না। এসব কথাই ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

দরজা খুলে আমরা যখন বেরিয়ে এলাম তখন মনে হল সকাল আটটা বেজে গেছে। খেড়ীঘাটের শিব মন্দিরে পূজা চলছে। বহু ভক্তের ভীড়। আমরা নর্মদাতে নেমে স্নান-তর্পণাদি সেরে যখন ফিরলাম তখন পূজা সমাপ্ত। মন্দিরে কেউ নেই। মন্দিরে ঢুকলাম পূজা করতে। প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথ বলতে বালি আর কাঁকর, লাল আর কালোপাথরের ঢিবির পর ঢিবি। ঢিবির গায়ে গায়ে ফণিমনসা আর কাঁটা বাবলা। কোথাও বা পথের দুধারে সারিবদ্ধভাবে সেগুন, বুনোনিম এবং শিরীষ গাছ। নর্মদা যেন ধীরে ধীরে পাহাড়ের মধ্যে কতকটা পথ ঢুকে গিয়ে আবার বক্রগতিতে আপন পথে বয়ে চলেছেন।

পথের মধ্যে কোথাও কোন হিংস্র জন্তু লুকিয়ে আছে কিনা তা দেখবার জন্য পথের দুপাশের জঙ্গল এবং পাহাড়ের দিকে ঘুরে ফিরে তীক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখতে দেখতে চললাম। বনের পাখী ও দূরের গাছের ডালে দু'চারটে ময়ূর ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলাম না। সারাদিন হেঁটে বেলা প্রায় চারটার সময় মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে পৌঁছলাম। দূর থেকে একটা মন্দিরের চূড়া মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিলাম। বড় বড় সেগুন গাছের জটলার জন্য সম্পূর্ণ মন্দিরটা চোখে পড়ছিল না। জঙ্গল পেরিয়ে আসতে আমাদের দৃশ্যপটে ফুটে উঠল বিরাট মন্দির। এই মন্দিরে ওঁকারেশ্বর বিরাজিত। আমরা সেইখানেই ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম জানালাম নর্মদাবক্ষের বৈদূর্যপর্বতস্থিত ওঁকারেশ্বর মহাদেবকে। কিছুদূরে দু'চারটে পাথরের পুরানো বাড়ী দেখতে পেলাম। আমরা নর্মদার কিনারে এসে পৌঁছলাম। সকলেই নর্মদার জল চোখে মুখে দিয়ে পেট পুরে জল খেলাম। স্নিগ্ধ জলের স্পর্শে দেহ মন শীতল হল।

আমরা মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে বিশ্রাম করতে বসলাম। আমি বললাম — নর্মদা পরিক্রমার মাহাত্ম্য পূর্বে কেউ জানত না। নর্মদা মহিমার প্রথম প্রচার কর্তা মার্কণ্ডেয় মুনি। মার্কণ্ডেয় মুনি যে সপ্তকল্পান্তজীবী তা বোধহয় আপনারা শুনে থাকবেন। কল্পান্তে প্রলয়কালে একবার মার্কণ্ডেয়জী একলা এক কুমারী কন্যাকে অপার সমুদ্রজলে খেলা করতে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হন। অন্যান্য কল্পান্তেও পৃথিবীর সবকিছু বিনষ্ট হয়ে গেলেও মার্কণ্ডেয় একই কুমারী কন্যাকে দেখে তিনি তাঁর চরণযুগল ধরে পরিচয় জানবার জন্য কাতরভাবে প্রার্থনা করতে থাকেন। তখন তিনি নিজেকে শিবপুত্রী নর্মদা বলে পরিচয় দেন এবং একথাও বলেন, যে তাঁর কখন বিনাশ নেই, তিনি তপস্যায় সিদ্ধিদায়িনী। মহামুনি মার্কণ্ডেয়, নর্মদার মাহাত্ম্য যে সর্বাধিক তা' বুঝতে পেরে তিনি পরিক্রমা শুরু করেন এবং প্রতিঘাট ও সংগমস্থলে অবস্থান করে সেগুলিকে জাগ্রত করেন। তিনিই সর্বপ্রথম জগতে প্রচার করেন যে নর্মদা পরিক্রমায় তপোসিদ্ধি হয়। জনশ্রুতি যে, আমাদের সামনে নর্মদা বক্ষে যে শিলাটি রয়েছে এর উপর বসেই তিনি নর্মদার তপস্যায় রত ছিলেন। হরানন্দজী বললেন — আমার তর সইছে না। এক্ষুণি ওঁকারেশ্বর মন্দিরে দৌড়ে যেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু আমাদের হাত পা বাঁধা। সোমানন্দজী আমাদের মার্কণ্ডেয় শিলার কাছেই অপেক্ষা করতে বলেছেন। তিনি আমাদের সঙ্গে এখানেই দেখা করবেন। হরানন্দজীর কথা শুনে ত্রিদিবানন্দ বললেন — তাই ভাল। তাঁর জন্য অপেক্ষা করা যাক। আমরা সবসময়েই তাঁর দৃষ্টিপথে আছি।

এদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছেন। তাঁর অস্তকালীন রক্তরাগরশ্মির ছটায় গোটা পশ্চিম আকাশ রঞ্জিত। তারই প্রতিফলন পড়েছে নর্মদার বুকে। অপরূপ! অপরূপ! সূর্যাস্তের অপরূপ দৃশ্য দু চোখ ভরে দেখতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ পরেই ঢং ঢং করে ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠল ওঁকারেশ্বর মন্দিরে। এবার বোধহয় আরতি শুরু হবে। আমরা নর্মদা স্পর্শ করে এসে মার্কণ্ডেয় শিলার কাছের বিশাল বিল্ব বৃক্ষ তলে জপে বসলাম। জপ শেষ হতেই হঠাৎ দূর থেকে দেখতে পেলাম কেউ যেন হেলে দুলে হাত নাড়তে নাড়তে আসছেন। ক্রমশঃ স্পষ্ট হচ্ছে তাঁর গলার স্বর। আমরা সকলেই উঠে দাঁড়িয়েছি। একটু এগিয়ে যেতেই স্পষ্ট শুনতে পেলাম — 'যম বেটা তোর

সাহস থাকে এগিয়ে আয়! পারিস তো তোর খালি আঁত ভরিয়ে যা'। আমাদের দেখে অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়লেন তিনি।

আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে বললেন — 'আবে নে নে, ন্যাকামি আর করতে হবে না। তুই বড় সাধের ঠাকুর দেখেছিস্। সেই আদ্যিকালের বুড়োটাকে ভাবছিস্। আরে, আমিও বুড়ো শিবের বুড়ো বয়সের ছ্যনারে! আমাকেও বাপটা আদর করে।'

তিনি মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে এসে ধপ্ করে বসে পড়লেন। আর কোন কথা বলছেন না। তিনি শুধু দুলেই যাচ্ছেন। হঠাৎ মেঘের কড়্ কড়্ কড়াৎ শব্দ শোনা গেল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হঠাৎ হরানন্দজীর দিকে তাকিয়ে বললেন — ওরে বুড়ো আমার রসের গুঁড়ো। ভাবছিস্ বৃষ্টি হলে খোলা আকাশের তলায় বসে ভিজতে হবে। না রে, না, তোরা এখানে ঘুমা। আমি তো এখানেই বসে আছি। তিনি বিল্ববৃক্ষের গায়ে ঠেস দিয়ে গান ধরলেন —

ওমা রেবা, তুই চিন্তা করিস্ কেনে,
তোর বুড়ো বাপের মতন আর কেউ নাইকো ত্রিভুবনে।
তোর বাপের গুণের বশে ত্রিলোকের লোক ভালবাসে
আসমান হতে লোক আসে তোর বাপের দরশনে।
ওমা রেবা, তুই চিন্তা করিস্ কেনে।

বিজন কান্তারে মুক্ত আকাশের তলায় রাত্রিযাপনের অভিজ্ঞতা পরিক্রমাকালে আগেও ঘটেছিল। গান শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন সকাল হয়ে গেছে। সোমানন্দজীকে কোথাও দেখতে পেলাম না। যেদিকে তাকাই সেদিকে শুধু বড় বড় বনস্পতির মেলা। একটু পরেই সোমানন্দজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। বন-বাদাড় ভেদ করে তিনি আসছেন। এসেই আমাদের স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে নিতে বললেন।

নিত্যকর্মাদি সেরে এসে দেখি মহাত্মা কতকগুলি ইঁট দিয়ে হোমকুণ্ড সাজিয়ে রেখেছেন। তাতে ঘৃত সিঞ্চিত কিছু কাষ্ঠ। একটি তামার পাত্রে কিছুটা ঘি। একটি তাম্রপাত্রে কিছু ফল ও ফুল। হোমকুণ্ডের পাশে একটি চমস রাখা হয়েছে। রঞ্জনকে বললেন — আজ তোমার পিতৃবিয়োগের একাদশতম দিন। তুমি মার্কণ্ডেয় শিলার সামনে নর্মদার দিকে মুখ করে এই কুশাসনে বস। আর আমি কি বলছি শোন।

তিনি শুরু করলেন —'পা রক্ষণে' — এই ধাতু হতে 'পিতা' পদ সিদ্ধ হয়। যঃ পাতি সর্বান্ স পিতা অর্থাৎ যিনি সকলের রক্ষক সেই পরমেশ্বরের অপর নাম পিতা। আমাদের জন্মদাতাকে পিতা নামে অভিহিত করে ঋষিরা বুঝাতে চেয়েছেন যে, এই স্থূলজগতে পিতাই পরমেশ্বর পদবাচ্য।

পিতাই শিব। পিতা ও মাতা একত্রে শিব-শিবানী অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর। সমাধিবান্ ঋষিদের এই উপলব্ধ সত্য বর্ণ বিশ্লেষণেও ধরা পড়ে। ভারতীয় ভাষা জননী সংস্কৃত বা বাংলার বর্ণ-বিন্যাসের একটি যোগবিজ্ঞান সম্মত ক্রম আছে। সংস্কৃত বা বাংলার বর্ণগুলি সূক্ষ্ম আকাশে সেইভাবে স্পন্দনাত্মক বৃত্তি বা ধ্বনি রূপে নিয়ত বিরাজমান। দেহস্থ বিভিন্ন চক্রে সেইভাবেই সেগুলির দ্যোতনা পর পর একটি ক্রমধারায় উপলব্ধ হয়ে থাকে। কণ্ঠ, তালু, মূর্ধ্বা ওষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে তারই স্পন্দনাত্মক ঘাত্ উচ্চারণ স্থানরূপে নির্দিষ্ট।

প্রাচীন শৈবাগম দর্শনের বর্ণাভিধানং, কামধেনুতন্ত্র*, বর্ণোদ্ধারতন্ত্র, প্রভৃতি গ্রন্থে ঐ সব বর্ণের ধ্যান প্রণালী এবং স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। দুঃখের বিষয় ঐ সব গ্রন্থ বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। আমি এখানে বাংলা ভাষায় যেভাবে শিব ও পিতা শব্দ দুটি লেখা হয়, বাংলাতে সেই দুটি অক্ষরস্থ বর্ণের লেখনশৈলী ও স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখাবো যে বর্ণগুলির দ্বারা একই মূলতত্ত্ব দ্যোতিত ও প্রস্ফুট হয়েছে।

তিনি চাথালের এক কোণে চকখড়ি দিয়ে 'শিব' শব্দ বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। শিব = শ্ + ই + ব্ + অ। চারটি বর্ণের সমষ্ঠি। 'শ' বর্ণটির লেখন প্রণালী লক্ষ্য কর,

শ সব্যশ্চ কুণ্ডলী বামতো দক্ষতো গতা।
উর্দ্ধে কিঞ্চিৎ কোণং ভূত্বা উর্ধ্বাৎ আগচ্ছতি অধঃ॥

* তন্ত্র বলতে বর্তমান ভারতবর্ষ তথা বাংলা ও আসামে বহু প্রচলিত ও প্রচারিত তন্ত্র-সাহিত্য নয়।

সব্য শব্দের অর্থ বাম ও দক্ষিণে উভয় পার্শ্ব। 'শ' বর্ণটিতে বাম দিকেও একটা মণ্ডলা বা কুণ্ডলী পাকানো ডান দিকেও একটা; বাম দিকের কুণ্ডলীটি পাকিয়ে একই টানে বাম দিক হতে ডান দিকে কুণ্ডলীটি লেখা হয় (বামতো দক্ষতো গতা)। তারপর ঊর্ধ্বদিকে কিঞ্চিৎ কোণের মত সৃষ্টি করে উপর হতে নিচের দিকে একটা রেখা টানা হয়েছে (ঊর্ধ্বে কিঞ্চিৎ কোণং ভূত্বা ঊর্ধ্বাৎ আগচ্ছতি অধঃ)।

প্রাচীন মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ এই 'শ' এর স্বরূপ ও ধ্যান প্রসঙ্গে বলেছেন,

শকারঃ ব্রহ্মবিগ্রহঃ ধ্যানমস্য প্রচক্ষতে।
মূর্ত্তসৌখ্যঃ কুমারশ্চ সদাকল্যাণতৎপরঃ॥

— শ কে শিব বলে অবধারণ করবে। ইনি মূর্ত্তিমান্ সৌখ্য সুখস্বরূপ; কুমার (কুং কুৎসিতং মারয়তি যঃ) — মানুষের যা কিছু কুৎসিৎ ও কদর্য বৃত্তি তা ধ্বংস করে ইনি তার মধ্যে সুন্দরম্‌কে জাগ্রত করেন। সেই সঙ্গে জীবের সর্দৈব মঙ্গলচিন্তা করেন। তাহলে শ এর দ্বারা সূচিত করা হচ্ছে এমন একটি চৈতন্যসত্তাকে যিনি একাধারে সৌন্দর্য ও মঙ্গলের ঘনীভূত বিগ্রহ।

ই-কার এর অর্থ গতি। সংস্কৃতে ই-ধাতুর অর্থ গমন করা। যেমন, এতি = ই ধাতুর উত্তর লট্ তি। এতি মানে গচ্ছিত। গত্যর্থক ই ধাতু শক্তিরও প্রতীক, Dynamic পদার্থ। যখনই কোন বস্তু গতিশীল হবে, বুঝতে হবে তার মধ্যে শক্তির স্পন্দন ক্রিয়াশীল অর্থাৎ সেখানে ই-বর্ণের প্রকাশ হয়েছে।

ঋষিদের উপলব্ধি, এই গতি যদি ঊর্ধ্বমুখী হয়, এবং বর্ণের বামদিকে থাকে তাহলে সিদ্ধকালী অর্থাৎ জগতের পরমা ক্রিয়াশক্তিতে পরিণত হয়,

ই-কারঃ গতিশক্তিশ্চ সর্দৈব গমনার্থ কঃ।
বামপার্শ্বস্থিতা রেখা ভবতি সিদ্ধকালিকা॥

শিব শব্দে শ বর্ণের বামদিকে হ্রস্ব ই কার (ি) থাকায় পরমপুরুষের সঙ্গে পরমাক্রিয়াশক্তির সংযোগ অর্থাৎ শিব-শিবানী একত্র যুক্ত হয়ে গেলেন।

এইবার ব-কার (ব্ + অ)। এই বর্ণের আকৃতি একটি ত্রিভূজের মত — ত্রিকোণযুক্ত রেখা। ব্রাহ্মণরা পূজার নৈবেদ্যাদি ঠাকুরকে নিবেদন কালে জল দিয়ে 'ব' এঁকে তার উপর ভোগপাত্র রেখে থাকেন। তাঁরা এটি আধারশক্তির প্রতীক বলে গণ্য করেন। আধারশক্তির অর্থ যে চৈতন্য শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বিধৃত। ঋষিরা 'ব' বর্ণের লেখনশৈলী এবং স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন —

কোণত্রয়যুতা রেখা আধারশক্তেঃ বরং বিভুঃ।
ত্রিভুজং ত্রিনয়নং তু রুণ্ডমালো মহেশঃ॥

— তিনটি কোণযুক্ত এই রেখা আধারশক্তির বরণীয় বিভু। ত্রিভুজের আকারটি গলায় হাড়মালাশোভিত মহেশ্বরের ত্রিনয়ন। আর 'অ' অর্থে অনন্ত। ব্ বর্ণের শেষে অনন্তের প্রতীক অ থাকায় শিব একাধারে অনন্ত ক্রিয়াশক্তি (ি), অনন্ত সৌন্দর্য (কুমারঃ), অনন্ত আনন্দ (মূর্ত্তসৌখ্যঃ) এবং অনন্ত মঙ্গলের (সদা কল্যাণ তৎপরঃ) সার্থকতম প্রতিশব্দ। ঋষিদের অত্যন্ত সুনির্বাচিত শব্দ।

এইবার পিতা শব্দটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে প্রতিটি বর্ণের লেখনশৈলী বর্ণনা করছি। একটু অনুধ্যান করলেই বুঝতে পারবে পিতা শিবেরই প্রতিরূপ। পিতা = প্ + ই + ত্ + আ। চারিটি বর্ণের সমষ্টি। প্রথমেই প অক্ষর ধরা যাক্। আমরা বাংলায় কিভাবে 'প' লিখি? একটি রেখাকে কুঞ্চিত করে বাঁকিয়ে নীচের দিকে কিঞ্চিৎ টেনে এনে উপরের দিকে তুলি, তাতে যে কোণের সৃষ্টি হয়, তাকে পুনরায় একটি কুঞ্চিত রেখা দ্বারা আচ্ছাদন করে একটি উর্ধাধঃ রেখা টানলে বাংলায় প অক্ষরের সৃষ্টি হয়। এই লেখন প্রণালীকে সংস্কৃতে লিখলে,

কুঞ্চিতা বামরেখায়া কোণাদ্দক্ষিণতোঽপরা।
কুঞ্চিতা সাপি বিজ্ঞেয়া ঊর্ধ্বাধঃ গচ্ছতি পুনঃ॥

এই প এর স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে শিব শৈবাগম দর্শনের উপদেষ্টা দুর্বাসাকে বলেছিলেন,

চতুবর্গপ্রদং বর্ণং পকারং হি তপোধন।
শরচ্চন্দ্র-প্রতীকাশং বাৎসল্যরসসিঞ্চিতং।
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-তথা শিবঃ ক্রমশস্তাসু তিষ্ঠতি॥

অর্থাৎ যে সব রেখা টেনে প লেখা হয়, সেগুলির মধ্যে (তাসু) ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের বাৎসল্য রস এবং শক্তি নিহিত আছে। এই অক্ষরের স্বরূপতত্ত্ব জানতে পারলে চতুর্বর্গ লাভ হয়।

শাস্ত্রকারদের মতে, ব্রহ্মা এই জগৎ সৃষ্টি করেছেন, বিষ্ণু পালনী শক্তির প্রতীক আর শিব হচ্ছেন এক সদৈব মঙ্গলময় সত্ত্বা (শিব শব্দের অর্থ মঙ্গল)। পিতা শব্দটির মধ্যে প থাকায় পিতার মধ্যে সৃষ্টি স্থিতি পালন করার ক্ষমতা আছে। তিনি বাৎসল্যরসমণ্ডিত মঙ্গলময় সত্ত্বা। এ কথা কি আর বলে বুঝাতে হবে যে পিতাই আমাদের দেহ সৃষ্টি করেছেন, পিতাই তাঁর অপার স্নেহ মমতা ও দয়া দিয়ে আমাদেরকে পালন করেন, ভরণ পোষণ করেন, আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য তাঁর সতত চিন্তা থাকে। আমরা জ্ঞানলাভও করি পিতার কাছ হতে। আপন সন্তানকে ধর্মপথে অভ্যুদয়ের পথে উন্নতি পরিচালিত করার জন্য পিতার যেমন অতন্দ্র দৃষ্টি থাকে, এমনটি আর কার আছে? প বর্ণের বিশ্লেষণে ঋষিরা দেখিয়েছেন এই হল পিতার স্বরূপ।

পূর্বেই ই-বর্ণের ব্যাখ্যায় দেখিয়েছি যে ই হল পরমা ক্রিয়াশক্তি। প এর বামে এই হ্রস্ব ই-কার থাকায় পরমা ক্রিয়াশক্তির (সিদ্ধ কালিকার) প্রতীক মাতৃশক্তি অর্থাৎ মা পিতার সঙ্গে যুক্ত। আমার মা তোমার মা প্রত্যেকের মা পিতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছেন — একত্রে শিব শিবানী অর্থাৎ অর্ধনারীশ্বর।

এইবার ত অক্ষরটি লেখন শৈলী ও স্বরূপটি শোন।

আদৌ বিন্দুস্ততোমধ্যে কুণ্ডলীত্বমবাপ্য সঃ।
দক্ষাদ্বামগতো নিত্যঃ শিবঃ মঙ্গলস্বরূপঃ॥

— প্রথমে একটি বিন্দু (·) লিখে বিন্দুকে কুণ্ডলীর মত করে অর্ধবৃত্তাকারে ডান দিক হতে বাম দিকে বিস্তৃত বা প্রসারিত করে দিলেই বাংলা ভাষায় ত অক্ষর ফুটে উঠবে। শৈবাগমের ঋষি বলেছেন, ঐ 'ত' বর্ণে আকারে দিলে (আ বর্ণের অর্থ সৃজনী শক্তি), সেটি মঙ্গলস্বরূপ শিব-এর দ্যোতক।

পূর্বে শিব শব্দের যে তাৎপর্য উদ্‌ঘাটন করেছি, এখানে পিতা শব্দের বর্ণ ও স্বরূপ বিশ্লেষণেও সেই একই মর্ম, একই রহস্য, একই অর্থ ধরা পড়ছে। দেখা যাচ্ছে যে, শিব ও পিতা দুটি শব্দই সমার্থক, দুজনেই সমান। পিতা = শিব। পিতা অসীম শিবেরই সসীম রূপ। ঘটাকাশ, গুহাকাশ এবং মহাকাশ যেমন কোন স্বরূপতঃ প্রভেদ নাই, একই আকাশে ঘট ও গৃহের সীমায়িত স্থানে আবদ্ধ থাকায় ঘটাকাশ ও গৃহাকাশ সংজ্ঞা দেওয়া হয় মাত্র, ঘট বা গৃহ ভগ্ন করলে যেমন একই আকাশ থাকে, তেমনি অমর্ত্ত্য শিব যখন মর্ত্ত্যশরীরের আবেষ্টনীতে থেকে আমাদের সামনে ঘুরে বেড়ান তখনই আমরা তাঁকে পিতা বলি। আমি ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বলতে চাচ্ছি, পিতা ও শিবে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই, পিতাই শিব। এইটি আমার জপমন্ত্র। আমার উপলব্ধ সত্য — পিতা জীবন্ত ঈশ্বর এবং মাতা জীবন্ত ঈশ্বরী। তুমিও এই সিদ্ধমন্ত্র জপ কর, আমার সঙ্গে কলকণ্ঠে বল —

তোমার — তোমার — আমি হে তোমার
— প্রতি পরমাণু কহে বারবার,
বাবা, তুমিই আমার নন্দন-সার
সুন্দর প্রেমখনি;
কেশ বেশ ঢেকে আসিয়াছ শিব।
অমৃত-পরশমণি।

কমণ্ডলুর জল দিয়ে খড়ির দাগ ঘষে ঘষে ধুয়ে উঠে দাঁড়ালেন মহাত্মা। যজ্ঞকুণ্ডের চারদিকে নমস্কারের ভঙ্গীতে মাথা দোলাতে দোলাতে মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুত্র মধুছন্দা দৃষ্ট ঋগ্বেদের আগ্নেয় সূক্তের অন্তর্গত প্রথম মণ্ডলের প্রথম মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে করতে যজ্ঞকাষ্ঠের উপর ঘৃত সিঞ্চন করতে থাকলেন, তাঁর কণ্ঠে গায়ত্রী ছন্দে মন্ত্র উদ্‌গীত হতে থাকল —

ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং। হোতরং রত্নধাতমং॥

ওঁ অগ্নিং ঈলে। ওঁ অগ্নিং পুরঃহিতং ঈলে। ওঁ হোতারং ঈলে। ওঁ ঋত্বিজং ঈলে। ওঁ রত্নধাতমং দেবং ঈলে। ওঁ যজ্ঞস্য পুরোহিতং হোতারং ঋত্বিজং রত্নধাতমং দেবং অগ্নিং ঈলে॥

এইভাবে মন্ত্রের প্রতিটি শব্দ ভেঙ্গে ভেঙ্গে গমকে গমকে তালে তালে পরিপূর্ণ গায়ত্রী ছন্দে উচ্চারণ করে তাঁর নির্দিষ্ট আসনে দাঁড়িয়ে স্থির দৃষ্টিতে সূর্যের দিকে তাকিয়ে সুদীর্ঘ বিলম্বিত শ্বাস টানলেন প্রায় দেড় মিনিট

কাল ধরে তারপর একই বিলম্বিত তালে নিঃশ্বাস ফেললেন ঘৃত সিক্ত যজ্ঞ কাষ্ঠের উপর। নিঃশেষিতভাবে শ্বাস ফেলেই তিনি পুনরায় সূর্যের প্রতি দৃষ্টি স্থাপন করে ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলান্তর্গত চতুর্দশ সূক্তের কণ্বপুত্র মেধাতিথি দৃষ্ট নবম ঋক্‌মন্ত্রটি একই গায়ত্রী ছন্দে নিখুঁত স্বরব্যঞ্জনায় গেয়ে উঠলেন —

ওঁ আকীং সূর্যস্য রোচনাদ্বিশান, দেবাঁ উষর্বুধ বিপ্রো হোতেহ বক্ষতি॥ ওঁ॥

তাঁর মন্ত্রোচ্চারণও শেষ হল আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে যজ্ঞকুণ্ডে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠল। আক্ষরিক অর্থেই বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্তব্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম স্বয়ং প্রকটিত অগ্নিশিখার নর্তনলীলা। যজ্ঞকুণ্ডস্থিত প্রত্যেকটি কাঠ দেখতে দেখতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। বিনা অগ্নিতে কেবল মন্ত্রশক্তিতে এইভাবে অগ্নি দেবতার আবির্ভাব দৃশ্য জীবনে দ্বিতীয়বার দেখলাম। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছি যজ্ঞাগ্নির দিকে।

এমন সময় তিনি রঞ্জনকে ইঙ্গিতে চমসের সাহায্যে ঘি অগ্নিতে আহূতি দিতে নির্দেশ করলেন এবং নিজে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন।

ওঁ অগ্নয়ে কব্য বাহনায় স্বাহা। সোমায় পিতৃমতে স্বাহা॥ (যজু ঃ ২৯ কণ্ডিকা)

হে অগ্নে। তুম কব্য বহন করে থাক, অতএব আমাদের প্রাণপুরুষ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে এই কব্য তোমার নিকট সমর্পন করছি, এই আহূতি স্বাহূতি হোক। হে সোম, তুমি পিতৃগণের অধিষ্ঠান, অতএব তোমার উদ্দেশ্যে এই কব্য অগ্নিতে হবন করছি, এই আহূতি স্বাহূতি হোক (দেবতার উদ্দেশ্যে যা দেওয়া হয় তা হব্য আর পিতৃগণের উদ্দেশ্যে হৃদ্য ও উপাদেয় যা কিছু অগ্নিতে দেওয়া হয়, তার নাম কব্য। দেবতা ও পিতৃপুরুষ অগ্নিমুখেই গ্রহণ করেন। মাটির উপর কুশ পেতে পিণ্ডার্পন প্রভৃতি পরবর্তী যুগের ব্যাপার, পৌরহিত্য-তন্ত্রের অবদান)।

ওঁ আয়ন্তু নঃ পতরঃ সোম্যাসোহগ্নিষ্বাত্তা পথিভির্দেবযানৈঃ॥ (যজু ঃ ৫৮ কণ্ডিকা)

পিতৃগণ, দেবযানে আগমন করুন। অগ্নি আপনাদের দেহ গ্রহণ করেছে কিন্তু আত্মা অবিকৃতই আছে, অগ্নিমুখে আমাদের এই অন্ন গ্রহণ করুন।

ওঁ যে নঃ পিতুঃ পিতরো যে পিতামাতা য আবিবিশুরুর্বন্তরিক্ষম্।
য আক্ষিয়ন্তি পৃথিবীমুতদ্যাং তেভ্যঃ পিতৃভ্যো নমসা বিধেম॥ (অথর্ব ঃ ১৮।২।৪৯)

আমাদের পিতৃগণ যারা বৃহদাকাশে 'উরু অন্তরীক্ষং' প্রবেশ করেছেন, সহজ কথায় দিব্যলোকে আছেন অথবা আকাশ ও পৃথিবী আচ্ছাদন (আক্ষিয়ন্তি) করে বিরাজিত, সকলেরই মঙ্গল ও তৃপ্তিসাধনের জন্য অগ্নিতে প্রাণের অর্ঘ্য নিবেদন করছি।

ওঁ যে নিখাতা যে পরীপ্তা যে দগ্ধা যে চোদ্ধিতাঃ।
সর্বাংস্তনগ্ন আবহ পিতৃন্ হবিষে অত্তবে॥ (অথর্ব ঃ ১৮।২।৩৪)

পিতৃগণের দেহে প্রোথিত হোক বা যেরূপই তার পরিণাম ঘটুক না কেন, হে অগ্নে। তাঁদের ভোজনের জন্য (অত্তবে) অর্থাৎ তৃপ্তির অভিপ্রায়ে এই হবিঃ হোমের পদার্থ বহন করে নিয়ে যাও।

রঞ্জনের ঘৃতাহূতি ও কব্য অগ্নিতে সমর্পণ করার পর পূর্ণাহূতির সঙ্গে সঙ্গে নর্মদার মধ্যে দেখা দিল বিদ্যুতের মুহুর্মুহু ঝিলিক। রঞ্জনের বাবা-মার বৈদিহী আত্মা মূর্তি পরিগ্রহ করল। রঞ্জন হাউহাউ করে কাঁদতে কাঁদতে জ্ঞান হারাল। আমরা তখন বিস্মিত, হতচকিত, অবাক, স্তব্ধীভূত। আমরা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কেউই নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারছি না। পরস্পর পরস্পরকে ধরাধরি করে উঠবার চেষ্টা করছি কিন্তু উঠতে পারলাম না। রঞ্জনের স্থির স্তব্ধ শরীরে কোন স্পন্দন দেখছি না। দেখলাম সোমানন্দজী টলতে টলতে এগিয়ে চলেছেন বনের দিকে।

এইভাবে যে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। আমরা চুপচাপ বসে রইলাম। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে। শান্ত, নির্জন পরিবেশ। আকাশে অজস্র তারা ঝিক্‌মিক্ করছে। সামনে বয়ে চলেছেন কলনাদিনী নর্মদা। সোমানন্দজী ফিরে এসেছেন। আমরাও পায়ে হাতে জোর ফিরে পেয়েছি। কিন্তু মনে বইছে অনাবিল আনন্দের স্রোত। সোমানন্দজী স্পর্শ করলেন রঞ্জনকে। তার শরীরে ধীরে ধীরে স্পন্দন ও কম্পন দেখা দিল। প্রায় আধঘন্টা লাগল তার স্বাভাবিক হতে। তিনি বললেন — আমার হাত ধর। রঞ্জনের হাত ধরে ধীরে ধীরে বটগাছের তলায় হেলান

দিয়ে বসিয়ে দিলেন। ভোর হয়ে আসছে।

— এবার আমি যাব। হরবখৎ তুমি ও তোমরা আমার নজরের মধ্যে থাকবে। শিবমস্তু! শিবমস্তু! এই বলে সোমানন্দজী দুলতে দুলতে এগিয়ে চললেন।

আমরা তাঁকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। তিনি সবার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। আমরা একদৃষ্টে তাঁর চলে যাওয়া পথের দিকে দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। চড়াই উৎরাই পথে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমরা নর্মদার ঘাটে নামলাম স্নান করতে। বারবার চোখে মুখে জল নিতে লাগলাম। চোখের জল তবুও বিরাম মানছে না। বুকের ভিতরটা বড় ফাঁকা লাগছে। অনেকক্ষণ ধরে নর্মদাতে স্নান করলাম। সূর্যার্ঘ্য ও তর্পণাদি সেরে মহর্ষি তণ্ডি-কৃত শিবের সহস্রনাম পাঠ করতে লাগলাম। প্রায় দু'ঘন্টা সময় লাগল পাঠ শেষ করতে। রঞ্জন একইভাবে গাছে হেলান দিয়ে নর্মদার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। চোখে তার অবিরল অশ্রুধারা। বসে বসে ভাবছি আমি যা দর্শন করলাম নর্মদা পরিক্রমা করতে না এলে এই দুর্লভ সৌভাগ্য আমার জীবনে কী ঘটত ? বাবা কেন যে আমাকে তাঁর অন্তিমকালেও নর্মদা পরিক্রমা করার কথা বারবার করে বলে গেছলেন, তা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছি। মধ্যাহ্ন গত হয়েছে প্রায় এমন সময় দেখি সোমানন্দজী আসছেন সেই একই রকম হেলতে দুলতে। আর মুখে তাঁর অসংবদ্ধ প্রলাপ — যেয়েও আছে, থেকেও নাই। তেমনি তুমি আর আমি রে ভাই। আমরা মরে বাঁচি, বেঁচে মরি। মা নর্মদার এ কী বিষম চতুরী?

আমাদের সামনে একটা নূতন গামছায় বাঁধা পোটলা ফেলে দিয়ে বললেন — খেয়ে নাও। মা নর্মদা তোমাদের জন্য খাবার পাঠিয়ে দিয়েছেন। খুলে দেখি শালপাতা দিয়ে মোড়া গরম গরম পুরী ও সদ্য পাক করা চরু। আমরা খুবই তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে ফেললাম। দুদিন আমাদের কিছুই খাওয়া হয়নি। খেয়ে উঠেই আমরা নর্মদার ঘাটে নেমে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। এঁটো পাতাগুলি খাবার পরেই বনের দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। এসে দেখি, তিনি একইভাবে মাথা দোলাতে দোলাতে বলে চলেছেন — রাঁধুনী নাই তো রাঁধলে কে, রান্না নেই তো খেলেন কী? যে রাঁধলে সে খেলে, এই তো দুনিয়ার ভেলকি রে ভাই, এই তো দুনিয়ার ভেলকি।

চক্ষু মুদিলে সকলই দেখি, দেখি স্বরূপের বাজার। চক্ষু মেলিলে যা দেখি সবই ধোঁকা। দিনে সৃষ্টি রেতে লয়, নিরন্তর ইহাই হয়!

আমরা তাঁকে ঘিরে নির্বাক হয়ে বসে আছি। সহসা তিনি রঞ্জনকে বললেন — কাল বৈশাখী পূর্ণিমা। আমি তোমায় সন্ন্যাস দীক্ষা দেব। তোমার দীক্ষা গ্রহণের সময় উপস্থিত। জানবে — দীক্ষা এবং গুরু এই শব্দ দুইটি একে অপরের পূরিপূরক। দীক্ষা ছাড়া জীবের পূর্ণত্ব আসে না আর সেই দীক্ষা দান করেন গুরু। 'দীক্ষা' কথাটিতে দুটো অক্ষর — 'দী' আর 'ক্ষা'। 'দী'— দান করে, দীয়তে, ক্ষা — ক্ষীয়তে, ক্ষয় করে।

কিসের দান? কিসের ক্ষয়? 'দীয়তে পরমং জ্ঞানম, ক্ষীয়তে পাপ কর্মানি'— যা পরম জ্ঞান দান করে আর পাপ কর্ম অর্থাৎ আত্মার আবরক অজ্ঞান-অন্ধকার ক্ষয় করে।

'গুরু' কথাটির মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত। ঋষিরা বলেছেন —

'গু' শব্দে অন্ধকারঃ স্যাৎ 'রু' শব্দঃ তন্নিরোধকঃ
অন্ধকারনিরোধিত্বাদ্ তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

'গু' মানে অজ্ঞানতার অন্ধকার — 'রু' অর্থে তন্নিরোধক বিমল চৈতন্য-জ্যোতিঃ। দীক্ষাকালে গুরু ঐ অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করে, প্রকট করেন চৈতন্যের ধারা, শিষ্যের মধ্যে ঘটে প্রজ্ঞার পরম প্রকাশ। গুরু যিনি, তিনি দীক্ষাকালে 'ঘর মেঁ ঘর দেখলায় দেয়', এই দেহের মধ্যেই যে আনন্দধাম আছে — তা দেখিয়ে দেন, তৃতীয় চক্ষু উন্মীলন করে দেন। সাচ্চা গুরুর কাছে যে ভাগ্যবানের দীক্ষালাভের সুযোগ ঘটে — সেই আস্বাদন করে এই নিগূঢ় তত্ত্ব। এক সিংহশাবক দৈবাৎ শিশুকাল থেকেই মেষদলে মিশে গিয়ে নিজেকেই মেষ বলে ভাবত? মেষের মত শব্দ করতো? একদিন আর একটি সিংহ এসে তাকে চিনতে পেরে, জলের ধারে নিয়ে গিয়ে তার প্রতিবিম্ব দেখিয়ে তার স্বরূপের সন্ধান দিল। সে যে সিংহশাবক, মেষশাবক নয় — এই পরিচয় পেয়ে সে মহাবিক্রমে হুঙ্কার দিয়ে উঠল। সিংহশাবক যখন নিজের পরিচয় পেল, তখন তার ঐ Persona, মুখোশ — মেষশাবকরূপে মিথ্যা পরিচয় দান ঘুচল — সিংহের অনুসরণ করে — কায়ার পেছনে ছায়ার

মত ঘুরতে লাগল। সদ্‌গুরুর কাছে ঐ Loss of self ঘটে, কিন্তু লাভ হয় Long Life — এক দিব্যতর মহাজীবন! জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ, অমৃতের সনাতন-সিংহশাবক মহাবিক্রম ও তেজের আধার, কিন্তু নিজের স্বরূপ ভুলে মেষশাবকের মত ভুলে থাকে। প্রকৃত সদ্‌গুরু যিনি — একমাত্র তিনিই পারেন মহাজীবনের সন্ধান দিয়ে অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে। তাই কৃতকৃত্য, কৃতার্থ, কৃতজ্ঞ ভক্ত নিজেকে সদ্‌গুরু-চরণে বিলিয়ে দেয়, বিকিয়ে দেয়; এ তার আত্মবিলুপ্তি নয়, এই তার আত্মসত্তার মহাসমুত্থান। তাই গুরুর প্রণাম মন্ত্রে আছে —

(ক) অখণ্ড-মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

অখণ্ড-মণ্ডল পরিব্যাপ্ত যে চৈতন্য স্বত্তা — তাঁর পরমপদ যিনি দেখিয়ে দিলেন বা যাঁহা কর্তৃক দৃষ্ট হল, সে হেন গুরুকে প্রণাম করি।

(খ) অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরুবে নমঃ।

অজ্ঞানতার অন্ধকারে অন্ধ ছিলাম। জ্ঞানাঞ্জনশলাকা দ্বারা যিনি আমার দিব্যচক্ষু (জ্ঞানচক্ষু) ফুটিয়ে দিলেন, সেই গুরুকে প্রণাম করি। গুটিপোকা যেমন নিজের লালায় নিজেই আবদ্ধ হয়ে যায়, তেমনি জীবাত্মাও বাসনার জালে বাঁধা। কোটি কোটি জন্ম cycle of birth and death এর ভিতর দিয়ে আসতে আসতে মাকড়সার জালের মত তার উপর পড়েছে কর্মের আবরণ; সে ভুলে গিয়েছে তার প্রীতম্‌কে। সুধাপাত্র ফেলে রেখে, একাদশ ইন্দ্রিয় দিয়ে সে বিষয় ভোগ করে চলেছে। এই জগতের রূপ রস গন্ধ শব্দ স্পর্শ সম্ভোগের মধ্য দিয়ে বৃথাই সে খুঁজে বেড়াচ্ছে — শান্তি-সুখ-তৃপ্তি।

'আনন্দম্' এর অংশ আনন্দ-দুলাল সে, কিন্তু কর্মের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে দেয় বিপরীতমুখী গতি। একটু পেছন ফিরে উর্ধপানে এগোলেই — যাঁকে পাওয়া যায় — তাঁকে ভুলে গিয়ে, তুচ্ছ ভোগ-সম্ভোগে মেতে থাকে সংস্কারের বেড়াপাকে। Negative Power – 'কাল' কর্মানুযায়ী তাকে ফল দিয়ে যায় — প্রারব্ধ কর্ম ভোগের জন্য তাকে বারবার আসতে হয়। কর্ম থেকে হয় কর্মের বৃদ্ধি — এই কর্মচক্রই দেয় সৃষ্টি অভিমুখী downward গতি — তার 'আবাগমন' আর শেষ হয় না।

এরজন্য দাতাদয়াল কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পারেন না — সন্তান তাঁকে ভুলে রয়েছে বলে এই অপরাধে; তিনি সইতে পারেন না — তাঁর 'বাচ্চা'র উপর কালের এই প্রচণ্ড শাসন। মর্ত্যের জীবকে জগতের সন্ধান দিতে তখন হয় দয়াল শক্তির (Positive Power) manifestation — ইনি সদ্‌গুরু।

"বাদশাহে আজম, তেরে বস্তা বুদ্ মোকম্ পশিদা দালকে আদম, ইয়ানিক বরদর আমদ্।।"

(শমসের তবরেজ)

সাচ্চা শাহন্‌শাহ আর জীবাত্মার মধ্যে রয়েছে শক্ত কপাট। যিনি দয়া করে আমাদের মত মূর্তি ধরে এসে কালের ও মায়ার এই লৌহ-যবনিকা সরিয়ে দেন তিনিই গুরু। একমাত্র সদ্‌গুরুই পারেন — জীবের মধ্যে নামের ধারা প্রকট (Manifest) করে এই জীবনে তাকে দিতে পারে সেই আলোক তীর্থ, অক্ষয় শান্তির সন্ধান।

সে কলকণ্ঠে আনন্দোচ্ছল হয়ে বলতে পারে —

'আজ সদ্‌গুরু কী শরণ ভাগ সে মৈঁ নে পাই
শব্দ ধুন বাজ রহি, চাংদনী ঘটমেঁ ছাই।
করম ঔর ধরম ভরম জানকে, সব ছোড় দিয়ে
টেক পিছলো কী তজী, প্রেম-গুরুমেঁ লঈ।।"

প্রেমিক গুরুর কৃপায় তার প্রীতম্-প্রিয়তমের দরশ-দরশ পাওয়ার তার সব কিছু বন্ধন — অতীতের যত কিছু ভ্রান্ত সংস্কারের আবরণ যায় খসে।

গুরু তাঁর আশ্রিতকে — সত্যান্বেষী সাধককে, দীক্ষাকালে দেন পরমজ্ঞান। আর যে সঞ্চিত কর্মের আবরণ তাঁর সত্তাকে ভুলিয়ে রাখে — সেই কর্মের জাল ছিন্নভিন্ন ক্ষয় করে প্রকট করে দেন নামের অমৃত-ঝঙ্কার। সহস্রারে প্রকট — এই দিব্য শব্দের অনুসরণ করে, শব্দের মধ্যে 'লবলীন' (absorbe) হয়ে সে তখন ফিরে যেতে পারে — দয়ালের শান্তিময় কোলে।

সূচীভেদ্য অন্ধকারময় ঘোর দুর্যোগের রাতে, বনে জঙ্গলে বেঘোরে যখন ঘুরতে থাকে পথিক, নির্ণয় করতে পারে না গন্তব্যস্থলের (Station) সঠিক পথ, ঘর্মাক্ত শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে কন্টকবিদ্ধ সে যেমন হোঁচট খেতে থাকে, সে সময় যদি Station থেকে Train এর Whitsel শুনতে পেলে নিরাশ প্রাণে পায় আশার আলো, সেই শব্দ অনুসরণ করে সে যেমন পৌঁছতে পারে Station এ, তেমনি জীবও তার গন্তব্যস্থল দয়ালদেশের পথ ভুলে গিয়ে — ত্রিতাপ ক্লিষ্ট হয়ে সংসার অরণ্যে দিশেহারা হয়ে পাচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণা অবিদ্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার — তার সঞ্চিত কর্মের জাল, রচনা করেছে এই দুর্ভেদ্য লৌহ যবনিকা। কাতর প্রাণে কেউ দয়ালের শরণাগত হলে সদ্‌গুরু এসে ডাক দেন — নেন 'পয়গম' 'আজান', আবরণ ঘুচিয়ে মুমুক্ষুর সহস্রার চক্রে প্রকট করে দেন নামের ধারা; শব্দ ঝঙ্কারের দিব্য তানে সুরতকে যুক্ত করে, আনন্দধামের সন্ধান দিয়ে আশ্বাস শোনান

"স্বরূপ হারানো জীব! আনন্দ দুলাল!
এসো অনুসরি এই শব্দের ঝঙ্কারে
ভয় নাই, ভয় নাই, ভয় নাই আর,
আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি ওরে।"

এই পরম মুহূর্তে থেকেই — শব্দ স্বরূপ হয়ে নিত্যকালের সাথী গুরু থাকেন সঙ্গে সঙ্গে, সঞ্চিত কর্মকে করে দিলেন ক্ষয়, প্রারব্ধ কর্মভোগ হতে থাকে আর ক্রিয়মাণ কর্মকে regulate করতে থাকেন। সেই দিন থেকে শিষ্যের প্রতিটি মুহূর্ত, প্রতিটি নিঃশ্বাস তাঁরই অদৃশ্য সঙ্কেতে হয় পরিচালিত। গুরু ধীরে ধীরে করেন শিষ্যকে আত্মসাৎ, তার আসে শরণাগতি, মালিকের 'মৌজ' এর উপর নির্ভরতা, প্রিয় মিলনের তীব্র আকুলতা; শব্দের ধারার দুর্নিবার আকর্ষণে সুরত আধ্যাত্মিক স্তরগুলি ধীরে ধীরে অতিক্রম করতে থাকে — প্রাণে আসে বিমল শান্তি। দীক্ষালাভের পর থেকে সাধক সর্বভূতে দেখতে থাকেন তাঁর ইষ্টকে — প্রতি ঘটনার পশ্চাতে দেখেন তাঁর গুরুদেবেরই অঙ্গুলি নিয়ে সুখদুঃখ শোকতাপ — সব কিছু সম্পদ আর সংঘাতকে মালিকের মৌজ' ভেবে গ্রহণ করতে থাকেন প্রসন্ন চিত্তে। ফলে, প্রত্যেক বস্তুতে প্রত্যেক কর্মেই হয় তাঁর 'ভাগবত সত্তার রসাস্বাদন।' সাধক প্রতিষ্ঠা লাভ করেন সত্যে, প্রতিটি কর্মই তাঁর পূজা হয়ে ফুটে ওঠে, প্রতি ধূলিকণা অণুপরমাণুটি পর্যন্ত তাঁর কাছে আনন্দেরই অভিব্যক্তি, আনন্দময় আনন্দ পরিপ্লুত বলে মনে হয়।

"শব্দ-স্বরূপী সংগ হৈ, কভী ন হোতে দূর
ধীরজ রাখিও চিত্ত মেঁ, দেখেগা সত্ নূর,
সত্যনাম সৎপুরুষকা সত্যলোকমেঁ পুর
সুরত চড়াও শব্দমেঁ দর্শন হাল হুজুর।'

তাই সহজ কথায় বলতে গেলে দীক্ষা মানে 'দেখা', শিষ্য 'দেখেন', 'গুরু দেখান। সদ্‌গুরু — সাচ্চানাম — আর দীক্ষালাভ সম্বন্ধে গুরু নানকের বাণী —

"ঘর মেঁ ঘর দেখলায় দে সো সৎগুরু পুরুষ সুজান।
পংচ শব্দ ধুনকার ধুন বাজে শব্দ নিশান।
দীবলবে পাতাল থান খণ্ড মংডল হৈরাণ।
তার ঘোর বাজন্তরা তঁহা সচ্ তখত্ সুলতান।
সুখমন্ (সুষুম্না) কে ঘর রাগ সুন সুন্ন মংডল লোলায়,
অকথ কথা বিচারকে মনসা মনহিঁ সমায়।
উলট কঁবল অমৃত ভরে য়হ্ মন কিত্‌হু ন জায়
অজপা জপ ন বিসরেঁ আদি জুগাদি সমায়
সব সখিয়াঁ বিচে মিলৈঁ গুরুমুখ নিজঘর বাস
শব্দ খোজ য়হ্ ঘর লহৈ নানক তাঁকো দাস।"

এই হল সাচ্চা দীক্ষালাভ — সাচ্চানাম প্রাপ্তি — সাচ্চাগুরুর পরশলাভ।
পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভূমি নির্মল চৈতন্যদেশ থেকে যে All attractive Current আসছে — যা সদ্‌গুরুর

দীক্ষাকালে জীবের সহস্রার চক্রে Connection দেন বা প্রকট করেন সেই ধ্বন্যাত্মক দিব্য Sound Current -ই নাম। ঐ দিব্য লোকত্তর সঙ্গীত-শব্দধারা-'ধুনের ডুরি'র সঙ্গে জীবাত্মাকে যুক্ত করাই হল নাম প্রাপ্তি। অর্থাৎ ঐ যে সাচ্চানাম তা কোন ইংরেজী, আরবী, ফারসী কোন ভাষার বর্ণাত্মক অক্ষর মাত্র নয়। সারা ব্রহ্মাণ্ডের সারসত্তা এই নাম — এরই চেতনধারায় সব কিছুই সঞ্জীবিত রয়েছে। পুণ্যশ্লোক মহাত্মা থেকে পাপী তাপীর মধ্যে ঐ বস্তু আছে — কিন্তু কেউ তা জানতে পারে না, যতক্ষণ না সদ্‌গুরু কৃপা করে রুহ বা জীবাত্মাকে ঐ নামের ধারার সঙ্গে যুক্ত করে দেন। হিন্দু হোক, মুসলমান খ্রীষ্টান হোক সব সম্প্রদায়ের জন্য পরমেশ্বর ঐ এক সাচ্চানামের ব্যবস্থা রেখেছেন। কোন ভেদ বিভেদ নেই। জাতপাত, মত পথের অন্তরায় নেই। যে কেউ ঐ সাচ্চানামের সম্পদ লাভ করবে সেই মুক্ত হবে — দিব্য আনন্দলাভ করে বিভোর হবে।

যেমন ডাক্তারি শাস্ত্রে ঔষধের গুণাগুণের বর্ণনা থাকে, ঔষধ থাকে আলমারীতে বা আরও সূক্ষ্মভাবে বলতে গেলে ডাক্তারের মস্তিষ্কে — জ্ঞানে, তেমনি শাস্ত্রে নামের মহিমা আছে। নাম আছে সদ্‌গুরুর (Living Adept) ঐ দিব্য Sound Current (Audible Life stream) এর সঙ্গে সদ্‌গুরুর কৃপায় যুক্ত হতে পারলে মন diluted হয়ে dissolved হয়ে যায়, জীবাত্মা (সুরত বা রুহ) মনের Power of Gravitation থেকে মুক্ত হয়ে সেই দয়ালদেশে পৌঁছতে পারে। ভেতরে যে 'অন্তরি সংকীর্তন' হচ্ছে গুরু কৃপায় যদি তার সঙ্গে যুক্ত হতে পার — তবেই মন যাবে গলে।

বাহিরি কীর্তন ঘন্টা ফিরে কাল মজাসে খায়গ
অন্তরী কীর্তন যো জোতে, দয়াল খোদ পৌঁছায়॥

ঐ Inward music, Heavenly Melody শুনলে তবেই জীবাত্মা এই বর্হির্জগতের রূপ রস গন্ধ-স্পর্শের মোহ ত্যাগ করে — অন্তরপথ তার প্রীতম্‌-এর অভিসারে এগোবে। সন্ধ্যাকালে শুধু বাহ্যিক মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে, শঙ্খ ঘন্টাধ্বনি করে আরতি করলে কোন ফল হবে না। ভেতরে দীপকলিকাকার আত্মা চির দেদীপ্যমান —

উল্টা কুঁয়া গগনমেঁ তিস্‌মেঁ জ্বলে চিরাগ।
তিস্‌মেঁ জ্বলে চিরাগ্‌ বিন্‌ রোগন্‌ বিন্‌ বাতি॥
ছে রুত, বারহ মাস রহত জ্বলতো দিন রাতি।
সৎগুরু মিলা জো হোয় তাঁহি কী নজরমেঁ আবে,
বিন্‌ সৎগুরু জো হোয় নহীঁ তা কৌ দরশাবে॥

চিদাকাশে একটি বিপরীতমুখী কুঁয়া (Inverted Well) — তার মধ্যে দিন-রাত্রি ধরে বিনা তেল সল্‌তেতে এক অনির্বাণ দীপ-জ্যোতি জ্বলছে। যে সদ্‌গুরু পেয়েছে সেই এই দীপকলিকাকার আত্মার দর্শন পাবে।

সদ্‌গুরু কৃপায় এই আত্মা সেই দিব্য শব্দধারার সঙ্গে যুক্ত হলে Inward divine ear দিয়ে শঙ্খ ঘন্টাধ্বনি স্মরণ করতে করতে এগোতে থাকবে পরমাত্মার আনন্দ নিকেতনে। জীবাত্মা যে All-attractive, Divine Sound Current এর সঙ্গে যুক্ত হলে লোকত্তর রাজ্যে সফর করতে পারে, দয়ালের দর্শন পেতে পারে — তাই হল নাম — আদিনাম, সাচ্চানাম, আওয়াজ গৈব, পারস্য ভাষায় একেই বলা হয়েছে মালিকের হুকুম, কুদরত কুল, আরবীতে বাঁগি আস্‌মানি, কলামি-ইলাহি।

পরমসন্ত কবীর সাহেব — এই নামকে পরশমণি বলেছেন; মনরূপী ময়লা লৌহ-এর সঙ্গে যুক্ত হলেই যে সোনা হয়ে যাবে, খসে পড়বে তার সমস্ত কলুষতার আবরণ, ধুয়ে যাবে তার মোহ কালিমা। এই 'নিজনাম' না পেয়ে সংসার ভ্রমে ভুলে রয়েছে —

আদি নাম পারশ হৈ মন হৈ মৈলা লোহ,
পরশত কাঞ্চন ভয়া ছুটা কজল মোহ।
আদি নাম নিজ মূল হৈ, ঔর সব মন্ত্র ডার
কহে কবীর নিজ নাম বিনু বুড়া মুয়া সংসার।
কোটিনাম সংসারমেঁ তাতেঁ ন মুক্তি হোয়
আদি নাম যো গুপত্‌ জপ বুঝে বিরলা কোঈ॥ (কবীর)

এই মুসলিম ফকিরও তাঁর উপলব্ধ সত্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন —

"ইসম রা খানী মুসম্মা রা বিজো।
বে মুসম্মা ইসম কৈ বাশদ নিকো॥

যে 'ইসম' অর্থাৎ বর্ণাত্মক নাম জপ করে মরবে তাকে সারা জীবনেও ধূরধামের (Abode of Highest Bliss) অনুভূতি পেতে হবে না। সে যেমন খালি এসেছিল তাকে তেমনি খালিই (Vacant) চলে যেতে হবে। যতক্ষণ না 'মুসম্মা' অর্থাৎ ধুন-আত্মক নাম সে লাভ করতে পারে ততক্ষণ তার কোনই ফল হবে না।

বুঝে দেখ, রাম রাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ বা যে কোন নাম তো তুমি জপ করবে মন দিয়ে, মন তো ইন্দ্রিয়, তিনি যে ইন্দ্রয়াতীত। 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ'। 'ন যত্র বাক্ প্রভবিত।' তর্কের খাতিরে ধরে নিলুম তোমার একাগ্র নাম রটনার ফলে, Intense thiking এবং desire এ ফলে মন স্থির হল, মন গলেও নাই তো গেল, মনের ত্রাণ হল — কিন্তু তুমিও তো মন নও। মন সেই চিন্ময় পুরুষের ধামে যেতেও পারে না। তাহলে এখন খুঁজে দেখতে হবে এমন কিছু ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু আমাদের মধ্যে আছে কিনা, যা সেই অতীন্দ্রিয় নির্মল চৈতন্যের ধামে যেতে পারে। একটি বস্তু আছে সে হল জীবাত্মা (সুরত বা রুহ্)। এই সুরত কুলমালিকের অংশ, যেমন সূর্যের অংশ সূর্যের রশ্মি; রশ্মিটা যেমন সূর্য নয় অথচ সূর্য থেকে পৃথকও নয় Inter-linked, inter-connected; তেমনি সুরতও তাঁর সঙ্গে নিত্যযুক্ত, এবং উৎস বা ভাণ্ডার পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের অতীত ভূমি দয়াল দেশে, (Purely Spiritual region) আদি শব্দের মধ্যে। পিণ্ডের (ষট্‌চক্র সমন্বিত দেহের) মধ্যে সুরতের আসল স্থান চক্ষুদ্বয়ের পশ্চাতে সুষুম্নার মধ্যে; এর পারিভাষিক নাম (Tisra Til) তিস্‌রা তিল্। সুরতই দেহের 'জান্' স্বরূপ — সার পদার্থ। এরই শক্তি দ্বারা সমূহ দেহ মন ইন্দ্রিয়াদি আপন আপন কাজ করে। এই জীবাত্মার (সুরতের) মধ্যেই জ্ঞান, বুদ্ধি, সমূহ divinity, সমস্ত Potentiality Latent হয়ে আছে। যেমন চার হাত দূরে একটা পিলসুজের উপর প্রদীপ আছে — কিন্তু তার দীপ্তি যেমন অনেকটা স্থান জুড়ে আভা দেয়, তেমনি তিস্‌রা তিলে ঐ জলদর্চিমান্ দীপশিখা সারা শরীরকে সঞ্জীবিত করে রাখে, এরই চৈতন্য শক্তিতে মন, বুদ্ধি, সমূহ ইন্দ্রিয় বৃত্তি ক্রিয়াশীল থাকে। সুরতের বৈঠক ঐ তিস্‌রা তিল ঠিক যেন একটি তার টানবার কল — বঁড়শীর wheel এর মত। Wheel দিয়ে যেমন বহুদূর বিস্তৃত ডোরকে গুটিয়ে আনা যায় তেমনি এই তিস্‌রা তিলে — সারা শরীরের Spiritual Current কে Accumulate করে নেওয়া যায়। একজন মুমূর্ষু ব্যক্তিকে ভাল করে পর্যবেক্ষন করলে দেখা যায়, তার চোখের তারা দুটি যায় উল্টে। Sprit-Current যা সারা শরীরে প্রবাহিত থাকে তা মহাপ্রস্থানের জন্য ক্রমশই accumulated হতে থাকে ঊর্ধ্বভাগে; তাই পা থেকে দেহের ঊর্ধ্বভাগ ক্রমশঃই হতে থাকে শীতল। যখন 'রুহ্' একেবারেই দেহত্যাগ করে যায় তখন তাকে বলা হয় 'মৃত্যু'। ঐ রুহ (সুরত-জীবাত্মা) যতক্ষণ দেহে থাকে ততক্ষণ তার হিন্দু-মুসলমান-পার্শী-খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র পারিয়া বিভিন্ন জাত, নামরূপ উপাধি, ভিন্ন ভিন্ন পরিচয়; দেহ পিঞ্জর ছেড়ে গেলে সকল গণ্ডীর ঊর্ধ্বে, সকল সংকীর্ণতার অতীত হওয়া যায়।

আমাদের কোন কোন শাস্ত্রে আছে 'নবদ্বারে পুরে দেহী'। যতক্ষণ নয় দরজার মধ্যে কেউ থাকে ততক্ষণ দল, বর্ণ, উপাধি, মতপথের সংস্কার আর আচারের অধীন থাকে, আবার কোন কোন অনুভবী মহাত্মা বলে গেছেন ত্রিকুটী বা আজ্ঞাচক্রও একটা দ্বার, দশম দুয়ার। কিন্তু কৃষ্ণযজুর্বেদের অন্তর্গত কঠোপনিষদ বলেছেন — আমাদের দেহ একাদশ দ্বার বিশিষ্ট।

কঠোপনিষেদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় বল্লীতে প্রথম মন্ত্রটি হচ্ছে,

পুরমেকাদশদ্বারমজস্যাবক্রচেতসঃ।
অনুষ্ঠায় ন শোচতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। এতদ্বৈ তৎ॥

অর্থাৎ জন্মরহিত নিত্যচৈতন্যস্বরূপ একাদশ দ্বারযুক্ত একটি নগর.আছে। সেই নগরের যিনি অধিষ্ঠাতা, তাঁকে ধ্যান করে লোকেরা শোকাতীত হয়। মুক্ত হয়, আর তার পুনর্জন্ম হয় না। ইনিই সেই আত্মা।

সেই একাদশ দ্বার হল নাভি। নাভি যে কেমন দরজা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি দেখ।

এই বলে তিনি নিজের নাভির উপর গুণে গুণে তিনটি থাপ্পড় মারলেন সশব্দে। আমরা অবাক হয়ে দেখতে

লাগলাম, তাঁর নাভি ধীরে ধীরে ফুলে উঠে বিস্ফারিত হয়ে গেল। সেই বিস্ফারিত রন্ধ্রপথে বেরিয়ে আসতে লাগল নানা বিচিত্র বর্ণের ছোট ছোট শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গগুলি নাভিদ্বার হতে বেরিয়ে ঠুক্ ঠুক্ শব্দে এক একটি করে মাটিতে গড়িয়ে পড়ছে আর তিনি এক একটি করে তা মুখে পুরে গিলে গিলে নিচ্ছেন। এ দৃশ্য আমার পূর্বে দেখা থাকলেও আমার সঙ্গীদের চোখ কপালে উঠবার জোগাড়। তারা রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে। তাঁর বিস্ফারিত নাভি আমাদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে জুড়ে গিয়ে স্বাভাবিক হয়ে উঠল...।

এখন, জীবিত অবস্থায় কেউ যদি সদ্গুরুর কৃপায় সাচ্চানামের Connection পায়, দিব্য শব্দধারার সঙ্গে যুক্ত হয় তাহলে সেই 'ধুন-আত্মাক' সাচ্চানাম জীবাত্মাকে 'তিসরা তিলের' মধ্যে দিয়ে চিন্ময় রাজ্যের তোরণ দ্বারে পৌঁছে দেবে, মৃত্যুর রাজ্য যাবে সে পেরিয়ে, আনন্দ-অমৃত জ্যোতির মন্দাকিনী ধারায় সে হবে অভিস্নাত।

সদ্গুরু তাঁর শিষ্যের দেহের মধ্যে তাঁর চিন্ময় বীর্য্যের প্রভাবে অনুরূপ একটা দিব্যদেহ গঠন করেন। শিষ্যকে সজ্ঞানে এই দিব্যদেহ প্রদর্শন হল প্রকৃত দীক্ষা। এই দিব্যদেহ অর্থাৎ সদ্গুরুর চিন্ময়বীর্য সম্পাতে তৈরী দেহের নিরত দর্শন করে শিষ্য। এ দেহ কিছুতেই বিনষ্ট হবে না। এই দীক্ষা গ্রহণের পর শিষ্য তার স্থূল দেহে সমস্ত কাজ করলেও ঐ সূক্ষ্মদেহ অহরহ নাম অর্থাৎ শব্দধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পরমানন্দ লাভ করে। এইরূপ দীক্ষা গ্রহণের সময় দেখা যায় 'কাল' তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা কর। কারণ সন্ন্যাস গ্রহণের পর জীব কালশক্তির শাসনের বাইরে চলে যায়। সূর্যমণ্ডলে কোন মানুষ যেতে পারে না, Choromosphere -এ পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। কিন্তু সূর্যের অংশ বলে সূর্যরশ্মিটা অবহেলে অতিক্রম করে যায় সব Sphere গুলো, পৌঁছতে সমর্থ হয় নিজ ভাণ্ডারে। তেমনি কুলমালিকের অংশ বলে জীবাত্মাই পারবে পৌঁছতে 'ধুরাধামে' — নিজ ভাণ্ডারে। ওখানে অবিরামধারে প্রতিনিয়ত ঝঙ্কৃত হচ্ছে নামের ধারা। সদ্গুরুর কৃপাতেই এই নাম পাওয়া যায়। এই নাম সার্বভৌম সার্বজনীন। তুমি হিন্দু — গুরুকৃপায় তাঁর সঙ্গে যুক্ত হও — ভুলে যাবে তোমার সংস্কারের হীনতা, বৃথাই মঠ মন্দিরে মূর্তিতে জীবনভোর ফুল জল নৈবেদ্য ডালি দিয়েও 'দেউলিয়া' হয়ে যেতে হবে না। শঙ্খ ঘন্টা বাজিয়ে খোল-করতালের কররোলে-বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানে বৃথা সময় নষ্ট হবে না। অন্তরে নামের মহিমা নিজেই অনুভব করতে পারবে। চৈতন্যময় জীব হয়ে Inanimate object — একটা গ্রন্থকে পূজা করে সারাটা জীবন বৃথা কাটাবে না। আরও সহজ করে বলতে দীক্ষা মানে বোঝায় শিষ্যের হৃদয়ে গুরুর প্রাণ প্রতিষ্ঠা। পূজা পদ্ধতিতে দেখ তো — বরণ, অধিবাস, প্রাণ-প্রতিষ্ঠাদির কথা থাকে? তুমি দয়ালকে মনে প্রাণে বরণ করে নিয়ে, হৃদয়ের আসন-বেদীতে তাঁকে 'অধিবাস' করালেই গুরু এসে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। তার মানে এই নয় যে তুমি নিষ্প্রাণ ছিলে, তিনি এসে বসে জীবন্ত করলেন। ভাবার্থ এই, তোমার মধ্যে যে চৈতন্যশক্তি তিনি তা Potent করে দেন, manifest করেন।

একই খনির মধ্যে কয়লাও থাকে, হীরাও থাকে। হীরা আর কয়লার মধ্যে তফাৎ শুধু atomic change -এর, স্পন্দনাত্মিকা চেতন-শক্তির চাপে electron proton -এ শুধু স্থিতির পার্থক্য। Systematic এবং scientific way তে electron proton এর displacement হলেই কয়লাটা হবে হীরাতে রূপান্তরিত। সদ্গুরু শিষ্যের এই atomic change এনে দেন-তার সমস্ত system -এ, Astral এবং casual plane এতেও ঘটে চৈতন্যময় পরিবর্তন। রুদ্ধ মুখ গোমুখীর প্রবাহ যেন খুলে যায়, হয় বোধির বোধন, মরু-সাহারায় আসে প্রাণগঙ্গার প্লাবন। তার ফলেই দেখা যায় — সাচ্চা গুরুর দীক্ষালাভের পর দুর্জন হয় সজ্জন, কামুক হয় জিতেন্দ্রিয়।

আমরা সবাই যে যার আসনে করজোড়ে সসম্ভ্রমে উপবিষ্ট। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে। হঠাৎ রঞ্জনের চারপাশে যেন আগুনের হলকার মত গরম বাতাস বইতে শুরু করল। মনে হল রঞ্জনের সারা দেহ যেন আগুনে ঝলসে যাচ্ছে এবং তার নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। অথচ আশেপাশের আর কাউকে এই গরম বাতাস স্পর্শ করছে না। রঞ্জন খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। সোমানন্দজী হেসে লুটোপুটি খেতে লাগলেন, হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন — যম বেটা তুই দুমুখো থলি, আজ রইল তোর আঁত্ খালি, বড় সাধ করেছিলি মনে, ওরে আজ তোর সে গুড়ে বালি। তাঁর হাসি আর থামছে না। দু এক মিনিট পরেই রঞ্জনকে স্পর্শ করে বলতে লাগলেন — আরে এটা কালশক্তির খেলা।

সঙ্গে সঙ্গে গরম বাতাসের হলকা থেমে গেল। রঞ্জনও সুস্থ বোধ করতে থাকল। এরপর রঞ্জন প্রবল জ্বরে

আক্রান্ত হলেন। সেই জ্বর অবস্থাতেই সোমানন্দজী রঞ্জনকে দিয়ে পূর্বদিনের মত হোমকুণ্ডের সামনে বসিয়ে পূর্বোচ্চারিত মন্ত্রগুলির সাহায্যে পূর্বপুরুষদের এবং তাঁর নিজের শ্রাদ্ধাদি প্রভৃতি কার্য সমাধা করলেন। রঞ্জনের উপবীতটিও হোমকুণ্ডে আহুতি দিলেন।

সোমানন্দজীর মন্ত্রোচ্চারণে প্রজ্জ্বলিত হোমকুণ্ড একইভাবে জ্বলে চলেছে। কিন্তু কিভাবে যে হোমকুণ্ডে কাঠ বা ঘি আসছে তা আমাদের বোধগম্য হল না। ভরভর করে চন্দনের সুগন্ধ বেরোচ্ছে, মনে হচ্ছে সারা বনভূমিই চন্দনের গন্ধে সুবাসিত হয়ে গেছে; এ গন্ধ যেমনি স্নিগ্ধ তেমনি তৃপ্তিদায়ক!

সন্ন্যাস দেওয়ার পূর্বে সোমানন্দজী রঞ্জনকে পরতে দিলেন পীত রং-এর কৌপীন। কোমরে ঐ রং এরই ওড়না। রঞ্জনের মাথার চুল আলুলায়িত। তার উপর পীত রং এর কাপড়ে পাগড়ী বাঁধা। তার হাতে দিলেন একটি দণ্ড। সোমানন্দজী তাঁর নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করলেন। রঞ্জনকে বসালেন হোমকুণ্ডের সামনের আসনে। বেদের মন্ত্র নির্দিষ্ট সুরে নির্দিষ্ট ছন্দে উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং রঞ্জনকে দিয়ে তা পুনঃচ্চারিত করাতে থাকলেন। সংস্কৃত মন্ত্রগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে এমন ধ্বন্ উঠতে লাগল যে সকলই মুগ্ধ হয়ে শুনতে লাগলাম। কোথাও থেকে ভেসে আসতে শুরু করল অবিরল শঙ্খধ্বনি। আমরা বিস্মিত, বিস্ফারিত। সোমানন্দজী সেদিন কম্বুকণ্ঠে ঘন্টার পর ঘন্টা মন্ত্রোচারণ করে যেতে থাকলেন। এরপরই এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সোমানন্দজী রঞ্জনকে দিয়ে মার্কণ্ডেয় শিলার উপর নৃসিংহ শিলা দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ করে হোমে ঘৃতাহুতি দেন এবং রঞ্জনের সর্বাঙ্গ স্পর্শ করে রঞ্জনকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। ধীরে ধীরে হোমকুণ্ড হল নির্বাপিত। শঙ্খধ্বনিও গেল থেমে। রঞ্জনও এই প্রখর রৌদ্রে একইভাবে মার্কণ্ডেয় শিলার উপর বসে আছেন।

— আমাদের দিকে ফিরে বললেন — কিরে তোরা কী ভাবছিস্। রৌদ্রে ও বসে আছে কিভাবে? যা, যা তোরা রঞ্জনকে স্পর্শ করে দেখনা! শালা।

আমরা একে একে রঞ্জনকে স্পর্শ করলাম। দেখি তার সমস্ত শরীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঠাণ্ডা, হিম হয়ে গেছে। সোমানন্দজী বললেন — এইসময়ে অনেকে দেহত্যাগ করে। এইভাবে রঞ্জন প্রায় সাত ঘন্টা স্থির হয়ে বসে আছে। আমরাও রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বসে আছি। ভয়ে সবাই কাঠ।

প্রায় সাত ঘন্টা পর সোমানন্দজী রঞ্জনকে স্পর্শ করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেন। দেখি ধীরে ধীরে রঞ্জন চোখ খুলল। আস্তে আস্তে তার সংজ্ঞা ফিরে আসতে আমাদের সকলের মুখে হাসি ফুটে উঠল। এরপর সোমানন্দজী রঞ্জনকে ধরে ধরে মার্কণ্ডেয় শিলার বিপরীতে একটি উঁচু টিলার মত জায়গায় নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করতে বললেন, আমাদের তাঁর কাছে যেতে বারণ করলেন।

রঞ্জনকে তিনি বললেন — এতক্ষণ রোদে খুব কষ্ট পেলে না? রঞ্জন জানাল — সেখানে আবার কষ্ট কিসের? আমি তো পরমানন্দে দয়ালের কোলে বসে বিশ্রাম করছিলাম। আমার বিন্দুমাত্র কোন কষ্ট বা পরিশ্রম হয় নি?

এইভাবে রঞ্জনের সন্ন্যাস দীক্ষার পর সোমানন্দজী মার্কণ্ডেয় শিলার উপর বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। আমাদের বললেন — যাও নর্মদায় গিয়ে স্নান ও প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এস। আজ তোমরা অভুক্তই থাকবে।

বেলা বোধহয় পাঁচটা বেজে গেছে। পাহাড়ে গাছপালার উপর তখনও সূর্যের আলো আছে, তবে ম্লান হয়ে আসছে। হয়ত একটু পরে সমগ্র পাহাড় নিথর অন্ধকারে ঢেকে যাবে। হয়ত বা সূর্য অস্তাচলেই চলে গেছেন, আমরা যে আলো দেখছি, তা হয়ত twilight!

ফিরে এসে দেখি সোমানন্দজী কোন এক ক্রিয়া দেখিয়ে দিয়ে রঞ্জনকে বলছেন — এইভাবে ধ্যান করতে করতে বিন্দু ভেসে উঠবে। ঐ বিন্দুর নিত্যধ্যানে Sprit centre excited হয় — সারা দেহের সুরত চৈতন্য accumulated হতে থাকে। শহরে রাস্তার ধারে যেমন অজস্র Street light থাকে, তেমনি ঐ বিন্দুগুলিও সেই আর শহরের আলোর নিশানা — এই হল উত্তরায়ণের পথ।

বিরাট বিস্ময় - বিশ্ববিন্দু মধ্যে.স্থিত
সর্বশেষে হতে হবে বিন্দু সমাহিত।
মহাজ্যোতি বুকে আছে বিন্দু অগণিত।
তার মধ্যে এক বিন্দু এর ইচ্ছা মত।

প্রত্যেক বিন্দুটি হয় অসীম অনন্ত।
দৈর্ঘ্যহীন, প্রস্থহীন, বোধ তিরোহিত।
সর্বকিছু এককরে দেখ মহাবিন্দু।
তাতে কোটি বিশ্ব অগণিত সিন্ধু॥
বিন্দুতে ডুবিয়া যাও শব্দপথ ধরি।
সমাহিত হও উঠে যাও মায়া পরিহরি॥
আশ্রিতার ক্ষেত্র ইহা জানিও নিশ্চয়।
আমি আছি এই বোধে হবে মন লয়।
বিন্দু ফেটে বিশ্বহাসে অতি চমৎকার।
শব্দের তরঙ্গ এই মায়িক সংসার॥
বিন্দুতে বিলীন হয় পুত্র পরিবার।
বিন্দুগলে শব্দরূপে ব্যাপ্ত চরাচর।
এইভাবে ডোবে ভাসে মহাবিন্দু কোলে।
সাধক আনন্দে ভাসে সমাধি হিল্লোলে॥
এইভাবে ঘন ঘন হলে সমাহিত।
কারণ ক্ষেত্রেতে তুমি হবে উপনীত॥
স্নিগ্ধ নীলিমাময় সীমাহীন দেশ।
অস্মিতাও ডুবে যায় হেথা সব শেষ॥
ধ্যেয় ধ্যাতা জ্ঞাতা জ্ঞেয় মিলে যায় হেথা।
কে জাগিবে কে শুনিবে কে কহিবে কথা॥
এইভাবে থাকি সেথা ফিরিবে যখন।
নিশ্চয় শুনিবে সার শব্দের কম্পন।
সাগর তরঙ্গে কিংবা মেঘের গর্জনে।
নদীর কুলুকুলু স্বরে কিংবা পাখীর কূজনে॥
পশুরূপে, ধূলিঝড়ে, ঘড়ির দোলনে।
রোদনে চিন্তনে কিংবা সূচিকা পতনে॥
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে কিংবা ধমনী স্পন্দনে।
ঝংকৃত বিশ্বের বুকে যে কোন কম্পনে॥
তরঙ্গিত সারশব্দ কান পেতে শোন্।
বিশ্ব পরমাণুগুলি নাচে অনুক্ষণ॥
পঞ্চবায়ু সমতালে বাজায়ে খঞ্জনী।
নীরবে শুনায়ে দেয় সার শব্দধ্বনি॥

বুঝলাম আমাদেরকে দেখাবেন না বলেই হয়ত স্নান করতে পাঠিয়েছিলেন। সোমানন্দজীর কথা শেষ হতে না হতেই সারা বনভূমি কম্পিত হয়ে উঠল। সোঁ সোঁ করে বাতাস বইতে লাগল। দেখলাম সাধু ও রঞ্জন দুজনেই জ্ঞান হারালেন। দেহে কোন সাড় আছে বলে মনে হল না। এই নিঃস্তব্ধ গহন অরণ্যের গভীর রাত্রি। শ্বাসরোধকারী লোমহর্ষক পরিবেশ, ঘন জমাট থম্‌থমে নৈঃশব্দ্যের মধ্যে আমরা প্রাণপণে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, যখন ঘুম ভাঙল তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে।

আমরা নর্মদাতে স্নান করতে গেলাম। নর্মদাতটে গিয়ে সূর্যরশ্মির গতিপ্রকৃতি দেখে অনুমান করলাম বেলা আটটা, সাড়ে আটটা হবে। স্নান তর্পনাদি সেরে এসে দেখলাম, সাধু ও রঞ্জনের সেই একই নিস্পন্দ অবস্থা। দূর থেকে তাঁকে প্রণাম করে বসে থাকলাম। একদল ময়ূরকে কেকা রব করতে করতে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে দেখলাম। কোন কোনটা গাছের ডালে উঠছে।

আমরা বসে থাকতে থাকতে ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়লাম। নর্মদায় গিয়ে পেটপুরে জল খেলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য মাথার উপর লম্বভাবে কিরণ দিচ্ছে। বুঝলাম বেলা বোধহয় বারোটা কিংবা সাড়ে বারোটা হবে।

নর্মদার ঘাট থেকে ফিরে এসে সাধুর সাড়া পেলাম। কিন্তু রঞ্জনের কোন সাড়া নেই। তিনি উঠে বসে সমানে দুলতে দুলতে বলে চলেছেন — 'দোল্ দোল্ দোল্' — দে দোল্ দে দোল্, কোলে তোল্, কোলে তোল্। মাগো, অনেক আদর খেলুম মা, তোমার আদরের চাদর মুড়ি দিয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে নিলাম মা!

তিনি নিজের শরীরের উপর ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন — এখনই আসছি। টলতে টলতে নর্মদার ধারে ধারে চলে গেলেন ওঁকারেশ্বর মন্দিরের দিকে। আধঘন্টা পরেই শুনতে পেলাম সাধুর কণ্ঠস্বর। তিনি আবেগের সঙ্গে গাইতে গাইতে আসছেন —

তোর বুড়ো বাপের মতন আর কেউ নেইকো ত্রিভুবনে।
ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে ঝুলে, কোমর আঁটা বাঘের ছালে।
হাড়ের মালা গলায় দোলে, ধুতরার ফুল কানে।
ভাঙের নেশায় মত্ত থেকেও সব কথাই সে জানে।।

দেখলাম পোঁটলায় করে নিয়ে এসেছেন আমাদের উপযোগী কলা ও নারকেল। একেই অভুক্ত ছিলাম। খুবই তৃপ্তির সঙ্গে আমরা তা খেলাম।

আমাদের দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রাপ্তির পর সোমানন্দজী এগিয়ে গেলের রঞ্জনের কাছে। তিনি তাঁর অনামিকা দিয়ে রঞ্জনের বক্ষস্থলের মাঝখানে স্পর্শ করলেন। রঞ্জনের শরীরে বার তিনেক শিহরণ দেখা দিল। এরপর রঞ্জনের ডানহাতটি ধরে রঞ্জনকে এনে দাঁড় করলেন মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে। শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, চোখ খোলার চেষ্টা কোরো না, চেষ্টা করলেও খুলতে পারবে না, ঐ অবস্থাতে শোন আমার কথা।

সংজ্ঞা ও পরিভাষা সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। দৃষ্টিকোণের পার্থক্য অনুসারে এই প্রকার ভিন্নতার সার্থকতা যে না আছে তা মনে হয় না।

প্রণবের স্বরূপগত বিশ্লেষণ আগম উপবিষ্ট সাধন সম্প্রদায়ে বিস্তৃতরূপে পাওয়া যায়। যাকে শুদ্ধবিদ্যা বলা হয় তা উদয়ের পর শুদ্ধমার্গে যে গতিলাভ হয় তার পরিসমাপ্তি পূর্ণত্ব লাভ না হওয়া পর্যন্ত হয় না। আবার পূর্ণত্ব পরম সত্যের বিশ্বাতীত ও বিশ্বাত্মক স্বরূপের অভিন্নতা সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্যন্ত লভ্য নয়। প্রণবের অর্দ্ধমাত্রা হতে ক্রমিক উর্ধ্বগতি প্রণবের অমাত্রভূমি পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে বলা চলে। মনোরাজ্য ভেদ ও উন্মনীতে প্রবেশ এরই অন্তর্গত। এই উর্ধ্বগতির ক্রমিক বিবর্তনের প্রসঙ্গেই পর পর ভিন্ন শূণ্যের সাক্ষাৎকার ও অতিক্রম করে থাকে। পিণ্ড ব্রহ্মাণ্ড উভয়ের ভেদ এর দ্বারাই সম্পন্ন হয়। যাকে নির্মল চৈতন্যের দেশ বলা হয়, তাতে প্রবিষ্ট হতে হলে কালরাজ্য ও কালের সৃষ্টি ভেদ করতে হয়। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বিভিন্ন আগম গ্রন্থে আছে।

সন্তসাহিত্যে বিশেষতঃ কবীরের বাণীতে যে অভিনব নাদের উল্লেখ আছে, তা নিরন্তর চিদাকাশে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্ত্তি শূণ্যস্থানেই তার উৎপত্তিস্থল। চিদাকাশ হতে উদ্ভূত হয়ে নাদ তরঙ্গরূপে প্রবাহিত হয়। নাদের অভিব্যক্তির মূল — চিদাকাশে চিৎশক্তির আঘাত। এটি যখন ঘটে, তখন একে মহা কৃপা বলে বুঝতে হবে।

কিন্তু অচিন্ত্যভাগ্যোদয়বশতঃ নাদ অভিব্যক্ত হলেও, মন তাতে যুক্ত না হলে শ্রুতিগোচর হয় না। অনেক সময় গুহ্য ক্রিয়াকৌশলে বা প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা মনকে অন্তর্মুখ করতে পারলে নাদ শ্রবণ হয়। তখন নাদই ক্রমশঃ মনকে আকর্ষণ করতে থাকে। যে অনুপাতে নাদে আকৃষ্ট হতে থাকে সেই অনুপাতে মন একাগ্রতা লাভ করে। নাদ উত্থিত হয় চিদাকাশ হতে এবং লীনও হয় চিদাকাশে। নাদ ফিরবার মুখে মনকে টেনে নিয়ে যায়। বিন্দুই চিদাকাশ। যখন মন ঐস্থানে পৌঁছে যায়, তখন তার চঞ্চলতা আর থাকে না — তা বিন্দুতে স্থিতিলাভ করে। এটাই একাগ্রতা। এই অবস্থায় মনের লয় হয় না একেই বলে চৈতন্যাবস্থা। মনের জাগ্রতাবস্থা। এরই নাম প্রজ্ঞা। নাদের আশ্রয় না পেলে মন বিন্দুতে স্থিতিলাভ করতে পারে না। করলেও ঐ স্থিতি চৈতন্যরূপে না হয়ে সুষুপ্তিরই নামান্তর হয়। মনকে বিন্দুরূপী কেন্দ্রস্থলে যেতে হলে একটি রাস্তা ধরে যেতে হয় — এটাই নাড়ী পথ।

বিন্দু হতে অসংখ্য রশ্মি নির্গত হয়েছে তন্মধ্যে যেটির সঙ্গে মনের যোগ হয়, সেইটাই মনের স্বকীয় মার্গ। ঐ মার্গ ধরে মন উজান বাইতে থাকে অর্থাৎ শব্দের নিবৃত্তিধারা ধরে বিন্দুস্থানে যেতে থাকে। এটাই স্বাভাবিক ক্রম।

তবে এও দেখা গেছে যে, কোন কোন ব্যক্তিবিশেষ নাদের অশ্রয় না নিয়েও চেতনভাবে বিন্দুতে অবস্থান করতে পারেন — কিন্তু এইরূপ ব্যক্তি অত্যন্ত বিরল। এর কারণ, এই চিৎশক্তি সাক্ষাৎভাবে মায়াতে পতিত হয় না। মহামায়াতে প্রতিফলিত হয়ে মায়াতে পতিত হয়। তখন মায়াতে ক্ষোভ জন্মে। একেই বলে বিকল্প জ্ঞান। মাতৃকাচক্ররূপে এই বর্ণমালা অনন্ত বিকল্পময়ী বৃত্তি ধারণ করে জীবকে বদ্ধ করে থাকে। এই মায়াজাল হতে উদ্ধার পাবার জন্যই শুদ্ধ নাদময় শব্দকে আশ্রয় করতে হয়। নাদময় শব্দই জাগ্রৎ মন্ত্র। ইহা অভেদ জ্ঞান উৎপন্ন করে অশুদ্ধ বর্ণাত্মক শব্দের জালকে ভেঙে দেয়। এইজন্যই নর্মদাতটের ঋষিরা অত্যন্ত জোরের সঙ্গে বলেছেন যে, বর্ণাত্মক শব্দ হতে ধ্বন্যাত্মক শব্দে প্রবেশ করতে না পারলে যোগপথ পাওয়া যায় না। ধ্বন্যাত্মক শব্দই নাদ। বর্ণরূপী শব্দ যতক্ষণ বিগলিত হয়ে বৈচিত্র্য পরিহার করতে না পারে, ততক্ষণ নাদরূপী শব্দের উপলব্ধি হয় না। নাদ ভিন্ন বিন্দুর উপলব্ধি কি প্রকারে হবে? রেখা যেমন গতিহীন হলে বিন্দুরূপ ধারণ করে, নাদও তেমনি প্রবাহহীন হলে বিন্দুরূপে পরিণত হয়। এই বিন্দুই আত্মজ্যোতি। আত্মস্বরূপের এটাই অভিব্যঞ্জক। সদ্‌গুরুপ্রদত্ত দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গেই যে বিশুদ্ধকায় অভিব্যক্ত হতে আরম্ভ হয়, তা বাস্তবিক পক্ষে শিষ্যের স্বদেহ। বীজ অঙ্কুরিত হয়ে যেমন বৃক্ষরূপে পরিণত হয় এবং যথাসময়ে তাতে যেমন ফলের অবিষ্কার হয়, তদ্রূপ গুরুদত্ত বীজ শিষ্যের হৃদয়রূপ ক্ষেত্রে যথাবিধি পতিত হয়ে অঙ্কুরিত হতে আরম্ভ হলে শীঘ্রই হোক অথবা বিলম্বেই হোক জ্ঞানরূপ দেহ উৎপন্ন করবেই করবে। বীজ যেমন অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তির প্রভাবে বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং বাহির হতে কেবলমাত্র পরিকর্মের আবশ্যকতা হয়, তদ্রূপ বীজ গুরুশক্তি বা চৈতন্যশক্তির প্রভাবে শিষ্যক্ষেত্রে উপ্ত হয়ে আপনা আপনি বিকশিত হতে থাকে। শিষ্যকৃত সাধনা পরিকর্মরূপে প্রতিবন্ধক অপসারণ করে তার অভিব্যক্তিতে সাহায্য করে মাত্র। শিষ্যের যাবতীয় ক্রিয়া গুরুদত্ত বা গুরু কর্তৃত্বাভিমানী চৈতন্যশক্তির সাহায্যেই সম্পন্ন হয়। এটাই স্বাভাবিক সাধন। কর্তৃত্বাভিমানী জীব এই সাধন করতে সমর্থ হয় না। কারণ, দেহাভিমানের অতীত শুদ্ধ চৈতন্যশক্তি বা গুরুশক্তি আপন স্বভাবে উহা নির্বাহ করে থাকে। কাজেই, দীক্ষা মানে শিষ্যের হৃদয়ে গুরুর প্রাণপ্রতিষ্ঠা, সদ্‌গুরু কখন শিষ্য করেন না, তিনি গুরু করেন অর্থাৎ সত্যান্বেষী আকুলপ্রাণ শিষ্যের হৃদয়ে নিজের ইষ্টকে প্রতিষ্ঠা করেন, শিষ্যের দেহ প্রকৃতপক্ষে গুরুরই সাধন মন্দির। এ কথা অত্যন্ত সত্য যে, গুরুকৃপা ছাড়া অর্থাৎ গুরু কর্তৃক সাক্ষাৎভাবে চৈতন্যশক্তি সঞ্চারিত না হলে শব্দমার্গ কখনই আয়ত্ত হতে পারে না। যে সকল সাধক গুরু হতে শুদ্ধ চৈতন্যশক্তির স্পর্শ প্রাপ্ত না হন, তাঁরা চৈতন্যশক্তির সম্বন্ধ বিরহিত থাকেন বলে প্রকৃত সাধক বা যোগী কোন শ্রেণীর অন্তর্গত নন। তবে সত্য যে, তীব্র সম্বেগ, উৎকট ইচ্ছা, বৈরাগ্য এবং ভগবদ্‌ভক্তি থাকলে তাঁরাও চৈতন্যশক্তি প্রাপ্ত হতে পারেন। কারণ, বিশ্বগুরু সমগ্র জগতের উদ্ধার কামনায় নিত্য সন্নিহিত রয়েছেন। তাদৃশ ব্যাকুলতা থাকলে আধারের অন্য প্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও সাক্ষাৎভাবে না হলেও পরম্পরাতে গুরুকৃপা অবশ্যম্ভাবী। তবে যতক্ষণ চৈতন্যের সংস্পর্শ না ঘটে ততক্ষণ উহাদের যথার্থ সুফল লাভের ততটা আশা থাকে না।

যোগবীজ, নাদবিন্দু উপনিষদ, ধ্যানবিন্দু, শিবসংহিতা, স্বচ্ছন্দ আগম, ত্রিপুরাসার সমুচ্চয়, যোগতারাবলী প্রভৃতি তাবৎ যোগগ্রন্থে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যোগীগণ এই নাদ সাধনার রহস্য ব্যক্ত করে গেছেন। নাদতত্ত্ব বুঝতে হলে আমাদেরকে প্রাণগত উচ্চারের রহস্যটি ভাল করে বুঝতে হবে। প্রাণের স্বাভাবিক ধর্মই উচ্চার। এর দুই প্রকার বৃত্তি আছে — একটি সামান্য বা স্পন্দাত্মক ও ভেদহীন এবং অপরটি বিশিষ্ট যা প্রাণাদিভেদে পাঁচপ্রকার। স্পন্দাত্মকটি বৃত্তিবিশিষ্ট, বৃত্তিনিচয়ের ভিত্তি স্বরূপ। ইহা দেহকে আত্মসাৎ করে আছে বলে দেহ অচেতন হলেও চেতনবৎ প্রতীয়মান হয়।

এই প্রাণাত্মক উচ্চারে একটি অব্যক্ত ধ্বনি নিরন্তর স্ফুরিত হচ্ছে। একে অনাহত নাদ বলে। নাদ প্রাণিমাত্রের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবে সর্বদাই চলছে — এর কোন কর্তা নাই এবং কোন প্রতিরোধকও নাই। প্রকৃত অনাহত নাদ অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্বে ইড়া পিঙ্গলার ক্রিয়া মন্দীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার শ্রুতিমধুর স্থূল নাদ শুনতে পাওয়া যায়। ঐগুলি বিভিন্ন স্তর থেকে উদিত হয় এবং এদের সংখ্যা বস্তুতঃ অগণিত হলেও সাধারণত

তারা নয় শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকে। গুরুর উপদেশ এই যে, ঐ সকল ধ্বনির কতকগুলি অনাহত প্রাপক হলেও বাস্তবিক তারা অনাহত নয়। তাই ঐগুলিকে পরিহার করে যেটি বাস্তবিক অনাহত ধ্বনি বা পরমানন্দ তাকেই আশ্রয় করতে হয়। পক্ষান্তরে, এমনও হতে পারে যে ঐ সকল মধুর ধ্বনি শুনতে শুনতে অকস্মাৎ গুরুকৃপায় অনাহত নাদ শ্রবণ পথে আসে, তখন ঐ সকল অবান্তর ধ্বনি আর শুনতে পাওয়া যায় না, কারণ ঐ সময়ে মন অনাহতে লীন হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই বিশুদ্ধ চৈতন্যের প্রকাশ দ্বার খুলে যায়।

শব্দসাধনার প্রাথমিক অবস্থাতে শব্দ হতে জ্যোতি, জ্যোতি হতে রূপ, দৃশ্য প্রভৃতি আবির্ভূত হয়ে থাকে। শব্দকে আশ্রয় না করে জ্যোতির রাজ্যে প্রবেশ করা যায় না। আমাদের বিকল্প চিন্তা স্মৃতি যাবতীয় জাগতিক বৃত্তি এবং বিক্ষিপ্ততা এই সব অশুদ্ধ শব্দের খেলা। অশুদ্ধ শব্দ অনন্ত প্রকার বিকল্পের আকারে আমাদেরকে ঘিরে রেখেছে। যখন বিশুদ্ধ শব্দ ফুটে ওঠে, তখন ক্রমশঃ এই সকল মলিন শব্দের বিকার এতে আকৃষ্ট হয়ে ইন্ধন যেমন প্রদীপ্ত অনলে দগ্ধ হয়, তদ্রূপ দগ্ধ হয়ে যায়। শুদ্ধ শব্দের ক্রমবিকাশে প্রথমে অস্পষ্ট আলোর — তারপর স্পষ্টালোক — তারপর জ্যোতির অভিব্যক্তি হয়। আলোকভাবের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শব্দভাব ক্ষীণ হয়ে আসে। ক্রমশঃ এমন সময় আসে যখন ঐ শব্দ আর শুনতে পাওয়া যায় না এবং একমাত্র জ্যোতিই তখন দেদীপ্যমান হয়ে ফুটে ওঠে। এই দৃশ্য বস্তুতঃ জ্যোতির দ্বারাই গঠিত, যেন জ্যোতিই ঘনীভূত হয়ে দৃশ্যরূপে পরিণত হয়েছে। বাহিরে জ্যোতি একটু হাল্কা না হলে এই আভ্যন্তরীণ ঘনীভাব বৈচিত্র্যময় দৃশ্যরূপে আবির্ভূত হতে পারে না। এই দৃশ্য অনন্ত প্রকার হতে পারে। মূর্তি, মন্দির, ফল, পুষ্পাদি উদ্যান পাহাড় পর্বত প্রভৃতি সকল আকারেই তা প্রকাশ পেতে পারে। এই অবস্থায় এই সকল দৃশ্য স্বয়ং জ্যোতির্ময় হয়েও অপেক্ষাকৃত হাল্কা জ্যোতিতে বেষ্টিত দেখা যায়। এর পর দীর্ঘ যাত্রার পর ঐ সকল ঘনীভূত রূপ এত অধিক ঘনীভূত হয় যে একটি ক্ষণের জন্য বাহিরের সমস্ত আলোক যেন তাতে অন্তর্নিবিষ্ট হয়ে যায়। এর পর ঐ সকল দৃশ্য ঠিক বাহ্য জগতের মতই সুষ্ঠুভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। তাকে ঘিরে একটা জ্যোতি থাকে বটে কিন্তু বুঝতে পারা যায় ঐ জ্যোতি দৃশ্য হতেই আবির্ভূত। দৃশ্যটি যেন জ্যোতির ঘনীভূত অবস্থা নয়। তার পর বেষ্টনকারী জ্যোতিও ক্ষীণ হয়ে আসে। ক্রমশঃ তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়। তখন অনন্ত আকাশের মধ্যে ঐ চিদানন্দময় দৃশ্য ভাসতে থাকে। পরে আকাশও থাকে না। উহাই সাধকের আত্মা — উহা সাধক স্বয়ং — উহাই পূর্ণ — উহাই ষোড়শী। যে নিরাধার ও অব্যক্ত নিরাকার সত্তা এই পূর্ণত্বের দ্রষ্টা ও প্রদর্শক সেই গুরু। সেই সপ্তদর্শী। কিন্তু এরও পরাবস্থা আছে। ইহাই স্বপ্রকাশ চৈতন্যাবস্থা। অনন্ত কোটি জগৎ, ভূত, ভবিষ্যত ও বর্তমান সমগ্র কাল এই মহাচৈতন্যে ভাসছে।

আমার তীব্র অনুভূতিতে ফুটে উঠল যে এই ওঁকার ক্ষেত্রেরই একস্থানে মহাত্মা প্রলয়দাসজীর অঙ্গুলি স্পর্শে শ্বেতজ্যোতির্মণ্ডিত স্থির মহাকাশে আমারও এই স্থূল শরীরেরই অনুরূপ এক শুভ্র অবয়বের আবির্ভাব ঘটেছিল; যা ছিল আমারই দিব্যদেহ। এ দেহ কিছুতেই বিনষ্ট হয় না। যিনি এই দেহ লাভ করেন তিনি স্থূলদেহে সমস্ত সাংসারিক কাজ করলেও ঐ শুভ্র অবয়ব অহরহ অনন্ত সংগীতময়ের মাধুর্য ও মাদকতায় বিহ্বল হয়ে থাকে, এগিয়ে চলে উর্ধের পথে। হয়ত রঞ্জনকেও সোমানন্দজী শুনাচ্ছেন দুন্দুভি দামামার সেই অবিশ্রান্ত ঝঙ্কার। হয়ত ক্রমে ক্রমে সেই ঝঙ্কার তড়িৎজড়িত হয়ে ওঁকারনাদে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎই সোমানন্দজী আমাদের দিকে ঘুরে বললেন — রঞ্জন এখন আমার কাছেই থাকবে। রঞ্জনকে ছেড়ে আজই তোমরা ওঁকারেশ্বরের পথে যাত্রা কর। রঞ্জনকে ছেড়ে যেতে হবে শুনে আমার মন ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। দক্ষিণতট পরিক্রমার শুরু থেকেই রঞ্জন আমার সাথী ছিল। মহাত্মা কৃপানাথের আশ্রমের কাছে আমাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন কামরূপ মঠের দণ্ডী সন্ন্যাসীর দল। দক্ষিণতটের পথে সে ছিল আমার সুখ ও দুঃখের সাথী। একসঙ্গে অনেক দুঃসহ দুঃখ ভাগ করে ভোগ করেছি। জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে কিনা জানি না। আমার চোখ দিয়ে টস্‌টস্ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। আমি সাহস করে বললাম — রঞ্জনের সমাধি ভাঙুক। আমরা তার সঙ্গে দেখা করে যাত্রা করতে চাই। সোমানন্দজী কুলিশ কঠোর স্বরে বললেন — তা হবে না। তোমরা এখনই যাত্রা করো। যে ক'দিন এই ওঁকারেশ্বরে থাকবে সেই সময়ের মধ্যে এদিকে আসবে না। বলেছি তো, প্রয়োজনে আমি তোমাদের সঙ্গে দেখা করব।

আমি জানি, মা নর্মদার সাক্ষাৎ প্রেরণায় তুমি একদিন নর্মদার মহিমা নিয়ে একটি গ্রন্থ লিখবে। আর এও জানি ঐ বই হবে যোগের বিশ্বকোষ। কিন্তু তোমার কাছে আমার অনুরোধ — আমি যে মন্ত্রে রঞ্জনকে দীক্ষা দিলাম, সেই মন্ত্র তুমি বইতে দেবে না। আর যা দেখেছ বা শুনেছ সবই দেবে। এরজন্য আমি আগেই মার কাছে অনুমতি নিয়ে নিয়েছি। তারপর পূর্বের মত বিড়বিড় করে মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন — চক্ষু মেলিলে

সকল পাই, চক্ষু মুদিলে কিছুই নাই। দিনে সৃষ্টি রেতে লয়। নিরন্তর ইহাই হয়।

সোমানন্দজীকে প্রণাম করে একবার রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে মনে মনে তাকে প্রণাম জানিয়ে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে হাঁটতে লাগলাম হর নর্মদে ধ্বনি দিতে দিতে ওঁকারেশ্বর ক্ষেত্রের দিকে। পা আর চলতে চাইছে না। আমাদের কারো মুখে কোন কথা নাই। আমাদের বুকে বিদায়ের রাগিনী বাজছে। হরানন্দজী ঝোলা গাঁঠরী হাতে হাঁটছেন আর ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বেশ কতকটা এগিয়ে এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দেখি, তিনি বরাভয় মুদ্রায় দাঁড়িয়ে আছেন। আমরা যুক্তকরে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালাম। বেলা বোধহয় তিনটে বেজেছে। আমার ভিতরটা বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। শ্লথপদে কিছুটা হেঁটেই বসে পড়লাম। গায়ে কোন শক্তি নাই। আমি বসে বসে মা নর্মদার শ্রীচরণে প্রার্থনা করতে লাগলাম — মা! তোমার কৃপায় আজ এতদূরে এসে পৌঁচেছি। বাকী পথ যেন তোমার কূলে কূলে হেঁটে তোমাকে মাথা লুটিয়ে প্রণাম করার শক্তি দাও। তুমি সহায় হও মা। মিনিট পাঁচেক পরে গাঁঠরী ঘাড়ে তুলে হাঁটতে আরম্ভ করলাম, নর্মদার ধারে ধারে। পথে যেসব পথিক আসা যাওয়া করছেন তাঁরা অধিকাংশই ওঁকারেশ্বর বা অমলেশ্বর মন্দির হতে ফিরছেন। দেবদর্শনের গভীর পরিতৃপ্তি তাদের মুখে চোখে ফুটে রয়েছে। গরমকাল যে পড়ে গেছে তা ভালভাবেই অনুভব করছি। এখানেও দেখছি দুই তটের বন জঙ্গলের অদ্ভুত দৃশ্য। নর্মদাতে না এলে এ দৃশ্য দর্শন জীবনে ঘটত না। আমারা ক্রমশঃ উপর দিকে হাঁটছি। পাহাড়ের উঁচুতে লোকজনের ঘরবাড়ী চোখে পড়ছে। আমরা সমতলভূমিতে উঠে এলাম। বাঁদিকে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া সূর্যকিরণে ঝকমক করছে। সূর্যকরোজ্জ্বল ঐ স্বর্ণদ্যুতি মনে করিয়ে দিচ্ছে ওঁকারেশ্বরের দিব্য হিরন্ময় দ্যুতিকে। বামদিকে অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মিতে নর্মদা মায়ীর বিস্তীর্ণ জলপ্রবাহও চিক্‌চিক্ করছে।

একজন কম বয়সী ব্রাহ্মণ যুবা আমাদের কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল — আপলোগ্ পরিক্রমাবাসী হো। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বল — হম্ আপকো পয়ছান লিয়া হ্যায়। আপ পহেলে যব আয়ে থে তব আপনে ওঁকারেশ্বরমেঁ রামদাসজীকা আশ্রমমেঁ ঠারে থে। ম্যায় দীনদয়ালকী ছোটা ভাই রামদয়াল। আপলোগ্ বিষ্ণুপুরীমেঁ পধারেঁ।

মান্ধাতার তপস্যায় ওঁকারেশ্বরের উদ্ভব বলে নর্মদার বুকে জেগে ওঠা ঐ পর্বতের নাম — ওঁকার মান্ধাতা। সেগুলি শিবপুরী, ব্রহ্মাপুরী এবং বিষ্ণুপুরী — এই তিনভাগে বিভক্ত। বিষ্ণুপুরীর মন্দিরে বিষ্ণু ভগবান এবং লক্ষ্মীমাতা এবং ব্রহ্মাপুরীতে ব্রহ্মেশ্বর বিরাজিত। এই দক্ষিণতটে বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মাপুরীর মাঝখানে আছেন অমরেশ্বর বা অমলেশ্বর বা মামলেশ্বর। মামলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ, সেখানে ইন্দোরের মহারাজা হোলকারদের নিযুক্ত বাইশজন ব্রাহ্মণ দৈনিক ত্রিশ হাজার শিবলিঙ্গ তৈরী করে সেইসব পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার পর নর্মদার জলে বিসর্জন দিতেন। সম্প্রতি রাজার রাজত্ব গেছে, কিন্তু পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা এখনও বন্ধ হয়নি। মামলেশ্বর মন্দিরের পাশেই আছেন বীরেশ্বর মহাদেবের মন্দির।

রামদয়ালের সঙ্গে পূর্বদিকে কিছুটা হেঁটে আবার পূবমুখী একটি তোরণদ্বার দিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে নীচে নামতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরেই আমরা উপস্থিত হলাম বিষ্ণুপুরীস্থিত বিষ্ণু ভগবানের মন্দিরে। রামদয়ালের বাবা বিষ্ণু ভগবানের আরতির আয়োজন করছিলেন, তিনিও বেরিয়ে এসে আমাদের সম্বর্ধনা জানালেন। রামদয়াল মন্দিরের পিছনে একটি খালি ঘরে আমাদের নিয়ে এসে তুলল। আমরা এখানে স্বচ্ছন্দেই রাত্রিবাস করতে পারব। আমাদের কোন অসুবিধা হবে না। ঘরে আমাদের গাঁঠরী ফেলে দিয়ে নর্মদা স্পর্শ করার জন্য বিষ্ণুপুরীর ঘাটে নামলাম। সামনে নর্মদার শান্ত স্থির সবুজ জল, হঠাৎ নজর পড়ল উত্তরতটের ওঁকারেশ্বর মন্দিরের চূড়ার বৈদ্যুতিক আলোকস্তম্ভের দিকে। আলোর প্রভায় শ্বেতশুভ্র মন্দিরটিকে অপরূপ দেখাচ্ছে। ওঁকারেশ্বরে স্ফটিক লিঙ্গ স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যুক্ত করে প্রণাম করলাম ওঁকারেশ্বরজী ও প্রলয়দাসজীকে। তাঁর অযাচিত করুণার কথা বারবার আমাকে স্নেহময় পিতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ফিরে এলাম আমাদের নির্দিষ্ট ঘরে। আজ আর আরতি দেখতে যেতে মন চাচ্ছে না। রঞ্জনের নানা টুকরো টুকরো কথা, তার ব্যবহার সবকিছুই স্মৃতিপটে উদিত হচ্ছে। আমরা রঞ্জনের গুরুলাভের কথা, সোমানন্দজীর কথা, তাঁর দীক্ষা দানের পন্থা, তাঁর ভাবোন্মাদ অবস্থা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলাম।

এরপর তণ্ডিকৃত শিবস্তোত্র পাঠ করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। ঘুমের মধ্যেই যেন দেখছি — যেন সকাল হয়ে গেছে, আকাশে অরুণোদয় হচ্ছে। আর সূর্যের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন মহাত্মা সোমানন্দজী। সেই ঝাঁপড় ঝাঁপড় চুল। আব ছোট ছোট জটা দুলিয়ে তিনি কলকণ্ঠে বলছেন — আমার কথা মনে রাখবি, মাঝে মাঝে চেয়ে দেখবি, রস পাবি, মধু পাবি। মা আমার সর্বপরিব্যাপ্তা। তিনি আছেন

ভাবলেই আছেন, নাই ভাবলেই নেই।

ধীরে ধীরে সেই সূর্যগোলক সর্ সর্ করে উঠে গেল আকাশের মধ্যস্থলে। আমার ঘুম ভেঙে গেল। ঘেমে নেয়ে গেছি একবারে। উঠে বসলাম। কমণ্ডলুর জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেললাম। হঠাৎ সামনের দিকে নজর দিতে দেখি — মহাদেবানন্দ তাঁর আসনে দেওয়ালে ঠেক দিয়ে বসে আছেন। তাঁর মুখে স্মিত হাসির ছটা। চোখ দিয়ে দরবিগলিত অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আমি হরানন্দজীকে ঠেলা দিয়ে উঠিয়ে দিলাম। একে একে সবাই জেগে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই মহাদেবানন্দের সম্বিত ফিরে এল। তিনি সোজা হয়ে বসে বলতে লাগলেন গুরুজীর আদেশে আমরা যখন নর্মদা পরিক্রমায় আসা স্থির করি সেইসময় আমাক এক গুরুভ্রাতা আমাদের সঙ্গে আসবে বলে ঠিক হয়। গুরুজী নির্দিষ্ট দিনে কাশী স্টেশনে পৌঁছানোর পর পণ্ডিতস্বামী আমাদের সঙ্গে যেতে অস্বীকার করে বলেন, 'আপনারা নর্মদার শোভা দেখে আসুন; বরং ততদিন আমি গঙ্গার শোভা দেখি।'

জিজ্ঞাসা করলাম — 'আপনি যাবেন না কেন?'

'আমার গুরুদেব ছাড়া আমি অন্য কোন তীর্থ দর্শনে, সাধু দর্শনে যাব না।'

'সে কি কথা? তীর্থ দর্শনে, সাধু দর্শনে দোষ কি? সকল গুরুর মধ্যেই তো একই গুরুশক্তি ক্রিয়াশীল, এটি বুঝলে তবেই তো সাধনার শুরু হয়?'

উষ্ণকণ্ঠে পণ্ডিতস্বামী উত্তর দিলেন, 'অত তত্ত্বকথা বুঝি না। আমি আমার মত করে বুঝে রেখেছি,

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্ব রামরাজীবলোচনঃ॥

অর্থাৎ লক্ষ্মীনাথ শ্রীকৃষ্ণ এবং সীতাপতি রামচন্দ্রে কোন ভেদ নাই জানি, দুজনে এক এবং অভিন্ন, তথাপি শ্রীরামচন্দ্রই আমার জীবন সর্বস্ব — মহাবীরের এই উক্তিকেই আমি জপমন্ত্র করে নিয়েছি।

পণ্ডিতস্বামীর কথা শুনে বড় রাগ হল। আপনি জানেন চিরকালই আমি স্পষ্টবক্তা। তাই বলে ফেললাম, 'আপনি আপনার গুরুদেবের কাছে কি পেয়েছেন জানি না। আমি ত দেখেছি তিনি আপনাকে উপেক্ষাই করেন, নানা কটূক্তি বর্ষণ করেন। তাঁর যা ক্ষণং তুষ্ট ক্ষণং রুষ্ট ভাব।

রহস্যময় হাসি হেসে পণ্ডিতস্বামী জবাব দিলেন, 'কোনদিন মৌচাক ভেঙে মধু খেয়েছেন? মৌচাক থেকে মধু পেতে হলে মৌমাছির হুল সহ্য করতে হয়। ভালবাসা হল ঘন মধুর মত, আঠাযুক্ত। মধু যত পুরানো হয়, তত গাঢ় হয়, আরো বেশী আঠালো হয়। গুরুদেবের সঙ্গে আমার বহুদিনের সম্বন্ধ, হয়ত বা জন্ম জন্মান্তরের সম্বন্ধ। তাঁর মেজাজের কথা বলছেন? মুনি ঋষিদের ঐ রকম ক্ষণং তুষ্ট ক্ষণং রুষ্ট ভাব থাকে। রুদ্র এবং আশুতোষ — এই দুই ভাবের সমাহার এবং সামরস্যই তো শিবরূপ।'

একদিকে ভক্তজনোচিত ভাবোচ্ছ্বাস, অন্যদিকে পণ্ডিতী ভাষ্য — সে এক বিষম ব্যাপার! অগত্যা রণে ভঙ্গ দিয়ে আমরা ট্রেনে উঠলাম।

একবার মঠে গুরুজী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাঁর সর্বক্ষণের সঙ্গী পণ্ডিতস্বামী গুরুজীকে ঔষধ না খাওয়ার জন্য খুব বকাবকি করছেন। পণ্ডিতস্বামী বলছেন — রোজ ডাক্তার আসছেন, আপনাকে দেখে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনি কারো কোন কথাই শুনছেন না। আপনার অসুস্থতা আমরা চোখে দেখতে পারছি না।

আমি তখন সবে ভিক্ষা করে এসে গুরুজীর সামনে দাঁড়িয়েছি। গুরুজীকে প্রণাম করতেই আমার হাত ধরে উঠে বসলেন এবং বললেন — জান, সন্ন্যাসীর ব্রত কি? বেদান্তের মতে সন্ন্যাসীকে সমবৃত্তি ও সমদৃষ্টিতে থাকতে হয়। কাজেই বাবা রোগটাকেই বা দ্বেষ করবো কেন? তোমরা এই অপদার্থকে ভালবাস বলেই না রোগ তাড়াবার জন্য ডাক্তার ডেকে এনেছ! কিন্তু ডাক্তারই বা ডাকা হবে কেন? প্রারব্ধ কর্মানুসারে এই দেহ। যদি ভোগ থাকে, ভোগ হবে। যার যা কাজ সে করে যাবে। রোগ যদি এই শরীরটাকে নিয়ে যায়, নিয়ে যাক্। ক্ষতি কি? সবাই তো আনন্দের মূর্তি। কাউকে ডেকেও আনিনি, কাউকে তাড়িয়েও দেব না।

সন্ন্যাস নিয়ে শুধু সাজসজ্জা করলেই হয় না, বেদান্তের মূল তত্ত্ব তা নয়, সমবৃত্তি, সমদৃষ্টিতে স্থিতি, আত্মাহুতি — এই তো উদ্দেশ্য। তবে রোগকে কি করে দ্বেষ করা যায় বল? বর্তমানে সন্ন্যাসধর্মে অনেক ক্লেদ জমেছে। এইজন্য ভগবান মনু কলিতে সন্ন্যাস নিষিদ্ধ বলে বর্ণনা করেছেন। সন্ন্যাসোপনিষদে আছে —

সর্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
নানু তিষ্ঠন্তি মৈত্রেয়, শিশ্নোদরঃ পরায়ণাঃ॥

হে মৈত্রেয়! কলিযুগ উপস্থিত হলে সকলেই মুখে 'আমি ব্রহ্ম' 'আমি ব্রহ্ম' এই রকম বলবে, শিশ্নোদর পরায়ণ হবে। তারা কেউ শাস্ত্র বর্ণিত কর্মের অনুষ্ঠান করবে না। শাস্ত্রে এ কথাও আছে যে কলিকালে

অশক্তশ্চেদ্ ভবেৎ সাধুঃ, ব্রহ্মচারীঃ চ নির্ধনঃ।
ব্যাধিষ্ঠৌ দেবভক্তশ্চ, বৃদ্ধানারী পতিব্রতা॥

লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চা, অর্থোপার্জন — সব দিক দিয়েই যারা অক্ষম, যারা জীবনযুদ্ধে পরাজিত, জীবনের দায়দায়িত্ব এড়িয়ে যারা পালিয়ে যেতে চায় — তারাই সাধু সাজে। নির্ধনরাই ব্রহ্মচারীর ভেক নেয়। দুরারোগ্য রোগের আক্রমণ হলেই তাদের দেবতার প্রতি ভক্তি বেড়ে যায়। এই রকম যে হবে, ত্রিকালজ্ঞ ঋষিরা তা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তাঁরা নানাভাবে হুঁশিয়ার করে গেছেন।

গেরুয়া হল ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতীক। ভারতবর্ষ চিরকাল এই ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহিমা জগতে ঘোষণা করে এসেছে। সন্ন্যাস ধর্ম চার আশ্রমের শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভিতরে তীব্র ভোগরাগের আসক্তি আছে, অথচ গেরুয়া পরে নিলুম, একে বৈরাগ্য বলে না। ঐ রকম মর্কট বৈরাগ্যকে ঋষিরা চিরকাল নিন্দা করেছেন। অথচ আজকাল শুনছি, তাই হচ্ছে। আচ্ছা, যার যেমন ইচ্ছা সে-ই যে যত্রতত্র যখন তখন গেরুয়া পরে নিচ্ছে তাতে কি তাদের ভয় করে না? একবারও বুক কাঁপে না? দেবদৈত্যজয়ী রাবণের মত পরাক্রান্ত লোক রামচন্দ্রের হাতে সবংশে নিহত হলেন। এর মূল্যে যত কারণই থাকুক না কেন, আমার ত মনে হয় তার প্রধানতম কারণ, রাবণ সন্ন্যাসীবেশে মা জানকীকে অপহরণ করেছিলেন বলে তাঁর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। রাবণ গেরুয়া পরেছিলেন বলেই মা জানকী তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন, লক্ষ্মণ-গণ্ডীর বাইরে এসে তাঁকে ভিক্ষা দিয়েছিলেন। গেরুয়াকে হিন্দু ভারতবর্ষ চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছে, সম্মান দিয়ে এসেছে। অথচ দেখ, লোকে আজকাল গেরুয়া পরেই অবলীলাক্রমে ছলনা করে যাচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখের আর কী থাকতে পারে।

আজকাল সং অর্থাৎ সংস্কারনাশী সন্ন্যাসীর বড় অভাব, সৎ + নাশীদের ভীড় বেশী। অত্যন্ত খাঁটি কথা। কর্মগতিকে আমরা এখন তাই হয়ে পড়েছি বটে! কলিতে সন্ন্যাসের নামে নানারকম ভ্রষ্টাচার চলবে বলেই বোধ হয় ভগবান মনু সন্ন্যাস-আশ্রম নিষিদ্ধ করে গেছেন।

সত্যিকথা বলতে কি, সন্ন্যাস বড় কঠিনতম ব্রত। সন্ন্যাস একটা বেশ মাত্র নয় — সন্ন্যাস হচ্ছে একটা অবস্থা। সাধনার উচ্চতম মার্গে এ অবস্থা লাভ হয়। সন্ন্যাসীকে লৌকৈষণা, পুত্রৈষণা এবং বিত্তৈষণা ত্যাগ করতে হয়। বিরজা হোমের সময় বাইরের জগৎ আর তার হাতছানি অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ যেমন ন্যাস (ত্যাগ) করতে হয়, তেমনি অন্তর্জগতের যোগজ শক্তি, বিভূতি এবং অতীন্দ্রিয় দৃশ্য দর্শনের লোভও ত্যাগ করতে হয়। পূর্বাশ্রমকে ভুলতে হয়; এমনভাবে ভুলতে হয় যে, যেমনভাবে মানুষ নিথর রহস্যে ঢাকা পূর্বজন্মকে ভুলে যায়। গৈরিক বস্ত্র গ্রহণের পূর্বে নিজেকে মৃতজ্ঞানে সন্ন্যাসীকে শ্রাদ্ধ করতে হয়। এটা ত অনুমান করলে চলবে না, সত্যি সত্যি সেইরকম বোধটি জীবন্ত হওয়া চাই।

এই মঠের পূর্ববর্ত্তী আচার্যরা এইভাবেই কঠোরতম তপস্যা ও কৃচ্ছ্রসাধনের দ্বারা পবিত্র সন্ন্যাসধর্মের জ্যোতিকে জ্বালিয়ে রেখে গেছেন। আমি নিজে অপদার্থ বটে, তবে তাঁদের সেই ত্যাগ ও তপস্যাপূত জীবন-চর্যা দেখেছি এবং জেনেছি বলেই এত কথা বলতে পারছি।

আজকাল সন্ন্যাসীরা শুনছি শিষ্য এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য নাকি নানারকম উদ্যোগ করেন, এজন্য নাকি অনেককে অনেক রকম মাথা খাটিয়ে বুদ্ধি খরচ করতে হয়, এ সব কথা শুনে তো মাটিতে সেধুঁতে ইচ্ছা করে। অথচ সন্ন্যাসীর ব্রত বিষয়ে আচার্য মেধাতিথি কি বলেছেন দেখ —

আসনং পাত্রলোভঞ্চ সঞ্চয়ঃ শিষ্যসংগ্রহঃ।
দিবাস্বাপো বৃথালাপো যতের্বন্ধ করাণি ষট্॥

— নিবাসস্থান অর্থাৎ নিজস্ব বড় বড় মঠবাড়ী ও আশ্রম গড়ে তোলার জন্য আসক্তি, পাত্রলোভ, সঞ্চয়, শিষ্যসংগ্রহ, দিবানিদ্রা এবং বৃথালাপ (যেমন সর্বত্র ছুটে দৌড়ে, নানারকম বন্দোবস্ত করে মাইক সহযোগে বক্তৃতাবাজী ইত্যাদি) এই ছয়টি দোষ হল যতি বা সন্ন্যাসীর বন্ধনের কারণ।

অর্থসম্পদ এবং নানা বস্তুসম্ভার তো দূরের কথা, আচার্যদের নির্দেশ — নিজের দণ্ডটির অতিরিক্ত, সময়ান্তরে ব্যবহারের জন্য সন্ন্যাসী যদি সামান্য একগাছি লাঠিও সংগ্রহ করেন, তবে তাকে সঞ্চয় বলা হবে এবং সে সঞ্চয়ও সন্ন্যাস ব্রতের বিরোধী। আচার্যরা এইরকম নির্দেশই দিয়ে গেছেন। 'জীবন্মুক্তি বিবেকে' স্বয়ং বিদ্যারণ্য মুনি বলেছেন —

গৃহীতস্য তু দণ্ডাদে দ্বিতীয়স্য পরিগ্রহঃ।
কালান্তরোপভোগার্থম্ সঞ্চয়ঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

প্রকৃত সন্ন্যাসীর কাছে প্রতিষ্ঠা শুকরী বিষ্ঠা এবং গৌরব রৌরব নরকের তুল্য। সন্ন্যাস ব্রতধারীর কাছে অর্থ সত্যই অনর্থ এবং বন্ধনের কারণ। আজকাল শুনতে পাই, অমুক সন্ন্যাসীর মঠে এত সোনা আছে, তমুক সন্ন্যাসীকে তাঁর জন্মদিনে শিষ্যরা সোনা দিয়ে ওজন করেছেন। যতি-ধর্ম-নির্ণয়ঃ এবং 'বিশ্বেশ্বর-পদ্ধতিঃ' নামে যে দুখানি দুষ্প্রাপ্য বইতে আছে দেখবে, সন্ন্যাসীর পক্ষে এ সব অত্যন্ত গর্হিত কাজ।

'আবাধকঃ ক ইতি চেদাবাধকোহস্ত্যেব'

— সন্ন্যাসীর পক্ষে কোন্‌টি অত্যন্ত বাধক, সে বিষয় নির্দেশ দিতে গিয়ে আচার্যরা বলছেন হিরণ্য অর্থাৎ সোনাই সেই রকম বন্ধনের হেতু।

'যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যম্ রসেন দৃষ্টম্ চেৎ স ব্রহ্মহা ভবেৎ'।

— যদি কোন ভিক্ষু 'রসেন' অর্থাৎ আদর ও আগ্রহের সঙ্গে সোনা দর্শন করেন, তাহলে তিনি ব্রহ্মহা হবেন। 'ব্রহ্মহা' কথাটি বলার উদ্দেশ্য হল, হিরণ্যে যার আসক্তি থাকে, তা অর্জন ও রক্ষণের জন্য তাকে যত্নবান হতে হয়, তাতে সে ব্রহ্মতত্ত্ব ভুলে যাবে। কাজেই তাকে ব্রহ্মহা বলা যায়।

'যস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণ্যম্ রসেন স্পৃষ্টং চেৎ, স পৌল্কসো ভবেৎ'।

— যদি কোন ভিক্ষু আগ্রহের সঙ্গে সোনা স্পর্শ করেন, তাহলে তিনি পৌল্কস অর্থাৎ ম্লেচ্ছ হবেন। তাঁর পাতিত্য দোষ ঘটবে।

'তস্মাদ্ভিক্ষুর্হিরণম্ রসেন ন দৃষ্টং চ, স্পৃষ্টং চ, ন গ্রাহ্যং চ'।

— অতএব সন্ন্যাসী সোনা গ্রহণ তো দূরের কথা, সোনা দর্শনও করবেন না, স্পর্শও করবেন না।

আমি এ কথা ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি — ভারতে শাস্ত্রদর্শী গৃহস্থের অভাব নাই, এদেশে শাস্ত্রচর্চার আলোও এখন নির্বাপিত হয়ে যায় নি। তাঁরা কি এ কথা জানেন না যে, সন্ন্যাসীকে সোনা দান করতে নাই? কেননা —

'যতয়ে কাঞ্চনং দত্ত্বা দাতারপি নরকং ব্রজেৎ'।

— সন্ন্যাসীকে স্বর্ণদান করলে দাতাকেও নরকস্থ হতে হয়।

আজকাল কোন কোন মঠ ও মিশনের আচার্যরা নাকি এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্ ঘরে বাস করেন। তাঁদের ভোগরাগ এবং বৈভব নাকি রাজৈশ্বর্যকেও হার মানায়। কোনও এক সাধু নাকি আবার হাতে ও গলায় হীরা ও মণিমুক্তা পড়ে বেড়ান এবং সোনার খঞ্জনী বাজিয়ে গান করেন। কলি-কৌতুক আর কাকে বলে! গেরুয়া পরে সাধু সেজে এ সব না করলে কি চলতো না? এভাবে তাঁরা যতিধর্মকে কলুষিত করছেন কেন? শাস্ত্রে আছে, যতি বা সন্ন্যাসীকে প্রাণধারণের জন্য একবার মাত্র ভিক্ষা করতে হয়, তাও যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকু মাত্র, কেন না অধিক ভিক্ষার আগ্রহ থাকলে বিষয়ে আসক্তি জন্মে —

এককালে চরেদ্ ভৈক্ষং ন প্রসজ্জেত বিস্তরে।
ভৈক্ষ্যঃ প্রসক্তো হি যতি র্বিষয়েষ্বপি সজ্জতি॥ (মনুসংহিতা ৬/৫৫)

সন্ন্যাসীর এই যে একবার মাত্র ভিক্ষা গ্রহণ, একে মাধুকরী বলে। প্রকৃত সন্ন্যাসী অগ্নি স্পর্শ করেন না, কারও বাড়ীতে গিয়ে ভিক্ষা গ্রহণ বা কোন ধাতু-নির্মিত পাত্রও ব্যবহার করেন না। এইভাবেই সন্ন্যাসীকে ব্রত পালন করতে হয়। সন্ন্যাস একটা বেশ মাত্র নয় — সন্ন্যাস হচ্ছে একটা অবস্থা। সাধনার উচ্চতম মার্গে এ অবস্থা লাভ হয়। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ — সং অর্থাৎ সংস্কার ন্যাস (ত্যাগ) কিংবা সম্যক রূপে কর্মফলত্যাগ।

সম্যঙ ন্যস্যন্ত্যধর্মাচরণানি যেন বা সম্যঙ নিত্যং সৎব্রহ্মণি স্থিরীভবতি উপবিশতি যেন স সংন্যাসঃ। সংন্যাসো বিদ্যতে যস্য স সংন্যাসী। অর্থাৎ যার দ্বারা অধর্মাচরণ সম্যকরূপে পরিত্যাগ করা হয় কিংবা যে সাধনের দ্বারা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে স্থিতি লাভ করা যায় সেই সর্বোত্তম অবস্থার নাম সন্ন্যাস। যাঁতে এইরূপ সংন্যাস আছে, তিনিই সন্ন্যাসী।

আমি বললাম — আপনার গুরুদেবের মত শাস্ত্রমূর্তি উগ্রতপা সন্ন্যাসীর পক্ষে পবিত্র সন্ন্যাস ধর্ম সম্বন্ধে যে শাস্ত্রবাক্য উচ্চারণ করছেন বর্তমান যুগে গেরুয়াধারীদের পক্ষে জ্ঞানাঞ্জন - শলাকা স্বরূপ। ভারতের কোন কোন প্রাচীন মঠে এই ধারা লক্ষ্য করা গেলেও কিন্তু বর্তমান দুনিয়ায় আমরা দেখছি, সন্ন্যাসী মহলে কর্মফল ত্যাগের পরিবর্তে কর্ম ত্যাগ করে পরোপজীবী হওয়াটাই যেন পরম পুরুষার্থ। শিষ্যের টাকায় প্রাসাদোপম অট্টালিকা বানিয়ে তার নাম দিয়েছেন আশ্রম। হীরাকে লাল কাঁচ বলে পরিচয় দিয়ে তা ধারণ করলে কি হীরা ভোগ হয় না? বাবা মা আদর করে নাম রেখেছিলেন যদু, কিন্তু যেহেতু নামরূপ উপাধি ত্যাগ করা সন্ন্যাসীর বাহ্যিক বিধি সেজন্য তাঁরা সামান্য দুটি অক্ষর যদু পরিত্যাগ করে সেজেছেন শ্রীশ্রী ১০০৮ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ যাদবানন্দ সরস্বতী। নামরূপ উপাধি ত্যাগই বটে। এদিকে দেখি মায়ার বন্ধন ভেবে নিজের প্রিয় পরিজনকে ত্যাগ করে এসে সন্ন্যাসী, শিষ্যদের সুখ দুঃখ ও হাজারো সমস্যার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে হাবুডুবু খান।

কহা ভয়ো রচি স্বাংগ বনায়ো
অংতরজামী নিকট ন আয়ো
কহা য়ো তিলক গরেঁ জপমালা,
মরম না জানে মিলন গোপালা
স্বাংগ সেত করণী মনি কালী
কহা ভয়ো গণি মালা মালী
বিন হী প্রেম কহা ভয়ো রোএ।
ভীতরি মৈলি বাহরি কহা ধোএ।

বেশভূষার সং সেজে কি হবে। অন্তর্যামী নিকটে আসবেন না। পরমাত্মার কথা না জেনে কেবল তিলক কাটলে বা জপমালা ধারণ করলে কি হবে। তোমার বাহিরের সাজসজ্জা সাধুর মত হলে, গলায় মালা পরলে, কিন্তু মনের কালিমা যদি থেকে যায় — অন্তরে প্রেম নেই, অথচ রোদন কর, সেই রোদনে কি অন্তরের ভিতরের মলিনতা ধুয়ে যাবে।

শাস্ত্রমতে চিদাকাশে স্থিতি না হলে সংস্কার নাশ হয় না, চিদাকাশ মহাকাশ ও দহরাকাশ প্রভৃতির অতীত হিরণ্যাকাশে না প্রবেশ করা পর্যন্ত জীবাত্মা সম্পূর্ণতঃ বি (বিগত) র- (ধূলি, মালিন্য, মল) অর্থাৎ কর্মমল, মায়িকমল এবং আনবমল হতে মুক্ত হয় না। এই অবস্থাই প্রকৃত পক্ষে বিরজা হোম। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত একটি বাহ্যিক যজ্ঞানুষ্ঠান, ঘৃতাহুতির পর্বকেই 'বিরজা হোম' বলে সন্ন্যাসীরা বুঝে বসে আছেন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং সন্ন্যাস এই চার অবস্থার মধ্যে সন্ন্যাস আশ্রম শ্রেষ্ঠ সন্দেহ নাই, হিন্দু ভারতবর্ষের এইরকম অধিকার ও স্তরভেদ জগতের অন্য কোন ধর্মে নাই, তবে তার জন্য শাস্ত্রকর্তারা সন্ন্যাসের মহোত্তম সাধন অবস্থার কথা চিন্তা করেই অনেক কঠোর বিধি বিধান লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

ভগবান মনুর বিধানানুসারে —

বনেষু তু বিহৃত্যৈব্যং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥ (মনু ৬।৩৩)

বাণপ্রস্থ অবলম্বনের পর অরণ্যে আয়ুর তৃতীয় অংশ পর্যন্ত বাস করার পর আয়ুর চতুর্থ ভাগ (ন্যূনধিক ৭০ বৎসরের পর) সব মোহাদি আসক্তি পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসী হবে।

অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাঁশ্চোৎপাদ্য ধর্মতঃ।
ইষ্টবা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্মনো মোক্ষে নিয়োজয়েৎ।।৩৬

বিধিপূর্বক ব্রহ্মচর্যাশ্রম হতে সমূহ বেদ অধ্যয়ন করে গৃহাশ্রমী হয়ে ধর্মানুসারে পুত্রোৎপাদন পূর্বক বাণপ্রস্থে সামর্থ্যানু যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান তপস্যাদি করে মোক্ষে অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে নিযুক্ত হয়ে মনোনিবেশ করবে।

আগারাদভিনিষ্ক্রান্তঃ পবিত্রোপচিতো মুনিঃ।
সমুপোঢ়েষু কামেষু নিরপেক্ষঃ পরিব্রজেৎ॥ ৪১

যখন সব কামনাকে জয় করে নেবে এবং তাদের জন্য কোন অপেক্ষা থাকবে না, পবিত্রাত্মা, পবিত্রান্তঃকরণ এবং মননশীল হবে তখনই গৃহাশ্রম থেকে বহির্গত হয়ে সন্ন্যাস-আশ্রমে প্রবেশ করবে।

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্।
কালমেব প্রতীক্ষতে নির্দেশং ভৃতকো যথা॥ ৪৫

আপন জীবনে আনন্দ বা আপন মরণে দুঃখিত হবে না। যেমন ক্ষুদ্র ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞার প্রতীক্ষায় থাকে, সেইরূপ কাল ও মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে থাকবে।

দূষিতোহপি চরেদ্ধর্মং যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ।
সম সর্বেষু ভূতেষু ন লিঙ্গ ধর্মকারণম্॥ ৬৬

যদি কেউ সন্ন্যাসীর নিন্দা করে, অপমান করে সন্ন্যাসী তাতে বিচলিত বা ক্ষুব্ধ হবেন না। পক্ষপাতশূণ্য হয়ে সকল প্রাণীর প্রতি সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টি সন্ন্যাসীর থাকা উচিত। এই হল সন্ন্যাসাশ্রমের বিধি। কেবল দণ্ডাদি চিহ্ন ধারণই ধর্মের কারণ নয়।

ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি॥ ৬৭

নির্মলী বৃক্ষের ফল যদিও জলকে শুদ্ধ করে তথাপি তার কেবল নাম গ্রহণ করলেই জল শুদ্ধ হয় না। তা পিষে জলে দিলে তবেই জল শুদ্ধ হয়। তেমনি নামমাত্র আশ্রম ধারণে কিছুই ফল হয় না। স্ব স্ব আশ্রমোচিত কাজ করলে তবেই আশ্রম ধারণ সার্থক হয়।

সম্যগ্‌দর্শনসম্পন্ন কর্মভির্ণ নিবধ্যতে।
দর্শনেন বিহীনস্তু সংসারং প্রতি পদ্যতে॥ ৭৪

যে সন্ন্যাসী যর্থাথ জ্ঞানযুক্ত তিনি কর্মে বদ্ধ হন না। যে জ্ঞান বিদ্যা, যোগাভ্যাস সৎসঙ্গ ধর্মাচরণ ষড়দর্শন রহিত হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করে সে জন্ম-মরণ রূপ সংসারকেই প্রাপ্ত হয়। এইরকম মূর্খ ও অধর্মীর সন্ন্যাস গ্রহণ নিরর্থক। সে ধিক্কারের যোগ্য।

যদা ভাবেন ভবতি সর্বভাবেষু নিঃস্পৃহঃ।
তদা সুখমবাপ্নোতি প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্॥ ৮০

যখন সন্ন্যাসী সব পদার্থে নিজের ভাবে নিস্পৃহ হয় তখন সে মৃত্যুর পর পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় নিরন্তর সুখ লাভ করে।

অননে ক্রমযোগেন পরিব্রজতি যো দ্বিজঃ।
স বিধুয়েহ পাপমানং পরং ব্রহ্মাদি গচ্ছতি॥ ৮৫

এই ক্রমানুসারে সন্ন্যাস যোগ দ্বারা যে দ্বিজ সন্ন্যাস গ্রহণ করে, সে এই সংসার ও শরীর হতে মুক্ত হয়ে পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।

যাবদ্দেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ।
প্রামাণ্যং কর্মশাস্ত্রাণাং তাবদ্দেহ্যুপপদ্যতে॥

যে পর্যন্ত আমি দেহ এইরূপ অনুভব, মহাকাব্যাদির প্রমাণ দ্বারা বাধিত না হয়, সেই পর্যন্ত দেহী জীব, কর্মশাস্ত্রের প্রমাণ স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

যো বাসনাপরিত্যাগঃ কর্মত্যাগ স এব হি।

ফল কামনা বর্জন পূর্বক কর্মানুষ্ঠানকেই কর্মত্যাগ বলে।

কর্মের বাহ্য পরিত্যাগকে কর্মত্যাগ বলা হয় না। কর্মত্যাগ একটি মানসিক ব্যাপার অর্থাৎ কর্ম করেও আমি কর্তা নই — এই রূপ অবধারণ করাকেই কর্মত্যাগ বলে।

কর্মণা চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাত্তয়া তীব্র মুমুক্ষতা।
ততো বিবেকান্মুক্তিঃ স্যাৎ কর্ম ত্যাজ্যং কথং তু তৎ।

বিহিত কর্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের রাগদ্বেষাদি মল অপনীত হয়। চিত্ত বিশুদ্ধি হলে তীব্র মোক্ষেচ্ছা জন্মে; সেই মোক্ষেচ্ছা স্থৈর্য লাভ করলে নিত্যানিত্য বিচার জন্মে এবং তা হতে মুক্তিলাভ হয়। অতএব কর্ম কি প্রকারে

পরিত্যাজ্য হতে পারে?

কৃত্বা কপট ভাবেন দম্ভ লোভ পরায়ণৈঃ।
হট্টে নগরমধ্যে বা সা তপস্যাধমা স্মৃতা।

নিজের তপস্বিত্ব খ্যাপন দ্বারা লোকের স্তুতি অথবা তাদের নিকট হতে ধনাদি পাবার ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে যাঁরা হাটে কিংবা নগর গ্রাম প্রভৃতি লোকালয়ে তপস্যার অনুষ্ঠান করেন তাঁদের সেই তপস্যা অধম তপস্যা বলে পরিগণিত। গেরুয়া পরিচ্ছদই মুক্তির হেতু নয়।

মুক্তির্নাস্তি জটাজুটে ন কাষায়ে ন মুণ্ডনে।
ন ভস্মানি ন কন্থায়াং তিলকে বা কমণ্ডলৌ॥

জটার মুকুট রচনা করতে পারলেই মুক্তি লাভ হয় না। গৈরিকাদি রঞ্জিত বস্ত্র পরলেই বা মস্তক মুণ্ডন করলেই বা ভস্ম মাখলেই বা শীতনিবারণার্থ কন্থা ধারণ করলেই বা তিলক কমণ্ডলু ধারণ করলেই মুক্তি হয় না।

দ্বেষেণ তাড্যতে সর্পো বৃথা বল্মীকতাড়নম্।
মনসো নিগ্রহো নাস্তি বৃথা কায়স্য মুণ্ডনম্।

বিদ্বেষবশতঃ লোকে সর্প তাড়না করে কিন্তু সাপকে ধরতে না পেরে কেবল সর্প নিবাস বল্মীকের স্তূপকে যষ্ঠী প্রভৃতি দ্বারা তাড়না করা নিষ্ফল ও হাস্যজনক। সেইরূপ যে স্থানে মনকে শাসন করে আয়ত্তাধীন করার প্রয়াস নাই, সে স্থানে কেবল শরীরকে মুণ্ডন করে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করা নিষ্ফল ও হাস্যজনক।

ন বিরক্তা ধনৈস্ত্যক্তা ন বিরক্তা দিগম্বরাঃ।
বিশেষরক্তাঃ স্বপদে তে বিরক্তা মতা মম।

ধনরহিত হলেই বৈরাগ্যবান হওয়া যায় না, তাহলে নির্ধন মাত্রেই বৈরাগ্যবান হত। দিগম্বর হলেই যদি বৈরাগ্যবান হওয়া যেত তাহলে শিশুগণ বৈরাগ্যবান হত। বিরক্ত শব্দের অর্থ বি = বিশেষরূপে, রক্ত = আসক্ত। যাঁরা কেবল আত্মাতে আসক্ত কেবল আত্মনিষ্ঠ তারাই ব্যবহারিক জগতে লোকদৃষ্টিতে আসক্ত বলে প্রতীয়মান হলেও তাদেরকেই আমি বিরক্ত বলব।

চৌরাস্ত্যজন্তি গেহং স্বং ভয়ে নৈব চ বোধতঃ।
জারাস্ত্যজন্তি গেহং স্বং কামেনৈব ন বোধতঃ॥

চোরেরা যে নিজ গৃহ, ক্ষেত্র, বিত্ত, কুটুম্বাদি পরিত্যাগ করে, তা রাজদণ্ড ভয়ে, জ্ঞানবশতঃ নয়। জ্ঞান বিনা গৃহাদি পরিত্যাগে যদি বিরক্ত হতে পারত তাহলে ত চোরেরাই প্রধান বৈরাগ্যবান্ হয়ে যেত। পরদারাসক্ত লম্পট পুরুষরাও তো অনেক সময় কাম চরিতার্থের জন্য পরনারী নিয়ে পলায়ন করে তবে তারা কি বৈরাগ্যবান্। মূল কথা জ্ঞান।

বমনাহারবৎ যস্য ভাতি সর্বৈষণাদিষু।
তস্যাধিকারঃ সন্ন্যাসে ভক্ত্যদেহাভিমানিনঃ।
যদা মনসি বৈরাগ্যং জাতং সর্বেষু বস্তুষু।
তদৈব সন্ন্যাসেদ্বিদ্বানন্যথা পতিতো ভবেৎ॥
দ্রব্যার্থং মন্নবস্ত্রার্থং যঃ প্রতিষ্ঠার্থমেব চ।
সন্ন্যাসসেদুভয়ভ্রষ্টঃ স মুক্তিং নাপ্তুমর্হতি॥

(মৈত্রেয়ী উপনিষদ ২।১৮-২০)

ভুক্ত অন্নাদি বমন করলে যেমন তা আর খাবার জন্য স্পৃহা হয় না বরং ঘৃণাই জন্মে, যখন সমস্ত অভীষ্ট বিষয়ে সেইরূপ যাঁর ঘৃণা জন্মে এবং যাঁর দেহাত্মজ্ঞান (আমি এই দেহ) এইরূপ জ্ঞান থাকে না, তিনিই সন্ন্যাস গ্রহণের অধিকারী। যখন যাবতীয় বিষয়ে বৈরাগ্য অর্থাৎ অনাসক্তি জন্মে তখনই বুদ্ধিমান মুমুক্ষের সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁর ইহকাল পরকাল দুই-ই নষ্ট হয়। তাঁরা কখনই মুক্তিলাভ করতে পারে না।

কর্মত্যাগান্ন, সন্ন্যাসো ন প্রৈষোচ্চারণেন তু।
সন্ধৌ জীবাত্মনোরৈক্যং সন্ন্যাসঃ পরিকীর্তিতঃ॥

কেবলমাত্র কর্মত্যাগ করলেই সন্ন্যাস হয় না এবং মুখে 'সন্ন্যাস' 'সন্ন্যাস' বা প্রণব উচ্চারণ করলেও সন্ন্যাস

হয় না। ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিস্থানে (আকাশচক্রে) জীবাত্মা ও পরমাত্মার একীকরণের নামই সন্ন্যাস।

সন্ন্যাসং পরমং তপঃ।

বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তো দেখছি ধর্ম ও নীতির বিপ্লব উপস্থিত। ধর্মের সঙ্গে নীতির বন্ধন শিথিল হয়ে পড়েছে। শিক্ষিত যুবকগণের মধ্যেই চরিত্র-হনন এবং সমাজবিরোধী কাজের দিকে প্রবৃত্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে। আমাদের দেশের বেদ-বেদান্ত অতুল্য সন্দেহ নাই। বিদেশীরাও শতমুখে প্রশংসা করছেন। কিন্তু এদেশের কোন শিক্ষিত যুবক বেদ-বেদান্ত অধ্যয়ন করেন? ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলন এবং পূর্ব পুরুষের প্রবৃত্তি বাসনা জয়ের দ্বারা ব্রহ্মে চিত্ত সমাধানের চেষ্টা কোথায়? মুখে পিতৃপুরুষের স্তুতি করবো অথচ তাঁরা যাতে সন্তুষ্ট হবেন তা করবো না। কুপুত্র হয়ে, কুলে কলঙ্ক দিয়ে কেউ কি কখনও পিতৃপুরুষের প্রিয় পাত্র হবেন, এটা কি করে সম্ভব? মুখে তাঁদের মত না হই, তাহলে বিদেশীরা কেনই বা অমাদেরকে ধিক্কার দেবেন না? বিদ্যাচর্চা আরও হোক, পিতৃপুরুষের গুণবাদ আরও বাড়ুক কিন্তু বিদ্যাচর্চা অবিদ্যায় পরিণত না হয়, গুণবাদ মৌখিক না হয়, এদিকে দৃষ্টি রাখা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

শঙ্করাচার্য একজন যুগ প্রবর্তক মহাত্মা সন্দেহ নাই। তিনিই বিলুপ্ত ব্রহ্মবাদকে পুনরুদ্ধার করেছেন। তিনিই নূতন করে ঘোষণা করেন যে সন্ন্যাস ছাড়া ব্রহ্মসংস্থ অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিতি কখনও সম্ভব নয়। তিনি যে সন্ন্যাস প্রবর্তন করলেন, তাতে গৃহে থেকে কেউ যে সন্ন্যাসী হবেন তার সম্ভাবনা রইল না। কেননা তাঁর মতে গৃহে থাকলে কর্মানুষ্ঠান অপরিহার্য। কর্মানুষ্ঠান করতে গেলেই চাঞ্চল্য ও ব্যস্ততা এবং তদ্ধেতু চিত্তবিক্ষেপ অবশ্যম্ভাবী। এইরূপ অবস্থায় ব্রহ্মচিন্তা ব্রহ্মে স্থিতি কিভাবে সম্ভব? অতএব কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্ত! আচার্য শঙ্করের মতে জনক ও যাজ্ঞবল্ক্য নাকি বিদ্বৎ সন্ন্যাসী ছিলেন না, বিবিদিষা সন্ন্যাসী ছিলেন। যাঁরা বিদ্বৎ সন্ন্যাসী তাঁদের ব্রহ্মে স্থিতি হয়েছে, তাঁরা গৃহত্যাগী ত্যক্তসমস্তকর্মা, আর যাঁরা বিবিদিষা সন্ন্যাসী তাঁরা ব্রহ্মজ্ঞানানুশীলনপরায়ন, গৃহে বা বনে সদাচারে বাস করেন, তাঁরা অপরিত্যক্তকর্মা। আচার্য শঙ্করের এইমত তাঁকে কোন কোন আচার্যের কটাক্ষের পাত্র, ধিক্কারের পাত্র করেছে।

* বল্লভাচার্য তাঁকে সন্ন্যাস পাষণ্ডের প্রবর্তক বলে ধিক্কার দিয়েছেন। এইরকম কঠোর বাক্য সাম্প্রদায়িক সন্দেহ নাই। তাঁর অনুপম অবদানের কথা মনে রাখেন নি। তবুও একথা কি অস্বীকার করা যায় যে বৈদিক ঋষিদের মতবাদের অনুরূপ শঙ্করের ঐ মত নয়?

একটু ভেবে দেখলেই বুঝা যায় শঙ্করের বিধান মত সমস্ত কর্মত্যাগ কখনও সম্ভব নয়। সন্ন্যাসীর ভিক্ষাচর্চা মাধুকরী, অজগরবৃত্তিধারী হলেও তাঁর অশন চর্বন গলাধঃকরণ, এমনকি মানসিক চিন্তা ও অনুধ্যান এসকলই কর্মসাধ্য গণ্য। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ অনুগীতাতে বলেছেন যে বাইরের কর্মত্যাগ করে যিনি আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতপক্ষে তিনিও ক্রিয়াবান্। কেননা মন বুদ্ধি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল নিয়তই তাঁকে কর্মে প্রবৃত্ত রেখেছে। কর্মের অপরিহার্যত্ব অনুভব করেই তিনি বললেন — যোগ কর্মসু কৌশলম্ — কর্মেতে কৌশলই যোগ।

বল্লভাচার্য — ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে মধ্যপ্রদেশের রায়পুর অঞ্চলের চম্পারণ্যে দক্ষিণী ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণ ভট্টের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বল্লভাচার্য ছিলেন শুদ্ধাদ্বৈতবাদের প্রবর্তক ও শ্রেষ্ঠ আচার্য। প্রয়াগেই তিনি দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করেন। পরম বৈষ্ণব পিতাই ছিলেন প্রথম আচার্য ও গুরু। কিছুদিন বিষ্ণুচিত্ত নামক এক অধ্যাপকের কাছে শিক্ষালাভ করেন। কৈশোরে উপনীত হলে বেদ উপনিষদ প্রভৃতি উচ্চতর শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য তিরুম্মল নামক দক্ষিণদেশীয় পণ্ডিতের শরণ নেন। নারায়ণ দীক্ষিত নামক এক দিকপাল পণ্ডিতের কাছে কিছুদিন জটিল দার্শনিক তত্ত্বের শিক্ষালাভ করেন। বল্লভাচার্য ছিলেন শুদ্ধাদ্বৈতবাদী বিষ্ণুস্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত। বৃন্দাবনে শ্রীনাথ মন্দিরের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। মধ্বাচার্যের মতানুসারে ইনি ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্য করেন। বল্লভাচার্য ছিলেন চৈতন্যদেবের সম-সাময়িক। পুরীতে উভয়ের সাক্ষাৎ হয়েছিল। গীতার সুবোধিনী টীকা, জৈমিনী সূত্রভাষ্য, পূর্বমীমাংসা কারিকা, ভাগবততত্ত্বদীপ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীশ্রীবালগোপলই ছিলেন বল্লভাচার্যের উপাস্য দেবতা। ভক্ত দামোদরদাস ছিলেন প্রধান শিষ্য।

শ্রীভগবনের মাধুর্যতত্ত্বের প্রচার, পুষ্টিমার্গীয় সাধনা ও শুদ্ধাদ্বৈতবাদের শাস্ত্রীয় ভিত্তি নির্মাণ — এই তিনটি মহতী কর্মের মধ্য দিয়ে বল্লভ এদেশের অধ্যাত্মবাদের ইতিহাসে উজ্জ্বল স্বাক্ষ্য রেখে গেছেন। তাঁর মতে সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হতে জীব ও জগৎ উদ্ভূত কাজেই উভয়েই সত্য।

বল্লভ বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস বা ভেককে সমর্থন করতেন না। ঔপনিষদিক যুগ বা ঋষিযুগের কল্যাণময় গার্হস্থ্য আশ্রমকেই তিনি অনুসরণ করতে বলতেন। তাঁর মত সাধক তখনই সন্ন্যাস গ্রহণ করবে যখন শ্রীভগবানের বিরহ দহন তাঁর জীবনে চরমে এসে পৌঁচেছে। এই সন্ন্যাসের পরই মরদেহের বিনাশ হয়। কৃষ্ণ সাযুজ্য ঘটে। ১৫৩২ খৃঃ একদিন পূর্ব ঘোষিত লগ্নে তিনি সহস্র ভক্ত, শিষ্য ও তীর্থচারী দর্শকের সম্মুখে হেঁটে গিয়ে কাশীর গঙ্গা গর্ভে প্রবেশ করেন। কথিত আছে, আচার্যের দেহ গঙ্গায় বিলীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখান হতে এক শুভ্র জ্যোতির ধারা উদ্ভূত হয়ে ধীরে ধীরে আকাশমার্গে মিলিয়ে যায়।

অনেকে ভুল ব্যাখ্যা করে বলেন শ্রীকৃষ্ণ (নারায়ণ ঋষি) গীতাতে বৈরাগ্যের কথা বলেছেন। কিন্তু তা যদি হত, তাহলে তাঁর উপদেশ শোনার পরেই অর্জুন কৌপীন সম্বল করে গিরিগুহায় চলে যেতেন? ক্লৈব্য পরিহার করে সমরাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন না। গীতার ঐ উপদেশ থেকে আমি যা বুঝেছি, সংসার রূপ সমরাঙ্গনে সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই কর্মসু কৌশল রূপ যোগ অবলম্বন করার মধ্যেই প্রকৃত সন্ন্যাস লাভের উপায় নিহিত। এই কৌশল কি? কর্ম করেও কর্ম না করা। কর্ম না করা কি? কর্মের কোন ফলাকাঙ্খা না রাখলে কর্ম করতে প্রবৃত্তি হবে কেন? প্রবৃত্তি হবে ঈশ্বরানুরাগে। ঈশ্বরানুরাগ নিরাকাঙ্খ ব্যক্তিকে তাঁর আদেশ পালনে নিয়ত প্রবৃত্ত রাখবে, সুতরাং আদেশ পালন ভিন্ন কর্মে প্রবৃত্ত হবার আর কোন কারণ বিদ্যামান থাকবে না। বৈদিক ঋষিদের পরিকাঙ্খিত এই সন্ন্যাস শঙ্কর প্রবর্ত্তিত সন্ন্যাস হতে পৃথক হচ্ছে বটে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট সন্ন্যাসের সঙ্গে তার মিল রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মধ্যে বৈদিক ঋষিদের সেই প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন। শঙ্করের ঐরূপ ব্যবস্থা প্রয়োজন ছিল বৌদ্ধধর্মকে স্তব্ধীভূত করার জন্য। তিনি বুঝেন নি, এমন নয়। শঙ্কর প্রবর্তিত সন্ন্যাসের সঙ্গে প্রাচীনের দৃশ্যতঃ আর একটি বিরোধও সকলের চোখে পড়বে। জ্ঞানে সমুদয় জগৎ মিথ্যা বলে উড়িয়ে না দিলে বা তা মিথ্যা হয়ে না গেলে ব্রহ্মে স্থিতির বাধা জন্মায়। সুতরাং তিনি জগৎকে মিথ্যা স্বপ্নবৎ বলে প্রতিপাদন করেছেন। এখানেও অন্যান্য আচার্যদের সঙ্গে শঙ্করের বিরোধ। বৈদিক ঋষিরা তো বটেই এমনকি রামানুজ প্রভৃতি অন্যান্য দ্বৈতবাদীরাও জগৎ ও জীবকে সত্য বলেই স্বীকার করেছেন। তাঁদের মতে সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ হতে উদ্বুদ্ধ এই সৃষ্টি সত্য এবং আনন্দ পরিপ্লাবিত। সংসারে থেকেও সং এর মধ্যেই সারকে অনুসন্ধান করাই সাধনা। এই সাধনার অন্তে ক্রমে সং ন্যাস হয় সারের সন্ধান পেয়ে কৃতকৃত্য হওয়া যায়। বৈদিক ঋষিরাও তাই করতেন। ব্রহ্মচারীরূপে গুরুগৃহে থেকে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন স্বাধ্যায় বেদপাঠের দ্বারা তাঁরাও এই কৌশল অবলম্বন করে তাঁদের সমাবর্ত্তন করে সংসার ধর্ম পালন করলেও প্রতিবস্তুর মধ্যে সেই আনন্দমাত্রম নির্বিশেষং নিরীহম্ এর রসাস্বাদনে তাঁদের কোন বাধা হত না।

ব্যাসপুত্র শুকদেবের জীবন ছিল নিবৃত্তিযোগের জ্বলন্ত প্রতীক। তিনি প্রব্রজ্যাবলম্বন করে গৃহ সংসার পরিত্যাগ করলেন, হিমালয় অতিক্রম করে মেরু প্রদেশে গেলেন আর কখনও পিতার কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করবেন এমন আশা ছিল না অথচ সেই নির্জন প্রদেশে যখন তাঁর যোগ গভীর থেকে গভীর হল তখন সেই ব্রহ্মসত্তার ভিতর হতে যে স্বরূপ সৌন্দর্য প্রকাশ পেল তাতে তাঁর চিত্ত ভগবদনুরাগে বিক্ষিপ্ত হল, অনন্ত ঐশ্বর্য দর্শনে ব্যাকুল হল, ভক্তি এসে চিত্তকে অধিকার করল। ভগবদ্ গুণকীর্তনেই তাঁর চিত্ত পাগল হয়ে গেল। তিনি আর নির্জন বনবাসী হয়ে থাকতে পারলেন না, ঘরে ফিরলেন। নিবৃত্তিযোগ পরিপূর্ণভাবে পরিপাক হলে এইরূপ আনন্দরতি পূর্ণ সংসারযোগ সম্ভব হয়। এই কর্ম কৌশল যোগই এমন একটি যোগ যে যোগে ব্রহ্মে রতি ছাড়া অন্তে আর কিছুই থাকে না। এই অবস্থার আমরা নাম দিতে পারি সন্ন্যাস যোগ। কর্মের মধ্যেও নৈষ্কর্ম্য, নিবৃত্তিযোগে চিত্ত নির্বিকার এবং বাসনাশূণ্য হয়। তখন বিষয়ের মধ্যে বাস করেও, চারিদিকে সংসারের মধ্যে আবৃত্ত থেকেও তারই মধ্যে এমন একটা স্থিতি আসে যে, যেন সংসার নাই, বিষয় নাই, সমুদয় উড়ে গেছে কেবল এক ব্রহ্মই আছেন। যখন এই ভাব সিদ্ধ হল, আমার বলবার কিছুই থাকল না, তখন ব্রহ্মের আদেশ হল, এখন যাও সংসারে স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে এই পথে আন, তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমার সংসার নির্মাণ কর। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কি? সম্পূর্ণরূপে ন্যাস, সমুদয় ভগবানে সম্যক প্রকারে অর্পণ। বৈদিক যুগে ঋষিরা সংসার ত্যাগ করেন নি। গুরুগৃহে সাংখ্য বেদাদি অধ্যয়ন, ব্রহ্মার্থ পালনের পর সংসারে ফিরে সংসারী হতেন, কিন্তু আত্মজয়ের সাধনায় গুরুগৃহে সিদ্ধ হবার পর সংসার করতেন বলে তাঁদের গৃহ তপোবনে পরিণত হত।

বসন্ বিষয় মধ্যেহপি ন বসত্যেব বুদ্ধিমান্।
সংবসত্যেব দুর্বুদ্ধিরসৎসু বিষয়েষ্বপি॥

— বুদ্ধিমান ব্যক্তি বিষয় মধ্যে বাস করেও বিষয়েতে বাস করেন না। দুর্বুদ্ধি যে বিষয় সকলের মধ্যে কেবল অসৎ বিষয় সমূহেই বাস করে। এই ন্যায়ানুসারে তারা আর দশজনের মত সংসারে থাকলেও বিষয়ে বাস করেন নি, ব্রহ্মকে নিয়েই সংসারণ্যে বাস করতেন — এ এক অনুপম অবস্থা।

নিবৃত্তিযোগের দ্বারা বাসনা নিবৃত্ত হওয়ায় ভগবদ্ ভক্তিরূপ প্রবৃত্তিযোগের দীক্ষালাভের ফলে দুঃখ বিপদের

দিকে দৃষ্টি থাকে না, ভগবান তাঁকে কষ্ট পরীক্ষার মধ্যেই ফেলুন, দুঃখ যন্ত্রণাই দিন, কিছুতেই তাঁর মন বিচলিত হয় না। বরং তিনি বলেন, 'আমার প্রভু, তোমার কি দয়া! আমার সব গিয়েছে তাতে আমার কি? তুমি ত আমার সব হয়েছ।'

প্রকৃত ভক্ত-সন্ন্যাসীর মুখের কথা হল —

দিশতু স্বারাজ্যং বা বিতরদু তাপত্রয়ং বাপি।
সুখিতং দুঃখিতমপি মাং ন বিমঞ্চতু কেশবঃ স্বামী॥

তিনি আমার স্বরাজ্যই দিন বা তাপত্রয়েই জারিত করুন, সুখেই রাখুন বা দুঃখেই রাখুন, কালভয়বারণ প্রভু যেন আমায় পরিত্যাগ না করেন।

আগতে স্বাগতং কুর্যাৎ গচ্ছন্তং ন নিবারয়েৎ
যথা প্রাপ্তং সহেৎ সর্বং সা তপস্যোত্তমত্তমা॥

বৈদিক ঋষি ছিলেন এই সর্বোত্তম তপস্যায় সিদ্ধ তপস্বী। সংসার বিকারের স্থল সন্দেহ নাই, কিন্তু যাঁর চিত্ত এইরূপ ভাবাপন্ন, তাঁর আর কিছুতেই বিকার হবার সম্ভবনা নেই। সন্ন্যাসীর আদর্শ একদিকে দিয়ে দেখতে গেলে সৈনিকের আদর্শ। অবসরকালে সৈনিক যথেচ্ছ সম্পদ ভোগ করে কিন্তু যেই রণভেরী বেজে উঠে, কোথায় থাকবে স্ত্রী পুত্র পরিবার, কোথায় পড়ে থাকবে বিষয়-বৈভব, তখনই সে সকল কিছু ছেড়ে নির্লিপ্ত পুরুষের মত যুদ্ধে চলে যাবে। প্রত্যাশান্ত মৃত্যু — চোখ বন্ধ করলেই আলোর জগৎ। প্রকৃত সন্ন্যাসী অবধূতের মত সংসারে বাস করবেন। বাহিরে সংসারীর বেশ, অন্তরে সর্বদা ব্রাহ্মীস্থিতি। পূর্বকালে জনক প্রহ্লাদ প্রভৃতি ঈশ্বর সাক্ষাৎকারের পর তাঁর আদেশে সংসারে থেকে রাজ্যপালনাদি কার্য এবং সংসারের নানা গুরুভার পালন করে গেছেন। যেখানে ঈশ্বরের আদেশ পালনই মুখ্য সেখানে নিজেদের প্রয়োজন গৌণ।

মিথিলায়াং প্রদদ্ধেয়ং রোমমেকং ন দহ্যতি।

এই হল আসল সন্ন্যাস। এই অবস্থায় বিষয় কোনমতেই মনে বিকার উৎপন্ন করতে পারে না। এই হল বৈদিক আন্তর্সন্ন্যাসের অবস্থা।

সন্ন্যাস দু প্রকারের — ১) যা কিছু কাজ করা হোক তা ঈশ্বরে সমর্পণ আর ২) দেহের মধ্যেই ঈশ্বরের লীলা নিকেতন দর্শন করে তাঁর আদেশে ইন্দ্রিয় সকলের ব্যবহার। দ্বিতীয় সন্ন্যাসের অবস্থা সম্বন্ধে ভক্তগণ বর্ণনা করেছেন — গো বিক্রয় করলে গোস্বামী যেমন তার তৃণগুচ্ছ জলাদির বিষয়ে নিশ্চিন্ত হন তেমনি ভক্ত আপনার দেহাদি 'গোবিন্দায় নমো নমঃ' — ন মম চ মম' বলে ঈশ্বর চরণে অর্পণ করে সংসার নির্বাহ, ইন্দ্রিয়ভোগ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হন। সন্ন্যাসী ঈশ্বরের আদেশে সংসারে বাস করছেন। তাঁর সকলই ঈশ্বরের চরণে সমর্পিত, তিনি আর কিসের জন্য চিন্তা করবেন? অন্য দশজন সংসারীর কাছে সংসার যেরূপ, তাঁর নিকট সংসার তখন সেরূপ থাকে না। তিনি সর্বত্র এবং প্রতি বস্তুতে দেখেন তাঁর ইষ্টদেবতার লীলা। সংসার যে তাঁরই প্রকাশ, তাঁরই লীলাক্ষেত্র। তখন তাঁর অন্তরে বাহিরে কেবল হরি, তিনি আর কিছু দেখেন না, স্বর্গধামও জানেন না, জানেন কেবল ভক্ত বৎসলকে। সন্ন্যাস ভক্তি ও জ্ঞানের এক অদ্ভুত ও অনুপম রাখি-বন্ধন — সম্পূর্ণভাবে সামরস্য অবস্থা।

অবধূত নিত্যানন্দকে শ্রীচৈতন্য বাহিরের সন্ন্যাস ত্যাগ করে গৃহী হতে অনুমতি দিয়েছিলেন, এ কেবল দেখাবার জন্য যে বাহিরে গৃহধর্ম পালন করে, গৃহে থেকেও অন্তরে সন্ন্যাসধর্ম রক্ষা করা যায়। সংসারকে মূল করলেই ভুল হবে প্রতি পদে, স্খলন পতন ত্রুটি সব কিছুই ঐ মানসিকতার রন্ধ্রপথে প্রবেশ করবে কিন্তু ভগবানকে মূল করতে ভুল হয় না, স্বয়ং অচ্যুত জীবনের কেন্দ্রমণি হওয়ায় চ্যুতির সম্ভবনা আর থাকবে কি করে? সাধকের নিজের কোন ইচ্ছা থাকে না। ভগবদ্ ইচ্ছাই তাঁর নিয়ামক। বেদে যোগের দ্বারা এই আন্তর্সন্ন্যাসের সাধনের দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে একাত্মতা লাভে উপদেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর সংসার যোগীর সংসার সন্তানরাও যোগী, গৃহিণীও যোগিনী। বৈদিক ঋষিগণ সংসার ধর্মের মধ্যে ব্রহ্মযোগ এমনভাবে ঘনিষ্ঠ করে দিয়েছেন যে সর্বাবস্থায় ব্রহ্মের সঙ্গে যোগ থাকে। নিয়ত ব্রহ্মচিন্তা, প্রাত্যহিক জীবনচর্চায় ব্রহ্মস্থাপনা — এই অবিচ্ছেদ্য যোগের ফলে যোগে পূর্ণতা আসে। জগতে জীবে ও সমুদয় ব্যবহারে ব্রহ্মের সঙ্গে অবিচ্ছেদ যোগবশতঃ যোগের যে পূর্ণতা উপস্থিত হয়, তা গৃহ ভিন্ন অন্যত্র সম্ভব হয় না। এজন্যই বেদ গার্হস্থ্যে

উপনিষদ-ধর্মের পর্যবসান করেছেন। শুকদেবের জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মানুষের যা প্রিয়তম এবং চরমতম আকাঙ্খা; তা ঈশ্বরত্বে পৌঁছাতে না পারলে মানুষের আশা মিটে না, শান্তি মিলে না। ঈশ্বরত্ব লাভ করার চেষ্টাই একমাত্র সত্য পুরুষার্থ। ইহাই আত্মদর্শন। এই আত্মদর্শন মূল উপপাদ্য বিষয়। গীতাকার কিন্তু এই উদ্দেশ্যে গীতা রচনা করেন নি, গীতার উদ্দেশ্য আত্মদর্শনকামীকে আর এক অদ্বিতীয় উপায় প্রদর্শন করা। যে বস্তু আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থে বহুভাবে আলোচিত ও দ্যোতিত বাঞ্ছিত তাই বেদ বেদান্ত — অনেকভাবে অনেক শব্দের ভিতর দিয়ে পুনরুক্তিদোষ স্বীকার করেও পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে — কর্মফলত্যাগ এই অদ্বিতীয় যোগের নাম।

যেখানে দেহ সেখানেই কর্ম, তা হতে কারও মুক্তি নাই। তবু দেহকে প্রভুর মন্দির করে তার দ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায় সকল ধর্মই তা প্রতিপাদন করছে। কর্মমাত্রেরই কয়েকটি দোষ আছে। মুক্তিতো দোষহীন শুদ্ধচেতারই লভ্য। তাহলে কর্মবন্ধন হতে অর্থাৎ দোষ স্পর্শ হতে মুক্তি পাওয়া যাবে কেমন করে? গীতা বেদের অনুবর্তন করে অত্যন্ত স্পষ্টভাষায় তার নির্দেশ করেছেন — 'নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, যজ্ঞার্থ কর্ম করে কর্মফল ত্যাগ করে, সমস্ত কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করে — অর্থাৎ দেহ মন বাক্যকে আহূতি দিয়ে।'

কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্মফলত্যাগ তো শুধু মুখের কথা নয়। এটি কেবল বুদ্ধির ব্যাপার বা প্রয়োগ নয়; হৃদয় মন্থন করে এইভাব প্রস্ফুট হয়। এই ত্যাগশক্তি উৎপন্ন করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। বাচকজ্ঞানী অনেক আছেন, শাস্ত্র তাঁদের কণ্ঠস্থ, কিন্তু ভোগে আসক্ত। ভগবদ্‌ভক্তির কুঙ্কুম চন্দনে যাঁর হৃদয় নিষিক্ত ও চর্চিত, তাঁরই জ্ঞান সার্থক। ভক্তি বিনা জ্ঞান ব্যর্থ। ভক্তি থাকলে স্বতঃই জ্ঞান আসে। গীতাতে স্থিতপ্রজ্ঞের যে লক্ষণ আছে, প্রকৃত লক্ষণও তাই। আমার বাবা বলতেন, ভক্তি হল ভোগের প্রতি ইতি। ভোগাসক্তি গেলেই জ্ঞান আসে, ভক্তি আসে। বলা বাহুল্য এই ভক্তি বীর্যহীনতা নয়, অন্ধ শ্রদ্ধা ভাবালুতা প্রভৃতির কোন ফেনিল উচ্ছ্বাসও নয়। লৌকিক কল্পনায় ভক্ত বলতে ধরা হয় এক নির্বীর্য মালাজপ নিরত ব্যক্তি, সেবাকর্মেও তার মালা জপে বিক্ষেপ আসে। কিন্তু মালা তিলক দণ্ড কমণ্ডলু ধারণ বা ভস্মত্রিপুণ্ডাদি লেপন ভক্তের লক্ষণ নয়, সন্ন্যাসীর লক্ষণ নয়। যিনি অদ্বেষ্টা, যিনি করুণার ভাণ্ডার, যিনি মমতাশূন্য, নিরহঙ্কার, যাঁর কাছে সুখ ও দুঃখ, শীত ও উষ্ণ সমান, যিনি ক্ষমতাশীল সর্বদা সন্তুষ্ট, যাঁর আত্মা সংকল্পে দৃঢ়, যিনি মন ও বুদ্ধি শ্রী ভগবানে অর্পন করেছেন, যিনি লোকের ভয়ের কারণ নন, যাঁর কোন লোকের ভয় নাই, যিনি হর্ষ শোক ভয়াদি হতে মুক্ত, যিনি পবিত্র, কার্যদক্ষ হয়েও তটস্থ, যিনি শুভাশুভ ত্যাগ করেছেন,শত্রু মিত্রে তাঁর সমভাব, মান অপমান যাঁর কাছে তুল্যমূল্য, যিনি স্তুতি দ্বারা উৎফুল্ল বা নিন্দা দ্বারা দুঃখিত হন না, যিনি মৌনব্রতী, একান্ত প্রিয় স্থিরবুদ্ধি তিনিই ভক্ত। এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি প্রকৃত সন্ন্যাসী হওয়া ও প্রকৃত ভক্ত বা জ্ঞানী হওয়া একই কথা।

গীতা জ্ঞানী ও ভক্ত দুই প্রকারের লোককেই শুনিয়েছেন — কর্ম বিনা কেউ সিদ্ধিলাভ করে না, জনকাদিও কর্ম দ্বারা জ্ঞানী হয়েছিলেন। যদি আমিও আলস্য রহিত হয়ে কর্ম না করি, তাহলে লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। একথা বলার পর সাধারণ লোকে আর কি বলার থাকতে পারে? কিন্তু একদিক দিয়ে বিচার করতে গেলে কর্মমাত্রেই যে বন্ধনস্বরূপ একথা অবিসম্বাদিত সত্য। অপরদিকে দেহধারীমাত্রকেই ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছায় হোক কর্ম করতে হয়, শারীরিক ও মানসিক চেষ্টা মাত্রই কর্ম। তাহলে কর্মনিরত ব্যক্তি কেমন করে বন্ধন মুক্ত হতে পারে? আমি যতদূর জানি গীতায় এ প্রশ্নের যেরকমভাবে সমাধান করা হয়েছে অন্য কোন ধর্মগ্রন্থেই সেরূপ করা হয় নি। গীতায় বলা হয়েছে — 'ফলাশক্তি ছাড় এবং কর্ম কর, নিরাশী হও, এবং কর্ম কর, নিষ্কাম হয়ে কর্ম কর।' কর্মকে যে পরিত্যাগ করে তার পতন, কর্ম করতে করতেই ফল ত্যাগ করতে পারলে তবেই অভ্যুদয়।

এস্থলে ফলের এইরকম অর্থ নয় যে ত্যাগী কোন ফল পান না। গীতার কোথাও এইরকম অর্থ নাই। ফল ত্যাগের অর্থ ফলের বিষয়ে আসক্তি ত্যাগ। প্রকৃতপক্ষে কর্মফলত্যাগী হাজার গুণ ফললাভ করে। গীতার ফলত্যাগে অক্ষুণ্ণ শ্রদ্ধার পরীক্ষা রয়েছে। যে লোক পরিণাম চিন্তা করে, সে বহুবার কর্ম অর্থাৎ কর্তব্য হতে ভ্রষ্ট হয়। সে অধীর হয়ে উঠে, তাতে সে, ক্রোধের বশীভূত হয়, তখন সে যা করা উচিত নয়, তাই করে এবং এক কর্ম হতে দ্বিতীয়ে এবং দ্বিতীয় হতে তৃতীয়ে জড়িত হয়ে পড়ে। পরিণাম চিন্তাকারীর অবশ্য বিষয়াঙ্কের

মতই হয় এবং শেষে সেও বিষয়ীর মত সারাসার নীতি-অনীতির বিচার ত্যাগ করে ফললাভের জন্য যে কোন উপায় অবলম্বন করে এবং তাকেই ধর্ম বলে গণ্য করে। ফলাশক্তির এইরূপ কটু পরিণাম হতে মুক্তির উপায় স্বরূপ গীতাকার অনাসক্তি অর্থাৎ কর্মফল ত্যাগের সিদ্ধান্ত আবিষ্কার করেছেন এবং অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ভাষায় তা জগতের সম্মুখে উপস্থিত করেছেন। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয় ধর্ম ও অর্থ পরস্পরের বিরোধী, ব্যবসা প্রভৃতি লৌকিক ব্যাপারে ধর্মের স্থান নাই, ধর্মরক্ষাও হয় না, ধর্মের প্রয়োজনীয়তা মোক্ষের জন্য হতে পারে। ধর্মের ক্ষেত্রে ধর্ম শোভা পায়, অর্থের ক্ষেত্রে অর্থ। আমার মতে গীতাকার এই ভুল ধারণার নিরাকরণ করেছেন। তিনি মোক্ষ এবং লৌকিক ব্যবহারের মধ্যে কোন ভেদ রাখেননি এবং ব্যবহারের মধ্যেই ধর্মের সার্থকতা প্রতিপন্ন করেছেন। আমার মতে বেদে বলা হয়েছে — যে ধর্ম কর্মের মধ্যে অভ্যাস না করা যায়, তা ধর্মই নয়, অর্থাৎ তাঁদের মতে যে সকল কর্ম আসক্তি বিনা করাই যায় না তা পরিত্যাজ্য। এই সুবর্ণ নিয়ম মানুষকে অনেক ধর্মসঙ্কট হতে বাঁচাতে পারে। এই মত দ্বারা হত্যা ব্যাভিচার মিথ্যাচার প্রভৃতি সকল বিষয়ই ত্যাজ্য হয়ে পড়ে। মানুষের জীবন সরল হয় এবং সরলতা হতে শান্তি আসে। পরিণাম সম্বন্ধে বেপরোয়া ভাবও ফলত্যাগের অর্থ নয়। পরিণাম, উপায়-বিচার এবং তার সম্বন্ধে জ্ঞান অত্যন্ত প্রয়োজন। এগুলো হলে যে যে লোক পরিণামের ইচ্ছা না করেই সাধনের মধ্যে তন্ময় হয়ে যেতে পারে, সেই যথার্থ ফলত্যাগী।

গীতায় আছে — যজ্ঞের অর্থ মুখ্যভাবে পরোপকারের জন্য শরীরের উপযোগ। গীতায় বলা হয় নি যে কর্মমাত্রের ত্যাগই সন্ন্যাস। গীতার সন্ন্যাসী অতি কর্মী এবং অতি অকর্মী উভয়ই।

নিবৃত্তিপথ অবলম্বনের জন্যই সন্ন্যাস। নিবৃত্তিপথে সিদ্ধ না হলে অপরোক্ষ ব্রহ্মদর্শনে কৃতার্থ হবার সম্ভবনা নাই। ভোগ প্রবৃত্তি ব্রহ্মদর্শনের অন্তরায়। ভোগের প্রতি লালসা ব্রহ্মবস্তু হতে আমাদেরকে দূরে নিয়ে যায় এবং ভোগের প্রতি বিতৃষ্ণা আমাদেরকে দুর হতে নিকটে আনে। বিষয় বিরাগ ছাড়া তৎপ্রতি বিতৃষ্ণা আমাদের জন্মাবে কেন? কিন্তু তার জন্য সংসার হতে দূরে নির্জন গিরিগুহায় পলায়ন করলে বা গেরুয়া পরে সংসারের দায় দায়িত্ব এড়িয়ে 'কুটীচক' বা 'বহুদক' সন্ন্যাসীরূপে ঘুরে বেড়ালেই বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য জন্মায় না। সংসারকে এইভাবে ত্যাগ করা যায় না। সংসার থাকে মনে। সংসারে থেকেই সাংসারিক বিষয় সমূহের অনিত্যত্ব, পরিণামবিরসত্ব ইত্যাদি চিন্তন এবং সর্বাবস্থায় ঈশ্বরানুধ্যান দ্বারাই সংসার ও বিষয়ের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগা সম্ভব। চোখের সামনেই মানুষ দেখে অতীতের ভগ্ন অট্টালিকা, জীর্ণ মন্দির, ধ্বংসপ্রাপ্ত নগর ও জনপদ। মানুষ দেখে সহসা অপ্রত্যাশিত রোগের আক্রমণে একটি ভরাট সুখের সংসার শ্মশান হয়ে গেল। মানুষের সযত্ন লালিত প্রিয় বস্তুর পরিণামও নাশ। বাবা বলতেন — সংসারই শ্রেষ্ঠ গুরু। কারণ ঐ সকল বস্তুর বৃদ্ধি ক্ষয় ও ধ্বংস — এই শিক্ষাই দেয় যে জগৎ অনিত্য। সংসারের সতত পরিবর্তনশীল এই অবস্থাই মানুষের মনে নির্বেদ জাগায়। প্রাণপ্রিয়া সুন্দরী স্ত্রী সহসা রোগ ভোগে মারা যায়, ব্যাভিচারিণী হয়, প্রাণাধিক পুত্রের সহসা মৃত্যু, কোথাও তার কাছ হতে অবজ্ঞা — এইরকম নানা যন্ত্রণায় কাতর হয়ে মানুষ ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক ঈশ্বরমুখী হয়। যিনি বিচারশীল তিনি দেখেন —

সোহি জনাই জহি দেহু জনাই।
জানত তুমহি তুমহি কোঈ জাঈ॥

হে প্রভু, তুমি যাকে কৃপা করে জানাও সেই জানতে পারে তোমাকে। আমার আসিত্বের নাশ হয়ে দেখছি আমি (জ্ঞানে) তুমি ছাড়া কিছু নাই।

সংসারই যে সর্বশ্রেষ্ঠ গুরু সন্দেহ নাই। সংসারের মধ্যে থেকে সংসারের তাপ সহ্য করতে করতে এই যে আত্মদর্শনের সাধনা এই হল বৈদিক রীতি। ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য যোগে যুক্ত হয়ে, ঈশ্বারনুরাগে উদ্দীপ্ত হৃদয় হয়ে ঈশ্বরের সংসার পালন করাই এবং ধর্মে স্থিতিলাভই আসল সন্ন্যাস।

বৈদিক সন্ন্যাসের প্রকৃত অর্থ শুক্লযর্জুর্বেদের দুটি মন্ত্রে ব্যঞ্জিত রয়েছে —

১) ঈশাবাস্যামিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।
২) কুর্বনেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোহস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

মন্ত্র দুটির ভাবার্থ হল — হে সাধক, এ জগতে যা কিছু স্থির পদার্থ আছে, সেগুলি তোমাকে ঈশ্বর দ্বারা আচ্ছাদিত করে নিতে হবে অর্থাৎ জগতের যাবতীয় পদার্থ ভোগ্যবস্তু এবং দৃশ্য পদার্থ সকলই ঈশ্বরের দান, সবকিছুর মধ্যেই তাঁর প্রকাশ এই ভাবনা দৃঢ় করে নিতে হবে। তিনি তোমাকে যে ধন দেবে তা তাঁর প্রসাদ জ্ঞানে সানন্দে জীবিকা নির্বাহ করবে। কারও ধনে লোভ করবে না, যদি কোন বস্তু অপ্রাপ্য থাকে তাহলে বুঝবে তা তোমার মঙ্গলের জন্যই। এভাবে কর্ম করাতে মানুষ কর্মে লিপ্ত হয় না। কর্মজনিত দোষ ঘটে না। এই সংসারে কেউ যদি শতবর্ষ জীবিত থাকতে ইচ্ছা করে তাহলে তাকে এইভাবে নিত্য কর্মানুষ্ঠান করতে হবে।

বৈদিক ঋষিবৃন্দ কোনকালে কর্মহীন জীবনযাপন করতেন না। কায়িক মানসিক আধ্যাত্মিক সর্ববিধ বিষয়ে তাঁরা নিয়ত কর্মরত থাকতেন। তাঁরা গৃহ ও কর্মের সমুদয় আয়োজনের মধ্যে দেবদর্শন করতেন। সর্বত্র তাঁরা আস্যম্ — আনন্দোজ্জ্বল মুখচ্ছবি — জীবনের সুখ দুঃখ সবকিছুকেই গ্রহণ করতেন তাঁরই লীলা বিলাস হিসাবে। তাঁরা অনুভব করেছেন যে জগতের সর্বত্র সাম বা স্তোত্র গান হচ্ছে। সাম শব্দের অর্থ সা - বাক্, অম - প্রাণ। প্রাণশক্তিযোগে বাক্য উচ্চারিত হয়ে স্তোত্র উদ্গীত হয়ে নিনাদিত হয়। এই বাক্ ও প্রাণ সমুদায় জগদ্ব্যাপী সুতরাং যিনি বাক্যের বাক্, প্রাণের প্রাণ তাঁরই গুণ গাঁথা জগতের সকল বস্তুতে প্রতি অনু পরমাণুতে নিরন্তর অভিব্যক্ত হয়ে চলেছে। আত্মার কর্ণ যদি নিরন্তর এই পরমাত্মার গুণগান শ্রবণ করে, পৃথিব্যাদি লোকসকল, মেঘ, বিদ্যুৎ, বর্ষার বারিধারা, ঋতুচক্র, চক্ষুরাদি, ইন্দ্রিয়, উদয়াস্ত, দিন বিভাগ, গবাদি প্রাণী, অগ্নি বায়ু সূর্য চন্দ্রমা ইত্যাদির মধ্যে যদি এই স্তোত্রগান কেউ সংসারে থেকেও প্রত্যক্ষ করে, তাহলে কি পরমাশ্চর্য মধুর যোগই না জীবনে নিষ্পন্ন হয়। ক্রমে উদয়াস্তবিরহিত আদিত্যের রশ্মিসমূহে মধুবহাগড়ী, বেদ উপনিষৎ ইতিহাস সমূহে মধুমতী প্রজ্ঞার ধারা, আধিভৌতিক দেবাদিতে বেদরস, ব্রহ্মভাবে ভাবিত হয়ে মন আদির সেই রসপান যাতে হয় তারই অবিচ্ছেদ সাধন বেদের ছত্রে ছত্রে। বৈদিক ঋষিরা তারই মধুপান করেছেন সংসারে থেকেও এবং তাঁরা এইভাবে সন্ন্যাসী হতেন।

প্রকৃত সন্ন্যাসীর সাধন হল —

আত্মা ত্বং গিরিজা মতিঃ সহচরাঃ প্রাণঃ শরীরং গৃহং
পূজা তে বিবিধোপভোগরচনা নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ।
সঞ্চারস্তু পদো প্রদক্ষিণবিধিঃ স্তোত্রাণি সর্বাঃ গিরো,
যদয়ৎ কর্ম করোমি তত্তদখিলং শম্ভো। তব আরাধনম্॥

আত্মা তুমি, শক্তি তব মতি-বুদ্ধি মোর,
আজ্ঞাবহ তব বায়ু — মোর পঞ্চপ্রাণ —
এ শরীর তোমারি ত প্রিয় বাসস্থান।
উপভোগ তরে মোর যে ভোগ রচনা
তোমারি ত সে সকল পূজার বিধান,
নিদ্রা সে তো সমাধিতে সুখে অবস্থান।
ভোজন আমার আহুতি প্রদান, শয়ন আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।
ভ্রমণ আমার প্রদক্ষিণ তাঁর প্রতি কথা মোর মন্ত্র,
যেভাবেই বসি সেই ত আসন, প্রতি অঙ্গভঙ্গী মুদ্রা বিরচন
যে চিন্তাই করি তাঁরই ধ্যান করি এ জীবন তাঁর যন্ত্র॥

যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'সন্ন্যাসী' কবিতায় পাই —

সন্ন্যাসী

ওগো সন্ন্যাসী ওগো উদাসীন, মিনতি তোমার কাছে —
বলো একবার, জীবনে তোমার কি ধনচাওয়ার আছে।
গিরিগুহাতলে আসন পেতেছ ঘন অরণ্য মাঝে,
নরের দৃষ্টি সমাজের আঁখি সহিবারে পার না যে।
বিষয় বাসনা বিষেরই মতন ত্যাজিয়া গিয়াছ চলি

ধূলিসম এই ধরণীর মায়া হেলায় দুপায়ে দলি;
বনের পশুরে সঙ্গী করেছ, সাথী বনতরুলতা,
মুখের বাণীরে বন্ধ করেছে বন্দিয়া নীরবতা!
ঘন জটাজালে ঢাকি চারুকেশ ললাটে ভস্ম মাখি
প্রকৃতির পানে রুধেছ সবলে প্রকৃতিরই দেওয়া আঁখি;
সব ডাকাডাকি ছাড়িয়া গোপনে কারে ডাকি দিবারাতি
কাটাইছ কাল কিসের আশায় পাষাণে আসন পাতি?
কে তোমারে প্রভু জন্ম দিয়াছে, ছিল না কি মাতাপিতা —
সুখ-শৈশব কাদের অঙ্কে কাটিয়াছে জান কি তা?
ও কঠিন দেহ পুষ্টি লভিল কাহার অন্নজলে?
কার কাছে তব দেবতার নাম শিখেছ কৌতূহলে?
অসহায় দেহ অশরণ মন কোন্ সমাজের স্নেহে
বাড়িয়া উঠেছে কোন্ পল্লীর কোন্ অকরুণ গেহে?
কাহার বক্ষে চরণ ফেলিয়া ছাড়িয়া এসেছ কারে —
কাহাদের কথা বিপুল যত্নে ভুলিয়াছ একবারে!
কৃতজ্ঞতার কোন অধিকার কারো বুঝি তার আছে —
তাই কি সুদূরে সরিয়া এসেছ দেখা পাও কারো পাছে!
ধরণীর স্নেহে তরণী করিয়া সরণি হয়েছ পার,
কিসের নৌকা, কেবা তার মাঝি? ধারো না কাহারো ধার!
বুড়া বিধাতার ভুল হয়েছিল মানবের গৃহবাসে
মানুষ করিয়া পাঠালো তোমায় না বুঝে এ পরিহাসে!
কেমনে চিনিবে অন্তর তব — মর্মবাসনা গূঢ় —
পাষাণের মাঝে পাথর তোমারে গড়িতে পারেনি মূঢ়!
কে জানিত আগে, মুক্তির লোভে শুধিবারে দেব ঋণ,
পিতৃঋণের এ বড় ফাঁকি দিতে পারে কোনো দীন?
মায়ের ভায়ের স্নেহ — সে তো মায়া, মিছে সমাজের দাবী,
দেশ — সে তো মাটি — অন্নে তাহার কোথা মুক্তির চাবি?
তোমার মোক্ষ তোমারি সে শুধু — স্বীয় সাধনার ধন,
দশজনে টেনে রাখিবে তোমারে মায়ায় ভুলায়ে মন।
এত 'ছোট' নহ তুমি দেব ধরণীর মোহে ভুলি,
তোমার স্বর্গ পরের কথায় শিকায় রাখিবে তুলি!
ধিক্ সন্ন্যাসী, ধিক্ উদাসীন, ধিক্ হে মুক্তিকামী,
শ্রীপদে তোমার শতবার ধিক্ — হে মোক্ষপথগামী!
মানুষের ঘরে মানুষ হবার যোগ্যতা নহি যার,
স্বর্গের লোভ সাজে কি তাহার — দেবতার অধিকার!
পিতা কাঁদে ভুঁয়ে, মাতা পথে শুয়ে মুমূর্ষু গৃহহীন,
ক্ষুধা-অপরাধে ভাইবোন কাঁদে — নিজবাসে পরাধীন!
তুমি খুঁজিতেছ আপনার পথ, ভাবিয়া তাদের মায়া,
যাদের মায়ায় মানুষ হয়েছ, যাদেরি রক্তে কায়া!
হায় কাপুরুষ, হায় পলাতক, হায় ভীরু, হা রে দীন!
স্বার্থ - আশায় মনুষ্যত্বে এত বড় উদাসীন —

সহিতে পারেন শুধু তিনি — যাঁর আকণ্ঠ ভরা বিষে,
মানুষের পরে হেন পরিহাস মানুষ সহিবে কিসে?

....

তব ভাণ্ডারে কোন সে বিত্ত সঞ্চিছ কার তরে?
স্বার্থ-সাধনা-ছদ্মের বেশে ভুলাইব কোন্ নরে!
যাহারে ডাকিয়া ভস্ম মাখিয়া কাটাইছ নিশিদিন —
জেনো — ধরা তাঁর স্নেহেরই আগার — তিনি নন উদাসীন।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানা কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোরে উঠে আমরা স্নান করে এলাম। পর্বতের ঢালুদেশে সোজা বাঁধানো ঘাটের উপর নেমে এসেছে। কয়েকটি ছায়া ঢাকা চৌকি স্নানার্থীদের জন্য পাতা আছে। সিঁড়ির ধারে কয়েকজন ভিক্ষুক এবং শিবপূজার বেলপাতা ও ফুল সাজিয়ে নিয়ে বিক্রির জন্য কয়েকজন বালক-বালিকা বসে আছে।

বিষ্ণু ভগবানের মন্দিরে মঙ্গলারতির আয়োজন চলছে, ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং। বিষ্ণু ভগবানের সামনে জ্বলছে ঘৃতপ্রদীপ। বিষ্ণু ভগবানের মূর্তির পিছনে রয়েছেন মা লক্ষ্মীর মূর্তি। রামদয়ালের বাবা ভক্তি ভরে আরতি করলেন অনেকক্ষণ ধরে। প্রাণভরে আরতি দেখলাম। মন্দিরে গৃহী, সাধু, নারী, পুরুষ স্নান করে পূজা ও আরতি দেখতে উপস্থিত হয়েছেন।

আরতির পর রামদয়াল আমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ল পথে। আমরা তার পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। এখন গরমকাল তাই তীর্থযাত্রীর ভীড় কম। গ্রীষ্ম ও বর্ষা ছাড়া সব ঋতুতেই এখানে তীর্থযাত্রীর ভীড় হয়। হাজার হাজার পরিক্রমাবাসীরা এখানে আসেন। হোলকারদের স্টেট থেকে এই মন্দিরের সমূহ খরচ চলে। একটু হেঁটে সে দূরের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল — ঐ যে দূরে গোমুখ থেকে যে জল নর্মদাতে পড়ছে ঐ ধারার নাম কপিলধারা। আমি বললাম — কপিলধারা নামে এক প্রপাত তো আমি অমরকন্টকে দেখে এসেছি। এর সঙ্গে কি তার কোন যোগ আছে।

— না, না এ কপিলধারার সঙ্গে সে কপিলধারার কোন যোগ নেই। পুরাকালে মহর্ষি কপিল এ স্থানে তপস্যা করেছিলেন। এই কুণ্ড ছিল মহর্ষি কপিলের যজ্ঞকুণ্ড। এখন সেই যজ্ঞকুণ্ড জলকুণ্ডে পরিণত হয়েছে। বছরের সবসময়েই এই কুণ্ড থেকে জল নির্গত হয়। কথা বলতে আমরা চড়াইপথে অনেকখানি উপরে উঠে এসেছি। সবাই এরই ঘর্মাক্ত কলেরব। তেষ্টাও পেয়েছে খুব। আমার গোমুখ থেকে কমণ্ডলুতে জল ভরে পান করে কুণ্ডের পাশেই বিশ্রাম করতে বসলাম।

এই কপিলধারা কুণ্ড থেকে একটু দূরে একটি টিলা দেখিয়ে রামদয়াল জানাল ইহ্ হ্যায় ব্রহ্মাপুরী। ইহাঁ ব্রহ্মেশ্বর মহাবেদকা মন্দির হ্যায়। — স্বয়ম্ভূব মনুর সময় দানবের ভয়ে সমস্ত দেবতা এই তীর্থে এসে ব্রহ্মাজীর শরণ নেন। ব্রহ্মা বলেন যে তিনি নিজে দৈত্যদের ভয়ে দিশেহারা এবং তাঁর সমস্ত বেদমন্ত্রের বিস্মরণ ঘটেছে তাই তিনি দেবতাদের দানবদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবেন না। তখন ব্রহ্মাজী সহ সমস্ত দেবতারা এই ব্রহ্মেশ্বর মহাদেবের পূজা করে শিবজীর করুণা প্রার্থনা করেন। ব্রহ্মাজীসহ সমস্ত দেবতাদের অসহায়তার কথা শ্রবণ করে শিবজীর হুঙ্কারে পাতাল থেকে এক শিবলিঙ্গের উদ্ভব ঘটে। যা ওঁকারেশ্বর নামে পূজিত। তাই ওঁঙ্কারক্ষেত্রের নাম শিবপুরী।

শিবের আশীর্বাদে ব্রহ্মাজীর সমস্ত বেদমন্ত্র স্মরণে আসে এবং দানবদের ধ্বংস করেন। দেবতারা দানবদের হাত থেকে রক্ষা পান। ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরে শিবলিঙ্গে কমণ্ডলুর জল ঢেলে প্রণাম করলাম —

অব দ্রুগ্ধানি পিত্র্যা সৃজা নোহব যা বয়ং চকৃমা তনূভিঃ।
অব রাজন্ পশুতৃপং ন তায়ুং সৃজা বৎসং ন দাম্নো বসিষ্ঠন॥ (বশিষ্ঠ ৭।৮৬।৫)

হে বরুণ, তুমি কর গো মোদের পাপবন্ধন মুক্ত
আজিও রয়েছে কর্ম - কালিমা এই তনু সনে যুক্ত।
আপনারে মোরা বাঁধিয়া রেখেছি কামনা রজ্জু দিয়া
হে রাজন্ এই পশু বন্ধন দাওগো উন্মোচিয়া॥

এরপর রামদয়াল আমাদের নিয়ে এল ব্রহ্মাপুরী ও বিষ্ণুপুরীর মধ্যস্থলে মামলেশ্বর শিব মন্দিরে। এটি জ্যোতির্লিঙ্গ। দেখি, পুরোহিতরা পার্থিব শিবলিঙ্গ তৈরী করে তার মাথায় এক দানা করে চাল দিয়ে যোনীপীঠ সমন্বিত বড় বড় কাঠের চৌকীতে স্থাপন করছেন। বেলা প্রায় সাড়ে বারোটা নাগাদ সমস্ত শিবলিঙ্গ তৈরী হয়ে গেলে এক সঙ্গে পার্থিব শিবলিঙ্গ ও মামলেশ্বর শিবের পূজা শুরু হল।

আমরা মামলেশ্বরের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলাম —

প্রভুং প্রাণনাথং বিভুং বিশ্বনাথং জগন্নাথনাথং সদানন্দভাজম্।
ভবদ্ভব্যভূতেশ্বরং ভূতনাথং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ১
গলে রুদ্রমালং তনৌ সর্পজালং মহাকাল কালং গণেশাধিপালম্।
জটাজুটগঙ্গোত্তরঙ্গৈর্বিশালং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ২
মুদামাকরং মণ্ডনং মণ্ডনানাং মহামণ্ডনং ভস্মভূষাধরং তম্।
অনাদিং হ্যপারং হ্যমোহস্মারং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৩
তটাধোনিবাসং মহাট্টাট্টহাসং মহাপাপনাশং সদা সুপ্রকাশম্।
গিরীশং গণেশং সুরেশং মহেশং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৪
গিরীন্দ্রাত্মজাসংগৃহীতার্দ্ধদেহং গিরৌ সংস্থিতং সর্বদাসন্নগেহম্।
চতুর্ব্বক্তরমুখ্যৈঃ সদা বন্দ্যমানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৫
কপালং ত্রিশূলং করাভ্যাং দধানং পদাম্ভৌজনম্রায় কামং দদানম্।
বলীবর্দ্দযানং সুরাণাং প্রধানং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৬
শরচ্চন্দ্রগাত্রং গণনন্দপাত্রং ত্রিনেত্রং পবিত্রং ধনেশস্য মিত্রম্।
অপর্ণাকলত্রং চরিত্রৈর্বিচিত্রং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৭
নৃরং সর্পহারং চিতাভুবিহারং ভবং বেদসারং সদা নির্বিকারম্।
শ্মশানে বসন্তং মনোজং দহন্তং শিবং শঙ্করং শম্ভুমীশানমীড়ে॥ ৮

পূজা করে বেরিয়ে এলাম। আমরা মামলেশ্বর মন্দির থেকে প্রায় আধঘন্টা হেঁটে আমাদের আস্তানায় এসে পৌঁছালাম। বেলা প্রায় দুটো বাজতে যায়। বিষ্ণু মন্দিরেও তখনই পূজা ও ভোগারতি শেষ হয়েছে।

মধ্যাহ্নভোজের পর আমরা মন্দির সংলগ্ন মণ্ডপে বিশ্রাম করতে লাগলাম। গরমের জন্য আমাদের আর শুয়ে থাকতে ভাল লাগল না। আমরা সবাই উঠে পড়লাম। রামদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে বিষ্ণুপুরী মন্দির হতে বেরিয়ে পশ্চিমমুখী রাস্তার উপর উঠে এলাম। নিবিড় অরণ্যানির অপরূপ শোভা উপভোগ করতে লাগলাম। নর্মদার দক্ষিণ তীর পর্বত সমাকীর্ণ। কতকগুলি বন্য শৃগালকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। রাস্তার উপর অজস্র বাড়ীঘর দেখে মনে হচ্ছে, অদূর ভবিষ্যতে হয়ত এই মহল্লা একটি বড় শহরে পরিণত হবে। এখানে বাজার, পোষ্টাপিস্ সবই আছে। নর্মদার উপরে তৈরী পুল ব্রহ্মাপুরী ও বিষ্ণুপুরীর সঙ্গে শিবপুরীর সংযোগ ঘটিয়েছে। ওঁকারেশ্বরে আসার জন্য খাণ্ডোয়া, ইন্দোর থেকে যে সমস্ত গাড়ী আসছে তা এই পুলের মুখে এসেই থামে। তারপর পায়ে হেঁটে পুল পার হয়ে ওঁকারেশ্বর মন্দিরে যেতে হয়। সারাদিনে যত তীর্থযাত্রী আসা-যাওয়া করে তাদের খাওয়া-দাওয়ার জন্য অনেক দোকান তৈরী হয়েছে। তাতে পাওয়া যাচ্ছে লিট্টি ও রং বেরং এর ভাত। থাকার জন্য অনেকগুলি ধর্মশালা ও সদাবর্ত রয়েছে। ক্রমাগত তীর্থযাত্রীদের আসা-যাওয়ার জন্য এই এলাকা বেশ সরগরম। একটি দোকানের ঘড়িতে দেখি সময় হয়েছে ৬টা ৩৫ মিনিট। সন্ধ্যা হয়েছে। রামদয়াল আমাদের ফিরে চলার জন্য তাড়া লাগাল। বলল — বাবা চিন্তা করবেন। হরানন্দজী বললেন — তুমি মন্দিরে যাও। আমরা নর্মদাতে স্নান করে ফিরব। রামদয়াল নাছোড়বান্দা। সে কিছুতেই আমাদের একা ছেড়ে দেবে না। সেও আমাদের সঙ্গে নর্মদার ঘাটে এসে সিঁড়ির উপর বসে রইল। বিষ্ণুপুরীর ঘাটে সান্ধ্য স্নান সেরে আমরা মন্দিরে ফিরে সন্ধ্যা করতে বসলাম। সান্ধ্য জপাদি যখন শেষ হল তখন রাত্রি ন'টা বেজেছে। আমরা শোবার আয়োজন করছি।

আমার মনে হয় মহামুনি মার্কণ্ডেয় নর্মদা পরিক্রমার দূরত্বকে আটশ মাইল বলে বর্ণনা করেছেন বটে কিন্তু পরিক্রমাবাসীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে বুঝা যায় শূলপাণির ঝাড়ি, ওঁকারেশ্বর ঝাড়ি ও মুণ্ডমহারণ্য এই তিনটি

ঘোর জঙ্গলসহ পাহাড়ী উপত্যকা অঞ্চলকে ধরলে সমগ্র পথ সাড়ে আটশ মাইলের কম হবে না। যে যুগে মহামুনি মার্কণ্ডেয় নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন সেই সময় হয়ত পথের দূরত্ব আটশ মাইলই ছিল কিন্তু কালক্রমে নর্মদার গতিপথের সামান্য অদল বদল হওয়ায় এখন দূরত্ব যৎকিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রেমানন্দের এই কথা শেষ হতে না হতেই রামদয়াল ও তার বাবা আমাদের কাছে এসে বসে বললেন — কাল থেকে এখানে তিনদিন ব্যাপী সাধু-সম্মেলন শুরু হচ্ছে। প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন শ্রীমৎ প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী এবং দ্বিতীয় দিনে শ্রীমৎ করপাত্রীজী মহারাজ এবং তৃতীয় দিনে মহাদেবানন্দ গিরি। মিথিলা, দ্বারভাঙ্গা, কাশী, হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানের প্রায় তাবৎ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলী এবং সন্ন্যাসীরা এই সভায় যোগ দেবেন। তাই এই সম্মেলন আকারে, বৈশিষ্ট্যে বিশেষ গরিমামণ্ডিত রূপ ধারণ করবে আশা করি। আমি আপনাদের এই সম্মেলনে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করছি। আপনারা তিনদিন অপেক্ষা করুন। আমি সঙ্গে করে আপনাদের ওঁকারেশ্বর মহাদেব দর্শন করতে নিয়ে যাব। মহানন্দস্বামী বললেন — সেই ভাল। আমরা এই সাধু সম্মেলনে যোগ দিয়ে আমাদের জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করতে চাই।

পরদিন ভোরেই ঘুম ভাঙল। আজ সোমবার। শিবের বার। শুক্লা পঞ্চমী তিথি। সকাল সাতটা নাগাদ আমরা বিষ্ণুপুরীর ঘাটে গেলাম। সেখানে স্নান তর্পনাদি সেরে আমরা 'হর নর্মদে' ধ্বনি দিতে দিতে মন্দিরে ফিরে এলাম। দেখলাম সাধু সম্মেলন উপলক্ষে হাজার হাজার সাধু সন্ন্যাসীতে নর্মদার ঘাটগুলি ভরে গেছে। হয়ত রাত থেকে গাড়ীতে করে কাতারে কাতারে লোক আসছে। সাধু-সন্ন্যাসী দর্শনের জন্য বহু গৃহী নর-নারীও এসে উপস্থিত হয়েছে দেখলাম। রামদয়াল দৌড়ে এসে জানাল — জানেন একটিও ধর্মশালা ফাঁকা নেই। বহু লোক জায়গা না পেয়ে ফাঁকা মাঠে রাত কাটাবে। মোরটক্কা থেকে পুলিশ কোন গাড়ীকে ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। প্রায় ৯ কি.মি. রাস্তা লোক হেঁটে আসছে। বেলা বারোটা নাগাদ সম্মেলন শুরু হবে। আপনারা কোন চিন্তা করবেন না। বাবা আপনাদের সঙ্গে করে সম্মেলন স্থলে নিয়ে যাবেন। বুঝলাম রামদয়ালের বাবা ঠিকই বলেছিলেন — এই ভীড় কাটিয়ে আমাদের পক্ষে ওঁকারেশ্বরে যাওয়া দুঃসাধ্য। প্রত্যেকে ঘরে বসে যে যার ক্রিয়াকর্মে মন দিলাম। আমি প্রলয়দাসজী প্রদত্ত দিব্য গুরুর মন্ত্রমালা পাঠ করতে লাগলাম। প্রলয়দাসজী বলেছিলেন — এই দিব্যগুরুর মন্ত্র পাঠ করলে তপজপ যোগ ক্রিয়ার সমস্ত কিছু সূক্ষ্মভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে যায়। যে কোন সিদ্ধ বেদ মন্ত্রোচ্চারণের সমান শক্তি ঐ মন্ত্রমালায় নিহিত আছে। মৃত্যুকালে ঐ মন্ত্ররাজি কারো চিত্তপটে উদিত হলে সেই সুকৃতিবান সাধকের ব্রাহ্মী অবস্থা লাভ হয়। প্রলয়দাসজীকে দেখার জন্য মন আকুলি বিকুলি করছে। কিন্তু মনকে সান্ত্বনা দিলাম এই বলে যে যখন সময় হবে তখন তিনি নিশ্চয়ই দর্শন দেবেন।

এমন সময় রামদয়াল আমাদের ভোজনের জন্য নিয়ে এসেছে পরমান্ন। তখনও ইষদুষ্ণ। আমরা খেতে বসলাম। রামদয়াল আমাদের ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল যাতে কেউ এদিকে না আসে।

বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ রামদয়ালের বাবা এলেন আমাদের সম্মেলন স্থলে নিয়ে যেতে। মঞ্চের সামনেই আমাদের বসান হল।

প্রথম দিনের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করলেন শ্রীমৎ স্বামী প্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্‌ভাগবতের হিন্দীতে অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করার ফলে বৈষ্ণব সমাজে এঁর অখণ্ড প্রতিপত্তি।

প্রথম দিনের আলোচ্য বিষয় — ভক্তি ও জ্ঞান। সভাস্থলে গিয়ে দেখি, বহু বৈষ্ণবের সমাগম হয়েছে। মালা তিলক ঝোলা শোভিত প্রভুপাদদের চক্রাঙ্কিত ললাটে কারও হরিদ্রাবর্ণ রেখা, কারও কৃষ্ণরেখা, কারও বা কেবল গোপীচন্দনের ছাপ। বুঝলাম, সভাতে রামানুজ, মাধ্ব, বিষ্ণুস্বামী, গৌড়ীয়, পুষ্টিমার্গী সকল সম্প্রদায়েরই সমাবেশ ঘটেছে। বহু গেরুয়াধারী দণ্ডী সন্ন্যাসী এবং নিকটস্থ বিভিন্ন মঠ থেকেও অনেক সাধুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। বৈষ্ণব মহাজনরা যে কী অপরূপ কৌশল ও কসরতের সঙ্গে তাদের স্পর্শ বাঁচিয়ে সভামঞ্চে প্রবেশ করছিলেন, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

যাই হোক এক প্রস্থ নাম কীর্তনের পর সভার কাজ শুরু হল।

প্রথম বক্তা জনৈক কৃষ্ণদাস ব্রজবাসী ভক্তিসুধাকর। তিনি সভামণ্ডপ, সভাপতি এবং সমবেত ভক্তবৃন্দকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ দিয়ে প্রথমেই নিজেকে 'ভক্তদাসানুদাসস্য দাসঃ' এবং 'অধমাধম' ইত্যাদি ঘোষণা করে বললেন — "অক্ষজজ্ঞানকে অধঃকৃত করে যিনি অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে ব্রহ্মলোকেরও পরপারে বৈকুণ্ঠ ও

গোলোকে পরমসেব্য রূপে নিত্য বিরাজমান, সেই কেবল-মাধুর্য-বিগ্রহ অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণই জীবের পরম উপাস্য বস্তু। তিনি বিভু, জীব চিৎকণ-অণু। জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃত মূর্ত্তি। নারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে সিদ্ধান্ততঃ কোন ভেদ না থাকলেও তথাপি শৃঙ্গার-রস-বিচারে কৃষ্ণ-রূপ চরম উৎকর্ষতা লাভ করেছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার নামই ভক্তি। শাণ্ডিল্য সূত্রে আছে — সা পরানুরক্তি ঈশ্বরে। ভক্তরাজ নারদ বলেছেন, ভক্তি হল — স তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা। সুতরাং ব্রহ্ম-পরমাত্ম-প্রতীতির সম্বন্ধে যে শান্তরস তা নিতান্ত ক্ষুদ্র। জ্ঞানমার্গে যাঁরা বিচরণ করেন, তাঁরা স্বভাবতঃই ঈশ্বরের স্বরূপ না পেয়ে নির্বিশেষ, নিরাকার ইত্যাদি বলে নিবৃত্ত হন। জ্ঞানমার্গে ঈশ্বর লভ্য নন, ভক্তিমার্গে ব্যতীত ঈশ্বর লাভের আর কোন উপায় নাই। সনকাদি ঋষি, শিব, ব্যাস ও নারদ প্রভৃতি অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্মৈক্যজ্ঞানকে অনাদর করে কৃষ্ণকৃপোদিত অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলাত্মক রসবর্ণনাকে শ্রেয়ঃ বলে মনে করতেন। সর্বশাস্ত্র-রাজচক্রবর্তী শ্রীমদ্ভাগবত প্রকটিত করেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত ব্যতীত অন্যে যারা (অর্থাৎ মায়াবিদগণ) নিজেদেরকে মুক্ত বলে অভিমান করে তাদের বুদ্ধি শুদ্ধ নয়। তারা শম দমাদি অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন পূর্বক নিজেকে জীবন্মুক্ত বোধ করলেও শ্রীভগবানের পাদপদ্মকে অনাদর করায় তারা অধিকতর হীনাবস্থা প্রাপ্ত হয় —

আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥”

দ্বিতীয় বক্তা শ্রীমদ্ ভক্তিকুশল নরসিংহ মহারাজ। প্রভু বললেন ভক্তি প্রসিদ্ধা ভবমোক্ষণায়, ভক্তি ছাড়া ভবসমুদ্র হতে নিষ্কৃতির উপায় নাই। ভক্তি পথই পরম আদরণীয় শ্রেষ্ঠ পথ। যারা মায়াবাদের কোটিকন্টকরুদ্ধ দুরতিক্রম্য অসম্যক অর্বাচীন পথ পরিত্যাগ পূর্বক আশাবদ্ধ-সমুৎকণ্ঠাময়ী সরল সহজ ভক্তকোলাহল-মুখরিত শ্রৌতপন্থা অর্থাৎ ভক্তিমার্গের পথিক হয় তারাই প্রকৃত চতুর। শ্রীমদ্ভাবত উপদেশ দিয়েছেন (১০।১৪।৩), যারা জ্ঞানলাভের কিছুমাত্র চেষ্টা না করে — জ্ঞানে প্রয়াসসমুদপাস্য নমন্ত এব — নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রম ধর্মে অবস্থান পূর্বক ভক্তমুখে শ্রীভগবানের মহিমা শ্রবণ করে জীবন অতিবাহিত করে, শ্রীভগবান অখিল লোকে অজিত হয়েও তাদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন। গীতা মুখে স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখের শ্রীউক্তি — ভক্ত্যা মামভিজানাতি (১৮।৫৫) অহং ভক্তপরাধীনো। তিনি নিজমুখে স্বীকার করছেন যে, ভক্তির দ্বারাই তাঁকে জানা যায়, তিনি ভক্তের অধীন, এর চেয়ে জীবের পক্ষে আর পরম আশ্বাসের বাণী আর কি আছে? ভক্তি ও প্রেমের দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমের রসাস্বাদন সম্ভব হয়। চিনি হয়ে লাভ নাই, চিনির আস্বাদনেই সুখ। ভক্তি নববিধা। শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে শ্রীপ্রহ্লাদ কর্তৃক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর প্রতি এই নবলক্ষণা ভক্তির কথাই কীর্তিত ঃ

শ্রবণং কীতনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নব লক্ষণা॥

অর্থাৎ সদৈব শ্রীকৃষ্ণ কথা শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন প্রভৃতি নববিধ ভক্ত্যঙ্গ সাধনের দ্বারাই জীবন কৃতকৃত্য হয়। শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামীপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নামক মহাগ্রন্থে দৃষ্টান্ত দিয়েছেন — শ্রবণে পরীক্ষিৎ, কীর্তনে শুকদেব, স্মরণে প্রহ্লাদ, পদসেবায় লক্ষ্মী, পূজায় মহারাজ পৃথু, বন্দনায় অক্রুর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন এবং আত্মনিবেদনে মহারাজ বলি সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁরা নববিধা ভক্তির জ্বলন্ত বিগ্রহ। তাঁদের শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ নমস্কার।”

তৃতীয় বক্তার নাম শ্রীমদ্ সুদর্শন ব্রহ্মচারী। এই প্রভু বললেন — ‘প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভেদে ধর্ম দুই প্রকার বলে ভক্তিও দুই প্রকার। ফলানুসন্ধানের সঙ্গে যে ভক্তি উদ্রিক্ত হয় তা প্রবৃত্তিলক্ষণা বা সকাম ভক্তি আর ফলানুসন্ধান ত্যাগ করে যে ভক্তি উদ্রিক্ত হয়, তার নাম নিবৃত্তিলক্ষণা বা নিষ্কাম ভক্তি। নিষ্কাম ভক্তির দ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হলেও এবং তা ভক্তদের নিকট শ্রেয়োস্করী হলেও, ভক্তি যদি বনিগ্ বৃত্তিও হয়, তাহলেও তা নিষ্ফল হয় না। কারণ কাঁচা আম যেমন পাকা আমের কারণ হয় সেইরকম প্রবৃত্তিলক্ষণা ভক্তিও ভবিষ্যতে প্রেমনাম্নী ভক্তির কারণ হয়ে থাকে। এইজন্যেই ভক্তিপথের উৎকর্ষতা। যারা মায়াবাদের দ্বারা কবলিত সেই সমস্ত দুর্মতিগ্রস্ত জীবই ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের উৎকর্ষতা বর্ণনা করেন। মায়াবাদং অসৎশাস্ত্রং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। শঙ্করাচার্য মায়াবাদ প্রকটিত করে জীবকে পথভ্রষ্ট করেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখুন, হিরণ্যকশিপুর সেই ‘অমি

মৃত্যুহীন অব্যয় শুদ্ধ স্বরূপ' ইত্যাদি বাক্য এবং তৎকৃত ব্রহ্মস্তবে তাঁর ব্রহ্মজ্ঞান, নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞান প্রভৃতি বর্ণিত হলেও তিনি তিরস্কৃত ও অসুররূপে গণ্য হয়েছেন। বস্তুতঃ শাস্ত্রে অদ্বৈতবাদীদের অহংগ্রহ উপাসনা অর্থাৎ সোঽহং — আমি সেই ভগবান ইত্যাকার উপাসনা কঠোর ভাবে ধিকৃত। যাদবগণ যেরূপ পৌণ্ড্রক বাসুদেবকে উপহাস করেছেন, সেইরূপ শুদ্ধ ভক্তগণও অহংগ্রহ উপাসকগণকে ঘৃণিত বলে উপহাস করে থাকেন। শ্রীহনুমান তাই বলেছেন — কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবং পদমিচ্ছতি? অর্থাৎ এমন মূঢ় ব্যক্তি কে আছে যে, সে ভগবদ্দাস্য পরিত্যাগ করে প্রভু হবার ইচ্ছা করবে? প্রকৃত মুক্তজীব মাত্রই শ্রীভগবানের দাস। প্রভু যেমন দাসের সুখের জন্য প্রযত্ন করেন, শ্রীভগবানও আপন ভক্তের সুখের জন্য প্রযত্ন করেন। শ্রীভগবান আপন ভক্তকে নিজেই বরণ করে নেন এবং দেবদুর্লভ দর্শনসুখ দান পূর্বক ভক্তের নিকট অপ্রাকৃত লীলা প্রকট করে থাকেন। কঠ শ্রুতি বলেছেন — মেধা দ্বারা এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না, স্বাধ্যায় নিদিধ্যাসন ধ্যান ধারণা তপস্যাদি ভগবদ্-লাভে কার্যকরী পন্থা নয়। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্ (কঠ ১।২।২৩)। অর্থাৎ শ্রীভগবান যাঁকে বরণ করেন, সেই তাঁকে লাভ করতে পারে, তারই নিকট তিনি আপন ভাগবতী তনু প্রকট করেন। সাধারণতঃ প্রিয়তম ব্যক্তিই বরণীয় হয়। শ্রীভগবান যাঁর নিকট নিরতিশয় প্রিয় সেই তাঁর প্রিয়তম। ভক্তের নিকট শ্রীভগবানই একমাত্র প্রিয়তম। সুতরাং শ্রীভগবান ভক্তকে স্বয়ং দর্শন দান করেন। জ্ঞানমার্গীরা এই অলৌকিক সৌভাগ্য হতে বঞ্চিত।"

এইবার মঞ্চে এলেন চতুর্থ বক্তা গোস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিতিলক দাস। তিনি প্রথমেই সাধু, গুরু ও বৈষ্ণবদের চরণে কোটি কোটি প্রণাম নিবেদন করে আর্তি জানালেন — 'বৈষ্ণবগণের পাদপদ্ম-ধুলি না হতে পারলে অসমোর্দ্ধভূমিকা শ্রীবৃন্দাবনে গতি হয় না। মাদৃশ অধমাধমকে আপনারা কৃপা করুন।' এই বলে তিনি কিছুক্ষণ উচ্ছ্বসিত আবেগে ক্রন্দন করলেন। ক্রন্দনের বেগ স্তিমিত হলে মাইক্রোফোনের কাছে এসে ঘোষণা করলেন 'প্রভুগণ! আপনাদের মহাভাগ্য উপস্থিত। কেননা, আপনাদের কাল প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের আবির্ভাব-গৌরবে গৌরবান্বিত। তিনিই কলিযুগকে প্রেমযুগে পরিণত করেছেন। তিনি শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভক্তি একাধারে সাধন ও সাধ্যতত্ত্ব। শুদ্ধাভক্তি পরিপক্ক হলেই প্রেমের উদয় হয়। পরন্তু ভোগবাঞ্ছা বা মোক্ষবাঞ্ছারূপ স্বসুখতাৎপর্যের মলিনতা যে পর্যন্ত লেশমাত্রও অন্তরে সংলিপ্ত থাকবে, তাবৎ সেই হৃদয়ে পরমশুদ্ধা ভক্তিসুখের আবির্ভাব কদাচ সম্ভব হবে না, তাই ত শ্রীগৌরাঙ্গের নিজজন শ্রীমৎ রূপ গোস্বামীপ্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে লিখেছেন —

ভক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে।
তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

তাৎপর্য এই যে, অহৈতুকী সেবা বা ভক্তি ত দূরের কথা, মুক্তিসুখকে পিশাচীর ন্যায় অনর্থকর বলে বোধ হয়। জীবের চাই শরণাগতি, চাই সর্বানুকুল্যে কৃষ্ণ-সেবা। শ্রীভগবান তাঁর শরণাগত জীবকে সদৈব রক্ষা করেন। গজ-গ্রাহের উপাখ্যান স্মরণ করুন। কুম্ভীরের (গ্রাহের) আক্রমণে গজের যখন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন সে কাতরভাবে শ্রীভগবানের শরণ নিল। ভক্তবৎসল শ্রীহরি শ্রীসুদর্শন চক্র দ্বারা গ্রাহকে নিহত করে গজকে রক্ষা করলেন। প্রপন্ন ভক্ত এইভাবে শ্রীভগবানের কৃপা লাভ করেন। ভক্তিমার্গের বিশেষ উপাদেয়তা এই যে, যাঁরা আত্মসমাধিযোগবল দ্বারা বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করে শ্রীভগবানে প্রবেশ করেন তাঁদেরকে অধিক পরিশ্রম করতে হয়। পরন্তু শ্রীভগবানের সেবারূপ ভক্তিতে তত পরিশ্রম হয় না। ভক্ত অনায়াসে শ্রীভগবানে প্রবেশ করেন। শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে ৪৫ ও ৪৬ নম্বর মন্ত্রে এই রহস্যটি স্পষ্টীকৃত। ভক্তি সাধনার আর একটি গুহ্যতত্ত্ব নিবেদন করতে চাই। শ্রীলঘুভাগবতামৃতের 'ভক্তামৃত' নামক উত্তর খণ্ডে নির্ণীত হয়েছে — শ্রীহরিভক্ত সকলের মধ্যে প্রহ্লাদ শ্রেষ্ঠ, প্রহ্লাদ হতেও পাণ্ডবগণ শ্রেষ্ঠ ভক্ত। এতাদৃশ পাণ্ডবগণ হতেও কোন কোন যাদব শ্রেষ্ঠ। আবার সমস্ত যাদবগণের মধ্যে উদ্ধব শ্রেষ্ঠ, উদ্ধব হতেও ব্রজদেবীগণ বরীয়সী, কারণ শ্রীউদ্ধব মহাশয়ও সেই ব্রজদেবীগণের শ্রীচরণধূলি প্রার্থনা করেন। আবার এতাদৃশ ব্রজরমাগণের মধ্যে বার্ষভানবী শ্রীমতী রাধিকাই সর্বশ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণরস আস্বাদন করতে হলে শ্রীবার্ষভানবীর কৃপা চাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রাবলী, শ্রীবৃন্দা, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি সখিবৃন্দের অনুগত না হলে শ্রীমতী কৃপা করেন না। শ্রীবৈদগ্ধবিলাস গ্রন্থ তাই সাধন সঙ্কেত দিয়েছেন —

কৃষ্ণপ্রিয়াদাসীভাবং সমাশ্রিতঃ প্রযত্নতঃ।
তৎপরা পরমাগতি র্যা সদানন্দরূপিনী॥

হায় হায়, কবে আমার সেই সখীদের পরম আনুগত্যে থেকে দাসীভাবের রতি জন্মাবে? প্রভুগণ, বৈষ্ণবগণ, ভক্তগণ আমাকে কৃপা করুন।'

সম্মেলনে ভগবদ্‌ভক্তদের সাম্প্রদায়িক বক্তৃতা শুনতে শুনতে মনে বড় দুঃখ হল। এঁরা অহেতুক কেন জ্ঞান-গুরু শঙ্করাচার্যের নিন্দা করছেন? শুদ্ধ জ্ঞানের পথিক ও প্রবক্তা ছিলেন বলেই কি তাঁর উপর প্রভুপাদদের এত দ্বেষবুদ্ধি? অথচ এ কথা কে না জানেন যে বস্তুতঃ জ্ঞান ও প্রকৃত ভক্তিতে কোন বিরোধ নাই। ভক্তির পথ ভালবাসার পথ। কাউকে ঘনিষ্ঠভাবে অন্তরঙ্গভাবে না জানলে কি ভালোবাসা যায়? এই জানার নাম জ্ঞান। জলের মধ্যে যেমন গতি থাকে, দুইকে পৃথক করা যায় না, তেমনি জ্ঞানের মধ্যে ভক্তি এবং ভক্তির মধ্যে জ্ঞান অনুস্যূত থাকে। গীতাপাঠী মাত্রেই জানে যে গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিমান্ পুরুষের চরম অবস্থার যে বর্ণনা আছে, তা দ্বিতীয় অধ্যায়ের স্থিতপ্রজ্ঞের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু এক এবং অভিন্ন। জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ আরম্ভে ভিন্ন হলেও, পারদগুলি (Mercury) আদিতে ভিন্ন হলেও পরে যেমন তারা একত্রে মিলিত হয়, তেমনি ঐ দুই মার্গও শেষে একত্রে মিলে যায় এবং যে গতি জ্ঞানী প্রাপ্ত হন, ভক্তও অন্তে সেই একই গতি প্রাপ্ত হন।

এই সব তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝলেও প্রভুপাদদের একতরফা শঙ্কর-নিন্দা শুনতে শুনতে দুষ্ট বুদ্ধি জাগল। ভাবলাম যদি এই সভায় বলার সুযোগ পাই তাহলে এমন কিছু বলব যাতে প্রভুপাদদের কিঞ্চিৎ বায়ু ও পিত্ত প্রকুপিত হয়ে উঠে। বাবা, প্রলয়দাসজী ও সোমানন্দজীকে মনে মনে স্মরণ করে বললাম — 'তোমরাই আমাকে শিখিয়েছ দুনিয়া কথার অর্থ দ্বন্দ্ব। দ্বন্দ্ব এখানে থাকবেই। তাকে এড়িয়ে সকলের সঙ্গে হেঁসে কথা বলতে। বেকার বার্তালাপসে ক্যা ফয়দা' পরিক্রমাকারীর কাছে পরিক্রমা হল জ্ঞান সঞ্চয়ের পথ।' কিন্তু তা বলে প্রভুপাদদের একতরফা জ্ঞানগুরু শঙ্করের নিন্দা হজম করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই সভাপতির কাছে অপ্রাকৃত রসের রসিকদের সভায় মাদৃশ প্রাকৃতজন কিছু বলার অনুমতি চাইলাম। আমার গৌড় দেশীয় চেহারা এবং পরিক্রমাবাসী জেনে সভাপতি আমাকে বলার অনুমতি দিলেন।

মঞ্চে উঠে সকলের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে আমি প্রথমেই শুরু করলাম বেদমন্ত্র দিয়ে —

ওঁ শ্রদ্ধাং প্রাতর্হবামহে শ্রদ্ধাং মধ্যন্দিনং পরি।
শ্রদ্ধাং সূর্যস্য নিম্রুচি শ্রদ্ধাপয়হে নঃ॥ (ঋগ্বেদ ১০।১৫১।৫)

— শ্রদ্ধাকে আমরা প্রাতঃকালে আবাহন করি, শ্রদ্ধাকে আমাদের মধ্যাহ্নে আবাহন। সূর্য যখন অস্ত যান, তখনও আমরা শ্রদ্ধাকে আবাহন করি। হে শ্রদ্ধে, এখন আমাদেরকে শ্রদ্ধাময় কর।

বৈদিক ঋষিরা এই মন্ত্রে শ্রদ্ধার মহিমা কীর্তন করেছেন। কারণ, শ্রদ্ধাই সকল সাধনার মূলাধার। শ্রদ্ধাই মানুষকে নিঃশ্রেয়সের পথে প্রচোদিত করে, কল্যাণে উজ্জীবীত করে। তাই দেবতারা অসুরদের মধ্যে শ্রদ্ধা স্থাপন করেছিলেন — যথা দেবা অসুরেষু শ্রদ্ধামুগ্রেষু চক্রিরে।

শ্রদ্ধারই পরাকাষ্ঠা ভক্তি। ভক্তির মূল বীজটি শ্রদ্ধার মধ্যেই নিহিত। বেদকে যদি প্রভুরা কথঞ্চিৎ মান্য করে থাকেন, তাহলে 'তৃণাদপি সুনীচ' ও 'নিষ্কিঞ্চন' বলে অভিহিত বৈষ্ণবদের সভায় এভাবে আচার্য শঙ্করের নিন্দাবাদ করা সমীচীন হয় নি। বেদান্ত প্রতিপাদিত অদ্বৈততত্ত্বের নিন্দায় 'নির্মৎসর' বৈষ্ণবকুলের যে কী ইষ্টসিদ্ধি হল তা মাদৃশ প্রাকৃত জনের বোধগম্য হল না। সমবেত প্রভুপাদদের করকমলে পুষ্পার্ঘ্যের মত আমি আর একটি বেদমন্ত্র উপহার দিচ্ছি ঃ

ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ॥

(ঋগ্বেদ ৭।৫৯।১২, শুক্ল যজু ৩।৬০।১)

বেদে কোথাও স্পষ্টভাবে ভক্তি শব্দটির উল্লেখ নাই, তবে লক্ষণাতে আছে। উদ্ধৃত মন্ত্রে 'সুগন্ধিং' শব্দ লক্ষণাতে ভক্তির বাচক। ভক্তি যে অমৃতাত্মক জ্ঞানের পূর্ববৃত্ত তা এখানে যজামহে পদের দ্বারাই অভিব্যক্ত। মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাৎ — এই শেষ বাক্যের দ্বারা মুক্তি অর্থাৎ জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞানই যে জীবের অভীষ্ট তত্ত্ব তা বৈদিক ঋষিরা ঘোষণা করছেন। তাঁদের মতে মৃত্যু হতে মুক্তি কি? না — অমৃতত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই মন্ত্র

বা অন্য কোন বেদমন্ত্রেও ত সখীভাব উপাসনার কথা নাই! এ সম্বন্ধে প্রভুপাদদের কি উত্তর? বৈদিক ঋষিদের অভয় অমৃত বাণীই ত আচার্য শঙ্করের জীবন-দর্শনে ধ্বনিত, তবে তাঁর উপর অহেতুক ক্রোধ কেন?

আমার পূর্ববর্তী বক্তারা প্রায় সকলেই কেবল ভাগবত থেকেই শ্লোকাদি উদ্ধৃত করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, জ্ঞান নয়, কেবল ভক্তির দ্বারাই অনায়াসে এবং অচিরে চিত্তশুদ্ধি বশতঃ ভগবদ লাভ হয়। ভাগবত আদৌ বেদব্যাসের রচিত নয়, পণ্ডিতরা অনেকেই এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, তবে ভাগবত যখন আপনাদের এতই মান্য তাতে একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবেন, সেখানে পরস্পর বিরোধী এত কথার সন্নিবেশ ঘটেছে যে ভাগবত কথিত ভক্তির মাহাত্ম্য সূচক বর্ণনাকে অর্থবাদ * বলেও মনে করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৫ ও ৪৬ নম্বর মন্ত্র দুটির উল্লেখ করা যেতে পারে। আমার পূর্ববর্তী এক বক্তাও এই মন্ত্র দুটি উদ্ধৃত করে দেখাতে চেয়েছেন যে, যাঁরা আত্মসমাধি যোগে অর্থাৎ শঙ্কর-নির্দিষ্ট ও ঋষি-প্রতিপাদিত তপস্যাদির দ্বারা বলিষ্ঠা প্রকৃতিকে জয় করে ভগবানে প্রবেশ করেন, তাঁদেরকে অধিক পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু ভক্তদেরকে কোন তপস্যাজনিত পরিশ্রম করতে হয় না, ভক্তিবলে তাঁরা নাকি অনায়াসে ভগবানে প্রবিষ্ট হন। আপনাদেরকে বেদবেদান্ত প্রভৃতি অন্যান্য প্রামাণ্য শাস্ত্র হতে প্রমাণ দেখিয়ে বিড়ম্বিত করতে চাই না, আপনাদের পরম মান্য ভাগবতেরও ঐ তৃতীয় স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়ের উনিশ নম্বর মন্ত্রটি অবলোকন করুন, সেখানে স্বয়ং ব্রহ্মা বলেছেন 'তপস্যা দ্বারাই মানুষ সর্বভূতগুহাবাসী পরজ্যোতিঃ ভগবান অধোক্ষজকে অনায়াসে এবং শীঘ্র লাভ করতে পারে।

ভগবতের একস্থানে ভগবান কপিল মুনি (যাঁকে আপনারা অবতার বলে মানেন) বলেছেন বটে যে,

বাসুদেব ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানং যদ্ ব্রহ্মদর্শনং॥ (৩।৩২।৩৩)

অর্থাৎ ভগবান বাসুদেবের প্রতি প্রয়োজিত ভক্তি শীঘ্র (আশু) বৈরাগ্য এবং ব্রহ্মদর্শন রূপ জ্ঞান উৎপন্ন করে।

কিন্তু ঐ ভাগবতেই আবার কপিলের উক্তি বলে বর্ণিত হয়েছে — 'প্রকৃতিপুরুষ বিবেক দ্বারাই লোক অনায়াসে এবং শীঘ্র বৈরাগ্য ও জ্ঞানলাভ করতঃ কৈবল্য প্রাপ্ত হয়'।

আবার দু একটি উদাহরণ দিই। আপনাদের ভাগবতেই দেখছি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখের উক্তি — সাংখ্যজ্ঞান দ্বারা মানুষ বৈকল্পিক অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চ রূপ ভ্রমকে সদ্য পরিত্যাগ করে (১১।২৪।১)। যেমন আকাশে সূর্যোদয় হলে অন্ধকার থাকতে পারে না, তেমনি সাংখ্য বিচার সম্পন্ন ব্যক্তির বৈকল্পিক ভ্রম থাকতে পারে না (৪।২৪।২৮)। ভগবান রুদ্রও ভাগবতে বলছেন — এই সংসারে সমস্ত শ্রেয় সমূহের মধ্যে জ্ঞানই পরম নিঃশ্রেয়স (সাধন)। জ্ঞানরূপ নৌকা দ্বারাই এই সংসার রূপ দুষ্পার ব্যসনার্ণবকে সুখে পার হওয়া যায় (৪।২৪।৭৫)।

আমার পূর্ববর্তী বক্তারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে জ্ঞানমার্গের এত নিন্দা করে গেলেন, কিন্তু আপনাদের 'সর্বশাস্ত্র রাজচক্রবর্তী' ভাগবতেই যে অনেক স্থলে জ্ঞানমার্গের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে তা কি প্রভুপাদদের চোখে পড়ে নি? আপনারাই আমাকে বলে দিন, ভাগবতের কোন অংশটি মানব আর কোন্ অংশটি উপেক্ষা করব? কোন্ অংশটি মানলে অরসজ্ঞ কাকের নিম্বফল ভক্ষণ সার হবে, আর কোন্ অংশটি মানলে রসজ্ঞ কোকিল হয়ে প্রেমাম্রমুকুলের রসাস্বাদন করা যাবে?

এ কথা সত্য যে আমি একজন শঙ্করপন্থী সন্ন্যাসী। আমি যে শঙ্কর প্রতিপাদিত মায়াবাদ ও অদ্বৈতপথের একজন গর্বিত পথচারী একথা স্বীকার করতেও আমার কোন কুণ্ঠা নাই। আমার ভাগ্যে একসঙ্গে এত সিদ্ধ মহাজনের দর্শন লাভ আর কখনও ঘটবে কি না জানি না। তাই এই সুযোগে আপনাদের শ্রীচরণে আমার

---

* অর্থবাদ — অহেতুক স্তুতি বা নিন্দাবাচক বচনের আতিশয্যকে অর্থবাদ বলে। 'প্রাশস্ত্য নিন্দান্যতরপরং বাক্যং অর্থবাদঃ' অর্থাৎ বিহিত অর্থের স্তুতিপর বাক্য অথবা নিন্দাপর বাক্য 'অর্থবাদ' শব্দের বাচ্য। গুণবাদ, অনুবাদ ও ভূতার্থবাদ ভেদে অর্থবাদ তিনভাবে বিভক্ত। 'প্রমাণান্তর বিরুদ্ধার্থজ্ঞাপকঃ শব্দঃ গুণবাদঃ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ বিরুদ্ধে অর্থের বোধক বাক্য গুণবাদ নামে প্রসিদ্ধ। যেমন, আলোচ্য অংশে ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ের ৪৫ ও ৪৬ নম্বর মন্ত্রে যে বলা হয়েছে — আত্মসমাধিযোগের অনুষ্ঠানে অত্যন্ত পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু ভগবানের সেবারূপ ভক্তিতে কোন পরিশ্রম করতে হয় না, কৃচ্ছ্রসাধন বা তপস্যা করতে হয় না — এ সব প্রত্যক্ষ প্রমাণে উপলব্ধ হয় না। অতএব ঐরূপ উক্তি গুণবাদ নামক অর্থবাদের উদাহরণস্থল।

আরও কিছু ধৃষ্ট বক্তব্য নিবেদন করছি।

জ্ঞান যদি কিছু নয় এবং মুক্তি যদি 'পিশাচী' হয় তাহলে ভাগবতের প্রথমেই (১। ৩।৪০) কেন বলা হল —'নিশ্রেয়সায় লোকস্য, লোকের নিঃশ্রেয়স্ অর্থাৎ মুক্তিলাভের জন্যই বেদব্যাস এই গ্রন্থ রচনা করেছিলেন'? ঐ শ্লোকের উপসংহারেই আছে — কৈবল্যৈকপ্রয়োজনম্ — অর্থাৎ প্রতিপাদ্য তত্ত্ব হল একমাত্র কৈবল্য। ভক্তিসহকারে শ্রবন মনন ও পাঠ করলে বিচারপরায়ণ মানুষ বিমুক্ত হয়। এই গ্রন্থ শ্রবণের পর পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলেছিলেন যে তিনি সিদ্ধ হয়েছেন। 'হে ভগবান! আমি তক্ষকাদির দংশন বা মৃত্যু হতে আর ভয় পাই না। কেননা, আপনার প্রদর্শিত অভয় ও নির্বাণব্রহ্মে আমি প্রবিষ্ট হয়েছি'। টীকাকার শ্রীধর স্বামী শ্লোকটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন — 'ঐ নির্বাণ কৈবল্যরূপ। সেই হেতু তা অভয়'। কাজেই পরীক্ষিৎ-এর নিজের উক্তিতেই দেখা যাচ্ছে, তিনি বলছেন যে তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন, নির্বাণ বা কৈবল্যলাভ করে ব্রহ্মে প্রবিষ্ট হয়েছেন। সূতও স্বীকার করেছেন যে, পরীক্ষিৎ ব্রহ্মভূত হয়েছিলেন (ভাগবত ১২।৬।১০-১৩)। এছাড়া ঐ একই গ্রন্থে অন্যত্র বলা হয়েছে — 'ভাগবতের দশ লক্ষণের একটি মুক্তি (২।৯।৪৩, ২।১০।১-২)'।

এইভাবে উপক্রম ও উপসংহার * তথা লক্ষণ নির্দেশ ও দৃষ্টান্ত হতে নিশ্চিতরূপে জানা যাচ্ছে যে ভাগবতের একমাত্র উদ্দেশ্য জীবকে নিঃশ্রেয়স, কৈবল্য, মুক্তি, নির্বাণ বা সিদ্ধিপ্রাপ্ত করানো, জীবকে ব্রহ্মে প্রবেশলাভের দিগ্‌নির্দেশ দিয়ে ব্রহ্মভূত করা। পরাভক্তি লাভের পথ নির্দেশ বা তার লক্ষণ পরাভক্তি — এ কথা ভাগবতের কোথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়নি। বরং মুক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে — 'মুক্তিঃ হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ' (২।১০।৬) অর্থাৎ অবিদ্যা অধ্যস্ত অন্যথা রূপ পরিত্যাগ করে স্বরূপে বিশেষভাবে স্থিতিলাভই মুক্তি বা কৈবল্য। ভাগবতেই দেখা যায় ভগবান কপিলদেব বলছেন —

যদা রহিতমাত্মানং ভূতেন্দ্রিয়গুণাশয়ৈঃ।
স্বরূপেণ মায়াপেতং পশ্যন্ স্বারাজ্যমৃচ্ছতি॥ (৩।১০।৩৩)

অর্থাৎ যখন নিজেকে ভূতেন্দ্রিয় গুণাশয় রহিত এবং সেই স্বরূপেই আমার সঙ্গে একীভূত বলে উপলব্ধি করে তখন জীব স্বরাজ্য লাভ করে, নিজ চিৎস্বরূপে স্থিত হয়।

প্রভুপাদরা এর পরও কি বলবেন, জীবব্রহ্মৈক্যজ্ঞান রূপ আলোকপথের দিশারী আচার্য শঙ্কর ও তাঁর অনুবর্তী জ্ঞান-তাপসরা পণ্ডিত? 'জ্ঞানমার্গীরা হীনবস্থায় পতিত হন — এ কথা কি ভাগবত ভক্তদের বলা সাজে?

একজন বক্তা গজ-গ্রাহের যুদ্ধের বিবরণ দিয়ে বলেছেন গজ যখন ভগবানের শরণাগত হল, তখন ভগবানের সুদর্শন চক্র গ্রাহকে খণ্ড বিখণ্ড করে গজকে রক্ষা করলেন, ভগবান এইভাবে শরণাগত ভক্তকে রক্ষা করেন। বক্তার ভাবখানা এই যে জ্ঞানী ভগবানের কোন সাহায্য পান না। সুতরাং ভক্ত জ্ঞানীর চেয়ে তথা ভক্তি জ্ঞানের চেয়ে অনেক বড়। প্রভুপাদ প্রদত্ত ঐ আখ্যায়িকা যদি আদৌ বেদব্যাসের রচনা হয় তাহলে বরং ঐ গল্প জ্ঞানপথেরই পুষ্টিসাধন করছে। কারণ ভেবে দেখুন ঐ গজ কে? গজ কথার অর্থ কি? গচ্ছতীতি 'গ', জায়তে ইতি 'জ'। গশ্চাসৌ অশ্চেতি অর্থাৎ যা গমন করে তাই 'গ'। দেহাৎ, দেহান্তরং গচ্ছতি জীবঃ। জীবই এক দেহ হতে অন্য দেহে গমনাগমন করে। জা ধাতু প্রজননে। জায়তে মানে জন্মগ্রহণ করে। জীবেরই জন্মমৃত্যু হয়। কাজেই ঐ আখ্যায়িকায় রূপকের আবরণে গজ শব্দ জীবের প্রতীক বা দ্যোতক। গ্রাহ হল মহামোহ। গল্পের মর্মার্থ — শরণাগত গজরূপী জীবকে ভগবান মহামোহরূপী গ্রাহের কবল থেকে রক্ষা করেন সুদর্শনের সাহায্যে। ঐ সুদর্শন কথার অর্থ কি? সুদর্শন অর্থাৎ কিনা সু — সুষ্ঠু বা সম্যগ্ দর্শন। জ্ঞানং সম্যগ্ বেক্ষণং — সম্যগ্ দর্শনই ত জ্ঞান। কাজেই গল্পের বহিরাবরণ বিশ্লেষণ করতেই দেখা গেল, সম্যগ জ্ঞান — স্বরূপজ্ঞানই জীবকে (গজকে) মহামোহরূপী গ্রাহ অর্থাৎ মায়িকমলের গ্রাস থেকে রক্ষা করে। একমাত্র ব্রহ্মই অখণ্ড চৈতন্যরূপে পরিব্যাপ্ত — এই স্যমগ্ জ্ঞানলাভেই জীব শাশ্বত শান্তির অধিকারী হয়। এ সম্বন্ধে গীতার

* উপক্রম ও উপসংহার — শাস্ত্রকারগণ কোন গ্রন্থের তাৎপর্যবোধের জন্য উপক্রমোপসংহারাদি ছয়টি লিঙ্গ নির্দেশ করেছেন। যথা (ক) উপক্রম উপসংহার, খ) অভ্যাস, গ) অপূর্বতা, ঘ) ফল ঙ) অর্থবাদ এবং চ) উপপত্তি (যুক্তিযোজনা)। এই ছয়টি দ্বারা প্রস্তাব তাৎপর্য এবং শাস্ত্র তাৎপর্য বুঝা যায় বলে এইগুলি লিঙ্গ নামে অভিহিত। যেমন ধূমজ্ঞানে যদি অগ্নির জ্ঞান জন্মে তাহলে ধূমকে অগ্নির লিঙ্গ বলা যাবে। উপক্রম = আরম্ভ, উপসংহার = সমাপ্তি। আরম্ভকালের বাক্য ও সমাপ্তি কালের বাক্য যদি একরূপ বা একার্থবাচক হয়, তবে বুঝতে হবে সেই কথাটা বক্তার প্রতিপাদ্য বিষয়।

প্রসিদ্ধ উক্তি — জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরোণাধি গচ্ছতি। (৪। ৩৯)

জ্ঞানেই শান্তি, জ্ঞানেই বন্ধনের অবসান, জ্ঞানের দ্বারাই সচ্চিদানন্দতত্ত্বে পর্যান ও পর্যবসান ঘটে। ভক্তবৃন্দকে আমি সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, জ্ঞানমার্গে আত্মদর্শনের জন্য জ্ঞানবিচারের কথা যে পুনঃ পুনঃ বলা হয়, তা প্রকৃত ভক্তিও বটে। সাধারণতঃ ভক্তকূল 'ভক্তি' বলতে যা বুঝেন, সে ভক্তি বেদাদি সম্মত ভক্তি নয়। ঋষি প্রণীত শাস্ত্রে কোথাও 'শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাসত্ব', 'নিত্যদাসীত্ব' বা 'চিরকৈঙ্কর্যের' কথা আম্নাত হয়নি। পদলেহন ও দাসত্বের ভাবকে ভক্তি বলে না। নৃত্য গীত, কেলি-কীর্তন, অশ্রুপাত এবং মূর্চ্ছাদি দশাপ্রাপ্তির অভিনয় ভক্তির পরাকাষ্ঠা নয়। শাস্ত্রমুখে ঋষিরা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সম্পূর্ণভাবে ভোগের ইতি না ঘটলে অর্থাৎ মন বাসনাশূন্য না হলে প্রকৃত ভক্তি — যা জ্ঞানের সমার্থক — তা কখন উৎপন্ন হতে পারে না। বেদাদি শাস্ত্রের কথা দূরে থাক, গীতাতেই আপনাদের আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদের শ্রেণী বিন্যাস করতে গিয়ে যা বলেছেন তা বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে তা আমার বক্তব্যেরই পরিপোষক। আপনারা সবাই জানেন, শ্রীকৃষ্ণের মতে ভক্ত চার প্রকার — আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী। আর্ত ভক্তের উদাহরণ যেমন — মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত রাজা সুরথ এবং সমাধি নামক বৈশ্য। সুরথের দেবী আরাধনার মূলে ছিল শত্রুজয়, হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের কামনা এবং সমাধি চেয়েছিলেন স্ত্রী-পুত্রদের হৃদয় জয় করতে। ইক্ষাকু এবং যুধিষ্ঠির প্রভৃতি রাজন্যবর্গের যজ্ঞানুষ্ঠান প্রভৃতির মূলে ছিল স্বর্গপ্রাপ্তির কামনা। তাঁরা অর্থার্থী ভক্তের উদাহরণস্থল। তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায়, ভৃগু পিতা বরুণের মতে কোথা হতে এই প্রাণীপুঞ্জের উৎপত্তি হয়েছে, কি ভাবে তারা বেঁচে আছে এবং অন্তেই বা তারা কিসের মধ্যেই বিলীন হয় — এই তত্ত্ব জানার জন্য অন্ন, প্রাণ, মনঃ, বিজ্ঞান ও আনন্দের স্বরূপ বিচার করেছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখবেন, শ্বেতকেতু পিতা উদ্দালক আরুণির উপদেশ ক্রমে, এক টুকরো লৌহকে জানলে যেমন লৌহজাত সমস্ত পদার্থের ভাব ও ধর্ম জানা যায়, তেমনভাবে সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের মূল অনুসন্ধানে রত হয়েছিলেন। ভৃগু ও শ্বেতকেতু যে নিষ্ঠা নিয়ে রহস্য অনুসন্ধান করতে চেয়েছিলেন, তার মূলে ছিল কেবল জানবার ইচ্ছা। আর্ত অর্থার্থীদের মত তাঁদের নিষ্ঠা কামনা জর্জরিত নয়। তাঁরা জিজ্ঞাসু ভক্তের উদাহরণস্বরূপ।

মহাভারতের শান্তিপর্ব দেখবেন, কিভাবে ব্যাস ও জনকের উপদেশে শুক সেই চরম সত্যকে জেনে জিজ্ঞাসার পরিসমাপ্তি ঘটিয়েছিলেন তার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, দেবকীনন্দন কৃষ্ণ ঘোর নামক ঋষির দীক্ষাবীর্য প্রভাবে দৃশ্যপ্রপঞ্চের অনিত্যতা বুঝে আত্মনিরত হতে পেরেছিলেন। এই শুক ও শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানীভক্ত পদবাচ্য।

আর্তভক্তের দুঃখ নিবারণের কামনা থাকে, অর্থার্থীর থাকে সুখ প্রাপ্তির আকাঙ্খা। জিজ্ঞাসু ভক্তের তেমন কোন বাসনা না থাকলেও জানবার ইচ্ছা দ্বারা তাঁরা চালিত হন বলে তাঁদের ভাবকে সকাম বলা যায়। কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তাঁর জানবার বাসনাও থাকে না, তিনি কোন সূক্ষ্ম কামনারও দাস নন। এ জন্য গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বললেন — তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে (৭।১৭) অর্থাৎ উক্ত চার প্রকার ভক্তের মধ্যে একমাত্র জ্ঞানীভক্তই আমার সঙ্গে নিত্যযুক্ত হয়। তত্ত্ববিৎ জ্ঞানীভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীকৃষ্ণ ও শুক প্রভৃতিরা তত্ত্বানুসন্ধানের পথে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে তাঁদের স্ব স্ব আত্মাই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত, আত্মাই সোম অর্থাৎ অমৃতস্বরূপ। যৎ যৎ বস্তু দৃষ্টিপথে ভাসমান তৎসমুদায়ই সেই একই পরম তত্ত্বের প্রকাশ মাত্র। তাঁরা জগতের মধ্যে নিজেকে (আত্মা) এবং নিজের মধ্যেও জগৎকে উপলব্ধি করে কৃতকৃত্য হয়েছিলেন। তাঁদের সেই মহত্তম সাধনার নাম আত্মযাগ বা সোমযাগ। শুক ও শ্রীকৃষ্ণ যেমন আত্মযাজী, সোমযাজী, তেমনি ব্রহ্মজ্ঞ মাত্রেই আত্মযাজী। অদ্বৈতবেদান্তের সাধনা মূলতঃ আত্মযাগ। এই আত্মযাগ অর্থাৎ ব্রহ্মবোধ নিজের অমৃতস্বরূপ স্থিতিলাভেরই অপর নাম অহংগ্রহ উপাসনা। কাজেই আত্মাকে সর্বত্র সর্বকালে অখণ্ড সম ও একরস বলে অনুভব করা যে অহংগ্রহ উপাসনার ফল, সেই মহত্তম সাধনা প্রভুপাদরা বলছেন বলেই 'ধিকৃত' হয়ে যাবে না। তাঁরা জেনে রাখুন, যে জ্ঞান বিচার ও তত্ত্বানুসন্ধানের ফলে ঐ চরম অনুভূতি হয় তাকেই গীতাতে বলা হয়েছে 'একভক্তিঃ'। এরই অপর নাম পরাভক্তি।

আমার পূর্ববর্তী এক বক্তা অহংগ্রহ - উপাসনাকে ব্যঙ্গ করার জন্য হনুমানের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে বলতে চেয়েছেন — এমন, মূঢ় ব্যক্তি কে আছে যে ভগবদ্দাস্য পরিত্যাগ করে প্রভু হবার ইচ্ছা করবে?

ভক্তজনোচিত কথাই বটে! কিন্তু চারিবেদেই যে দেখেছি হনুমৎ-বাক্যবিরোধী ভাবধারাতেই পরিপূর্ণ! সাধারণ ভক্ত তো দূরের কথা, স্বয়ং হনুমানেরও যাঁদেরকে 'মূঢ় ব্যক্তি' বলতে ধৃষ্ঠতা হবে না, সেই বৈদিক ঋষিরা অপরোক্ষানুভূতির পরম ভূমিতে উঠে সমস্বরে নিজেদের ভূমিত্ব ও বিভুত্ব ঘোষণা করে গেছেন — যথা, 'অহম্ ওষধীষু অহং বিশ্বেষু ভুবনেষু অন্তঃ' (ঋগ্বেদ), 'অহম্ অদ্মি পিতুষ্পরি মেধা মৃতস্য জগ্রহ, অহং সূর্য ইবাজনি' (সামবেদ), অহম্ পরস্তাৎ অহম্ অধস্তাৎ যদন্তরীক্ষঃ য অসৌ আদিত্যে পুরুষঃ, স অসৌ অহম্ (যজুর্বেদ), অহং জজান পৃথিবীম্ উত দ্যাম্ অহম্ ঋতুরজনয়ং সপ্তসিন্ধূন্ (অথর্ববেদ)।

শাস্ত্রের যথার্থ, প্রকৃত মর্ম নির্ণয়ের জন্য, পূর্ব মীমাংসার রীতি অনুযায়ী ছয়টি উপায় নির্দিষ্ট আছে, যথা — শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ, স্থান ও সমাখ্যা। তার মধ্যে 'অর্থ-বিপ্রকর্ষ, অর্থের ব্যবধানবশতঃ, পূর্বাপেক্ষা পরেরটি দুর্বল অর্থাৎ শ্রুতি হতে লিঙ্গ দুর্বল, লিঙ্গ হতে বাক্য দুর্বল, বাক্য হতে প্রকরণ, প্রকরণ হতে স্থান, স্থানাপেক্ষা সমাখ্যা দুর্বল। সুতরাং মহামুনি জৈমিনি কথিত সিদ্ধ রীতি অনুসারে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাণী বেদবাক্য দ্বারা যে হনুমৎ বাক্য খণ্ডিত ও নিরস্ত হল, তা সহজেই অনুমেয়। বৈষ্ণবরা বেদবাক্য মান্য করেন কি না জানি না, কোন কোন বৈষ্ণব প্রভুকে বলতে শুনি তাঁদের ধর্ম নাকি 'বেদবাহ্য ও বেদাতীত'। তাই যদি হয় সেক্ষেত্রেও প্রভুদের নিস্তার নাই। হনুমানের ঐ উক্তির চেয়ে নিশ্চয়ই তাঁরা তাঁদের ইষ্ট শ্রীকৃষ্ণের উক্তিকে মান্য করবেন। তিনি কিন্তু গীতাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন — আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ (৭।১৮) — সমাহিত চিত্ত জ্ঞানীর 'আমি স্বরূপতঃ ভগবান বাসুদেব — অন্য কিছু নই' — এই বোধ দৃঢ় থাকে। এই রকম জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয়। একটু আগে আত্মযাগ সাধনার যে মূল রহস্য ব্যাখ্যা করলাম, সেই গুহ্য সংকেতটিও শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী শ্লোকে পরিস্ফুট করে দিয়ে মন্তব্য করেছেন, বহু জন্মের সাধনার ফলেই (বহূনাং জন্মজন্মান্তে) 'সমুদয় জীবজগৎ বাসুদেব অর্থাৎ আত্মার প্রকাশ (বাসুদেবঃ সর্বমিতি)' এইরূপ জ্ঞান জন্মে থাকে। যে তত্ত্ববিৎ মহাত্মা এই দিব্য বোধির অধিকারী হন, শ্রীকৃষ্ণের ভাষায় সেরূপ মহাত্মা শুধু দুর্লভ নন — 'সুদুর্লভঃ'। স্বয়ং বেদপ্রমাণ এবং কৃষ্ণবাক্যানুসারে দেখা যাচ্ছে, হনুমান কথিত ভগবদ্দাস্য নয় ব্রহ্মস্বরূপতা লাভই জীবের পরিণাম ও লক্ষ্য।

প্রভুপাদদের কাছে নিবেদন, ভাবের ঘোরে কোন মন্তব্য করা উচিত নয়। তাঁদের কোন কথা তাঁদের ইষ্টবাক্যেরই বিরোধী হচ্ছে কিনা তা একটু ভেবে চিন্তে বলাই ভাল। তাঁরা যেভাবে ভক্তির অভিনব ব্যাখ্যা প্রদান করেন তাকে একভক্তি বা প্রকৃত ভক্তি বলা যায় না। তাঁরা দয়া করে অবহিত হোন যে, শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে যে 'বাসুদেবঃ সর্বমিতি' অর্থাৎ স্বরূপ অনুসন্ধানের পথে স্বরূপ প্রতিষ্ঠাকে 'একভক্তিঃ' বলে প্রশংসা করেছেন, আচার্য শঙ্করও সেই একই কথাই বলেছেন তাঁর রচিত 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে —

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ৩২॥

অর্থাৎ মুক্তিলাভের যত রকম পথ আছে, তার মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ পথ, তবে এই উক্তি হল — স্বরূপের অনুসন্ধান।

একই কথা কৃষ্ণ বললে মান্য আর শঙ্করাচার্য বললে 'ঘৃণ্য' এ কিরম কথা? এ কি সত্যের অপলাপ ও ভাবের ব্যভিচার নয়?

ইতিপূর্বে তৃতীয় বক্তা বেশ রস দিয়ে বলেছেন যে ভক্তি যদি বণিগ্ বৃত্তিও হয় তবুও তা নিষ্ফল হয় না, কামনা বাসনা পূরণের আশা নিয়েও কেউ যদি ভগবানের ভজনা করে তবুও সেই ভক্তি একদিন ভগবদ্-প্রাপ্তির উপায় প্রেমে পরিণত হবে! তাঁর এই উক্তিরও আমি প্রতিবাদ করি। কারণ তাঁর এই ব্যাখ্যা শাস্ত্রানুযায়ী নয়। কারণ শাস্ত্রে আছে, যে ভক্তির দ্বারা ঈশ্বর লভ্য হন, কামনা বাসনা সম্পূর্ণ ক্ষয় না হলে সেই ভক্তির উদয় হয় না। বেনিয়াবুদ্ধিসম্পন্ন ভক্তির ভড়ং শাস্ত্রে নিন্দিত। বক্তা প্রভুপাদ যদি ঐ তত্ত্বটি ভাবদৃষ্টিতে অনুভব করেছেন বলেন, তাহলে আমিও বলতে চাই, আমিও ভাবদৃষ্টিতে দেখেছি ঐ সব তথাকথিত ভক্তকে দেখে ভগবান ত দূরের কথা, দেবমন্দিরের সামান্য দেবতাগণই মন্দির ছেড়ে উর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে যান! কারণ, ঐ ধরণের ভক্তদের হাতে থাকে পাঁচ সিকা পয়সার ফুল ও মিষ্টির ডালা কিন্তু অন্তরে থাকে একডোল কামনা

বাসনা পূরণের আর্জি। সামান্য ডালাটকু গ্রহণ করলেই ডোলপ্রমাণ বাসনা পূরণ করতে হবে, এই ভয়ে দেবতারাও যে সন্ত্রস্ত। সাধে কি আর তুলসীদাসজী বলেছেন যে,

তুলসী ইয়ে সংসার মেঁ কাঁহাসে ভক্তি ভেট্,
তীন্ বাতসে লটপট হ্যায় দামড়ি চামড়ি পেট্।

— ধন, শিশ্ন ও উদর এই তিনের চিন্তাতে যারা লটপট্ খাচ্ছে, তাদের ভাগ্যে, আর ভক্তির দেখা কোথা থেকে মিলবে। অত্যন্ত খাঁটি কথা, হক্ কথা।

দ্বিতীয় বক্তা পরম পুলক ভরে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৫ নম্বর মন্ত্রের আংশিক উদ্ধৃতি দিয়ে বলতে চেয়েছেন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি অর্থাৎ ভক্তির দ্বারাই আমাকে জানা যায়।' 'জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা যায় না', ভক্তির মহত্ত্ব প্রদর্শনই বক্তার উদ্দেশ্য। কিন্তু মন্ত্রটি বিশ্লেষণ করলেই বুঝা যাবে বক্তার ব্যাখ্যা ও উপলব্ধি ঠিক নয়। উদ্ধৃত শ্লোকাংশের অব্যবহিত পূর্বের শ্লোকটি হল.

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ (১৮।৫৪)

শ্রীধরস্বামী * উক্ত শ্লোকের টীকা করেছেন — ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যোনাবস্থানস্য ফলামহ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি নচাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃতবিক্ষেপাভাবাৎ সর্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরাং মদ্ভক্তিং লভতে— 'আমি ব্রহ্মস্বরূপ - সোঽহং' এই বোধে যিনি প্রতিষ্ঠিত হন, তিনি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্যও আকাঙ্ক্ষা করেন না। দেহাভিমান ও রাগদ্বেষাদি শূণ্য সেই যতি সর্বত্র সমদর্শনের ফলে সর্বভূতে মদ্বিষয়ক ধ্যান অর্থাৎ ব্রহ্মদৃষ্টি রূপ পরম ভক্তি লাভ করেন।

শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, এই রকম পরম ভক্তির দ্বারাই 'আমাকে' জানা যায়—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ (১৮।৫৫)

শ্রীধরস্বামী টীকা করেছেন — তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি, কথং ভূতং যাবান্ সর্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্তথাভূতং, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতঃ জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ — অনন্তর সেই পরম ভক্তি প্রভাবে সেই যতি আমার সর্বব্যাপিত্ব ও সচ্চিদানন্দত্ব জ্ঞাত হয়ে, সেই জ্ঞানেরও উপরম বা বিশ্রান্তি ঘটলে আমাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ পরমানন্দরূপ প্রাপ্ত হন (কথং ভূতং — কেমন করে? কি ভাবে? যাবান্ সর্বব্যাপী যশ্চাস্মি — আমি যে প্রকার এবং যাহা তাদৃশ আমাকে জানিয়া অর্থাৎ আমি উপাধিকৃত ভেদবিশিষ্ট কিন্তু স্বরূপতঃ নিরুপাধি, সর্বব্যাপী এবং অখণ্ডৈকরস তা জানার পর। যে জ্ঞানের দ্বারা উপাধিকৃত ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয়ে এইরূপ অভেদজ্ঞান জন্মে, তারই নাম পরাভক্তি। আচার্য শঙ্করের মতেও ভক্তি ও পরাজ্ঞান নিষ্ঠা একই বস্তু — সেয়ং জ্ঞাননিষ্ঠা আর্তাদিভক্তিত্রয়াপেক্ষয়া পরা চতুর্থীভক্তিরিত্যুক্তা — (শাঙ্করভাষ্য)।

---

* শ্রীধরস্বামী — গুজরাটবাসী মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ইনি ত্রয়োদশ শতাব্দীর কিঞ্চিৎ পরবর্তী। শ্রীধরস্বামী প্রণীত গীতার উপর 'সুবোধিনী' টীকা, ভাগবতের উপর ভবার্থ-দীপিকা এবং বিষ্ণুপুরাণের উপর একখানি টীকা বিখ্যাত। শ্রীধরস্বামীর টীকা বৈষ্ণবদের পরম মান্য। কারণ স্বয়ং চৈতন্যদেব বলে গেছেন,

'প্রভু হাসি কহে স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করয়ে গণন॥
শ্রীধরস্বামীর প্রসাদতে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধরস্বামী গুরু করি মানি॥
শ্রীধর উপরে গর্ব যে কিছু করিবে।
অস্তব্যস্ত লিখন সেই লোকে না মানিবে॥
শ্রীধরের অনুগত যে কর লিখন।
সবলোক মান্য করি করয়ে গ্রহণ॥" (চৈতন্যচরিতামৃত)

তাহলে শ্লোক দুটির তাৎপর্য দাঁড়াল অহংকারদেশ বাক্য* অবলম্বন করে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন যে, ব্রহ্মবোধে উদ্বুদ্ধ, লব্ধাত্মপ্রসাদ, সমদর্শী পুরুষই আমার পরম ভক্তি লাভ করেন। হে অর্জুন, সকল প্রাণীর মধ্যে চৈতন্যরূপী আমাকে দেখার নামই পরাভক্তি। জ্ঞানমার্গীরা একেই বলেছেন স্বরূপানুসন্ধান, শ্রীধরস্বামীর ভাষায় সর্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং। জ্ঞানীরা যে জ্ঞানের কথা বলেন, যে জ্ঞানে ব্রহ্মানুভূতি হয়, সে জ্ঞান কখনও শ্রৌতজ্ঞান নয়, সে হল সাক্ষাৎ অপরোক্ষানুভূতি। অপরোক্ষানুভূতিতে সাধকের দ্বৈত জ্ঞানের নিষেধ হয়ে অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ কথিত পরাভক্তিও হল ইষ্টগতপ্রাণ ভক্তের সর্বত্র অখণ্ড চৈতন্যের লীলাবিলাস দেখতে দেখতে অন্তে তাতেই একীভূত হওয়া॥ শ্রীধরস্বামী তাঁর টীকাতে এই অবস্থাকেই বলেছেন — ব্রহ্মাহমিতিনৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ ব্রহ্মেতি। বলা বাহুল্য, এটি বেদান্ত প্রতিপাদিত অহংগ্রহ উপাসনার নামান্তর এবং তারই ফলশ্রুতি।

ভক্তসাধক বিদ্বদ্বর্য নরহরি কবিরাজ তাঁর রচিত 'বোধসারঃ' নামক গ্রন্থের 'ভক্তিরসায়নম্' শীর্ষক অধ্যায়ে এই তত্ত্বটি সুন্দর রসস্নিগ্ধ ভাষায় পরিস্ফুট করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন,

অপরোক্ষানুভূতি র্যা বেদান্তেষু নিরূপিতা।
প্রেমলক্ষণভক্তেস্ত্ত পরিণামঃ স এব হি॥ ১০

— বেদান্তশাস্ত্রে যাকে অপরোক্ষানুভূতি বলে, তা প্রেম নামক ভক্তিরই পরিণাম।

বাসুদেবময়ং সর্বং বাসুদেবাত্মকং জগৎ।
ইত্থং দ্বৈতরসাঢ্যাসা জ্ঞানং কিমবশিষ্যতে॥ ১২

— সকলই বাসুদেবময় এবং জগৎ বাসুদেবাত্মক — এই প্রকারে যিনি দ্বৈতে বা জগতে আনন্দানুভব করেন, সেই রসাঢ্য, আনন্দসম্পন্ন ব্যক্তির কি কখন অদ্বৈতাত্মস্বরূপজ্ঞান হতে বাকী থাকে?

তবাস্মীতি ভজত্যেকস্ত্বমেবাস্মীতি চাপরঃ।
ইতি কিঞ্চিদ্বিশেষেঽপি পরিণামঃ সমো দ্বয়ঃ॥ ২৩

— আমি তোমারই, এই বলে ভক্ত ভজনা করে থাকেন। জ্ঞানী ভজনা করেন — 'আমিই তুমি' এই বলে। এই সামান্য প্রভেদটুকু থাকলেও উভয়ের পরিণাম একই।

অন্তর্বহির্যদা দৈবং দেবভক্তঃ প্রপশ্যতি।
দাসোঽহং ভাবয়ন্নেব দাকারং বিস্মরত্যসৌ॥ ২৪

— দেবভক্ত যখন শুদ্ধান্তকরণে 'আমি তোমার দাস' এই রকম ভাবনা করতে করতে চিন্মাত্রৈক স্বভাব আপন ইষ্টকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন করেন, তখন সেই মধুর মিলন লগ্নে একসময় 'দাসোঽহং' এর 'দা' কারটি ভুলে যান, দসোঽহং পরিণত হয় 'সোঽহং'-এ।

এমতাবস্থায় জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে পার্থক্য দর্শন করলে বা জ্ঞানকে হেয় করলে তাকে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত অপসিদ্ধান্ত বলতে হবে। কারণ, জ্ঞানী ও ভক্তের চরম লক্ষ্য ও পরমপ্রাপ্তি বস্তুতঃ একই শিবতম রসতম পরতত্ত্বের সঙ্গে সামরস্য।

এখানে কেউ কেউ এমন কথাও বলেছেন যে, মিষ্টদ্রব্য চোখে দেখে লাভ কি, খেয়ে দেখা দরকার, তবেই ত স্বাদ গ্রহণ সম্ভব। ভক্ত মুক্তি চান না, ভক্ত চান দ্বৈতবোধে রসাস্বাদন। চিনি হওয়াটা বড় কথা নয়, চিনি খেতে হবে। বলা বাহুল্য, এসব রসের কথা, ভাবের কথা, শুনতে মিঠা বলতে মিঠা, কিন্তু একটু বিচার করলেই বুঝা যাবে এ কথা শূণ্যগর্ভ, কেবল বাগ্‌পল্লব।

পরমাত্মাকে জানা আর চিনি বা রসগোল্লার মত কোন জড়বস্তুকে জানা এ দুই এর মধ্যে দুস্তর প্রভেদ। চিৎতত্ত্বের মধ্যেই আনন্দ থাকে। রসসম্ভোগ থাকে। সৎ চিৎ আনন্দ। সৎ এর মধ্যে চিৎ ও আনন্দ, চিৎ এর

---

* অহংকারাদেশ বাক্য — ব্রহ্মজ্ঞ বৈদিক ঋষিদের দ্বারা সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্য বিষয় বেদে বা শ্রুতিতে তিন উপায়ে উপলব্ধি হয়েছে (১) কোথাও 'তদাদেশ' বাক্যে, কোথা 'আত্মাদেশ' এবং কোথাও বা 'অহংকারাদেশ' বাক্যে। 'তৎ ত্বম্ অসি', 'প্রজ্ঞানং আনন্দং ব্রহ্ম'—এই মহাবাক্যগুলি তদাদেশ বাক্য, 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' — আত্মাদেশ বাক্য, আর 'অহং ব্রহ্মাস্মি' — অহংকারাদেশ বাক্য। গীতায় শ্রীকৃষ্ণোক্ত 'মম,', 'ময়ি', 'মাম্', 'মৎ' প্রভৃতি শব্দগুলি অহংকারাদেশ বাক্য। অন্যান্য আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের মত শ্রীকৃষ্ণও স্বরূপবোধে প্রতিষ্ঠিত হয়ে স্বরূপের ভূমি থেকেই ঐ শব্দগুলি উচ্চারণ করেছিলেন — সংঘাত দৃষ্টিতে বলেন নি। এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ ও বিশ্লেষণের জন্য আলোক তীর্থ দ্রষ্টব্য।

মধ্যে সৎ ও আনন্দ আবার আনন্দের মধ্যেই সৎ ও চিৎ বর্তমান। পরমাত্মা পূর্ণ সৎ, পূর্ণ চিৎ, পূর্ণ আনন্দ।

মুনি হারীতায়নের সেই প্রসিদ্ধ বাক্যটি স্মরণ করুন,

স্ফুরন্তি শীকরাঃ যস্মাৎ আনন্দাস্যাম্বরে বনৌ।
সর্বেষাং জীবনং তস্মৈ ব্রহ্মানন্দাত্মনে নমঃ॥

— যা হতে স্ফুরিত আনন্দধারায় আকাশ হতে বনভূমি অর্থাৎ দ্যুলোক ভূলোক প্লাবিত, যিনি সকলের জীবন, সেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপই ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মকে জানলে সাধক নিজেই আনন্দস্বরূপ হয়ে যান। এই হল চিন্ময় বস্তুর ধর্ম। চিনিকে জানলে বা চোখে দেখলে চিনি খাওয়া না হতে পারে কিন্তু চিন্ময় আনন্দতত্ত্বের ধর্ম এই যে তা জানা মাত্রই আনন্দ উথলিত হয় — আনন্দাম্বুধিস্ফুরনম্ — সাধক নিজেই আনন্দময় হয়ে যান। সেটি রসাস্বাদনের পূর্ণাবস্থাও বটে। চৈতন্যে জাগরণই ত আনন্দের আস্বাদন।

তত্ত্বটিকে একটু স্থূলভাবে বিচার করে দেখা যেতে পারে। চিনিকে জানলে দেখলে রস পাওয়া যায় না, গলাধঃকরণ করলে তবে রসাস্বাদন হয়। ঠিক কথা, কিন্তু কোন মানুষের সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় হয়, তখন কি তাকে গিলে ফেললে তার রসাস্বাদন হয় না — ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় ও হৃদ্যতার ফলে সে অভিন্নহৃদয় বন্ধুতে পরিণত হলে তবেই তাঁকে মধুর লাগে? কোন্ মানুষকে ঘনিষ্ঠভাবে জানাটাই রসাস্বাদন, তাতেই তৃপ্তি। দ্বৈতবাদী ভক্তের চোখে তাঁদের ভগবান দিব্যদেহধারী। তাঁর রসাস্বাদন করতে হলে তাঁকে কি গিলে ফেলতে হবে? না তাঁর স্বরূপ পরিচয় জানলে, তাঁর সন্নিহিত হলে তবেই রসসম্ভোগ পূর্ণ হয়? কোনটি ঠিক? ধর্মজগতের প্রভুরা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই কেন যে নানা ভক্তমনোলভা মধুর মধুর ভাববাণী ফিরি করেন, তা ভেবে আমি আশ্চর্য হই।

পার্থিব জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, ধর্মশাস্ত্রে যার নাম অপরাবিদ্যা — সেখানেও দেখা যায় কোন গবেষক ছাত্র বা বিজ্ঞানী দিবারাত্র পরিশ্রমের পর যখন অঙ্ক বা পদার্থবিদ্যাদির কোন জটিল সূত্রের সমাধান আবিষ্কার করেন তখনই তাঁর আনন্দ হয়। এ জন্য তাঁকে সূত্র বা ফরমুলাটি গিলে ফেলতে হয় না। সেই বিষয়ে পূর্ণজ্ঞান হলে তবেই রসাস্বাদন সম্ভব হয়। কোন তত্ত্বকে জানাচেনার অর্থাৎ রহস্য সমাধানের মূলে থাকে ঐ তত্ত্ব বা রহস্যের প্রতি ভালবাসা। ভালবাসা না থাকলে, সাধকই বলুন, গবেষকই বলুন, কেউ কি তাই নিয়ে দিবারাত্র মগ্ন থাকতে বা তপস্যার ক্লেশ সহ্য করতে পারেন? তাই ত 'বিবেকচূড়ামণি'তে শঙ্করের কণ্ঠে শুনি সঙ্কেত ও সমাধানের বাণী ঃ

স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ॥ ৩৩

অর্থাৎ আত্মজিজ্ঞাসা বা স্বরূপতত্ত্বের অনুসন্ধানই কারও কারও মতে ভক্তি নামে কথিত।

লোকে সাধারণতঃ ভক্তি বলতে ভাবাবেগে রোদন, নর্তন-কুর্দন বা 'মুই দাস' বোধে ইষ্টের পাদবন্দনা ও পূজার্চনাদিকেই বুঝে থাকে। কিন্তু শুনুন বেদবাণী, স্বরূপ অনুসন্ধানের পথই যে প্রকৃত ভক্তিমার্গ এবং স্বরূপস্থিতিই (সোঽহংবোধ) যে যথার্থ ভক্তি — এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অপৌরুষেয় বেদমন্ত্রেও অভিব্যক্ত —

ভগভক্তস্য তে বয়মুদশেম তবাবসা। মূর্দ্ধানং রায় আরভে॥

(ঋগ্বেদ ১।১৪।৫)

মন্ত্রটিং অন্বয়মুখী অর্থ হল — বয়ং ভগভক্তস্য তে (ষড়ৈশ্বর্যযুক্তস্য তব প্রার্থনাকারিণঃ) তব অবসা (তব অনুগ্রহেণ) রায়ঃ (স্বরূপজ্ঞানরূপপরমধনস্য) মূর্দ্ধানং (উৎকর্ষং) আরভে (শীঘ্রলব্ধুং) উদশেম (উৎকর্ষেণ ব্যাপ্নুমঃ)। অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যশালী আপনার ভক্ত আমরা, আপনার অনুগ্রহে স্বরূপজ্ঞান রূপ পরমধন প্রাপ্ত হয়ে যেন তার উৎকর্ষ সাধনে ব্যাপৃত হতে পারি॥

ভক্তের ভাব যদি ভক্তি হয়, তাহলে এখানে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে স্বরূপানুসন্ধানের পথেই চরমোৎকর্ষ। স্বরূপস্থিতি যে ভক্তের লক্ষ্য এবং তাই যে যথার্থ ভক্তি তা সর্বজনমান্য বেদেরও অভিপ্রায়।

অতঃপর তর্ক বা বিতণ্ডার কথা থাক। এতৎসত্ত্বেও কেউ যদি জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কল্পিত সীমারেখা টেনে জ্ঞানের চেয়ে ভক্তিকে গরীয়সী ও বরীয়সী বলতে চান তাহলে আমি তাঁকে সর্তক হয়ে গীতাবাক্য মনন করতে বলি। গীতাবাক্য মনন ও স্বাধ্যায় করলেই যে কেউ দেখতে পাবেন যে, জ্ঞানীভক্তের প্রতিই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষপাতিত্বটা একটু বেশী। গীতার সপ্তম অধ্যায়ে তিনি বলছেন, আর্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী — আমার এই চার প্রকার

ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীভক্তই সর্বশ্রেষ্ঠ —

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তি বিশিষ্যতে। প্রিয়ো হি জ্ঞানীনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥ ১৭

শ্রীধরস্বামী এই মন্ত্রের টীকা করেছেন — তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ তেষামিতি। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্টঃ তত্র হেতবঃ নিত্যযুক্তঃ সদা মন্নিষ্ঠঃ, একস্মিন্ ময্যেব ভক্তির্যস্য স জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তভক্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্যস্য, অতএব তস্যাহমত্যন্তং প্রিয়ঃ স চ মম, ইত্যাদি — উক্ত চার প্রকার ভক্তের মধ্যে জ্ঞানীই সর্বশ্রেষ্ঠ। জ্ঞানীর বৈশিষ্ট্য এই যে সে আমা বৈ আর কিছু জানে না। জ্ঞানীর দেহাত্মবুদ্ধি ও চিত্তবিক্ষেপ থাকে না সুতরাং নিত্যমন্নিষ্ঠিতা সততই বর্তমান। অন্যান্য সকাম ভক্তদের মধ্যে এই নিত্যযুক্তভাব বা ঐকান্তিক ভক্তির অভাব দেখা যায়। তারা কখন আমার ভজনা করে, কখন বা সংসার ভজনা করে, সংসারে সুখলাভের আশায় অন্য দেবতারও ভজনা করে। কিন্তু জ্ঞানী সদৈব আমাগতপ্রাণ। জ্ঞানীর কাছে আমি যেমন একমাত্র প্রিয়-পরম, তেমনি জ্ঞানীও আমার কাছে পরম প্রিয়।

পরবর্তী শ্লোকে কৃষ্ণ বাক্য আরও স্পষ্ট। তিনি জ্ঞানীভক্তের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে বলছেন —

উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্। গীতা, ১৮

শ্রীধরস্বামীর ভাষায় এই মন্ত্রাংশের টীকা — সর্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থ জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ, ইত্যাদি — প্রোক্ত চতুর্বিধ উপাসক সকলেই মহান্, সকলেই মুক্তিলাভার্হ কিন্তু তার মধ্যে জ্ঞানীই আমার আত্মস্বরূপ — এই হল আমার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

আর কথা বাড়াবো না, এইবার এই প্রসঙ্গে আপনাদের একটি ছোট্ট গল্প শুনিয়ে আমার বক্তৃতার উপসংহার টানছি। একবার বাংলাদেশে রাজা লক্ষ্মণ সেনের (১১৭০ খৃ - ১২০০ খৃ) রাজসভায় প্রাচীন কবিদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, এই নিয়ে তর্ক উঠল। সেদিন 'পঞ্চরত্ন' নামে প্রসিদ্ধ পাণিনির দুর্ঘটবৃত্তির প্রণেতা শরণদেব, পবনদূত নামক কাব্যপ্রণেতা ধোয়ী, আর্যসপ্তপদী প্রণেতা কবি গোবর্ধন আচার্য, প্রশস্তপত্রীয়* নামক কবিতা রচয়িতা উমাপতিধর এবং গীতগোবিন্দ প্রণেতা মরমী কবি জয়দেব ছাড়াও রাজসভার ধর্মাধিকারিক, ব্রাহ্মণসর্বস্বাদি প্রণেতা বিখ্যাত বৈদিক পণ্ডিত হলায়ুধও উপস্থিত ছিলেন। শরণদেব বললেন — কাব্য আমার বিষয় নয়। তবে বহুকাল থেকে দশকুমারচরিত প্রণেতা দণ্ডী সম্বন্ধে একটি প্রাচীন বচন শুনে আসছি —

জাতে জগতি বাল্মীকে কবিরিত্যভিধীয়তে।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্তয়ি দণ্ডিনি॥

অর্থাৎ বাল্মীকির আবির্ভাবের পরেই জগতে 'কবি' শব্দটির উৎপত্তি হল, শব্দটি দ্বিবচনান্ত হল দ্বিতীয় কবি ব্যাসের আবির্ভাবের পর এবং তৃতীয় কবি দণ্ডীর আবিভার্বের ফলেই শব্দটির বহুবচনান্ত হওয়া সম্ভব হল। আমার মনে হয় প্রাচীন কবিদের মধ্যে দণ্ডীই শ্রেষ্ঠ। ধোয়ী বললেন — আমার মতে ভাসই শ্রেষ্ঠ কবি। স্বপ্নবাসবদত্তাদি গ্রন্থ তাঁর অমর সৃষ্টি। কবি কালিদাসও তাঁর কাছে বহুভাবে ঋণী। কালিদাস রচিত অনেক কাব্যেরই মূল ভাসের রচনায় স্ফুটাকারে বর্তমান ছিল দেখতে পাওয়া যায়।

ধোয়ীর কথা শেষ হতে না হতেই উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন কবি গোবর্ধন আচার্য। তিনি ছিলেন কালিদাসের মুগ্ধ পুজারী, একেবারে অন্ধভক্ত। তিনি দীর্ঘকাল ধরে কালিদাসের কাব্য চর্চা, গবেষণা এবং অধ্যাপনা করে আসছিলেন। তিনি ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলতে লাগলেন — কালিদাসের সঙ্গে কি কারও তুলনা হয়? ভাসের রচনার মধ্যে যা স্ফুটাকারে ছিল তা যদি কালিদাসের কাব্যে বিস্তার লাভ করে, তাহলে আচার্য ধোয়ীর বক্তব্যানুসারেই প্রমাণিত হচ্ছে যে ভাস যদি বীজ হন, কালিদাস হলেন মহীরুহ। কবির জীবনের একটি ক্ষুদ্র ঘটনার কথা ধার যাক্। সরস্বতীর বরলাভের পর তিনি ঘরে ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী কমলাদেবী প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন — অস্তি কশ্চিদ্ বাগ্‌বিশেষঃ, সরস্বতী তাঁকে কবিত্ব শক্তি দান করেছেন। স্ত্রী বললেন, 'এইমাত্র যে পদগুলি উচ্চারণ করলে, তার প্রত্যেকটি দিয়ে যদি এক একটি মহাকাব্য রচনা করতে পার, তাহলেই বুঝব যে তুমি যথার্থই বরলাভ করেছ।' এ কথা সবাই জানেন যে কালিদাস তার

* উমাপতিধরের কবিতাগুলি কলিকাতা মিউজিয়ামে সুরক্ষিত আছে।

অলোকসামান্য প্রতিভাবলে এই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন। তিনি 'অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা'[১] দিয়ে কুমারসম্ভব, 'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা'[২] দিয়ে মেঘদূত, 'বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ'[৩] দিয়ে রঘুবংশ এবং 'বিশেষ স্পৃহনীয়চন্দ্রমাঃ'[৪] দিয়ে ঋতুসংহার — এই চারটি অমর মহাকাব্যের সূচনা করেছিলেন। এই দৈবী প্রতিভা অপর কবি কোথায় পাবেন? সুপ্রযুক্ত উপমা, রস-মধুর শব্দচয়ন এবং সুললিত ছন্দের প্রয়োগ — যে দিক দিয়েই বিচার করা হোক না কেন কালিদাসই সে সর্বকালের কবি-সার্বভৌম, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ করা চলে না।'

গোবর্ধনের বক্তব্য শেষ হতেই উমাপতিধর বললেন আলোচিত প্রত্যেক কবিই মহৎ প্রতিভার অধিকারী সন্দেহ নাই, তবে অর্থগৌরবের বিচারে কিরাতার্জুনীয় প্রণেতা ভারবিকে শ্রেষ্ঠ কবি বলতে হয়। কারণ তাঁর কাব্যের এমনই প্রসাদগুণ যে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি শব্দ গুরুগম্ভীর হয়েও রসাত্মক। নারিকেলের শক্ত আবরণ ভেঙে ফেললেই যেমন মিষ্ট শাঁস ও জলের সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি ভারবি রচিত প্রত্যেকটি পদ বিশ্লেষণ করলেই রসিকজন যে যাঁর ঈপ্সিত রসের সন্ধান পাবেন

নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্ বিভাজ্যতে।
স্বাদয়ন্তু রসগর্ভনির্ভরং সারমস্য রসিকাঃ যথেপ্সিতম্॥

রাজসভার পঞ্চম রত্ন, কবি-রত্ন জয়দেব বললেন পূর্ব পূর্ব বক্তার প্রিয় প্রত্যেক কবিই নমস্য এবং প্রত্যেকেই রসোত্তীর্ণ সাহিত্য স্রষ্টা। প্রত্যেকেই একক ভাবে এক একটি বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, যেমন উপমাতে কালিদাস, অর্থগৌরবে ভারবি এবং পদলালিত্যে নৈষধ। কিন্তু শিশুপালবধ নামক মহাকাব্য প্রণেতা মহাকবি মাঘের মধ্যে ঐ তিনগুণেরই সমাবেশ দেখা যায়।

উপমা কলিদাসস্য ভারবেরর্থগৌরবম্।
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়োগুণাঃ॥

অতএব আমার বিচারে মাঘই সর্বশ্রেষ্ঠ কবি।

এইভাবে তর্ক চলতেই থাকল। মীমাংসা আর কিছুতেই হয় না। অবশেষে রাজা হলায়ুধকে সম্বোধন করে বললেন বৈদিক মন্ত্রের প্রয়োগকর্তা এবং মন্ত্রবিৎ হিসাবে বর্তমান গৌড়ে আপনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। আপনি দেবী সরস্বতীর আরাধনার ব্যবস্থা করুন। মা যদি স্বয়ং কোন প্রত্যাদেশ দেন তাহলে তাই হবে আমাদের শিরোধার্য। সভাসদ ও পণ্ডিতবর্গ সকলেই রাজার কথায় সায় দিলেন। শুভলগ্নে বাগ্‌দেবীর অর্চনা শুরু হল। অনেক স্তবস্তুতির পর সহসা দৈববাণী হল কবির্মাঘঃ, কবির্মাঘঃ, কবির্মাঘঃ অর্থাৎ মাঘই শ্রেষ্ঠ কবি। দৈববাণী শুনে সবাই আনন্দিত সবাই উৎফুল্ল কিন্তু কালিদাস ভক্ত গোবর্ধন আচার্যের মনে দুঃখের সীমা নাই। তিনি আজীবন বিশ্বাস করে এসেছেন কালিদাস শ্রেষ্ঠ কবি, সেইভাবেই তিনি অগণিত ছাত্রকে শিখিয়ে এসেছেন, আজ কি না দেবীর মুখে অন্য কথা। তিনি কি তাহলে এতকাল ভুল শিক্ষা দিয়ে এসেছেন? অপরিসীম গ্লানিতে তাঁর মন

১। অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা, হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্বাপরৌ তোয়নিধীবগাহ্য, স্থিতঃ পৃথিব্যাহব মানদণ্ডঃ॥ ১ (কুমারসম্ভব)
— উত্তরদিকে দেবতাধিষ্ঠিত হিমালয় নামক এক শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে। ঐ গিরিরাজের প্রান্তদ্বয় পূর্বসাগর ও পশ্চিমসাগরে অবগাহন পূর্বক (নিমগ্ন থাকায়) পৃথিবীর মানদণ্ডরূপে বিরাজিত।

২। কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ।
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্তুঃ॥ ১ (মেঘদূত)
— কোন যক্ষ নিজ কর্তব্য কর্মে অবহেলার ফলে তার প্রভুর (যক্ষরাজ কুবেরের) অভিশাপে একবৎসর ব্যাপী (নির্বাসন জীবন যাপন করতে বাধ্য হওয়ায়) নিদারুণ পত্নীবিরহে নিষ্প্রভ ও কাতর হয়ে পড়েন।

৩। বাগার্থাবিব সম্পৃক্তৌ বাগার্থ প্রতিপত্তয়ে।
জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্বতী পরমেশ্বরৌ ॥ ১ (রঘুবংশ)
— আমি শব্দ ও অর্থের প্রতিপত্তির (সম্যগ জ্ঞানলাভের) জন্য শব্দ ও অর্থের ন্যায় সম্পৃক্ত (নিত্যসম্বন্ধযুক্ত) জগতের মাতাপিতা পার্বতী ও মহেশ্বরকে বন্দনা করি।

৪। বিশেষ সূর্যঃ স্পৃহনীয়চন্দ্রমাঃ সদাবগাহক্ষতবারিসঞ্চয়ঃ।
দিনান্তরম্যোহ ভ্যুপশান্তমন্মথো, নিদাঘকালোহয়মুপাগতঃ প্রিয়ে॥ ১ (ঋতুসংহার)
— প্রিয়তমে! এখন গ্রীষ্মকাল সমাগত। এ সময়ে সূর্য প্রচণ্ড তেজ ধারণ করেছে, চন্দ্রমার দৃশ্য স্পৃহনীয় হয়েছে নিরন্তর অবগাহনের ফলে জলাশয়ের জল হ্রাস পেয়েছে, সন্ধ্যাকাল রমনীয় হয়ে উঠেছে এবং কামবেগ প্রশান্ত হয়েছে।

ভরে গেল, তিনি স্নানাহার ত্যাগ করলেন। জ্ঞান-তাপসের দুঃখে বাগ্‌দেবী বিচলিতা হলেন। তিনি স্বপ্নে আবির্ভূতা হয়ে বললেন — বৎস, তুমি মন খারাপ করো না, তুমি রাজাকে পুনরায় আমার অভিমত যাজ্ঞা করতে বল, তাহলেই সকলের ভুল ভাঙবে। প্রভাত হতেই গোর্বধন ছুটে গেলেন রাজার কাছে, কাতরভাবে মিনতি জানালেন — সেদিন উপাসনাকালে বাদ্য এবং মন্ত্রোচ্চারণের কোলাহলে আমি বাগ্‌দেবীর দিব্যবাণী স্বকর্ণে শুনতে পাই নি। আপনি দয়া করে আর একবার পূজার আয়োজন করুন এবং পূজাস্থলের কাছাকাছি স্বয়ং উপবিষ্ট হোন। রাজা জানতেন গোবর্ধন কালিদাসের একনিষ্ঠ ভক্ত, সেদিনকার প্রত্যাদেশ তার গভীর মনোবেদনার কারণ হয়েছে, বিশেষতঃ তিনি এই কাব্য রসিক সরল মানুষটির উপবাস ক্লিষ্ট বিষণ্নমূর্ত্তি দেখে 'না' বলতে পারলেন না।

তিনি ব্রাহ্মণদের পুনরায় পূজার আয়োজন করতে বললেন। সভাসদবর্গেরও এই প্রস্তাবে আপত্তি করার কোন কারণ ছিল না, কারণ তারা জানতেন দৈববাণী কখনও মিথ্যা বলে না, ক্ষণে ক্ষণে তা পরিবর্তিত হয় না, কাজেই এবারেও নিশ্চয়ই একই অভিমত ব্যক্ত হবে। যথাবিধি পূজা হল। সেদিনও দৈববাণী প্রতিধ্বনিত হল — কবির্মাঘঃ, কবির্মাঘঃ, কবির্মাঘঃ। গোবর্ধন কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। তিনি দেবীর উদ্দেশ্যে বললেন — মা, তবে যে শুনি কালিদাস তোমার বরপুত্র, তাঁর জিহ্বাগ্রে তোমার নিত্যস্থিত — এসব কথা কি সত্য নয়? কালিদাস কি শ্রেষ্ঠ কবি নন? মা বললেন — তোমরা আমায় ভুল বুঝেছ বাছা। কালিদাস কি কবি? যেমন গঙ্গা জলমাত্র নয়, কাশী শুধু তীর্থ নয়, কৈলাস কেবল পর্বত নয় — গঙ্গা যেমন বিষ্ণুর পাদোদক, কাশী যেমন মোক্ষধাম, কৈলাস যেমন স্বয়ং শিবস্বরূপ, তেমনি মহাকবি কালিদাস আমার আত্মা, কালিদাসই আমি, আমিই কালিদাস — কালিদাস আর আমাতে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই।

আসুন, এবারে আমরা মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। কোন কবি বা কাব্য নয়, আমাদের প্রধান বিচার্য বিষয় — ভক্তি ও জ্ঞান। উপরোক্ত গল্পে দেখুন কবিকূলে কালিদাস শ্রেষ্ঠ কিনা, এই বিষয়ে পণ্ডিতসমাজে নানা মত থাকলেও সরস্বতীর মুখনিঃসৃত বাণীই যেমন সকলের শিরোধার্য, তেমনি ভক্তি ও জ্ঞান বিষয়ে নানা মতবিরোধ থাকলেও শ্রুতিবাক্য এবং শ্রীকৃষ্ণবাক্যকেই আমাদের মান্য করা উচিত। শ্রুতি বলেছেন — জ্ঞানই অমৃত। জ্ঞানাদেব মুক্তিঃ নান্যথা। আর গীতাতে দেখছি, গল্পোক্ত সরস্বতীর মত শ্রীকৃষ্ণ, যাঁকে ভক্তকূল পূর্ণ ভগবান বলে মানেন, তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছেন — জ্ঞানী আমার ভক্ত বটে কিন্তু ভক্ত হলেও পার্থক্য আছে। জ্ঞানী তু আত্মৈব মতম্ — জ্ঞানী আমার আত্মা, স্বয়ং আত্মস্বরূপ।"

আমার বক্তৃতা শেষ হল।

বক্তৃতাকালে শুনতে পাচ্ছিলাম প্রভুপাদদের মধ্যেও গুঞ্জন উঠছে, কোন কোন প্রভুপাদ আমার অভক্তোচিত মন্তব্যে কর্ণে অঙ্গুলি দিয়ে কৃষ্ণপদে মন দিচ্ছিলেন। মঞ্চ হতে নেমে ইতস্ততঃ দৃষ্টি দিতেই চোখে পড়ল, অহিংস নিষ্কিঞ্চণ বৈষ্ণব প্রভুদের চোখগুলি যেন জ্বলছে।

পরবর্তী বক্তা সিংহবিক্রমে মঞ্চে উঠেই সভাপতিকে সম্বোধন করা প্রভৃতি সে সব প্রচলিত রীতি, তা উত্তেজনাবশতঃ ভুলে গিয়ে প্রথমেই অনুযোগ করলেন যে আমার মত একজন প্রাকৃত জনকে সভায় বলতে দেওয়া উচিত হয়নি। তিনি আমাকে পাষণ্ডী, মায়াবাদী, শ্রীকৃষ্ণচরণে ঘোরতর অপরাধী প্রভৃতি নানা মধুর বাক্যে আপ্যায়িত করে বললেন — 'জ্ঞানের চেয়ে ভক্তি অনেক বড়। ভক্তিমার্গই ঈশ্বরলাভের শ্রেষ্ঠতম পথ। শ্রীকৃষ্ণের কৈঙ্কর্যলাভ এবং সখী অনুগত হয়ে ভজন করাই জীবের অভীষ্ট। জ্ঞানের পথে মুক্তিলাভ অবজ্ঞেয়।'

অতঃপর সভাস্থল ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ মনে করলাম। আমার সঙ্গীরাও আমার পিছনে পিছনে সভাস্থল ছেড়ে উঠে এলেন। পথে যেতে যেতে মাইকে প্রভুপাদদের বিলাপধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলাম। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রার্থনা করছিলেন —

'বরং বৃন্দাবনারণ্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং।
ন তু বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন'॥

আহা! শ্রীভগবান প্রভুপাদের সাধ পূর্ণ করুন! ইত্যবসরে আমরা এগিয়ে চলি বিষ্ণুপুরীর ঘাটে মা নর্মদার দিকে।

সাধু-সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে যথারীতি বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ রামদয়ালের বাবার সঙ্গে আমরা

সম্মেলনস্থলের সামনের সারিতেই এসে বসলাম।

দ্বিতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল — 'অদ্বৈতবাদের মূল উৎস'। পৌরহিত্য করেছিলেন সমগ্র সন্ন্যাসী জগতের বিশেষ পরিচিত পূজ্য শ্রীমৎ স্বামী করপাত্রীজী মহারাজ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক ডঃ শ্রী আশুতোষ শাস্ত্রী* এবং আর্যসমাজের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বেদবিৎ ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসু* এই দুজনের অত্যন্ত সহজবোধ্য সংস্কৃত ভাষায় প্রদত্ত ভাষণই আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছে। মূল্য আলোচ্য বিষয়ের গভীরতা ছাড়াও সংস্কৃত ভাষা যে কত সরল হতে পারে তা তাঁদের ভাষণ সেদিন যাঁরা শুনেছিলেন তাঁরা তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। বাংলা ও হিন্দী শব্দে যেন কতকগুলি অনুস্বার বিসর্গ যোগ করে দিয়েছেন মাত্র! আমার ইচ্ছা হচ্ছিল, যাঁরা দুর্বোধ্যতার হেতু দেখিয়ে সংস্কৃতকে রাষ্ট্রভাষা করার বিপক্ষে পার্লামেন্ট ও পার্লামেন্টের বাহিরে সোরগোল তুলেছেন সেইসব মাননীয় পার্লামেন্টের সদস্যবর্গ এবং পেশাদার রাজনীতিকরা যদি এই ভাষণ শুনতেন! শুনলে তাঁরা বুঝতে পারতেন প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কথ্যভাষা হিসাবেই হোক কিংবা সংবাদপত্র পরিচালনাদি যাবতীয় বিষয়ে মধুর সংস্কৃত ভাষা আজও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। টেপ রেকর্ডার সঙ্গে থাকলে সরল সংস্কৃতের এই আদর্শরূপটি যন্ত্রে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতাম। সংস্কৃত পঠন-পাঠনের দোষে ছাত্রদের সংস্কৃত সম্বন্ধে যে বিভীষিকা দেখতে পাই, ঐ বক্তৃতা শুনে তাদের সেই ভয় ও বিতৃষ্ণা দূর হয়ে যেত। যাইহোক ডঃ শাস্ত্রীজী বললেন — 'অদ্বৈতমতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ তাত্ত্বিক সত্তারহিত, অতএব ইন্দ্রজালসদৃশ মিথ্যা তথা একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মই পরমার্থিক সৎ। তথা হি শ্রুতি — একমেবাদ্বিতীয়ম্ ব্রহ্ম। নেহ নানাস্তি কিঞ্চন। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। উদরমন্তরং কুরুতে অথ তস্যভয়ং ভবতি। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি। অর্থাৎ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আছেন। এই অদ্বিতীয় ব্রহ্মে কোনরূপ নানাত্ব (নানা জগৎ রূপভেদ) নাই। যে পুরুষ এঁতে বৃথা নানাত্ব বা ভেদ দেখে সেই ভেদদর্শী পুরুষ মৃত্যু দ্বারা মরণপ্রাপ্ত হয়। যে পুরুষ এঁতে কিঞ্চিত মাত্রও ভেদ দেখে সে ভয়প্রাপ্ত হয়। এই পুরুষের দ্বিতীয় ভাব দ্বারাই ভয়ের প্রাপ্তি হয় ইত্যাদি অনেক প্রকারের শ্রুতি এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বোধন করেন, দ্বৈতরূপ জগতের নাস্তিত্ব

---

* ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী (১৮৯৮-১৯৬৭) — M.A. P.R.S., Ph.D. কাব্য ব্যাকরণ সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ, বিদ্যা বাচস্পতি। জন্মস্থান - ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত সিঙ্গারডাঙ্গা গ্রামে। পিতার নাম -'অভয়াচরণ ভট্টাচার্য। শৈশবেই মাতা পিতাকে হারিয়ে তিনি ইংরাজী শিক্ষার কোন সুযোগ পান নি। গ্রামের চতুষ্পাঠীতে পড়ে অনন্য সাধারণ প্রতিভাবলে মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে তিনি ব্যাকরণের উপাধি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তার দুই বৎসর পরেই তিনি হন কাব্যতীর্থ। অতঃপর দারিদ্র্যের জন্য তিনি ইদিলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের হেড পণ্ডিতের কাজ গ্রহণ করেন। কিন্তু ঢাকা বিভাগের বিদ্যালয় সমূহের তদনীন্তন পরিদর্শক স্টেপলটন সাহেব ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ আশুতোষের এই নিয়োগ সমর্থন করেন নি। অধ্যবসায়ী আশুতোষ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ১৮ বৎসর বয়সে ABCD শুরু করে মাত্র এক বৎসরের পরিশ্রমে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে প্রতিটি পরীক্ষায় সাফল্য লাভ করে ১৯২৪ খৃঃ সংস্কৃতে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হন। এছাড়াও তিনি Shankar's Theory of Knowledge নামক Thesis লিখে P.R.S. এবং Post-Shankar - Dialectics নামক Thesis লিখে Ph.D ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে আশুতোষ বেদান্তের অধ্যাপক হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগের প্রধান পদ লাভ করেন।

এই বিপুল গভীর পাণ্ডিত্য ছাড়াও আশুতোষের সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য ছিল অনর্গল সংস্কৃত ভাষণে তিনি ছিলেন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯১৮ সালে সংস্কৃত সাহিত্যে পরিষদের প্রথম অধিবেশনে তিনি সংস্কৃত ভাষণে বাগ্মিতা দেখিয়ে হিন্দুস্থানী পণ্ডিতদেরকে পরাজিত করেছিলেন। পরে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের সভাপতিত্বে পাটনায় অনুষ্ঠিত All India Philosophical Congress এর অদ্বৈতবেদান্তের অবিদ্যার প্রমাণ সম্পর্কিত বিতর্কে সংস্কৃতে বক্তৃতা দিয়েও তিনি জয়লাভ করেন। বেদান্তদর্শন — অদ্বৈতবাদ নামক গ্রন্থ তাঁর অমর সৃষ্টি। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বিষয় — 'অদ্বৈতচিন্তার ইতিবৃত্ত', দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় — 'বেদান্ত প্রমাণ পরিক্রমা', তৃতীয় খণ্ডের বিষয় — 'বেদান্ততত্ত্ব সমীক্ষা'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় রচিত এই পুস্তকখানি পড়লে যেকোন পাঠক মূল সংস্কৃত গ্রন্থ পাঠের অভাব অনুভব করবেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

* পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসু — আচার্যদেব পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসু ছিলেন আর্য্য সমাজের অসাধারণ বৈয়াকরণ এবং বেদবিৎ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ। বারাণসীর উপকণ্ঠে মতিঝিলস্থ আজমতগড় প্যালেসে প্রতিষ্ঠিত পাণিনি মহাবিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন অধ্যক্ষ। ঐখানে থেকেই তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ বেদবাণী নামক পত্রিকার সম্পাদনা করেন। দুর্বোধ্যতম পাণিনি ব্যাকরণের একটি অভিনব সরল পাঠ্যক্রম রচনা করে তিনি অগণিত ছাত্রকে মাত্র ছয় মাসের মধ্যে সংস্কৃতে পঠন-পাঠন ও ভাষণে পটু করে তুলতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'সংস্কৃত পঠনপাঠন কী অনুভূত সরলতম বিধি' 'বেদার্থ' প্রক্রিয়াকে মূলভূত সিদ্ধান্ত এবং ঋষি প্রণালী নামক তিনখানি গ্রন্থ রচনা করেন। মহর্ষি দয়ানন্দ কৃত বেদ ব্যাখ্যার অনুসরণে পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত রচিত ও সম্পাদিত 'যজুর্বেদ ভাষ্য বিবরণ' নামক গ্রন্থখানি বেদাভ্যাসীদের কাছে একটি মূল্যবান কুঞ্জিকা বিশেষ।

প্রতিপাদন করেন। উক্ত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম দেশ পরিচ্ছেদ, কাল পরিচ্ছেদ ও বস্তু পরিচ্ছেদ — এই তিন পরিচ্ছেদ হতে রহিত হওয়ায় অনন্ত তথা উৎপত্তি ও নাশ রহিত হওয়ায় সৎ অর্থাৎ সত্য তথা আপনার প্রকাশে অন্য কারও অপেক্ষা করেন না বলে জ্ঞানস্বরূপ অর্থাৎ চৈতন্যস্বরূপ আর তাঁর আনন্দ দ্বারা সর্বজগৎ ব্যাপ্ত হওয়ায় অর্থাৎ সর্বত্র তাঁর আনন্দ প্রতীত হওয়ায় আনন্দস্বরূপ। তথাহি শ্রুতিসত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, আনন্দো ব্রহ্ম অর্থাৎ উক্ত ব্রহ্ম সত্যরূপ তথা জ্ঞানরূপ তথা অনন্তরূপ তথা আনন্দরূপ। কথিত লক্ষণাক্রান্ত ব্রহ্মে উল্লিখিত তিন পরিচ্ছেদের অভাববোধন করবার অভিপ্রায়ে প্রথমে অনাত্ম বস্তুতে প্রোক্ত তিন পরিচ্ছেদের স্বরূপ বর্ণনা করা যাচ্ছে। অত্যন্তাভাব প্রতিযোগিত্বং দেশ পরিচ্ছেদঃ অর্থাৎ অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতাকে দেশ পরিচ্ছেদ বলে। যেমন যে ভূতলাদি দেশে ঘটাদি পদার্থ থাকে সেই দেশ ছেড়ে অন্যত্র সর্বত্র উক্ত ঘটাদির অত্যন্তাভাব থাকে বলে এই অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগিতা উক্ত ঘটাদিতে হয়, একেই ঘটাদিতে 'দেশ পরিচ্ছেদ' বলা হয়। 'ধ্বংসপ্রাগভাব প্রতিযোগিত্বং কাল পরিচ্ছেদ' অর্থাৎ প্রধ্বংসাভাবের তথা প্রাগভাবের যে প্রতিযোগিতা তার নাম কাল পরিচ্ছেদ। যেমন ঘটাদি জন্য পদার্থের উৎপত্তির পূর্বে কপালাদিতে ঘটাদির প্রাগভাব তথা নাশের অন্তর কপালাদিতে ঘটাদির প্রধ্বংসভাব থাকে বলে উক্ত প্রাগভাবের তথা প্রধ্বংসাভাবের প্রতিযোগিতা ঘটাদি পদার্থে হয় বলে একেই ঘটাদি পদার্থে 'কাল পরিচ্ছেদ' বলে। 'অন্যোন্যভাব প্রতিযোগিত্বং বস্তু পরিচ্ছেদ' অর্থাৎ ভেদরূপ অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা তা বস্তু পরিচ্ছেদ বলে উক্ত। যেমন পটঃ ঘটো ন অর্থাৎ পট ঘট নয় ইত্যাদি প্রতীতিতে ভাসমান যে ঘটাদি বস্তু বিষয়ে বস্তুর ভেদরূপ অন্যোন্যাভাব সেই অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগিতা ঘটাদি বস্তুতে হয়, এটাই বস্তুতে বস্তু পরিচ্ছেদ। এই প্রকার যাবৎ অনাত্ম পদার্থ উক্ত তিন পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট। কিন্তু ব্রহ্ম উক্ত তিন পরিচ্ছেদ রহিত। কারণ ব্রহ্ম সর্বত্র ব্যাপক হওয়ায় তাঁতে দেশ পরিচ্ছেদ তথা উৎপত্তিনাশ রহিত হওয়ায় কাল পরিচ্ছেদ, তথা সকলের আত্মা হওয়ায় বস্তু পরিচ্ছেদ সম্ভব নয়। প্রদর্শিত লক্ষণে লক্ষিত ব্রহ্মের কোন একদেশে অব্যাকৃতনামা মূল প্রকৃতিরূপ শক্তি থাকে। এই শক্তি ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়রূপ। শুদ্ধ সত্ত্ব গুণের প্রধানতায় অর্থাৎ উৎকৃষ্টসত্ত্ব প্রাবল্যে ঐ শক্তিতে মায়া এবং মলিন সত্ত্বগুণের প্রধানতায় অর্থাৎ মলিন সত্ত্ব প্রাবল্যে অবিদ্যা বলা হয়। রজঃ তমঃ দ্বারা অভিভব প্রাপ্ত হলে মলিন সত্ত্বগুণ নামে অভিহিত হয়। এই প্রকারে একই মূল প্রকৃতি, মায়া ও অবিদ্যা উভয়ই রূপ। শ্রুতি কথা — 'মায়াচাবিদ্যাচস্বয়মেবভবতি' অর্থাৎ উক্ত ত্রিগুণাত্মক-মূল প্রকৃতি নিজেই শুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রধানতায় মায়ারূপ আবার মলিন সত্ত্বগুণের প্রধানতায় অবিদ্যারূপ। এই মায়া অবিদ্যারূপ প্রকৃতির অন্য নাম 'অজ্ঞান'। উক্ত মায়াবিশিষ্ট যে ব্রহ্মচেতনা তাকে ঈশ্বর বলে তথা অবিদ্যা বিশিষ্ট ব্রহ্মচেতনার নাম জীব। এই প্রকারে একই ব্রহ্মচেতন মায়ারূপ উপাধির সম্বন্ধে ঈশ্বর সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত তথা অবিদ্যারূপ সম্বন্ধে জীবসংজ্ঞা প্রাপ্ত। যেমন একই আকাশ মঠরূপ উপাধি সম্বন্ধে মঠাকাশ আর ঘটরূপ উপাধি সম্বন্ধে ঘটাকাশ শব্দে অভিধেয় হয়। শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়ারূপ উপাধি বিশিষ্ট হওয়ায় ঈশ্বর সর্বজ্ঞ তথা সর্বশক্তিসম্পন্ন তথা আপনার পরমার্থিক শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপের আবরণ হতে রহিত তথা মায়ায় অনধীন অর্থাৎ মায়া তাঁর অধীন, তিনি মায়ার বশ্য নন। আর মলিন সত্ত্বপ্রধান অবিদ্যারূপ উপাধি বিশিষ্ট হওয়ায় জীব অল্পজ্ঞ, অল্প শক্তিমান্, আপনার পরমার্থিক শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বরূপের আবরণবিশিষ্ট হওয়ায় অবিদ্যার বশ্য অর্থাৎ অধীন। সৃষ্টির আদিকালে জীবগণের পুণ্যপাপ কর্মের প্রেরণায় উক্ত মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর চেতনে 'একোহহং বহুস্যাম্' অর্থাৎ এক আমি বহুরূপ হই এইরূপ মায়ায় বৃত্তিরূপ সংকল্প উদয় হলে উক্ত মায়ার বৃত্তিরূপ সংকল্পের বলে ঈশ্বর হতে দ্বৈতরূপ জগতের আবির্ভাব হয়। অনাদি অজ্ঞান-প্রভাবে মলিন গুণের প্রভাবে ব্রহ্মে জীবভাব এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণের প্রভাবে যথাক্রমে জীবভাব ও ঈশ্বরভাব ব্রহ্মে আরোপিত হয়। দ্বৈতরূপ প্রপঞ্চ জ্ঞানের মূল এই মায়া অবিদ্যা।

বেদান্ত মতে আত্মা বিভু ও এক, বহু নন, তবে যে আমরা বহু দেখি, বহুত্ব প্রতিভাসিত হয় তার মূল অজ্ঞান মায়া বা অবিদ্যা। আত্মজ্ঞানের উদয় হলে এই অজ্ঞানতার উচ্ছেদ ঘটে। যেমন দর্পণাদি নানা উপাধিতে একই মুখের নানা প্রতিবিম্ব হয় তদ্রূপ একই আত্মার অন্তঃকরণাদি উপাধি ভেদে নানাভাব (দৃষ্ট) হয় অথবা যেমন একই মহাকাশে ঘটমঠ পর্বতাদি উপাধিভেদে — ঘটাকাশ মঠাকাশদি রূপ — নানাভাব প্রতীত হয় তেমনি একই ব্রহ্মে মায়া অবিদ্যারূপ-উপাধি সম্বন্ধে জীব ঈশ্বর প্রপঞ্চরূপ নানা ভেদ অবারিত হয়। জীব ব্রহ্মের একতা বেদান্তশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় এবং এই একান্ত বিজ্ঞান পরম প্রয়োজন ও পুরুষার্থ। তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে

অজ্ঞানের নাম দ্বারা নিরাবরণ জীবের ব্রহ্মভাব প্রকটিত হলে সাধনার্থের নিবৃত্তি, পূর্ণানন্দ লাভ অর্থাৎ স্বস্বরূপে স্থিতি হয়। বেদান্ত শাস্ত্রে এই পরম অবস্থাই মোক্ষ শব্দে অভিহিত।

ডঃ শাস্ত্রীর বক্তৃতার পরেই একটি বিসদৃশ ঘটনা ঘটল। সভার এক প্রান্ত হতে জনৈক দ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী সহসা সভাপতির কাছে কিছু বলার অনুমতি চাইলেন। সভাপতিজী অনুমতি দিবা মাত্র তিনি নাটকীয় ভঙ্গীতে মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন —'এতক্ষণ ধরে দুই বক্তা অদ্বৈতবাদের জয়ঢক্কা নিনাদিত করলেন, তাঁদের কথায় মনে হতে পারে যে অদ্বৈতবাদই যেন সমগ্র বেদ উপনিষদের একমাত্র প্রতিপাদিত তত্ত্ব। আমি এই ধারণাকে একদেশধর্মী বলে মনে করি। কারণ বেদ এবং উপনিষদে এমন অনেক মন্ত্র লিখিত আছে, যাতে সুষ্ঠুভাবে বুঝা যায় দ্বৈতবাদও শ্রুতির অভিপ্রেত তত্ত্ব। ঋগ্বেদ ও সামবেদ দ্বারাও অর্থববেদের সৌভাগ্যকাণ্ডে অনেকগুলি উপনিষদ আছে, তার অধিকাংশই সগুণ ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশে পরিপূর্ণ। প্রমাণস্বরূপ কৃষ্ণযজুর্বেদীয় কঠশ্রুতির নিম্নলিখিত দুটি শ্লোক উপন্যাস করছি —

১) ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পচাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ॥ (১।৩।১)

এই মন্ত্রের তাৎপর্য হল — এই শরীরে একজন স্বকৃত কর্মফল ভোগ করেন, অপরজন ভোগ করান। প্রথম জনের নাম জীবাত্মা, দ্বিতীয় জন পরমাত্মা। উভয়েই মানুষের হৃদয়স্থিত পরম আকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে স্থিত আছেন। ব্রহ্মবিদগণ এই উভয়কে ছায়া ও আলোকের ন্যায় পরস্পর বিলক্ষণ স্বভাব বলে অনুভব করেন। কেবল যে ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানীগণ এইরূপ কথা বলেন তা নয়, গার্হপত্য, আহবনীয়, দক্ষিণা, সভ্য এবং আবসথ্য এই পাঁচ প্রকার অগ্নিবিদ্যার অনুশীলনকারীগণ এবং যাঁরা তিনবার নাচিকেত অগ্নির চয়ন করেছেন সেই ত্রিনাচিকেতগণও একই প্রকার কথা বলে থাকেন। মূল শ্লোকে 'পিবন্তৌ' পদটিতে দ্বিবচন থাকায় এই শ্রুতি মন্ত্রটি জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুটি তত্ত্বের অর্থাৎ দ্বৈতবাদের সমর্থক।

অর্থববেদের শৌনকীয় শাখার অন্তর্গত মুণ্ডক উপনিষদের আর একটি মন্ত্রও দ্বিতীয় প্রমাণস্বরূপ আমার বক্তব্যের সমর্থনে উপন্যাস করছি —

২) দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তি অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি॥ (৩।১।১)

এর মন্ত্রার্থ হল — সর্বদা যুক্ত ও পরস্পর সখ্যভাবাপন্ন দুইটি শোভন পক্ষ ও পক্ষী (জীবাত্মা ও পরমাত্মা) একই দেহে বৃক্ষকে আশ্রয় পূর্বক পরস্পর অলিঙ্গন করে আছে। তাদের মধ্যে একজন (জীব) দেহ-বৃক্ষের বিচিত্র আস্বাদ যুক্ত ফল (সুখ দুঃখাত্মক কর্মফল) ভোজন করে, অপরটি কিছু ভোজন না করে কেবল দর্শন করে।

দ্বৈতবাদ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে এক নয় বরং পরস্পর ভিন্ন এই বিষয়ে এই শ্রুতিমন্ত্রটিও দ্বৈতবাদের অকাট্য প্রমাণ।

এইসব উৎকৃষ্ট এবং সুস্পষ্ট শ্রুতি তথা বৈদিক প্রমাণসত্ত্বেও যদি কেউ বলেন যে দ্বৈতবাদ উপনিষদের অনভিপ্রেত তাহলে তা সত্যের অপলাপ মাত্র। অদ্বৈতবাদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত এই সভার সুপণ্ডিত বক্তাদেরকে এই সত্যটি স্মরণ করাবার জন্যই আমি নিতান্ত একজন অনুপ্রবেশকারীর মত কিঞ্চিত বাগ্-বিস্তার করে গেলাম।"

এই বলে তিনি সভামণ্ডপ হতে নেমে গেলেন। চারিদিকে একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা — পণ্ডিত ব্রহ্মদত্ত জিজ্ঞাসু এবং পণ্ডিত ডঃ আশুতোষ শাস্ত্রী তাঁদের অনবদ্য বক্তৃতায় কোথাও দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কটাক্ষ করেন নি, তবুও দ্বৈতবাদী ঐ সন্ন্যাসীর ঐ আকস্মিক উৎপাতে কিছুক্ষণ সবাই যেন হতচকিত হয়ে পড়লেন। এরপর করপাত্রজী ঐ 'অনুপ্রবেশকারী' বক্তার সমুচিত জবাব দেওয়ার জন্য আমার নাম ঘোষণা করে এই সম্বন্ধে কিছু অনুরোধ করেন। আমি সভায় উপস্থিত আচার্যদের পাদ-বন্দনা করে বলতে শুরু করলাম —

'এই অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় 'অদ্বৈতবাদের উৎস কি?' পূজনীয় পণ্ডিত জিজ্ঞাসু এবং আমার শিক্ষক শ্রীশাস্ত্রী মহাশয় সেই প্রসঙ্গ বলতে গিয়ে সুন্দর ভাবে দেখিয়েছেন যে ঋগ্বেদই অদ্বৈতবাদের উৎস। এতে কোন দ্বৈতবাদী মহাশয়ের ক্ষোভ বা উষ্মা প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। পূর্বোক্ত বক্তারা কেউই দ্বৈতবাদের

বিরুদ্ধে একটি কথাও বলেন নি। কাজেই মূল আলোচ্য বিষয় হতে সরে গিয়ে দ্বৈতানন্দজীর এইরূপ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণাকে আমি অশোভন বলেই মনে করি। তবুও তিনি যখন প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে এই সভায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছেন তখন মূল বিষয় সম্বন্ধে আমার ধারণা ব্যক্ত করার আগে যুযুধান বক্তার বক্তব্য সম্বন্ধে কিছু পর্যালেচনা করে নিতে চাই।

দ্বৈতবাদী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত আপাতঃ রমণীয় হলেও অভিনিবিষ্ট চিত্তে তাঁর উদ্ধৃত শ্রুতিমন্ত্র দুটির তাৎপর্য আলোচনা করলে সহজেই বুঝা যাবে যে বস্তুগত ভাবে তার দ্বারা দ্বৈতবাদ সমর্থিত হয় না এবং অদ্বৈতবাদের অবৈদিকতাও প্রতিপন্ন হয় না।

দ্বৈতবাদীরা একথাটি মনে রাখলে ভাল করবেন যে অদ্বৈতাবাদীরা ব্যবহারিক জগতে কখনও দ্বৈতপ্রপঞ্চের অপলাপ করেন না। তাঁরাও শাস্ত্র মনন, গুরুশিষ্য ভাবে আত্মবিদ্যার অনুশীলন করেন, সত্ত্বশুদ্ধির জন্য কর্মের অনুষ্ঠান করেন, চিত্তের একাগ্রতার জন্য উপাসনাদিও করে থাকেন। সুতরাং উপাস্য উপাসক ভাবে জীব ব্রহ্মের ঔপাধিক ভেদও স্বীকার করেন এবং আত্মসাক্ষাৎকারের জন্য যোগমার্গ আশ্রয় করেন। কিন্তু তাঁরা দ্বৈতপ্রপঞ্চের সত্যতা এবং পরমার্থিকতা স্বীকার করেন না। তাঁরা বলেন পরিদৃশ্যমান দ্বৈতপ্রপঞ্চ ব্যবহারিক এবং মায়াময় — অদ্বৈতই পরমার্থিক ও সত্য। সুতরাং অদ্বৈতবাদের মতেও উপনিষদে দ্বৈত প্রপঞ্চের উল্লেখ থাকতে পারে কিন্তু দ্বৈতপ্রপঞ্চ সত্য এরকম উপদেশ কদাপি কোন উপনিষদে নাই, থাকতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে দ্বৈতপ্রপঞ্চের মায়ামত্বই উপনিষদে উপবিষ্ট হয়েছে। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। পরমেশ্বর মায়ার দ্বারা বহুরূপে দৃষ্ট হন।

তাছাড়া 'ঋতং পিবন্তৌ' ইত্যাদি যে শ্লোকটি শুনিয়ে দ্বৈতানন্দজী দ্বৈতবাদ সমর্থন কতে চাইছেন, তিনি এবং অন্যান্য সব দ্বৈতবাদীদেরকে একথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ঐ মন্ত্রটি ভালভাবে মনন করলেই তাঁরা বুঝতে পারবেন যে ওখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মা যে পরস্পর ভিন্ন একথা প্রতিপাদিত হয় নি, পরন্তু একই আত্মার উপাধি ভেদে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপে স্বরূপই প্রতিভাসিত হয় মাত্র। উক্ত মন্ত্রে এই তাৎপর্যই প্রকটিত। কেননা একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে ঐ শ্লোকে ভেদের সত্যতা বোধক কোন শব্দই নাই। ভেদ যে বাস্তবিক নয় তার আরও কারণ এই যে মৃত্যু নচিকেতাকে তিনটি বর দিতে প্রতিশ্রুত হন। নচিকেতা প্রথম বরে পিতার সৌমনস্য এবং দ্বিতীয় বরে অগ্নিবিদ্যা প্রার্থনা করেন। ঐ বর দুটি গ্রহণের পর নচিকেতা তৃতীয় বর হিসাবে প্রার্থনা করেলন —

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥ (১।১।২০)

কেউ বলেন মৃত্যুর পর মানুষের দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব থাকে, কেই বলেন থাকেন না। এই যে প্রসিদ্ধ সংশয়, মরণের পর আত্মার অস্তিত্ব থাকে কিনা অর্থাৎ আত্মা দেহেন্দ্রিয় হতে ভিন্ন কিনা তা আমাকে বুঝিয়ে দিন। মৃত্যু নচিকেতাকে বহু প্রলোভন দেখিও যখন ঐ বর হতে নচিকেতাকে নিবৃত্ত করতে পারলেন না তখন তিনি নচিকেতার যথেষ্ট প্রশংসা করলেন এবং আত্মার যথার্থ স্বরূপের জ্ঞান হলে যে পরম পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় সে কথা স্বীকার করতে বাধ্য হলেন। নচিকেতা তখন আত্মার যথার্থ স্বরূপ জানতে চাইলেন। তদুত্তরে মৃত্যুও আত্মার দেহেন্দ্রিয় ভিন্নত্ব এবং তার যথার্থ স্বরূপের ব্যাখ্যা করেলন। ঋতং পিবন্তৌ — শ্লোকটি নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরদান কালে মৃত্যুর উক্তি।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে চিন্তা করা প্রয়োজন — নচিকেতা প্রশ্ন করেছিলেন জীবাত্মা বিষয়ে। নচিকেতার জীবাত্মা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যুর পরমাত্মা বিষয়ে উপদেশ প্রদান অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। এর থেকেই বুঝা যায় জীবাত্মার স্বরূপ এই পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপ হতে ভিন্ন নয় একথা বুঝানোই মৃত্যুর উদ্দেশ্য। বরং এই কথাই বলা যায় যে মৃত্যু এবংবিধ উত্তর দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এক, কেবল উপাধিভেদে ঘটাকাশ মঠাকাশের ন্যায় তাদের মধ্যে ভেদ প্রতীত হয়, জীবাত্মায় সংসারিত্ব অবিদ্যাকৃত, অবিদ্যার অভাবে পরমাত্মার সংসারিত্ব নাই। এই অভিপ্রায়ে নচিকেতার জীবাত্মা বিষয়ক প্রশ্নের উত্তরে মৃত্যু জীবাত্মা ও পরমাত্মার কথা বলেছেন।

এইভাবে তৃতীয় বর প্রার্থনা করে তার সদুত্তর পাবার পূর্বেই নচিকেতা পরমাত্মা বিষয়ে আর একটি প্রশ্ন

করে বসবেন, এটি সঙ্গত বা সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ যমের কথায় জানা যাচ্ছে তিনি ঐ প্রশ্নের পরেই নচিকেতাকে বারবার বলেছেন — ঐ প্রশ্নের উত্তর সুজ্ঞেয় নয়, দেবতারা ঐ বিষয়ে সন্দিহান। আমাকে এ বিষয়ে আর উপরোধ করো না, অন্য বর প্রার্থনা কর — নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি করলেন। পরিবর্তে অন্য বর দিতে চাইলেন। নানা প্রলোভনও দেখালেন। কিন্তু নচিকেতা কিছুতেই বিচলিত হলেন না। তিনি স্পষ্টই বললেন, যে বিষয়ে দেবগণও সন্দিহান, যাকে তুমি দুর্জ্ঞেয় বলছো এ বিষয়ে তোমার মত যোগ্য উত্তরদাতা কোথায় পাব? ঐ দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব ছাড়া আর অন্য কোন বর চাই না। মৃত্যু নচিকেতার দৃঢ়তা লোভশূণ্যতা দেখে তাঁর প্রশ্নের এবং তাঁর জ্ঞাতব্য তত্ত্ব — আত্মার পরমার্থ ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। একটু ধীরভাবে চিন্তা করলেই বুঝা যায় যে আত্মার যথার্থ স্বরূপ বলতে অনুরোধ করা প্রকারান্তরে পূর্ব প্রশ্নের ব্যাখ্যা মাত্র। কেননা, আত্মা দেহাদি স্বরূপ হলে মরণের পর আত্মার অস্তিত্ব থাকতে পারে না, আত্মা দেহাদি ভিন্ন হলেও মরণের পরেও তার অস্তিত্ব থাকতে পারে। নচিকেতার অনন্তর প্রশ্ন অর্থাৎ আত্মার যথার্থ স্বরূপ জিজ্ঞাসা পরমার্থ বিষয়ক প্রশ্ন — এ কল্পনা করা যেতে পারে না। কারণ, প্রতিশ্রুত প্রার্থিত বর দুর্জ্ঞেয় বলে তদুত্তর প্রদান করতে যম আপত্তি করেছেন অথচ নচিকেতা তদুপরি আরও একটি আরও একটি দুর্বিজ্ঞেয়তর বিষয়ে প্রশ্ন করবেন — এটা কোন ক্রমেই সম্ভবপর হতে পারে না। মৃত্যু যেভাবে নচিকেতার প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন, মনোযোগ পূর্বক তার পর্যালোচনা করলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, পরস্পর ভিন্ন নয় — এই কথাই তাঁর অভিপ্রেত। তিনি বক্ষ্যমানরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে আরম্ভ করলেন —

সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি তপাংসি সর্বাণি চ যদ্ বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীমি ওম্ ইত্যেতৎ॥ (১।২।১৫)

সমস্ত বেদ যে পদের প্রতিপাদন করে, সমস্ত তপস্যা যে পদলাভের সাধন, যে পদ লাভের ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য আচরিত হয়, সংক্ষেপে তোমাকে সেই পদ বলছি শোন, ওঁকারই সেই পদ। ওঁকার পরমাত্মার বাচক। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে যে জীবাত্মা এবং তার পরমার্থস্বরূপ বিষয়ে নচিকেতা প্রশ্ন করেছেন। মৃত্যু তদুত্তরের প্রারম্ভে পরমাত্মার কথা বলে জীবাত্মা ও পরমাত্মা অভিন্ন একথা জানিয়েছেন। এইরকম না বললে ঐ রকম প্রত্যুত্তর কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না।

নচিকেতা জীবাত্মা বিষয়ে প্রশ্ন করে পরে তার উত্তর পাবার পূর্বেই বরদানের অতিরিক্ত পরমাত্মা বিষয়ে আর একটি প্রশ্ন করে বসবেন এইরকম অসঙ্গত কল্পনা করলেও প্রশ্নের ক্রমানুসারে প্রথমতঃ জীবাত্মার কথা বলে পরমাত্মার কথা বলা মৃত্যুর উচিত হত। প্রথমতঃ পরমাত্মার কথা বলা এবং জীবাত্মা বিষয়ে পৃথকরূপে কোন কথা না বলাই প্রমাণ করে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা মূলতঃ এক ও অভেদতত্ত্ব একথা বলাই শ্রুতির অভিপ্রায়। আর একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধান করা কর্তব্য। মূল শ্লোকে 'ছায়াতপৌ' পদটি বিশেষ ইঙ্গিতবহ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিরা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে ছায়া ও রৌদ্রের মত সম্বন্ধ বিশিষ্ট বলেছেন। ছায়া বস্তুতঃ রৌদ্রই বটে, তবে উহা আবৃত ও খণ্ডিত। জীবাত্মাও স্বরূপতঃ পরমাত্মাই বটে তবে দেহমনের ক্রিয়া দ্বারা আবৃত হয়ে জীব আপনাকে ছায়ার মত খণ্ডিত ও পরিছিন্ন মনে করে। রৌদ্রকে আশ্রয় করেই ছায়া বর্তমান থাকে সেইরূপ জীবাত্মাও পরমাত্মাকে আশ্রয় করে বর্তমান। রোদ্র ব্যতীত ছায়ার অস্তিত্ব নাই। পরমাত্মা নিরপেক্ষ ছায়ার অস্তিত্বও অসম্ভব। জলে যেমন সূর্যের প্রতিবিম্ব পড়ে সেইরকম অন্তঃকরণে শুদ্ধ চৈতন্যের বিবর্ত বা আভাসই জীব। তাকেই এখানে ছায়া বলে অভিহিত করা হয়েছে এবং শুদ্ধচেতনাকে আলোক বলা হয়েছে। অন্তঃকরণে চৈতন্যের বিবর্তরূপ জীব পরমার্থতঃ চৈতন্যস্বরূপই। কল্পিত অন্তঃকরণের বিলয়ে শুদ্ধচৈতন্য মাত্রই বিরাজ করেন। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ঐ শ্রুতিমন্ত্র দুটির তাৎপর্য বুঝলে দেখা যাবে যে অদ্বৈতবাদই ওখানে ব্যঞ্জিত হয়েছে।

দ্বৈতানন্দজীর আরও বিবেচনা করা উচিত যে, ঋতং পিবন্তৌ — এই শ্লোকের কিছু পরেই কঠবল্লরীতে দ্বৈতের প্রতিষেদ এবং দ্বৈতাদর্শীর নিন্দা করা হয়েছে। যথা —

মনসৈবেদমাপ্তব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।
মৃত্যো স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ (২।১।১১)

আচার্য এবং শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা, সংস্কৃত মন দ্বারা এই ব্রহ্ম প্রাপ্তব্য। এই ব্রহ্মে অণুমাত্রও নানা অর্থাৎ ভেদ

নাই। যে এই ব্রহ্মে অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করে সে জন্ম মৃত্যু রূপ — সংসার প্রবাহে পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হয়। ঋতং পিবন্তৌ এই শ্লোকে জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তবিক ভেদ অভিপ্রেত হলে পূর্বাপর বিরোধ উপস্থিত হয়। অতএব কঠবল্লীর তাৎপর্য অদ্বৈতবাদের দ্বৈতবাদে নয় — ইহা স্থির হল।

মুণ্ডকোপনিষদের দ্বা সুপর্ণা ঐ বাক্যটি আপাততঃ স্পষ্টতর বলে প্রতীয়মান হলেও উহা কঠবল্লীর ঋতং পিবন্তৌ এই বাক্যের সমানার্থক, একথাটি একটু মন দিলেই বেশ বুঝা যায়। সুতরাং কঠবল্লীর ঋতং পিবন্তৌ এই বাক্যের মত মুণ্ডকোপনিষদের (৩।১।১) দ্বা সুপর্ণা এই বাক্যও দ্বৈতবাদ প্রতিপাদক না হয়ে অদ্বৈতবাদেরই প্রতিপাদক হবে — এটি সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। দ্বৈতবাদীরা অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদবাদীরা দ্বা সুপর্ণা এই মন্ত্রটিকে তাঁদের অনুকূলে অকাট্য প্রমাণ বলে বিশ্বাস করেন এবং তারই উপর সমধিক নির্ভর করেন সত্য কিন্তু ঐ মন্ত্রটি দ্বৈতবাদের অকাট্য প্রমাণ হওয়া ত দূরের কথা ওকে আদৌ কোন প্রমাণই বলা যায় না। আশ্চর্যের বিষয় তাঁরা তা লক্ষ্যই করেন না। কেন হয় না তার কারণ, দ্বা সুপর্ণা এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য জীবাত্মা ও পরমাত্মা নয়; অন্তঃকরণসত্ত্ব এবং জীবাত্মাই এই মন্ত্রের প্রতিপাদ্য। একথা আমার স্বকপোলকল্পিত ব্যাখ্যা নয় স্বয়ং বেদেই মন্ত্রটি ঐভাবেই ব্যাখ্যাত হয়েছে। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণে মন্ত্রটির বক্ষ্যমানরূপ ব্যাখ্যা দেখতে পাওয়া যায়।

তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং স্বাদু অত্তীতি সত্ত্বং অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি অনশ্নন্ অন্যোঽভিঃ পশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ ইতি। অর্থাৎ তয়োরণ্যঃ পিপ্পলং খাদন্তি — এই কথা দ্বারা সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তঃকরণের ফলভোক্তৃত্ব বলা হয়েছে। অনশ্নন অন্যোঽভিচাকশীতি-এর অর্থ এই যে অন্য ভোক্তা নয় কিন্তু দ্রষ্টা। অতএব দুটি পাখী জীবাত্মা ও পরমাত্মা নয়। এই দুটি পক্ষী হল অন্তঃকরণ ও জীবাত্মা। পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণে এইভাবে দ্বা সুপর্ণা মন্ত্রটির ব্যাখ্যা করে পরে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে —

তদেতৎ সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যতি অথ যোঽয়ং শরীর উপদ্রষ্টা স ক্ষেত্রজ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞাবিতি। অর্থাৎ যার দ্বারা স্বপ্নদর্শন সম্ভব হয় সেই অন্তঃকরণের নাম সত্ত্ব, যে শরীর অর্থাৎ জীবাত্মা দ্রষ্টা, তার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। অতএব অন্তঃকরণ ও জীবাত্মা যথাক্রমে সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ। অচেতন অন্তঃকরণের ভোক্তৃত্ব কিভাবে সম্ভবপর হতে পারে এই আশঙ্কার উত্তরে ভগবান শঙ্করাচার্য বলেছেন যে —

নেয়ং শ্রুতিরচেতনস্য সত্ত্বস্য ভোক্তৃত্বং বক্ষ্যামীতি প্রবৃত্তা, কিন্তর্হি চেতনস্য ক্ষেত্রজ্ঞস্যাভোক্তৃত্বং ব্রহ্মস্বভাবতাঞ্চ বক্ষ্যামীতি। তদর্থং সুখাদিবিক্রিয়াবতি সত্ত্বে ভোক্তৃত্বমধ্যারোপয়তি।

অর্থাৎ অচেতন অন্তঃকরণের ভোক্তৃত্ব বলা উক্ত মন্ত্রের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু চেতন ক্ষেত্রজ্ঞের অভোক্তৃত্ব এবং ব্রহ্মভাবত্ব প্রতিপাদন করাই তার উদ্দেশ্য। চেতন ক্ষেত্রজ্ঞের অভোক্তৃত্ব এবং ব্রহ্মস্বভাবত্ব বুঝাবার জন্য ক্ষেত্রজ্ঞের উপাধিভূত সুখাদি বিকারযুক্ত অন্তঃকরণে ভোক্তৃত্বের আরোপ করা হয়েছে। কারণ অন্তঃকরণ এবং ক্ষেত্রজ্ঞের অবিবেক নিবন্ধন ক্ষেত্রজ্ঞে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব কল্পিত হয় মাত্র। সুখাদি আকারে পরিণত বুদ্ধিসত্ত্বে চিৎ প্রতিবিম্ব পতিত হয় বলে চিত্তের ভোক্তৃত্ব প্রতীতি হয়ে থাকে। সুতরাং উহা অবিদ্যাজনিত (অবিদ্যক) ভিন্ন কোনক্রমেই পারমার্থিক হতে পারে না।

সুধী শ্রোতাগণ আশা করি বুঝতে পারছেন যে, বেদের যথার্থ অর্থ বুঝতে হলে কিরকম সাবধানতা ধীরতা ও বহুদর্শিতার প্রয়োজন হয় এবং তার বিন্দুমাত্র ত্রুটি হলে কিরকম বিপরীত অর্থগ্রহণ পরিগৃহীত হয়ে অনর্থের হেতু হয়। বেদজ্ঞ আচার্যদের মতে যে বাক্য জীবের ব্রহ্মভাববোধক, সেই বাক্যই জীবব্রহ্মের ভেদবোধকরূপে প্রতীয়মান হওয়া অর্থবোধের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বেদ তাৎপর্যবেত্তারা যথার্থই বলেছেন যে —

বিভেতি অল্পশ্রুতাৎ বেদো মাময়ং প্রহরিষ্যতি।

এ আমাকে প্রহার করবে এই বিবেচনায় বেদ অল্পবিদ্যাদেরকে ভয় করেন। প্রত্যেকের মনে রাখা উচিত যে পৌর্বাপর্যপারসৃষ্টঃ শব্দোঽন্যাং কুরুতে মতিম্ — পূর্বাপর পর্যালোচনা না করলে শব্দ বিপরীত বোধের কারণ হয়।

মূল কথা এই যে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্মই একমাত্র পরমার্থসৎ। ব্রহ্ম ভিন্ন কোন পদার্থের পারমার্থিক সত্তা নেই। দ্বৈতপ্রপঞ্চ পরমার্থ সত্য নয়। স্বপ্নদৃশ্য পদার্থ যেমন স্বল্পকালে যথার্থ বলে বোধ হয়, জাগতিক পদার্থও সেইরকম ব্যবহার দশায় অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পূর্বে যথার্থ বলে বোধ হয়। আত্মতত্ত্বজ্ঞান

হলে দ্বৈতের বিদ্যমানতা থাকে না। জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে — কাজেই দ্বৈতবাদীদিগের আপত্তি আপাততঃ রমনীয় হলেও উহা ভিত্তিশূণ্য এবং অকিঞ্চিৎকর। বক্তৃতা শেষ হল।

সভামঞ্চ হতে নেমে আসতেই শাস্ত্রীজী দৌড়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে স্নেহ-চুম্বনে ভরিয়ে তুললেন। আমি তাঁকে প্রণাম করে তাঁর আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম।

অদ্বৈতবাদের গহন রহস্য তথা ঋগ্বেদেই যে তার উৎসস্থল একথা অনবদ্য ভাষায় অন্যান্য দিকপাল পণ্ডিতবর্গ এমন সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করলেন যে তা আমার হৃদয়পটে চিরকাল মুদ্রিত হয়ে থাকবে।

তৃতীয় দিনের আলোচ্য বিষয় ছিল — 'বৈরাগ্য মহিমা'। সভাপতি ছিলেন স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি। প্রথম বক্তা, সোনার ঘড়ি ও সিল্কের গেরুয়া পরিহিত, জনৈক স্বামী সহজানন্দ গিরি, শুনলাম ইনি মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির* মন্ত্রশিষ্য বহুতর শ্লোক অনর্গল আবৃত্তি করার পর রাজা ভর্তৃহরির বৈরাগ্য বিষয়ে গল্প জুড়লেন — 'একবার এক সন্ন্যাসী ভর্তৃহরিকে একটি সুমিষ্ট ফল উপহার দিয়ে বলেছিলেন যে ফলটি ভক্ষণ করলে যৌবন অটুট থাকবে। রাজা প্রেমবশতঃ সেই ফল রাণীকে খেতে দিলেন। কিন্তু রাণীর একজন উপপতি ছিল। তার যৌবন যাতে অটুট থাকে সেই আশায় রাণী ফলটি দিলেন উপপতিকে। ঐ উপপতি আবার ভালবাসত এক বারাঙ্গনাকে। সে ফলটি নিজে না খেয়ে সেই বারাঙ্গনাকে উপহার দিল। বারাঙ্গনা ফলের গুণ শুনে ভাবল, নিজের কলুষিত জীবনকে দীর্ঘতর করে লাভ কি! তার চেয়ে প্রজাবৎসল দয়ালু রাজা যদি ফলটি ভক্ষণ করেন, তাহলে অটুট যৌবনশক্তির অধিকারী হয়ে তিনি আরও দীর্ঘকাল ধরে প্রজাদের মঙ্গলসাধন করতে পারবেন। এই ভেবে সে পরদিন রাজসভায় গিয়ে পরম শ্রদ্ধাভরে ফলটি রাজার হাতে দিয়ে এল। ফলটি পেয়ে রাজা ত বিস্ময়ে হতবাক্। সন্ন্যাসী প্রদত্ত যে ফল তিনি প্রাণ প্রেয়সী রাণীকে দিয়েছিলেন, সেই ফল কি ভাবে বারাঙ্গনার হাতে গেল সে সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করে সমূহ বিবরণ তিনি জানতে পারলেন। সংসারী লোকের ভাব-ভালবাসা এবং ভোগরাগ যে কত অকিঞ্চিৎকর তা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করলেন — অনুভব করলেন যে জাগতিক প্রেমের কোন মূল্য নাই। এর মূলে আছে শুধুই বঞ্চনা, স্বার্থপরতা এবং বিশ্বাসঘাতকতা।

সংসারের উপর রাজার ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মাল। রাজ্যপাট ত্যাগ করে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সেই সময়কার তাঁর একটি বিখ্যাত স্বগতোক্তি পণ্ডিতসমাজে আপ্তবাক্যের মত প্রচলিত আছে। ভর্তৃহরির সেই হৃদয় মথিত দীর্ঘশ্বাস নিম্নলিখিত শ্লোকে গাঁথা হয়ে আছে,

যাং চিন্তয়ামি সততং ময়ি সা বিরক্তা
সাপি অন্যমিচ্ছতি জনং স জনোহন্যসক্তঃ।
অস্মৎকৃতে চ পরিতুষ্যতি কাচিদন্যা
ধিক্ তাং চ তং চ মদনং চ ইমাং চ মাং চ॥
যার চিন্তা সদা করি, বিরক্ত সে আমার উপর,
চাহিছে সে অন্যজনে, অন্যে পুনঃ আসক্ত সে নর।
অপর কেহ বা মোরে, তুষ্ট করে, চাহে পুনরায়.
ধিক্ নারী, ধিক্ নরে, ধিক্ কামে, তারে ও আমায়।

---

* স্বামী মহাবেদানন্দ গিরি (বাং ১২৭৮-১৩৬৯) - ভারত প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মা শ্রীমৎ ভোলানন্দ গিরির মন্ত্রশিষ্য, শ্রীশ্রীভোলানন্দ সন্ন্যাস আশ্রমের প্রাক্তন সভাপতি ও আচার্য। পূর্বাশ্রমের নাম — পরেশনাথ লাহিড়ী, পিতার নাম — গিরীশ চন্দ্র লাহিড়ী, জন্মস্থান — ময়মনসিংহ জেলার পাথরাইদ গ্রাম। বি এল পাশ করার পর কর্মজীবনে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বে তিনি যে ভাবে গুরুর সংস্পর্শে আসেন, তাকে দৈব ঘটনা আখ্যা দেওয়া যায়। একবার কলিকাতায় গঙ্গাস্নান করতে গিয়ে বড়বাজারের এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার বারান্দায় একখণ্ড গৈরিক বস্ত্র ঝুলতে দেখে যেন এক চৌম্বকী আকর্ষণে তিনি গৃহস্বামী বা আর কারও অনুমতির অপেক্ষা না করেই তর্‌তর্ করে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যান এবং দেখেন, তাঁর ভাবী গুরু গিরিমহারাজ সহাস্যবদনে বসে আছেন। বাঙালী হিসাবে আমাদের বিশেষ গর্ব ও গৌরব এই যে, এই অদ্বৈতবাদী বাঙালী সন্ন্যাসী স্বীয় বিদ্যা ও তপস্যা প্রভাবে ভারতীয় সাধু সমাজে 'মহামণ্ডলেশ্বর' পদে অভিষিক্ত হয়ে সন্ন্যাসীদের উপর অখণ্ড প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করতে পেরেছিলেন। তত্ত্ববেত্তা দার্শনিক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল সর্বাধিক। বেদান্ত সোপান, উপনিষদ-রহস্য, বৈদিকযুগ, গীতাবোধিনী, অধ্যাত্মবিদ্যা, কথার কথা, নাসদীয় উপনিষদ ও পরিশিষ্ট প্রভৃতি গ্রন্থ ছাড়াও তাঁর লিখিত প্রবন্ধাবলীর সংখ্যাও দুই শতাধিক। তাঁর ভক্ত ও শিষ্যগণ গত ১৩৭৮ সালে শতবার্ষিকী পালন উপলক্ষ্যে বিশাল দুইখণ্ড পুস্তকে এই প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেছেন)

এ পর্যন্ত গিরিজীর বক্তৃতায় আপত্তির কোন কারণ ঘটে নি। কিন্তু যখন তিনি বললেন যে রাজা ভর্তৃহরি সন্ন্যাস গ্রহণের পর বাক্যপদীয় নামক স্ফোটবাদের বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, তখন আমার মনে উত্তাপ দেখা দিল। আমি সভাপতির অনুমতি নিয়ে ঐ উক্তির প্রতিবাদস্বরূপ বললাম —

'গিরীজীর সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ব্যাভিচারিণী স্ত্রীর উপর বিরক্ত হয়ে যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তিনি বাক্যপদীয় মহাগ্রন্থের রচয়িতা নন। রাজা ভর্তৃহরি এবং বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি উভয়ে স্বতন্ত্র ব্যক্তি। একমাত্র নাম-সাদৃশ্য ছাড়া শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক এবং বৈরাগ্যশতক প্রণেতা রাজা ভর্তৃহরি ও বাক্যপদীয় ও ভট্টিকাব্য প্রণেতা আচার্য ভর্তৃহরির জীবন ও জীবন-বেদে আর কোন মিল নাই। রাজা ভর্তৃহরি মালবদেশের অন্তর্গত উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন (৬ষ্ঠ - ৭ম শতাব্দী)। তাঁর পিতার নাম ছিল গন্ধর্ব সেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা যশোধর্মার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করেন। এই যশোধর্মাই মিহিরকুল ও অন্যান্য হূণদেরকে পর্যুদস্ত করে 'বিক্রমাদিত্য' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ভর্তৃহরির তপস্যাক্ষেত্র ছিল চুনার পর্বত। চুনারে এখনও তাঁর সমাধিক্ষেত্র রক্ষিত আছে। তাঁর লিখিত বই-এর নাম শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক এবং বৈরাগ্যশতক। অন্য ভর্তৃহরির হতে এই ভর্তৃহরির স্বাতন্ত্র্য চিনবার জন্য তাঁর লেখন-শৈলীরও (Style) যৎকিঞ্চিৎ পরিচ দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছি। প্রথমে শৃঙ্গারশতকের কথাই ধরা যাক। এই বই-এ কেবল কামকলারই কথা নাই, চপলমতি যুবকরা যাতে কোনমতে ক্ষণিক প্রলোভনের ফাঁদে পা না দেয় সেজন্য অনেক সাবধান বাণীও উচ্চারিত হয়েছে। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে কবি নিজের জীবনে মর্মযাতনা ভোগ করেছিলেন, এ জন্য স্ত্রীলোকদের সম্বন্ধে তাঁর বক্রোক্তি —

জল্পন্তি সার্দ্ধমন্যেন পশ্যন্ত্যন্যং সবিভ্রমম্।
হৃদয়ে চিন্তয়ত্যন্যং প্রিয়ঃ কো নাম যোষিতম্॥ ৮
বাক্যালাপ করে কারও সনে —
সবিভ্রমে চাহে অন্য পানে,
হৃদয়ে চিন্তয়ে অন্যে;
নারীর যে কে বা প্রিয়,
কেই বা তা জানে?

'বৈরাগ্যশতকে' ধ্বনিত হয়েছে তীব্র বৈরাগ্যের সুর। সংসার অনিত্য, এখানে তৃষ্ণার নিবৃত্তি কোনমতেই সম্ভব নয়, তবুও বাসনাবদ্ধ জীব কি ভাবে সেই মরীচিকার পেছনে উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে, ভর্তৃহরি তা দেখিয়েছেন বৈরাগ্যশতকের পঞ্চম শ্লোকে ঃ

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ।
প্রাপ্ত কার্ণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণেঽধুনা মুঞ্চমাম্॥
রতন মিলিবে ভাবি ক্ষিতিতল করেছি খনিত,
গিরি হতে ধাতু আনি অনলে করেছি বিগলিত।
সাগরে দিয়েছি পাড়ি, নৃপগণে তুষেছি যতনে,
কেটেছে শ্মশানে নিশা এক মনে মন্ত্রের সাধনে;
পাই নাই কানাকড়ি কোনখানে কখন কোথায়,
ওগো তৃষ্ণে! এবে তুমি ছাড়হ আমায়।

বৈরাগ্যশতকের কোন কোন শ্লোক শঙ্করাচার্য বিরচিত মোহমুদগরের শ্লোক স্মরণ করিয়ে দেয়। মোহমুদগরে আছে —

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিত শোভনদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চতি আশা ভাণ্ডম্॥ ৮

এরই পাশাপাশি বৈরাগ্যশতকের একটি শ্লোক শুনন, মানুষেরা ভোগলালসার নগ্নরূপটি দেখাতে গিয়ে

ভর্তৃহরি শঙ্করাচার্যের মতই তীব্র খেদের সঙ্গে বলছেন,

ভিক্ষাশনং তদপি নীরসমেকবারং
শয্যা চ ভূঃ পরিজনো নিজদেহমাত্রম্।
বস্ত্রঞ্চ জীর্ণপটখণ্ড নিবদ্ধকন্থাঃ
হা হা তথাপি বিষয়ান্ ন পরিত্যজন্তি॥ ১৬
নীরস ভিক্ষান্ন তাও জোটে একবার,
ভূমিশয্যা, নিজ দেহমাত্র পরিবার,
জীর্ণবস্ত্রে গাঁথা কন্থা তাহাই বসন,
হায় রে, বিষয় তবু নাহি ত্যজে মন।

সংক্ষেপে এই হল রাজা ভর্তৃহরির জীবন বৃত্তান্ত। একমাত্র নাম-সাদৃশ্য ছাড়া এঁর সঙ্গে বাক্যপদীয় ও ভট্টিকাব্য প্রণেতা আচার্য ভর্তৃহরির জীবন ও জীবন-বেদে আর কোন মিল নাই। পূর্বেই বলেছি বৈরাগ্যশতকাদি প্রণেতা ভর্তৃহরি ছিলেন রাজা কিন্তু বাক্যপদীয়কার রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন রাজার আশ্রিত। তাঁর পিতার নাম ছিল শ্রীস্বামী। টড ও ফার্গুসেনের ইতিহাস হতে জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গুজরাটে কাথিয়াবাড়ের অন্তর্গত বল্লভীপুরে শ্রীধর সেন নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁদের বংশের নাম বল্লভী বংশ। এই বল্লভী বংশ নিজেদেরকে শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর বলে দাবী করতেন। শ্রীধর সেনের আশ্রয়ে থেকেই যে আচার্য ভর্তৃহরি বাক্যপদীয় ও ভট্টিকাব্যের মত অমর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, ভট্টির ২২শ সর্গের একটি শ্লোকই তার প্রমাণ। তিনি লিখেছেন — কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বল্লভ্যাং শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্ (৩৫শ শ্লোক)। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ এবং ইৎসিঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হতেও আমরা এই ভর্তৃহরির (যাকে আমি অতঃপর আচার্য ভর্তৃহরি বলে উল্লেখ করব) স্থিতিকাল নির্ণয় করতে পারি। ইৎসিঙ্ লিখেছেন, ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাঁর ভারত আগমনের ৪০ বৎসর পূর্বে অর্থাৎ ৬৩৩ খৃষ্টাব্দে ভর্তৃহরির দেহান্ত ঘটে।

শাস্ত্রার্থের নামে নানারকম আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে যেভাবে গিরিজী অবলীলাক্রমে বিকৃত তথ্য পরিবেশন করতে আরম্ভ করেছিলেন তা নীরবে গলাধঃকরণ করা আমার পক্ষে কোন মতেই সম্ভব ছিল না। কি করব, আমি যে চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছি সত্যসন্ধ ঋষিরা যে শাস্ত্রের দ্রষ্টা এবং প্রণেতা, তার মধ্যে মিথ্যার কুহক মিশিয়ে বিকৃতি ঘটালে গুরুতর অপরাধ হয়। শাস্ত্রবাণীই আমাদের জ্ঞানদেহ তথা আন্তরসত্তার একাধারে জনয়িত্রী ও ধাত্রী। মাতা পিতার সঙ্গে এই জন্মের সম্বন্ধ কিন্তু শাস্ত্র আমাদের যে কত জন্মের মাতা পিতা তার ইয়ত্তা নাই। সুতরাং শাস্ত্র যে সকল তত্ত্ব অবধারণ করেছেন সে সম্বন্ধে কেউ পর্যনুযোগ* করলে তা বসে বসে সহ্য করে যাওয়াটাকে আমি কোনমতেই পুত্রোচিত কাজ বলে ভাবতে পারি না।

এই ঐতিহাসিক বিবরণ ছাড়াও উভয় ভর্তৃহরির মধ্যে এমন একটি বৈসাদৃশ্য আছে যা দিয়ে সহজেই বুঝা যায় যে উভয়েই সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবেন যে বৈরাগ্যশতকাদি প্রণেতা স্বভাব কবি হলেও তাঁকে ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞ বলা যায় না। কারণ তাঁর রচিত কোন কোন শ্লোকের অপাণিনীয় পদের বহুল প্রয়োগ আছে। কিন্তু বাক্যপদীয়কার ছিলেন ধুরন্ধর বৈয়াকরণ। অসামান্য প্রতিভাবলে তিনি স্বরচিত ভট্টিতে বেদের চক্ষু ব্যাকরণকে কাব্যরূপ দিয়েছিলেন। ভট্টিকাব্য চারখণ্ডে বিভক্ত। ১ম হতে ৫ম সর্গের নাম প্রকীর্ণকাণ্ড, ৬ষ্ঠ হতে ৯ম সর্গের নাম অধিকারকাণ্ড, ১০ম হতে ১৩শ সর্গের নাম প্রসন্নকাণ্ড এবং ১৪শ হতে ২২শ সর্গের নাম তিঙন্তকাণ্ড। উক্ত প্রসন্নকাণ্ডে অলঙ্কার শাস্ত্রের যে বিচার আছে, তাতে ভর্তৃহরিকে একজন শ্রেষ্ঠ আলংকারিকও বলা যায়।

কিন্তু এই বাহ্য। আচার্য ভর্তৃহরির সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় — তিনি স্ফোটবাদ তথা শব্দব্রহ্মবাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বক্তা। তাঁর বাক্যপদীয় একাধারে ব্যাকরণের দর্শন এবং স্ফোটবাদের আকরগ্রন্থ। স্ফোট কি? বৈয়াকরণদের

* শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের প্রতিকূল তর্ক উত্থাপন এবং সত্য মিথ্যার রঙ্ মিশিয়ে বিকৃত তথ্য পরিবেশন।

মতে স্ফোট হল পূর্ব পূর্ব বর্ণের অনুভবের সঙ্গে শেষ বর্ণের ব্যঞ্জনাবৃত্তির দ্বারা বোধ্য অখণ্ড শব্দবিশেষ। অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্। (৩।৩।১৯) — পাণিনির এই সূত্রানুসারে কর্মবাচ্যে বা অপাদান বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করেও স্ফোট শব্দটি নিষ্পন্ন হয়। (৩।৩।১৮) — পাণিনির এই সূত্রানুসারে ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করেও শব্দটি সাধিত হতে পারে। নাগেশ ভট্ট[১] প্রভৃতি আচার্যগণ অপাদান বাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করে স্ফোট শব্দের নিষ্পত্তি করেছেন। এই জন্য তাঁরা বুৎপত্তি দিয়েছেন - স্ফুটত্যর্থোঽস্মাদিতি স্ফোটঃ। এই ব্যুৎপত্তি গ্রহণ করলে অর্থপ্রতিপাদন সমর্থ শব্দেরই স্ফোট সংজ্ঞা হয়। আবার, কর্মবাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করে স্ফুট্যতে (প্রকাশ্যতে) যঃ স স্ফোটঃ' এই রকম ব্যুৎপত্তি করলে শব্দ ও অর্থ উভয়েরই স্ফোটসংজ্ঞা হতে পারে। তৃতীয়তঃ ভাববাচ্যে ঘঞ্ প্রত্যয় করে 'স্ফোটনং স্ফোটঃ' এই রকম ব্যুৎপত্তি করলেও শব্দের প্রকাশ বা উচ্চারণের যেমন স্ফোটসংজ্ঞা হতে পারে, তেমনি অর্থের প্রকাশ ও উপলব্ধিরও স্ফোটসংজ্ঞা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

বৈয়াকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বদর্শনসংগ্রহের পাণিনি দর্শনে মাধবাচার্য বলেছেন — স্ফুট্যতে ব্যজ্যতে বর্ণৈরিতি স্ফোটঃ। বর্ণানাং বাচকত্বানুপপত্তৌ যদ্ বলাৎ অর্থ প্রতিপত্তিঃ স স্ফোটঃ। বর্ণাতিরিক্তো বর্ণাভিব্যঙ্গোঽর্থপ্রত্যায়কো নিত্যঃ শব্দঃ স্ফোট ইতি তদ্বিদো বদন্তি। এর তাৎপর্য এই যে, বর্ণসমূহের বাচকত্ব উপপন্ন নয়, সুতরাং যে জন্য অর্থপ্রত্যয় হয় সেই শব্দের স্ফোট। ক্ষণস্থায়ী বর্ণের দ্বার অভিব্যক্ত হলেও এইটি বর্ণাতিরিক্ত নিত্য শব্দ। এই কথার দ্বারা বুঝতে হবে যে, নিত্যানিত্য ভেদে শব্দ দুই প্রকার। তারমধ্যে স্ফোটই প্রাকৃত বা নিত্য শব্দ, এবং বর্ণাত্মক যত শব্দ সেগুলি বৈকৃত বা অনিত্য শব্দ। যেমন ধরুন, ঘ-কার, অ-কার, ট-কার ও অ-কার — এই চারটি বর্ণের সমষ্টি যে ঘট (ঘ + অ + ট + অ) শব্দ, তার দ্বারা একটি 'কলস' এর বোধ জন্মে। কিন্তু ঐ সকল বর্ণের মধ্যে ঘ-কার বা ট-কার পৃথকভাবে ঘটের বোধ জন্মাতে পারে না এবং ঘ-কারের পর ট-কারও ঘটের বোধ জাগাতে পারে না, কারণ ট-কারের উচ্চারণ কালে ঘ-কারের নাশ হয়। এই রকম বস্তুগতি দেখে বৈয়াকরণেরা মনে করেন, যে 'ঘ' কারাদি বর্ণসমূহের দ্বারা প্রথমতঃ স্ফোটের অভিব্যক্তি হয় এবং পরে ঐ স্ফোটের দ্বারাই কলসার্থক ঘটের বোধ উৎপন্ন হয়ে থাকে। স্বল্পকথায় মূলতঃ এরই নাম স্ফোটবাদ।[২] ক্রমশঃ সবিকল্পক জ্ঞানকে পরিত্যাগ করে নির্বিকল্প জ্ঞানে উপনীত হওয়ার জন্য যোগসূত্র প্রণেতা পতঞ্জলি বিভূতিপাদের 'শব্দার্থপ্রত্যায়ানাং' ইত্যাদি সূত্রে শব্দ, অর্থ ও প্রত্যয়ের বিভাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। এই রকম বিভাগ করার সময় দেখা যায় যে, কেবল নাদ কেন, এর কোন একটি ধ্বনি আবির্ভূত ও তিরোভূত হলেও তা শ্রোতার মনে কোন না কোন অর্থ উৎপাদন করে একটি প্রত্যয় রেখে যায়। জীবনে প্রথম যখন সমুদ্র দেখতে গিয়ে তার ভীষণ তরঙ্গাঘাত দেখলাম, তখন সেই সঙ্গে তার এক অপূর্ব গর্জনও শুনলাম। যা শুনলাম তা বৈকৃত ধ্বনি, তরঙ্গাঘাতে ঐরকম শব্দ হচ্ছে এবং ঐ শব্দের একটি বিশেষত্ব আছে — সেটাই তার অর্থ, সমুদ্র হতে বহুদূরে চলে গেলে, স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পর সমুদ্রের সেই তরঙ্গজাত শব্দ বা তার বিশেষত্ব রূপ 'অর্থ' তিরোহিত হয়। কিন্তু তিরোহিত হবার পরেও যা আমার মনে আরূঢ় থাকে তারই নাম প্রত্যয় রূপ ধ্বনি। এই ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত হতে বুঝা যায় যে, বর্ণাত্মক পূর্বোক্ত 'ঘট' শব্দ উচ্চারিত হলে যা আমি

১। নাগেশ ভট্ট - (১৭০০-১৮০০ শতাব্দী) - শিবভট্টের ঔরসে সতীদেবীর গর্ভে মহারাষ্ট্র দেশে নাগেশ জন্ম গ্রহণ করেন। প্রয়াগ সন্নিহিত শৃঙ্গবেরের রাজা রামদেবের তিনি ছিলেন প্রধান সভাপণ্ডিত। অলংকার শাস্ত্রে কাব্যপ্রকাশের উপর বৃহদুদ্যোতোদাহরণ দীপিকা, রসগঙ্গাধরের উপর গুরুমর্ম প্রকাশ নামক টীকাদি ছাড়াও তিনি পদার্থদীপিকা (ন্যায়গ্রন্থ), সাংখ্যসূত্রবৃত্তি, যোগসূত্রবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ব্যাকরণশাস্ত্রে নাগেশ রচিত পরিভাষেন্দুশেখর, প্রদীপোদ্যোত, বৈয়াকরণভূষণ, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্ত মঞ্জুষা এবং লঘুমঞ্জুষা বৈয়াকরণদের নিকট বিশেষ আদরের বস্তু।

২। স্ফোটবাদ — বৈয়াকরণরা আবার ধ্বনিকেও স্ফোট বলেন। মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত ফণিভাষ্যে বলা হয়েছে — ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দানাং ধ্বনিস্তু খলু লক্ষ্যতে। ব্যাকরণ মতে ধ্বনি দ্বিবিধ - প্রাকৃত ও বৈকৃত। সেই জন্য বাক্যপদীয় গ্রন্থে ভর্তৃহরিও বলেছেন — স্ফোটস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে। স্থিতিভেদে নিমিত্তত্বং বৈকৃতঃ প্রতিপদ্যতে। আচার্য কৌণ্ড ভট্টের মতে স্ফোট দ্বিবিধ — ব্যক্তিস্ফোট এবং জাতিস্ফোট। ব্যক্তিস্ফোট পাঁচ প্রকার —বর্ণস্ফোট, পদস্ফোট, বাক্যস্ফোট, অখণ্ডপদ-স্ফোট ও অখণ্ডবাক্য স্ফোট। জাতিস্ফোট তিন প্রকার — বর্ণজাতি-স্ফোট, পদ-জাতি স্ফোট ও বাক্য-জাতি স্ফোট। বৈয়াকরণভূষণসারে এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা আছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত জানতে হলে মহাভাষ্য, বাক্যপদীয়, প্রদীপ, উদ্যোত, মঞ্জুষা, শব্দকৌস্তভ, স্ফোটচন্দ্রিকা এবং স্ফোটসিদ্ধিন্যায়বিচারাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পুন্যরাজকৃত বাক্যপদীয়ের টীকা এবং নাগেশ ভট্ট কৃত লঘুমঞ্জুষা টীকা বাক্যপদীয়ের মর্মার্থ বোধের সহায়িকা। এ ছাড়া বিখ্যাত বেদভাষ্যকার উবটাচার্যের পুত্র মহামতি কৈয়ট তৎকৃত মহাভাষ্যের 'প্রদীপ' নামক টীকায় দুর্গম স্ফোটবাদের অনেক দুরূহ তত্ত্বকে যথাসম্ভব সুগম করে দিয়েছেন।

শুনি, তা হল বৈকৃত ধ্বনি; ঐরূপ শুনে যখন ঘট বিশেষের কথা মনে পড়ল, তখন সেইটাকে বলা যাবে বৈকৃত ধ্বনির অর্থ; এবং ঐ দুইটিই অপগত হওয়ার পরও যা আমার মনে নির্বিশেষভাবে বদ্ধ থাকে, সেটাই হল তার প্রত্যয়রূপ প্রাকৃত ধ্বনি। সুতরাং শব্দমাত্রই প্রত্যয়ের স্মারক। তবে বর্ণহীন ধ্বনি তদ্গত বা তজ্জাতীয় প্রত্যয়ের স্মারক আর বর্ণাত্মক ধ্বনি বা নাদ তদ্ব্যতিরিক্ত প্রত্যয়ের স্মারক। বৈয়াকরণরা বলেন, যা আবির্ভাবের পর তিরোভূত হয়েও এইভাবে একটি প্রত্যয় রেখে যায়, তার অবশ্যই কোন না কোন একটি শক্তি আছে বলে স্বীকার করতে হবে। এই শক্তিই শব্দের স্ফোটশক্তি বা প্রাকৃত ধ্বনি। পতঞ্জলি এই শব্দগত স্ফোটকে ব্রহ্মের বিশেষণে বিশেষিত করার পর মন্তব্য করেছেন ধ্বনিঃ স্ফোটশ্চ শব্দনাং ধ্বনিস্ত খলু লক্ষ্যতে অর্থাৎ শব্দের দুটি তত্ত্ব — ধ্বনি ও স্ফোট। যা ব্যঞ্জক তা ধ্বনি আর যা বাচক তা হল স্ফোট।

স্ফোট সম্বন্ধে পূর্বাচার্যদের এই অভিমত মোটামুটিভাবে স্বীকার করে নিয়ে স্ফোটের অর্থনিহিত যৌগিক রূপকে আরও পরিস্ফুট এবং প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন আচার্য ভর্তৃহরি। তাঁর উপলব্ধ স্ফোটবাদ সুপ্রাচীন শব্দব্রহ্মবাদের দার্শনিক রূপ। তাঁর রচিত 'বাক্যপদীয়ম্'-এর প্রথম খণ্ড ব্রহ্মকাণ্ড নামে বিখ্যাত। সেখানে প্রথম শ্লোকেই তিনি ঘোষণা করেছেন —

অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেহর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥

অর্থাৎ শব্দতত্ত্ব অনাদি-নিধন অর্থাৎ উৎপত্তি বিনাশ রহিত, ব্রহ্ম (সর্বব্যাপক পরমতত্ত্ব) এবং অক্ষর (বিকৃতিবিহীন)। এই শব্দতত্ত্ব অর্থরূপে বিবর্ত্তিত হয় এবং এই শব্দতত্ত্ব হতেই যাবতীয় সৃষ্টিকার্য সংঘটিত হয়ে থাকে।

ব্যুৎপত্তি অনুসারে যদিও ব্রহ্ম শব্দের অর্থ সর্বব্যাপী তথাপি শ্লোকে অনাদি-নিধন, অক্ষর এবং জগৎকারণ রূপে বর্ণনা করায় স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে, বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের সঙ্গে শব্দতত্ত্বের অভিন্নতা প্রতিপাদনই আচার্য ভর্তৃহরির অভিপ্রায়। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, গ্রন্থের প্রথম শ্লোকেই তিনি শব্দতত্ত্বকেই অনাদি-নিধন প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত করেছেন, শব্দকে নয়। শব্দ ও শব্দতত্ত্বের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য বর্তমান। ভর্তৃহরি এখানে কি অভিপ্রায়ে শব্দতত্ত্ব শব্দটি গ্রহণ করেছেন তা বুঝবার জন্য টীকাকার পুণ্যরাজ বলেছেন — সর্বশব্দরূপতয়া সর্বশব্দোপগ্রাহ্যতয়া চ শব্দতত্ত্বমভিধীয়তে। টীকাকারের এই কথাকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। প্রথমতঃ বলা যেতে পারে, ভর্তৃহরি বিশেষ কোন শব্দের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করেন নি, কেবল শব্দজাতির ব্রহ্মত্বই স্বীকার করেছেন, এ কথা বুঝানোই পুণ্যরাজের উদ্দেশ্য। শব্দজাতির মধ্যে সকল শব্দই আছে। সুতরাং তার সর্বশব্দরূপতা স্বীকার্য, আবার সকল শব্দ দ্বারাই শব্দজাতির গ্রহণ হয়, অতএব সর্বশব্দোগ্রাহ্যতাও স্বীকার করতে হয়। গো শব্দ দ্বারা যেমন গো জাতির গ্রহণ হয়, শব্দগুলির দ্বারাও তেমনি শব্দজাতির গ্রহণ হয়ে থাকে — এটাই হল সর্বশব্দোপগ্রাহ্যতা কথাটির তাৎপর্য।

দ্বিতীয়তঃ বলা যেতে পারে — কেবলমাত্র শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাটির ব্রহ্মত্ব প্রতিপাদনের জন্যই উক্ত শ্লোকে শব্দ না বলে শব্দতত্ত্ব বলা হয়েছে। শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাকে ভর্তৃহরি অন্যত্র পরাবাক্ নামে অভিহিত করেছেন। একেই তিনি অবাঙ্মনসগোচর অনাদি-নিধন শব্দব্রহ্ম বলে মনে করেন। যেহেতু সূক্ষ্ম অবস্থায় সকল শব্দই এক রূপে অবস্থান করে সেই হেতু তার শব্দরূপতা অবশ্যই মান্য। আবার সকল শব্দের মূলে এই সূক্ষ্মতম অবস্থা বিদ্যমান থাকলে তার সর্বশব্দোপগ্রাহ্যতাও স্বীকার করা যেতে পারে। অর্থাৎ যে কোন শব্দ শুনলেই বুঝা যায় যে, সে তার সূক্ষ্মতম অবস্থা হতে উদ্ভূত হয়েছে।

উল্লিখিত দুটি কারণেই ভর্তৃহরি শব্দতত্ত্বের ব্রহ্মত্ব স্বীকার করতেন না, — এদের মধ্যে যে কোন একটি তাঁর অভিপ্রেত ছিল?

এ কথা সবাই জানেন, ভাববোধক ত্ব প্রত্যয় জাতি বুঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তস্য ভাবস্ততলৌ (৫।১।১১৯) — এই পাণিনির সূত্রের ব্যাখ্যায় বার্ত্তিককার তা স্বীকার করেন, যথা — গোত্ব, অশ্বত্ব, নরত্ব ইত্যাদি। আচার্য কৌণ্ড ভট্টও তাঁর বৈয়াকরণ ভূষণসার গ্রন্থে ত্ব ও তল্ প্রত্যয়ের জাতিবোধকতাই স্বীকার করেছেন। বস্তুতঃ শব্দজাতির নিত্যত্ব ও ব্রহ্মত্বই যদি আচার্যের অভিপ্রেত হত, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই শব্দের সঙ্গে 'ত্ব' প্রত্যয় যোগ করে শ্লোকে 'শব্দত্বম্' কথাটি প্রয়োগ করতেন। কিন্তু অতিরিক্ত একটি তদ্ শব্দের

সন্নিবেশ ক্রমে তার সঙ্গে জাতি বা ভাববোধক 'ত্ব' প্রত্যয় যোগ করে 'শব্দতত্ত্বম্' পদের প্রয়োগের দ্বারা আচার্য ভর্তৃহরি একটি সূক্ষ্ম অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে চেয়েছেন বলে আমি মনে করি। সেটি কি?

শাস্ত্রে আছে, ঋষিরা উপলব্ধি করেছেন যে বর্ণাত্মক শব্দের চারটি অবস্থা — পরা, পশ্যন্তী, মধ্যমা এবং বৈখরী। তার মধ্যে কেবল পরা নাম্নী শব্দের সূক্ষ্মতম অবস্থাটির মধ্যেই নিত্যতা প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান, অতএব এই পরাবাকই ব্রহ্ম পদবাচ্য — এই কথা বুঝাবার জন্যই আচার্য শব্দ বা শব্দত্ব না বলে মূল শ্লোকে শব্দতত্ত্ব পদটি ব্যবহার করেছেন। আচার্য নাগেশ ভট্ট তাঁর লঘুমঞ্জুষা নামক গ্রন্থে ভর্তৃহরির এইটাই যে অভিপ্রায় তা ব্যক্ত করেছেন এবং লঘুমঞ্জুষার কলাটীকায় আচার্য বালভট্টও স্পষ্ট বলেছেন যে ভর্তৃহরির মতে পরা ভিন্ন অবশিষ্ট তিনটি অবস্থাই শব্দব্রহ্মের বিবর্ত* ব্রহ্মে বহুভবনের ইচ্ছা সমুদিত হলেই তিনি শব্দতত্ত্বে বিবর্তিত হন। কারণ শব্দগত নাম ব্যতীত তাঁর বহুত্ব কখন উপলব্ধি হয় না। আকাশ যেমন অখণ্ড, মহান্ হয়েও ঘটাকাশ মহাকাশ বলে গৃহীত হয় তেমনি শব্দব্রহ্ম হতেই জগন্নিদান শব্দতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন নামাদির দ্বারা প্রপঞ্চিত হয়ে থাকে এবং তার ফলেই ব্যবহারিক জগৎপ্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হচ্ছে।

এই হল ভর্তৃহরির প্রতিপাদিত শব্দব্রহ্মবাদের মূল কথা। এই রহস্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন —'একাক্ষরা বৈ বাক্, ওঙ্কারো বাগেবেদং সর্বম' ইত্যাদি শ্রুতিমন্ত্রের অভিপ্রায় এই যে একমাত্র সূক্ষ্মা অনপায়িনী বাক্‌শক্তি বিশ্বের নাম রূপে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান রয়েছে। এঁরই অপর নাম শব্দব্রহ্ম, বিন্দু বা আন্তর প্রণব। এঁরই সাহায্যে শব্দবোধ হয় বলে এই সূক্ষ্ম অনপায়িনী বাক্‌শক্তি স্ফোট পদবাচ্য। বস্তুতঃ স্ফোটাত্মক শব্দব্রহ্ম স্বীকৃত না হলে বেদমন্ত্রের অর্থই সুগম হত না। স্ফোট হল সঙ্কেতের সঙ্কেত। স্ফোট না থাকলে কখনও উপলব্ধির প্রবর্তক হত না।

স্মরণাতীত কাল হতে ভারতবর্ষে শব্দতত্ত্ব ও শব্দের স্বরূপ নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছে এবং শব্দরহস্যবিদ্ মুনিদের ব্যাখ্যায় স্ফোটের পূর্বোক্ত বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি অনুসারে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বিভিন্ন সময়ে অভিব্যক্ত হয়েছে। 'অবাঙ্ স্ফোটায়নস্য' (৬।১।১২৩) — পাণিনির এই সূত্র হতে স্পষ্টতই জানা যায় যে পাণিনির বহু পূর্ব হতেই ভারতে স্ফোটবাদের আলোচনা হত। জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ স্ফোটবাদ সম্বন্ধে বিস্তর গবেষণা করেছিলেন বলেই তাঁর নাম হয়েছিল স্ফোটায়ন। কিন্তু তথাপি স্ফোটবাদ সম্বন্ধে আচার্য ভর্তৃহরির অবদানই সর্বাধিক। বাক্যপদীয় গ্রন্থে তিনিই স্ফোটবাদকে অধিকতর জনপ্রিয় করে তুলেছেন। তুলনামূলক ভাবে বিচার করলে দেখা যাবে যে পূর্ববর্তী স্ফোটবাদীদের সঙ্গে তাঁর কোন কোন বিষয়ে যেমন মিল আছে, তেমনি অমিলও অনেক। দু'একটি উদাহরণ দিলেই তা স্পষ্ট হবে।

(ক) স্ফোট ও ধ্বনির মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে প্রাচীন স্ফোটবাদীদের সঙ্গে ভর্তৃহরির চিন্তাধারার কোন প্রভেদ ছিল না। তাঁরা বলতেন — শব্দের অর্থপ্রকাশের নাম স্ফোট এবং তার উচ্চনীচ অবস্থার নাম ধ্বনি। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য তাঁরা উদাহরণ দিয়েছেন — মনে করুন কেউ কোন নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন। যাঁরা তাঁর নিকটতর, তাঁদের কানে ঐ উচ্চারিত শব্দ যেমন তীব্রভাবে আঘাত করবে, যাঁরা দূরে বা দূরতর স্থানে অবস্থান করছেন তাঁদের কানে ঐ শব্দ মৃদুতর ভাবে আঘাত করবে। ফলে নিকটবর্তী লোক শুনবে উচ্চতম ধ্বনি কিন্তু অধিকতর দূরত্বে স্থিত লোকজন শুনবে মধ্যম রকমের ধ্বনি আর অতি দূরে যাঁরা তাঁরা শুনবেন অতি মৃদু ধ্বনি। যদিও বিভিন্ন ব্যক্তির কানে এইভাবে একই শব্দের তীব্রমন্দাদিভেদে বিভিন্ন প্রকারের শ্রবণের তারতম্য ঘটবে তথাপি তাতে কানে অর্থের পার্থক্য ঘটবে না। যেমন তীব্রভাবে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারিত

---

* বিবর্ত - বাস্তব পদার্থের অবাস্তব পদার্থরূপে যে প্রতীতি হয় তাকে বিবর্ত বলে। আমরা জানি কোন পদার্থের অন্য পদার্থরূপে পরিবর্তন বা পরিদৃশ্যমান হওয়া সাধারণতঃ দুভাবে হয়ে থাকে। যখন কোন বাস্তব পদার্থ অন্য একটি বাস্তব পদার্থে রূপান্তরিত হয়, বেদান্তের ভাষায় তখন বলা হয়ে থাকে যে, সে পদার্থান্তরে পরিণত হয়েছে। দুগ্ধ যে দধিতে রূপান্তরিত হয় — এ তার পরিণাম। অদ্বৈতাবেদান্ত মতে এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নন, ব্রহ্ম জগদাকারে পরিণত হন নি। তাঁদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, ব্রহ্মই একমাত্র বাস্তব পদার্থ — জগৎ মায়াময় অবাস্তব। তথাপি রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত বাস্তব ব্রহ্মের অবাস্তব জগৎরূপে প্রতীতি হচ্ছে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের মত ব্রহ্মে অসত্য মায়াময় জগতের এই যে অস্তিত্ব ভ্রম তাকেই বেদান্তের ভাষায় বিবর্ত বলা হয় —

স তত্ত্বতো অন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ। (বেদান্তসারধৃত)
অতত্ত্বতো অন্যথা প্রথা বিবর্ত ইত্যুদীরিতঃ॥

অশ্ব শব্দ যে অর্থ বুঝায়, মৃদুভাবে ও অতি মৃদুভাবে উচ্চারিত অশ্ব শব্দটি সেই অর্থই বুঝিয়ে থাকে। অশ্ব শব্দের এইরূপ অর্থপ্রকাশনের নাম স্ফোট এবং তার উচ্চাবচ প্রভৃতি বিভিন্ন অবস্থার নামই ধ্বনি। ভর্তৃহরি 'স্ফোটারূপাবিভাগেন ধ্বনের্গ্রহমিশয্যতে' কথাটির দ্বারা স্ফোট ও ধ্বনির মধ্যে এই প্রকার পার্থক্যই স্বীকার করেছেন এবং তা দেখাতে গিয়ে বলেছেন, ধ্বনি দ্বিবিধ — প্রাকৃত ও বৈকৃত। তার মধ্যে প্রাকৃত ধ্বনি স্ফোটগ্রহণের হেতু এবং শব্দ উচ্চারণের পর উচ্চনীচ প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে যে তার প্রকাশ হয় তাই বৈকৃত ধ্বনি —

বর্ণস্য গ্রহণে হেতুঃ প্রাকৃতো ধ্বনিরিষ্যতে।
শব্দস্যোর্দ্ধমভিব্যক্তেবৃত্তিভেদে তু বৈকৃতাঃ।।
ধ্বনয়ঃ সমুপোহন্তে স্ফোটটাত্মা তৈ র্ন ভিদ্যতে।। (বাক্যপদীয়, ব্রহ্মকাণ্ড, ৭৭-৭৮)

(খ) বৈয়াকরণরা শব্দের নিত্যত্ব স্বীকার করেছেন। মহর্ষি পাণিনি 'তদ্‌শিষ্যং সংজ্ঞা-প্রমাণত্বাৎ' সূত্রে শব্দের নিত্যতা সমর্থন করেছেন। মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিও 'নিত্যেষু শব্দেষু কূটস্থৈঃ' প্রভৃতি কথা দ্বারা শব্দের নিত্যতা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে আচার্য ভর্তৃহরির চিন্তা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও মৌলিক। তিনি শুধু শব্দের নিত্যতাই স্বীকার করেন নি, শব্দ, অর্থ ও তার সম্বন্ধেকেও তিনি নিত্য বলে সিদ্ধান্ত করেছেন,

নিত্যাঃ শব্দার্থসম্বন্ধাঃ সমাম্নাতা মহর্ষিভিঃ।
সূত্রাণাং সানুতন্ত্রানাং ভাষাণাঞ্চ প্রণেতৃভিঃ।। (ঐ, শ্লোক ২৩)

(গ) স্ফোটবাদী মাত্রেই প্রায় সকলেই অর্থ-প্রতিপাদন-সমর্থ শব্দের স্ফোটত্ব স্বীকার করলেও কেউ কেউ বলেছেন যে কণ্ঠতালু প্রভৃতি সংযোগের ফলে উচ্চারণকারীর বদন সম্মুখস্থ আকাশে একটি শব্দ উৎপন্ন হয়, এরই নাম স্ফোট, কেউ বলেছেন যেহেতু কোন শব্দের উচ্চারণ ব্যতিরেকে তার দ্বারা অর্থবাধ হওয়া সম্ভব নয়, যা কারও শ্রবণগোচর হলনা তাদৃশ সূক্ষ্ম শব্দ কেমন করে অপরের অর্থবোদ জন্মাবে? অতএব উচ্চারিত শ্রবণযোগ্য শব্দগত ধ্বনিই স্ফোট, আবার কেউ বা তত্ত্বটিকে আরও বিশদ করে বুঝাতে গিয়ে বলেছেন যে, স্ফোট ও ধ্বনি হিসাবে যদি শব্দের মধ্যে দুটি বিভাগ কল্পনা করতে হয়, তাহলে বরং সার্থক শব্দগুলি স্ফোট বলে নিরর্থক শব্দগুলিকে ধ্বনি বললে তাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে। এই নিরিখে মেঘগর্জনাদি নিরর্থক শব্দগুলির স্ফোট সংজ্ঞা হওয়া উচিত নয়। কারণ তারা 'স্ফুটত্যর্থো যস্মাৎ স স্ফোটঃ' এই লক্ষণের অন্তর্গত নয়, কিন্তু সার্থক শব্দমাত্রেই এই লক্ষণের অন্তর্গত হওয়ায় তাদের স্ফোট সংজ্ঞা হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই অর্থাৎ তাঁদের মতে উচ্চারিত সার্থক শব্দগুলিই স্ফোট পদবাচ্য।

অন্যান্য স্ফোটবাদীদের উপরোক্ত যুক্তিগুলির কিছু কিছু স্বীকার করে নিয়েও আচার্য ভর্তৃহরি একটি নূতন কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন — ঠিক কথা, মানুষের উচ্চারিত শব্দমাত্রেই স্ফোট এমন কথা বলা চলে না কারণ মানুষ হাই তোলার কালে বা অন্য সময়েও ত কখন কখনও নিরর্থক শব্দ উচ্চারণ করে থাকে। কাজেই মূলাধার হতে উর্ধ্বদিকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ক্রমশঃ যে সকল শব্দ মানুষের বদন পথে বিনির্গত হয় তাদের সকলেরই স্ফোট সংজ্ঞা হওয়া উচিত নয়। তাঁর মতে, যখন কোন লোক জ্ঞাত অর্থ প্রকাশ করার ইচ্ছা করে শব্দ উচ্চারণ করে তখন সেই শব্দই স্ফোট পদবাচ্য হয় — বিষয়ত্বমনাপন্নৈ শব্দৈর্নার্থ প্রকাশ্যতে (বাক্যপদীয়)। নাগেশ ভট্ট এর টীকা করেছেন — জ্ঞাতমর্থং বিবক্ষোঃ পুংস ইচ্ছয়া জাতেন প্রযত্নেন যোগে এব মূলাধারস্থ পবনসংস্কারঃ তদভিব্যক্তং শব্দব্রহ্ম ...। (লঘুমঞ্জুষা)

এখানে ইচ্ছা কথাটি লক্ষ্যণীয়। এই কথার মধ্যে স্ফুটাকারে যোগের একটি নিগূঢ় রহস্য ব্যঞ্জিত হয়েছে। সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন যোগীমাত্রেই জানেন মহাকাশে যেমন সূক্ষ্ম অব্যক্ত অবস্থায় শব্দসকল সর্বদাই অবস্থান করে, তেমনি মানুষের দেহস্থিত মূলাধার চক্রেও * সকল সময়েই সূক্ষ্ম অব্যক্ত অবস্থায় যাবতীয় শব্দই বিদ্যমান থাকে। কোন ব্যক্তি যখন শব্দ উচ্চারণের ইচ্ছা করেন, তখন তাঁর ঐরূপ ইচ্ছাবশতঃ বুদ্ধিক্ষেত্রে (ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী

* মূলাধার চক্র — প্রচলিত ধারণানুযায়ী লিঙ্গমূলস্থ চক্র মূলাধার নয়। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী অন্তরাকাশে সাধকের উর্ধ্বরতি ঘটলে ব্রহ্মই জগতের মূলাধার অর্থাৎ মূল আশ্রয়, এই বোধ জন্মে। কাজেই ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী স্থানই মূলাধার পদবাচ্য।

অন্তরাকাশে) স্পন্দন উঠে, তার ফলেই সূক্ষ্ম পরাবাকের উদ্ভব হয়। উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত পরাবাক ক্রমশঃ সুষুম্না নাড়ী পথে উর্ধ্বে উত্থিত হতে থাকে। এই সূক্ষ্ম বাক্ সহস্রারে প্রবেশ করে যে অব্যক্ত ধ্বনি করে, তার নাম নাদ *। তারপর পুনরায় নিম্নগতি লাভ করে বদন পথে বিনির্গত হয়। উৎপত্তির সময় হতে উচ্চারণের সময় পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই তাকে নাদ বলা যায় কিন্তু উচ্চারিত হওয়ার পর বৈখরীতে যে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্পন্দন অনুস্যূত থাকার ফলে তা অর্থবোধ জন্মায় — সেই জ্ঞান ও বুদ্ধিযুক্ত স্পন্দনাত্মিকা শব্দশক্তিই স্ফোট।

একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। মনে করুন, কেউ ট্রেনে ভ্রমণকালে কামরায় বসে 'পঙ্কজ' শব্দটি উচ্চারণ করলেন। সেখানে দেশী বিদেশী শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকই বসে আছেন। পঙ্কজ শব্দটি সংস্কৃত যোগরূঢ় শব্দ, এর অর্থ পদ্মফুল। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তৎসম শব্দরূপে এর ব্যবহার আছে কিন্তু মূর্খ দেহাতি (গ্রাম্য) লোক অনেকেই এর অর্থ জানেন না, বিদেশীদের ত জানার কথাই নয়। সুতরাং গাড়ীতে শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোকের অর্থবোধ জন্মাবে কিন্তু বাকী লোকের ঐ শব্দ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মাবে না, তাদের কাছে শব্দটি দুর্বোধ্যই থেকে যাবে। আচার্য্যের মতে, যাদের মনে ঐ শব্দ কোন অর্থবোধ পরিস্ফুট করবে না তাদের কাছে ঐ শব্দের উচ্চারণ ধ্বনি মাত্র কিন্তু যাদের কাছে অর্থবোধ জন্মাবে তাদের কাছে ঐটি শব্দ। কিন্তু ঐ অর্থবোধ যে জন্মায়, যে কারণে জন্মায় — বুদ্ধিস্থ স্পন্দন — তার নাম স্ফোট। পুনঃ পুনঃ শব্দবিশেষ শ্রবণ দ্বারাই বুদ্ধির সাহায্যেই অন্তরে অর্থ উপলব্ধির সামর্থ্য জন্মে। যাদের জন্মেছে তাদের বুদ্ধিতেই (আবৃত্তি পরিপাকায়াং বুদ্ধৌ) শব্দ নিজ অর্থ স্থাপন করে থাকে, তাদৃশ লোকই সার্থক শব্দের অর্থ উপলব্ধি করে থাকেন। ঐ জ্ঞান ও বুদ্ধি যুক্ত শব্দই স্ফোট পদবাচ্য কারণ যাঁর অর্থবোধ হয় তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যেই প্রধানতঃ অর্থবোধ আহরণ করেন।

স্ফোটের এই যৌগিক রূপটি সুবোধ্য করার জন্য ভর্তৃহরি একটি চমৎকার শ্লোকে উপমাদি সাহায্যে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একটি অগ্নিশিখা হতে যেমন অন্যান্য অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয় তেমনি স্ফোটাত্মক শব্দ হতে অপর শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে,

অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্।
তচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রুতীণাং কারণং পৃথক। (বাক্যপদীয়, শ্লোক ৪৬)

অর্থাৎ ভর্তৃহরি মনে করেন অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষণের ফলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বে তা সেই অরণিদ্বয়ের মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষের ফলে উক্ত সূক্ষ্ম অগ্নি স্থূলতা লাভ করে আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয় এবং তখন সে নিজেকে প্রকাশ করে পার্শ্ববর্তী অন্য দ্রব্যকেও প্রকাশিত করে। ঠিক এইভাবে আমাদের দেহাভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে শব্দসকল সর্বদাই অবস্থান করছে। শব্দ উচ্চারণের ইচ্ছা হলে বুদ্ধিক্ষেত্রে স্পন্দন জাগে এবং ঐ বুদ্ধিস্থ ক্রিয়া বা স্পন্দনের সঙ্গে অবরোহনের পথে যখন জিহ্বা তালু প্রভৃতির সংযোগ ঘটে তখন সেই সূক্ষ্ম শব্দ স্থূলতা লাভ করে বদন সকাশে উচ্চারিত হয়। এইভাবে উচ্চারিত হওয়ার পরেই সে নিজেকে প্রকাশ পূর্বক নিজ প্রতিপাদ্য অর্থটিকেও প্রকাশ করে দেয়, উচ্চারণের পূর্বাবস্থায় শব্দ যখন বুদ্ধিতে অবস্থান করে তখনই সে কারণরূপে বিবেচ্য এবং উচ্চারণের পর তার যে অবস্থা আমাদের শ্রুতিগোচর হয় তা হল কার্যশব্দ। ভর্তৃহরির মতে ঐ কারণরূপটিই স্ফোটের গুহ্যস্বরূপ।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে অন্যান্য স্ফোটবাদীদের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈলক্ষণ্য থাকলেও শব্দাদ্বৈতবাদী আচার্য ভর্তৃহরির উপলব্ধ স্ফোটবাদ সম্পূর্ণ বেদাশ্রিত। অথর্ববেদ সংহিতার (৭।১।১) মন্ত্রে

নাদ — নদতি ইতি নাদঃ। নদ্ ধাতুর অর্থ গর্জন করা। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মতে নাদ এক প্রাক চিদাত্মিকা শক্তি। সঙ্গীত দামোদরের মতে,

নাভেরূর্ধ্বং হৃদিস্থানাং মরুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।
নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্তিতঃ॥

'নাভেরূর্ধ্বং অর্থাৎ নাভির উর্ধ্বস্থিত হৃদয় হতে উত্থিত হয়ে প্রাণবায়ু যখন উর্ধ্বদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে, ব্রহ্মরন্ধ্রের শেষ সীমায় পৌঁছে একপ্রকার অব্যক্ত ধ্বনি করতে থাকে তখন তার নাম হয় 'নাদ'। শ্লোকান্তর্গত হৃদয় শব্দ বলতে প্রচলিত ধারণানুযায়ী বুকের মধ্যস্থলকে বুঝায় না। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী অন্তরাকাশের মধ্যে গুহ্যস্থিত মধ্যবিন্দুই যথার্থ হৃদয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে হৃদয় পুণ্ডরীক বিদ্যা আলোচনা কালে শঙ্করাচার্য তা ব্যাখ্যা করেছেন।

বলা হয়েছে — শব্দ উচ্চারণে প্রবৃত্ত মানুষের প্রথমে হয় উচ্চারণের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা হতে প্রযত্নের উৎপত্তি, উক্ত প্রযত্ন হতে চিদাত্মিকা শক্তির পরিস্পন্দ জন্মে এবং এইরূপ পরিস্পন্দের ফলেই বুদ্ধিক্ষেত্রে সূক্ষ্মা পরাবাকের আবির্ভাব ঘটে ঃ

ধীতি বা যে অনয়ন্ বাচো অগ্রং মনসা বা যেহবদন্নতানি।
তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তুরীয়েণামণৃত নাম ধেনোঃ॥ (অর্থব ৭।১।১)

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও শব্দের চারটি অবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। ঐ চারটি অবস্থার মধ্যে তিনটি অবস্থাকে সূক্ষ্মরূপে এবং একটিকে স্থূলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সূক্ষ্ম অবস্থা তিনটিকে মানুষ প্রকাশ করতে পারে না, কেবল চতুর্থ অবস্থাটি মানুষের উচ্চারণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। ঐ চারটি অবস্থার বৈদিক পরিভাষা হল — নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত। ঋগ্বেদোক্ত শব্দের তিনটি সূক্ষ্ম অবস্থাকে পরবর্তীকালের আচার্যগণ সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মভেদে নাম দিয়েছেন — পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা আর চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ 'নিপাত'-এর বর্তমান পারিভাষিক নাম বৈখরী। তদ্‌যথা —

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি, তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মণীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥ (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৫)

— এই বৈদিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভর্তৃহরি তাঁর অসামান্য যোগজ প্রাতিভ জ্ঞানের প্রভাবে।

এইবার আমার পূর্ব বক্তব্যের জের টেনে উপসংহার হিসাবে বলতে চাই, এতক্ষণ ধরে আমি যে আলোচনা করলাম তাতে আশা করি আপনাদের কাছে এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে আমরা প্রাচীন যুগে দুইজন ভর্তৃহরির অস্তিত্বের সন্ধান পাচ্ছি। দুইজনের শুধু পৃথক জীবন-বৃত্তান্ত ও জীবন-দর্শন নয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে একই ব্যক্তি নন বলে উভয়ের রচিত গ্রন্থাদির রচনাশৈলীও পৃথক ছিল। বৈরাগ্যশতকাদি প্রণেতা রাজা ভর্তৃহরির রচনার প্রধান গুণ ছিল — তন্ময়তা। তিনি তাঁর উপলব্ধিকে নিজের মানস-রাগে অনুরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছিলেন। তার উপর তাঁর ভাষায় ছিল চারুতা ও লালিত্য। এ সমস্তই গীতিকবির ধর্ম।

অন্যদিকে আচার্য ভর্তৃহরির ভাষা ছিল গাঢ়বদ্ধ ও ভাবগম্ভীর, তাঁর ভাবের মধ্যে ছিল যোগজ প্রাতিভ জ্ঞানের হীরকদ্যুতি। তাঁর রচিত বাক্যপদীয় মহাগ্রন্থখানি ব্যাকরণের বলয়ে যোগবিজ্ঞানের সূত্রে গ্রথিত মহামূল্য মণিহার-স্বরূপ।

বক্তৃতা শেষ করলাম। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বৈরাগ্য-মহিমা, আমি বিজৃম্ভণ করে বসলাম স্ফোটবাদ! এটি মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ হল, না — গুড়াভাবে মধু দদ্যাৎ হল বুঝলাম না।।

রাজর্ষি জনকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভারতের ঋষি সমাজের যে সভায় যাজ্ঞবল্ক্য, অলম্বায়ন, গার্গী প্রভৃতির নিগূঢ় তত্ত্বালোচনার বিবরণ ছান্দোগ্য উপনিষদে পড়েছি, তা মানসচক্ষে কল্পনা করতে পারি। কিন্তু আজ সেইরকমই এক জীবন্ত চিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করলাম, প্রত্যক্ষ করলাম শাশ্বত ভারতবর্ষের সনাতন অধ্যাত্মরূপ। অনেক শিখলাম, অনেক জানলাম, আমর জীবনের এটি একটি বড় সঞ্চয়। বক্তারা কেউ সংস্কৃতে, কেউ হিন্দীতে ভাষণ দিয়েছিলেন।

নর্মদা স্পর্শ করে ঘরে এসে চুপ করে বসে রইলাম। আজ আর কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। হরানন্দজী দু'একবার ডেকে চুপ করে গেলেন, আমি কোন সাড়া দিলাম না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই সকাল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখলাম হরানন্দজী তাঁর বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। আমি কমণ্ডলু ও গামছা নিয়ে বিষ্ণুপুরীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে দেখি, রামদয়ালের বাবা স্নান করে উঠে আসছেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন — আপনে বহুত আচ্ছা প্রবচন কিয়া। আজ হম্ আপলোগকা সাথ ওঁকারেশ্বর চলুঙ্গা। জলেহরি পরিক্রমাকি শপথমেঁ বহোৎ বহোৎ কঠিনাই হ্যায়। মা নর্মদা আপকো ভালা করেঁ।

ব্যস্ত মানুষ, তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমি নর্মদাতে স্নান, তর্পণাদি সেরে ফিরে এলাম আমাদের মন্দির সংলগ্ন ঘরে। আমি আমার আশ্রয়স্থলে এসে ভিজা গামছা রোদে শুকাতে দিচ্ছি এমন সময় 'সিয়ারাম, সিয়ারাম' বলতে বলতে রামদাসজী আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে দীনদয়াল। তিনি আমার অপর সাথীদের সঙ্গেও কুশল বিনিময় করলেন।

অন্তরাকাশে) স্পন্দন উঠে, তার ফলেই সূক্ষ্ম পরাবাকের উদ্ভব হয়। উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত পরাবাক ক্রমশঃ সুষুম্না নাড়ী পথে ঊর্ধ্বে উত্থিত হতে থাকে। এই সূক্ষ্ম বাক্ সহস্রারে প্রবেশ করে যে অব্যক্ত ধ্বনি করে, তার নাম নাদ *। তারপর পুনরায় নিম্নগতি লাভ করে বদন পথে বিনির্গত হয়। উৎপত্তির সময় হতে উচ্চারণের সময় পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই তাকে নাদ বলা যায় কিন্তু উচ্চারিত হওয়ার পর বৈখরীতে যে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্পন্দন অনুস্যূত থাকার ফলে তা অর্থবোধ জন্মায় — সেই জ্ঞান ও বুদ্ধিযুক্ত স্পন্দনাত্মিকা শব্দশক্তিই স্ফোট।

একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। মনে করুন, কেউ ট্রেনে ভ্রমণকালে কামরায় বসে 'পঙ্কজ' শব্দটি উচ্চারণ করলেন। সেখানে দেশী বিদেশী শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকই বসে আছেন। পঙ্কজ শব্দটি সংস্কৃত যোগরূঢ় শব্দ, এর অর্থ পদ্মফুল। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তৎসম শব্দরূপে এর ব্যবহার আছে কিন্তু মূর্খ দেহাতি (গ্রাম্য) লোক অনেকেই এর অর্থ জানেন না, বিদেশীদের ত জানার কথাই নয়। সুতরাং গাড়ীতে শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোকের অর্থবোধ জন্মাবে কিন্তু বাকী লোকের ঐ শব্দ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মাবে না, তাদের কাছে শব্দটি দুর্বোধ্যই থেকে যাবে। আচার্য্যের মতে, যাদের মনে ঐ শব্দ কোন অর্থবোধ পরিস্ফুট করবে না তাদের কাছে ঐ শব্দের উচ্চারণ ধ্বনি মাত্র কিন্তু যাদের কাছে অর্থবোধ জন্মাবে তাদের কাছে ঐটি শব্দ। কিন্তু ঐ অর্থবোধ যে জন্মায়, যে কারণে জন্মায় — বুদ্ধিস্থ স্পন্দন — তার নাম স্ফোট। পুনঃ পুনঃ শব্দবিশেষ শ্রবণ দ্বারাই বুদ্ধির সাহায্যেই অন্তরে অর্থ উপলব্ধির সামর্থ্য জন্মে। যাদের জন্মেছে তাদের বুদ্ধিতেই (আবৃত্তি পরিপাকায়াং বুদ্ধৌ) শব্দ নিজ অর্থ স্থাপন করে থাকে, তাদৃশ লোকই সার্থক শব্দের অর্থ উপলব্ধি করে থাকেন। ঐ জ্ঞান ও বুদ্ধি যুক্ত শব্দই স্ফোট পদবাচ্য কারণ যাঁর অর্থবোধ হয় তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যেই প্রধানতঃ অর্থবোধ আহরণ করেন।

স্ফোটের এই যৌগিক রূপটি সুবোধ্য করার জন্য ভর্তৃহরি একটি চমৎকার শ্লোকে উপমাদি সাহায্যে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একটি অগ্নিশিখা হতে যেমন অন্যান্য অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয় তেমনি স্ফোটাত্মক শব্দ হতে অপর শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে,

অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্।
তচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রুতীণাং কারণং পৃথক। (বাক্যপদীয়, শ্লোক ৪৬)

অর্থাৎ ভর্তৃহরি মনে করেন অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষণের ফলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বে তা সেই অরণিদ্বয়ের মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষের ফলে উক্ত সূক্ষ্ম অগ্নি স্থূলতা লাভ করে আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয় এবং তখন সে নিজেকে প্রকাশ করে পার্শ্ববর্তী অন্য দ্রব্যকেও প্রকাশিত করে। ঠিক এইভাবে আমাদের দেহাভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে শব্দসকল সর্বদাই অবস্থান করছে। শব্দ উচ্চারণের ইচ্ছা হলে বুদ্ধিক্ষেত্রে স্পন্দন জাগে এবং ঐ বুদ্ধিস্থ ক্রিয়া বা স্পন্দনের সঙ্গে অবরোহনের পথে যখন জিহ্বা তালু প্রভৃতির সংযোগ ঘটে তখন সেই সূক্ষ্ম শব্দ স্থূলতা লাভ করে বদন সকাশে উচ্চারিত হয়। এইভাবে উচ্চারিত হওয়ার পরেই সে নিজেকে প্রকাশ পূর্বক নিজ প্রতিপাদ্য অর্থটিকেও প্রকাশ করে দেয়, উচ্চারণের পূর্বাবস্থায় শব্দ যখন বুদ্ধিতে অবস্থান করে তখনই সে কারণরূপে বিবেচ্য এবং উচ্চারণের পর তার যে অবস্থা আমাদের শ্রুতিগোচর হয় তা হল কার্যশব্দ। ভর্তৃহরির মতে ঐ কারণরূপটিই স্ফোটের গুহ্যস্বরূপ।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে অন্যান্য স্ফোটবাদীদের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈলক্ষণ্য থাকলেও শব্দাদ্বৈতবাদী আচার্য ভর্তৃহরির উপলব্ধ স্ফোটবাদ সম্পূর্ণ বেদাশ্রিত। অর্থববেদ সংহিতার (৭।১।১) মন্ত্রে

নাদ — নদতি ইতি নাদঃ। নদ্ ধাতুর অর্থ গর্জন করা। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মতে নাদ এক প্রাক চিদাত্মিকা শক্তি। সঙ্গীত দামোদরের মতে,

নাভেরূর্ধ্বং হৃদিস্থানাং মরুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।
নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্তিতঃ॥

'নাভেরূর্ধ্বং অর্থাৎ নাভির ঊর্ধ্বস্থিত হৃদয় হতে উত্থিত হয়ে প্রাণবায়ু যখন ঊর্ধ্বদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে, ব্রহ্মরন্ধ্রের শেষ সীমায় পৌঁছে একপ্রকার অব্যক্ত ধ্বনি করতে থাকে তখন তার নাম হয় 'নাদ'। শ্লোকান্তর্গত হৃদয় শব্দ বলতে প্রচলিত ধারণানুযায়ী বুকের মধ্যস্থলকে বুঝায় না। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী অন্তরাকাশের মধ্যে গুহ্যস্থিত মধ্যবিন্দুই যথার্থ হৃদয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে হৃদয় পুণ্ডরীক বিদ্যা আলোচনা কালে শঙ্করাচার্য তা ব্যাখ্যা করেছেন।

বলা হয়েছে — শব্দ উচ্চারণে প্রবৃত্ত মানুষের প্রথমে হয় উচ্চারণের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা হতে প্রযত্নের উৎপত্তি, উক্ত প্রযত্ন হতে চিদাত্মিকা শক্তির পরিস্পন্দ জন্মে এবং এইরূপ পরিস্পন্দের ফলেই বুদ্ধিক্ষেত্রে সূক্ষ্মা পরাবাকের আবির্ভাব ঘটে ঃ

ধীতি বা যে অনয়ন্ বাচো অগ্রং মনসা বা যেহবদন্নতানি।
তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তুরীয়েণামণ্বত নাম ধেনোঃ॥ (অর্থব ৭।১।১)

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও শব্দের চারটি অবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। ঐ চারটি অবস্থার মধ্যে তিনটি অবস্থাকে সূক্ষ্মরূপে এবং একটিকে স্থূলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সূক্ষ্ম অবস্থা তিনটিকে মানুষ প্রকাশ করতে পারে না, কেবল চতুর্থ অবস্থাটি মানুষের উচ্চারণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। ঐ চারটি অবস্থার বৈদিক পরিভাষা হল — নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত। ঋগ্বেদোক্ত শব্দের তিনটি সূক্ষ্ম অবস্থাকে পরবর্তীকালের আচার্যগণ সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মভেদে নাম দিয়েছেন — পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা আর চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ 'নিপাত'-এর বর্তমান পারিভাষিক নাম বৈখরী। তদ্‌যথা —

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি, তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মণীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥ (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৫)

— এই বৈদিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভর্তৃহরি তাঁর অসামান্য যোগজ প্রাতিভ জ্ঞানের প্রভাবে।

এইবার আমার পূর্ব বক্তব্যের জের টেনে উপসংহার হিসাবে বলতে চাই, এতক্ষণ ধরে আমি যে আলোচনা করলাম তাতে আশা করি আপনাদের কাছে এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে আমরা প্রাচীন যুগে দুইজন ভর্তৃহরির অস্তিত্বের সন্ধান পাচ্ছি। দুইজনের শুধু পৃথক জীবন-বৃত্তান্ত ও জীবন-দর্শন নয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে একই ব্যক্তি নন বলে উভয়ের রচিত গ্রন্থাদির রচনাশৈলীও পৃথক ছিল। বৈরাগ্যশতকাদি প্রণেতা রাজা ভর্তৃহরির রচনার প্রধান গুণ ছিল — তন্ময়তা। তিনি তাঁর উপলব্ধিকে নিজের মানস-রাগে অনুরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছিলেন। তার উপর তাঁর ভাষায় ছিল চারুতা ও লালিত্য। এ সমস্তই গীতিকবির ধর্ম।

অন্যদিকে আচার্য ভর্তৃহরির ভাষা ছিল গাঢ়বদ্ধ ও ভাবগম্ভীর, তাঁর ভাবের মধ্যে ছিল যোগজ প্রাতিভ জ্ঞানের হীরকদ্যুতি। তাঁর রচিত বাক্যপদীয় মহাগ্রন্থখানি ব্যাকরণের বলয়ে যোগবিজ্ঞানের সূত্রে গ্রথিত মহামূল্য মণিহার-স্বরূপ।

বক্তৃতা শেষ করলাম। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বৈরাগ্য-মহিমা, আমি বিজৃম্ভন করে বসলাম স্ফোটবাদ! এটি মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ হল, না — গুড়াভাবে মধু দদ্যাৎ হল বুঝলাম না।।

রাজর্ষি জনকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভারতের ঋষি সমাজের যে সভায় যাজ্ঞবল্ক্য, অলম্বায়ন, গার্গী প্রভৃতির নিগূঢ় তত্ত্বালোচনার বিবরণ ছান্দোগ্য উপনিষদে পড়েছি, তা মানসচক্ষে কল্পনা করতে পারি। কিন্তু আজ সেইরকমই এক জীবন্ত চিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করলাম, প্রত্যক্ষ করলাম শাশ্বত ভারতবর্ষের সনাতন অধ্যাত্মরূপ। অনেক শিখলাম, অনেক জানলাম, আমর জীবনের এটি একটি বড় সঞ্চয়। বক্তারা কেউ সংস্কৃতে, কেউ হিন্দীতে ভাষণ দিয়েছিলেন।

নর্মদা স্পর্শ করে ঘরে এসে চুপ করে বসে রইলাম। আজ আর কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। হরানন্দজী দু'একবার ডেকে চুপ করে গেলেন, আমি কোন সাড়া দিলাম না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই সকাল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখলাম হরানন্দজী তাঁর বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। আমি কমণ্ডলু ও গামছা নিয়ে বিষ্ণুপুরীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে দেখি, রামদয়ালের বাবা স্নান করে উঠে আসছেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন — আপনে বহুত আচ্ছা প্রবচন কিয়া। আজ হম্ আপলোগকা সাথ ওঁকারেশ্বর চলুঙ্গা। জলেহরি পরিক্রমাকি শপথমেঁ বহোৎ বহোৎ কঠিনাই হ্যায়। মা নর্মদা আপকো ভালা করেঁ।

ব্যস্ত মানুষ, তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমি নর্মদাতে স্নান, তর্পণাদি সেরে ফিরে এলাম আমাদের মন্দির সংলগ্ন ঘরে। আমি আমার আশ্রয়স্থলে এসে ভিজা গামছা রোদে শুকাতে দিচ্ছি এমন সময় 'সিয়ারাম, সিয়ারাম' বলতে বলতে রামদাসজী আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে দীনদয়াল। তিনি আমার অপর সাথীদের সঙ্গেও কুশল বিনিময় করলেন।

অন্তরাকাশে) স্পন্দন উঠে, তার ফলেই সূক্ষ্ম পরাবাকের উদ্ভব হয়। উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই উক্ত পরাবাক ক্রমশঃ সুষুম্না নাড়ী পথে উর্ধ্বে উত্থিত হতে থাকে। এই সূক্ষ্ম বাক্ সহস্রারে প্রবেশ করে যে অব্যক্ত ধ্বনি করে, তার নাম নাদ *। তারপর পুনরায় নিম্নগতি লাভ করে বদন পথে বিনির্গত হয়। উৎপত্তির সময় হতে উচ্চারণের সময় পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই তাকে নাদ বলা যায় কিন্তু উচ্চারিত হওয়ার পর বৈখরীতে যে জ্ঞান ও বুদ্ধির স্পন্দন অনুস্যূত থাকার ফলে তা অর্থবোধ জন্মায় — সেই জ্ঞান ও বুদ্ধিযুক্ত স্পন্দনাত্মিকা শব্দশক্তিই স্ফোট।

একটি উদাহরণ দিলে বক্তব্যটি স্পষ্ট হবে। মনে করুন, কেউ ট্রেনে ভ্রমণকালে কামরায় বসে 'পঙ্কজ' শব্দটি উচ্চারণ করলেন। সেখানে দেশী বিদেশী শিক্ষিত অশিক্ষিত বহু লোকই বসে আছেন। পঙ্কজ শব্দটি সংস্কৃত যোগরূঢ় শব্দ, এর অর্থ পদ্মফুল। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় তৎসম শব্দরূপে এর ব্যবহার আছে কিন্তু মূর্খ দেহাতি (গ্রাম্য) লোক অনেকেই এর অর্থ জানেন না, বিদেশীদের ত জানার কথাই নয়। সুতরাং গাড়ীতে শব্দটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোকের অর্থবোধ জন্মাবে কিন্তু বাকী লোকের ঐ শব্দ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান জন্মাবে না, তাদের কাছে শব্দটি দুর্বোধ্যই থেকে যাবে। আচার্য্যের মতে, যাদের মনে ঐ শব্দ কোন অর্থবোধ পরিস্ফুট করবে না তাদের কাছে ঐ শব্দের উচ্চারণ ধ্বনি মাত্র কিন্তু যাদের কাছে অর্থবোধ জন্মাবে তাদের কাছে ঐটি শব্দ। কিন্তু ঐ অর্থবোধ যে জন্মায়, যে কারণে জন্মায় — বুদ্ধিস্থ স্পন্দন — তার নাম স্ফোট। পুনঃ পুনঃ শব্দবিশেষ শ্রবণ দ্বারাই বুদ্ধির সাহায্যেই অন্তরে অর্থ উপলব্ধির সামর্থ্য জন্মে। যাদের জন্মেছে তাদের বুদ্ধিতেই (আবৃত্তি পরিপাকায়াং বুদ্ধৌ) শব্দ নিজ অর্থ স্থাপন করে থাকে, তাদৃশ লোকই সার্থক শব্দের অর্থ উপলব্ধি করে থাকেন। ঐ জ্ঞান ও বুদ্ধি যুক্ত শব্দই স্ফোট পদবাচ্য কারণ যাঁর অর্থবোধ হয় তিনি জ্ঞান ও বুদ্ধির সাহায্যেই প্রধানতঃ অর্থবোধ আহরণ করেন।

স্ফোটের এই যৌগিক রূপটি সুবোধ্য করার জন্য ভর্তৃহরি একটি চমৎকার শ্লোকে উপমাদি সাহায্যে বুঝিয়েছেন। তিনি বলেছেন, একটি অগ্নিশিখা হতে যেমন অন্যান্য অগ্নিশিখার উৎপত্তি হয় তেমনি স্ফোটাত্মক শব্দ হতে অপর শব্দের উৎপত্তি হয়ে থাকে,

> অরণিস্থং যথা জ্যোতিঃ প্রকাশান্তরকারণম্।
> তচ্ছব্দোঽপি বুদ্ধিস্থঃ শ্রুতীনাং কারণং পৃথক। (বাক্যপদীয়, শ্লোক ৪৬)

অর্থাৎ ভর্তৃহরি মনে করেন অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষণের ফলে যে অগ্নি উৎপন্ন হয়, উৎপত্তির পূর্বে তা সেই অরণিদ্বয়ের মধ্যেই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে। অরণিদ্বয়ের সংঘর্ষের ফলে উক্ত সূক্ষ্ম অগ্নি স্থূলতা লাভ করে আমাদের দৃষ্টিপথের পথিক হয় এবং তখন সে নিজেকে প্রকাশ করে পার্শ্ববর্তী অন্য দ্রব্যকেও প্রকাশিত করে। ঠিক এইভাবে আমাদের দেহাভ্যন্তরে অতি সূক্ষ্মভাবে শব্দসকল সর্বদাই অবস্থান করছে। শব্দ উচ্চারণের ইচ্ছা হলে বুদ্ধিক্ষেত্রে স্পন্দন জাগে এবং ঐ বুদ্ধিস্থ ক্রিয়া বা স্পন্দনের সঙ্গে অবরোহনের পথে যখন জিহ্বা তালু প্রভৃতির সংযোগ ঘটে তখন সেই সূক্ষ্ম শব্দ স্থূলতা লাভ করে বদন সকাশে উচ্চারিত হয়। এইভাবে উচ্চারিত হওয়ার পরেই সে নিজেকে প্রকাশ পূর্বক নিজ প্রতিপাদ্য অর্থটিকেও প্রকাশ করে দেয়, উচ্চারণের পূর্বাবস্থায় শব্দ যখন বুদ্ধিতে অবস্থান করে তখনই সে কারণরূপে বিবেচ্য এবং উচ্চারণের পর তার যে অবস্থা আমাদের শ্রুতিগোচর হয় তা হল কার্যশব্দ। ভর্তৃহরির মতে ঐ কারণরূপটিই স্ফোটের গুহ্যস্বরূপ।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে অন্যান্য স্ফোটবাদীদের সঙ্গে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈলক্ষণ্য থাকলেও শব্দাদ্বৈতবাদী আচার্য ভর্তৃহরির উপলব্ধ স্ফোটবাদ সম্পূর্ণ বেদাশ্রিত। অর্থববেদ সংহিতার (৭।১।১) মন্ত্রে

---

* নাদ — নদতি ইতি নাদঃ। নদ্ ধাতুর অর্থ গর্জন করা। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের মতে নাদ এক প্রাক চিদাত্মিকা শক্তি। সঙ্গীত দামোদরের মতে,

> নাভেরূর্ধ্বং হৃদিস্থানাং মরুতঃ প্রাণসংজ্ঞকঃ।
> নদতি ব্রহ্মরন্ধ্রান্তে তেন নাদঃ প্রকীর্তিতঃ॥

'নাভেরূর্ধ্বং অর্থাৎ নাভির উর্ধ্বস্থিত হৃদয় হতে উত্থিত হয়ে প্রাণবায়ু যখন উর্ধ্বদিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হয়ে, ব্রহ্মরন্ধ্রের শেষ সীমায় পৌঁছে একপ্রকার অব্যক্ত ধ্বনি করতে থাকে তখন তার নাম হয় 'নাদ'। শ্লোকান্তর্গত হৃদয় শব্দ বলতে প্রচলিত ধারণানুযায়ী বুকের মধ্যস্থলকে বুঝায় না। ভ্রূদ্বয়ান্তর্বর্তী অন্তরাকাশের মধ্যে গুহ্যিত মধ্যবিন্দুই যথার্থ হৃদয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে হৃদয় পুণ্ডরীক বিদ্যা আলোচনা কালে শঙ্করাচার্য তা ব্যাখ্যা করেছেন।

বলা হয়েছে — শব্দ উচ্চারণে প্রবৃত্ত মানুষের প্রথমে হয় উচ্চারণের ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা হতে প্রযত্নের উৎপত্তি, উক্ত প্রযত্ন হতে চিদাত্মিকা শক্তির পরিস্পন্দ জন্মে এবং এইরূপ পরিস্পন্দের ফলেই বুদ্ধিক্ষেত্রে সূক্ষ্মা পরাবাকের আবির্ভাব ঘটে ঃ

ধীতি বা যে অনয়ন্ বাচো অগ্রং মনসা বা যেহবদন্নতানি।
তৃতীয়েন ব্রহ্মণা বাবৃধানাস্তুরীয়েণামণৃত নাম ধেনোঃ॥ (অথর্ব ৭।১।১)

পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদেও শব্দের চারটি অবস্থার উল্লেখ দেখা যায়। ঐ চারটি অবস্থার মধ্যে তিনটি অবস্থাকে সূক্ষ্মরূপে এবং একটিকে স্থূলরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। সূক্ষ্ম অবস্থা তিনটিকে মানুষ প্রকাশ করতে পারে না, কেবল চতুর্থ অবস্থাটি মানুষের উচ্চারণ দ্বারা প্রকাশিত হয়। ঐ চারটি অবস্থার বৈদিক পরিভাষা হল — নাম, আখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত। ঋগ্বেদোক্ত শব্দের তিনটি সূক্ষ্ম অবস্থাকে পরবর্তীকালের আচার্যগণ সূক্ষ্মতর এবং সূক্ষ্মভেদে নাম দিয়েছেন — পরা, পশ্যন্তী ও মধ্যমা আর চতুর্থ অবস্থা অর্থাৎ 'নিপাত'-এর বর্তমান পারিভাষিক নাম বৈখরী। তদ্‌যথা —

চত্বারি বাক্ পরিমিতা পদানি, তানি বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মণীষিণঃ।
গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি॥ (ঋগ্বেদ ১।১৬৪।৪৫)

— এই বৈদিক সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন ভর্তৃহরি তাঁর অসামান্য যোগজ প্রাতিভ জ্ঞানের প্রভাবে।

এইবার আমার পূর্ব বক্তব্যের জের টেনে উপসংহার হিসাবে বলতে চাই, এতক্ষণ ধরে আমি যে আলোচনা করলাম তাতে আশা করি আপনাদের কাছে এ কথাটি স্পষ্ট হয়েছে যে আমরা প্রাচীন যুগে দুইজন ভর্তৃহরির অস্তিত্বের সন্ধান পাচ্ছি। দুইজনের শুধু পৃথক জীবন-বৃত্তান্ত ও জীবন-দর্শন নয়, একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে একই ব্যক্তি নন বলে উভয়ের রচিত গ্রন্থাদির রচনাশৈলীও পৃথক ছিল। বৈরাগ্যশতকাদি প্রণেতা রাজা ভর্তৃহরির রচনার প্রধান গুণ ছিল — তন্ময়তা। তিনি তাঁর উপলব্ধিকে নিজের মানস-রাগে অনুরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছিলেন। তার উপর তাঁর ভাষায় ছিল চারুতা ও লালিত্য। এ সমস্তই গীতিকবির ধর্ম।

অন্যদিকে আচার্য ভর্তৃহরির ভাষা ছিল গাঢ়বদ্ধ ও ভাবগম্ভীর, তাঁর ভাবের মধ্যে ছিল যোগজ প্রাতিভ জ্ঞানের হীরকদ্যুতি। তাঁর রচিত বাক্যপদীয় মহাগ্রন্থখানি ব্যাকরণের বলয়ে যোগবিজ্ঞানের সূত্রে গ্রথিত মহামূল্য মণিহার-স্বরূপ।

বক্তৃতা শেষ করলাম। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল বৈরাগ্য-মহিমা, আমি বিজৃম্ভন করে বসলাম স্ফোটবাদ! এটি মধ্বাভাবে গুড়ং দদ্যাৎ হল, না — গুড়াভাবে মধু দদ্যাৎ হল বুঝলাম না।।

রাজর্ষি জনকের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ভারতের ঋষি সমাজের যে সভায় যাজ্ঞবল্ক্য, অলম্বায়ন, গার্গী প্রভৃতির নিগূঢ় তত্ত্বালোচনার বিবরণ ছান্দোগ্য উপনিষদে পড়েছি, তা মানসচক্ষে কল্পনা করতে পারি। কিন্তু আজ সেইরকমই এক জীবন্ত চিত্ররূপ প্রত্যক্ষ করলাম, প্রত্যক্ষ করলাম শাশ্বত ভারতবর্ষের সনাতন অধ্যাত্মরূপ। অনেক শিখলাম, অনেক জানলাম, আমর জীবনের এটি একটি বড় সঞ্চয়। বক্তারা কেউ সংস্কৃতে, কেউ হিন্দীতে ভাষণ দিয়েছিলেন।

নর্মদা স্পর্শ করে ঘরে এসে চুপ করে বসে রইলাম। আজ আর কারো সঙ্গে কোন কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। হরানন্দজী দু'একবার ডেকে চুপ করে গেলেন, আমি কোন সাড়া দিলাম না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। এক ঘুমেই সকাল।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখলাম হরানন্দজী তাঁর বিছানায় অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। আমি কমণ্ডলু ও গামছা নিয়ে বিষ্ণুপুরীর ঘাটে স্নান করতে গিয়ে দেখি, রামদয়ালের বাবা স্নান করে উঠে আসছেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন — আপনে বহুত আচ্ছা প্রবচন কিয়া। আজ হম্ আপলোগকা সাথ ওঁকারেশ্বর চলুঙ্গা। জলেহরি পরিক্রমাকি শপথমেঁ বহোৎ বহোৎ কঠিনাই হ্যায়। মা নর্মদা আপকো ভালা করেঁ।

ব্যস্ত মানুষ, তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমি নর্মদাতে স্নান, তর্পণাদি সেরে ফিরে এলাম আমাদের মন্দির সংলগ্ন ঘরে। আমি আমার আশ্রয়স্থলে এসে ভিজা গামছা রোদে শুকাতে দিচ্ছি এমন সময় 'সিয়ারাম, সিয়ারাম' বলতে বলতে রামদাসজী আমাকে পিছন থেকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে দীনদয়াল। তিনি আমার অপর সাথীদের সঙ্গেও কুশল বিনিময় করলেন।

— রামদয়াল বলতে থে আপ চাররোজ ইধার আয়ে হেঁ?

— ইস্‌লিয়ে হম ক্যা কহুঁ। ইহ বাত সচ্ হ্যায়। সাধু সম্মেলনকে লিয়ে রাস্তা বন্ধ থা।

তিনি তক্ষুণি সবাইকে নিয়ে ভজন-আশ্রমে ফিরে যেতে চান। কিন্তু রামদয়ালের বাবা তাঁকে ও আমাদের কিছুতেই ছাড়বেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রামদাসজীর আগ্রহে আমরা রামদাসজীর সঙ্গে পুল পার হয়ে ভজন-আশ্রমে প্রবেশ করলাম। রামদাসজী আমার সাথীদের সঙ্গে আশ্রমিক মঙ্গলদাস, অচ্যুতদাস ও ষড়ঙ্গী মহারাজের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভজন আশ্রম আমার নিজের জায়গা, পুরাতন জায়গা। আমাকে দেখে তাঁরা খুবই আনন্দিত। কাজেই খুব আনন্দে ও আরামে থাকা যাবে। আমরা সবাই মিলে গেলাম আশ্রম দেবতাকে প্রণাম করতে।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের পূজা ও ভোগ নিবেদন সমাপ্ত হতে আমরা সবাই একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। গরম বেশী পড়ায় শুধু মেঝেতে গড়াতে লাগলাম।

বেলা পাঁচটা নাগাদ উঠে পড়ি। দেখি সবাই যে যার ঘরের বারান্দায় বসে মৃদুকণ্ঠে ভজন করছেন — শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। আমি ধীরে ধীরে রামদাসজীর ঘরে গিয়ে উঁকি মারলাম, দেখলাম একা বসে জপ করছেন। আমি ফিরে আসার উপক্রম করতেই তিনি আমাকে কাছে ডেকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আদর করে বসতে বললেন। আমি তাঁকে সেই বৃদ্ধ সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করলাম। আর তাঁর দর্শন পাওয়ার জন্য মনের ব্যাকুলতার কথাও অকপটে জানালাম। তিনি হাসতে হাসতে বললেন — সেই মহাযোগীর সঙ্গে কাল ওঁকারেশ্বর মন্দিরে আমার দেখা হয়েছিল। তাঁর ধ্যানবিষ্ট দেহের চারদিকে অলৌকিক জ্যোতির আভা এবং তাঁর অঙ্গ সৌরভে তাঁকে চিনতে আমার ভুল হয় নি। তিনিই কাল তোমাকে সিদ্ধেশ্বর মন্দিরে গিয়ে দেখা করতে বলেছেন।

তাঁর অনুরোধেই আমি সকাল সকাল বিষ্ণুপুরীতে গিয়ে তোমাকে শিবপুরীতে নিয়ে এসেছি। তাঁর জন্য তোমার ব্যাকুলতা ও তোমার জন্য তাঁর ব্যাকুলতা দেখে মনে হয় তোমার সঙ্গে তাঁর পূর্বজন্মের কোন সম্বন্ধ আছে। তুমি ভাবছ কাউকে কিছু না বলে চলে গেলে সকলে চিন্তা করবে এবং ফিরে এসেই বা কি উত্তর দিবে। আমি নিজে কিংবা দীনদয়াল তোমার সাথীদের ওঁকারক্ষেত্র পরিক্রমা করিয়ে দেব। তুমি কাল সকালে সবাই ওঠার আগেই বেরিয়ে পড়বে। তোমার সাথীদেরকে যা বলার আমিই বলব। সে দায়িত্ব তুমি আমার উপর ছেড়ে দাও। তুমি প্রভুর উপর ভরসা রাখো। আমি তাকে প্রণাম করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এসে দিখে আমার সাথীরা ওঁকারশ্বের মন্দিরের স্বর্ণচূড়ার দিকে তাকিয়ে আছেন। এমন সময় দীনদয়াল জানাল — গুরুজী আপনাদের ওঁকারশ্বের মন্দিরে প্রভু ওঁকারেশ্বরের সন্ধ্যারতি দেখিয়ে নিয়ে আসার জন্য আদেশ করেছেন। দীনদয়ালের কথায় সম্মতি জানিয়ে আমরাও বেরিয়ে পড়লাম। আমরা ঢাল বেয়ে সরু পাহাড়ী পথে উপরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কোটিতীর্থের ঘাটে নর্মদা স্পর্শ করে মন্দিরে প্রবেশ করলাম শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে। ওঁকারেশ্বর মন্দিরে আরতির আয়োজন চলছে। ঘন্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং। মন্দিরের সমস্ত প্রকোষ্ঠ আলোকমালায় সজ্জিত। ওঁকারেশ্বরের সামনে জ্বলছে — ঘৃতপ্রদীপ। অনির্বাণ এই দীপশিখা। স্বয়ম্ভু শিবলিঙ্গকে দেখে মনে হয় ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি।

প্রধান পুরোহিত জয়ানন্দ গোঁসাই ভক্তি ভরে আরতি করলেন অনেকক্ষণ ধরে। প্রাণভরে আরতি দেখলাম। গৃহী ও সাধু, নারী ও পুরুষ আরতি দেখতে উপস্থিত হয়েছেন, আরতির পর গর্ভমন্দিরের সামনে একটি রৌপ্য নির্মিত দোলা খাটালেন পূজারীরা। এবার ওঁকারেশ্বর শয়ন করবেন, বিশ্রাম করবেন, মন্দির দ্বার বন্ধ হবে। মন্দির থেকে দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। রাত্রি আটটা বা সাড়ে আটটা হবে। মন্দির ও পথঘাট সবই এর মধ্যে জমনানবশূণ্য হয়ে পড়েছে। ভজন আশ্রমে ফিরে আসতে রামদাসজী বললেন — আভি বিশ্রাম করিয়ে, ভজন করিয়ে, জপ করিয়ে, জো আপকা খুশ্। আশ্রমে রাম নামের ভজন চলছে — শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম, শ্রী রাম জয় রাম জয় জয় রাম।

আমরা নিজেদের ঘরে এসে বসতেই হরানন্দজী স্বগতভাবে বললেন — সৃষ্টি স্থিতি সংহারের বিধাতা ত্রিলোকব্যাপ্ত মহেশ্বরের আবার শয়ন ও বিশ্রাম কি! তাঁতেই ত অন্তঃকালে সমগ্র প্রাণীজগৎ স্থূল, সূক্ষ্ম কারণ জগৎ শয়ন করে থাকে। ওঁকারেশ্বর যদি জগদাদি কার্য হতে নিবৃত্ত হন, তাঁর সেই শয়ন বা বিভ্রান্তিই ত

মহাপ্রলয় ডেকে আনবে।

ত্রিদিবানন্দ বললেন — এতে ভক্তদের অন্তরের অনুরাগ মিশে থাকে। কারণ আত্মবৎ সেবা করাই বিধি। আমার কোন কথাই বলতে বা শুনতে ইচ্ছা করছে না। প্রলয়দাসজীর দর্শনের জন্য মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সকাল হওয়া পর্যন্ত তর সইছে না। এখনই সিদ্ধনাথ মন্দিরে দৌড়ে চলে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তিনি যখন কাল সকালেই যেতে বলেছেন তখন আগে ভাগে চলে গেলে তাঁর সাক্ষাৎ পাব না। প্রদীপের দম কমিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আশ্রমিকদের সেই ত্রয়োদশাক্ষর রাম ভজন শুনতে লাগলাম। আর চিন্তা করতে লাগলাম ওঁকারেশ্বর তত্ত্ব সম্বন্ধে সেইসব কথা যা প্রলয়দাসজী বলেছিলেন। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

খুব ভোরেই ঘুম ভাঙল। রামদাসজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি কাতর কণ্ঠে রামচন্দ্রের পুণ্য চরিত্র অনুস্মরণ করছেন। অন্যান্য কুটীরেও সকলে রামভজনে রত। আমি তাঁর কুঠিয়াতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাঁর কোন হুঁশ নেই। আমার সাথীরা তখনও ঘুমে অচৈতন্য। আমি প্রাতঃকৃত্য সেরে কোটি তীর্থের ঘাটে গেলাম স্নান করতে। স্নান করে কমণ্ডলুতে জল ভরে মন্দিরে গেলাম ওঁকারেশ্বরের পূজা করতে। জয়ানন্দজী আমাকে পূজা করার সুযোগ করে দিলেন।

ওঁকারশ্বেরকে পূজা ও প্রণাম করে ওঁকারেশ্বর পর্বতের পূর্ব কিনারে অবস্থিত ওঁকারতীর্থের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম স্থান সিদ্ধনাথ মন্দিরের দিকে রওনা হলাম। এখান থেকে বেশী দূর নয়। প্রাচীনকালে এই মন্দিরই ছিল ওঁকার-তীর্থের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। প্রাচীন ঋষি মুনিগণ থেকে মার্কণ্ডেয় মুনি এবং বর্তমানের শ্রেষ্ঠ তপস্বীরা যে ওঁকারলিঙ্গের মাহাত্ম্য উচ্ছ্বসিতভাবে বর্ণনা করেছেন, এই সিদ্ধেশ্বরই নাকি সেই মহাদেব। একটি সংকীর্ণ রাস্তা ধরে পর্বতপৃষ্ঠের শির বেয়ে চড়াইয়ের পথে সিদ্ধনাথ মন্দিরে এসে পৌঁছলাম। ঠিক সেই সময় মন্দিরের অভ্যন্তর হতে ভেসে এল আমার পরম প্রিয় মহাত্মা প্রলয়দাসজীর কণ্ঠস্বর। আমার মন আনন্দে নেচে উঠল। বুকে তখন আমার শতহস্তীর বল। দুলাফে আমি চারটে সিঁড়ির ধাপ ডিঙিয়ে দরজায় পৌঁছে গেলাম। মন্দির অভ্যন্তরে আমার নয়নানন্দই বটে! সেই একইভাবে 'সমকায়শিরোগ্রীব' হয়ে বসে আছেন আর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মহেশ্বরের অষ্টমূর্তির শ্লোকগুলি বলছেন — ওঁ সর্বায় ক্ষিতিমূর্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ, রুদ্রায় অগ্নিমূর্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্তয়ে নমঃ, ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ, পশুপতয়ে যজমানমূর্তয়ে নমঃ, মহাদেবায় সোমমূর্তয়ে নমঃ, ওঁ ঈশানায় সূর্যমূর্তয়ে নমঃ।

আমি চরণপ্রান্তে লুটিয়ে পড়তেই বললেন — আ যাও বেটা, ইয়ে হ্যায় নর্মদা মায়ীকা ধ্যানমন্ত্র, তুমভি বল ...। এই বলে তিনি ধীরে ধীরে মন্ত্রটি পাঠ করালেন। মন্ত্র পাঠের পর তিনি বলতে শুরু করলেন — এই নর্মদা তটস্থ বৈদূর্য পর্বত ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থলে অবস্থিত। এই সন্ধিস্থলে বসে তোমাকে যে কথাটি বলছি মন দিয়ে শোন — হিরন্ময় ত্রিশিখ ওঁকার স্বীয় জ্যোতিঃ থেকে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশ করতে লাগলেন। সর্বপ্রথম বেদ প্রকট হলেন। পরে ক্রমে ক্রমে তত জন বৈদিক দেবতা, কয়েকজন ঋষি ও মানুষ সৃষ্টি হল ওঁকার থেকে। ভগবান ওঁকার কল্পান্তকালে দেব অসুরসহ সমগ্র জীবকুল সংহার করে নিজের মধ্যে লীন করে নেন। পুনরায় সমগ্র ভূতজগৎ সৃষ্টি করে থাকেন। ওঁকারদেব অব্যক্ত, শাশ্বত এবং সর্বজগতের স্রষ্টা।

কর্তা চৈব বিকর্তা চ সংহর্তা চ মহাংস্তু যঃ। ওঁকারপূর্বকা বেদা যজ্ঞাশ্চোঙ্কার পূর্বকাঃ॥
ওঁকার পূর্বকং জ্ঞান তপশ্চোঙ্কার পূর্বকম্। স্বয়ম্ভূরিতি বিজ্ঞেয়ঃ স ব্রহ্মা ভুবনাধিপঃ॥

ওঁকারই কর্তা, বিকর্তা, সংহর্তা ও মহান। ওঁকার হতেই বেদ, যজ্ঞ, জ্ঞান ও তপস্যার উৎপত্তি ঘটেছে। ওঁকারই ভুবনাধিপ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, বায়ু, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, প্রজাপতি, সপ্তর্ষি, বসু, যক্ষ-রক্ষ-পিশাচ-দৈত্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, ম্লেচ্ছাদি, চতুষ্পদ ও তির্যকযোনি; সর্বভূতে তিনি, ভূতনাথও তিনি। সমস্ত সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হলে ওঁকার বিশ্বেশ্বরের কাছে তাঁর স্থিতিযোগ্য পবিত্র স্থান নির্দিষ্ট করে দিতে বললে বিশ্বেশ্বর শূলপাণির পূর্বদিকে মহাকালবনকে (ওঁকারেশ্বরে স্থিত এই স্থানটি) তাঁর আবাসস্থল হিসাবে নির্দিষ্ট করে দেন।

মহাকালবনং দিব্যং সর্বসম্পৎকরং শুভং। তত্র তে ভবিতা কীর্তিঃ শাশ্বতী নাত্র সংশয়ঃ॥
শূলেশ্বরস্য দেবস্য পূর্বভাগে ব্যবস্থিতম্। ত্রিকল্পপ্রভবং লিঙ্গং তন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যতি।
ওঁকারেশ্বর ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি জগত্রয়ে। ইত্যুক্তা হি ময়া দেবি ওঁকারো হৃষ্টমানসঃ॥
দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ।

এই মহাকাল বনে ত্রিকল্পকাল ব্যেপে যে লিঙ্গ বিরাজমান আছেন ঐ লিঙ্গ ওঁকারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। সহস্র যুগাধ্যায়, শত ব্যাতিপাত যোগ এবং সহস্র অয়নে তপস্যায় নিমগ্ন থাকলে কিংবা চতুর্বেদ অধ্যয়ন করলে যে পুণ্য হয়, ওঁকারেশ্বর দর্শনে সেই সকল পুণ্যই লাভ হয়। এহেন ওঁকারেশ্বরকে ধ্যান করি এস।

'ধ্যান করি এস' বলে তিনি সেই যে ধ্যানে ডুবলেন, ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে গেল, সেই ধ্যান আর কিছুতেই ভাঙে না। বেলা প্রায় পাঁচটা নাগাদ তাঁর দেহে স্পন্দন দেখা দিল। এক অপূর্ব সুরভি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। গন্ধটা এমনই মিষ্টি যে আমি কয়েকবার নিঃশ্বাস টেনে টেনে বুক ভরে গন্ধটা নিলাম। ধীরে ধীরে তিনি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়েই আমার হাত ধরে নিয়ে গেলেন সিদ্ধনাথের এক কোণে রাখা হোমকুণ্ডের ধারে।

— জানবে, ওঁকার কোন স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ নয়। কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, নাসিকা দ্বারা ওঁ উচচারণ করা যায় না। যদক্ষরং ন ক্ষয়তে কথঞ্চিৎ। কোনকালেই এর অণুমাত্রও ক্ষয় হয় না বলে একে অক্ষর বলা হয়। ওঁকার শব্দাতীত এবং আকাশ সদৃশ নির্মল ও অনন্ত। এই ওঁকারের সাধনাই বৈদিক ঋষিদের উদ্‌গীত উপাসনা, সাক্ষাৎ ব্রহ্মসাধনা। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদের স্পষ্ট ঘোষণা —

ওমিত্যেদক্ষরং ব্রহ্মামুদ্‌গীথমুপাসীত।

মূর্ধাস্থানেই ওঁকারের সাধনা করতে হয়। সাধনা করতে করতেই ওঁ শব্দ এসে ক্রমে নিঃশব্দে পরিণত হয় — নিঃশব্দং তৎপরং ব্রহ্ম পরমাভেমতি নীয়তে।

আজ এই সন্ধিস্থলে ওঁকারেশ্বরের পাদমূলে তোমাকে ঋষিদের গুহ্যতম ওঁকার সাধনা শিখিয়ে দেব। এই বলে তিনি 'ওঁ, 'ওঁ' বলে সজোরে নিঃশ্বাস টেনে কুম্ভক করে স্থির হলেন। সহসা তিনি এক দীর্ঘ প্রলম্বিত শ্বাস ফেললেন সোজা হোমকুণ্ডের মধ্যস্থলে, কিঞ্চিৎ ছাই উড়ে গিয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। অগ্নিদেব প্রকট হলেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন —

সকৃদুচ্চারিতমাত্রং স এয উর্ধ্বমুৎক্রাময়তি ইতি ওঁকারঃ।
প্রাণান সর্বান্ পরমাত্মনি প্রণাময়তীতি তস্মাৎ প্রণবঃ॥ (অথর্বশির উপনিষদ)

ওঁকার উচ্চারণের সাথে সাথে দেহস্থ স্বাভাবিক নিম্নগ ক্রিয়া সুষুম্নাপথে (উৎ) উর্ধ্বগামী হয় বলেই এর নাম হয়েছে — ওঁকার। প্রাণাদি আভ্যন্তর বায়ু এই ওঁকারধ্বনিতে প্রলীন হয় বলেই এর দ্বিতীয় নাম — প্রলয়। এই ওঁকারই প্রাণাদিকে পরমাত্মার অভিমুখে নমিত করে বলে এর তৃতীয় নাম — প্রণব।

ওঁকারস্তু প্লুতোস্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিত। অকারস্তু অথ ভূর্লোকি উকার ভুব উচ্যতে॥
স ব্যঞ্জন মকারস্তু স্বর্লোকস্তু বিধীয়তে। অক্ষরৈস্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেদাত্মা ব্যবস্থিতঃ॥

অর্থাৎ দীর্ঘ প্রণব অর্থাৎ ওঁকারের অপর নাম ত্রিনাদ কারণ এই তিনটি শব্দবিশিষ্ট — অকার, উকার এবং মকার। অকার ভূর্লোকি, উকার ভুবর্লোকি এবং মকার স্বর্লোকি। এই ত্রি-অক্ষর-সমন্বিত ওঁকারেই পরমাত্মা অবস্থিত।

অ উ ম — ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সমন্বয় মূর্তি ওঁকার। যিনি একাধারে প্রণব ও পরপ্রণবতত্ত্ব, যাঁর সেই অতলান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব বা রহস্য বোঝা দুষ্কর। তিনি বলে চলেছেন — ওঁ এর তলার দিকের শেষ বিন্দু যদি ও অর্থাৎ ব্রহ্মা হন মধ্যস্থলের মণ্ডলটা 'উ' অর্থাৎ বিষ্ণু এবং শিরোদেশের প্রথম বিন্দুটা 'ম' অর্থাৎ মহেশ্বর। এই তিন তত্ত্বই উদ্ভূত হয়েছে ওঁকার বা প্রণব থেকে। তটস্থা পেরিয়ে চন্দ্রবিন্দুর বিন্দুটাই পরপ্রণবতত্ত্ব। নর্মদামায়ী বুকে করে ধরে রেখেছেন এই প্রণব ও পরপ্রণব তত্ত্বকে। তাই মায়ের জলধারাও সেই তত্ত্বকে সূচিত করবার জন্য ওঁ এর আকারে বাঁক নিয়েছেন। তিনিই সর্বজীবের অন্তরশায়ী কারণস্বরূপ নারায়ণ। অন্তরশায়ী প্রত্যগাত্মা তাই নারায়ণই শিব, শিবই নারায়ণ, নরগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি স্বয়ং কোন কারণসম্ভূত নন, তিনিই

পরমব্রহ্ম ওঁকার, ওঁকারই ব্রহ্ম। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে —

স্বদেহমরণিং কৃত্বা প্রণবঞ্চোত্তরারণিং
ধ্যাননির্মথনাভ্যাসাদ্ দেবং পশ্যেন্নিগূঢ়বৎ॥

অর্থাৎ যাঁরা স্বদেহকে অরণি অর্থাৎ অগ্নি উৎপাদক কাষ্ঠ ও প্রণবকে উত্তরারণি অর্থাৎ ঘর্ষণ কাষ্ঠ চিন্তা করে ব্রহ্ম ধ্যানে নিমগ্ন হন তাঁর জ্ঞান নেত্রে নিগূঢ় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ঘটে।

অমৃতবিন্দু উপনিষদে আছে —

ওঁকারং রথমারুহ্য বিষ্ণু কৃত্বাতু সারথিম্।
ব্রহ্মালোক পদাণ্বেষী রুদ্রারাধন তৎপর॥

যাঁরা ব্রহ্মালোকের প্রকৃত পথ অণ্বেষণ করেন, তাঁরা ওঁকার রূপ রথে আরোহন করে বিষ্ণুকে অর্থাৎ সর্বব্যাপী তত্ত্বকে সারথি করে রুদ্রদেবের অর্থাৎ জ্যোতিস্বরূপের আরাধনায় তৎপর হন অর্থাৎ ওঁকারই ব্রহ্মালোকে গমনের প্রধান উপায়। সেই উপায় আশ্রয় করলেই ব্রহ্মালোক প্রাপ্তি হয়।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে —

ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্বম্।

ওঁ এই অক্ষরটির অর্থ হল সমস্ত জগৎ। ওঙ্কারাত্মক জগৎ জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি এব তুরীয় — এই চারপাদযুক্ত।

সর্বংহ্যেতদব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্মা, সোহয়মাত্মা চতুষ্পাৎ।

ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা (জীব) জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুযুপ্তির কোন না কোন একটি ভূমিতে থাকে। কেবল উচ্চকোটির সাধকগণ একটি উন্নত চৈতন্যভূমিতে আরোহণ করেন যাতে তুরীয় অবস্থা বা ব্রহ্মভাব বলে। ওঁকারে পাদ হল — ১) অকার, ২) উকার, ৩) মকার ৪) অর্ধমাত্রা বা নাদবিন্দু।

ওঙ্কার-তত্ত্ব সম্যকরূপে জানতে হলে বুঝতে হলে ওঙ্কারের অবয়ব রহস্য জানা আবশ্যক। আচার্য গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের গৌড়পাদ-কারিকায় বলেছেন —

ওঙ্কারং পাদশো বিদ্যাৎ পাদা মাত্রা ন সংশয়ঃ।
ওঙ্কারং পাদশো জ্ঞাত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

অর্থাৎ ওঙ্কারকে জানতে হবে এক এক মাত্রা বা পাদ ধরে। ওঙ্কারে প্রত্যেক পাদের দেবতা ও দেবতা এক একজন।

অথর্বশিখা উপনিষদে আছে —

ওমিত্যেতদক্ষরমাদৌপ্রেযুক্তং ধ্যানং ধ্যায়িতব্যম।
ওমিত্যেতদক্ষরস্য পাদাশ্চত্বারো দেবাশ্চত্বারো
বেদাশ্চত্বারঃ। চতুষ্পাদেতদক্ষরং পরং ব্রহ্ম।

ওঁ এই অক্ষরকে সমস্ত মন্ত্রের আদিতে প্রয়োগ করে তবেই তার ধ্যান করবে।

১. অকার-তত্ত্ব — ওঁঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকার জাগ্রত অবস্থার অধিষ্ঠাতা বিশ্বরূপ আত্মা বা বৈশ্বানর। 'অকারো বৈ সর্বা বাক্'। অকার বিরাটের ন্যায় সকল বাক্য জুড়ে বিরাজমান। অকার যেমন প্রণবের প্রথম বর্ণ, বিশ্বস্রষ্টা. ও বিরাট। তেমনি ব্রহ্মাও সৃষ্ট্যাদি অবস্থাত্রয়ের প্রথম দেবতা।

জাগরিতস্থানো বৈশ্বানরোহকারঃ প্রথম মাত্রা, আপ্তেরাদিমত্ত্বাদ্ বা, আপ্নোতি
হবৈ সর্বাণ কামান্, আদিশ্চ ভবতি য এবং বেদ। (মাণ্ডুক্য উপনিষদ, ৯)

জাগরিত স্থান বৈশ্বানরই প্রথম মাত্রা অকার স্বরূপ। কেননা উভয়ই ব্যাপক ও আদ্য। যে সাধক এই কথা জানেন তিনি সমস্ত কাম্য বিষয় লাভ করেন এবং সকলের মধ্যে প্রথম হন।

অথর্বশিখা উপনিষদে আছে —

পূর্বস্য মাত্রা পৃথব্যকারঃ স ঋগ্‌ভি র্ঋগ্বেদো ব্রহ্মা বসবো গায়ত্রী গার্হপত্যঃ।

অর্থাৎ ওঙ্কারের প্রথম মাত্রা অকারের অধিষ্ঠানলোক পৃথিবী, ঋগ্বেদ হল এর বেদ, অধিষ্ঠাতা দেব হলেন ব্রহ্মা, গণদেবতা অষ্টবসু, ছন্দ গায়ত্রী এবং অগ্নি গার্হপত্য। অকার অর্থাৎ পৃথিবীর বর্ণ পীত।

২. উকার তত্ত্ব — ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার স্বপ্নাবস্থার অধিষ্ঠাতা তৈজস আত্মা। স্বপ্নাবস্থায় যেমন জাগ্রৎ অপেক্ষা উপাধির নূন্যতা হেতু স্বপ্নাধিষ্ঠাতা তৈজস আত্মা বৈশ্বানর অপেক্ষা উর্ধস্থ বা উৎকৃষ্ট, তেমনি অকার অপেক্ষা উকার তত্ত্বজ্ঞান অধিক শ্রেয়স্কর। অকার তত্ত্বজ্ঞানে সর্ব কামনা সিদ্ধ হয়, উ-কার তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হয়, উকার অক্ষরটি যেন অকার ও মকারের মধ্যবর্ত্তী সেরূপ তৈজস আত্মাও বৈশ্বানর এবং সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞের মধ্যস্থিত।

স্বপ্নস্থানস্তৈজসঃ উকারো দ্বিতীয়া মাত্রা, উৎকর্ষাদ্ উভয়ত্বাদ বাং উৎকর্ষতি
হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি, নাস্যা ব্রহ্মবিদ্ কূলে ভবতি, য এবং বেদ

(মাণ্ডুক্য উপনিষদ, ১০)

অর্থাৎ তৈজস আত্মাই ওঙ্কারের দ্বিতীয় মাত্রা উকার। কেননা উভয়েরই উৎকর্ষ এবং মধ্যবর্ত্তিত্ব ধর্ম তুল্য। যিনি এই দুয়ের একত্ব জানেন, তিনি স্বীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধন করেন এবং সাধুজনের সমান হন। এঁর বংশে ব্রহ্মজ্ঞানহীন কেউ জন্মগ্রহণ করে না।

অথর্বশিখা উপনিষদে আছে —

দ্বিতীয়ান্তরিক্ষনূকারঃ স যজুভি যজুর্বেদো বিষুব্রুদ্রা স্ত্রিষ্টুপ্ দক্ষিণাগ্নিঃ।

ওঁকারের দ্বিতীয়মাত্রা উকার, এর লোক অন্তরিক্ষ্য, বেদ যজুঃ এর অধিষ্ঠাতা দেব বিষ্ণু, গণদেবতা, একাদশ রুদ্র, ছন্দঃ ত্রিষ্টুপ এবং অগ্নি দক্ষিণাগ্নি। উকার অর্থাৎ আকাশ বিদ্যুৎবর্ণ।

৩. মকার-তত্ত্ব — ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা মকারের স্বরূপ ও মকার তত্ত্ব বিজ্ঞানের ফল। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে — সুষুপ্তস্থানঃ প্রাজ্ঞো মকার স্তৃতীয়া মাত্রা মিতের পীতের্ব্বা, মিনোহি হ বা ইদং সর্বমপীতিশ্চ ভবতি, য এবং বেদ।

সুষুপ্তি স্থানগত প্রাজ্ঞ আত্মা ওঁকারের তৃতীয় পাদ মকার স্বরূপ। কেননা প্রাজ্ঞ ও মকার উভয়ই যথাক্রমে বৈশ্বানর ও তৈজসের এবং অকার ও উকারের পরিমাপক বা নির্গম স্থান এবং অপীতি বা বিলয়স্থান। যিনি এটি জানেন তিনিই এই সমস্ত অবগত হন এবং সকলের আশ্রয়ভূত হন।

যেরূপ জাগ্রত ও স্বপ্ন প্রকৃতিবশে সুষুপ্তিতে লয় হয়, সেরূপ অ এবং উ মকারে লীন হয়, সৃষ্টি ও স্থিতি লয়ে পর্য্যবসিত হয়। যেভাবে সুষুপ্তির শেষে জাগরণ পুনরায় আবির্ভূত হয়, সেরূপ ওঁকার পুনঃ উচ্চারিত হলে লয়স্থান ম হতে অ এবং উ মাত্রা পুনরায় বাহির হয়। এই কারণে ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা মকারকে সুষুপ্তিরর অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ আত্মা স্বরূপ বলা হয়ে থাকে।

অথর্বশিখা উপনিষদে আছে —

তৃতীয়া দ্যৌ র্মকারঃ স সামভিঃ সামবেদো রুদ্র আদিত্যা জগত্যাহবনীয়ঃ।

ওঁকারের তৃতীয় মাত্রা মকারের অধিষ্ঠান লোক স্বর্গ, বেদ হল সাম, অধিষ্ঠাতা দেব রুদ্র (মহেশ্বর), গণদেবতা দ্বাদশ আদিত্য, ছন্দঃ জগতী এবং অগ্নি আহবনীয়। মকার অর্থাৎ স্বর্লোক হল শুক্লবর্ণ।

৪. অর্ধমাত্রা (নাদবিন্দু) — ওঁকারের মধ্যে অ, উ, ম — এই তিনটি বর্ণ আছে। এছাড়া অর্ধমাত্রা আছে, যা নাদ বিন্দু স্বরূপ এবং প্রণবের মস্তকে অবস্থিত। এই মাত্রাটির উচ্চারণ সম্পূর্ণ হয় না বলে একে অর্ধমাত্রা বলা হয়ে থাকে।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে আছে —

অমাত্রশ্চতুর্থোহব্যবহার্য্যঃ প্রপঞ্চোপশমঃ শিবোহদ্বৈত এবমোঙ্কার আত্মৈব। (১২)

অর্থাৎ তূরীয় ওঁকার আকারাদি মাত্রাত্রয়রহিত, বাক্যমনের অগোচর বলে ব্যবহারের অযোগ্য, জগৎ প্রপঞ্চের নিবৃত্তিস্থান, মঙ্গলময় এবং অদ্বৈত আত্মাস্বরূপই বটে।

প্রণবের অ, উ, ম অর্থাৎ 'ওম্' শব্দ দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সগুণ ব্রহ্মকে বুঝায়। বিন্দু দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মকে বুঝায় এবং অর্ধচন্দ্রাকৃতি 'নাদ' দ্বারা শব্দ ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তিকে বুঝায়, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের ত্রিবিভক্তবৎ শক্তির দ্বারা সমাদৃত হয়ে শব্দ ব্রহ্মময়ী আদ্যাশক্তি নাদ রূপে অর্ধচন্দ্রাকৃতি রেখার দ্বারা বুঝান হয়। আর তার মধ্যকেন্দ্রে অবস্থিত 'বিন্দু' বা পরব্রহ্ম।

প্রণব সংযোগে যেমন সকল মন্ত্র নির্দোষ ও পূর্ণ হয়, সেরূপ অর্ধমাত্রা বা নাদবিন্দুর সংযোগে ওঁকার

মূলতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

আমার আর হোমাগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করার ক্ষমতা রইল না। আমার চোখ দুটো কেউ যেন আঠা দিয়ে আটকে দিয়েছে। আস্তে আস্তে পীতজ্যোতি সমন্বিত আকাশ ভেসে উঠল। সেই জ্যোতিতে ভাসতে লাগলাম। ধীরে ধীরে পীতজ্যোতি অন্তর্হিত হয়ে বিদ্যুৎময় আকাশমণ্ডল আমার সমস্ত অন্তর্সত্ত্বাকে গ্রাস করে ফেলল। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ চমকের জ্যোতি ক্ষীণ হয়ে জেগে উঠল শুক্লজ্যোতির্মণ্ডিত আকাশ। আঃ! এই জ্যোতি এত স্নিগ্ধ, এত মধুর তা ভাষায় বর্ণনা করা কঠিন। ধীরে ধীরে জেগে উঠল ওঁকারের পূর্ণ ধ্বনি। তার প্রবাহ বয়ে চলেছে হৃদয় কন্দরে। ওঁকারের কলতানে আত্মহারা হয়ে পড়লাম। ক্রমে ওঁকারের সুরেলা ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে রেবা, রেবা, রেবা। এই মিষ্টি সুরতরঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন তালে তালে গমকে গমকে যেন উর্ধের দিকে উঠে যাচ্ছে। সুরেলা ধ্বনির স্ফূরণ ও অবিরাম ঝঙ্কার এক মুহূর্ত্তও থেমে নেই। ধীরে ধীরে আমাকে মাতাল করে তুলেছে, আমি যেন নেশা করেছি, ওঁকারের নেশা — আমার শরীর টলছে দুলছে। ওঁকারের ব্যঞ্জনায় এক অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল আমার শিরা ও ধমনীতে, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। ওঁকারই আমাকে চিদাকাশ, দহরাকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, সূর্যাকাশ একে একে ভেদ করে মহ, জন, তপঃ, এবং সত্যলোকে নিয়ে গিয়ে ব্রহ্মময় ব্রহ্মস্বরূপ করে তুলল।

কতক্ষণ, কত ঘন্টা, কত প্রহর যে এভাবে কেটে গেল, আমার জানা নেই। আমি এক আনন্দস্বর্গে ডুবে ছিলাম। যখন চেতনা এল ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। সামনেই দেখলাম সেই হোমকুণ্ডের অগ্নি জ্বলছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্যকিরণে সমগ্র তপস্থলী উদ্ভাসিত, নর্মদার জল, পাহাড়, গাছপালা, আমার সম্মুখস্থ হোমাগ্নি সর্বত্র যেন ওঁকারের বাজনা বাজছে, অসহ্য পুলকে মন ভরে আছে। আনন্দের নেশায় আবার চোখ বন্ধ করলাম। শুনলাম, প্রলয়দাসজী বলছেন — ব্যস্ করোজী, ঔর উন্‌কী রস লেনেকা জরুরৎ নেহি।

ধীরে ধীরে চোখ দুটো মেলবার সামর্থ্য এল। আমি হোমাগ্নি এবং তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। নর্মদায় গেলাম স্নান করতে। নর্মদাতে নেমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম করে ও পিতৃতর্পণ সেরে সদ্য উদীয়মান ভগবান বিবস্বানের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করলাম। অঞ্জলিভরা মহাপবিত্র রেবাবারির সঙ্গে, মায়ের অহেতুকী কৃপার কথা স্মরণ করতে করতে অশ্রুধারাও গড়িয়ে পড়তে লাগল। প্রণামান্তে সিদ্ধেশ্বরের চরণে দণ্ড দিতে দিতে উঠে এলাম মন্দিরে।

সিদ্ধেশ্বরকে প্রণাম করে উঠে মন্দিরের একধারে চুপ করে বসে থাকলাম। প্রলয়দাসজীকে দেখতে পাচ্ছি না। তবে কি তিনি চলে গেলেন? প্রায় আধ ঘন্টা কেটে গেল। পূর্ণভাবে সূর্য প্রকট হয়েছেন। হঠাৎ আমার সামনে শালপাতায় ঢাকা চরু রেখে খল্‌খল্ করে হাসতে লাগলেন। কলকণ্ঠে বলতে শুরু করলেন — নর্মদা পরিক্রমায় এসে এতকিছু জানছ এবং জানতে পারছ, অন্য কোন স্থান পর্যটন করে এত বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারতে না। একটা সারকথা জেনে রাখ, কেউ যদি আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের সুবিপুল মহিমা জানতে চায়, তাকে নর্মদাতটে আসতেই হবে। মা নর্মদে, তুমহারা সদৈব জয় হো। লেও, খানে সুরু করো।

আমি শালপাতার ঢাকনা খুলে দেখি 'চরু' তখনও গরম। যেমনি সুস্বাদু, তেমনি সুগন্ধি যুক্ত। খাবার পর নর্মদার জলে হাত মুখে ধুয়ে এলাম।

প্রলয়দাসজী সিদ্ধেশ্বরের সামনে সমকায়শিরোগ্রীব অবস্থায় গভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। ঘুম ভাঙতেই দেখি তিনি নাই। সূর্য চলেছেন অস্তাচলে। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভায় সিদ্ধনাথের মন্দির রক্তিমবর্ণ ধারণ করেছে। বড় বড় গাছপালায় ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। অস্তোন্মুখ সূর্যের ম্লান আলো পড়েছে সামনের নর্মদা বক্ষে।

আমি তট ধরে বেড়াতে লাগলাম। আমি নর্মদার ঘাটে নেমে সাবধানে নেমে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। এক কমণ্ডলু জল ঢক্‌ঢক্ করে গিলে ফেললাম। কোথাও কোন শব্দ নাই। সন্ধ্যা রাত্রিকেই মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। সমগ্র পরিবেশঃ অপূর্ব শান্ত, স্নিগ্ধ এবং সুরভিত হয়ে উঠেছে অলৌকিক দিব্য গন্ধে। মনে হচ্ছে কোথাও হাজার হাজার গোলাপ, রজনীগন্ধা শিউলি কিংবা কুন্দফুল ফুটে আছে। চুপ করে ঘন্টাখানিক বসে থাকার পর প্রলয়দাসজীর নির্দেশিত পন্থায় মূর্ধাদেশে অন্তঃবিষুব ক্ষেত্রে ওঁকারতত্ত্ব মননে উদ্যোগী হলাম। ধীরে ধীরে ডুবে গেলাম ক্রিয়াতে। বেশ অনুভব করতে পারছি, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্নায়ু শিরার মধ্যে মধুর আবেশ, রসাবেশের

স্ফুরণ হচ্ছে। একটু পরেই মস্তিষ্ককোষে ওঁকারের টঙ্কার শুরু হয়ে গেল। শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আমার শরীরের অনুরূপ আর এক শরীর বেরিয়ে এসে মূর্ধাদেশে ভেসে উঠল। জ্যোতির্ময় সেই শরীর আকাশ পথে উঠছে, তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে গুরুগম্ভীর ওঁ-ওঁ-ওঁ।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটল তা বুঝতে পারিনি। যখন চেতনা এল, তখন ধীরে ধীরে চোখ খুললাম, কিন্তু আনন্দের ঘোরে আবার চোখ বন্ধ করলাম। আবার চোখ খুলে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি সর্বত্র চিদগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শিখার মধ্যে ছন্দে ছন্দে বেড়ে চলেছে ওঁকারের বাজনা।

ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ শব্দে জেগে উঠে দেখি প্রলয়দাসজী দাঁড়িয়ে আছেন। তুমি ক্রিয়াটি ভালভাবে শিখে নিতে পেরেছ দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। এস, এখন আদি ওঁকারেশ্বরের পূজা করি।

দেখলাম একটি শালপাতায় প্রচুর বিল্বপত্র, বনফুল ও দুটি মুখবন্ধ তামার পাত্রে চন্দন রাখা আছে। লিঙ্গের দু'দিকে দুটি আসন। আমার ও নিজের জলভর্তি কমণ্ডলু আসনের দুপাশে রেখে বললেন — আমরা একত্রে মন্ত্রোচ্চারণ করে পূজা করব।

আমি ও প্রলয়দাসজী কমণ্ডলুর জল দিয়ে আদি ওঁকারেশ্বরের গাত্র মার্জনা করলাম —

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতাম্।
পতীং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম্ দেবং ভুবনেশমীড্যম্॥

অর্থাৎ হে মহেশ্বর! তুমি নিয়ন্তাদের পরম নিয়ন্তা, দেবগণের পরম দেবতা এবং প্রভুগণের পরম প্রভু। তুমি বিদ্যা অবিদ্যার অতীত, পরমপূজ্য, স্বয়ং জ্যোতি। তোমাকে আমরা যেন জানতে পারি।

এরপর আমরা একত্রে স্বয়ম্ভু সিদ্ধেশ্বরের মাথায় যজুর্বেদের সেই বিখ্যাত মন্ত্রটি ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে ...' পড়তে পড়তে ধীরে ধীরে পঞ্চামৃত ঢালতে লাগলাম। পঞ্চামৃতে আদি ওঁকারেশ্বরের স্নান করিয়েই পড়তে লাগলাম মহর্ষি তণ্ডি কর্তৃক প্রকটিত সহস্রনাম।

এই সহস্রনামের স্তবরাজ পাঠ শেষ হতেই আমরা যে যার ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে পাঁচটা করে বিল্বপত্র আদি ওঁকারেশ্বরের মাথায় অর্পণ করলাম। অর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি করে বিল্বপত্র রেখা বেষ্টনীর বাইরে এসে ঠিক্‌রে পড়ল। আমি আনন্দে আত্মহারা। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার প্রাণের মধ্যে স্নিগ্ধ শান্তির পরশ।

উর্দ্ধ অধঃ সর্বত্র ব্যাপ্ত করে একটা জ্যোতির গোলক আমাকে ঘিরে ধরল। অনেকক্ষণ ধরে এরকমই অবস্থায় থাকার পর প্রলয়দাসজী বললেন — হমারা হাত পাকড়কে প্রদক্ষিণ করো। তিনি আমার হাত ধরে তিনবার আদি ওঁকারেশ্বরকে প্রদক্ষিণ করালেন। তাঁর সঙ্গে আমিও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম এই জ্যোতির্লিঙ্গকে।

— আভি চার বাজ গিয়া। আপ সিধা চলা যাও। অব্ হাম লোটেঙ্গে। হরবখৎ তুম্ হামারা নজরমেঁ রহেগা বেটা। শিবমস্তু! শিবমস্তু! কোন ভয় নেই। শিবানং সন্তু পন্থানঃ — পথ তোমার মঙ্গলময় হোক। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে লাঠি ঠুকে ঠুকে টলতে টলতে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে হেঁটে চললাম ভজন-আশ্রমের দিকে। তখনও সূর্যোদয় হয়নি তবে পূর্বাকাশ ক্রমে লাল হয়ে উঠছে। সূর্যকে স্মরণ করে মন্ত্রপাঠ করতে করতে এগিয়ে চললাম —

অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যন্ত্যক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে॥ (ঋ ১।৫০।২)

এই মন্ত্রের দেবতা সূর্য। মহর্ষি কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব দৃষ্ট মন্ত্র এটি। এই মন্ত্রে ঋষি ভগবান সূর্যনারায়ণের উদ্দেশ্যে বলছেন —

তিমিরমোচন বিশ্বলোচন মেলিলে আলোক-আঁখি।
নিশীথের তারা তস্করসম আপনারে ফেলে ঢাকি।

আমি এই মন্ত্র বারবার গাইতে গাইতে ওঁকারেশ্বরের ঘাটে পৌঁছে গেলাম। মা নর্মদাকে প্রণাম করে হর নর্মদে বলতে বলতে নেমে পড়লাম কোটি তীর্থের ঘাটে।

বুকের ভিতরটা বড় ফাঁকা লাগছে। অনেকক্ষণ ধরে নর্মদাতে স্নান করলাম। সূর্যার্ঘ্য ও তর্পণাদি সেরে ওঁকারেশ্বরজীকে পূজা ও প্রণাম সেরে হাঁটতে লাগলাম ভজন-আশ্রমের দিকে। দশম দিনে আমি ফিরছি।

আমার সাথীরা হয়ত আমাকে ছেড়ে পরিক্রমার পথে বেরিয়ে পড়েছেন। আর যদি থেকে থাকেন তবে তাদেরকেই বা কি উত্তর দেব? রামদাসজীই বা কি বলেছেন কে জানে! এসব কথা চিন্তা করতে করতে ভজন-আশ্রমে যখন ঢুকলাম তখন প্রায় বেলা ন'টা। আমাকে দেখতে পেয়ে হরানন্দজীসহ আমার অন্যান্য সাথীরা, রামদাসজী এবং অন্যান্য আশ্রমিকরা যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

— রামদাসজী আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করতে করতে বললেন — শৈলেন্দ্রনারায়ণজী কো কই কুছ বাত নেহী পুছেঙ্গে।

আশ্রমদেবতাকে প্রণাম করে আমাদের কুঠিয়াতে গিয়ে বসে থাকলাম চুপ করে। একটু পরে হরানন্দজী এক গ্লাস সরবত নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন। পিছনে আর সবাই। বললেন — এটা খেয়ে নাও। তোমার শরীর খুব উজ্জ্বল হয়েছে দেখছি। তোমার অবর্তমানে আমাদের ওঁকার-দ্বীপ পরিক্রমা হয়ে গেছে। রামদাসজী আমাদের সব ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখিয়েছেন। কে এক শম্ভুনাথ তার স্ত্রী-পুত্র নিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। তোমার সঙ্গে দেখা করার জন্যই তারা বাহাতী ধর্মশালায় আছে। আবার দেখা করতে আসবে। আমি বললাম — বড় ক্লান্ত লাগছে, একটু ঘুমিয়ে নিই।

— সেই ভালো, তুমি ঘুমাও। আমরা ওঁকারেশ্বর মন্দির থেকে ঘুরে আসছি।

ঘরের দরজা টেনে দিয়ে তাঁর চলে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম। এত গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, কখন যে ভোগ নিবেদন হয়েছে, ঘন্টা খোল করতালের বাজনা বেজেছে, তা আমি জানতে পারিনি। হরানন্দজী এসে ডাকতে আমার ঘুম ভাঙল। আমরা সবাই একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। প্রসাদ প্রাপ্তির পর ঘরে গিয়ে বসতে না বসতেই শম্ভুনাথ তার স্ত্রী বিন্নী ও ছেলে কিষেণকে নিয়ে দেখা করতে এল। বিন্নী মাতা ও কিষেণ আমাদের সবাইকে প্রণাম করল। শম্ভুনাথও নাছোড়বান্দা। শেষে সে আমার হাত দুটি ধরে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে করতে অঝোরে কাঁদতে থাকল। কিষেণ বেশ বড় হয়ে গেছে। আগের মত দুরন্ত নেই। আমিও বাচ্চাটিকে কাছে ডেকে একটু আদর করলাম। হঠাৎ কচি কচি গলায় আমার গলা জড়িয়ে ধরে বলল — তুমি আমায় দীক্ষা দেবে। সকলেই হতচকিত। রামদাসজী সহ সকলেই হাসতে লাগল। কিন্তু কিষেণ এতটুকুও না ঘাবড়িয়ে আমার গলা জড়িয়ে আবদার জানাতে থাকল। তার ভালবাসার তাপ ও চাপ এমনই অপ্রতিরোধ্য ছিল যে আমি তাকে আশ্বস্ত করে শম্ভুনাথকে একটি খাতা কিনে আনতে বললাম। খাতায় দুটি শ্লোক লিখে দিলাম —

ভূমেরুচ্চতরঃ স্বর্গঃ স্বর্গাদুচ্চতরঃ পিতা,
পিতুরুচ্চতরো নাস্তি তস্মৈ পিত্রে নমো নমঃ॥

স্বর্গকে সাধারণতঃ এই জরামরণশীল পৃথিবীর উর্ধ্বদেশে সুখ ও শান্তির স্থান বলে কল্পনা করা হয়। কাজেই স্থান মাহাত্ম্য ও গুণের বিচারে স্বর্গ পৃথিবীর চেয়ে উচ্চতর; কিন্তু স্বর্গের চেয়েও পিতা শ্রেষ্ঠতর। পিতার তুল্য গরীয়ান্ ও বরীয়াণ আর কেউ নেই। পিতাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি।

তীর্থানি শতশঃ সন্তি পুণ্যানি জগতীতলে।
সর্বাণি হি উপতিষ্ঠন্তে জননীপদপঙ্কজে।।

জগতে শথ শত পুণ্য তীর্থ আছে। সেইসব তীর্থে স্নান দান ও জপাদি ক্রিয়া প্রভৃতি তীর্থকৃত্যের যে ফল শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, সে সমস্ত ফলই লাভ হয় মায়ের চরণ বন্দনায়। কারণ, সমূহ তীর্থ মায়ের চরণ কমলে বিদ্যমান।

মহানন্দে কিষেণ খাতাটি নিয়ে উপস্থিত সকলকে প্রণাম করে বাবা-মার সঙ্গে ফিরে গেল বাহাতী ধর্মশালায়। সেখান থেকে তারা ফিরে যাবে নিজেদের বাড়ীতে।

আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হল না। হরানন্দজী সহ আমার অন্য সঙ্গীরা রামদয়ালের সঙ্গে ওঁকারেশ্বরের শয়ন-আরতি দেখতে গেলেন। আমি ঘরে বসে প্রদীপের আলোয় প্রলয়দাসজীর স্মৃতিচারণ করতে করতে ডায়েরীতে সব কথা লিখে ফেললাম। শরীর ও মন অবসাদে ভরে আছে। বড় ক্লান্ত লাগছে। ইতিমধ্যে প্রভুর আরতি দেখে সঙ্গীরাও ফিরে এসেছেন। আমরা শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করছি, এমন সময় ষড়ঙ্গী মহারাজ এসে খবর দিলেন খেড়াপতি হনুমানজীর মন্দিরের মোহান্তজী আশ্রমে এসেছেন আমাদের কাল দ্বিপ্রাহরিক ভিক্ষার জন্য অনুরোধ জানাতে।

আমরা রামদাসজীর কুঠিয়াতে যাবার জন্য বের হতে গিয়ে দেখি খেড়াপতি হনুমান মন্দিরের পুরোহিতজী রামদাসজীর সঙ্গে 'সিয়ারাম সিয়ারাম' বলতে বলতে আমাদের ঘরে ঢুকলেন। তিনি প্রত্যেককে জড়িয়ে ধরে করজোড়ে আগামীকালের ভিক্ষা গ্রহণের অনুরোধ জানালেন। অসময়ে আসার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বললেন — ঠাকুরের পূজা আরতি ও আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকর্মের জন্য দেরী হয়ে গেল।

আমাদের নমো নারায়ণায় জানিয়ে তিনি চলে গেলেন। একটু পরেই বৃষ্টি শুরু হল। আষাঢ় মাস শেষ হতে চলল। মাঝে মাঝে বৃষ্টি হওয়ায় এবার গরম সেরকম পড়েনি। বনাঞ্চল হতে ময়ূরের কেকাধ্বনি ভেসে এল। আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

রাত্রি প্রভাত হল। আমরা সকলে মিলে কোটি তীর্থের ঘাটে স্নান করে ওঁকারেশ্বরের পূজা করলাম। পূজার পর আমি নাটমন্দিরে বসে শিবের সহস্রনাম পাঠ করতে শুরু করলাম। অন্যান্যরাও ধ্যান জপে মন দিলেন। প্রায় ঘন্টা দেড়েক বাদে ওঁকারেশ্বরের কৃপা প্রার্থনা করে ফিরে এলাম। রামদাসজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তিনি তুলসীদাসজীর একটি দোঁহা আবৃত্তি করছেন —

ধন্য ভূমি বন পংথ পহারা। জহঁ জহঁ নাথ পাউ তুম্হ ধারা॥
ধন্য বিহগ মৃগ কাননচারী। সফল জনম ভরা তুম্হি নিহারী॥
হম্ সব ধন্য সহিত পরিবারা। দীখ্ দরসু ভরি নয়ন তুম্হারা॥
কীনহ্ বাসু ভল ঠাউঁ বিচারী। ইহাঁ সকল রিতু রহব সুখারী॥
হম্ সব ভাঁতি করব সেবকাই। করি কেহরি অহি বাঘ রবাই॥
বন বেহড় গিরি কন্দর খোহা। সব হমার প্রভু পগ পগ জোহা॥

....

তুলসীদাসকৃত এই দোঁহা রামদাসজীর কণ্ঠমাধুর্যের গুণে বেশ ভালই লাগল। আমরা আশ্রম দেবতাকে প্রণাম করে বড়ঙ্গী মহারাজকে বলে আমরা হেঁটে ভজন-আশ্রম পেরিয়ে কোটি তীর্থের ঘাটে পৌঁছলাম। খরবেগে নর্মদা বয়ে চলেছেন।

ভজন - আশ্রম থেকে বেরিয়ে ওঁকারেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে খেড়াপতি হনুমান মন্দিরের পথে রওনা হলাম। দূর থেকে দেখতে পেলাম যে রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটছি, সেই রাস্তার উপরেই একদল স্ত্রী পুরুষ মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে আছে, ডুগডুগি বাজছে। বেলা তখন বারোটা সাড়ে বারোটা হবে। মহানন্দস্বামী বললেন — কি হচ্ছে ওখানে? অন্য কোন পথও নেই যে, তাদেরকে এড়িয়ে যাই। দু'তিন মিনিট অপেক্ষা করার পর মা নর্মদার উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে হরানন্দজী এগিয়ে গেলেন। হরানন্দজী ঢুকে গেলেন তো গেলেন, আর তাঁর দেখা নেই। প্রায় মিনিট দশেক কেটে যাওয়ার পর দেখলাম হরানন্দজী ভীড়ের মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে হাসিমুখে হাত নেড়ে আমাদেরকে ডাকছেন। আমরা কঙ্করময় পথ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, সেইভাবে ছোট বড় পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে এগিয়ে গেলাম। গিয়ে দেখলাম শতাধিক পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ সারিবদ্ধভাবে মণ্ডলাকারে দাঁড়িয়ে আছে। ভীড় ঠেলে হরানন্দজী আমাদের ভিতরের সারিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালেন। গিয়ে যা দেখলাম, তাতে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। চকখড়ি দিয়ে একটি বড় গোলাকার জায়গা ঘেরা হয়েছে। সেই সাদা গণ্ডীর বাইরে দুজন যুবক ডুগডুগি বাজাচ্ছে। আর গণ্ডীর ভিতর একজন যুবক, বয়স বড়জোর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে একটি বালতি ভর্তি জল এবং তাতে ছোট ছোট চার পাঁচটি মাছ (জ্যান্ত) ঢকঢক করে গিলে ফেলছে আর একটু পরেই সেই মাছ সহ জল উগরে দিচ্ছে। আর একজন সম্ভবত তারই বয়সী যুবক মাটি গর্ত করে দেহের উর্ধাংশ শীর্ষাসন অবস্থায় তার ভিতর ঢুকিয়ে দিয়েছে। গর্তের পাশের ফাঁকা জায়গা সম্পূর্ণ মাটি দিয়ে ভরাট করা আছে। তার চোখ, মুখ, কান, সম্পূর্ণ মাটির তলায়। ত্রিদিবানন্দের জিজ্ঞাসার উত্তরে এক দেহাতী ভদ্রলোক জানাল যে সে এই অবস্থায় ঘন্টা খানিকের উপর রয়েছে। শরীরে কোন স্পন্দন আছে বলে মনে হয় না। সমবেত পাহাড়ী স্ত্রী পুরুষ সেই গোলাকার জায়গায় পয়সা ছুঁড়ে দিচ্ছে। প্রণাম করছে। আমরা সেই দৃশ্য দেখবার জন্য আর দাঁড়ালাম না। আমরা ভীড় থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেই হাঁটতে লাগলাম সোজা ঢালের পথে। নর্মদার ধারে ধারে হেঁটে খেড়াপতি হনুমানজীর মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের মোহান্তজী দেরী দেখে বাইরে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি আমাদের দেখতে পেয়েই — উন্‌হনে আগয়া, উন্‌হনে আগয়া বলে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন। তিনি মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নিজে নেমে এসে নমো নারায়ণায় বলে দণ্ডবত জানালেন। আমাদেরকে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে ভোজন-কক্ষে নিয়ে গিয়ে বসালেন। একজন ব্রহ্মচারী আমাদের কপালে চন্দন টিপ পরিয়ে সকলের সামনেই পঞ্চপ্রদীপ ঘোরাতে লাগলেন মন্ত্রপাঠ করতে করতে —

মহামূর্দ্ধা মহামাত্রো মহানেত্রো মহাবলঃ।
মহান্তকো মহাকর্ণো মহাষ্ঠশ্চ মহাহনুঃ॥

আরতি শেষ হতে আমাদের ভোজন পরিবেশন করা হল। খুবই সুস্বাদু আহার। ভিক্ষা প্রাপ্তির পর্ব যখন শেষ হল, তখন বেলা ২টা ৩০ মিনিট। আমাদের বিশ্রামের জন্য একটি আলাদা ঘরে নিয়ে এলেন। আমাদের ভোজনের পর তিনি আহারে বসলেন। আমরা বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর যখন বেরিয়ে পড়লাম দেখি হনুমানজীর মূর্তির নিচে বসে মোহান্তজী সমাগত ভক্তদের প্রশ্নের উত্তরে বলছেন —

অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব হল — ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। (১) ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা — এটি বেদান্তের মূল তত্ত্ব। আচার্য শঙ্কর বলতেন — অর্দ্ধ শ্লোকে প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ — কোটি কোটি গ্রন্থে যা লেখা আছে তা আধখানা শ্লোকে আমি বলছি —

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্ত ডিণ্ডিমঃ॥ ২১ (ব্রহ্ম জ্ঞানাবলী মালা)

এই শ্লোকের সরল অর্থ — 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম হতে জীব ও জগতের পৃথক কোন সত্ত্ব নাই — এই হল সমস্ত বেদান্তের উচ্চনিনাদ বা ঘোষণা'।

ব্রহ্ম সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, নির্বিশেষ, স্বপ্রকাশ, দেশ কাল পাত্র দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন এক অদ্বয় পরমতত্ত্ব — আশা করি এই ঋষিবাক্যে আপনাদের কোন সংশয় নাই। এই দৃশ্যমান জগৎ, আপনাদের ভাষায় এত 'সুখের ও সাধের পৃথিবী' মিথ্যা — এই কথাটি নিয়ে আপনাদের গোল বেধেছে। কিন্তু আচার্য এখানে কোন নঞর্থক (Negative) ভাবে 'মিথ্যা' শব্দটি প্রয়োগ করেন নি। মিথ্যা মানে আত্যন্তিক সত্তার অভাব। জলের কাছে দাঁড়ালে আপনাদের ছায়া পড়ে। আপনি দাঁড়িয়ে থাকলে ছায়াকেও দণ্ডায়মান দেখা যাবে, বসে থাকলে ছায়াও বসবে, আপনারা জলের কাছ হতে দূরে সরে যান, তাহলে জলের মধ্যে আর ছায়া দেখা যাবে না। তাহলেই বুঝে দেখুন আপনাদের ছাড়া ছায়ার কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বা সত্তা নাই। এই অর্থে জগৎ মিথ্যা। জগৎ যে মিথ্যা তা জগৎ শব্দের মধ্যেই প্রতিপাদিত রয়েছে। গচ্ছতীতি জগৎ (গম্ + ড) — যা নিয়ত গমন করে, নিয়ত পরিবর্তিত হয়, ever fleeting, ever changing, always inconstant, তাকে মিথ্যা ছাড়া আর কি বলা যাবে?

সত্য আমরা কাকে বলি? কালত্রয়মবাধিতং সত্যং — যা ত্রিকালে অবাধিত। যা পূর্বে ছিল, এখন আছে এবং পরেও থাকবে তারই নাম ঋষিরা দিয়েছেন 'সত্য'। যা পূর্বে ছিল, এখন নাই, তা সত্য নয়। পূর্বে ছিল না কিন্তু পরে হয়ত দেখা যাবে তাও সত্য নয়। আজ যে ৭০ তলা বা ১০২ তলা বিশিষ্ট আকাশচুম্বী অট্টালিকার কথা শুনে আপনারা বিস্ময়ে হতবাক হচ্ছেন, বিশ পঁচিশ বা পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ঐরকম ছিল না, কয়েক বৎসর পরে হয়ত দেখবেন তার রূপ এবং আকৃতি সবই বদলে গেছে! আপনারা আপনাদের স্ব স্ব স্থানেও দেখতে পাবেন এখানেও নানা পরিবর্তনের ধারা। জগতের প্রতি বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা প্রযোজ্য। জাগতিক যে কোন বস্তুর দিকে তাকিয়ে দেখুন, বিচার করলেই বুঝতে পারবেন, এখানে কোন বস্তুই নিত্য স্থির নয়। দৃশ্যপট, তার রূপ, রঙ প্রতিনিয়তই বদলাচ্ছে। এইভাবে যার উৎপত্তি বৃদ্ধি, বিবর্ধন ও বিলুপ্তি ঘটে, তা স্বভাবতই মিথ্যা।

কোন কোন টীকাকারের মতে, জগৎ শব্দের অর্থ যা ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের বিষয়। এই অর্থে তাবৎ দৃশ্য পদার্থই জগৎ পদবাচ্য। ব্রহ্ম জ্ঞেয় বা দৃশ্য হন না আবার যা সোনার পাথরবাটি, কাঁঠালের আমসত্ত্ব এবং বন্ধ্যাপুত্রাদির ন্যায় অসৎ তাও দৃশ্য হয় না। সুতরাং জগৎ সৎ নয়, অসৎও নয়। মিথ্যা বলতে যা সৎ নয়, অসৎ নয় এবং সদসৎও নয় তাকে বুঝায়। যেমন রজ্জুতে যে সর্পের জ্ঞান হয়, সেই সর্প মিথ্যা। মিথ্যা বস্তু তিনকালেই থাকে না অথচ তা জ্ঞানের বিষয় হয়। যেহেতু এ সম্বন্ধে জ্ঞান হয় এজন্য এটি সৎ কিন্তু তিনকালে বিদ্যমান থাকে

না, এজন্য এটি অসৎ। আবার অধিষ্ঠানের জ্ঞানে (রজ্জুকে রজ্জু বলে বুঝামাত্রই) এর নিবৃত্তি হয় বলে একে অসৎও বলা যায় না। এইভাবে এটি সদসৎ হতে ভিন্ন বস্তু। যা সদসৎ হতে ভিন্ন তা মিথ্যা। জগৎ এইরূপ মিথ্যা বস্তু।

যাইহোক, আমি আর একটি উদাহরণ দিয়ে পুনরায় তত্ত্বটি পরিস্ফুট করার চেষ্টা করছি। মনে করুন কোন মা-বাবা ছেলেকে নিয়ে সন্ধ্যেবেলা নর্মদার ধারে বেড়াতে গেছেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। ছেলেটি নিতান্ত খেলার ছলে জলে একটা ঢিল ছুঁড়ল। ঢেউ উঠল। বাচ্চা ছেলেটা তার মাকে বলল — দেখ দেখ মা জলের ভিতর চাঁদ নাচছে। ভেবে দেখুন ছেলেটার ঐ কথা কি ঠিক? আকাশের চাঁদ আকাশেই আছে, পুকুরে চাঁদ নাই, সে নাচছে না, মা হয়ত ভুল শুধরে দিবার জন্য বললেন — 'না না, চাঁদ নাচছে না, জলের নীচে চাঁদের প্রতিবিম্বটাই নাচছে'। কিন্তু একথাও যথার্থ নয়। বিম্বে যা থাকে প্রতিবিম্বে ত তারই প্রতিফলন ঘটে। কাজেই চাঁদ যখন নাচছে না, তখন তার প্রতিবিম্বও নাচতে পারে না। বল বা গতি জলে বাধা পেয়ে wave length সৃষ্টি করেছে, সেটাই কেঁপে কেঁপে চলেছে। পুকুরে চাঁদ নাই, তা নাচছে না, তার প্রতিবিম্বও নাচছে না।

এই উদাহরণ থেকে তাহলে একথাটি নিশ্চয়ই স্পষ্ট হল যে চর্মচক্ষুতে যা প্রত্যক্ষ দেখা যায়, সর্বদা তা সত্য হয় না। তাই আচার্য শঙ্করের অভিমত — জগৎ মিথ্যা। যোগী যাঁর স্বরূপ জ্ঞান হয়, তাঁর চোখে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। এই দৃশ্যমান ব্যবহারিক জগৎ অবিদ্যামানোহপি অবভাসতে। বাস্তবিক পক্ষে নাই অথচ আছে বলে মনে হয়, এই ভ্রান্ত জ্ঞানের উপরই জগৎ চলছে। এটি কেমন? না — শঙ্কর বলেছেন — যেমন, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানবৎ। সত্যি সত্যি সাপ নাই অথচ একগাছি দড়ি দেখে মনে হল সেটা সাপ। ভ্রান্তিবশে দড়িতে সাপের চিত্র ভেসে উঠল। পরম বৈজ্ঞানিক ঋষিরা বলেছেন — এই যে অবস্পন্দিত দৃষ্টি, এই যে ভ্রান্তি দর্শন, এর কারণ আপেক্ষিকতা (due to Relativity)। আপেক্ষিকতার উর্ধ্বে একমাত্র তুরীয় ভূমিতে জীবাত্মার সমুত্থান ঘটলে তবেই বুঝা যায় যে নাভাবো বিদ্যতে সতঃ — সৎএর বিদ্যমানতার কখন অভাব ঘটে না অর্থাৎ কিনা যা সৎ তা সদৈব অবিনাশী। সর্বব্যাপী ব্রহ্মে রজ্জুতে সর্পবৎ জগৎ ভাসে, কেবল প্রতীত হয়, প্রতীয়মান হয়। প্রকৃতপক্ষে জগতের ব্রহ্মনিরপেক্ষ কোন আন্তরিক সত্তা নাই। কাজেই জগৎ যে মিথ্যা — এটি যুক্তিসিদ্ধ এবং অনুভবসিদ্ধ তত্ত্ব।

মোহান্তজীর মর্মগ্রাহী ভাষণ শেষ হল। ভক্তবৃন্দ প্রণামাদি সেরে হর নর্মদে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ বসে মোহান্তজীকে নমো নারায়ণায় জানিয়ে ভজন আশ্রমের পথে রওনা হলাম। তাঁর কাছে ভিক্ষা গ্রহণের জন্য মোহান্তজী আমাদের বারবার সুক্রিয়া জানালেন। সূর্য ধীরে ধীরে ঢলে পড়ছে পশ্চিম দিকচক্রবালে। খেড়াপতি হনুমান মন্দিরে যাবার পথে যে জায়গায় আমরা 'ম্যাজিক' খেলা দেখেছিলাম এখন সেই জায়গা ফাঁকা। শুধু গভীর চিহ্নটা ছাড়া কিছু নাই। যে বড় গর্তটা ছিল সেটিও পাথর ও মাটি দিয়ে বোজান। প্রেমানন্দ বললেন, দুপুরে আমরা যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ দেখলাম এইসব অভিচার ক্রিয়ার অন্তর্গত।

আজকাল যোগ ও ধর্ম নিয়ে নানাপ্রকার জুয়াচুরি চলছে। অনেক প্রতারক গেরুয়া ও আশ্রমের আড়ালে দিকে দিকে যে লোকবঞ্চনার ফাঁদ পেতে বসেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভারতীয় ঋষিদের যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে অনেকের অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা দুঃখের বিষয় সন্দেহ নেই। আজকাল, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের চোখে বিশেষ করে যাঁরা বিজ্ঞানের ছাত্র — তাঁদের কাছে যোগ, ইন্দ্রজাল, তথা কেরামতি শব্দগুলি সমার্থক অর্থাৎ তাঁরা যোগবিদ্যাকে বুজরুগী বলে মনে করেন। তবে তাতে ঋষিদের যোগবিদ্যার কোন মহিমা ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে আমি মনে করি না। কারণ, সাপের চর্বি মিশিয়ে দুর্জনরা ভেজালের ঢালাও কারবার করছে বলে আসল ঘি-এর গুণ ও গুরুত্ব কি কিছু কম? যোগের এক একটি পদ্ধতি আবিষ্কারের জন্য আমাদের পরম কারুণিক ঋষিগণ কতই না কষ্ট করে গেছেন। নিরন্তর ও নিরলস পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলশ্রুতি সহ নিজেদের ব্যক্তিগত উপলব্ধির রসে যা তাঁদের নিকট সিদ্ধ বলে মনে হয়েছে, তাই তাঁরা কলিহত জীবের জন্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এটি যদি বিজ্ঞান না হয়, তা হলে বিজ্ঞান আর কাকে বলব? Physical Laboratory তে কতকগুলি যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষা করলে তা বিজ্ঞান হবে আর Spiritual Laboratory তে পরীক্ষা করে দেখলে, যেহেতু তা সম্পূর্ণভাবে অনুভূতি এবং প্রজ্ঞা ক্ষেত্রের ব্যাপার, এইজন্য তাকে বিজ্ঞান বলা হবে না, এই ধরণের মানসিকতাকেই বোধহয় 'ছটাকে বুদ্ধি' বলা যেতে পারে। বিজ্ঞান প্রথমতঃ একটা অনুমান (hypothesis) নিয়ে অগ্রসর হয়, পরে তা পরীক্ষায় সিদ্ধ হলে তাকে সত্য হিসাবে ধরা হয়। অপরপক্ষে যোগীরা কোন

অনুমানকে ভিত্তি না করে জীবজগতে যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তাকেই নিজ দেহ-ভাণ্ডে প্রাণের গতি ও নাড়ী সঞ্চালনের বিবিধ ক্রিয়ার সঙ্গে মিলিয়ে তীব্র সংবেগ এবং সূক্ষ্ম বুদ্ধিবলে নানা জটিল রহস্য উদঘাটন করেছেন। প্রকৃতির অতল রহস্য জানিয়েও তাঁরা ক্ষান্ত হন নি, দেহের মধ্যেই দেহাতীতকে কিভাবে অনুভব করা যায়, মরজগতে থেকেই কিভাবে অমরলোকের আনন্দ সম্ভোগ করা যায়, সেই অমৃতবার্তাও তাঁরা জানিয়ে গেছেন। অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিকরা কিন্তু আজকাল যোগবিদ্যাকে Higher Science, the Path of Science ইত্যাদি বলে মনে করেন।

Mullins তো স্পষ্টই ঘোষণা করেছেন — 'The Sankhya yoga is the Union of the body and mind. In its Vedantic view, it is the joining of the individual with the Supreme Spirit by Holy Communion with the other through intermediate grades, whereby the limited Soul may be led to approach its unlimited fountain and loss itself in the same.' [Eassy on Vedanta]

যাই হোক, যোগবিদ্যার মূলে কোন বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তি আছে কিনা, কিংবা এটা নিছক একটা কসরৎ ও কেরামতি, আসুন আজ সেই আলোচনাই করি।

প্রথমেই 'যোগ' কথাটির অর্থ পরিষ্কার হওয়া দরকার। ঋষিরা বলেছেন যোগ হল জীবাত্মাপরমাত্মনোরৈক্যম্ অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন বিজ্ঞানকেই যোগ বলে। এই মিলন কিভাবে হয়? তাঁদের উত্তর — যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। আমাদের বহুমুখী চঞ্চল চিত্তবৃত্তিগুলিকে নিরোধ করাই যোগবিদ্যার প্রথম পাঠ। চিত্তবৃত্তিগুলি বহুমুখীন কেন? কে বা কি তাদেরকে চঞ্চল করেছে? ঋষিরা গবেষণা করে বের করেছেন — নানা কামনা বাসনার ফলেই চিত্তবৃত্তি চঞ্চল হয়, বিক্ষিপ্ত হয়। বাসনা এব সংসার। নিজেদের সহস্র সহস্র বাসনার জালেই আমরা গুটিপোকার মতো আটকে আছি। আমরা আমাদের লালসার লালা দিয়ে যে জাল বুনেছি তারই ফাঁদে সবাই আবদ্ধ। এই ফাঁদই সংসার। তস্মিন্ ক্ষীণে জগৎ ক্ষীণং তৎ চিকিৎস্য প্রযত্নতঃ। বাসনা ক্ষয় হলেই কোন বন্ধন কোন দিন জ্বালা অজ্ঞানতার কোন বিড়ম্বনা আর থাকবে না। কাজেই ঋষিদের প্রেসক্রিপশন হল — সর্বাগ্রে বাসনা-ব্যাধির চিকিৎসা কর। এবং সেটা চিত্তবৃত্তি নিরোধ করতে পারলে তবেই সম্ভব।

বাসনার বিলয়ের প্রয়োজনীয়তা কি? থাক্ না বাসনা? তৃপ্তি ও অতৃপ্তির এই যে সুখের দোলনাটা নষ্ট করে লাভ কি হবে? লাভ — মোক্ষ। মোক্ষের আবশ্যকতা? জন্মমৃত্যুর গোলকধাঁধা থেকে বাঁচবার জন্য। ভালরে, ভাল — জন্মমৃত্যুর দোষটা কি? ঋষিরা বলেছেন — জন্ম থাকলে মৃত্যু ও পুনর্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। জন্ম পুনর্জন্ম মানেই রোগ শোক জরা চিন্তার তাপ ভোগ, অশান্তির পুটপাকে অবিরাম দহন। সুখ শান্তি সকলেই চায় — এমন কেউ নাই যে সুখ চায় না। শান্তিতে থাকতে চায় না। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অর্থাৎ পরিপূর্ণ সুখে থাকার আকাঙ্খা জীব মাত্রেরই সহজাত। দুঃখনিবৃত্তির এবং নিত্যানন্দে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মোক্ষ বা মুক্তি অনিবার্যভাবে প্রয়োজন। এই মুক্তি বাসনা ক্ষয়ের দ্বারাই সম্ভব। চিত্তবৃত্তি নিরোধ দ্বারা বাসনা ক্ষয় হয়। চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলেই 'স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে' (গীতা ৫/২১)। কাজেই অক্ষয় সুখলাভ করার জন্যই জীবাত্মা পরমাত্মার মিলন-বিজ্ঞান আবিষ্কার করা একদিন মানুষের বড় দরকার হয়েছিল। যোগবিজ্ঞানীরা বহু গবেষণার দ্বারাই এই বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন। এখন জড়বিজ্ঞানের আবিষ্কারগুলি যে উৎস থেকে, সেই একই প্রকৃতির গর্ভগুহ্য থেকে যোগ সম্বন্ধীয় তত্ত্বগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে কিনা, প্রথমটির সত্য তথ্যগুলিকে যদি বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে দ্বিতীয়টির অবদানগুলিকে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করা যায় কিনা তারই আলোচনা করা যাক্।

পৃথিবীর যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আবিষ্কারের মূলে থাকে প্রথমে কৌতূহল ও একাগ্র চিন্তা, দ্বিতীয় স্তরে দিনের পর দিন নিষ্ঠা সহকারে পর্যবেক্ষণ — সর্বশেষে ভূয়োদর্শন। ঐ ভূয়োদর্শনের যা ফলশ্রুতি — তারই অপর নাম বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান। ঋষিরা ভূয়োদর্শনের ফলে একদিন জানতে পারলেন —

'আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্তং প্রাণিনাং প্রাবর্তনং শ্বাসপ্রশ্বাসপেহয়ং শোধতে হৃদিকন্দরং।

তাঁরা আবিষ্কার করলেন — আমাদের চারদিকে যে বিপুল বিরাট বায়ুমণ্ডল, তার থেকে অম্লজান নিঃশ্বাসের মধ্য দিয়ে হৃদিকন্দরে অর্থাৎ ফুসফুসে আসে, এই অম্লজানই শরীরাভ্যন্তরস্থ মলিন রক্ত কণিকাগুলিকে দগ্ধ করে। তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন — এই ধরণের দহন ক্রিয়ার জন্যই শরীরে উত্তাপ, শোণিত শোধন, খাদ্যের পরিপাক — এক কথায় জীবনীশক্তির পোষণ হয়। অম্লজানের যে সূক্ষ্মাংশ আমাদের শরীর পোষণ

করে সেটাই আবার জীবনীশক্তি রূপে (vital fluid) মস্তিষ্কের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষগুলির পারমাণবিক পরিকম্পন হয়। বর্তমানের বৈজ্ঞানিকরা একে বলেন cellular vibration। ঋষিরা বললেন এই পারমাণবিক পরিকম্পন বা cellular vibration এর ফলেই চিন্তা বা চিত্তবৃত্তির উদয় হয়। আবার পূর্বোক্ত দহন ক্রিয়ার জন্যই শোণিত কণিকাস্থ অঙ্গারের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোগে অম্লজান যখন আধুনিক পরিভাষায় যার নাম Carbon dioxide বা Carbonic Acid gas রূপে বের হয়, তখন সেটাই হয় প্রশ্বাস। এই প্রশ্বাসের ফলেই শরীরে ক্ষয়ানুভূতি বা ক্ষুধার উদ্রেক হয়। তবেই দেখা গেল নিঃশ্বাস প্রশ্বাসেই চিত্তবৃত্তির উদয় ও ক্ষয় বা আয়ুনাশ। এই ক্রিয়া নিরুদ্ধ হলেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ বা যোগাবস্থা। এই অবস্থায় যে কোনও রকমের ক্ষয়ক্রিয়া নষ্ট হয় বলে আয়ুবৃদ্ধি হয়। এখন দেখুন, এ বিষয়ে এ বিজ্ঞানের সাক্ষ্য কি ? বৈজ্ঞানিক Watt বলেন — 'Animals inhale oxygen from the air, which combines with carbon in the lungs forming carbonic acid, which passes out of the lungs at every exhalation; while on the other hand, plants absorb this carbonic acid, digest it and give out oxygen from their leaves etc.' অর্থাৎ প্রাণিগণ অম্লজান নিঃশ্বাসে গ্রহণ করে। তা ফুসফুসে অঙ্গারের সঙ্গে মিলিত হয়। পরে Carbonic Acid gas রূপে (ঋষিরা যাকে বলেছেন আঙ্গারিকাম্ল) প্রশ্বাসের ভিতর দিয়ে বের হয়ে যায়। এই শ্বাস প্রশ্বাস নিরোধেই প্রাণায়াম। ধ্যানধারণাদি এই প্রাণায়ামের অবস্থা ভেদ।

সমাধি বায়ু সংযমের পরিণাম। সেই জন্যই বৃত্তি নিরোধ এবং শরীরের ক্ষয়নিবারণের দিকে যোগীদের এতখানি যত্ন। তাঁরা বুঝেছিলেন, বারবার অম্লজান যদি ফুসফুস প্রবেশ না করে, খাদ্যদ্রব্যকে উপযোগী করার জন্য যদি অল্প পরিমাণ অম্লজানকে কাজে লাগানো যায়, তাহলেই আমাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এই চিন্তা ভারতের ঋষিগণকে একদিন তীব্রভাবে ব্যস্ত করেছিল। এই আজকালকার বৈজ্ঞানিকরা যা করে থাকেন ঠিক তাঁরাও সেইরকমভাবে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রকৃতিতে প্রকৃতির অতলান্ত রহস্যের মধ্যে পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আরম্ভ করে দিলেন। তাঁরা খুঁজতে লাগলেন জীবজগতের মধ্যে এমন কোন প্রাণীর সন্ধান পাওয়া যায় কিনা যেটি স্বভাবতঃ সমাধিবান। কারণ তাঁরা অনুভব করেছিলেন সমাধিস্থ প্রাণীর দৈহিক ক্রিয়াগুলি আয়ত্ত করতে পারলেই জরা ব্যাধির কবল থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। নিরবধি সুখের গুপ্ত মন্ত্রটিও জানা যাবে।

স্বভাব-সমাধিবান-প্রাণী — এখন যাদেরকে Hibernating animals বলা হয় — তার খোঁজ শুরু হয়ে গেল। গবেষণার ফলে তাঁরা সাপ ভেক এবং এক জাতীয় কচ্ছপের সন্ধান পেলেন, যারা শীতকালে মাটির নীচে সমশীতোষ্ণ গুহার মধ্যে তালুকুহরে জিহ্বা দিয়ে নিঃশ্বাস বন্ধ রেখে সমাধির অবস্থায় থাকে। পরীক্ষা করে দেখলেন, এই সময় তাদের হৃদপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া মাত্রও থাকে না। বাহ্যজ্ঞানশূণ্য হয়ে থাকে। একেবারে সম্পূর্ণ বৃত্তি নিরোধ অবস্থা। শরীরের ক্ষয়বৃদ্ধি এমন কি মলমূত্র লালা স্বেদ উত্তাপ আদি কিছুই থাকে না। শীতকালে এই সব প্রাণীর সমাহিত অবস্থায় অঙ্গভঙ্গিগুলিও বিচিত্র হয়। কোন্ কৌশলে মানুষও ঐ রকমভাবে সমাহিত অবস্থায় চিত্তবৃত্তিশূণ্য হতে পারে তারই নিরন্তর গবেষণা তাঁরা চালালেন। ঐ সকল প্রাণীর আচরণ, অভ্যাস, কার্যকলাপ অতি সাবধানে পর্যবেক্ষণ করে বুঝলেন, ঐ অবস্থায় ঐ সকল জীবজন্তুর রক্ত শীতল, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রাও কম থাকে। দৃষ্টি থাকে পলকশূণ্য, গুহা বা গর্তটি থাকে সমশীতোষ্ণ। তারা অল্পাহারী, তাদের জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বিধাবিভক্ত ও দীর্ঘ, তালুকুহরে তাদের জিহ্বা ঢুকানো থাকে। এই সব finding থেকে তাঁরা সমাধিলাভের জন্য নানা আসন মুদ্রা ও সমাধির পদ্ধতি আবিষ্কার করলেন। যেমন ভেকের বসবার Posture থেকে বের করলেন পদ্মাসন, সিদ্ধাসন খেচরীমুদ্রা সবই তাঁদের ঐ সব observation এর ফল। তাঁরা বিশ্ববাসীকে জানালেন —

উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ।
উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পানিকৃত্বা তু তাদৃশৌ॥
নাসাগ্রবিন্যসেদ্ দৃষ্টিং দন্তমূলঞ্চ জিহ্বয়া।
উত্তোল্য চিবুকং বক্ষ উত্থাপ্য পবনং শনৈঃ॥
যথাশক্ত্যা সমাকৃষ্য পুরয়েদুদরং শনৈঃ।
যথাশক্তেরপশ্চাত্তু রেচয়েদ বিরোধতঃ
ইদং পদ্মাসনং প্রোক্তং সর্বব্যাধি বিনাশনং॥

বাম উরুর উপর ডান পা ও বাম হাত এবং দক্ষিণ উরুর উপর বাম পা ও ডান হাত উত্তান করে রাখবে। নাসাগ্রে দৃষ্টি ও দন্তমূলে জিহ্বাকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে। বুক ও চিবুক খাড়া করে যথাশক্তি বায়ু পূরণ কুম্ভক ও রেচন করে যেতে হবে। একেই পদ্মাসন বলে। পদ্মাসন অভ্যাস করলে শরীর ব্যাধিশূণ্য হবে — শরীরের ক্ষয়বৃদ্ধি মলমূত্র লালা স্বেদ উত্তাপ কিছুই থাকবে না চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হবে। নাতিশীতোষ্ণ স্থানে এটি অভ্যাস করা প্রয়োজন।

তাঁরা এর নাম দিলেন পদ্মাসন — আসলে এটি উপরোক্ত প্রাণীদের সমাহিত অবস্থার posture মাত্র। ঐ সব প্রাণীদের চিত্তনিরোধ অবস্থা এবং দীর্ঘ জীবন লাভ পদ্ধতি লক্ষ্য করেই ঋষিরা মানুষের সুখের জন্য ঐ কর্মকৌশলটি অভ্যাস করার ব্যবস্থাপত্র দিলেন। প্রত্যেক আসন মুদ্রা এই রকম নিরন্তর গবেষণার ফল। জিহ্বা তালুকুহরে প্রবিষ্ট করাতে পারলে শরীর নীরোগ হয়— তালু নিঃসৃত একরকম জীবনপ্রদ সর্বরোগহর রসের নিঃসরণে মানুষ অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দরসে নিমগ্ন হয়ে যায়। এইজন্য সাপ কচ্ছপ প্রভৃতি প্রাণীর জিহ্বার গঠন ও তালুকুহরে তা প্রবেশের কৌশল দেখে তাঁরা আবিষ্কার করলেন খেচরী মুদ্রা। এই মুদ্রাকে আয়ত্ত করার জন্য জিহ্বা দোহন ছেদনেরও কৌশল বের করে ফেললেন —

ভ্রূবোরন্তর্গর্তাং দৃষ্টিং নিধায় সুদৃঢ়াং সুধীঃ।
উপবিশ্যাসনে বজ্রে নানোপদ্রববর্জিতঃ।
লম্বিকোর্ধ্বস্থিতে গর্তে রসনা বিপরীতগাং।
সংযোগয়েৎ প্রযত্নেন সুধা কূপে বিচক্ষণঃ
মুদ্রৈষা খেচরী প্রোক্তা ভক্তানামানুরোধতঃ॥

খেচরী মুদ্রা প্রভাবেই ক্ষুধা তৃষ্ণা জয়, ক্ষয় বৃদ্ধি রোধ, দীর্ঘজীবন ও সৌম্যকান্তি লাভ হয়। এর শ্রেষ্ঠ ফল চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা নিরন্তর সুখলাভ।

যোগীদের এই প্রাণী পর্যবেক্ষণ থেকে যে সব যোগকৌশলের কথা বলা হল তা বাস্তবে সম্ভব কিনা তার কিছু কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণ দিই। ভারতে এমন বহু যোগী আছেন যাঁরা ঐসব যোগকৌশল আয়ত্ত করে বহু আশ্চর্য ক্ষমতা লাভ করেছেন। মার্ক টোয়েন লিখেছেন — ভাস্করানন্দকে প্রণাম করতে গিয়ে দেখেন তিনি আসনে নাই। অথচ সেই সভায় রাশিয়ার জার নিকোলাস, হাইকোর্টের তৎকালীন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রমাধব মুখোপাধ্যায় এবং স্বয়ং বড়লাট উপস্থিত ছিলেন। বড়লাট সেদিন উপস্থিত ছিলেন প্রোটোকলের নিয়মরক্ষার জন্য। মার্ক টোয়েন তাকিয়ে দেখেছিলেন। হঠাৎ আসন বেদীর উপরে, শূণ্য থেকে শোনা গেল ভাস্করানন্দের কলকণ্ঠ — 'সাহেব তুম্ ঢুঁড়তাহো মুঝে, আভি আ রাহা হৈ'। পরক্ষণেই মার্ক টোয়েন সবিস্ময়ে দেখলেন — ভাস্করানন্দ নিজের আসনেই বসে আছেন। আগমন নির্গমনের পথে আসন বেদীকে ঘিরে দিকপালরা বসে ছিলেন। এটা কি করে সম্ভব — এই ভেবে শুধু মার্ক টোয়েন নয় সবাই সেদিন স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ভাস্করানন্দ নিজেই এব জবাব দিয়েছিলেন — ইস্‌কো তুম্‌লোগ কৌঈ ইন্দ্রজাল মত্ সমঝো। এ হামারা ভারতীয় বিজ্ঞান শৈলী হ্যায়। প্রথম শ্রেণীর Sceptic Paul Brunton ও ঐরকম বহুযোগীর কথা তাঁর In Search of Secret India এবং In Search of Secret Egypt নামক বই দুটিতে লিখে গেছেন। পাঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের রাজত্বকালে যোগী হরিদাস ছিলেন ঐ খেচরী মুদ্রার জীবন্ত সাক্ষ্য। তিনি ৩০০ বৎসর নীরোগ অবস্থায় বেঁচেছিলেন। দুরভ্রমণ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য ক্ষমতাও তাঁর আয়ত্তে ছিল। রণজিৎ সিংহের আমলের লোক কিন্তু মার্ক টোয়েন ও পল ব্রান্টন উভয়েই তাঁকে দেখেছিলেন। একবার তিনি ঋষিদের আবিষ্কৃত আসন মুদ্রাগুলি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর রচিত কিনা তার demonstration দিতে মনস্থ করেন। মহারাজের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় মাটির নীচে একটি গুহাতে তিনি প্রবেশ করলেন। ৪০ দিন পরে তিনি সমাধি থেকে উঠেন। এ ব্যাপারের সাক্ষী ছিলেন General Ventura, Captain Wade এবং বড়লাটের চিকিৎসক Dr. Mc. Gregor. Govt. of India -র Gazettier -এ এর বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে —

"The account is given by Dr, Mc. Gregor, as regards a Faqueer of the Punjab, who happened to come to Lahore. After the expiration of forty days and nights, the Maharajah attended by his grandson and several of his Sirdars as well as General Ventura, Captain Wade and Dr. Mc. Gregor proceeded to disinter the Faqueer. The bricks and muds were

removed from the outer door-way; the door of the garden house was next unlocked and lastly that of the wooden box containing the Faqueer. The latter was found covered with a white sheet. The first step of the operation of resuscitation consisted in poaring over his head a quantity of warm water. After this a hot cake of atta was placed on the Crown of his head, a plug of wax was next removed from one of his nostrils and on this being done the man breathed strongly through it. The mouth was now opened and the tongue which had been closely applied to the roof of the mouth, brought forward and both it and the lips annointed with ghee. During this time, no pulsation was felt but the temperature of the body was much above the normal standard of health. But the Faqueer being animated, the pulse became perceptible while the unnatural temperature of the body rapidly diminished. At last, the Faqueer was able to converse and the completion of the feat was announced by the discharge of guns and other demonstration of joy."

খেচরী মুদ্রার দ্বারা মানুষ যে ক্ষুধা তৃষ্ণা জয় এবং একেবারে সকল চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ করে দীর্ঘজীবন লাভ করতে পারে উপরের বিবরণ তার প্রমাণ। কিন্তু এইটাই বড়কথা নয়। মুদ্রা আসনগুলির আবিষ্কার ও অভ্যাসের দ্বারা ঋষিরা আরও অনেকগুলি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন। তাঁরা ঐ আসন মুদ্রাগুলি থেকে বিভিন্ন প্রাণী ও মানুষের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা এবং প্রত্যেকে এক মিনিটে কয়বার শ্বাসগ্রহণ করে তাও নির্ভুলভাবে গণনা করে ফেলেন। যোগীর নিম্নলিখিত চার্টটিকে কোনও বিজ্ঞানীর findings বলতে বাধা আছে কিনা বিচার করে দেখুন —

প্রাণী	এক মিনিটে	কয়বার শ্বাসগ্রহণ করে
শশক	,,	৩৬
গিনি দেশীয় শূকর	,,	৩৬
কপোত	,,	৩৪
বানর	,,	৩০
কুক্কুট	,,	৩০
কুকুর	,,	২৮
বিড়াল	,,	২৪
ছাগ	,,	২৪
বক	,,	২২
পাতিহাঁস	,,	২১
ঘোটক	,,	১৬
মানুষ	,,	১২
কচ্ছপ	,,	৩

এই চার্ট থেকে দেখা যাচ্ছে কচ্ছপের শ্বাসগ্রহণের সংখ্যা সবচেয়ে কম, অতএব তার দ্রাম্লাঙ্গার (CO_2) বায়ুর নিঃসরণও কম। সুতরাং শারীরিক ক্ষয়ও তার অতি সামান্য। ফলে কচ্ছপ দীর্ঘজীবী।

'সশাতি দর্দুরা শীতে ফণিনঃ পবনশনাঃ
কূর্মাশ্চিবাঙ্গ গোপ্তা বা দৃষ্টন্তা যোগিনো মতাঃ॥

বিশ্ববন্দিত জীববিজ্ঞানী হ্যালডেন বলেন — 'one instance is recorded of a tortoise having lived hundred and ten years. Milky plants were its favourite nourishment. It was further insensible to serve wounds – একটি কচ্ছপ ১১০ বৎসর জীবিত ছিল। দুধের মত আঁঠাযুক্ত একরকম লতাপাতা এর খাদ্য ছিল। অস্ত্রাঘাতে এর কিছুই হত না।" হ্যালডেনের এই observation কে আশা করি আধুনিক বিজ্ঞানের কোন ছাত্র বা অধ্যাপকেরই গাঁজাখুরি গল্প বলবার ধৃষ্ঠতা হবে না। তা যদি না হয়, তাহলে বিনা dissection এ অর্থাৎ পরীক্ষাগারে কোন প্রাণী হত্যা না করেই যাঁরা যে পদ্ধতিতে প্রত্যেক প্রাণীর শ্বাস-প্রশ্বাসের সংখ্যা আবিষ্কার করে ফেললেন তাঁদেরকে বা তাঁদের পদ্ধতিটিকে বুজরুগী বলা কি ধরণের মানসিকতা? হ্যালডেন বললে তা বিজ্ঞান আর ঋষি বললে তা উদ্ভট গল্প হবে?

এখন ঋষি কথিত দ্ব্যম্লাঙ্গার অর্থাৎ Carbonic Acid এর যে অঙ্গারভাগ শরীরকে ক্ষয় করে বেরিয়ে যায়, তার সঙ্গে নিঃশ্বাস সংখ্যার কোন বিজ্ঞানসম্মত সম্বন্ধ আছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা যাক্।

ঋষিরা পর্যবেক্ষণ করে যা বের করেছিলেন, বর্তমানের শরীরতত্ত্ব-বিজ্ঞানীরাও প্রায় সেই একই কথা বলছেন।

ঋষি আবিষ্কারের করেছিলেন,	১ মিনিটে ৩ বার নিঃশ্বাসে ৩৬৪.৮৬ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হয়।
এখনকার বিজ্ঞানীর মতে	১ মিনিটে ৩ বার নিঃশ্বাসে ৩৬৪ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হয়।
ঋষি বলেছিলেন,	১ মিনিটে ৬ বার নিঃশ্বাসে ১৯৪৩ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হয়।
এখনকার বিজ্ঞানীর মতে	১ মিনিটে ৬ বার নিঃশ্বাসে ১৯৪৩.৬৭ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হয়।
ঋষি বলেছিলেন,	১ মিনিটে ১২ বার নিঃশ্বাসে ২৭৯৮ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হয়।
এখনকার বিজ্ঞানীর মতে	১ মিনিটে ১২ বার নিঃশ্বাসে ২৭৯৮.১৮ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হয়।
ঋষি বলেছিলেন,	১ মিনিটে ২৪ বার নিঃশ্বাসে ৪৫০১.১৩ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হয়।
এখনকার বিজ্ঞানীর মতে	১ মিনিটে ২৪ বার নিঃশ্বাসে ৪৫০১.১৩ গ্রেণ অঙ্গার নির্গত হয়।

অতএব শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়ার হ্রাস অনুসারে শারীরিক ক্ষয়েরও হ্রাস হয়। ক্ষয় হ্রাস হলেই দীর্ঘজীবন লাভ হয় — এই যে সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে যোগী ও বিজ্ঞানী প্রায় একমত হলেন। যোগীরা তাই নিরোগ দীর্ঘজীবন লাভের জন্য শ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী প্রাণায়াম পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর মধ্যে কোন বুজরুগীর বা অবৈজ্ঞানিক ভোজবাজীর খেলা নাই।

শারীরিক ক্রিয়ার তারতম্যানুসারে প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য আর প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য থেকে প্রতি মুহূর্তে কতটুকু অঙ্গারিকাম্ল নিঃসরিত হচ্ছে তাও যোগীরা যোগের সাহায্যে উদ্ভাবন করেছিলেন। "স্বরোদয় যোগ' থেকে আমি তার একটি ক্ষুদ্র তালিকা দিচ্ছি।

নাসাগ্র থেকে যতদূর পর্যন্ত প্রশ্বাসের স্পর্শ অনুভূত হয় সেই length টাকেই ঋষিরা প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য বলেন। তাঁদের পর্যবেক্ষণ শক্তি কত প্রখর দেখুন —

তাদের মতে	স্বাভাবিক সাম্যাবস্থায় প্রশ্বাসের দৈর্ঘ্য	৯"
	আহারকালে	১৩.৫"
	কথা বলার সময়	১৩.৫"
	দৌড়াবার সময়	২৫.৫"
	মৈথুনকালে	৪৮.৭৫"
	নিদ্রাকালে	৭৫"

এই জন্যই স্থূলকায় তামস প্রকৃতির নিদ্রা বেশী, আয়ুও অল্প। কিন্তু এই দৈর্ঘ্য বা অঙ্গারের অতি নিঃসরণ যদি কোন উপায়ে কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে মানুষ দীর্ঘজীবী হবেই। নাসাগ্র দৃষ্টি অর্থাৎ একাগ্রতা, ভেক সর্পাদির মত শ্বাসরোধ অর্থাৎ কুম্ভক প্রভৃতি ক্রিয়াকৌশলের দ্বারাই তা সম্ভব। তাই তাঁরা বলেন —

প্রাতঃকালে চ মধ্যাহ্নে সূর্যাস্তে চার্ধরাত্রকে।
কুর্য্যাদেবং চতুর্বারং কালেযৃতেষু কুম্ভকান্॥
ইত্থং মাসত্রয়ং কুর্যাৎ অনালস্যং দিনে দিনে।
ততো নাড়ী বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ অবিলম্বেন নিশ্চিতং।
রসনা মূর্ধ্বগাং কৃত্বা যশ্চন্দ্রে সলিলং পিবেৎ।
মানসমাত্রেন যোগীন্দ্রো মৃত্যুং জয়তি নিশ্চিতং॥ (শিবসংহিতা, ৫০)

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে — এটা নিছক ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ নয়। এগুলো রীতিমত বিজ্ঞানীদের গবেষণার মত। ট্র্যাজেডি হচ্ছে, ভ্রমবশে আমরা এগুলোকে ধর্মলাভের গুহ্যাতিগুহ্য পন্থা মাত্র বলে জেনেছি। যোগীরা যে আসলে scientist তাঁদের ক্রিয়াপদ্ধতি ও পর্যবেক্ষণের ধারাটিও যে Scientific research, তা আমরা বেমালুম ভুলে বসে আছি। তার ফলেই আধুনিক শিক্ষিত লোক এগুলোকে বুজরুগী বলতে সাহস পায়। মজার কথা এই J. Stuart Thomson তাঁর Animal Kingdom, Parker Haswell এর Zoology, H.G. Wells এর Science of Life, David Katz এর Animals & Men, L. E. Mc.Indoo এর The Olfactory Sense of

the Honey Bee এবং Auditory Reaction of Frogs প্রভৃতি গ্রন্থে ঋষিদের ঐসব তত্ত্বই বর্ণনা করেছেন। ঐ সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের ঐ উদ্ভাবিত তত্ত্বকে কেউ অস্বীকার করে না। ঋষিরা তাঁদের বহু আগেই ঐ সব রহস্য আবিষ্কার করেছিলেন। শুধু তাই নয়, আজ পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক যা বলেন নি — তাঁরা তার চেয়ে বেশী কিছু বলে গেছেন।

যেমন শ্বাস-প্রশ্বাসের হ্রাসবৃদ্ধির উপর মানুষের শুধু স্বাস্থ্য ও পরমায়ুই নির্ভর করে না, আরও অনেক কিছু লাভ হয়। ঋষিদের গবেষণালব্ধ অনুসন্ধানের ফলস্বরূপ তাঁরা বলেছেন —

	প্রশ্বাস হ্রাসের মাত্রা	ফল
মানুষের যে স্বাভাবিক	৯" প্রশ্বাস,	
তাকে যোগ কৌশলে	৮.২৫" তে নামাতে পারলে	জিতেন্দ্রিয়তা লাভ হয়।
	৭.৫" তে নামাতে পারলে	আনন্দ লাভ হয়।
	৬.৭৫" তে নামাতে পারলে	কবিত্বশক্তি লাভ হয়।
	৬" তে নামাতে পারলে	ভাবী ঘটনা উপলব্ধি করা যায়।
	৫.২৫" তে নামাতে পারলে	সূক্ষ্মদৃষ্টি উপলব্ধি করা যায়।
	৪.২৫" তে নামাতে পারলে	আসন থেকে শূণ্যে উঠা অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে অভিভব করা যায়।
	৩.৭৫" তে নামাতে পারলে	দূরদৃষ্টি লাভ হয়।
	৩" তে নামাতে পারলে	অণিমাদি শক্তি লাভ হয়।
	২.২৫" তে নামাতে পারলে	নব বিধির অস্তিত্বানুভূতি হয়।
	১.৫" তে নামাতে পারলে	দেবত্বলাভ এবং সূক্ষ্মশরীরে বিচরণ করা যায়।
	০.৭৫" তে নামাতে পারলে	ব্রহ্মানুভূতি লাভ হয়।

আর যখন প্রশ্বাস আদৌ নাসিকার সীমার বাইরে আসে না — "নাসাভ্যন্তরচারিণৌ বায়ু উন্মেষনিমেষবিবর্জিতং' অবস্থা, তখনই নির্বাণ লাভ।

ঋষিরা বলেছেন যে খাদ্য পরিপাকের জন্য যত বাইরের অম্লজান দরকার হয় সেই খাদ্যই ক্ষতিকর। এই রকম খাদ্য পরিপাক করতে বেশী অঙ্গারিকাম্ল বের করে ফেলতে হবে। ফলে শরীরে ক্ষয় হবে। সুতরাং কোন খাদ্য আয়ুষ্কর আর কোন্ খাদ্য আয়ুনাশক এই মাপকাঠিতেই তা নির্ণয় করা সম্ভব। এই সূক্ষ্ম রহস্য ধরতে পেরেছিলেন বলেই ঋষিরা খাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধির উপর এত জোর দিয়েছেন। এর মধ্যে কোন গোঁড়ামি নাই — এটা নির্ভেজাল scientific truth.

ঋষি লাদায়ন ও দলভ্য রচিত গ্রন্থ — 'মৃগপক্ষী শাস্ত্রম্', 'শৈনিক শাস্ত্রম্', উদয়ন রচিত কণ্ডলী, ছান্দোগ্য প্রাপভ্যক চৈতন্যম্, আত্রেয় রচিত আয়ুর্বেদগ্রন্থম, বনৌষধিদর্পণম এবং সুশ্রুত সংহিতাতে পাই তাঁরা বলেছেন — দুধের প্রতি মাসা অঙ্গার নষ্ট করার জন্য ২.১৪ মাসা অম্লজান দুধের মধ্যেই নিহিত আছে। কাজেই বাইরের বায়ু থেকে ২.১৪৪ মাসা অংশ অম্লজান দুধকে বিশুদ্ধ করার জন্য দরকার হয় না। এই জন্যই দুধ মানুষের পক্ষে পরম উপকারী। বাইরের অম্লজানই ফুসফুস মধ্যে এসে রক্ত কণিকা সকলকে দগ্ধ করে, ক্ষয় করে। খাদ্যনিহিত অম্লজান তা করে না।

ঋষিদের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানানুমোদিত কিনা দেখা যাক। Dr. Livig প্রদত্ত চার্টে দেখি, তিনি গবেষণা করে বের করেছেন —

খাদ্য	উহার ১ গ্রেণ অঙ্গারে যে পরিমাণ অম্লজানের প্রয়োজন
চাউল	১.৬৬৫
গম	১.৬৮৬
যব	১.৭৫৩
গো-দুগ্ধ	২.১৪৪
মাংস	২.২৫৭

লক্ষ্য করুন — ঋষিরা বলেছেন দুধের প্রতি মাসা অঙ্গার নষ্ট করার জন্য ২.১৪৪ মাসা অম্লজান দরকার। বৈজ্ঞানিক Dr. Livig বলেছেন দুধের প্রতি গ্রেণ অঙ্গার নষ্ট করার জন্য ২.১৪৪ গ্রেণ অক্সিজেন দরকার হয়। ওজনের Unit এর ভিন্ন নাম আছে বলে কি কেউ ঋষিদের আবিষ্কৃত সত্যকে অবৈজ্ঞানিক বলবেন?

আর একটা উদাহরণ দিই। বিখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ও গবেষক Dr. Landois, Dr. Sterling এবং Dr. Besanez প্রমাণ করেছেন যে — এক সের দুধে ৫২৫.৫ গ্রেণ অম্লজান অর্থাৎ অক্সিজেন আছে। তাই দুধে বাইরের অম্লজান কম লাগে। তাতে সবচেয়ে বেশী অর্থাৎ ৯১৭৩.৫ গ্রেণ অম্লজান আছে। যোগীরাও এটা জানতেন। তাই তাঁরা পায়সান্নকে অতীব সুপথ্য এবং দুধকে সাত্ত্বিক খাদ্য বলেছেন।

উপরোক্ত বৈজ্ঞানিকরা বের করেছেন — মাংসে নাইট্রোজেন অর্থাৎ যবক্ষারজান বড় বেশী। দুধে যেখানে যবক্ষারজান ৭৪ গ্রেণ — সেখানে মাংসে যবক্ষারজানের পরিমাণ ৫৪১ গ্রেণ। দুধে লবণাংশ ৯০ গ্রেণ কিন্তু মাংসে ১৫২ গ্রেণ। তাই দুধ জান্তব খাদ্য হলেও মাংসের চেয়ে বেশী উপকারী। এই কথাটাই যোগীরা যখন বলেন — দুধ সাত্ত্বিক খাদ্য কিন্তু মাংস রজঃ ও তমোগুণবর্ধক, বড়ই উত্তেজক খাদ্য — তখন তাঁদের ঐ সব সিদ্ধান্তকে কি বিজ্ঞানের মত ভূয়োদর্শনের ফল বলা যাবে না?

আসল কথা হল। যোগ নিয়ে নানা অনাচার আজগুবি ধারণা মানুষের মনে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে যোগশাস্ত্র একটি পরিপূর্ণ বিজ্ঞান। এখন যাকে বিজ্ঞান বলা হয়, বৈদিক ভারতে তাকেই রহস্যশাস্ত্র অর্থাৎ যোগ বলা হত। প্রকৃত যোগী হলেন প্রকৃত বিজ্ঞানী। যোগের নিয়মাধীন খাদ্য ও ক্রিয়াকৌশল প্রভৃতি সব কিছু বিচার করলে এবং আধুনিক বিজ্ঞানের সঙ্গে তার অত্যাশ্চর্য মিল দেখলে, কোনই সন্দেহ থাকে না যে, বিজ্ঞানীদের Scientific Research এর মত প্রকৃত যোগী প্রকৃত দুর্জ্ঞেয় রহস্য আবিষ্কারের পেছনেই ধ্যানমগ্ন থাকেন।

এতক্ষণ ধরে যে সব কথা আলোচনা করা হল সে সমস্তই হঠযোগের কথা। হঠযোগ প্রণালীর অনুশীলন করতে করতেই ঋষিরা যে সব তত্ত্ব আবিষ্কার করেছিলেন তাতেই Anatomy, Physiology, Psychology এবং Medical Science এর অনেক দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে। মনে রাখা দরকার, এই হঠযোগ হল — ভারতীয় যোগপদ্ধতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে নিম্নতম স্তরের। তাতেই বহু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব যদি আমাদের কাছে ধরা পড়ে, তাহলে রাজযোগ, লয়যোগ, সিদ্ধযোগ, বিহঙ্গযোগ, উদ্‌গীথযোগ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ যোগপন্থাগুলির মধ্যে নিশ্চয়ই আরও পরমাশ্চর্য সূক্ষ্মতম বিজ্ঞানের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

আমরা কথা বলতে বলতে ভজন-আশ্রমে ফিরে এলাম। আমি মুখ হাত ধুয়ে ঘরে ঢুকে পেট ভরে জল খেলাম। নিজের আসনে বসে থাকতে থাকতে পরিক্রমা পথের নানা কথা মনের মধ্যে ভিড় করে এল। ভাবতে লাগলাম, আমার সঙ্গী সাধুরা কেউ কম নন। আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হল না। কিন্তু আমার সঙ্গীরা সকলেই গেছেন ওঁঙ্কারেশ্বরজীর সান্ধ্য আরতি দেখতে। আমি বসলাম ডায়েরী লিখতে। একে একে লিখে ফেললাম সোমানন্দজীর কথা। রঞ্জনের দীক্ষার কথা, বিষ্ণুপুরীর সাধু-সম্মেলন ও রামদাসজীর কথা, প্রলয়দাসজীর ওঁ-কার তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

সঙ্গীরা ওঁকারেশ্বরের আরতি দেখে ফিরে আসর পরেই 'আমার খুব ঘুম পাচ্ছে বলে' শুয়ে পড়লাম। সকালে যখন জেগে উঠলাম, তখন পূর্বাকাশে অরুণোদয় হচ্ছে। আমি শুনতে পাচ্ছি রামদাসজীর মধুর কণ্ঠস্বর। তিনি ভক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে 'রামচরিতমানস' থেকে নবদূর্বাদল রামচন্দ্রের রূপের বর্ণনা করছেন।

আমি ও আমার সঙ্গীরা কোটিশ্বর ঘাটে স্নান করতে গেলাম। আমি যথারীতি স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরে ঢুকে শিবসহস্রনাম পাঠ করলাম। পাঠান্তে ওঁকারেশ্বরজীর মাথায় জল ঢেলে ফিরে এসে দেখি কয়েকজন সাধু এসেছেন রামদাসজীকে দর্শন করতে। কিছুক্ষণ পরেই তাঁদরে সঙ্গে রামদাসজী আমাদের ঘরে ঢুকলেন। মঙ্গলদাসজী আমাদের সকলের জন্য সরবত নিয়ে এলেন।

পরিচয় পর্বের পর রামদাসজীর বয়সী একজন বৃদ্ধ সাধু পরিষ্কার বাংলায় বললেন — আমি বহুবার বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করেছি। বাংলাদেশে মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালী মাত্রেরই প্রাণের বস্তু। বাঙালী জন্মগ্রহণ করে কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুনতে শুনতে। কোন আনন্দোৎসব কালে, আধি, ব্যাধি, বিপদ, আপদের কালেও বাঙালী রামায়ণ পাঠ করে। কৃত্তিবাসের কল্যাণে রামায়ণ বাঙালী জীবনের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হলেও মহাকবি কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ এবং মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে

অনেক পার্থক্য আছে। অনেক স্থানে মূল ঘটনাও বিকৃত বা বর্ধিত হয়েছে কৃত্তিবাসী রামায়ণে?

মূল বাল্মীকি রামায়ণে দেখা যায় প্রাচেতস বাল্মীকি নারদকে জিজ্ঞাসা করলেন ভূমণ্ডলের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? জ্ঞানে গুণে সত্যানিষ্ঠা এবং চরিত্রবত্তায় আদর্শ চরিত্র কার?

চারিত্রেন চ কো যুক্তঃ সর্বভূতেষু কো হিতঃ,
বিদ্বানন্ কঃ, কঃ সমর্থশ্চ কশ্চৈকঃ প্রিয়দর্শনঃ?
আত্মবান্ কো জিতক্রোধো, দ্যুতিমান্ কোহনসূয়কঃ
কস্য বিভ্যতি দেবাশ্চ জাতরোযস্য সংযুগে? (মূল বাল্মীকি,বালকাণ্ড)

নারদ তখন একাত্তরটি শ্লোকে রাম চরিত্র বর্ণনা করলেন —

স চ সর্বগুণোপেতঃ কৌশল্যানন্দ বৰ্দ্ধনঃ
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে স্থৈর্যে চ হিমবানিব। (ঐ)

ইত্যাদি। কিন্তু ক্রমে ক্রমে বাল্মীকি রামায়ণের মূল কলেবরেই বাড়তে থাকে। খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বাল্মীকি রামায়ণের যে প্রথম সংস্করণ বেরোয় তাতে সংখ্যা কিছু বেড়েছিল। দ্বিতীয় সংস্করণে দেখা গেল শ্লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে চব্বিশ হাজার এবং বহু প্রক্ষিপ্ত ঘটনায় পরিপূর্ণ! তৃতীয় সংস্করণে পরিশিষ্ঠ ভাগে উত্তরাকাণ্ড সহ কলেবর আরও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হোল।

যাই হোক, বাল্মীকির রামচন্দ্র আদর্শ মানব; স্বার্থপরতা প্রেম পিতৃভক্তি পরাক্রম এবং প্রজানুরঞ্জনে তিনি গরীয়ান পুরুষ; দেবোপম দেবতা বা পূর্ণ পরমাত্মা নন। রামচন্দ্রকে পূজা করতে হবে কিংবা তাঁর নাম তারকব্রহ্ম মুক্তিপ্রদ নাম, একথা বাল্মীকি বলেন নি। কিন্তু কৃত্তিবাস লিখলেন —

'শমন দমন রাবণ রাজা রাবণ দমন রাম
শমন ভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম!'

বাল্মীকির পর যত রকমের রামায়ণ সম্প্রদায়ীরা লিখেছেন তাদের প্রত্যেকটিতে সর্বজ্ঞতা সর্বশক্তিমত্ত miracles করবার ক্ষমতা, পূর্ণ যড়ৈশ্বর্য আরোপ করে তাতে পূর্ণ পরমেশ্বরত্ব প্রতিপাদন করা হয়েছে। সবচেয়ে চরমে উঠেছে, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অন্তর্গত অধ্যাত্ম রামায়ণে; এটি ব্যাসের নামে লেখা হয়েছে। অধ্যাত্ম রামায়ণে দেবতারা বটেই এমন কি মাতা কৌশল্যাকে দিয়েও পূর্ণ পরব্রহ্মজ্ঞানে রামের স্তব করান হয়েছে।

অদ্ভুতাচার্য্যের অদ্ভুত রামায়ণে আবার দশম স্কন্ধে রাবণের পরিবর্তে সহস্রস্কন্ধ রাবণের কথা আছে। তাতে আছে রাবণ যখন সীতাকে হরণ করতে যান তখন সহসা সীতা নাকি দুর্গামূর্তি (!) ধারণ করে তার ৯৯০টা মুণ্ড ছেদন করে ফেললেন; তারপর 'রামের হাতে রাবণের মৃত্যু' এই দৈববাণী শুনে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সীতা হয়ে গেলেন; শান্ত সুশীলা অবলা বালিকার মত রাবণকে অপহরণের সুযোগ দিলেন। কোন রামায়ণকার আবার এমনই সীতারামের ভক্ত যে, দশানন রাক্ষস মা জানকীকে হরণ করে নিয়ে যাবে একথা লেখনী মুখে লেখেন কি করে? কাজেই লেখা হল — রাবণের হরণকালে ব্রহ্মা এসে সীতাকে নিয়ে গেছলেন, মায়া সীতাকে পঞ্চবটীতে রেখে। রাবণ এই মায়া সীতাকেই অপহরণ করেছিল। রাবণ বধের পর, অগ্নিপরীক্ষাকালে মায়া সীতা দগ্ধ হল আর অগ্নি মধ্য হতে ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে আসল সীতাকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলেন!! কৃত্তিবাসও রামভক্তিতে গদগদ হয়ে লিখেছেন —

তোমার গায়ের লোমাবলি যত দেবগণ,
সীতাদেবী লক্ষ্মী তুমি নিজে নারায়ণ!'

কল্পনার কুহেলি রচনায় এই সব অতি ভক্ত রামায়ণকারদের কাছে বাল্মীকি শিশুমাত্র! বাল্মীকির রামচন্দ্র 'সর্বগুণোপেতঃ', 'নিয়তাত্মা মহাবীর্যো দ্যুতিমান্ ধৃতিমান বশী', 'ধর্মজ্ঞ সত্যসন্ধশ্চ প্রজানাং চ হিতে রতঃ' — একজন আদর্শ মানব; পূর্ণ পরমেশ্বর নন; দেবতাগণ কিংবা মাতাপিতারও আরাধ্য ভগবান নন। তোমরা সবাই রামের মূর্তি গড়ে পূজা কর, জপ নাম কর — এ ধরণের কোন নির্দেশ প্রাচেতস বাল্মীকি মুনি দিয়ে যান নি।

যাই হোক, মূল বাল্মীকির রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনা নিয়ে পার্থক্যের বহরটা দেখ ঃ—

১। বাল্মীকি পূর্বজন্মে দস্যু রত্নাকর ছিলেন — 'মরা মরা' জপ করে বাল্মীকি হয়েছিলেন — মূল রামায়ণে এসব কথার বিন্দুবিসর্গ নেই।

২। কৃত্তিবাস বর্ণিত রামের দুর্গাপূজা বা অকাল বোধনাদির কথা সত্যদর্শী বাল্মীকি মুনির মূল রামায়ণে নেই।

৩। রামের জন্মে ৬০,০০০ বছর পূর্বে বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করেছিলেন — একথাও মিথ্যা। 'কোন্বস্মিন্ সাম্প্রতং লোকে গুণবান্ কশ্চ বীর্যবান্' — নারদকে বাল্মীকির এ ধরণের প্রশ্নে স্পষ্টই বোঝা যায় তখন রাম রাজত্ব করছেন। মূল রামায়ণে স্পষ্ট বলা হয়েছে —

প্রাপ্ত রাজ্যস্য রামস্য বাল্মীকির্ভগবান ঋষিঃ।
চকার চরিতং কৃৎস্নং বিচিত্র পদর্থবৎ'। (আদিকাণ্ড, ৪র্থ সর্গ ১ম শ্লোক)

৪। যজ্ঞ রক্ষার জন্য রাম লক্ষ্মণকে পাঠানোর ব্যাপারে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে দশরথ ছলনা করেছিলেন বলে কৃত্তিবাস যে রসাল বর্ণনা দিয়েছেন বাল্মীকি রামায়ণে তা নেই। বাল্মীকি রামায়ণে আছে বিশ্বামিত্র রাম লক্ষ্মণকে প্রার্থনা করায় বশিষ্ঠ বললেন —

'তেষাং নিগ্রহেন শক্তঃ স্বয়ং চ কুশিকাত্মজঃ,
তব পুত্র হিতার্থায় ত্বামুপেত্যাভিযাচতে।'

বশিষ্ঠের ঐ কথা শুনে দশরথ প্রসন্নচিত্তে, নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে রাম লক্ষ্মণকে যেতে দিলেন। কৃত্তিবাসের বর্ণনানুযায়ী দশরথের ছলনায় ক্রুদ্ধ হয়ে অগ্নিশর্মা বিশ্বামিত্র অযোধ্যা ভস্ম করে ফেলবার ভয় দেখাতে, মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিত হতে হতে, অগত্যা দশরথ রাম-লক্ষ্মণকে তাঁর সঙ্গে দিলেন এ ধরণের বর্ণনা মূল রামায়ণে নেই। মূল রামায়ণে বরং এই কথাই আছে —

'তথা বশিষ্ঠে ব্রুবতি রাজা দশরথঃ সুতম্,
প্রহৃষ্টবদনো রামম্ আজুহাব সলক্ষণম্'।
'দদৌ কুশিক পুত্রায় সুপ্রীতেনান্তরাত্মনা'।

৫। গৌতমীপত্নী অহল্যা পাথর হয়েছিলেন; রামের চরণস্পর্শে তিনি মনুষ্য শরীর লাভ করলেন; রামের চরণস্পর্শে কাঠের নৌকা সোনা হয়ে গেছল — ইত্যাদির বর্ণনা দিয়ে কৃত্তিবাস রামভক্তির যে পরকাষ্ঠা দেখিয়েছেন — ঐ সব অলীক অলৌকিক কথা মূল রামায়ণে নেই। অহল্যা পাথর হয়ে যান নি, অন্যাকে দেখা না দিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে কঠোর ব্রহ্মচারিণী জীবন যাপন করেছিলেন — এই কথাই বাল্মীকি রামায়ণে আছে; ('বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপ্যন্তী ভস্মশায়িনী' — ইত্যাদি)।

৬। রাবণ বিভীষণকে পদাঘাত করায় সে রামের কাছে আশ্রয় নিয়েছিল — একথা কৃত্তিবাসের কৃপায় বাংলাদেশেরও শিশুও জানে! কিন্তু রাবণ বিভীষণকে তিরস্কার করেছিলেন মাত্র — পদাঘাত করেন নি — এই কথাই বাল্মীকি লিখেছেন। রাবণ ক্ষোভ প্রকাশ করলেন,

'বসেৎ সহ সপত্নেন ক্রুদ্ধোনাশীবিষেণ বা
নতু মিত্র প্রবাদেন সংবসেচ্ছত্রুসেবিনা।'

রাবণের ধিক্কার বাণী শুনে কুলপাংশু দেশদ্রোহী কৃতঘ্ন বিভীষণই বরং 'উৎপপাত গদাপাণিশ্চতুর্ভিঃ সহ রাক্ষসৈঃ', দেশ ও জাতির ঐ চরম বিপদের মুহূর্তে উল্টে রাবণকেই গালাগালি দিয়ে রামের কাছে চলে এল!

'...ইত্যুক্ত্বা পরুষং বাক্যং রাবণং রাবণানুজঃ
আজগাম মুহূর্তে যত্র রাম সলক্ষণঃ।' (বাল্মীকি রামায়ণ)

৭। হনুমান কর্তৃক সূর্যকে বগলদাবা করে গন্ধমাদন পর্বত মাথায় করে আনার উদ্ভট কথাও বাল্মীকি রামায়ণে নেই।

৮। কালনেমি সংবাদ, নন্দীগ্রামে ভরতের সঙ্গে হনুমানের সাক্ষাৎ, গরুড়-পবনের যুদ্ধ অঙ্গদরায়বার ইত্যাদি মূল রামায়ণে নেই।

৯। হনুমানের প্রার্থনায় উগ্রচণ্ডাদেবীর লঙ্কাত্যাগের কাহিনী, সমুদ্র লঙ্ঘন কালে সিংহিকা রাক্ষসী প্রসঙ্গ, জান্তব কাক সীতাকে আক্রমণ করায় রামের নিক্ষিপ্ত ত্রিশিরাশর কাকটিকে দেবলোক, ব্রহ্মলোক, শিবলোক পর্যন্ত ধাওয়া করে তার চক্ষুবিদ্ধ করে আনল — এই সব কথাও মূল রামায়ণে নেই।

১০। রাবণের স্বর্গ বিজয় কালে কুম্ভকর্ণের গমন, চৌযট্টি যোগিনী সহ যুদ্ধ, তরণীসেন বধ, মহীরাবণ, অহীরাবণ বধ, অতিকায় বীরবাহু তরণীসেন প্রভৃতির কাটামুণ্ডের রাম নাম উচ্চারণের অতি মিথ্যা কাহিনীও বাল্মীকি রামায়ণে নেই।

১১। লক্ষ্মণের চৌদ্দ বছরের ফল আনয়ন কাহিনী, লবকুশের যুদ্ধাদি সমগ্র উত্তরকাণ্ডই বাল্মীকি রামায়ণে নেই।

১২। বাল্মীকির সীতা আর কৃত্তিবাসের সীতাচরিত্র অঙ্কনেও তফাৎ আছে। বাল্মীকির সীতা বীরাঙ্গণা; অপহরণকালে তিনি ক্রুদ্ধা সিংহীর মত গর্জন করছেন —

'ধিক তো শৌর্যঞ্চ সত্ত্বঞ্চ যৎ ত্বয়া কথিতং তদা।'

রাবণকে বলছেন —

কুলাক্রোশকরং লোকে ধিক্ তে চারিত্রমাদৃশম্।
'বদ্ধ স্তং কালপাশেন দুর্নিবারেণ রাবণ।''

আর কৃত্তিবাসের বর্ণনা দেখ —

'করে দুষ্ট কুড়ি পাটি দন্ত কড়মড়ি,
জানকী কাঁপেন যেন কলার বাগুড়ি!!''

অলমিতি।

বৃদ্ধ সাধুর আলোচনা শেষ হতেই রামদাসজী বললেন — রামদয়াল এখন চল যাই, প্রভুজীর ভোগারতি হবে, সবাই মিলে দর্শন করবে চল।

যড়ঙ্গী মহারাজের বিগ্রহসেবা ঘড়ির নিয়মে চলে। ভোগারতির পর সবাই একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। বিকেলে নর্মদামুখী মন্দিরের দাওয়ায় আমরা বসে আছি। এমন সময় রামদাসজী আমাদের কাছে এসে বসলেন।

ত্রিদিবানন্দ তখন হাতজোড় করে বললেন — মহারাজ! তুলসীদাসজীর রামচরিতমানসের উত্তরকাণ্ডে আছে পক্ষিরাজ গরুড় রাম-কথা শুনবার জন্য ভুশুণ্ডি কাকের নিকট যান। তিনি ভুশুণ্ডিকে সাতটি প্রশ্ন করেন। কিন্তু ঠেঁট এবং খোড়িবলি ভাষায় সংমিশ্রণে রচিত বলে রামচরিতমানসের যথার্থ অর্থ কোনদিনই সেভাবে অনুধাবন করতে পারি নি। তাই এই বিষয়ে গরুড় ও ভুশুণ্ডির মধ্যে যা কথপোকথন হয় তা আপনার মুখ থেকে শুনবার আগ্রহ হচ্ছে। আপনি যদি দয়া করে বলেন।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রামদাসজী বললেন — শম ও দৈন্য, শরণাগতি ও আত্মনিবেদনের ভাব হতে যে চিত্তপ্রসাদ লাভ হয়, সেই চিত্তপ্রসাদ ভিন্ন তুলসীদাসজীর রামচরিতমানসের মাধুর্য্য তথা রামলীলার অমৃতকথা কারও পক্ষে আস্বাদন করা সম্ভব নয়।

তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন —

পুনি সপ্রেম বোলেউ খগরাউ। জো কৃপাল মোহি-উপর তাউ॥
নাথ মোহি নিজ সেবক জানী। সপ্ত প্রশ্ন মন কহহু বখানী॥

খগরাজ গরুড় প্রেমপূর্ণ ভাষায় বলছেন — যদি আমার উপর আপনার স্নেহ হয়, যদি আমাকে আপনার সেবক বলে মনে করেন তবে আমার সাতটি প্রশ্নের উত্তর বিস্তারিত ভাবে দিন।

প্রথমহি কহহু নাথ মতিধীরা। সব তেঁ দুর্লভ কবন সরীরা॥
বড় দুখ কবন কবন সুখ ভারী। যো সংছেপ হি কহহু বিচারী॥

— হে ধীরমতি প্রভো, প্রথমে বলুন কোন্ শরীর সর্বাপেক্ষা দুর্লভ? সবচেয়ে বড় দুঃখ কি? সবচেয়ে বড় সুখ কি?

সন্ত অসন্ত মরম তুম্হ জানহু। তিন্হকর সহজ সুভাব বখানহু॥
কবন পুণ্য শ্রুতিবিদিত বিখালা। কহহু কবন অঘ পরমকৃপালা॥

অর্থাৎ হে পরম কৃপালু, আপনি সন্ত ও অসন্ত ব্যক্তির মর্ম্ম জানেন। তাঁদের সাধারণ স্বভাব বর্ণনা করুন। বেদবিদিত বিশাল পূণ্য কি? পাপ কি?

মানসরোগ কহহু সমুঝাঈ। তুম্হ সর্বজ্ঞ কৃপা অবিকাঈ॥

তাত সুনহু সাদর অতিপ্রীতী। মৈঁ সংছেপ কহউঁ য়হ নীতি॥

—আপনি সর্বজ্ঞ এবং আমার উপর আপনার অত্যধিক কৃপা। মানসরোগ কি, তা আমাকে বলুন।

এরপর ভুশুণ্ডি অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে গরুড়কে 'তাত' সম্বোধন করে বললেন —

নর তন সম নহিঁ কবনিউ দেহী। জীব চরাচর জাঁচত জেহী॥

নরক সর্গ অপবর্গ নিসেনী। জ্ঞান বিরাগ ভগতি সুখ দেনী॥

নরদেহের মত দেহ আর নাই, চরাচরের সকল জীবই তা প্রার্থনা করে। এটাই স্বর্গ, নরক ও মোক্ষের সিঁড়ি এবং জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ভক্তিসুখ দান করে।

যো তনু ধরি ভজহিঁ ন জেনর। হোহিঁ বিষয় রত মন্দ-মন্দতর॥

কাঁচ-কিরিচ বদলে তে লেহী। করতেঁ ডারি পরসমনি দেহী॥

এই দেহ ধারণ করে যে লোক হরিভজন করে না এবং বিষয়ে লিপ্ত হয়, সে মন্দ হতেও মন্দ। সে নিজ হাতে পরশমণি ফেলে দিয়ে কাঁচখণ্ডকে পরশমনি ভাবে।

নহিঁ দরিদ্র-সম দুখ জগ মাহীঁ। সন্তমিলন সম সুখ কছু-নাহীঁ॥

পর-উপকার বচন মন কায়া। সন্ত সহজ সুভাউ খগরায়া॥

হে খগরাজ, দরিদ্র হওয়ার মত দুঃখ জগতে কিছু নাই, সন্তপুরুষের সঙ্গে মিলনের মত সুখ আর হয় না। কায়মনোবাক্যে পরের উপকার করাই সন্তপুরুষের সাধারণ স্বভাব।

সন্ত সহহী দুখ পরহিত লাগী। পরদুখ হেতু অসন্ত অভাগী॥

ভূ-রজ তরু সম সন্ত কৃপালা। পরহিত নিত সহ বিপতি বিসাসা॥

সন্তপুরুষ পরহিতের জন্য দুঃখ সহ্য করেন, আর অভাগা অসন্ত ব্যক্তি পরের দুঃখের হেতু। কৃপালু সন্ত পৃথিবীর ধূলা ও তরুর সমান; তিনি পরহিতের জন্য নিত্য মহা বিপত্তি সহ্য করেন।

সন ইব খল পরবন্ধন করঈ। খাল কঢ়াই বিপতি সহি মরঈ॥

খল বিলু স্বারথ পর অপকারী। অহি মূষক ইব সুনু উরগারী॥

হে সর্পকুলের শত্রু, খল ব্যক্তি শণের মত, সে অপরকে আবদ্ধ করে এবং নিজের ছাল উঠিয়ে বিপত্তি সহ্য করে। সাপ ও ইঁদুরের মত স্বার্থ না থাকলেও খল পরের অপকার করে।

পরসম্পদা বিনাসি নসাহীঁ। জিমি কৃষি হতি হিম উপল বিলাহী॥

দুষ্ট উদয় জগ আরত হেতু। জথা প্রসিদ্ধ অধম গ্রহ কেতু॥

দুষ্ট পরের সম্পদ বিনষ্ট করে নিজেও নষ্ট হয়। শিলাবৃষ্টির সময় শিলা যেমন কৃষিজ দ্রব্যকে নষ্ট করে নিজেও বিলুপ্ত হয়। গ্রহ কেতু যেমন অধম বলে প্রসিদ্ধ, সেরূপ দুষ্টের উদয় হয় জগতের দুঃখের জন্য।

সন্ত উদয় সন্তত সুখকারী। বিশ্ব সুখদ জিমি ইন্দু তমারী॥

পরম ধরম শ্রুতি বিদিত অহিংসা। পরনিন্দা সম অঘ ন গিরিংসা॥

ইন্দু যেমন বিশ্বের তমসা দূর করে সুখ দান করে, সন্ত পুরুষের উদয়ও সেরূপ সদা সুখকর। পরম ধর্ম হচ্ছে বেদবিদিত অহিংসা, পরনিন্দার মত পর্বতপ্রমাণ পাপ আর নাই।

হরিগুরু নিন্দক দাদুর হোঈ। জনম সহস্র পাব তন সোঈ॥

দ্বিজ নিন্দক বহু নরক ভোগ করি। জগ জনমই বায়স শরীর ধরি॥

হরি ও গুরুর নিন্দা যারা করে তারা ভেকের মত, সে সহস্র জন্ম সেই তনু পায়। দ্বিজনিন্দক বহু নরক ভোগ করে বায়স রূপে জন্মায়।

সুর শ্রুতি নিন্দক জে অভিমানী। রৌরব নরক পরহিঁ তে প্রাণী॥

হোহি উলুক সন্ত নিন্দারত। মোহনিসা প্রিয়জ্ঞান ভানু গত॥

যে অভিমানী দেবতা ও শ্রুতির নিন্দা করে, সে রৌবব নরকে পড়ে। সন্ত-নিন্দা-রত ব্যক্তি পেচক হয়ে জন্মে, মোহরূপ নিশা তার কাছে প্রিয়, জ্ঞানরূপ ভানু তার নিকট প্রকাশিত হয় না।

সবকৈ নিন্দা জে জড় করহীঁ। তে চমগাদর হোই অবতরহীঁ ॥
সুনহু তাত সব মানস রোগা। জেহিতে দুখ পাবহি সব লোগা ॥

যে মূর্খ সকলেরই নিন্দা করে, সে বাদুড় হয়ে জন্মে। হে তাত, এখন মানসরোগের কথা শুনুন, যে সকল রোগে সমস্ত লোকে কষ্ট পায়।

মোহ সকল ব্যাধিন কর মূলা। তেহি তেঁ পুনি উপজই বহু মূলা।
কাম বাত কফ লোভ অপারা। ক্রোধ পিত্ত নিত ছাতী জারা ॥

মোহ সকল ব্যাধির মূল, পরে তা থেকেই বহু ব্যাধির উৎপত্তি। কাম হচ্ছে রাত, অত্যধিক লোভ হচ্ছে পিত্ত, যার দ্বারা নিত্য বুক বিদীর্ণ হয়।

প্রীতি করহি জো তীনিউ ভাঈ। উপজই সন্নিপাত দুখ দাঈ ॥
বিষয় মনোরথ দুর্গম নানা। তে সব মূল নাম কো জানা ॥

এই বাত-পিত্ত-কফ সংযোগে দুঃখদায়ক সন্নিপাত রোগ জন্মে। বিষয়ের যে নানা দুষ্পূরণীয় মনোরথ আছে, তাও পীড়া। কে জানে সে সকলের নাম?

মমতা দাদু কণ্ডু ইরষাঈ। হরষ বিষাদ গহরু বহুতাঈ ॥
পর সুখ দেখি জরনি সোই ছাঈ। কুষ্ঠ দুষ্টতা মল কুটিলাঈ ॥

মমতা হচ্ছে দদ্রু, ঈর্ষা হচ্ছে কণ্ডূয়ন, হর্ষ ও বিষাদ কঠোর গ্রন্থিবাত। পরের সুখে যে জ্বলন হয়, তা হল ক্ষয়রোগ আর দুষ্টতা ও কুটিলতা হচ্ছে কুষ্ঠব্যাধি।

অহংকার অতি দুখদ উঁবরুআ। দম্ভ কপট মদ মান নহরুআ ॥
তৃষ্ণা উদরবৃদ্ধি অতি ভারী। ত্রিবিধ ঈষণা তরুণ তিজারী ॥

অহংকার অতি দুঃখদায়ী জলোদরী রোগ, দম্ভ, কপটতা মদ, অভিমান হচ্ছে নহরুয়া রোগ; তৃষ্ণা (লিপ্সা) অতি প্রবল উদরবৃদ্ধি আর তিন প্রকার লালসা হচ্ছে প্রবল জ্বর।

জুগ বিধি জ্বর মৎসর অবিবেকা। কহঁ লগি কহউ কুরোগ অনেকা ॥

মাৎসর্য্য ও অবিবেক হল দুই প্রকারের জ্বর। এরূপ কুরোগের কথা আর কত বলব?

এক ব্যাধি বস নর মরহিঁ, এ অসাধ্য বহু ব্যাধি।
পীড়হিঁ সংতত জীব কহুঁ সো কিমি লহই সমাধি ॥

একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেই লোকে মারা যায়, আর এ ত হচ্ছে বহু অসাধ্য ব্যাধি। এই রোগে লোক সতত পীড়িত হয়; রোগে কেমন করে শান্তি পাবে?

নেম ধর্ম্ম আচার তপ জ্ঞান জজ্ঞ জপ দান।
ভেষজ পুনি কোটিক নহী রোগ জাহি হরিজান ॥

হে হরিবাহন গরুড়, নিয়ম, ধর্ম্ম, আচার, তপ, জ্ঞান, যজ্ঞ, জপ, দান ইত্যাদি কোটি প্রকারের ভেষজ আছে, কিন্তু তাতে রোগ যায় না।

এহি বিধি সকল জীব জড় রোগী। শোক হরষ প্রীতি বিয়োগী ॥
মানস রোগ কছুক মৈঁ গায়ে। হহিঁ সবকে লখি বিরলই পায়ে ॥

সকল মূর্খ লোকই হল এইরূপ রোগী। শোক, হর্ষ, ভয় ও প্রীতিতে সকলে লিপ্ত। কিছু কিছু মানসরোগের কথা আমি বললাম। যা সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।

জানে তে ছীজহিঁ কছু পাপী। নাস ন পাবহি জন পরিতাপী ॥
বিষয় কুপথ্য পাই অঁকুরে। মুনিহু হৃদয় কা নর বাপুরে ॥

দুঃখদায়ী এই সকল পাপী রোগের বিষয় জানতে পারলে কিছু কম হয়, কিন্তু একেবারে নষ্ট নয় না। বিষয়রূপ কুপথ্য পেলে মুনিজনের হৃদয়েও ঐ সকল রোগের অঙ্কুর জন্মে। বেচারা সাধারণ মানুষের কথা আর কি বলব? এতক্ষণ রোগের কথা বলা হল। এখন ঔষধ নির্ণয় করা আবশ্যক। ভুশুণ্ডি তাও করলেন।

রামকৃপা নাসহিঁ সব রোগা। জো এহি ভাঁতি বনই সংজোগা ॥
সদ্‌গুরু বৈদ বচন বিস্বাসা। সংজম গ্রহ ন বিষয় কৈ আসা ॥

সদ্‌গুরু-রূপ বৈদ্য, তাঁর বচনে বিশ্বাস এবং বিষয়ের প্রতি লালসায় সংযম ঘটলেই তবে একমাত্র রাম নামেই সকল রোগ নষ্ট হয়।

রঘুপতি ভগতি সজীবন মূরী। অনুপান শ্রদ্ধা অতি পুরী॥
এহি বিধি ভলেহিঁ সো রোগ নসাহীঁ। নাহি ত জতন কোটি নহি জাহীঁ॥

রামভক্তি হল সঞ্জীবনী বটিকা, তার অনুপান হল পূর্ণ শ্রদ্ধা। এতে সহজেই রোগ নাশ হয়। না হলে কোটি যত্ন করলেও রোগ যায় না।

পরে এই প্রসঙ্গের উপসংহারে ভুশুণ্ডি বললেন —

কমঠ পীঠি জামহিঁ বরুবারা। বন্ধ্যাসুত বরু কাহুহি মারা॥
ফুলহিঁ নভ বরু বহু বিধি ফুলা। জীব ন লহ সুখ হরি প্রতিকূলা॥

কচ্ছপের পিঠে চুল হওয়া, বন্ধ্যার পুত্র হওয়া আর আকাশে ফুল ফোটার মত অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হতে পারে, কিন্তু হরি প্রতিকুল সুখ পাওয়া কিছুতেই সম্ভব নয়।

রাম কথা শেষ হল। আর রামদাসজী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়লেন আমার কোলে। আমরা ধরাধরি করে রামদাসজীকে তাঁর ঘরে এনে শুইয়ে দিলাম।

পরদিন সকালে নর্মদায় স্নান, প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে ওঁকারেশ্বরজীর পূজা করে যখন আমরা ভজন-আশ্রমে ফিরে এলাম তখন দেখি রামদাসজী উঠোনে পয়াচারী করছেন। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি বললাম — সকালে ওঁকারেশ্বর মন্দিরে প্রভুর পূজাপাঠ ও বিকেলে আপনার মুখ থেকে 'শ্রীরামচরিতমানসের' দোঁহা শুনে আমাদের বেশ আনন্দেই কাটছে। এবার আমরা বেরিয়ে পড়তে চাই। অনেক পথ এখনও বাকী।

আমার কথা শুনে রামদাসজী থমথমে মুখে বসে পড়লেন। তারপর নিঃশব্দে গম্ভীর মুখে উঠে গেলেন নিজের ঘরে। হরানন্দজী বললেন — এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ সাধুকে এভাবে বলা তোমার উচিত হয় নি। তাঁর কাছ থেকে যে স্নেহ ও সমাদর পেয়েছি, তাতে তাঁকে আমাদের যাত্রার কথা পরে রয়ে সয়ে বললে ভাল করতে।

অল্পক্ষণ পরে রামদাসজী ফিরে এলেন একটি লাল কাপড়ে মোড়া একটি বই নিয়ে, সেটি আমার হাতে দিয়ে বললেন — উত্তরতট পরিক্রমাকালে যখন তুমি এখানে ছিলে তখন এই রামচরিতমানস আমি তোমাকে দিয়েছিলাম কিন্তু দুর্গম পথে 'দূরকে শোলা ভারী' বলে এই বই তুমি নাও নি। কিন্তু কথা দিয়েছিলে ফিরবার পথে নিয়ে যাবে। সেই থেকে এই বই আমি যত্ন করে রেখে দিয়েছি। এবার তোমাকে এটা নিয়ে যেতেই হবে।

আমি কোন কথা বলতে পারলাম না, সংসারবিরক্ত নিরাসক্ত সাধুর স্নেহে আমি অভিভূত। আমার দু চোখ দিয়ে অবিরলধারে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। তাঁকে প্রণাম করে তাঁর হাত ধরে আমি বললাম — আপনার স্নেহের দান এই বইটি আমি অবশ্যই নিয়ে যাব। আপনার দেওয়া বইটি নিশ্চয়ই পবিত্র স্মারক চিহ্ন হিসাবে রাখার যোগ্য।

দেখলাম রামদাসজী স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। বললেন — সন্ধ্যেবেলা তোমার প্রভুর শয়ন আরতি দেখে এস। কাল যাত্রার পক্ষে শুভদিন, আমি খোলামনে তোমাদের যাত্রার অনুমতি দিলাম।

আমরা মন্দিরের পথে রওনা হলাম।

মনের চিন্তাস্রোত নানাদিকে দৌড়ে বেড়াতে লাগল। আজ ওঁকারেশ্বরে শেষ দিন। আজ বড় ক্লান্ত লাগছে। শরীর ও মন অবসাদে ভরে আছে। জীবনে রামদাসজীর সঙ্গে দেখা হবে কিনা জানি না কিন্তু সারা জীবন তাঁর স্নেহ যত্ন মনে রাখব। ওঁকারেশ্বর মন্দিরে গিয়ে ওঁকারেশ্বরের শয়ন আরতি দেখে, তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে ফিরে এলাম ভজন-আশ্রমে।

শেষ রাত্রিতেই উঠে পড়েছি। মঙ্গলারতির সময় সকলের সঙ্গে আমরাও তাঁদের সঙ্গে ভজনে যোগ দিলাম। আরতি শেষ হতেই আমরা প্রাতঃকৃত্য শেষ করে এসে মহাত্মা রামদাসজীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করলাম। তাঁকে প্রণাম করে যড়ঙ্গী মহারাজ, মঙ্গলদাসজী এবং দীনদয়াল সকলের সঙ্গে কোলাকুলি এবং নমস্কারাদি সেরে 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি দিতে দিতে গাঁঠরী তুলে নিলাম। সকলেই আমাদের সঙ্গে এলেন কোটিতীর্থের ঘাট পর্যন্ত।

রামদাসজী, মঙ্গলদাসজী, দীনদয়াল সহ সকলের চোখেই জল। নৌকা চলেছে এই শৈলদ্বীপ হতে নর্মদার দক্ষিণতটে। নৌকা হতে দেখতে পাচ্ছি, রামদাসজী হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। এই ভজন-আশ্রম এবং আশ্রমিকদেরকে কখনও ভুলতে পারব না। নৌকা বিষ্ণুপুরীর তটে এসে ভিড়ল। নৌকা থেকে নামলাম।

পথের পরিচয় পথে শেষ হলেও বিষ্ণুপুরীর ঘাটে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনের কথা মনে পড়ায় বুকের ভিতরটা গুমরে গুমরে উঠছে। একটুখানি পশ্চিমদিকে পিছিয়ে গেলেই ত মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে রঞ্জনের দেখা পাব! কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই। মহাত্মা সোমানন্দজীর রুদ্রশাসন উপেক্ষা করার মত শক্তি আমাদের কোথায়! দেহ, মন অবশ হলেও 'হর নর্মদে, হর নর্মদে' করতে করতে আমরা সবাই কম্বল, ঝোলা পিঠে ফেলে হাঁটতে লাগলাম পূর্বদিকের পাহাড়ের গা বেয়ে। পাথরের গা যেন ঘি দিয়ে মেজে ঘষে চকচকে করা হয়েছে। আধ মাইলটাক হেঁটে নর্মদার চরে নেমে হাঁটতে লাগলাম নর্মদার কিনারা ধরে। দূরে দূরে পাহাড়ের গায়ে বড় বড় গাছপালার জঙ্গল দেখা যাচ্ছে বটে কিন্তু আমরা নর্মদার বালুচরের উপর দিয়ে হাঁটছি। ক্রমশঃ আমরা মুণ্ডমহারণ্যে প্রবেশ করছি। চারিদিক প্রভাত সূর্যের উদয়-রশ্মিতে ঝলমল করছে। আবার আমরা চড়াই-এর পথে উঠছি, ক্ষীণ পথরেখা লক্ষ্য করে। ঠিক এই সময়েই জঙ্গলের ভিতর থেকে ভেসে এল এক ক্ষীণ চেনা চেনা কণ্ঠস্বর। মনে হচ্ছে কখনও শব্দটা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে বা কখনও দূরে সরে যাচ্ছে। আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম।